ইতিহাস অনুসন্ধান ১৬

সম্পাদনা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা * * * * * ২০০২

সূচীপত্র

বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ

বিভাগ ঃ প্রাচীন ভারত

সারাংশ

বিভাগ ঃ মধ্যযুগের ভারত

বিভাগ ঃ আধুনিক ভারত

ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক - উত্তর যুগের আর্থ সামাজিক ইতিহাস

সারাংশ

আঞ্চলিক ইতিহাস ঃ বীরভূম

সারাংশ

আঞ্চলিক ইতিহাস ঃ বীরভূম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল

সারাংশ

নারী ইতিহাস ঃ সমাজ—সংস্কৃতি— রাজনীতি

সারাংশ

চিন্তা-চেতনার ইতিহাস ঃ প্রেক্ষিত ঃ সমাজ ও সংস্কৃতি

সারাংশ

আন্দোলন ও সমাবেশের ইতিহাস

সারাংশ

বাংলাদেশ

সারাংশ

বাংলাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশ

সারাংশ

অগ্নিযুগের সূচনা ও স্বরূপ

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইতিহাস সংসদের সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় অতিথিবর্গ, এবং সমবেত ঐতিহাসিক বন্ধুগণ

আজ ২০০১ সালের চব্বিশে জানুয়ারি আপনারা সবাই আমাদের প্রিয় শান্তিনিকেতনে মিলিত হয়েছেন, আর আমি পড়ে আছি সুদূর প্রবাসে— এতে আমার অপরাধ যতটা, দুঃখও তার কম নয়। সেজন্য আমি একই সঙ্গে আপনাদের ক্ষমাপ্রার্থী, সহানুভূতি-প্রত্যাশী, এবং প্রশ্রয় - ভিখারী। অনিবার্য পারিবারিক কারণে আমার এই নির্বাসন, গৌতমদা জানেন। আজ আমার বক্তব্য তাঁরই কণ্ঠে আপনারা শুনতে পাবেন, এই ভরসা পেয়েছি। তিনি আমার অগ্রজ-প্রতিম, সুতরাং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করতে পারি না।

আজকের অধিবেশনে মূল নিবন্ধ পেশ করার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি তো যাকে বলে সম্মানিত বোধ করছি, কিন্তু খানিকটা সন্ত্রস্তও। ভাবছি আপনারা না শেষ পর্যন্ত এর জন্য অনুতাপ করেন। কেননা, যাঁরা আমার কাজকর্মের খোঁজ রাখেন তাঁরাই জানেন, আমি আর যাই হই না কেন, পেশাদার ইতিহাসজীবী নই। বলতে পারেন আমি শুধুই ইতিহাস-প্রেমিক। আমাদের চতুর্দিকে ইতিহাস ঘটে চলেছে— কখনও নিঃশব্দে, কখনও সশব্দে এই চেতনা আমাকে স্পন্দিত করে; ইতিহাসের মূল প্রশ্ন নিয়ে আমি ভাবিত হই; ইতিহাসের বই পড়তে ভালবাসি, যদি অবশ্য পাঠযোগ্য হয়; কিন্তু ইতিহাস লিখতে গেলেই গায়ে জ্বর আসে। সংস্কৃত বচন অনুসারে মুর্খের পক্ষে চুপচাপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ছেলেবেলায় শেখা এই সাবধানবাণী ভুলে গিয়ে বুকনি কিংবা হাল-ফ্যাশানের jargon - এর জালে আপনাদের জড়াতে সাহস পাই না। সোজা কথায় আমি মানুষটা একটু পুরনো। কলেজে আমার কাছে যাঁরা tutorial করেছেন, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে research, লেখার ব্যাপারে আমার এই ভীরু খুঁতখুঁতনির কথাটা অনেক দুঃখের মধ্য দিয়েই জেনে গেছেন তাঁরা।

সুতরাং আজকের অধিবেশনের জন্য কী উপহার আনব তা নিয়ে আমার দ্বিধা ছিল। আমার রচনার বিষয়বস্তু কী হবে এই সাত-পাঁচ চিন্তা থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন ইতিহাস-সংসদের উৎসাহী কর্মী, আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আজ আমার এই মূল নিবন্ধের বিষয় বাংলায় "অগ্নিযুগের সূচনা ও স্বরূপ"। বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষণা করেছি, একদা ইংরেজিতে আমার ভাবনা গ্রন্থিতও করেছিলাম। কিন্তু

আমার ভাগ্যবশত সেই লেখা বিশেষ কারও চোখে পড়েনি। রামকৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন বাংলাভাষায় আমার সেই ভাবনা সংক্ষেপে লিখে ফেলতে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যদিও জানিনা, মাতৃভাষায় ইতিহাসচর্চায় যাঁরা উৎসাহী রামকৃষ্ণর এই মন্ত্রণায় তাঁরা শেষ পর্যন্ত কতটা উপকার পাবেন।

অনেকদিন আগে, বোধহয় ইতিহাস-সংসদেরও জন্মের আগে, "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় ধারাবাহিক একটা বাংলা নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। নাম দিয়েছিলেন "বয়কট, বামা ও ভদ্রলোক"। তাতে আমার অনুসন্ধানের পর্যায় ছিল অগ্নিযুগের সামাজিক ও আর্থিক পটভূমি। ঐ লেখার শিরোনামে একটা চমক ছিল, হয়তো সেজন্যই অনেকে আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। শুনেছি, অন্বিষ্ট বিষয়ের নতুনত্বও অনেকের কৌতূহল জাগিয়েছিল ঃ ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের দুর্গতি যে কীভাবে চরমপন্থী রাজনীতির দিকে তাঁদের ঠেলে দিচ্ছিল তা নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা এর আগে হয়তো হয়নি। কিন্তু অনেকে আবার লজ্জিত, আহত ও বিরক্ত হয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের আর্থিক ব্যাখ্যায়। "অগ্নিযুগ" নিয়ে বাঙালির ভাবালু উচ্ছ্বাস হয়তো ধাক্কা খেয়েছিল আমার কথায়। তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে আন্দোলনের মহত্ত্ব আর্থিক বিশ্লেষণে ক্ষুণ্ণ হয় না। বৃহত্তর তাৎপর্যময় ফরাসি বিপ্লবেরও তো আর্থনীতিক ব্যাখ্যা আছে।

তবে আর্থিক ব্যাখ্যাটাই একমাত্র নয়। কে যে কী কারণে একটা আন্দোলনে ভেসে পড়েন পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকের পক্ষে তা সনাক্ত করা শক্ত। এমন কি যাঁরা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন তাঁরাও স্পষ্ট করে সব সময় বলতে পারেন না কীসের ঝোঁকে তাঁরা প্রাণিত হয়েছিলেন। স্মৃতিকথার উপর আদ্যন্ত নির্ভর করা যায় না; তাছাড়া সবাই তো আর স্মৃতিকথা লিখেও যায় না। প্রায় একশ বছর আগে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বয়কট আর বোমার আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে পুলিশী মন্তব্যও নির্বোধ ছেলেমানুষির উদাহরণ ঃ অর্থাৎ এঁরা সব বাপে তাড়ানো মায়ে-খেদানো 'Semi-educated' "professional agitators" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর অরবিন্দ ঘোষ (তখনও তিনি 'শ্রী অরবিন্দ" নন), এই দুজন নাকি I.C.S. স্বর্গ হতে বিচ্যুত হওয়ার অভিমানে স্বদেশী নেতা হয়েছিলেন। অন্যদিকে অরবিন্দ কিংবা বিপিনচন্দ্র পাল মানতে নারাজ পুলিশী অপপ্রচার ঃ স্বদেশী আন্দোলন, তাঁদের বিবেচনায়, একেবারেই আদ্যন্ত আধ্যাত্মিক, পশ্চিমি বস্তুবাদের নিরিখে এর বিচার অচল। অর্থাৎ পুলিশ বলছে স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে রয়েছে বাস্তব হিসেব, materialist calculation; ওদিকে নেতারা বলছেন তাঁদের প্রেরণা একেবারেই spritual— তাঁদের পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা সন্ধানে নেমেছেন পশ্চিমি প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ভারতাত্মার।

কোন দিকে যাই? তার উপর আমাদের বিচারবুদ্ধি আরও গুলিয়ে দিয়েছেন মনীষী

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বংশধর কেম্ব্রিজের কোনও অতিচতুর ইতিহাসবিদ। তিনি বলছেনঃ " Extremism was less an ideolgy than a technique." অর্থাৎ moderate - extremist-এ মতবাদের কোনও ফারাক নেই, প্রভেদ শুধু লড়াইয়ের কৌশলে। যাঁদের আমরা extremist আর moderate হিসেবে জানি তাঁরা নাকি একই সামাজিক শ্রেণীর মানুষ, ফলে একই ধান্ধা তাঁদের ঃ রাজানুগ্রহে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ আর উচ্চতর কর্মসংস্থান; তবে সরকারি চাকরি অভাব বশত তাঁদের কেউ-কেউ রাজ-সহায়ক (collaborator) - এর ভূমিকা ছেড়ে রাজ-সমালোচক ("critics") হয়েছেন। শীলবংশীয় এই ঐতিহাসিক যা বলছেন তা অনেক আগেই বলে গেছেন স্যর লিউইস নেমিয়ের (Sir Lewis Namier) Whig আর Tory দলের প্রভেদ-প্রসঙ্গে। কিন্তু মুশকিল এই যে নেমিয়ের এর কথাটা খাটে ছোটখাট দরবারি রাজনীতির (court politics) প্রসঙ্গে, যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ রাজনীতির বিচারে। সেখানে ছোট-ছোট clique, coterie-র মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভে পারস্পরিক গাঁটছড়া সহজেই চোখে পড়ে কিন্তু পরাধীন ভারতের বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে, যেখানে অনুগ্রহদাতার সঙ্গে উচ্চাশী ভারতীয়ের কোনও সামাজিক সম্পর্কই নেই, সেখানে Namierite পদ্ধতি আমাদের পথনির্দেশ করতে পারে না।

আর তাছাড়া স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি extremist - moderate -এ বিবাদ একটা বেশ ভাল রকমই ছিল। আমরা দেখতে পাব এই দুই দল দু রকম ভাবে তাকাছেন ব্রিটিশ রাজের দিকে, এঁদের বিচারভঙ্গীও দু রকম। ফলে, যা শুরুতে ছিল নেহাৎ কর্মসংস্থানের কিংবা প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্খা, তাই কালক্রমে হয়ে দাঁড়াল moderate-দের কণ্ঠে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, এবং extremist- দের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের জন্য একটা পৃথক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক স্বরূপ আবিষ্কারের সাধনা। বিদেশী শাসন, কিংবা তার চেয়েও বড় কথা বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে এই সংঘর্ষে ঐহিক হিসেব আর পারত্রিক মতবাদ যেন পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমি যতদুর বুঝেছি তা যদি আমার মতন করে বলতে চাই তাহলে এই রকম দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য আন্দোলনের মতই আমাদের স্বদেশী-বিপ্লবী আন্দোলনে যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নানা ঝোঁক কাজ করে থাকতে পারে। তাঁদের কোনও একজনের বেলায় হয়তো বিষয়-বিপন্নতা কাজ করেছে; আর একজন অনুভূতিপ্রবণ বাঙালি কিশোরের ক্ষেত্রে হয়তো প্রবল হয়েছে সহপাঠী - আর্দশবাদী কোনও বন্ধুর প্রভাব। কেউ-কেউ ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা যেমন তাড়িত হয়েছেন, কেউ-বা তেমনই চালিত হয়েছেন বিশিষ্ট কোনও মতবাদের দ্বারা। বাস্তব বিপর্যয় তো ছিলই। আমরা ভুলে গেছি তার কথা। মনে আছে শুধু "বন্দে মাতরম্" slogan আর বোমা-বিস্ফোরণের শব্দ। "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত আমার সেই প্রবন্ধে উল্লেখ ছিল বন্যা, অন্নাভাব, এবং আকস্মিক ও

দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির। তাতে যেমন একটা এপার-গঙ্গা-ওপার- গঙ্গা মধ্যিখানে চর জাতীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তারই মধ্যে শিব-সদাগরের মতই আসীন ছিলেন ইংরেজি-শিক্ষিত অথচ আশাহত বেকার বাঙালি ঃ তাঁর চেতনায় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে পশ্চিমি রোম্যান্টিক (romantic) সাহিত্যের হাতছানি; কলেজ-পাড়ায় গোলদীঘিতে সুরেন্দ্রনাথের তপ্ত বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন ফরাসি বিপ্লব আর ইটালীয় অভ্যুত্থানের (risorgimento) মদিরা; তাঁর মর্মে লেগেছে মার্কিন-প্রত্যাগত সদ্য-প্রয়াত বিবেকানন্দের বৈদান্তিক অভয়বাণীর অভিঘাত "ওঠো, জাগো...."। কিন্তু কে জাগবে? রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করে এবং একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি অগ্নিযুগের বাঙালি যুবকের যৌবনস্বপ্নে ছেয়েছিল বিশ্বের আকাশ, কিন্তু অধিকার ছিল না সেই আকাশ - পরিক্রমায়।

এই রকম একটা বৈদ্যুতিক বাতাবরণের মধ্যেই বুঝি বিপ্লব জন্ম নেয়! এই অগ্নিযুগের যাঁরা হোতা কী চাইছিলেন তাঁরা? ঐতিহাসিকেরা তাঁদের গায়ে "Extremist" লেবেল (label) সেঁটে দিয়েছেন, এবং তাঁদের ভাবখানা এই রকম যেন সমস্ত extremist একই শিবিরের অন্তর্গত, যেন উদ্দেশ্য ও প্রকরণে তাঁরা দুর্ভেদ্যভাবে যূথবদ্ধ। অর্থাৎ একদিকে দেখছি moderate নেতারা ব্রিটিশরাজের দৈব উপস্থিতি ("providential nature") মেনে নিয়ে আইনসঙ্গত উপায়ে, নামান্তরে "constitutional agitation" -এর মাধ্যমে, নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে আগ্রহী; ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছেন "চরমপন্থী" নেতারা, তাঁদের সকলেরই এক হাতে boycott অন্য হাতে বোমা।

আসলে কিন্তু moderate-বিরোধী শিবিরেও অনেক ভাগ, অনেক মতান্তর ছিল। প্রথমেই ধরুন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে স্মরণ করা হয় স্বদেশী আন্দোলনের চারণ-কবি রূপে; যেন তাঁর কাজ ছিল শুধু দেশাত্মবোধক গান আর কবিতা -রচনা। আমরা ভুলে যাই যে, শ্বেতাঙ্গ শাসকের উপর নির্বোধ নির্ভরের ভঙ্গী ত্যাগ করে তিনিই প্রথম শেখালেন "আত্মশক্তির" সাধনা। ছেলেবেলায় তিনি সঞ্জীবনী সভার সভ্যরূপে বিপ্লব-বিপ্লব খেলা করেছেন; যৌবনে সে খেলায় ভঙ্গ দিলেও আর যাই হোক moderate সাহেব-ভক্ত সাজেন নি। কুড়ি বছর বয়সে কবিতা লিখেছেন তিনি "আবেদন আর নিবেদন"- এর ভিক্ষাপাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে; তারও বারো বছর পরে রচনা করলেন "ইংরাজ ও ভারতবাসী" প্রবন্ধ — "আত্মশক্তি"র সেই প্রথম আবাহন। আমরা যেন শাসকের কাছে সমাদর আর সম্মান ভিক্ষা না করি, বরং সরকারকে সাত হাত দূরে রেখে নিজেদের কর্তব্য পালন করে সম্মান ও সমাদরের যোগ্য হতে পারি এই ছিল তাঁর স্পর্ধিত বক্তব্য। সরকারকে দূরে রাখার এই নীতি রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করলেন ১৯০৪ সালে "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে। ইংরেজের কাছে নিজেদের নাবালকত্ব বিসর্জন দিয়ে সনাতন গ্রামীণ সমাজের চর্চা করতে পরামর্শ দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে।

কবির এই পরামর্শে বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ স্বাগত জানালেও "আত্মশক্তি"কে

তাঁরা যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে শাণিত করতে চাইলেন ঃ সরকারকে শুধু দূরে রাখাই নয়, সরকারকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হোক। বিপিন পাল তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে এবং অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত The Doctrine of Passive Resistance (১৯০৭) নিবন্ধে ব্যাখ্যা করলেন কী কী উপায়ে এই অসহযোগ করা যেতে পারে ঃ অর্থনৈতিক শোষণ রুখতে বিলিতি বর্জন (boycott) করে স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহার, বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সরে এসে স্বদেশী বিদ্যালয় পত্তন, বিদেশী বিচারব্যবস্থার আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের গ্রাম পঞ্চায়তের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং সরকারি লাল-পাগড়িকে এড়িয়ে স্বদেশী সমিতির সাহায্যগ্রহণ। আইনভঙ্গ না করেই এই কাজগুলি করা যায়, এই ধরণের অসহযোগে সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু আইন অমান্য করে সম্মুখ-সমরে নেমে পড়ার একটা আয়োজনও চলছিল সংগোপনে। তাই ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে নাম পাই বিপিনচন্দ্রের। এবং খুব শীঘ্রই তিনি মা কালীর পুজোয় শ্বেত ছাগশিশু বলিদানের বিধান দিলেন মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়। অন্যদিকে, কলকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্যদের শুধুই ডন-বৈঠক করে যে সব যুবক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের "ছোট কর্তা" হয়ে দাঁড়ালেন বারীন ঘোষ, অগ্রজ অরবিন্দ "বড় কর্তা" (এই সাঙ্কেতিক পরিচয় রয়ে গেছে পুলিশ-ফাইলে)। তাঁদের প্রচারপত্র "যুগান্তর", যে-কারণে "যুগান্তর"-দল হিসেবে তাঁদের খ্যাতি।

"যুগান্তর" নামের মধ্যেই ছিল আসন্ন পরিবর্তনের অশনি-সংকেত। কিন্তু পরিবর্তন যে এত ও আকস্মিক হবে সেটা বারীন্দ্র কিংবা অরবিন্দ কারও জানা ছিল না। বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তি যদি অসত্য না হয় তাহলে বলতে হবে তাঁর দলবলের পরিকল্পনায় রক্তাক্ত বিপ্লব ছিল তখনও সুদূর পরাহত ("always thinking of a far off revolution") এখন চলছিল শুধুই তার প্রস্তুতি, অর্থ আর অস্ত্র সংগ্রহ, "মুক্তি কোন পথে" কিংবা "বর্তমান রণনীতি" জাতীয় পুস্তিকা আর "যুগান্তর" পত্রিকার গরম-গরম লেখার সাহায্যে, কিংবা যাত্রা-কথকতার প্রচারমাধ্যমে বিপ্লবের অনুকূলে জনমত তৈরি করা, সারা দেশ ঘুরে নিঃস্বার্থ দেশসেবক সংগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠী ধরণে "সন্তান"দল গড়ে তোলা, যে দল স্বাধীনতার জন্য অকাতরে ও নিঃশেষে প্রাণদান করবে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল জনগণ তখনও সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত নয়। অথচ যাঁরা অর্থসাহায্য করছেন সেই সব ধনী জমিদার ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকেরা সমিতির যুবকদের কাছ থেকে কাজের প্রমাণ চান। যুবকেরাও অস্থির বাঙালির ভীরু কাপুরুষ পরিচয়ের কালিমা ঘোচাতে। সেই অস্থিরতার যাঁরা বলি হলেন, পুলিশের হাত থেকে তাঁদের ছাড়িয়ে আনতে গেলেও টাকার দরকার। অতএব টাকার জন্য ডাকাতি। সেই ডাকাতির মামলা ঠেকাতে ফের ডাকাতি। কোথায় গেল খোলাখুলি আমূল বিপ্লবের পরিকল্পনা? তার জায়গা নিল সন্ত্রাস - ডাকাতি - সন্ত্রাসের গোপন বিষচক্র।

পথভ্রষ্ট সেই সব আদর্শবাদী যুবকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পথের মিল ছিল না ঠিকই, কিন্তু এঁদের তিনি ত্যাগ করেননি, এঁদের জন্য তাঁর শ্রদ্ধা ছিল ষোল-আনা এবং এঁদের কথাই তিনি স্মরণ করেছেন "চার অধ্যায়" (১৯৩৪) কাহিনীতে এলার স্নেহাসক্ত কণ্ঠেঃ "যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড় করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই... এই কথা মনে করে বুক ভরে ওঠে আমার।"

দেখলাম অগ্নিযুগের নেতারা কেউই রাজভক্ত moderate নন, কিন্তু তা বলে তাঁদের সবাইকে একাকার করে মার্কা মেরে দেওয়াটা ঠিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ এঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (কে না জানে "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" কবিতা?) কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধাসত্ত্বেও এঁরা পৃথক। যাঁরা তাঁর "ঘরে বাইরে" (১৯১৫-১৬) পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন একদা moderate নেতাদের ভিক্ষাবৃত্তি যেমন রবীন্দ্রনাথের চোখে অশুচি লেগেছিল, তেমনি বিলিতি-বর্জন নিয়ে গরিব মানুষের উপর extremist জবরদস্তিও তাঁর কাছে রুচিকর হয়নি। দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে যুক্তিহীন উন্মাদনা তাঁর কাছে মাতলামির নামান্তর। তাঁর 'ব্যাধি ও প্রতিকার" কিংবা "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারি তিনি আত্মশক্তির স্থির সাধক। বিদেশী শাসনের ফলেই ভারত দুর্বল একথা তিনি পুরো মানতে রাজি নন, তাঁর বিবেচনায় ভারতবর্ষের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সামাজিক দুর্বলতাই বিদেশী শাসনকে কায়েম করেছে। এবং যত বিলম্বই হোক, ধৈর্য ধরে স্বদেশী সমাজের চাষ করলে রাষ্ট্রনৈতিক লড়াই সেখানে সুফলা হতে পারে। পথিকের তাড়া থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্য পথ তো ছোট হতে পারে না এটাই রবীন্দ্রনাথের সাফ কথা। কিন্তু, অন্যদিকে, বিপিনচন্দ্র কিংবা অরবিন্দ এবং "যুগান্তর"-দলের ভয়ঙ্কর দামাল শিশুরা (les enfants terribles) একটু অধীর, কেননা তাঁদের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের মতন সুস্থ সমাজগঠন নয়, তাঁদের লক্ষ্য অবিলম্বে বিদেশী-বিতাড়ন। রবীন্দ্রনাথ চাপ দিচ্ছেন সামাজিক প্রশ্নে উপর। অন্যেরা জোর দিচ্ছেন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের, সমস্যা - সমাধানের দিকে একজনের গতি গঠনমূলক, অন্যদের ধ্বংসাত্মক।

পথ ও প্রকরণ নিয়ে যেমন বিতর্ক ছিল, মতভেদ ছিল তেমনই পথের শেষে গন্তব্যের ঠিকানা নিয়ে। ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে সভাপতি দাদাভাই নওরোজি গন্তব্য হিসেবে ঘোষণা করলেন "স্বরাজ" শব্দটি। Moderate কংগ্রেসিরা এই শব্দের অর্থ করলেন "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন," ইংরেজিতে "colonial self-government"। সে যুগে তার মানে ছিল ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রচ্ছায়ে আভ্যন্তীরণ ব্যাপারে কিছু স্বাধীনতা—যেমন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ছিল আর কি। প্রসঙ্গত বলি, আজকাল ঐতিহাসিকেরা

সাম্রাজ্য আর উপনিবেশের তফাৎটা গুলিয়ে ফেলেছেন ঃ তাঁদের মুখে empire ও colony এবং imperial আর colonial একই অর্থে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। কিন্তু সে-আমলের নেতারা এখনকার নেতাদের চেয়ে তো বটেই, এমনকি আধুনিক ঐতিহাসিকদের চেয়ে শিক্ষিত ছিলেন। রামমোহনের আমল থেকেই তাঁরা জানতেন ভারত, আর যাই হোক, British colony বা উপনিবেশ নয় বরং ভারত একেবারেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। ভারতে যা চালু ছিল তা British imperialism; colonialism নয়। তাঁরা আরও জানতেন যে সাম্রাজ্যবাদী (imperialist) শাসনের চেয়ে ঔপনিবেশিক (colonialist) শাসন ভাল (রামমোহন তাই British colony চেয়েছিলেন ভারতে) এবং সবচেয়ে কাম্য অবশ্যই স্বাধীনতা।

বিপিন পাল তাই স্পষ্ট জানালেন ভারতবাসী যা চায় তা সত্যকার স্বরাজ, "absolutely free of the British control"; ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব আর স্বায়ত্তশাসন পরস্পরবিরোধী অভিধা। "হ্যাঁ, স্বরাজ" — বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে গলা মেলালেন অরবিন্দ, এবং তর্ক জুড়লেন যে, ব্রিটিশ শাসনের যা কিছু ত্রুটি, moderate-রা তাকে "Un-British" বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন, ভারতবাসীর দারিদ্র্য নাকি "Un-British rule" এর ফল। অন্ধ রাজভক্ত নেতারা বুঝতে চাইছেন না যে, ব্রিটিশ বাণিজ্যিক শোষণের ফলেই ভারতবাসীর দারিদ্র্য; pax Britannica বা ব্রিটিশ শান্তি শৃঙ্খলার পরিণাম ভারতীয়ের ক্লীবত্ব; এবং ইংরেজি শিক্ষা কিংবা বিলিতি বুলির মোহে তাদের বিজাতীয়করণ (denationalisation)। সমস্ত নষ্টের গোড়া এই বিদেশী শাসন, আমলা আর বানিয়ার সংমিশ্রনে যা হয় তাই। সুতরাং — অরবিন্দ জানালেন — বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অর্থহীন, ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগুক — এ তো খুব সামান্য ভিক্ষা, দূর হোক ব্রিটিশ, চাই স্বরাজ।

কিন্তু স্বরাজ-স্বরাজ করলেই তো হবে না, ঐ স্বরাজের রাষ্ট্রনৈতিক চেহারাটা কেমন হবে? দেখা গেল অগ্নিযুগের নেতারা তার উত্তর জানেন না। স্বপ্নদ্রষ্টা অরবিন্দ বললেন, কী হবে ভবিষ্যতের নক্‌শা এঁকে, "Revolutions are full of surprises"। বিপিন পাল বললেন, মার্কিন কায়দায় একটা প্রজাতন্ত্রী United States of India তৈরি করতে হবে, তার নির্মাতা হবেন আফগানিস্থানের আমির, তাঁকে এনে সাময়িক dictator করে ভারতের সিংহাসনে বসাতে হবে, তাহলে নাকি দেশীয় রাজাদের আপত্তি থাকবে না, মুসলমান প্রজারাও খুশি হবেন। এই ব্যবস্থায় হিন্দুপদ পাদশাহীতে বিশ্বাসী মারাঠা নেতারা কতটা খুশি হবেন তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ ছিল। অন্যদিকে, "যুগান্তর" দলের হেমচন্দ্র কানুনগোর স্মৃতিকথায় দেখছি, বিপ্লবী যুবকদের একটা আবছা-বালসরল-অবাস্তব রকমের বিশ্বাস ছিল যে একবার বিদেশী দৈত্যেরা নিধন হলেই সারা দেশে রামরাজ্য নেমে আসবে, সবাই সুখে নিদ্রা যাবে, — রূপকথায় যেমন হয় আর কি!

স্বাধীনতার পর ভারত-রাষ্ট্রের রূপরেখা নিয়ে extremist ধারণা যে স্পষ্ট ছিল না, তার কারণ আর কিছুই নয় ঃ extremist ছিল একটা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, moderate-দের মতন একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিয়ে moderate দল ব্যস্ত, extremist চিন্তা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিয়ে। Union Jack নিয়ে চরমপন্থীদের আপত্তি মূলত এই যে, ওটা বিদেশী সংস্কৃতির জয়পতাকা, যার কাছে নির্লজ্জ নরমপন্থীরা স্বেচ্ছায় মাথা মুড়িয়েছেন। চরমপন্থীদের ইংরেজ-বিদ্বেষ যেন নরমপন্থীদের বিলিতিয়ানার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। Moderate রা তাকিয়ে আছেন পশ্চিমের ইতিহাস-অনুসারী ভবিষ্যৎ ভারতের দিকে, Extremist রা আবিষ্কার করতে চলেছেন সনাতন-শাশ্বত ভারতবর্ষ।

স্বভাবতই চরমপন্থী চোখে সনাতন দেখা দিল মোহময় রূপে। আর এই romanticism -এর পালে চলতি বাংলা বুলির হাওয়া লাগিয়ে দিলেন "সন্ধ্যা" পত্রিকার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ফলে, বেশ একটু আঁতে ঘা লাগলো সভ্যতা অভিমানী শ্বেতাঙ্গ প্রভুর। যিনি কিপলিং-ঘোষিত White Man's burden বহন করার অজুহাতে কৃষ্ণাঙ্গ native-দের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পাকা করে তুলছিলেন। হাতজোড়-করা নরমপন্থীদের শুনিয়ে ব্রহ্মবান্ধব বললেন, আমরা আর্যদের বংশধর, ওরা আমাদের native বলে তো আমরাও ওদের 'ফিরিঙ্গী" নামে ডাকব, এবং মুষ্টিমেয় ইংরেজি-শিক্ষিতের বদলে যদি জনসাধারণকে দলে পেতে হয় তাহলে কংগ্রেসি মঞ্চে এখন থেকে আর ফিরিঙ্গী ভাষায় বক্তৃতা নয়। আবাল্য ইংরেজি-শিক্ষিত অরবিন্দ লিখলেন ঃ আর নয় ইওরোপের অনুকরণ, ভারতকে ভারত হতে হবে, "The return to ourselves is the cardinal feature of the national movement" এখন থেকে "extremist" আখ্যায় তাঁদের মন ভরলো না, তাঁরা জানালেন তাঁরাই সত্যকার nationalist party অন্যেরা জাতিভ্রষ্ট (denationalised, déraciné)।

এই যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, বাংলায় অগ্নিযুগের মতোই এটা দেখা গেছে পৃথিবীর নানা জায়গায়, যখনই শক্তিশালী আক্রমণকারীর কাছে একটা উৎকৃষ্ট অথচ সামরিক দিক থেকে দুর্বল সংস্কৃতি মার খেয়েছে এবং এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের অভিমানে প্রায় সর্বত্রই রসদ জুগিয়েছে প্রধানত ধর্ম। ভারতের ক্ষেত্রে এই রসদ পাওয়া গেল হিন্দুত্বে; Hindu revivalism-এ বিশেষত বাঙালি হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানে। বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের কথা বলছি। কেননা তাঁরাই প্রধানত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকেছিলেন সেই Young Bengal এর আমল থেকে। পশ্চিমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সেজন্য তাঁদের অন্তরেই স্বাভাবিক। মুসলমানেরা তো পশ্চিমের মদিরায় মত্ত হন নি।

সুতরাং পরাধীন আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদে মুসলমানেরা যে শরিক হতে নারাজ হলেন তার জন্য অগ্নিযুগের হিন্দু বিপ্লবীকে দোষী

করাটা ফ্যাশন হলেও অনুচিত হবে। বস্তুত, হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের পূর্ব থেকেই, বা ১৮৫৭-র ব্যর্থতার পর থেকেই, মুসলমান নেতারা ব্রিটিশ-বিরোধিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছিলেন। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পাছে যোগ দিয়ে নিজেদের আখের গোছানর কাজ নষ্ট করেন, সেই কথা ভেবে বছর কুড়ি আগেই, ১৮৮০-র দশকে, আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর সম-সাম্প্রদায়িক প্রজাবৃন্দকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

সব মিলিয়ে অগ্নিযুগের জাতীয়তাবাদ হয়ে দাঁড়াল প্রধানত হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তার ধাক্কায় স্বাধীনতা আন্দোলনে কতগুলি নতুন ও দেশী প্রকরণ দেখা দিল। যেমন বঙ্গভঙ্গ ঠেকাতে কালীপুজো, অনশন, গঙ্গাস্নান, রাখিবন্ধন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দুটি নাটকে হিন্দু রাজা প্রতাপাদিত্য আর মুসলমান নবাব সিরাজ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদীর মনোহরণ করলেন, তাতে ইতিহাসের সত্য কতটা রক্ষা হলো সন্দেহ আছে, কিন্তু দেশপ্রেমের আগুনে তো বাতাস লাগলো।

স্বাধীনতার যুদ্ধ দেখা দিল ধর্মযুদ্ধর সাজে। অরবিন্দ লিখলেন ঃ "Nationalism is not a mere political programme; Nationalism is a religion" "স্বাধীনতা" কিংবা "জাতীয়তাবাদ" ইত্যাদি শব্দ সাধারণ ভারতীয়ের কাছে তখনও প্রায় অচেনা। তাদের ভুলোতে তাই কাজে লাগানো হলো তাদের চিরচেনা ধর্মশাস্ত্রের প্রতীকী শব্দ। দেশপ্রেমিকেরা হঠাৎ "যোগী" হয়ে দেখা দিলেন, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মতো তাদের অন্বিষ্ট হলো 'মোক্ষ' অর্থাৎ স্বাধীনতা। মানিকতলায় বাগানবাড়ি যেন একটা "আশ্রম", নতুন আনন্দমঠ। শাক্ত কালীসাধকের মতো তাঁরা ধরে নিলেন স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি কিংবা নরহত্যা কিছুই নয়, সবই "মায়ের লীলা", বিপ্লবীরা "কর্মযোগী", তাঁদের উপর ভর করেছেন স্বয়ং কালী। অরবিন্দর ভাষায় "Kali has entered into them"। এ সত্ত্বেও যুদ্ধে নামতে ইতস্তত করছিলেন যেসব বোতাম-আঁটা নিরীহ ভদ্রলোক, তাঁদের বলা হলো কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের মতোই তাঁরা "মায়া"-গ্রস্ত, যাদের বধ করতে হবে তারা যে আগে থাকতেই শারীরিক অর্থে মৃত সেকথা তাঁদের অজ্ঞাত। তাঁরা সান্ত্বনা পেলেন গীতায় বিধৃত শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে যে, আত্মা অবিনশ্বর, ফলত কেউই মৃত নয়, কেউই নয় পাপস্পৃষ্ট ঘাতক। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা বাংলার নতুন কুরুক্ষেত্রে নব্য ক্ষত্রিয়, অরবিন্দর কাছে তাঁরা আশ্বাস পেয়েছেন জাতীয়তাবাদের হতাশার কারণ নেই ঃ "Nationalism is an *avatar* and cannot be slain." মাত্র কয়েক বছর আগেই, উনিশ শতকের শেষ দিকে, তাঁরা শুনেছেন বিবেকানন্দর রোমাঞ্চকর বাণী অভী, ভয় নেই। এখন পেলেন তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার ভরসা। নিবেদিতা, যিনি তাৎপর্যময়ী ব্রিটিশ-বিরোধী আইরিশ নারী এবং কলকাতা অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেত্রী, তিনি ডাক দিয়েছেন বিশ্ববিজয়ের ঃ "On, on, in the name of a new spirituality, to command the treasures

of the modern world ! On, on, soldiers of the Indian Motherland" "Hinduism is become aggressive."

আর রবীন্দ্রনাথ? বিংশ শতাব্দীর সেই নব্য কুরুক্ষেত্রে তিনি দাঁড়িয়ে যাছেন একা, যেন সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির। তিনিও একদা মোহান্ধ হয়েছিলেন প্রথম পান্ডবের মতোই, হিন্দু revivalism-এর প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপরেও। ১৮৯৩ থেকে এক দশক ধরে তিনিও শিখ-রাজপুত-মারাঠা বীরত্বের কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের, কিন্তু এখন তিনি মোহমুক্ত। হিন্দু ঐতিহ্যের রোমাঞ্চ খসে পড়েছে যেন তাঁর চোখের সামনে। ভারত-সমাজ তার সত্য তার মিথ্যা নিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই কবির সামনে, যাঁর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা নেব শুধু দেশপ্রেমের নয়, বিশ্বপ্রেমের। শুধু দেশ স্বাধীন করার প্রেরণা নয়, তিনি দেবেন এমন দেশ গড়ার ব্রত "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য," যেখানে পূর্ব আর পশ্চিম এসে মিলবে সেই ভারতের "মহামানবের সাগরতীরে"। তিনি লিখছেন "গোরা" (১৯০৭-১০), যেন নতুন ভারতের মহাভারত।

বেলাকুলের বৃত্তান্ত

রণবীর চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত তাঁদের সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলনের প্রাচীন ভারত শাখায় সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে যে বিরল সম্মান দিয়েছেন, তাতে অভিভূত এবং গৌরবান্বিত বোধ করছি। গত দুই দশক ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে বাংলা ভাষায় সুষ্ঠ, তথ্যনিষ্ঠ, বিজ্ঞানসম্মত ও সুস্থ ইতিহাসচর্চার একটি বিশিষ্ট ধারাকে সযত্নে লালন পালন করেছেন, তা ইতিহাস অনুরাগী মানুষকে অতীতচর্চায় আগ্রহী ও উৎসাহী করে তুলেছে। প্রাচীন ভারত বিষয়ে গবেষণা ও পঠনপাঠনও ইতিহাস সংসদের কার্যাবলীতে তার স্বকীয়তা ও মর্যাদা লাভ করেছে। পূর্বে অনুষ্ঠিত ইতিহাস সংসদের বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত ও প্রকাশিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাবলীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে, এই ইতিহাস নিছক রাজবংশের খতিয়ান ও বিখ্যাত রাজাদের কীর্তিকাহিনী রচনার মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। গত পাঁচ দশক ধরে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক ঐতিহাসিকদের অনলস গবেষণায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। একথা অনস্বীকার্য যে কয়েক হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও কৃষিব্যবস্থা এবং কৃষিপ্রধান গ্রামসমাজের জীবনযাত্রার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিশাল ভূখণ্ডে কৃষিপ্রধান জীবনযাত্রার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের গুরুত্ব মেনে নিয়েও আর একটি বিষয়ের প্রতি বোধ হয় মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তা হল, এই ভূখণ্ডের তিনটি দিকই জলবেষ্টিত - যে কারণে ভূগোলের দৃষ্টিতে উপমহাদেশটি একটি উপদ্বীপও বটে। শ্রীলঙ্কা সহ উপদ্বীপটির অবস্থান ভারত মহাসাগরের প্রায় কেন্দ্রে। এই ভৌগোলিক ঘটনাটি সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় ইতিহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। ইতিহাসের আলোকে ভারত মহাসাগরের সঙ্গে ভারতীয় ভূখণ্ডের সম্পর্ক বোঝার তাগিদেই সমুদ্র ইতিহাস চর্চায় ভারতের ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমান আলোচনার মূল বিষয় ভারত মহাসাগরের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ভারতের সমুদ্র-ইতিহাস। ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই তিন শতকে ভারত মহাসাগরের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল তার ইতিহাস বহু ঐতিহাসিকের অবদানে এখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ[১]। সেই তুলনায় পোর্তুগিজদের ভারত মহাসাগরে আসার আগে—

অর্থাৎ প্রাক ১৫০০ খ্রি. পর্বে - এই সমুদ্রে ভারতের ভূমিকা কী, সে বিষয়টি স্বল্পজ্ঞাত। তবে গত দুই দশক ধরে এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়ছে। এর ফলে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের আগে ভারতের সমুদ্র বাণিজ্যের বহু নূতন তথ্য জানা গিয়েছে, বহু নূতন চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রও দেখা দিয়েছে। প্রাক-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্বে ভারতের সমুদ্র বাণিজ্যের আলোচনায় প্রধান ঝোঁক পড়েছে বিনিময় যোগ্য (অর্থাৎ আমদানি রফতানির উপযুক্ত) পণ্যসামগ্রী, জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলযানের নির্মাণ কৌশল এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর[২]। দূরপাল্লার সমুদ্রবাণিজ্য বিষয়ে ঐতিহাসিকদের ক্রমবর্ধমান মনোযোগও আমাদের নজর এড়ায় না।

সমুদ্র ইতিহাস ও সমুদ্র বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উঠলে অবধারিতভাবে আসবে বন্দরের কথা। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বন্দরগুলি 'বেলাকুল' বলে অভিহিত।[৩] এই শব্দটি আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, তুলনায় সমার্থক শব্দ পত্তনম্, পট্টিনম্ এবং পট্টনম্ বেশি ব্যবহৃত। দেবতার আলয় বা মন্দির বোঝাতে যেমন দেবকুল শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, তেমনই বেলাভূমিতে জলযানের আলয় হিসেবে চিহ্নিত হয় বেলাকুল। প্রাচীন ভারতের বেলাকুলগুলি নিয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনাই এই নিবন্ধের উপজীব্য। ভারতীয় উপমহাদেশের যে দুই সুদীর্ঘ তটরেখা, সেখানে বেলাকুলগুলি সংখ্যায় নেহাৎ নগণ্য নয়। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যের কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা বেলাকুলগুলির প্রতি অবশ্যই আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনা প্রাচীন বন্দরগুলির অবস্থান নির্দ্ধারণ, শনাক্তকরণ এবং তালিকাভিত্তিক বিবরণের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ।[৪] বন্দরগুলিরও নিজস্ব ইতিহাস আছে; সেই ইতিহাস পরিবর্তনবিহীন, অনড়, অটল নয়; বন্দরগুলির ওঠাপড়া সমৃদ্ধি-বিলয় এই ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বিষয়টি এখনও পর্যন্ত কম আলোচিত। কেন অনেকগুলি বন্দরের মধ্যে মাত্র কয়েকটি হয়ে ওঠে অগ্রগণ্য, কেন সব বেলাকুল সমান গুরুত্বপূর্ণ হয় না — এই জাতীয় প্রশ্নগুলিব প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ জরুরি। এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় অবস্থিত এবং বহুবৈচিত্র্যে চিহ্নিত বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সুদীর্ঘ কাল ধরে অসামান্য যোগসূত্র রচনা করেছে ভারতমহাসাগর। বহু ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও গোষ্ঠীর দ্বারা চিহ্নিত মানুষেরা যখন ভারতমহাসাগরের বিশাল জলরাশিতে পাড়ি দিতেন, তখন এই বিবিধ মানবগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান মিলনক্ষেত্র ছিল বেলাকুলগুলি। ভারতের সমুদ্রবাণিজ্য চর্চা করার জন্য বন্দরের ইতিহাস অবশ্যই অপরিহার্য, এছাড়া ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির চরিত্র অনুধাবন করার জন্যও বেলাকুলগুলি আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে।

।। ২ ।।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে ও সময়ে প্রাচীন ভারতের সব বন্দরের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয; এই নিবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। কিন্তু প্রাচীন বন্দরগুলির

একটি সামগ্রিক খতিয়ান এখানে দেওয়া চলে। বন্দরের গুরুত্ব নগরাশ্রয়ী হরপ্পা-সভ্যতার আমল (খ্রি. পূ. ২৫০০-১৭৫০) থেকে প্রতিভাত, যার সাক্ষ্য বহন করছে গুজরাট উপকূলের বন্দর লোথাল। তুলনায় ক্ষুদ্রতর ও গৌণ হলেও মাকরাণ উপকূলের সুৎকাগেনডোর ও সোৎকাকোহ্ সম্ভবত হরপ্পা-সভ্যতার সমুদ্রবাণিজ্যে অংশ নিত।[৫] যুদ্ধের প্রায় সমকালীন উত্তরভারতে সমুদ্রবাণিজ্যের পক্ষে প্রশস্ত বেলাকুল তথ্যসূত্রে বিরল হলেও গঙ্গাতীরবর্তী অনেকগুলি নগর নদীবন্দর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বারাণসী, পাটলিপুত্র ও চম্পার মতো নগরের উত্থানে[৬]। গঙ্গাবাহিত নদীপথের বাণিজ্য গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার মধ্যে দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পৌছলে অবাক হবার কিছু নেই। কিছুটা পরবর্তী কালের সিংহলী বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশতে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে অশোকের নির্দেশে জলযান তামলিত্তি বা তাম্রলিপ্ত থেকে তাম্রপর্ণী বা শ্রীলঙ্কায় পাড়ি দিয়েছিল বোধিবৃক্ষের একাংশ সঙ্গে নিয়ে।[৭] মৌর্যআমলে যদি গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাম্রলিপ্ত বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে, একই ভাবে সমকালীন কোঙ্কন উপকূলে গুরুত্ব পেতে থাকে শূর্পারিক নামক বন্দরটি। বর্তমান মুম্বই এর উপকণ্ঠে থানা জেলার অন্তর্গত সোপারাতে অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই বন্দর বিষয়ে মৌর্য শাসকের আগ্রহ অনুমান করা কঠিন নয়।[৮] অবশ্য বেলাকুল হিসেবে সোপারা বা সুপ্পারক-এর সেরা দিনগুলি দেখা দেবে আরও কিছু পরে— আ. খ্রি. প্রথম শতক থেকে। ভারতের দুই তটরেখায় অবস্থিত বন্দর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে খ্রি. প্রথম তিন শতকে। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত সমুদ্রবাণিজ্যের সূত্রে গ্রিক ও লাতিন বিবরণে, লেখমালায়, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে ও বিবিধ-পুরাবস্তুর আলোকে কয়েকটি বেলাকুলের ভূমিকা বিশেষভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সিন্ধু নদের বদ্বীপ এলাকায় সবচেয়ে বিখ্যাত বন্দরটি বারবারিকাস নামে পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী-তে উল্লিখিত। তার কিছুটা দক্ষিণে নেমে গেলে পাওয়া যাবে কাথিয়াওয়াড়ের মঙ্গলপুর তথা মনোগ্লোসন অর্থাৎ আধুনিক মানগ্রোলকে। গুজরাট উপকূলে নর্মদানদীর মোহানায় অবস্থিত ভৃগুকচ্ছ বা বারুগাজা অর্থাৎ বর্তমান ব্রোচ-এর প্রশংসায় দেশী বিদেশী সব তথ্যসূত্রই পঞ্চমুখ। খ্রি. প্রথম শতকে কোঙ্কন উপকূলে সোপারা ছাড়া আরও কয়েকটি বন্দর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল: যেমন, কল্যাণ বা ক্যালিয়েনা, সিম্মুল্লা বা চৌল। পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণতম অংশ মালাবার বলে পরিচিত। মালাবারের গুরুত্ব বহুগুণে বাড়ল মুচিরিপত্তনম্ বা মুজিরিস বন্দরের উত্থানের কারণে। মালাবারের শ্রেষ্ঠ বেলাকুল মুজিরিসকে শনাক্ত করা হয়েছে কেরলের ক্র্যাঙ্গানোর-এর সঙ্গে।[৯]

বন্দর সংক্রান্ত আলোচনায় ঐতিহাসিকদের ঝোঁক মূলত রয়েছে পশ্চিম তটরেখার বেলাকূলগুলির উপর। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের দরুন এই বন্দরগুলি সম্বন্ধে তথ্যও পরিমাণে বেশি। কিন্তু পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা

অসম্ভব। আ. দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে টলেমি যখন তাঁর ভূগোলে ভারতের উপকূলবর্তী এলাকার কথা লেখেন, তখন পূর্ব উপকূলের অনেকগুলি বন্দর তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছিল। প্রথম শতকের শেষভাগে অজ্ঞাতনামা গ্রিক নাবিক প্রণীত পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী গ্রন্থে পূর্ব উপকূলের বন্দরের তালিকাটি তুলনায় ক্ষুদ্রতর। অতএব বোঝা যায় পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলির গুরুত্ব বাড়ছিল। পূর্ব উপকূলের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত বৈগাই নদীর বদ্বীপ থেকে উত্তরে গাঙ্গেয় বদ্বীপ পর্যন্ত যে একটি নিয়মিত এবং বহু ব্যবহৃত উপকূলাশ্রয়ী সমুদ্র বাণিজ্য চলত, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে রুলেটেড ওয়্যার নামক এক বিশেষ ধরণের মৃৎপাত্রের আবিষ্কারের ফলে।[১০] এছাড়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সমুদ্রপথে যাবার পক্ষেও পূর্বউপকূলই ছিল সবচেয়ে অনুকূল। বর্তমান তামিলনাড়ুর উপকূলে তাই দেখতে পাওয়া যাবে কোরকাই বা কোলচি, অলগনকুলম, কাবেরীপট্টিনম, পোড়ুকা বা আরিকামেড়ুর মত বন্দরগুলিকে। গ্রিক বিবরণী, তামিল সঙ্গম সাহিত্য, উৎখনন এবং অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত পুরাবস্তু তামিল এলাকার পট্টিনম গুলির ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।[১১] পূর্ব উপকূল ধরে আরও উত্তরে অন্ধ্রের তটীয় এলাকায় নজরে পড়ে আরও দুটি বন্দর কন্টকসাল এবং আলোসুগনে। দুটি বন্দরের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন টলেমি।[১২] আধুনিক মসুলিপত্তনম-এর নিকটস্থ একটি প্রাচীন বন্দর থেকে যে সুবর্ণদ্বীপ ও সুবর্ণভূমি (সম্ভবত দক্ষিণপূর্ব এশিয়া)-র উদ্দেশ্যে জাহাজ ছাড়ত, এই তথ্যের জন্য আমরা টলেমির কাছে ঋণী।[১৩] ওড়িষ্যায় চিল্কাহ্রদের কাছে মানিকপট্টনম-এর উৎখনন ইঙ্গিত দেয় এখানে খ্রি. দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে একটি বন্দর বোধহয় ছিল।[১৪] গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসেবে তাম্রলিপ্তের গুরুত্ব তর্কাতীত। এই বন্দর টলেমি ও প্লিনির রচনায় যথাক্রমে ট্যামালিটেস ও টালুরটে-বলে বর্ণিত হয়েছে। উপকূলের বাণিজ্যই হোক বা সরাসরি শ্রীলঙ্কা যাবার জন্যই হোক- যেমনটি পাড়ি দিয়েছিলেন পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন— তাম্রলিপ্ত বন্দর হিসেবে উভয়তই অনুকূল। সপ্তম শতকে দণ্ডী তাঁর দশকুমারচরিতে তাম্রলিপ্তকে স্পষ্টই বেলাকুল আখ্যা দিয়েছিলেন। [১৫] তাম্রলিপ্ত ছাড়াও গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার অন্যতম বন্দর ছিল গ্যাঙ্গে। পেরিপ্লাস ও টলেমির ভূগোলে অভিহিত গ্যাঙ্গে নামটি নিঃসন্দেহে গঙ্গা নাম থেকে তৈরি হয়েছিল। যদিও পুরোপরি নিশ্চিত প্রমাণ নেই, তবুও অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ গ্যাঙ্গে বন্দরকে শনাক্ত করেন উত্তর চব্বিশ পরগণার বিখ্যাত প্রত্নক্ষেত্র চন্দ্রকেতুগড়ের সঙ্গে।[১৬]

আগেই বলেছি বেলাকুলগুলির চরিত্র ও স্থায়িত্ব পরিবর্তনশীল। এবার সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পর্বে প্রধান প্রধান বন্দরের পরিচয় দেওয়া যাক। এই সময়ে সিন্ধুর বদ্বীপ এলাকায় পুরনো বারবারিকাম-এর জায়গা নিয়েছে দেবল। কাথিয়াওয়াড়েও উঠে আসছে নূতন কয়েকটি বেলাকুলঃ সোমনাথপট্টন, অলদিব বা আমাদের অতিপরিচিত দিউ এবং ঘোঘা। ভৃগুকচ্ছের গৌরব অস্তমিত বটে, কিন্তু দশম-

একাদশ শতক থেকে গুজরাটের সেরা বন্দরের শিরোপা উঠেছে স্তম্ভতীর্থ বা ক্যাম্বের মাথায়।[১৭] কোঙ্কন উপকূলের পুরনো বন্দর সোপারা এবং সৈমুর অর্থাৎ চৌল, আগের মতোই সক্রিয়। কিন্তু বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে শ্রীস্থানক বা থানা বন্দর, দ্বাদশ শতকের আগে অবশ্য এই বন্দরের খ্যাতি অত প্রকট নয়। কোঙ্কনের দক্ষিণাংশে আগে বিশেষ কোনও বড় বন্দরই ছিল না। আদি মধ্য কালে, বিশেষত দশম শতক থেকে, তটীয় ও দূরপাল্লার সমুদ্রবাণিজ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছিল চারটি নতুন বন্দর: বলিপত্তন (আধুনিক খারেপতন)। গোপাকপট্টনম, চন্দ্রপুর (এই দুটিই বর্তমান গোয়ার নিকট অবস্থিত) এবং অল্‌মঞ্জরুর বা আজকের ম্যাঙ্গালোর।[১৮] মালাবারের বেলাভূমি ধারাবাহিক ভাবে বন্দরের জন্য বিখ্যাত। তবে মুজিরিসের জায়গায় দেখা দিল দশম শতক থেকে কুলম মালি বা কুইলন, কোচিন এবং আরও পরে চর্তুদশ শতকের গোড়ায় কালিকট।[১৯]

অন্যদিকে তামিলনাড়ুর উপকূলে কাবেরীপট্টিনম কার্যত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তার বদলে আপনারা দেখবেন পল্লব আমলের কাঞ্চীপুরম ও চোলপর্বের নাগপট্টিনম বন্দরকে।[২০] অন্ধ্র উপকূলে আদি মধ্যযুগে একটি সম্পূর্ণ নূতন বন্দর দেখা দিল। বন্দরটির প্রাচীন ও আধুনিক নাম একই বিশাখাপট্টনম। অন্তত ১০৬৮ খ্রি. থেকে লেখমালার ভিত্তিতে এই বন্দরটির অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব। একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোনও এক সময়ে চোল সম্রাট কুলোত্তুঙ্গ (১০৭৩-১১২০ খ্রি.)-এর নামানুসারে বিশাখাপট্টনম-এর নূতন নাম দেওয়া হল কুলোত্তুঙ্গচোলপট্টনম্। কোনও চোলশাসকের নামানুসারে বিদ্যমান একটি বন্দরের নতুন নামকরণ একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। নিজের নাম বন্দরটির সঙ্গে যুক্ত করে চোল সম্রাট নিঃসন্দেহে বন্দরটির গুরুত্বকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বিশাখাপট্টনম বা কুলোত্তুঙ্গ চোলপট্টনম এর গুরুত্ব দ্বাদশ শতকের পর কতদিন অব্যাহত ছিল, তা বলা দুষ্কর। ত্রয়োদশ শতকে কাকতীয় আমলে মসুলিপত্তনমের কাছে আর একটি নূতন বন্দরের দেখা মিলবে, তার নাম মোটুপুল্লী।[২১] গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার সেরা বন্দর হিসেবে তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি অধোগামী হয়েছে আ. খ্রি. অষ্টম শতক থেকে। অন্তত তারপর থেকে এই বেলাকুল কার্যত নেপথ্যে চলে গেল। এর ফলে পূর্বভারতের সমুদ্রবাণিজ্যের উপর এর প্রতিকূল অভিঘাত ঘটেছিল — এমন খেদোক্তি আপনারা বহু ঐতিহাসিকের লেখনীতে দেখবেন।[২২] তাম্রলিপ্ত তার গুরুত্ব হারাল বটে, কিন্তু দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশে প্রাচীন হরিকেল অঞ্চলে, বর্তমান চট্টগ্রামের সন্নিহিত এলাকায় দেখা দিল আর একটি নতুন বেলাকুল। এই বেলাকুল আরব বিবরণে বারবার সমন্দর এবং সুদকাওয়ান বলে প্রসিদ্ধ।[২৩]

এতক্ষণ ধরে বেলাকুলগুলির যে ঝটিতি ও নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল, তাদের মধ্যে সব বেলাকুল সমগুরুত্বের নয়। ভারত মহাসাগরের সমুদ্রবাণিজ্যে যেমন নানা সময়ে দিকবদল ঘটেছে, বন্দরের ইতিহাসেও পরম্পরা ও পরিবর্তনের

টানাপোড়েনের দরুন তেমনই প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। গুজরাটি বেলাকুলের তালিকায় ভৃগুকচ্ছ এবং স্তম্ভতীর্থ (অর্থাৎ ক্যাম্বে) একেবারে শীর্ষস্থানে রয়েছে। আবার মালাবারের বন্দর গুলির মধ্যে মুজিরিস, কুইলন ও কালিকট প্রথম সারিতে থাকে। তামিল উপকূলে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল কাবেরীপট্টিনম ও নাগপট্টিনম। প্রাচীন বাংলার বন্দরের মধ্যে তাম্রলিপ্ত ও সমন্দরই অগ্রগণ্য। প্রশ্ন হল, এমন হয় কেন? কী কারণে বা কী কী উপাদানের সমাহারে কোনও কোনও বেলাকুল সমকালীন অন্যান্য বন্দরকে গুরুত্বে ও খ্যাতিতে ছাপিয়ে যায়? প্রাচীন ভারতের সমুদ্র ইতিহাসে তথা বন্দরের আলোচনায় এই বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা বেশি নেই। কিন্তু এই ব্যাখ্যা না দিলে বেলাকুলের কথা নিছক তালিকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে; কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের চরিত্রকে বোঝা যাবে না।

।। ৩ ।।

একথা অনস্বীকার্য যে উপকূলে বা নদী মোহানায় অবস্থিত বন্দরগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রায়ই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না তার অবস্থান, প্রকৃতি কোনও বন্দরের প্রতি যতই প্রসন্ন হোন না কেন, একটি বন্দরের গুরুত্ব কেবলমাত্র ঐ বন্দরটির চৌহদ্দিতেই নিহিত থাকে না। সমগ্র পশ্চিম উপকূলে বন্দর নির্মাণের সবচেয়ে অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখা যায় কোঙ্কনে। অথচ কোঙ্কনের বন্দর গুলি সবসময়েই গুজরাট ও মালাবারের বেলাকুলগুলির চেয়ে গুরুত্বে গৌণ। কোনও বন্দরের উত্থান ও গুরুত্ব বিচারের প্রশ্নটি তার পশ্চাদ্‌ভূমি এবং অগ্রভূমি (hinterland - foreland)-র সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বারুগাজা বা ব্রোচ কেবলমাত্র নর্মদার মোহানায় এবং গুজরাট উপকূলে অবস্থিত ছিল না, তার বাণিজ্যিক যোগসূত্র অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পেরিপ্লাস পড়লে জানা যায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার পণ্য পাঞ্জাব ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল হয়ে, মথুরাকে ছুঁয়ে, উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়ে পৌঁছত এই বন্দরে। সেখান থেকে পণ্যসামগ্রী রফতানি হত জলপথে পারস্য উপসাগরীয় এবং লোহিত সাগরীয় বন্দরগুলিতে। এছাড়াও দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠান ওটের থেকে কাপড় স্থলপথে বারুগাজাতে পাঠানো হত, তারপর বারুগাজা থেকে তা জলপথে বিদেশে যেত।[২৪] একাদশ শতক থেকে ক্যাম্বের চমকপ্রদ উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে ঐ বন্দরের সঙ্গে গুজরাট, রাজস্থান এবং মালবের স্থলপথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। ক্যাম্বের গুরুত্ববৃদ্ধির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হয়ে থাকে কয়েকটি সহায়ক বন্দর, যেমন সোমনাথপট্টন, অল দিব (দিউ), থানা এবং চৌল। দূরপাল্লার সমুদ্রবাণিজ্য পারস্য উপসাগরের হোরমুজ এবং লোহিতসাগরের এডেন-এর সঙ্গে ক্যাম্বের নিয়মিত সমৃদ্ধ ব্যবসায়ের কথা সুবিদিত। বুঝতে পারা যায়, কেন ষোড়শ শতকের গোড়ায় তোমে পিরেস বলবেন ক্যাম্বের দুই-বাহু প্রসারিত হয়ে আছে পূর্বে মালাক্কা এবং পশ্চিমে এডেন পর্যন্ত।[২৫]

তাম্রলিপ্ত যে খ্রি. পূ. ২০০ থেকে খ্রি. অষ্টম শতক পর্যন্ত গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার

সেরা বেলাকুল বলে প্রসিদ্ধি পেয়েছিল, তার অন্যতম কারণ স্থলবন্দী গাঙ্গেয় উপত্যকার সঙ্গে স্থলপথে ও নদীপথে তার নিয়মিত সংযোগ। একই সঙ্গে শ্রীলঙ্কা হয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সমুদ্রযাত্রার জন্যও তাম্রলিপ্তের উপযোগিতা আমাদের অজানা নয়। এইভাবেই তাম্রলিপ্ত থেকে ৪১৪ খ্রি. জলপথে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন।[২৬] তাম্রলিপ্তের সহায়ক বন্দর হিসেবে চন্দ্রকেতুগড়ের ভূমিকাও উল্লেখনীয়। চন্দ্রকেতুগড় যে একটি সক্রিয় ও সমৃদ্ধ নদীবন্দর, তার সংশয়াতীত সাক্ষ্য পাওয়া যাবে চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির অনেকগুলি নামমুদ্রা বা সীলমোহরে। ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী মিশ্রলিপিতে 'উৎকীর্ণ' এই নামমুদ্রাগুলি প্রধানত খ্রি. প্রথম থেকে চতুর্থ শতকে তৈরি হয়। এর অনেক গুলিতে নানা প্রকারের জলযানের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি সম্ভবত সমুদ্রগামী জাহাজ।[২৭] নবম-দশম শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সমন্দর বা সুদকাওয়ান বন্দরের অব্যাহত উন্নতির অন্যতম কারণ তার সুবিস্তৃত পশচাদভূমি। মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকা ও উত্তরভারতের সঙ্গে নদীপথে ও স্থলপথে এই বন্দর যুক্ত ছিল। বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে এই বন্দরের সঙ্গে যাতায়াত চলত শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও মালাক্কা প্রণালীর সঙ্গে। সমন্দরের সঙ্গে সম্ভবত নদীপথে যুক্ত ছিল আদি মধ্যকালীন বাংলার কয়েকটি অভ্যন্তরীণ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর নদীবন্দর, যেমন ঢাকার কাছে বঙ্গসাগর সম্ভান্তারিয়ক (বর্তমান সাভার) এবং ময়নামতীর নিকটবর্তী ক্ষীরোদানদীর তীরে দেবপর্বত।[২৮]

মালাবারের বন্দরগুলির তাৎপর্য কিছুটা ভিন্নধর্মী। খ্রি. প্রথম শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত মালাবারী বেলাকুলের প্রধান খ্যাতি ইওরোপে (পশ্চিম এশিয়া হয়ে) তার প্রসিদ্ধ গোলমরিচ রফতানির কারণে।[২৯] মৌসুমী বায়ুর উন্নততর প্রয়োগের ফলে পারস্য উপসাগর এবং লোহিত সাগরের বন্দর থেকে মালাবার উপকূলে জাহাজগুলির পৌঁছতে সময় লাগত কুড়ি দিন থেকে এক মাস।[৩০] এই প্রসঙ্গে মুজিরিস বন্দরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া যাক। দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যাপিরাসের উপর লিখিত একটি ঋণসংক্রান্ত চুক্তিপত্র পাওয়া গিয়েছে। এতে দেখা যায় মুজিরিস বন্দরে হার্মোপোলন নামে একটি বিদেশী জাহাজ এসেছিল। তাতে রফতানির জন্য তোলা হয় গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার একপ্রকার সুগন্ধী তেল-যা নার্ড বলে অভিহিত — সূক্ষ্মবস্ত্র, হাতির দাঁতের সামগ্রী এবং হস্তীদন্ত (শেষোক্ত দ্রব্য অবশ্যই কাঁচামাল হিসেবে বুঝতে হবে)। জাহাজে এই অত্যন্ত দামি পণ্যগুলি নিয়ে যাওয়া হবে লোহিত সাগরের একটি প্রধান বন্দরে (বন্দরটির নাম পড়া যাচ্ছে না, তবে তা সম্ভবত বেরেনিকে অথবা মিওস হরমোস)। ঐ বন্দর থেকে পণ্য সামগ্রী নামিয়ে তা তোলা হবে উটের পিঠে এবং নিয়ে যাওয়া হবে বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র কোপ্ট স-এ। কোপ্ট স থেকে পণ্যসামগ্রী নীল নদের নৌকায় বাহিত হয়ে পৌঁছবে প্রসিদ্ধ বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখানে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত তা আনীত

হবে রোমের বাজারে। মুজিরিস বন্দরের এত বিশাল অগ্রভূমি (ফোরল্যান্ড)-এর অবিসংবাদী প্রমাণ এই চুক্তিপত্রে প্রকট। অন্যদিকে রফতানির পণ্যগুলি কোনওটিই মালাবারের নিজস্ব নয়। নার্ড আসছে সুদূর গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকা থেকে, দন্তশিল্পের সামগ্রী ও হাতীর দাঁত কর্ণাটক থেকে আসতে পারে, তবে ওড়িষ্যা থেকে আসার সম্ভাবনাও বাতিল করা যায় না। এর থেকে মুজিরিস বন্দরের পশ্চাদভূমির বিস্তার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩১] দশম-একাদশ শতক থেকে আরবি ও ফারসি ঘোড়ার আমদানি শুরু হয় সমুদ্রপথে। এই বহুমূল্য যুদ্ধাশ্ব নিয়ে বিদেশী জলযানগুলি নিয়মিত আসত মালাবারের বন্দরগুলিতে। মার্কো পোলো, আবদুল্লা ওয়াসাফ এবং ইবন বতুতার বিবরণে ঘোড়ার সমুদ্রবাণিজ্য বিষয়ে বিশ্বস্ত তথ্য পাওয়া যাবে।[৩২] চর্তুদশ শতকের প্রথম ভাগে ইবন বতুতা দেখেছিলেন চীনা জাঙ্কগুলি তাদের যাত্রা সমাপ্তি ঘটায় কালিকট বন্দরে; আরও পশ্চিমে তারা আর পাড়ি দিত না।[৩৩] অন্যদিকে আরবি জাহাজগুলির কালিকটে যাতায়াত তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ফলে চীনা পণ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সামগ্রী বদলাবদলি করে নেবার জন্য কালিকট বিশেষ অনুকূল হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে বোঝা যায়, কেন ১৪০৪ থেকে ১৪৩৩ পর্যন্ত তিন দশকে চীনা মহানাবিক চেং হো তাঁর বিশাল বহর নিয়ে আট আটবার কালিকটে এসেছিলেন।[৩৪]

॥ ৪ ॥

বন্দরের ইতিবৃত্ত সমুদ্র-ইতিহাসের এক অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু সমুদ্র ইতিহাস নিছক সমুদ্রবাণিজ্যের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে না। এই আলোচনা নিছক সমুদ্রের জলরাশিকেই উপজীব্য করে না। সমুদ্রকে তার উপকূল ও অভ্যন্তরস্থ ভূভাগ থেকে বিশ্লিষ্ট করা অসম্ভব। অবশ্য অশীন দাশগুপ্ত আমাদের সচেতন করে দিয়েছিলেন, সমুদ্র বা মহাদেশ কারোরই ইতিহাস নেই। সমুদ্র-ইতিহাস গড়ে ওঠে সমুদ্রাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপে বিজড়িত বিবিধ মানবগোষ্ঠীর দ্বারা।[৩৫] সেই মানুষগুলি বেলাকূলের ইতিহাসেও প্রধান কুশীলব। বন্দরের সমাজজীবনে বণিকদের বিশেষ অবস্থান নিয়ে দ্বিমত নেই। যত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, ততই সেখানে দেশী-বিদেশী বণিকদের কর্মতৎপরতা। অষ্টম শতকে উদ্যোতনসুরি তাঁর কুবলয়মালাগ্রন্থে শূর্পারিক বন্দরে আগত বহু বণিকের একটি 'মেলি' বা আড্ডার প্রাণবন্ত আলেখ্য উপহার দিয়েছিলেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বণিকরা তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করছেন। এটি প্রায় ব্যবসায়িক তথ্য চালাচালির সমতুল্য ঘটনা, যা না থাকলে বন্দরে বাণিজ্য প্রায় অচল হবার আশঙ্কা রয়ে যায়। ঐ একই গ্রন্থে আরও এক বণিকপুত্রের কাহিনী আছে। সম্পন্ন সার্থবাহের পুত্র সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি শূর্পারক বন্দর থেকে জাহাজ সাজিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করবেন। সার্থবাহ পিতা মূলত ডাঙার মানুষ। চেনা এলাকা ছেড়ে অকূল সাগরে পুত্র পাড়ি দেবে, এতে তাঁর শঙ্কা ও উদ্বেগ থাকা একান্ত স্বাভাবিক। তিনি পুত্রকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন যে

গন্তব্যস্থল বহু দূর ('দূরদেস'), পথ বিপদসংকুল ('বিসমপন্থা'), প্রবাসে সৎব্যক্তি সামান্যই আর দুষ্টলোকেরা অধিক (বিরলসজ্জনা, বহুয়ে দুজ্জনা), নিষ্ঠুর লোকও (নিট্‌ঠুর লোও) খুব কম নেই। কিন্তু এত চেষ্টাতেও যখন পুত্রকে নিবৃত্ত করা গেল না, তখন কীভাবে সমুদ্র যাত্রার যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন সম্পন্ন হল, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে কুবলয়মালাতে।[৩৬]

নির্দ্বিধায় বলা যায় বন্দরগুলিতে নিয়মিত হাজির হতেন বিদেশী বণিকরা। ভারতীয় শাস্ত্র বণিকদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন নয়। তাই বণিকদের 'প্রকাশ্যতস্কর' বা 'কন্টক' বলতে শাস্ত্রকারদের বাধে নি। শাস্ত্রের চোখে বণিকরা সত্যানৃতের (সত্য ও মিথ্যা) কারবারি, তাই তাঁরা সন্দেহভাজন। সমুদ্রযাত্রার প্রতিও শাস্ত্রীয় নিষেধ যথেষ্ট কঠোর।[৩৭] কিন্তু বন্দরে আগত বিদেশী বণিকরা সবসময়েই স্বাগত, শাস্ত্রবাক্যেও তা অনুমোদিত। বারুগাজা বন্দরে অগভীর জলের জন্য প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। বিদেশী জাহাজগুলি যাতায়াত করতে যাতে অসুবিধায় না পড়ে, তার জন্য শক রাজা নহপান স্থানীয় মাঝিমাল্লাদের দিয়ে বিদেশী জলযানকে পথ দেখিয়ে বন্দরে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১২৪৫ খ্রি. মোটুপল্লী বন্দরে জলদস্যুদের উপদ্রব বন্ধ করতে ও বিদেশী বণিকদের আশ্বাস দিতে কাকতীয় রাজ গণপতি জারি করেন এক বিরল 'অভয়শাসন'। দূর দূর দ্বীপ থেকে আসা সংযাত্রিকদের কাছে সম্পদ প্রাণের চেয়েও বেশি দামি (প্রাণেভ্যো অপি গরিয়সী)। সেই সম্পদ সুরক্ষার জন্যই গণপতির ঐ পদক্ষেপ।[৩৮]

মালাবারের মুজিরিস বন্দরে রোমক বণিকদের যাতায়াত ও উপস্থিতি এতটাই নিয়মিত ছিল যে সেখানে গড়ে ওঠে সম্রাট অগাস্টাসের নামাঙ্কিত একটি উপাসনালয়, পঞ্চম শতকের ট্যাবুলা পিউটেনজেরিয়ানাতে তার বর্ণনা আছে। দুই বিখ্যাত তামিল মহাকাব্য মণিমেখলাই ও শিলপ্পাদি কারম্ থেকে জানা যায় কাবেরীবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বন্দর নগরী কাবেরীপট্টিনম-এ যবন অর্থাৎ গ্রিক-রোমক বণিকদের জন্য শহরের একটি বিশেষ অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছিল।[৩৯]

একাদশ-দ্বাদশ শতকে ভারতমহাসাগরের বাণিজ্যে ইহুদী বণিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ইহুদী বণিকদের একাংশ ভারতের সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যে সক্রিয় অংশ নিতেন। তাদের দুই প্রধান কর্মক্ষেত্র মিশরের অল ফুসতাত বা পুরাতন কায়রো, এবং লোহিত সাগরের মুখে বিখ্যাত বন্দর এডেন। তাঁদের উপস্থিতি বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে মালাবার উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে[৪০]। মালাবারে ইহুদী বণিকদের ক্রিয়াকলাপ জানার বিশ্বস্ততম তথ্যসূত্র হল তাঁদের ব্যবসায়িক পত্রগুচ্ছ যেগুলি পাওয়া গিয়েছিল কায়রোর ইহুদী উপাসনালয়ের অন্তর্গত গেনিজাতে। এই রকমই কিছু চিঠি থেকে দেখা যায় অলমাহদিয়া বা টিউনিসিয়ার বণিক এব্রাহাম বেন ইশু অল ফুসতাত থেকে এডেন হয়ে এসেছিলেন অলমনজরুর বা ম্যাঙ্গালোরে। এই বন্দরনগরে তাঁর জীবনের দীর্ঘ

সতের বছর (১১৩২-১১৪৯) অতিবাহিত হয়। উপকূলের ইহুদী সমাজ, কায়রোর ইহুদী গোষ্ঠী এবং এডেনের ইহুদীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত নিবিড়। আবার পাশাপাশি বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তিনি রাখতেন আরব মুসলমান ও ভারতীয় হিন্দু বণিকদের সঙ্গে। ভারতে থাকাকালীন তিনি যে স্থানীয় কানাড়ী এক নারীর পাণিগ্রহণ করেন, তারও সাক্ষী ম্যাঙ্গালোর বন্দর। ইহুদী ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বহু সামগ্রী ম্যাঙ্গালোরে পাওয়া যেত না, যেমন ময়দা। ইহুদী বন্ধুরা যেন ম্যাঙ্গালোরগামী জাহাজে ইশুর জন্য ময়দা পাঠিয়ে দেন, এমন অনুরোধ পত্রগুচ্ছে পাওয়া যায়।[৪১]

নবম থেকে ত্রয়োদশ/চর্তুদশ শতক পর্যন্ত সময়সীমায় পশ্চিম উপকূলের বহু বন্দরে বাগদাদী, সিরাফী, হোরমুজী, ইয়েমেনী, ওমানী বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এই ইসলামী বণিকগোষ্ঠী গুলির প্রতি স্থানীয় শাসকরা— যাঁরা প্রায় কখনওই উপকূলের রাজশক্তি নন— ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতার অনুকরণযোগ্য নজির রেখেছেন। রাষ্ট্রকূট আমলে কোঙ্কন এলাকায় সঞ্জন, চৌল প্রভৃতি বন্দরে অনেক আরব মুসলমান বণিকের বাস ছিল। ঐ-সব বন্দরে মসজিদ নির্মাণ করতে তাঁদের কোনও সমস্যা হয় নি। সঞ্জন বন্দর নগরটিতে একটি বড় দেবী মন্দির ও মঠ ছিল। এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশে রাজকীয় ভূমিদানের সময় আরবি বণিকরা অনেক সময়ই উপস্থিত থাকতেন সাক্ষী হিসেবে, কারণ উপকূলের সমাজে তাঁরা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের 'তাজিক' বা আরব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে; কিন্তু নামগুলি সংস্কৃতায়িত হয়ে গিয়েছে। যেমন আলি থেকে অল্লীয়, মুহম্মদ থেকে মহুমত বা মধুমতি।[৪২]

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই বলতে হবে সোমনাথের কথা। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শৈব তীর্থকেন্দ্র হিসেবে সোমনাথের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে একটি সযত্নলালিত ধারণা বহুদিন জনমানসে রয়েছে। তা হল ১৩২৫-২৬ নাগাদ গজনীর মাহমুদের অভিযানের ফলে সোমনাথে ব্যাপক লুণ্ঠন ও ধ্বংসসাধন, তার দরুন সোমনাথ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল।[৪৩] এই দৃষ্টিভঙ্গি এত ব্যাপক যে সোমনাথ গুজরাট উপকূলে সরস্বতী নদীও আরব সাগরের সংগমস্থলে একটি প্রসিদ্ধ বন্দরও বটে, এই তথ্য প্রায় নেপথ্যে রয়ে যায়। ১২৬৪ ও ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দের দুটি বিখ্যাত লেখতে সোমনাথ পট্টন বলে আখ্যাত ; এই অন্ত্যনামই সোমনাথকে স্পষ্টভাবে বন্দর বলে চিহ্নিত করে। অবশ্য একাদশ শতকের প্রথম ভাগেই অল বিরুনি সোমনাথ বন্দরের গুরুত্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। গজনী সুলতানের অভিযান সোমনাথকে সাময়িকভাবে উপদ্রুত করে থাকতে পারে। কিন্তু বন্দর হিসেবে সোমনাথ যে ১০২৫-২৬ পরও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল তার প্রমাণ আছে সুদূর গোয়া অঞ্চলে। গোয়ার কদম্ববংশীয় একাধিক শাসক তাঁদের নিজস্ব লেখামালায় কীর্ত্তিত হয়েছেন গোয়া থেকে সমুদ্রপথে সোমনাথ যাত্রার জন্য : যাত্রার উদ্দেশ্য সোমনাথে শিবের উদ্দেশে উপাসনা করা। ১২৬৪ সালে সোমনাথ বন্দরে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার প্রেক্ষাপট বোঝার

জন্য উপরিউক্ত কথার অবতারণা করতে হল। ১২৬৪ ও ১২৮৭ সালের দুটি লেখ পড়লে সংশয়ের অবকাশমাত্র থাকে না যে, সোমনাথ বাণিজ্যকেন্দ্র ও পাশুপত শৈব ধর্মের তীর্থক্ষেত্র হিসেবে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিল। ১২৬৪ সালে সোমনাথ বন্দরে এসেছিলেন পারস্য উপসাগরের প্রসিদ্ধ বন্দর হোরমুজের জাহাজী বণিক (নাখুদা/নৌবিত্তক) নুরুদ্দীন ফিরুজ। জাহাজী বণিকটি সোমনাথে আসেন ব্যবসায়ের উদ্দেশে ('কার্যবশাৎ')। তিনি সোমনাথে একটি মসজিদ বা মিজিগিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মসজিদের প্রতিষ্ঠার কথাই ১২৬৪-র লেখতে বিশদভাবে বর্ণিত। লেখটি দ্বিভাষী সংস্কৃত ও আরবি। সংস্কৃত লেখটি বিশদ, তুলনায় আরবি লেখর বক্তব্য সংস্কৃত লেখটির কার্যত সংক্ষিপ্তসার। এই মসজিদ নির্মাণের জন্য একান্ত আনুকূল্য ফিরুজ পেয়েছিলেন স্থানীয় হিন্দু বণিকগোষ্ঠীর থেকে। সোমনাথ বন্দর-নগরের পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ সমর্থনও ছিল, যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শৈব পাশুপতাচার্য ত্রিপুরান্তক। সোমনাথের শৈব মন্দির যেমন ছিল, তার সঙ্গে মুসলমান জাহাজী বণিকের তৈরি মসজিদও ছিল। মসজিদ নির্মাণের চূড়ান্ত অনুমোদন এসেছিল গুজরাটের শাসক চৌলুক্যবংশীয় বাঘেলরাজ অর্জুনদেবের কাছ থেকে। বন্দর নগরটিতে সহাবস্থান করেন শৈব পাশুপতাচার্য-সহ বহু ব্রাহ্মণ; বিভিন্ন বণিক, মুআল্লিম এবং খাতিব সহ মসজিদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মুসলমান কারিগর ও পেশাদার গোষ্ঠীগুলি এবং হোরমুজী জাহাজী বণিক নুরুদ্দীন ফিরুজ। শৈব ধর্মের অব্যাহত জনপ্রিয়তার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল 'বরাতিসবি' (অর্থাৎ সব-ই বরাত) এবং খতমরাত্রি (অর্থাৎ এক রাত্রের মধ্যে সমগ্র কোরান পাঠের ব্যবস্থা)-র ইসলামী উৎসব। এই পরিপ্রেক্ষিতে নুরুদ্দীন ফিরুজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে লেখটিতে প্রতিভাত হন হিন্দু বণিক ছাড়। এতই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব এই দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বণিকের যে ১২৬৪-র লেখটিতে তাঁরা ধর্মবান্ধব (অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ বন্ধু) বলে অভিহিত। সবচেয়ে চমকপ্রদ বক্তব্যটি সংস্কৃত লেখটির একেবারে সূচনায় দেখা যায়। লেখটি রচনার মূল উদ্দেশ্য যেহেতু মসজিদ প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করা। তাই লেখটির সূচনা হয়েছে আল্লার উদ্দেশে স্তুতি জানিয়ে। চারটি অসামান্য অভিধায় আল্লাকে স্তুতি নিবেদন করা হয়েছে তিনি বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ শূন্যরূপ (অর্থাৎ নিরাকার) এবং লক্ষ্যালক্ষ্য (অর্থাৎ যাঁকে দেখা যায় আবার নিরাকার বলে যিনি অলক্ষ্যেও থাকেন)। সোমনাথ বন্দরের ইতিবৃত্তে এই ভাবে বণিকরা, সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রশাসকগোষ্ঠী এমন এক সামাজিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন যেখানে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক ভিন্নতার মধ্যে সহাবস্থান সম্ভব হয়েছিল।[৪৪]

উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে আশ্রিত বন্দরগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে ভারতের কৃষিপ্রধান আর্থ-সামাজিক চরিত্র থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী বলে মনে হতে পারে। সেই কারণে বোধহয় ভারতের ইতিহাসে বন্দরগুলির উপর সামগ্রিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের অভাব দেখা যায়। ভারত মহাসাগরের দ্বারা যুক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এবং

মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বন্দরগুলি যে সেতুবন্ধন ঘটায়, তার তাৎপর্য অনস্বীকার্য।[৪৫] কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সহাবস্থান যে ভারত-ইতিহাসের এক সজীব ও সনাতন চরিত্র। বেলাকুলের বৃত্তান্তে তার প্রমাণ পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষে বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধানের প্রয়াস সুবিদিত। কিন্তু ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অনেকান্ত চরিত্রকে একাকার করে দেবার সাম্প্রতিক চেষ্টা যে দুরভিসন্ধিমূলক এবং তা ভারতীয় চরিত্রেরও যে পরিপন্থী, সেই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেয় অতীতের বেলাকুলগুলি।

সূত্র নির্দেশ

১) অশীন দাশগুপ্ত এবং এম. এন. পিয়ার্সন (সম্পা), *ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান ওশান ১৫০০-১৮০০*, দিল্লী, ১৯৮৭; সতীশ চন্দ্র (সম্পা) *দ্য ইণ্ডিয়ান ওশান, এক্সপ্লোরেশনস ইন হিস্ট্রি, কমার্স অ্যাণ্ড পলিটিকস*, দিল্লী, ১৯৮৭; কে. এন. চৌধুরী, *ট্রেড অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ওশান ফ্রম দ্য রাইজ অব ইসলাম টু ১৭৫০*, কেমব্রিজ, ১৯৮৫; ঐ, এশিয়া বিফোর ইউরোপ: *ইকনমিক সিভিলাইজেশন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ওশান ফ্রম দ্য রাইজ অব ইসলাম টু ১৭৫০*, কেমব্রিজ, ১৯৯০; কেনেথ ম্যাকফারসন, *দ্য ইণ্ডিয়ান ওশান, এ হিস্ট্রি অব পিপল অ্যাণ্ড দ্য সী*, দিল্লী, ১৯৯৩; রুদ্রাংশু মুখার্জী এবং লক্ষ্মী সুব্রমনিয়ম (সম্পা) *পলিটিকস অ্যাণ্ড ট্রেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ওশান ওয়ার্ল্ড, এসেজ ইন অনার অব অশীন দাশগুপ্ত*, দিল্লী, ১৯৯৮।

২) এই ঝোঁকগুলির পরিচয়সহ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, রণবীর চক্রবর্তী (সম্পা) *ট্রেড ইন আর্লি ইণ্ডিয়া*, দিল্লী, ২০০১ (বিশেষত 'ইনট্রোডাকশন' অংশ এবং গ্রন্থপঞ্জি)। প্রাচীন জলযানের নির্মাণকৌশল জানার প্রধান উপকরণগুলি হল সাহিত্যগত বর্ণনা, পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ এবং বর্তমানেও সাবেক পদ্ধতিতে যে জলযান নির্মিত হয় তার পুঙ্খনাপুঙ্খ বিবরণ। হিমাংশুপ্রভা রায় এবং জে. এফ. সাল (সম্পা), *ট্রাডিশন অ্যান্ড আর্কিওলজি: আর্লি ম্যারিটাইম কনট্যাক্টস ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ওশান*, দিল্লী ১৯৯৬।

৩) এম. মনিয়র উইলিয়ামস, *এ স্যাংস্কৃট-ইংলিশ ডিকশনারি*।

৪) জি. এল. আঢ্য, *আর্লি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স*, বম্বে, ১৯৬৬; ডি. আর. দাস, *ইকনমিক হিস্ট্রি অব দ্য ডেকান*, দিল্লী ১৯৬৯; এস. এম. এইচ. নায়নার, *অ্যারব জিওগ্রাফারস নলেজ অব সাদার্ন ইণ্ডিয়া*, মাদ্রাজ, ১৯৪২।

৫) শিরীন রত্নাগর, 'হরপ্পান ট্রেড ইন ইটস ওয়ার্ল্ড কনটেক্সট' *ম্যান অ্যান্ড এনভিরনমেন্ট*, ১৯, ১৯৯৪ঃ ১১৫-২৭।

৬) দিলীপ চক্রবর্তী, *দ্য আর্কিওলজি অব এনশেন্ট ইন্ডিয়ান সিটিজ*, দিল্লী ১৯৯৫। বিনয়পিটকের মহাপরিনিব্বান সুত্তন্তে বলা হয়েছে বুদ্ধ তিন নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত পাটলিগাম 'পুটভেদন-'এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। 'পুটভেদন' এক ধরণের বাণিজ্যকেন্দ্র। যেখানে আক্ষরিক অর্থে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের 'পুট' বা আচ্ছাদন উন্মুক্ত করেন। বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য রণবীর চক্রবর্তী 'দ্য পুটভেদন অ্যাজ এ

সেন্টার অব ট্রেড ইন আর্লি ইন্ডিয়া' *সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ,* ১২, ১৯৯৬ ঃ ৩৩-৩৯। এই পাটলিগামই পরবর্তী কালের পাটলিপুত্র।

৭) বি. এন. মুখার্জী, *দ্য ক্যারেক্টার অব দ্য মৌর্য এম্পায়ার।* কলকাতা, ২০০০ঃ ৭৯-৮০।

৮) রাধাগোবিন্দ বসাক, *অশোকান এডিক্টস,* কলকাতা ১৯৫৯।

৯) এই বন্দরগুলির বর্ণনার জন্য প্রধান আকর, *পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী,* লায়নেল ক্যাসন সম্পাদিত ও অনূদিত, প্রিন্সটন, ১৯৮৯; প্লিনি, *ন্যাচুরালিস ইস্তোরিয়া,* জে. র‍্যাকহাম সম্পাদিত ও অনূদিত, কেমব্রিজ ম্যাসাচুসেটস. ১৯৪২; ক্লডিয়ান টলেমি, *জিওগ্রাফিকে হু ফেগেসিস।* ই. এল. স্টিভেনসন অনূদিত, নিউ ইর্য়ক, ১৯৩২। এছাড়া দ্রষ্টব্য ই. এইচ. ওয়ার্মিংটন, *কমার্স বিটুইন দ্য রোমান এম্পায়ার অ্যান্ড ইন্ডিয়া* লন্ডন, ১৯৭৪ (পুনর্মুদ্রণ); মর্টিমার হুইলার, *রোম বিয়ন্ড দ্য ইম্পেরিয়াল ফ্রন্টিয়ার* লন্ডন ১৯৫৪; বিমলা বেগলে এবং রিচার্ড ড্যানিয়েল ডি পুমা (সম্পা), *রোম অ্যান্ড ইন্ডিয়া, দ্য এনশেন্ট সী ট্রেড,* দিল্লী ১৯৯২; ফেদেরিকো দ্য রোমানিস এবং অন্দ্রে শার্নিয়া (সম্পা), *ক্রসিংস, আর্লি মেডিটেরানিয়ান কন্টাক্টস উইথ ইন্ডিয়া,* দিল্লী ১৯৯৭।

১০) বিমলা বেগলে এবং রিচার্ড ড্যানিয়েল ডি পুমা (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ভি.ডি. গোঘটে, দ্য চন্দ্রকেতুগড়-তমলুক রিজিয়ন অব বেঙ্গল: সোর্স অব দ্য আর্লি হিস্টোরিক রুলেটেড ওয়্যার ফ্রম ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া, *ম্যান অ্যান্ড এনভিরনমেন্ট*ঃ ২২, ১৯৯৭: ৬৯-৮৫.

১১) আর চম্পকলক্ষ্মী, *ট্রেড, ইডিওলজি অ্যান্ড আর্বানাইজেশন ইন সাউথ ইন্ডিয়া,* ৩০০ খ্রি: পূ:- ১,৩০০ খ্রি:, দিল্লী ১৯৯৬।

১২) অন্ধ্র উপকূলের এই বন্দরের বাণিজ্যিক তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাবে এইচ. সরকার, 'ইমার্জেন্স অব আর্বান সেন্টারস ইন আর্লি হিস্টোরি অন্ধ্রদেশ,' বি.এস. পান্ডে এবং বি.ডি. চট্টোপাধ্যায় (সম্পা) *আর্কিওলজি অ্যান্ড হিস্ট্রি, এসেজ ইন মেমোরি শ্রী এ. ঘোষ* দিল্লী. ১৯৮৭: ৬৩১-৪২। ঘন্টকসাল বা কোন্‌টাকোসুল্লা যে বন্দর ছিল, তার আর একটি প্রমাণ এই অঞ্চলে ছিলেন এক মহানাবিক ঃ তাঁর পরিচয় একটি দানলেখতে পাওয়া যায়। সুচন্দ্রা ঘোষ, 'ঘন্টশালের মহানাবিক,' *ইতিহাস অনুসন্ধান,* ১৫, ২০০১ (প্রকাশিতব্য), এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১৩) টলেমি, *প্রাগুক্ত.*

১৪) ডি. প্রধান, পি. মহান্তি এবং জে. মিশ্র, 'মানিকপাটনা: এ্যান এক্সক্যাভেশন রিপোর্ট *পুরাতত্ত্ব,* ২৬, ১৯৯৬: ১২০-২৩.

১৫) নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৯৮০ (পুনর্মুদ্রণ); রণবীর চক্রবর্তী, 'ম্যারিটাইম ট্রেড অ্যান্ড ভয়েজেস ইন এনশেন্ট বেঙ্গল,' *জর্নাল অব এনশেন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি,* ১৯, ১৯৯৬: ১৪৫-৭১; পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, *দ্য আর্কিওলজিক্যাল ট্রেজার্স অব তাম্রলিপ্ত,* মেদিনীপুর, ১৯৭৫.

১৬) চন্দ্রকেতুগড়ের উৎখনন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ পাওয়া যাবে অমলানন্দ ঘোষ সম্পাদিত, *অ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি,* (গেজেটিয়ার খন্ড), দিল্লী ১৯৮৯, দিলীপ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, দ্রষ্টব্য।

১৭) ভি. কে. জৈন, *ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ১০০০-১৩০০*, দিল্লী ১৯৮৯। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ক্যাম্বের পরিস্থিতির বিশদ আলোচনা আছে সিনাপ্পা অরসরত্নম এবং অনিরুদ্ধ রায়, *মসুলিপটনস অ্যান্ড ক্যাম্বে, এ হিস্ট্রি অব টু পোর্ট টাউনস*। দিল্লী, ১৯৯৪।

১৮) কোঙ্কন উপকূলের বন্দর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন রণবীর চক্রবর্তী, 'কোস্টাল ট্রেড অ্যান্ড ভয়েজেস ইন কোঙ্কন: দ্য আর্লি মিডিভ্যাল সিনারিও, *ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিয়্যু*, ৩৫, ১৯৯৮: ৯৭-১২৪; 'চন্দ্রপুর/সিন্দাবুর অ্যান্ড গোপাকপট্টন: টু পোর্টর্স ইন দ্য ওয়েস্ট কোস্ট অব ইন্ডিয়া (১০০০-১৩০০)', *প্রসিডিংস অব দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস*, হীরকজয়ন্তী সংখ্যা (কালিকট অধিবেশন), আলিগড়, ২০০০: ১৫৩-৬১.

১৯) মালাবারের বন্দরগুলি আদিমধ্যযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে আরবি বণিকদের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা। এর বিবরণ পাওয়া যাবে সুলেমান, ইবন খোরদাদবা, অল মাসুদী, অল বিরুনি, অল ইদ্রিসি, বুজুর্গ ইবন শহরিয়ার, ইবন বতুতার রচনায়। চার্লস ইলিয়ট এবং জেমস জসন অনূদিত, *দ্য হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ানস*, (এইচ হোদিবালার ভূমিকা সহ)। আলিগড় ১৯৫৩, প্রথম তিনখন্ড। কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী, *ফরেন নোটিসেস অব সাউথ ইন্ডিয়া ফ্রম মেগাস্থিনিস টু মা হুয়ান*, মাদ্রাজ ১৯৩৯; জি. এফ. হৌরানী, *অ্যারাব নেভিগেশন ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান ইন দ্য এনসেন্ট অ্যান্ড মিডিভ্যাল পিরিয়ড*, বেইরুট, ১৯৫৩; এ. আপ্পাদুরাই, *ইকনমিক কন্ডিশন ইন সাদার্ন ইন্ডিয়া* ১০০০-১৫০০, (দুইখন্ডে), মাদ্রাজ, ১৯৩৬ দ্রষ্টব্য।

২০) চোল আমলের দক্ষিণ ভারতীয় বন্দরের বিশ্বস্ত বিবরণ আছে নীলকান্ত শাস্ত্রী, *দ্য চোলস*, মাদ্রাজ, ১৯৫৫; আপ্পাদুরাই, *পূর্বোক্ত*; কে. আর হল, *ট্রেড অ্যান্ড স্টেটক্রাফট ইন দ্য এজ অব দা চোলস*, দিল্লী ১৯৮০ প্রমুখ গ্রন্থে।

২১) রণবীর চক্রবর্তী, 'রুলারস অ্যান্ড পোর্টস: বিশাখাপট্টনম অ্যান্ড মোটুপল্লী ইন আর্লি মিডিভ্যাল অন্ধ্র,' কে. এস. ম্যাথু (সম্পা), *ম্যারিনারস*, মার্চেন্টস অ্যান্ড ওশানস, দিল্লী ১৯৯৫: ৫৭-৭৮.

২২) নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, রামশরণ শর্মা, *ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম*, দিল্লী, ১৯৮০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

২৩) বি. এন. মুখার্জী, 'কমার্স অ্যান্ড মানি ইন দ্য সেন্ট্রাল অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন' সেক্টর্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (৭৫০-১২০০), ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন, ১৭, ১৯৮২: ৬৫-৮৩.

২৪) *পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী*, অনুচ্ছেদ ৪৭, ৪৮, ৫১.

২৫) এ. কর্তেসাও অনূদিত, সুমা ওরিয়েন্তাল; ম্যাকফারসন, *পূর্বোক্ত*।

২৬) রণবীর চক্রবর্তী, জর্নাল অব এনশেন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং, ১৫ দ্রষ্টব্য।

২৭) খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী মিশ্রলিপিতে উৎকীর্ণ এই নামমুদ্রাগুলি পাঠোদ্ধার করেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, 'খরোষ্ঠী অ্যান্ড খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী ইনসক্রিপসনস ফ্রম ওয়েস্টবেঙ্গল, ইন্ডিয়া,' *ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন*, ২৫, ১৯৯০।

২৮) বঙ্গসাগর সম্ভান্তারিয়ক নামটি ৯৭১ খ্রি একটি চন্দ্র লেখতে দেখা যায়। বোঝা যায়, দশম শতকের শেষ ভাগে ভারতমহাসাগরের পূর্বদিকের জলরাশি বঙ্গসাগর নামে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য রণবীর চক্রবর্তী, 'বঙ্গসাগর সম্ভান্তারিয়ক : এ রিভারাইন ট্রেড সেন্টার ইন আর্লি মিডিভ্যাল বেঙ্গল,' দেবলা মিত্র (সম্পা), *এক্সপ্লোরেশনস ইন দ্য আর্ট অ্যান্ড আর্কিওলজি অব সাউথ এশিয়া, এসেজ ডেডিকেটেড টু এন. জি. মজুমদার*, কলকাতা ১৯৯৬: ৫৫৭-৭২, রণবীর চক্রবর্তী, 'বিটুইন সিটিজ অ্যান্ড ভিলেজেস: লিংকেজেস অব ট্রেড ইন ইন্ডিয়া' টিলমান ফ্রাশ, গেয়র্ণ বার্কেমার, হার্মান কুলকে এবং জে. ল্যুট (সম্পা), *এক্সপ্লোরেশন ইন দ্য হিস্ট্রি অব সাউথ এশিয়া, এসেজ ইন অনার অব প্রফেসর ডিটমার রটারমুন্ড*, দিল্লী, ২০০১: ৯৯-১২০।

২৯) রোমিলা থাপার, 'দ্য ব্ল্যাক গোল্ড: সাউথ এশিয়া অ্যান্ড রোমান ম্যারিটাইম ট্রেড'; সাউথ এশিয়া, ১৫, ১৯৯২: ১-২৮।

৩০) লায়নেল ক্যাসন, 'এনশেন্ট নেভাল টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য রুট টু ইন্ডিয়া বিমলা বেগলে এবং রিচার্ড ড্যানিয়েল ডি পুমা (সম্পা), পূর্বোক্ত: ৮-১১

৩১) এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ দলিলটির সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছিলেন লায়নেল ক্যাসন, 'নিউ লাইটস অন ম্যারিটাইম লোনস, পি. ভিন্ডব জি ৪০৮২২', *ৎজাইটশ্রিফট ফ্যুর পাপিবোলোগি এন্ড এপিগ্রাফিক*, ৮৪, ১৯৯০ঃ ১৯৫-২০৬, প্রবন্ধটি রণবীর চক্রবর্তী (সম্পা), *ট্রেড ইন আর্লি ইন্ডিয়াতেও* অন্তর্ভুক্ত।

৩২) রণবীর চক্রবর্তী, 'হর্স ট্রেড অ্যান্ড পাইরেসি অ্যাট টানা (থানা, মহারাষ্ট্র, ইন্ডিয়া) গ্লিনিংস ফ্রম মার্কো পোলো,' *জর্নাল অব দ্য ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দ্য ওরিয়েন্ট*, ৩৪, ১৯৯১: ১৫৯-৮২।

৩৩) এ. আপ্পাদুরাই, *পূর্বোক্ত*।

৩৪) চেং হো-র বিখ্যাত সমুদ্রবিহারের বিবরণ দিয়েছিলেন মা হুয়ান, জে. ভি. জি. মিলস অনূদিত, *দ্য ওভারঅল ডেসক্রিপশনস অব দ্য ওশান'স শোরস*, কেমব্রিজ, ১৯৭০।

৩৫) অশীন দাশগুপ্ত, *ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য ও রাজনীতি*, ১৫০০-১৮০০, কলকাতা, ১৯৯৯।

৩৬) উদ্যোতনসুরি, *কুবলয়মালা*, এ. এন, উপাধ্যায় সম্পাদিত, বম্বে, ১৯৬৯।

৩৭) রণবীর চক্রবর্তী, 'প্র্যাকটিশনার্স অব সত্যানৃত : অ্যাটিচ্যুডস টুওঅর্ডস মার্চেন্টস ইন আর্লি ইন্ডিয়া,' *কোয়ার্টার্লি রিভিয়্যু অব হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ* ৩৮, ১৯৯৮: ১-১৪। সমুদ্রযাত্রার প্রতি শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা কলিবর্জ্য, হিসেবে চিহ্নিত। এই প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধ সংকলনে দুর্গা আইন এর নিবন্ধ পঠিতব্য।

৩৮) রণবীর চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, টীকা নং ২১ দ্রষ্টব্য।

৩৯) আর চম্পকলক্ষী, পূর্বোক্ত, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়।

৪০) এস. ডি. গয়টাইন, *এ মেডিটেরানিয়াস সোসাইটি*, ৬ খন্ডে, প্রিন্সটন, ১৯৬৭-৯৬ ইহুদি বণিকদের মধ্যে যাঁরা লোহিত সাগর হয়ে ভারতীয় উপকূলে ব্যবসা করতে আসতেন, তাঁদের গয়টাইন 'ইন্ডিয়া ট্রেডার্স বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

৪১) এই বাণিজ্যিক চিঠিগুলির ক্ষেত্রে এব্রাহাম বেন ইশু সর্বদাই প্রাপক। তিনি জবাবে যেসব চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার নমুনা এখনও পাওয়া যায় নি। ফলে যে চিঠিগুলি থেকে তাঁর কথা জানা যায়, সেগুলি সবই অন্য ইহুদি বণিকের লেখা। এই অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলের কিছু নমুনা পাওয়া যাবে এস. ডি. গয়টাইন, লেটার্স অব মিডিভ্যাল জুইশ ট্রেডার্স, প্রিন্সটন, ১৯৭৩। এই ধরণের অনেকগুলি চিঠিকে আশ্রয় করে স্বকীয় কল্পনায় এব্রাহাম ইশুকে নিয়ে একটি আশ্চর্য উপন্যাস লিখেছেন অমিতাভ ঘোষ, ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড্, দিল্লী ১৯৯০।

৪২) রণবীর চক্রবর্তী 'মনার্কস, মার্চেন্টস অ্যান্ড এ মঠ ইন নর্দার্ন কোঙ্কন (৯০০-১০৫৩), রণবীর চক্রবর্তী (সম্পা), ট্রেড ইন আর্লি ইন্ডিয়া, দিল্লী, ২০০১: ২৫৭-৮২।

৪৩) এই অভিযানের কোনও সমকালীন বিবরণ নেই। সব বর্ণনাই পরবর্তী কালের। ইংরেজি অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য, চার্লস এলিয়ট এবং জেমস ডসন (সম্পা), পূর্বোক্ত প্রথম তিন খন্ড। এ বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা পাওয়া যাবে অন্দ্রে উইংক, *অল হিন্দ*, ২য় খন্ড, দিল্লী ১৯৯৯।

৪৪) ১২৬৪ খ্রি: এর দ্বিভাষী লেখটি (সংস্কৃত ও আরবী)র জন্য দ্রষ্টব্য দীনেশচন্দ্র সরকার, *সিলেক্ট ইনসক্রিপশনস বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন*, ২য় খন্ড, দিল্লী ১৯৮৩: ৪০২-৪০৮ *জেড. এ. দেশাই, এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান সাপ্লিমেন্ট*, ১৯৬১: ১১-১৫; নীহাররঞ্জন রায়, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় রণবীর চক্রবর্তী এবং ভি.আর. মণি, *এ সোর্সবুক অব ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন*, কলকাতা, ২০০০: ৬৪৪ -৪৬৮ দ্রষ্টব্য। বিশদ আলোচনার জন্য রণবীর চক্রবর্তী, সোমনাথ বন্দরে নাখুদা নূরুউদ্দীন ফিরুজঃ ১২৬৪ঃ রণবীর চক্রবর্তী, কুণাল চক্রবর্তী এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস, অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ*, কলকাতা ২০০০: রণবীর চক্রবর্তী. 'নাখুদাস অ্যান্ড নৌবিত্তকসঃ শিপওনিং মার্চেন্টস ইন দ্য ওয়েস্ট কোস্ট অব ইন্ডিয়া (১০০০-১৫০০)', *জর্নাল অব দ্য ইকনমিক অ্যান্ড হিস্ট্রি অব দ্য ওরিয়েন্ট*, ৪৪, ২০০০:৩৪-৬৪। সোমনাথ বন্দরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে যে নিছক হিন্দু-মুসলমানের বিরোধিতার ছকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা ভুল, তার অনুপুঙ্খসহ আলোচনা করেছেন ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *রিপ্রেসেন্টিং দ্য আদার? মুসলিমস্ ইন স্যাংস্কৃট সোর্সেস*, দিল্লী, ১৯৯৮; রোমিলা থাপার *হিস্ট্রি অ্যাজ এ ন্যারেটিভ*, দিল্লী, ২০০০।

৪৫) ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের সময়সীমায় ভারত সহ ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন এলাকা বন্দর-নগর গুলির সদর্থক ও উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ভূমিকার আলোচনা পাওয়া যাবে ফ্রাঙ্ক ব্রোজ (সম্পা) *ব্রাইডস অব দ্য সী*, কেনসিংটন, ১৯৮৯।

চিত্রশিল্প ও ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস

অশোক কুমার দাস

ঐতিহাসিক বা ইতিহাসবেত্তা বলতে যা বোঝায় কোন অর্থেই আমি তা নই, আমি মাথা ঘামাই শিল্পকলা নিয়ে। তবে শিল্পকলা আমার কাছে শুধু শুদ্ধ শিল্পের নিদর্শন নয়, আমি তার মধ্যে নানাবিধ তথ্যের অনুসন্ধান করি, ইতিহাস রচনায় যা কাজে লাগে। একেবারে আধুনিক কালে ছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিল্পকলার অধিকাংশ নিদর্শন শুদ্ধশিল্পকর্ম হিসাবে নির্মিত হোত না— ধর্মীয়, লৌকিক, দরবারি বা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে বা প্রেরণায় এদের সৃষ্টি, তাই এই সব নিদর্শন থেকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার কৌমিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি চেতনা ইত্যাদি নানা বিষয়ের অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা অন্যভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ ইতিহাসের এই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপাদানের তেমন ব্যবহার হয় না, বিশেষ করে মধ্যযুগের গোড়ার দিককার ও মুঘল যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। লিখিত বিবরণের অভাব পূরণের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে বা অন্যভাবে আবিস্কৃত প্রতিটি স্থাপত্যের অবশেষ, মূর্তির ভগ্নাংশ, শিলালেখ, তাম্রশাসন, মুদ্রা, পোড়ামাটির ফলক, মৃৎপাত্রের অবশেষে কিংবা গজদন্ত, ধাতু বা দারুশিল্পের নিদর্শন থেকে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে যা অন্য কোন ভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বোধহয় তার কিছুটা ব্যতিক্রম হয়েছে কারণ লিখিত বিবরণ — তা দরবারের বেতনভুক ইতিহাসকার, চারণ কবি বা স্তাবকের পক্ষপাতদুষ্ট একপেশে লেখা হলেও— অগ্রাধিকার পেয়েছে চারু ও কারুশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ইত্যাদি ততটা গুরুত্ব পায়নি। একটা উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য বোধহয় কিছুটা স্পষ্ট হবে: মুঘল দরবারের বিবরণ দিতে গেলে আমরা অবধারিত ভাবে আবুল ফজল, বদাওনী, লাহোরী বা দরবারে উপস্থিত যেশুইট পাদরি, বিদেশী ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী বা রাজপ্রতিনিধির লেখার উপর নির্ভর করি কিন্তু বাবুরনামা, আকবরনামা, জাহাঙ্গীর নামা ও বাদশাহ্‌নামার বিভিন্ন চিত্রিত পুথির অসংখ্য বর্ণালী চিত্রমালার অনুপুঙ্খের উপর নির্ভর করি না। শিল্পের আলোচনায় তাদের বিশ্লেষণ যতটা প্রয়োজন, সমসাময়িক সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ধর্মসম্পর্কিত আলোচনাতে ততটা না হলেও তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে সেকথা বোধহয় তেমনভাবে স্বীকৃত হয়নি।

মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে শিল্পকলা— বিশেষ করে চিত্রশিল্প ও কারুশিল্পকে — কি ভাবে ব্যবহার করা যায় তার উপর কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। আদিমধ্যযুগে বিশেষ করে সুলতানি আমলে, দিল্লী ও গুজরাত, মালব (মাণ্ডু) জৌনপুর গৌড় ও গোলকুণ্ডার প্রান্তীয় শক্তি কেন্দ্রগুলির ইতিহাস রচনায় স্থাপত্যশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। তার অন্যতম কারণ অধিকাংশ মসজিদ, মকবারা, মঞ্জিল, মিনারে উৎকীর্ণ শিলালেখ থেকে প্রতিষ্ঠাতার নাম, ধাম, সাল, তারিখ ইত্যাদি অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। মুদ্রার ক্ষেত্রেও তাই। মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি, তারিখ, মুদ্রার আকার, ওজন, ধাতব উপাদান, প্রাপ্তি-স্থান টাঁকশালের অবস্থান ইত্যাদি তথ্যাবলী রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। কিন্তু চারুশিল্প বিশেষ করে চিত্রকলা — উপেক্ষিত রয়ে গেছে, কারণ দিল্লীর প্রভাব ও ক্ষমতাশালী সুলতানেরা চিত্রশিল্পে উৎসাহী ছিলেন না। তবে মালব (মান্ডু), গুজরাত, গোলকোন্ডা, গৌড় ও জৌনপুরের প্রাদেশিক সুলতানেরা ছবি আঁকার ব্যাপারে তেমন কোন বাধা নিষেধ আরোপ না করায় তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কয়েকটি চিত্রিত পুঁথি তৈরি হয়েছে। এগুলি খুঁটিয়ে দেখলে অনেক অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে। বছর কুড়ি আগে আকস্মিক ভাবে গৌড়ে লেখা ও চিত্রিত *গারাফনামা* পুথির আবিষ্কারের আগে[১] গৌড়ে কোন চিত্রশিল্পের রেওরাজ ছিল এ তথ্যটিও আমাদের জানা ছিল না। তবুও এই মূল্যবান দলিলগুলি অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের কাছে অজানা রয়ে গেছে। তার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে, পুঁথিগুলির একটি বাদ দিয়ে[২] বাকি গুলি লন্ডন, নিউইয়র্ক, জুরিখ বা বার্লিনের লাইব্রেরি সংগ্রহালয়ে এবং সীমিত-সংখ্যক কয়েকটি ছবি ছাড়া পুঁথির বাকি ছবি প্রকাশিত না হওয়ায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন গবেষক ও শিল্প ঐতিহাসিক ছাড়া অন্যদের কাছে সেগুলি অজ্ঞাত রয়ে গেছে।[৩] বিদেশে যাওয়া সহজ নয় ও ব্যয়সাপেক্ষ তাই এরকম ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে এদেশে-র কোন গবেষণাগারেই এই সব অত্যন্ত মূল্যবান সমসাময়িক উপাদানের উপযুক্ত ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

মুঘল যুগে চারু ও কারুশিল্প যে উৎকর্ষের শিখরে উঠেছিল তা কারুর অজানা নয়। ছবির আঙ্গিক, শৈল্পিক গুণাগুণ, বিষয়বৈচিত্র্য, স্রষ্টাশিল্পীদের নাম-ধাম, পরিচয় নিয়ে শিল্প ঐতিহাসিকেরা মাথা ঘামাবেন, কিন্তু এই অতুলনীয় চিত্রসম্ভারে মুঘল যুগের স্থাপত্য গৃহসজ্জা বিলাস বৈভব, বস্ত্রশিল্প, কারুশিল্প, নৃত্যগীত, আদবকায়দা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি যে কত বাস্তবানুগ ও নিখুঁত ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে সে বিষয়ে আমরা কতটা অবহিত? শিল্পী, স্থপতি ও ভাস্করের নাম যে দেশে সচরাচর অনুল্লিখিত থাকে সেখানে মুঘল তসবীরখানায় বিভিন্ন সময়ে কর্মরত অন্তত দেড়শ চিত্রকরের নাম জানা গেছে। তাঁরা শুধু তাব্রিজ, মাশ্‌হাদ, হেরাৎ বা সমরকন্দ থেকে নয়, গুজরাত, গোয়ালিয়র, লাহোর, কাশ্মীর সহ উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। এমন কি একজন আবিসিনিয়ার

হাবসি বা একজন ফিরিঙ্গী (পর্তুগিজ) চিত্রকরের নামও জানা গেছে। নকশার কাজে পারদর্শী 'নক্কাশ'ও 'মুজাহিব', ও প্রস্তরশিল্পী বা 'সঙ্গ্‌তরাস-'ও আকবর ও জাহাঙ্গীরের তসবীর খানায় কাজ করতেন সে খবরও লেখা আছে ছবির তলায়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে মুঘল দরবারে যোগ দেবার আগে তাঁরা কোথায় কোন রীতিতে কাদের জন্য, কি ধরণের ছবি আঁকতেন। অজন্তা, বাঘ, এলোরার গুহাচিত্রের পরে পালযুগে ও জৈন শ্রেষ্ঠী ও শাসকদের জন্য পশ্চিম ও মধ্যভারতে পুথি ও পটচিত্র ছাড়া অন্যধরণের ছবি আঁকার প্রচলন না থাকায় মনে করা হোত প্রাচীন ভারতের গৌবরময় চিত্রশিল্পের ধারা বোধ হয় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তাই বিংশ শতকের প্রথম দিকে বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিল্প ঐতিহাসিকেরা মুঘল চিত্রকলাকে পারসিক শিল্পকলার অংশভূত 'ইন্দো পারসিয়ান' শৈলী বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু এখন গত পঞ্চাশ বছরে অনুসন্ধান, আবিষ্কার, বিশ্লেষণ ও গবেষণার পর আমরা অনুভব করতে পেরেছি ওই মতবাদ কতটা ভ্রান্ত। হুমায়ুনের সঙ্গে বা উত্তর কালে আকবরের রাজত্বকালে ইরান বা মধ্য এশিয়া থেকে কখনই দশবারো জনের বেশি চিত্রকর এদেশে আসেনি। পারসিক শৈলীর সুস্পষ্ট প্রভাব থাকলেও ছবির আঙ্গিক ও শৈলীর অনুপুঙ্খে প্রাক-মুঘল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নানা ধরণের শিল্পরীতির প্রভাব অনেক বেশি।

মুঘল তসবীরখানায় আঁকা ছবি — তা সে জীবনীমূলক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, অভিযানমূলক বা কল্পনাশ্রয়ী যাই হোক না কেন — খুঁটিয়ে দেখলে অনেক সমসাময়িক খন্ডচিত্রর ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ছবির বিষয়বস্তুও নতুন তথ্যের সন্ধান দেয়। *আকবরনামার* একটি উল্লেখযোগ্য ছবি — ইবাদতখানায় যেশুইট পাদরি মুসলমান মৌলবী ও হিন্দু পন্ডিতের সঙ্গে আলোচনামগ্ন মুঘল সম্রাট আকবর ছবিটি[৪] অনেকেরই জানা। কিন্তু আকবর যে মহাভারত ও রামায়ণের ফারসি অনুবাদ করিয়ে ক্ষান্ত না থেকে তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য অসংখ্য অনবদ্যমানের ছবি দিয়ে চিত্রিত করে পুথি তৈরি করিয়েছিলেন।[৫] সে কথা কজনের জানা আছে? শুধু তাই নয় তাঁর বৃদ্ধা মা হামিদা বানুও যে ১৬০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর কিছুদিন আগেও এমনি আর একটি সচিত্র রামায়ণের পুথি দেখেছিলেন সম্প্রতি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৫৯৪ সালে লেখা এই চিত্রিত পুথিটি বছর দশেক আগে লন্ডনে বিক্রির জন্য আসে। গত বছর মাসকটের সুলতান ২৯টি পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবিসহ পুথিটি প্রায় দুকোটি টাকা দিয়ে কিনেছেন। পুথিতে গোড়ায় মোট ৫৪টি ছবি ছিল। বাকি ছবি এখন আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশের সংগ্রহে রয়েছে। এখানে বলা দরকার যে বাবুরের পারসিক অনুচর আলি আকবরের বিদুষীকন্যা হামিদা বানু অল্প বয়স থেকেই শিল্পে ও সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। তাঁর নিজস্ব সীলমোহর লাগানো অন্ততঃ দশটি এ্যালবাম ও পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে, যা দেখে জানা যায় যে স্বামী হুমায়ুনের ও পুত্র আকবরের অন্তরালে থেকেও তার বিদ্যোৎসাহিত্বে ভাটা পড়েনি, তাঁর নিজস্ব গ্রন্থসংগ্রহ

ছিল এবং রামায়ণের মত হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের সচিত্র গ্রন্থ তৈরি করিয়ে তাঁর উদার ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ দিয়ে গেছেন। লেখকের প্রকশিত প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বাবুর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী পড়ে তাঁদের প্রকৃতি প্রেম ও শিকার প্রীতির কথা জানা যায়। মুঘল তসবীর খানায় তৈরি অসংখ্য ছবির মধ্যে বাগ-বাগিচা নির্মাণ ও শিকার অভিযানের ছবি ছাড়া পশু, পাখী, ফুল ফল ও গাছের অগণিত ছবি দেখা যায়। তাদের মধ্যে এমন কিছু ছবি আছে যা দেখে মুঘল সম্রাটদের প্রকৃতি ও পরিবেশচেতনার কথা ও দুলর্ভ দুস্প্রাপ্য অজানা জীবজন্তু ও গাছপালার প্রতি তাঁদের গভীর আগ্রহের কথা জানা যায়। *বাবুরনামার* চারটি পুঁথিতে এরকম অনেক ছবি তো আছেই, *আকবরনামায়* নারওয়ার এর জঙ্গলে সাদা বাঘ শিকার *জাহাঙ্গীরনামার* ছবিতে গন্ডার এদেশে আসা প্রথম টার্কি পাখী ইত্যাদি ছবিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে ওস্তাদ মনশুর সাইবেরিয়ান সারসের[৬] কিংবা মরিশাসের ডোডোপাখীর ছবি যা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে। জাহাঙ্গীরের জন্য আঁকা এই ডোডোপাখীর ছবিটিই সারা দুনিয়ার এই বিলুপ্ত পাখীর একমাত্র বাস্তবানুগ প্রতিকৃতি।[৭] ছবিটি আবিস্কারের আগে ডোডোপাখী কেমন দেখতে তা সঠিক ভাবে জানার উপায় ছিলনা, কারণ ভ্রমণকারীদের বর্ণনা ও চার পাঁচটি মৃতপাখীর কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। মুঘলদের বাগানগুলি কত নিখুঁত ভাবে তৈরি হোত, তাঁদের শিকার ভূমির যেখানে তাঁরা সিংহ বাঘ, কৃষ্ণসার, হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি শিকার করতে যেতেন — কত যত্ন করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হোত কিংবা কি ভাবে তাঁরা এদেশ থেকে কলাগাছ বা আখগাছ আফগানিস্তানের কিংবা ওদেশথেকে ফুল ফল ও ছায়াদার গাছের চারা আনিয়ে এদেশের বাগানে লাগিয়ে ছিলেন তার চাক্ষুষ প্রমাণ এই সব চিত্রিত পুঁথির ছবির মধ্যে পাওয়া যাবে।

এখন আসা যাক সমস্যার কথায়। আগে যে সব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়েছে কারণ *আকবরনামা, বাবুরনামা, জাহাঙ্গীরনামার* বা ওস্তাদ মনশুরের ছবিগুলি ভাল করে পরীক্ষা করার সুযোগ হয়েছিল আমার। কিন্তু এরকম সুযোগ তো সহজে আসেনা— ডোডোর ছবি আছে সেন্ট পিটার্সবার্গের গ্রন্থাগারে, *আকবরনামার* পুঁথি দুটি লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে, ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও ডাবলিনের চেষ্টারবীটি গ্রন্থাগারে, *বাবুরনামার* একটি পুঁথি আমেরিকার বালটিমোরের ওয়াল্টার্স আর্ট গ্যালারীতে আর জাহাঙ্গীরনামার ছবিটি বার্লিনে। (তবে সাইবেরিয়ান সারসের ছবিটি আছে কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে)। কিন্তু বিদেশে যাওয়া যেমন কঠিন তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ, তাই এমন কিছু উপায়ের কথা ভাবতে হবে যাতে আসল ছবি বা পুঁথি না দেখলেও ভাল ফটো বা স্লাইড বা প্রতিলিপি দেখে কাজ চালানো যায়। এই রকম একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল নয়াদিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলা কেন্দ্রে। লন্ডনের

ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়াম ও ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির[৮] ভারতীয় চিত্রসংগ্রহের অধিকাংশের ফটোগ্রাফ কিংবা সি.ডি.রম এখানে সংগৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া ডাবলিনে চেষ্টার বীটি লাইব্রেরির ভারতীয় চিত্রসংগ্রহ, ক্লীভল্যান্ড আর্ট মিউজিয়াম, লজ এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়াম অফ আর্ট, ব্রুকলীন মিউজিয়াম ও প্যারিসের ম্যুজে গীসের ভারতীয় চিত্রসংগ্রহ সাম্প্রতিক কালে ক্যাটালগের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুঘল চিত্রিত পুঁথি যেমন ঃ ওয়াশিংটন ফ্রীয়ার গ্যালারীর *রামায়ণ*, হার্ভার্ডের স্যাকলার আর্ট মিউজিয়ামের *দিওয়ান-এ-আলোয়ারী*, ক্লীভল্যান্ডে মিউজিয়ামের তুতিনামা, ব্রিটিশ লাইব্রেরির *খামসা-এ-নিজামী* ও ওয়াল্টার্স আর্ট গ্যালারীর খামসা-এ-আমীর খুসরু দেহলাভী সাম্প্রতিক কালে সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের রেকর্ড অবশ্য তেমন ভাল নয় গত ত্রিশ বছরে প্রাক-মুঘল ও মুঘল আমলের মাত্র চারটি চিত্রিত পুঁথি পুস্তককারে প্রকাশিত হয়েছে : মুম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটির ১৫১২ সালে লেখা *অরণ্যপর্বের* একটি খন্ড, নানালাল মেহতা সংগ্রহের (আমেদাবাদ) চৌরপঞ্চাশিকা, ন্যাশনাল মিউজিয়ামের *বাবুরনামা* ও সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত কলা ভবনের *আইয়ার-এ-দামিশ*।

এদেশে সুলতানি আমলের মত মুঘল আমলের চিত্রিত পুঁথির সংখ্যা খুবই কম। জয়পুরের মহারাজা সওয়াই মান সিং সংগ্রহালয়ে আকবরের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি *মহাভারত* ও *রামায়ণের* ফারসি অনুবাদ *রজ্‌মনামা* ও *রামায়ণ*, পাটনার খোদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরিতে মুঘলদের বংশপরিচয়ের গ্রন্থ তারিখ-এ-খানদান-এ-তিমুরীয়া, বেনারসের ভারত কলা ভবনে পঞ্চতন্ত্রের ফারসি অনুবাদ, আইয়ার-এ-দানিশ, মুম্বাইয়ের প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ সংগ্রহালয়ে অন্য একটি আনোয়ার-এ-সুহয়েনীর অধিকাংশভাগ, দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংগ্রহালয়ে আমীর খসরুর জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ আশিকা ও বাবুরের আত্মজীবনী বাবুরনামা, আর রাম্পুর রাজা লাইব্রেরিতে মহাকবি হাফিজের কাব্যসংগ্রহ দিওয়ান-এ-হাফিজ ও মন্ত্রতন্ত্র-রাশিচক্রের একটি হারানো পুঁথি থেকে কাটা ছবির এ্যালবাম। এগুলি ছাড়া কলকাতার বিড়লা একাডেমি অফ্ আর্ট ও কালচার-এর অন্য একটি রজম্‌নামার পুঁথির কথা লেখা দরকার। কিছু কিছু মুঘল পুঁথির অংশ, এ্যালবাম, প্রতিকৃতি ও অন্যান্য খোলা ছবিও হায়দ্রাবাদের সালার জং সংগ্রহালয়, মুম্বাইয়ের কাওয়াসজী জেহাঙ্গীর সংগ্রহ, বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও সংগ্রহালয়, কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহালয়, রামপুর বেনারস, জয়পুর, দিল্লী, পাটনায় পাওয়া যায়। কিছু নিজ সংগ্রহও — যেমন গোয়েঙ্কা পরিবার সারাভাই পরিবারের সংগ্রহ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। আগেই বলা হয়েছে এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র চারটি চিত্রিত গ্রন্থ, আর দুটি নিজসংগ্রহ মুম্বাইয়ের কাওয়াসজী জেহাঙ্গীর ও কলকাতার গোয়েঙ্কা পরিবারের মূল্যবান সংগ্রহ। রামপুর রাজা লাইব্রেরির ক্যাটালগ সম্পূর্ণ হলেও প্রকাশ অনিশ্চিত। জয়পুর

মহারাজা সওয়াই মান সিং সংগ্রহালয়ের রামায়ণ ও মুঘল চিত্রাবলীর ক্যাটালগ সম্পূর্ণ হলেও প্রকাশ অনিশ্চিত।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আমাদের দেশের স্বল্পসংখ্যক প্রাক মুঘল ও মুঘল যুগের চিত্রিত পুঁথি ও অন্যান্য চিত্রাবলী গবেষকদের কাছে অনায়াসলভ্য না হলে এবং তাদের প্রকাশনার ব্যবস্থা না হলে আমাদের অতীত ইতিহাসের অনেক বিশ্বাসনীয় ও মূল্যবান সমসাময়িক উপাদান ঐতিহাসিক ও আপামর জনসাধারণের কাছে অজানা থেকে যাবে। বাস্তবের ছবিটি কি রকম তার উপর কিছুটা আলোকপাত হওয়া দরকার। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় অভিলেখাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগার শ্রেণীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার যেমন খোদাবক্স লাইব্রেরি, রাজা লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটিতে পুঁথি পুস্তকের সংগ্রহ পরীক্ষা করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ বা অসুবিধাজনক হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা জটিল। এদেশের অধিকাংশ সংগ্রহশালায় আপামর জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার (কিছু প্রবেশমূল্য সাপেক্ষে)। তাই অধিকর্তাদের অধিকাংশ সময় ও মনঃসংযোগ দর্শনার্থীদের সুবিধার ব্যবস্থায় চলে যায়— কি করে সাজসজ্জা আকর্ষণীয় করা যায়, উন্নত আলো লাগানো যায়, বিবরণিকায় কি কি তথ্য দিতে হবে সামগ্রিক নিরাপত্তা কি করে করা যায়, ইত্যাদি পরিচালনাগত সমস্যায় অর্থসংকুলান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। তাই তাঁদের গবেষক শ্রেণীর প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। গ্যালারীতে ঠাঁই না পাওয়া অসংখ্য নির্দশন - যা রিজার্ভ বা ষ্টাডি কালেকসন হিসাবে জনসমক্ষে না রেখে অন্তরালে রাখা হয়— দেখাবার দায়িত্ব তাঁরা অনেক সময় এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু সাধারণ দর্শকের অতিরিক্ত মুষ্টিমেয় কিছু দর্শনার্থীর — আমরা এই শ্রেণীভুক্ত— এগুলি না দেখলে চলেনা। একটি পুঁথির মাত্র দুটি পৃষ্ঠা শোকেসে দেখানো যায়, এঁরা দেখতে চান পুরো পুঁথিটির প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা, ছবির সমুখের দিকটাই ফ্রেমের মধ্যে দেখা যায়, এঁরা দেখতে চান ছবির চারদিকের বর্ডার ও পিছনের দিক, আতস কাঁচ লাগিয়ে পড়তে চান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লেখা। কিন্তু এই বিশেষ গবেষক দর্শকদের চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব নিতে অনেকেরই অসুবিধা হয়। এই সমস্যা সমাধানের দুটি উপায় যদি সংগ্রহালয়ের প্রত্যেকটি জিনিষের ছবি ও বিবরণ লিখে রাখা হয় তাহলে অধিকাংশ গবেষকের প্রয়োজনে মেটানো যায়। দ্বিতীয়টি কিছুটা সময়সাধ্য — ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় অধিকারীকে পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে সেগুলি দেখাবার ব্যবস্থা করা। অবশ্যই তার জন্য নির্দেশক বা অছিপরিষদের বিশেষ অনুমতির এবং গবেষকের প্রয়োজনীয়তা ও যোগ্যতার প্রমাণ দেবার দরকার হতে পারে। এই কাজটি যতই অসুবিধাজনক হোক সংগ্রহালয় অধিকর্তার কতর্ব্যের মধ্যে সহযোগিতার অনুভূতি থাকলে হয়তো অনেক অনায়াসে করা সম্ভব হবে। তবে আবার মনে করিয়ে দেবার দরকার যে যদি সংগ্রহের সম্পূর্ণ বিবরণ ও রঙিন প্রতিলিপি সহ বিবরণিকা বা

ক্যাটালগ প্রকাশের ব্যবস্থা হয় তাহলে অন্য অসুবিধাগুলি সহজে এড়ানো যায়। কিন্তু সংগ্রহালয় কর্তৃপক্ষ তাদের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হলেও ক্যাটালগ তৈরি বা প্রকাশিত হয়না কেন? অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত কেউ সেখানে কর্মরত না থাকায় কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। সে রকম অবস্থায় কোন বিশেষজ্ঞকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমন্ত্রণ করে এনে কাজটি সহজেই করিয়ে নেওয়া যায়। বস্তুত তামাম দুনিয়ায় এভাবে বিদ্যাজ্ঞানের আদানপ্রদান চলছে। প্রসঙ্গত দুটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করা যায় সেন্ট পিটার্সবার্গ এ্যালবামের কথা আগে বলা হয়েছে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের রাশিয়ান একাডেমি অফ্ সায়েন্স-এর ইন্‌স্টিট্যুট অফ্ ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজের সুবিশাল সংগ্রহে এই মুঘল ও পারসিক ছবির ও হস্তলিপির মোরক্কা বা এ্যালবামটি উনবিংশ শতকে পারস্যদেশ থেকে উপঢৌকন হিসাবে আসে। এ্যালবামের জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের সময়কার অনেক ছবির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ্যালবামটির জীর্ণ দশা ও কর্তৃপক্ষের আর্থিক অস্বাচ্ছল্য ইত্যাদি কারনে সুইজারল্যান্ডের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাষ্ট, ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার একদল বিশেষজ্ঞ ও গবেষক মিলে তিনবছরের কঠোর পরিশ্রমে ও প্রচেষ্টায় শুধু যে তার বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে তাই নয় এ্যালবামের ছবি গুলি ইতালি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় প্রদর্শিত হয়েছে ও অশেষ যত্নে এর প্রত্যেকটি ছবির ও ক্যালিগ্রাফি বাস্তবানুগ রঙে ও আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই ''ফ্যাকসিমিলি'' সংস্করণের দাম সাধারণের কেনার ক্ষমতার বাইরে তবুও ছবিগুলি দেখার জন্য আর সেন্ট পিটার্সবার্গ ছুটতে হবেনা বা সেখানকার অধিকর্তা বা বিভাগধ্যক্ষের অনুগ্রহ প্রার্থী হতে হবেনা, এদেশের কোন গ্রন্থাগারে গেলেই চলবে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত গতবছর সেপ্টেম্বর (২০০০) মাসে খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে তেহ্‌রান যাবার আমন্ত্রণ পাই। গত ৩৫।৩৬ বছর ধরে সেখানকার রাজকীয় গ্রন্থাগারের 'গোলশান মোরক্কার' জাহাঙ্গীরের সময়কালীন ছবি ও ক্যালিগ্রাফির অতুলনীয় নিদর্শনগুলি দেখার জন্য সেখানে যাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনই ফলপ্রসু হইনি। এবারে সেখানে গিয়ে দেখি 'গোলশান মোরক্কার' শ আড়াইয়েক ছবি ও ক্যালিগ্রাফির পৃষ্ঠাগুলি সারি সারি টেবিলের উপরে গোছ করে রাখা। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন ষোলজন বিভিন্ন বয়েসের গবেষক বিশেষজ্ঞ, তিনজন রাশিয়া তিনজন আমেরিকা, তিনজন ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড, তিনজন ফ্রান্স, তিনজন ইরান থেকে আর এই অধম ভারতবর্ষ থেকে— যে দেশের আঁকা ছবি ও লেখার নমুনা রয়েছে এই এ্যালবামের পাতায় পাতায়। ইতিমধ্যে এই অ্যালবামটির 'ফ্যাক্‌সিমিলি' ছাপার জন্য এম.ও.ইউ (মেমোরান্ডাম অফ্ আন্ডারষ্ট্যান্ডিং) স্বাক্ষরের ব্যবস্থা হয়েছে ওয়াশিংটনের স্মিথসনিয়ান ইনষ্টিট্যুট ও ইরানের গোলেস্তাঁ প্যালেসের নিদের্শক ও ইরান কালচারাল অর্গানিজেসনের প্রধানের সঙ্গে। আমাদের উপর ভার পড়ল ছবি ও লেখার নিদর্শন গুলির বিবরণ ও টীকা লেখার।

স্মিথসনিয়ান এ্যালবামটির আধুনিক উপায়ে সংরক্ষণের ও পেশাদার ফটোগ্রাফার পাঠিয়ে উচুঁমানের ছবি তোলার ব্যবস্থা করবে ইরানিয়ান কর্তৃপক্ষ ইংরাজি ও ফরাসিতে দু'খণ্ডে প্রকাশ করবে। অর্থাৎ আমাদের সাংস্কৃতিক শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে পয়সা খরচ করবেন, মাথা ঘামাবে ও প্রকাশের ব্যবস্থা করবে ইরান রাশিয়া ফ্রান্স ইংল্যান্ড ও আমেরিকার লোকজন, আর আমরা অপেক্ষা করব বই প্রকাশিত হলে কোথায় কি গলদ রয়েছে তার উপর মন্তব্য করার জন্য!

আবার প্রথম কথায় ফিরে আসা যাক— চিত্রকলাকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সম্যক ভাবে ব্যবহার করার কথায়। কিন্তু কেন তা সম্ভব হয়নি তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যাঁরা এই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা তাদের সত্যিকার উপযোগীতার ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন। তাঁরা যদি ভাল করে ক্যাটালগ প্রকাশ করেন, গবেষক বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের বিশেষ সুবিধা দেন, নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন তাহলে যে সব অমূল্য উপাদান সকলের অগোচরে রয়েগেছে তার উপযুক্ত মূল্যায়ন হবে ও ইতিহাসের অনেক অজানা অন্ধকার দিক নতুন করে আলোকিত হবে।

সূত্র নির্দেশ

১) এই পুঁথিটি এখন লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রয়েছে।

২) এদেশে দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে মান্ডুতে লেখা মহাকবি সাদির *বোস্তাঁর* পুঁথিটি আছে।

৩) মাত্র একটি সুলতানি আমলের পুঁথির চিত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে — গুজরাতে তৈরি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকের *শাহনামা*।

৪) ডাবসিনের চেষ্টারবীটি লাইব্রেরির *আকবরনামা* গ্রন্থে চিত্রিত আছে।

৫) আকবরের ব্যক্তিগত সংগ্রহের এই দুই মহাগ্রন্থের পুঁথিগুলি জয়পুরের মহারাজা সওয়াই মানসিং সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে।

৬) সাইবেরিয়ার এই লুপ্ত প্রায় বিরল প্রজাতির শিকার সারস মাত্র দু'তিন বছর আগেও আগ্রার কাছে ভরতপুরের পক্ষীনিবাশে শীতকালে উড়ে আসত।

৭) ডোডো পাখীর এই ছবি সেন্ট পিটার্গবার্গের গ্রন্থাগারের একটি এ্যালবামের পৃষ্ঠায় লাগানো আছে। ছবিটি চেনার কৃতিত্ব প্রখ্যাত জার্মান পক্ষীতত্ত্ববিদ এরউইন স্ট্রেসম্যানের। এ বিষয়ে ডঃ সলিম আলি ও বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ Salim Ali in M. A. Alvi and A. Rahman, Jahangir the Naturalist New Delhi 1968, pp. 15-17; A. K. Das, "The Dodo and the Mughals", History today, London, XXIII 1973, pp. 60-63- দ্রষ্টব্য।

৮) ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরির একটি বিভাগ।

উনিশ শতকের বাংলায় খ্রিষ্টধর্ম ও ধর্মপ্রচারের পটভূমিতে বুদ্ধিজীবীর আত্মানুসন্ধান

পাপিয়া চক্রবর্তী

আধুনিক ভারত বিভাগে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের কার্যনির্বাহী সমিতি আমাকে যে সম্মান জানিয়েছেন আমি তার জন্য তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পৃথিবীজোড়া নানা ঘটনায় ধর্ম আবার নতুন করে ইতিহাসের গবেষণায় গুরুত্ব পাচ্ছে। দেশী এবং বিদেশী ঐতিহাসিকেরা—ধর্ম ও রাজনীতি, ধর্ম এবং নেশন. ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষ, হিন্দু ধর্মের নতুন সংজ্ঞা, হিন্দু-খ্রিষ্টান পারস্পরিক যোগাযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নতুন করে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করছেন।[১]

কিছুদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যে ভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে, বিশেষ করে মিশনারি গ্রাহাম ষ্টেনস এবং তাঁর পুত্রদের যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা গোষ্ঠীগত রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংযোগের বিষময় ফলের একটি চরম দৃষ্টান্ত।[২] কিছুদিন আগে কোনও অখ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ভারতের খ্রিষ্টান চার্চগুলির কাছে indigenisation বা দেশীয়করণের প্রস্তাব এসেছে।[২ক] এই অযাচিত উপদেশ বিরক্তি'র বা বিতর্কের উৎস হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, উনিশ শতকেই বাংলার এবং দক্ষিণ ভারতের খ্রিষ্টান বুদ্ধিজীবীদের অংশবিশেষ দেশীয়করণের পদক্ষেপ নিজেরাই নিয়েছিলেন।[৩] ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতে আরও অনেক আগেই খ্রিষ্টধর্মের ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম খ্রিষ্টাব্দে, St Thomas নিজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে মনে করা হয়।[৪]

উনিশ শতকের বাংলায়, আধুনিকতার প্রায় জন্মলগ্নে, ইংরাজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তের আত্মপরিচয় সন্ধানে অনেক সময়ই ধর্মের idiom ব্যবহার করা হয়েছিল।[৫] ধর্মভাব মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে নতুন কিছু না। রেভঃ লালবিহারী দে তো 'religiosity' তে তাঁর দেশবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যই দেখেছিলেন।[৬] খ্রিষ্টধর্মও উনিশ শতকের অনেক আগেই বাংলায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু এই শতকে, হিন্দুধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্মের সম্পর্কে শুধুমাত্র নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়নি, সাংস্কৃতিক, সামাজিক আলোড়ন এবং বুদ্ধিজীবীর identity formation এ খ্রিষ্টধর্ম এবং ধর্মপ্রচারের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ।[৭]

সাম্প্রতিক কালের দুঃখজনক ঘটনাগুলির কোনও শিকড় উনিশ শতকে ছিল, কি ছিল না, বা বর্তমানের সঙ্গে সেকালের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনার মৌলিক পার্থক্য কোথায়, এই প্রশ্নগুলি স্বাভাবিক ভাবেই অনেকের মনে আসতে পারে। ভারতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক গবেষণা হয়েছে।[৮] তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে কয়েকজন হিন্দু ব্রাহ্ম এবং খ্রিষ্টান বুদ্ধিজীবীকে কেন্দ্র করে সময়ের স্বল্প-পরিসরে আমার কিছু চিন্তা ভাবনা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

আমার মনে হয়, বিদেশী শাসকের ধর্ম রূপে খ্রিষ্টধর্মের নতুন পরিচিতিই ভারতের খ্রিষ্টধর্মে নতুন মাত্রা সংযোজনের মূলে ছিল।[৯] দেশীয় শিক্ষিত সমাজের সচেতন অংশ ব্রিটিশ রাজশক্তি এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের nexus সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। ক্রমশঃ মিশনারি প্রচারিত ধর্মমতকে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের বৈধকরণের যন্ত্র হিসেবে মনে করার প্রবণতা দেখা যায়।[১০]

বিদেশী মিশনারিরা শুধুমাত্র Euro-centric খ্রিষ্টধর্মেরই আমদানি করেন নি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহক এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক রূপেও খ্রিষ্টধর্মকে উপস্থাপিত করেছিলেন। ফলে, ইতিহাসের গতিতেই মিশনারি প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্যতম সক্রিয় কারণে পরিণত হয়।[১১]

উনিশ শতকের বাংলায় আবার মিশনারি প্রচারিত খ্রিষ্টধর্ম থেকে যিশুখ্রিষ্টকে পৃথক করার মননশীল প্রক্রিয়ারও সূচনা হয়।[১২] অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের বাইরে এনে, আত্মীকরণের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের সারবস্তুকে স্বদেশের সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন এবং নবরূপায়ণ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করার প্রযত্নও দেখা যায়।[১৩] এই ভাবে বুদ্ধিজীবীর মানসক্রিয়া স্বদেশ থেকে বিশ্ব পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। জাতীয়তার সঙ্গে সর্বজনীনতাকেও শিক্ষিত বাঙালির আত্মপরিচিতির উপাদান করার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় খ্রিষ্টধর্মের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকল।

ঔপনিবেশিক কাঠামোয়, সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার শিক্ষিত সমাজে জটিল মানসিকতার সৃষ্টি হয়।[১৪] সেই পরিমন্ডলে, মিশনারি কর্মকান্ড এবং দেশীয় ঐতিহ্যের ঘাত প্রতিঘাত, ধর্ম এবং identity র ঘনিষ্ঠ যোগের একমাত্র কারণ ছিল না। ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদরাও যে ভাবে সভ্যতা এবং বর্বরতার বিভাজন করেছিলেন তার কেন্দ্রবিন্দুতেও ছিল ধর্ম।[১৫] অষ্টাদশ শতকের শেষে যে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদরা ভারতে এসেছিলেন, নিজেদের 'judeo-Christion' ঐতিহ্যের model ভারতীয় ধর্মগুলিকে উপস্থাপিত করার প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।[১৬] পাশ্চাত্য পন্ডিতদের ভারতীয় পুরাবৃত্তচর্চা, উনিশ শতকের ইংরাজিশিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মচেতনার অন্ততঃ পরোক্ষ প্রেরণার উৎস যে ছিল, তা অস্বীকার করা কঠিন।[১৭] অবশ্য, পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোতে

অবগাহন করার আগেই রামমোহন তাঁর ধর্মসংস্কার-সম্পর্কিত মূল সিদ্ধান্তে অনেকটাই উপনীত হয়েছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ এবং উদ্দেশ্যও ছিল। তবু পাশ্চাত্য পন্ডিতদের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান, এবং তাঁর ওপর এই পন্ডিতদের গবেষণা পদ্ধতির প্রভাবও বাস্তব ঘটনা।[১৮] বিশেষ করে কোলব্রুকের প্রতিই রামমোহনের শ্রদ্ধা ছিল সর্বাধিক।[১৯] যদিও রামমোহন অতীতের কোনও কল্পিত স্বর্ণযুগকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান নি, তিনি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ বা text-এ বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের অবস্থান নির্দেশ করে বেদান্ত সূত্র, উপনিষদ ইত্যাদির অনুবাদ করেন।[২০] এর ফলে রামমোহন যাকে 'হিন্দুর ধর্ম'[২১] বলেছিলেন, তার বৈচিত্র্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেন নি, সত্য। এই বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রণালী জনসাধারণের স্তরে পৌঁছেতে পারে নি, ঠিকই। কিন্তু মিশনারিরা শুধুমাত্র এদেশের ধর্মীয় আচার বা সামাজিক প্রথাকেই নৈতিক দিক থেকে সমালোচনা করেননি। যা তাঁরা হিন্দুর ধর্মতত্ত্ব বলে মনে করতেন তাও ভ্রান্ত এবং নিকৃষ্ট বলে প্রচার করতেন।[২২] সেই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্য Great Tradition-কে সাংস্কৃতিক প্রতিরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে কোনও উপায় ছিল কিনা, সেটিও ভেবে দেখার বিষয়। রামমোহনের *Brahmanical Magazine* এবং অন্যান্য রচনায় যে সমান মানদন্ড এবং মর্যাদার প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তা বিজিত জাতির আত্মমর্যাদার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।[২৩] বৈষম্যমূলক জুরি এ্যাক্টে (১৯২৬), তিনি মিশনারি ও ব্রিটিশ রাজশক্তির স্বার্থের যোগ দেখতে পেয়েছিলেন।[২৪] সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে মিশনারিরা, যে এ দেশের 'দুর্বল, দীন ও ভয়ার্ত' হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের ধর্মের নিন্দা করে নিজেদের ধর্ম চাপানর চেষ্টা করছিলেন তার জন্য রামমোহন ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[২৫] তিনি বারবার 'আমার দেশবাসী' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন[২৬]। তাঁর মানসপটে, ভারতের সুস্পষ্ট মানচিত্রে[২৭] ভারতসত্তার বা উন্মীয়মান nation-এর যে অস্পষ্ট অবয়ব ফুটে উঠেছিল, হিন্দু তার সঙ্গে সমার্থক ছিল না, একটি উপাদান ছিল মাত্র। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে।[২৮] তবে মিশনারিদের আধিপত্য প্রবণতার সঙ্গে রামমোহনের দ্বন্দ্ব এই দেশে জাতিসত্তা উন্মেষের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল।

বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নবচেতনায় নৈতিক মূল্যবোধ ছিল একটি বড় উপাদান।[২৯] নীতিবোধকে রামমোহন মানবসত্তার একটি মূল উপাদান— তার আধ্যাত্মিক চৈতন্যের প্রকাশ বলে গণ্য করতেন। এই খানে তিনি উপনিষদ এবং খ্রিষ্টোপদেশ উভয় দ্বারাই বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন,[৩০] নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিকতার জটিল সম্পর্ক আজ ইতিহাস গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু।[৩১] জাতি, বর্ণ, দেশ কালের গণ্ডী অতিক্রম করে রামমোহন যে সার্বভৌম ভিত্তির উপর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে যিশুর বিশ্বভ্রাতৃত্ব, নৈতিকতা আর প্রেমের বাণীর সঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের সারবস্তুর সমন্বয় সংঘটিত হয়।[৩২] এই ভাবে আধুনিক বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যুক্তিনিষ্ঠ syncretic

identity-র সূত্রপাত রামমোহন করেন। ঔপনিবেশিক খ্রিষ্টধর্ম যে সীমা আরোপ করেছিল, বৌদ্ধিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তা অতিক্রম করার উত্তরাধিকার রামমোহন রেখে গেছেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে শিষ্টাচার সম্মত ব্যবহারও যে রামমোহন এই identity র অঙ্গ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর 'Humble suggestions to my Countrymen' শীর্ষক রচনায়।[৩৩]

উনিশ শতকে মিশনারি বিরোধিতার আরও একটি ধারা ছিল— তা সহিংস, অসহিষ্ণু উগ্র। বেশির ভাগ প্রকাশ ঘটেছিল গ্রাম বাংলায়। মিশনারিরা বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ ছাড়াও দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, জমিদারি এবং অন্যান্য কায়েমী স্বার্থে আঘাত করেছিলেন।[৩৪] ধর্মান্তরিতের ধানের গোলা জ্বালানো বা ধর্মপ্রচারককে হত্যা সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থ প্রণোদিত।[৩৫] রামমোহন প্রবর্তিত ধারা থেকে এই ধারাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

তত্ত্ববোধিনী সভা এবং পত্রিকায় রামমোহন প্রবর্তিত ধারার ক্রমবিকাশ এবং রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়।[৩৬] খ্রিষ্টধর্ম সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের অনীহা থাকলেও, শিশির কুমার দাস তাঁর ধর্মোপদেশেও বাইবেলের ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।[৩৭] হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অংশকে এক প্ল্যাটফর্মে আনায় আলেকজান্ডার ডাফের Catalyst এর ভূমিকা সকলের জানা।[৩৮] *সংবাদ প্রভাকরের* ভূমিকা তুলনামূলক ভাবে কম আলোচিত। *প্রভাকর* ১৮৫৩ সালে লেখে 'রাজা ঐ ঈশুধর্ম ঘোষকদিগের তোষক ও পোষক হওয়াতে ইহারা সর্বশোষক হইয়াছে[৩৯]।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে মিশনারি বিরোধিতা বুদ্ধিজীবীদের এক অংশের মানসিকতায় আরও একটি মাত্রা যোগ করল।[৪০] রাজনারায়ণ বসুর ১৮৭২ এর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা শীর্ষক বক্তৃতার কিছু পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'হিন্দু জাতির ঐক্যসাধন' প্রবন্ধ প্রকাশিত হল।[৪১] ১৮৮১ তে রাজনারায়ণ লেখেন *বৃদ্ধ হিন্দুর আশা*-সেখানে যাকে মহা হিন্দু সমিতির কল্পনা।[৪২] সকল ধর্মের সাধারণ ভিত্তিভূমির উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করে রামমোহন সামাজিক সংহতির স্বপ্ন দেখেছিলেন।[৪৩] সেই ব্রাহ্ম সমাজের এক অংশ, উনিশ শতকের আশির দশক থেকে হিন্দু সংহতির কথা ভাবতে শুরু করেন। যদিও সেই যুগে তাতে রাজনৈতিক রঙ লাগে নি।[৪৪] অবশ্য রাজনারায়ণেরও 'What is Brahmoism' শীর্ষক বক্তৃতায় খ্রিষ্টধর্মের সার সংকলিত ছিল।[৪৫] syncretic এবং সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি রাজনারায়ণও, সম্প্রদায় সচেতনতার পাশাপাশি অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন।

যে তিন মহাশুদ্ধাত্মা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ রোপন করেছেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছিলেন, যিশুখ্রিষ্ট তাঁদের একজন।[৪৬] কিন্তু ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে রেভঃ হেষ্টিস পৌত্তলিক ক্রিয়াকান্ড উপলক্ষ্য করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মতত্ত্বকে আক্রমণ করলে, বঙ্কিমের সঙ্গে

তাঁর মসীযুদ্ধ শুরু হয়।[৪৭] শাসকজাতির একজন, দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মান দেখালে, আবার সাংস্কৃতিক প্রতিরক্ষা ধর্মের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এর পর থেকে বঙ্কিমের রচনায় একটি দ্বৈত ভাব প্রকাশ পেতে থাকে, যা তিনি নিজেই 'কোন পথে যাইতেছি' প্রবন্ধে আলোচনা করেন।[৪৮] একদিকে তিনি হিন্দুধর্মের শাঁস আর খোসার মধ্যে পার্থক্য করেন, তার 'বখামি' গুলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।[৪৯] অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে উৎসাহী হয়ে পড়েন। ১৮৮৮-তে প্রকাশিত ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে হিন্দুধর্মই একমাত্র সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ ধর্ম বলে বঙ্কিম অভিমত প্রকাশ করেন।[৫০] এখানে তিনি খ্রিষ্টান তাত্ত্বিকদের fulfilment theory হিন্দুধর্মের সপক্ষে ব্যবহার করেন।[৫১] কিন্তু, বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের গভীরে গেলে দেখা যায় যে, সেখানে ভাগবত গীতার সঙ্গে মিশে আছে মিল ফিক্তে, কান্ট, কোঁত এবং বিশেষ করে সীলী।[৫২] ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্মের সাদৃশ্যের কথাও বলেছেন।[৫৩] শেষপর্যন্ত Religion of Culture বা অনুশীলন এবং নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রীতি আর জাগতিক প্রীতির সামঞ্জস্য হয়েছে।[৫৪] উপনিবেশিক খ্রিষ্টধর্মের আরোপিত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য হিন্দু, স্বজাতি/স্বদেশ, বিশ্বমানবতা— identityর এই ধাপে ধাপে উত্তরণের প্রয়াস বঙ্কিমের মধ্যেও ছিল। Syncretism বঙ্কিমের চিন্তায় যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত। অথচ, উনিশ শতকের শেষ দুই দশকের জাতিবৈর, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিমন্ডলের জটিলতা তাকে ধর্মতত্ত্বে থেমে থাকতে দেয়নি। ১৮৯২ সালে গ্রন্থাকারে কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের 'সর্বগুণান্বিত সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য' কৃষ্ণ মানুষের পূর্ণাঙ্গ আদর্শের প্রতিমূর্তি।[৫৫] একদিকে এই কৃষ্ণ যিশুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু self-assertion এর সারসংক্ষেপ। অন্যদিকে কৃষ্ণ সমসাময়িক পাশ্চাত্যের মানবতাবাদে সিঞ্চিত যিশুর ভাবমূর্তির মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত।[৫৬] J. R. Seeley র Ecce Homo র নৈতিকতা এবং রাজনীতি সমন্বিত খ্রিষ্টের আদর্শের সঙ্গে কৃষ্ণচরিত্রের কৃষ্ণের সাদৃশ্য চোখে না পড়ার নয়।[৫৭]

বঙ্কিমের সমসাময়িক শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ উপলবদ্ধির আলোয় সকল ধর্মাদর্শকে সমান সত্য বলে চিনে, সমকালের ধর্মমত বিরোধ সংক্রান্ত tension এর নিজের মত সমাধান করে নিয়েছিলেন।[৫৮] শ্রীরামকৃষ্ণ বুদ্ধিজীবী নন, syncretist ও নন। কিন্তু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কেশব চন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর ভাববিনিময় তাৎপর্যপূর্ণ।[৫৯]

সম্ভবতঃ উনিশ শতকে কেশব সেন এবং তাঁর সহযোগী প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার খ্রিষ্টধর্ম এবং ধর্মপ্রচারকদের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।[৬০] কিন্তু চিন্তার ক্রমবিকাশের পরিণত স্তরে, কেশব সেন সর্বজনীন দৃষ্টি নিয়ে নিজেকে সব ধর্ম থেকে সমান দূরত্বে রেখেছিলেন।[৬১] দেশবাসীর জন্য তিনি খ্রিষ্টধর্মের সারবস্তু গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।[৬২] আর ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অন্বয়ের মাধ্যমে খ্রিষ্টের নীতির সর্বজনীন দিকটা উজ্জ্বলতর করার ইঙ্গিত তিনি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের দিয়েছিলেন।[৬৩] খ্রিষ্টধর্মের সমাজহিতৈষণার নীতি

তিনি নিজে শুধু কাজে পরিণত করেন নি খ্রিষ্টধর্মের মূলসুর অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেম এবং মানবপ্রেমের সঙ্গে আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয়দের আত্মিক যোগের কথাও বলেছিলেন।[৬৪] নামে মাত্র খ্রিষ্টান, এমন কিছু মিশনারি পাঠিয়ে ইংলন্ড যে তাঁর দেশবাসীর ক্ষতি করছে। সে কথাও অবশ্য বলতে ভোলেন নি।[৬৫] রামমোহনের মত তিনিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, খ্রিষ্টধর্ম জন্মসূত্রে এবং প্রারম্ভিক ঐতিহ্যের দিক দিয়ে প্রাচ্যদেশীয়। এই রূপেই ভারতে খ্রিষ্টসত্যের প্রসার সম্ভব। Euro centric খ্রিষ্টধর্ম এবং বিজাতীয় আচার-ব্যবহার প্রবর্তনের ভ্রান্তি তিনি দেখিয়ে দেন।[৬৭]

প্রতাপ মজুমদারও ভারতীয় ঐতিহ্য ও চিন্তাপ্রণালী অনুযায়ী খ্রিষ্টনীতির ব্যাখ্যার প্রয়োজনের কথাটি ম্যাক্সমূলারকে লেখেন।[৬৮] বাইবেলের রূপকল্পে সুস্পষ্ট প্রাচ্য ছাপের উল্লেখ করে, মজুমদার অনুযোগ করেন যে ইউরোপীয় মিশনারিরা নিজেদের ছাঁচে খ্রিষ্টধর্মকে ঢেলে, ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের দুই সংস্কৃতির মাঝে ত্রিশঙ্কু করে রাখার চেষ্টা করছে।[৬৯] প্রতাপচন্দ্র তাঁর Oriental Christ-এ ভারতীয় ঐতিহ্যের আলোয় যিশুকে প্রকাশ করেছিলেন।[৭০] এক দিকে, ইউরোপীয় মিশনারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত যিশুর ভাবমূর্তি যে ভারতীয়দের মর্মমূলে পৌঁছাতে পারবে না, সে কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'It is a national ideal only that can touch the undercurrents of national trust and aspirations.'[৭১] অন্যদিকে, বিশ্বের বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর পারস্পারিক ঋণ স্বীকারের মধ্যেই যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সাফল্য, সে কথা ম্যাক্সমূলারকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন।[৭২] ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু এবং খ্রিষ্টান আদর্শের সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন।[৭৩] আবার ১৮৭২ এর ব্রাহ্মসমাজের মতদ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে, ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাব এবং তার কাঠামোর পার্থক্য দেখিয়ে ধর্মমত যে জাতীয়তার সঙ্গে সম্পৃক্ত না, সেই কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৭৪]

বাংলার এবং দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও খ্রিষ্টান বুদ্ধিজীবী কেশব সেন বা প্রতাপ মজুমদারের আদর্শ থেকে কিছু অনুপ্রেরণা পেলেও[৭৫] তাঁদের আত্মজিজ্ঞাসা ছিল মূলত স্বতঃস্ফূর্ত। ইউরোপীয় মিশনারিদের কর্মপ্রণালী এবং খ্রিষ্টধর্মের পাশ্চাত্যকরণের তাঁরাও বিরোধিতা করেন। এই প্রসঙ্গে চারজন বাঙালি খ্রিষ্টান বুদ্ধিজীবী— কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আলোচনা এসে পড়ে।[৭৬]

কৃষ্ণমোহন, লালবিহারী এবং কালীচরণের কৈশোর দারিদ্রের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু পার্থিব প্রাপ্তির আশায় তাঁরা ধর্মান্তরিত হন নি; হয়েছিলেন, নিজেদের বিশ্বাস থেকেই।[৭৭] এঁদের মুক্তমন ভারতে চার্চের ওপর বিদেশী মিশনারিদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারে নি। বাংলার নবচেতনার রসে সিক্ত এই মানসিকতায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সঙ্গে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল।

বর্ণগত বিভেদের বিরুদ্ধে ভারতীয় খ্রিষ্টানদের অধিকার রক্ষার জন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৮ সালে Bengal Christian Association এর সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।[৭৮] ১৮৬৯ সালে রেভঃ লালবিহারী দে, ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত United National Church of Bengal এর প্রস্তাব আনেন। Mission Council-এ ভারতীয় ধর্মযাজকরা সমান মর্যাদা পেতেন না। তাই ভারতীয় খ্রিষ্টানদের স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি দাবি করে লালবিহারী দে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ identity-র প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ইউরোপের denominational বা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের বাইরে তাদের রাখার প্রস্তাব দেন। পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার করলে ক্যাথলিকদেরও ঐ জোটে ঢোকাতে আপত্তি করেন না।[৭৯] stephen Neill এর মতে স্কটল্যান্ড থেকে প্রেরিত অর্থ তহবিলের পরিচালনা করাই ছিল মিশন কাউন্সিলের প্রধান কাজ। ভারতীয় ধর্মযাজকরা এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ঠিক এই খানেই যে ভারতীয় খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের অনুভবশীল অংশের আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল, বিদেশী ধর্মপ্রচারক বা কিছু ঐতিহাসিক হয় তা, বুঝতে পারেন নি বা বুঝতে চান নি।[৮০] খ্রিষ্টধর্মের মূল্যবোধে সম্পূর্ণ আস্থাশীল লালবিহারী দে তাঁর 'Searching of Heart' শীর্ষক বক্তৃতায় মিশনারি ও ধর্মান্তরিতদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কের অভাবের ইঙ্গিত দেন।[৮১] দেশবাসী যে খ্রিষ্টধর্মকে বিদেশী শাসকের ধর্ম ভেবে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তার জন্য তিনি বিদেশী মিশনারিদের দায়ী করেন।[৮২]

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও খ্রিষ্টধর্মের বিদেশী পোষাক খুলে নেওয়ার কথা বলেন।[৮৩] তিনি *Bengal Christian Herald*-এ ১৮৭০-এ লেখেন, 'In having become Christians we have not ceased to be Hindus. We are Hindu Christians. .. We have embraced Christianity but we have not discarded our nationality.[৮৪] এইখানে তিনি ethnic অর্থে হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ethnicity এবং জাতীয় পরিচিতি যে ধর্মাদর্শ থেকে স্বতন্ত্র, তাই তিনি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন। আবার, নগর সংকীর্ত্তন ইত্যাদি প্রচলন করে খ্রিষ্টধর্মের ভারতীয় করণে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন।[৮৫]

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জে. সি. সোম প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টসমাজে লালবিহারীর স্বপ্ন কিছুটা সার্থক হয়।[৮৫ক] তবে স্বাধীন চার্চের এই আন্দোলন অর্থের অভাবে বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। উচ্চবর্গের স্বচ্ছল মানুষদের পক্ষেই বিদেশী মিশনারি নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করে খ্রিষ্টসমাজের সদস্য হওয়া সম্ভব ছিল।[৮৬] অধিকাংশ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষ। সম্ভবত ধর্মান্তরিত হয়ে তাঁরা সামাজিক, অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির আশা করেছিলেন। স্বাধীন সত্তার প্রশ্ন যে স্বনির্ভরতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভবে জড়িত। এ বিষয়ে Calcutta Christian Observer-এ অনেক আলোচনা আছে।[৮৭] সম্ভবত এই সমস্যার আজও সমাধান হয় নি।

কৃষ্ণমোহন বা কালীচরণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলস্রোতে যোগ দিয়ে, ভারত সভার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারতীয়দের জন্য রাষ্ট্রিক অধিকার দাবি করেন।[৮৮] তাঁরা দেখাতে পারেন যে, ধর্মবিশ্বাসে অবিচল থেকেও তাঁদের দেশাত্মবোধ প্রশ্নাতীত।

খ্রিষ্টধর্মের দেশীয়করণ প্রক্রিয়াকে তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতীয় খ্রিষ্টতত্ত্ব গঠন করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। কৃষ্ণমোহন সেখানে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এক সময়ের হিন্দুধর্মদ্বেষী কৃষ্ণমোহন ১৮৭৫ সালে তাঁর Arian Witness-এ দেখান যে বেদে যার ইঙ্গিত বাইবেলএ তার অভিব্যক্তি হয়েছে।[৮৯] The Relation Between Christianity and Hinduism (১৮৮০) পুস্তিকায় খ্রিষ্টধর্মকে তিনি বৈদিক ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ হিসেবে তুলে ধরেন।[৯০] যদিও এখানে পাশ্চাত্যের Liberal Christianity প্রভাব এবং জে- এন্. ফারকুহারের Crown of Hinduism এর পূর্বাভাস আছে এবং বিবর্তনে খ্রিষ্টধর্মকে উন্নততর স্থান দেওয়া হয়েছে, লক্ষণীয় যা, তা হচ্ছে, খ্রিষ্টধর্ম যে ভারতে সম্পূর্ণ বহিরাগত না, তা তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই শিকড় সন্ধানকে শুধুমাত্র খ্রিষ্টধর্মের স্বার্থরক্ষার দিক থেকে দেখা ঠিক হবে না। কৃষ্ণমোহন নিজে, এই ধর্মতত্ত্বচর্চাকে দেশের সম্মান, তাঁর ভাষায় 'patriotic honour' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত দেখতে চেয়েছিলেন।[৯১]

শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে না। চরমপন্থার জাতীয়তাবাদের সঙ্গেও খ্রিষ্টধর্মকে যে মেলানো সম্ভব তা দেখিয়েছিলেন —ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।[৯২] এই কাজ তিনি করেছিলেন এমন সময়, যখন কোনও কোনও মিশনারি, খ্রিষ্টধর্মকে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সচেষ্ট ছিলেন।[৯৩] দোলাচলপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মবান্ধবের। তিনি তাঁর কাকা কালীচরণের মত আত্মস্থ ছিলেন না। তবে, দীর্ঘ সাত বছর চিন্তা করে, প্রত্যয় থেকেই তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সঠিক নৈতিক এবং সুস্থ ধর্মীয় দৃষ্টি স্বদেশ প্রেমের সহায়ক। উপাধ্যায়ের মতে খ্রিষ্টধর্মের ভারতীয়করণ সম্পন্ন না হলে এ দেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের আর আশা নেই।[৯৪] এই চেতনা থেকে তিনি বিদেশী মিশনারিদের অংশবিশেষকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ বলে চিনেছিলেন এবং সেই দৃষ্টি বহির্বিশ্বে, যেমন চীনের বক্সার বিদ্রোহ পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন।[৯৫] ১৯০৭ সালে জীবনের শেষ প্রান্তে রাজদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত হয়ে, তিনি বিদেশী প্রভুর আদালতের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিলেন।[৯৬] একই অনমনীয় ভাব তিনি দেখিয়েছিলেন অন্তিমকালে। হাসপাতালে ভর্তির সময় রেজিস্টারে তাঁর ধর্ম উল্লেখ করার জন্য বারবার অনুরোধ এলেও, নিরুত্তর থেকে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন স্বদেশীর উত্তেজনায় খ্রিষ্টধর্ম তিনি ত্যাগ করেন নি।[৯৭] এর আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ধর্মান্তর তাঁর প্রায়শ্চিত্তের কারণ নয়। বিদেশে বিদেশের সঙ্গে

মেলামেশা, এবং সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন তাঁর প্রায়শ্চিত্যের কারণ[৯৮] তিনি অবশ্য হাসপাতালের রেজিস্টারে caste এর সারণীতে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।[৯৯]

ক্যাথলিক ধর্মের সর্বজনীন কাঠামোর মধ্যে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে খ্রিষ্টান সমাজের ভারতীয় অবয়ব ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।[১০০] নিজেকে বলতেন হিন্দু ক্যাথলিক খালি পা, পরণে সন্ন্যাসীর আলখাল্লা।[১০১] ব্রহ্মবান্ধব বলতেন জন্মসূত্রে, চিন্তাপ্রণালীতে, সামাজিক আচার-বিচারে তিনি হিন্দু। এগুলির এবং ধর্মবিশ্বাসের পৃথক অস্তিত্বের ওপর জোর দিতেন।[১০২] আবার আর্যগৌরবের মোহমুগ্ধ উপাধ্যায় বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথাও বলতেন।[১০৩] হয়তো, ইংরেজ শাসকের প্রতি বিদ্বেষ থেকে, পশ্চিমের প্রতিযোগিতা মূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করতে বর্ণাশ্রমকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।[১০৪] কিন্তু শুধুমাত্র আদর্শায়িত বর্ণভেদ নয়, বাস্তবেও ব্রাহ্মণ্য গর্ব ক্রমশ: ব্রহ্মবান্ধবের ব্যক্তিত্বকে আচ্ছাদিত করেছিল। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনসিদ্ধি এই ক্ষেত্রে একমাত্র সক্রিয় কারণ ছিল না। এই ব্যাপারে পিতামহীর প্রভাব তাঁর চৈতন্যের গভীরে চলে গিয়েছিল।[১০৫]

ব্রহ্মবান্ধব শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের সম্পর্ক স্থাপন করার প্রচেষ্টাই নেন নি, ব্রাহ্মণ্য সামাজিক কাঠামোর প্রবল সমর্থক রূপেও নিজেকে পরিচিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ব্রহ্মবান্ধব রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, বৈদান্তিক।[১০৬] তিনি বেদান্তের ভিত্তিতে ভারতীয় খ্রিষ্টতত্ত্ব নির্মাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[১০৭] অথচ বেদান্তের আত্মার দেবত্ব বা divinity এবং খ্রিষ্টধর্মের ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা বা dignity of human person — এই দুই আদর্শের মেলবন্ধন করে তার বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনার দিকে কোনও মনোযোগ দেন নি। অধিকন্তু, স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গবিক্ষোভে আন্দোলিত ব্রহ্মবান্ধব, তাঁর ভারতীয় খ্রিষ্টতত্ত্বে, খ্রিষ্টান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের মানুষদের আশা আকাঙ্ক্ষা, এবং স্বতন্ত্র ঐতিহ্য উপেক্ষা করলেন।[১০৮] ভবিষ্যতের দলিত খ্রিষ্টতত্ত্বে ব্রহ্মবান্ধবের অবদান থাকল না। যে *সন্ধ্যা স্বরূপের* সম্পাদক অল্পশিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্তের দুয়ারে স্বদেশী আন্দোলনের আহবান পৌঁছে দিচ্ছিলেন।[১০৯] তিনি কিন্তু এই ব্যাপারে পূর্বসূরীদের থেকে অগ্রসর হতে পারলেন না।

অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তার সূত্রগুলি জুড়ে নিলে যে দর্শনটি ফুটে ওঠে, সেখানে, ভবিষ্যতে যাকে ' pluralistic inclusivism ' বলা হয়েছে, তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।[১১০] তিনি বেদান্ত এবং St-Thomas এর ভাবনার সাদৃশ্যই শুধু দেখানর চেষ্টা করেন নি। তাদের সমতাপূর্ণ সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মের বিবর্তনে বেদান্ত বা বাইবেল কোনটিকেই তিনি চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব দেন নি।[১১১] কৃষ্ণমোহনের থেকে

তিনি এখানে এগিয়ে গেছেন। একদিকে তিনি ভবিষ্যতের সমন্বয়বাদী Christologistদের, বিশেষ করে Re-thinking Christian গোষ্ঠীর জন্য উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।[১১২] এরই সমান্তরালে বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্যও তাঁর প্রেরণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

উপসংহারে বলতে চাই, ঔপনিবেশিক কাঠামোর হিন্দু খ্রিষ্টান আদান প্রদান শাসক শাসিতের দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই ভাব-সংঘাত একদিকে বিদেশী আধিপত্য বিরোধিতা এবং জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ম দেয়। অন্যদিকে এই আদান প্রদানের ফলে, ভারতে আরও একটি ইতিবাচক সমন্বয়বাদী ধারারও উন্মেষ হয়। খ্রিষ্টধর্মকে অন্যান্য ঐতিহ্যের মূল্যায়নের মানদন্ড করার প্রবণতার বিরোধিতা রামমোহনের সময় থেকেই শুরু হয়। একই সঙ্গে যুক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবতাবাদের একটি সর্বজনীন মানদণ্ড ব্যবহার করার মানসিকতারও জন্ম হয়। খ্রিষ্টধর্মের ভারতীয়করণ এবং ভারতীয় ধর্মচিন্তায় খ্রিষ্টধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব— এই পারস্পরিক ভাববিনিময় উনিশ শতকের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। হিন্দুধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্মের যে dialogue ভারতে রামমোহনকে দিয়ে শুরু, আজ আন্তর্জাতিক স্তরে খ্রিষ্টান বেদান্ত বা বৈদান্তিক খ্রিষ্টধর্ম ইত্যাদি ধারণার মধ্য দিয়ে তা অনেক অগ্রসর হয়েছে। আস্রাবণ দু'দিক থেকেই হচ্ছে।[১১৩]

উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে নতুন করে খ্রিষ্টধর্মের দেশীয়করণের প্রস্তাব আমাদের বিস্মিত করেছে। দীর্ঘ সহাবস্থান এবং আদান প্রদানের ফলে যে সমন্বয়বাদী চেতনা গড়ে উঠেছিল, তার বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে।

সূত্র নির্দেশ

(১) (ক) A. T. Embree, *Utopias in Conflict; Religion and Nationalism in Madern India,* California 1990.

(খ) Peter Van Der Veer, *Religious Nationalism Hindus and Muslims in India*, California 1994.

(গ) S Tonnesson and H. Antlöv (ed), *Asian Forms of the Nation*, Surrey 1996.

(ঘ) G. D. Sontheimer and H. Kulke (ed), *Hinduism Reconsidered,* New Delhi, 1997: Romila Thapar, 'Syndicated Hindusim; R. E. Frykenberg, 'The Emergence of Modern Hinduism as a Concept and as an Institution.

(ঙ) A. Copley, *Religion in conflict: Ideology, Cultural Contact and Conversion in Late Colonial India*. Delhi 1997.

(চ) G. A. Oddie, *Religious Conversion Movements in South Asia Continuities and Change 1800-1990*, Surrey 1997.

(ছ) W. Radice (ed), *Swami Vivekananda and the Madernization of Hinduism,* Delhi 1998.

(জ) Peter V. D. Veer (ed), *Nation and Religion*, Princeton 1999: Partha Chatterjee, 'On Religious and Linguistic Nationalism: The Second Partition of Bengal.'

(২) *The Times of India*, 24 January, 1999.
The Asian Age, 30 Jan., 1999.
The Hindu, 21 May, 1999.
The Hindustan Times, 18 Oct., 1999.
The Statesman, 9 January, 2001.

(২ক) *The Statesman*, 5 November, 2000.

(৩) Kaj Bago, *Pioneers of Indigenous Christianity*, Bangalore and Madras 1969.

(৪) Stephen Neill, *A History of Christianty in India*, Cambridge (reprint), 1985, vol. I. Chapter II , 26–49. C. P. Mathew and M. M. Thomas, *The Indian Churches of St. Thomas*, Delhi 1967.

(৫) স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস* (১৮২৬ — ১৮৫৬), কলিকাতা ১৯৮৫, পৃ. ১, ১০৪। ইদানীং কালে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মজিজ্ঞাসায় জাতি, ধর্মের ভূমিকা নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হচ্ছেঃ Martin E Marty and Appleby (ed), *Religion, Ethnicity and self-Identity.*

(৬) G. Macpherson, *Life of Lal Behari Day,* Edinburgh, 1900, p. 42.

(৭) Sisir Kumar Das, *Shadow of the Cross,* New Delhi 1973. Arabinda Poddar, *Renaissance in Bengal: Search for Identity*, Simla 1977.

(৮) Nemai Sadhan Bose, Nisith Ranjan Roy (ed), *A Descriptive Classified Catalogue of Christian Missionary Records in Calcutta*, vol. I, Calcutta 1986; M.A. Sherring, *The History of Protestant Missioneries in India*, London 1884; P. Thomas, *Christians and Christianity in India and Pakistan,* London 1954; E.D. Potts, *British Baptist Missionaries in India*, Cambridge 1967; K. P. Sengupta, *The Christian Missionaries in Bengal*, Calcutta 1971; Abhijit Datta, *Nineteenth Century Bengal society and the Christian Missionaries,* Calcutta, 1992.

(৯) এই সম্পর্কের জটিলতা সম্বন্ধীয় বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য: Gerald studdert Kennedy,

Providence and the Raj, Imperial Mission and Missionary Imperialism, New Delhi, 1998.

(১০) এই সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Andrew Porter, 'Religion and Empire : British Expansion in the Long Nineteenth Centrury 1780–1914' in *The Journal of Imperial and Commonwealth History,* vol. 20, No. 3 Sept. 1992.; Penelope Carson, 'An Imperial Dilemma : The Propagation of Christianity in Early Colonial India,' in *The Journal of Imperial and Commonwealth History,* vol XVIII, No. 2 May 1990.

(১১) Tapan Raychaudhuri, *Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*, Delhi 1988, 'The Background;' Wilhelm Halbfass, *India and Europe: An Essay in Understanding,* New York 1988, p 221

(১২) R. Panikkar, *The Unknown Christ of Hinduism,* London 1964.; S. J. Samartha, *The Hindu Response to the Unbound Christ,* Madras 1974; Kalidas Nag, Debajyoti Barman (ed), *The Englishworks of Rammohan Roy*, Part IV Letter to a Gentleman of Baltimore, 1822, p 86.

(১৩) G. A. Oddie (ed), *Religious Traditions in South Asia : Interaction and Change*, Surrey 1998. p 6.

(১৪) K N. Panikkar, *Culture, Ideology, Hegemony : Intellectuals and social consciousness in colonial India*, New Delhi 1995, pp 19, 20, 24, 25.

(১৫) V. D. Veer (ed), *Nation and Religion*, Susan Bayly, 'Race in Britain and India', p. 73.

(১৬) P.J. Marshall (ed), *The British Discovery of Hinduism in the Eighteenth Century,* Cambridge 1970, p. 20; 'they created Hinduism in their own image, p. 43.

(১৭) দিলীপ কুমার বিশ্বাস, *রামমোহন সমীক্ষা,* কলিকাতা ১৯৮৩, পৃ. ২৭১।

(১৮) তদেব, পৃ ২২৩, ২২৬।

(১৯) তদেব, পৃ ২২৮, ২৩৯। দ্রষ্টব্য: H. T. Colebrooke, *Miscellanceous Essay*, vol. I, Madras 1872, 'On the Vedas', p. 9, 'On the Vedanta', p 371, 'On the Religious Ceremonies of the Hindus', p 196.

(২০) দিলীপ কুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩২। S. D. Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Calcutta 1962, pp 98-99.

(২১) অজিত কুমার ঘোষ (সম্পা), *রামমোহন রচনাবলী,* কলিকাতা ১৩৮০, *ব্রাহ্মণ সেবধি,*

'ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সম্বাদ,' সং ১ পৃ ২৩৪। D. Killingley, *Rammohun in Hindu and Christian Traditions,* Newcastle upon Tyne 1993, p. 62.

(২২) এই বিষয়ে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের ভূমিকার জন্য দ্রষ্টব্য, দিলীপ কুমার বিশ্বাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ ২২২।

(২৩) Kalidas Nag and Debajyoti, Burman, *The English Works of Raja Rammohun Roy,* Calcutta 1946, Part II, *The Brahmanical Magazine.* I.; *English Works*, Part V, 'An Appeal to the King in Council, pp 19-20.

(২৪) Dilip Kumar Biswas, *The Correspondence of Raja Rammohun Roy*, vol. I, Calcutta 1992, Rammohun to J. Crawford, Aug 18, 1828, pp 403-405.

(২৫) *ব্রাহ্মণ সেবধি*, পৃ ২৩

(২৬) দ্রষ্টব্য, *রামমোহন রচনাবলী* এবং *English Works* এর বিভিন্ন অংশ।

(২৭) *The English Works,* Part II, p 3, 'A Brief Preliminary sketch of the Ancient and Modern Boundaries and the History of that country.'

(২৮) *The English Works,* Part V, pp 65-66.

(২৯) Sisir Kumar Das, *op. cit*, Preface, p X.

(৩০) দিলীপ কুমার বিশ্বাস, *পূর্বোক্ত* পৃ ৩৫৪, *The Correspondence of Raja Rammohun Roy,* Letter to Henry Ware, 281; *English Works,* Part V, Calcutta 1948, *The Precepts of Jesus: The Guide to Peace and Happiness*; The English Works Part II, *The Abvidgement of Re-vedanta,* p 70, কঠোপনিষদ, মুণ্ডক এবং কেনোপনিষদের অনুবাদের ভূমিকাতেও এই নীতিবোধের কথা আছে।

(৩১) Ross Poole, *Morality and Modernity*, London 1991.

(৩২) Monier-williams, *Religious Life and Thought in India*, London 1883, pt I, p. 484; D. Biswas (ed.), *The Correspondence of Raja Rammohun Roy,* vol I, pp 66-68: Rammohun's letter to Rev. Jared sparks, Oct, 17. 1820, এখানে রামমোহন যিশু খ্রিষ্টর সর্বজনীন খ্রিষ্টধর্ম এবং মিশনারি প্রচারিত ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

(৩৩) *The English Works,* Part II : *Humble suggestions to My Countrymen who Believe in the One True God*, pp. 199–201.

(৩৪) Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities 1833–1857,* Chittagong 1965, Preface p VII; G. A. Oddie, *Social Protest in India*, New Delhi, 1979.

(৩৫) Mohar Ali, *তদেব* pp. 86, 137.

(৩৬) বিনয় ঘোষ (সম্পা), সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬৩।

(৩৭) শিশির কুমার দাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ ৮১।

(৩৮) *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, ২২ সংখ্যা, সম্পাদকীয় ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৭ শক, ২৩ সংখ্যা, ১ আষাঢ় ১৭৬৭ শক, অলোক রায়, *আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অনুগামীকয়েকজন*, কলিকাতা ১৯৮০, ২৬-২৭ Alexander Duff, *India and Indian Missions*, Edinburgh 1840.

(৩৯) সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, ১৯৬২, *সংবাদ প্রভাকর*, সম্পাদকীয় ৯ বৈশাখ, ১২৬০।

(৪০) *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* আশ্বিন ১৭৯৮ শক, ৩৯৮ সংখ্যা, 'স্বদেশানুরাগ'ঃ এখানে হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং বঙ্গভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে ঐক্য সম্পাদনের আলোচনা আছে।

(৪১) *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ ১৮০২ শক, ৪৪২ সংখ্যা ঃ 'প্রথমে ধর্মের একতা। ইহাই অন্যান্য সকল ঐক্যের মূল'।

(৪২) রাজনারায়ণ বসু , *বৃদ্ধ হিন্দুর আশা* (দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা ১২৯৯) পৃ ১৩, রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত* (কলিকাতা ১৩৫৯), পৃ ৯২।

(৪৩) S. D. Collet, *The Life and Letters of Raja Rammahun Roy* Appendix IV, 'The Trust Deed of the Brahmo Samaj, p. 471.

(৪৪) *Journal of History*, vol IV, 1983, Papia Chakravarty, 'Nationalism of Rajnarain Bose and Nabagopal Mitra : Ideology of Hindu Union in the Nineteenth Century.

(৪৫) রাজনারায়ণ বসু *আত্মচরিত*, পৃ ১৪৭।

(৪৬) *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৮০, 'সাম্য', পৃ ৩৮২।

(৪৭) *Bankim Rachanavali* (English) edited by Jogesh Chandra Bagal, Calcutta 1969. Letters to the Editor of The *Statesman*, from September to November, 1882; Bankim Chandra Chatterjee, 'Letters on Hinduism, pp. 227–269.

(৪৮) *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম', পৃ ৭৯২।
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী*, কলিকাতা ১৯৯১, পৃ ৬৯৬।

(৪৯) বঙ্কিম হেস্টির মসীযুদ্ধ, *The Statesman*, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ ৫৯০, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড 'ধর্মতত্ত্ব' পৃ ৬০৫, ৬৩৮।

(৫০) *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, 'ধর্মতত্ত্ব' পৃ ৫৯৬।

(৫১) Eric J. Sharpe, *Not to Destroy But to Fulfil*, uppsal 1965, p. 260 : J. N. Farguhar উনিশ শতকের শেষ দশকে যে fulfilment thesis টি বহুল প্রচারিত

করেছিলেন, তা আরও আগে পাশ্চাত্যদেশে ম্যাক্সমূলার এবং মনিয়ার উইলিয়ামস্ এবং ভারতে মিশনারি বিতর্কে T. E. Slater এবং F. W. Kellett প্রচলিত করতে সাহায্য করেছিলেন, Halbfass, পূর্বোক্ত p. 51 : অনেক আগে Nobili এই ব্যাপারে ইঙ্গিত দেন।

(৫১) 'ধর্মতত্ত্ব', পৃ ৬৪৯, ৬৫৩, ৬৭৩-৬৭৬, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ ৬৪৭, ৬৫৩।

(৫৩) 'ধর্মতত্ত্ব', পৃ ৫৯৬, ৬৭৫, Sisir Kumar Das, *The Artist in Chains, The Life of Bankim Chandra Chatterjee*, New Delhi 1984, p. 166.

(৫৪) 'ধর্মতত্ত্ব', পৃ ৫৯১, ৬৬১ : 'দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই'।

(৫৫) *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, 'কৃষ্ণচরিত্র,' পৃ ৪০৭।

(৫৬) Sisir K. Das, *The Artist in Chains,* p. 163–164; M. M. Thomas, *The Acknowledged. Christ of the Indian Renaissance,* London 1969.

(৫৭) 'ধর্মতত্ত্ব', পৃ ৬৭৫; এখানে বঙ্কিম বিশেষ করে সীলীর Ecce Homo এবং Natural Religion এর কথা বলেছেন, J. R. Seeley, *Ecce Homo: A survey of the Life and work of Jesus Christ*, 1865, Preface to the 5th edition, p. 9.

(৫৮) *শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত*, শ্রীম কথিত প্রথম ভাগ, কলিকাতা ১৩৮২, পৃ ২১।

(৫৯) W. Halbfass, পূর্বোক্ত, পৃ ২২৭, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, *পরমহংস রামকৃষ্ণ*, কলিকাতা ১৯৪৯।

(৬০) M. M. Thomas, *The Acknowledged Christ of the Indian Renaissance*, pp. 93, 94, 95; David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Madern Indian Mind,* Princeton 1979, p. 19.

(৬১) Kanailal Chattopadhyay, *Brahmo Reform Movement*, Calcutta 1983, p. 84.

(৬২) 'Christ and Christianity,' লণ্ডনে কেশব সেনের বক্তৃতা, ২৮ মে, ১৮৭০, M. Borthwick, *Keshub Chunder Sen, A. Search for Cultural synthesis,* Calcutta 1977, pp. 8, 9, 10 : কেশব সেনের জীবনবেদে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব।

(৬৩) *Keshab Chandra Sen in England,* লণ্ডনে সান্ধ্যভোজে কেশব সেনের বক্তৃতা, ১২ এপ্রিল, ১৮৭০।

(৬৪) 'Christ and Christianity.'

(৬৫) 'Keshab Chandra Sen in England', 12 April 1870.

(৬৬) তদেব : '..... there is no reason why Christanity should in these days be presented, to the Indain population in any other than an oriental aspect.' এখানে তিনি রামমোহনের ঐতিহ্যের ধারা বহন করেছিলেন।

Killingley, *পূর্বোক্ত* রামমোহন, কেশবচন্দ্র ইত্যাদি যিশুকে দেখেছেন এশিয়াবাসী রূপে।

(৬৭) শিশির দাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৫। M. M. Thomas, Director of the Christian Institute for the study of Religion and society কেশবচন্দ্রকে ভারতীয় খ্রিষ্টতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপনের কৃতিত্ব দিয়েছেন ঃ দ্রষ্টব্য, David Kopf, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫২।

(৬৮) ম্যাক্সমুলারকে লেখা প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের পত্র, ২০ আগষ্ট, ১৮৮১, পুনর্মুদ্রিত, F. M. Muller, *Biographical Essay.*

(৬৯) *Lowell Lectures* (in Boston), by P. C. Mozoomdar, p. 83.

(৭০) P. C. Mozoomdar, *The Oriental Christ* Boston 1883.

(৭১) তদেব, পৃ ১৬, ১৭।

(৭২) ম্যাক্সমুলারকে লেখা প্রতাপচন্দ্রের পত্র *পূর্বোক্ত*।

(৭৩) P. C. Mozoomdar, *The Faith and Progress of the Brahmo Samaj,* Calcutta 1882, p. 116.

(৭৪) P. C. Mozoomdar, 'The Relations of the Brahmo Samaj to Hinduism and Christianity' (1873), S. D. Collet Collection.

(৭৫) Kaj Bago, *পূর্বোক্ত* পৃঃ ৯,১০

(৭৬) *তদেব*; Ramchandra Ghosha, The (Rev) K. M. Banerjea, introdued with biographical notes by Asis Das Gupta, Probodh Biswas, Calcutta 1980; B. R. Barber, Kali Charan Banerjee, London, Madras etc. undated; G. Macpherson, *Life of Lal Behari Day*, Edinburgh 1900; Julius J. Lipner, *Brahmabandhab Upadhyay, The Life and Thought of a Revolutionary*, Delhi 1999; হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, বহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, কলিকাতা ১৯৬১, B. Animananda, *The Blade, Life and Work of Brahmabandhav Upadhyay*, Calcutta undated.

(৭৭) তদেব।

(৭৮) *Church Missionary Intelligencer* 1871, p. 261; G. A. Oddie, *Missionaries, Rebellions and Proto-Nationalism* (James Long of Bengal), Surrey 1999, pp. 145, 187 : ভারতীয়দের বিজাতীয় করণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণমোহন এবং রেভঃ জেমস লঙ এর সহযোগিতা।

(৭৯) Lal Behari Day, *The Desirableness and Practicability of Organizing a National Church in Bengal*, A Lecture Delivered at the Bengal Christian Association, 13 December, 1869 (Printed, Calcutta 1870).

(৮০) Stephen Neill, *পূর্বোক্ত* vol II p. 402.

(৮১) G. Macpherson, *পূর্বোক্ত*

(৮২) *তদেব*, পৃ ৯৮।

(৮৩) B. R. Barber, Preface by Sir Andrew Fraser, vol IV, p. 43 কালীচরণ বলেন, 'We should Christianise but not denationalize.'

(৮৪) Church Missionary Intelligencer, 1871, p 261.

(৮৫) *Indian Christian Herald*, 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 1880.

(৮৫ক) Kaj Bago, *পূর্বোক্ত* p. 5 B. R. Barber, *পূর্বোক্ত* p. 48-49.

(৮৬) Kaj Bago, p. 6-7.

(৮৭) *Calcutta Christian Observer* ১৯৪৯ সাল থেকে অনেকগুলি সংখ্যা

(৮৮) Ramachandra Ghosha, Asis Das Gupta, *পূর্বোক্ত* p. 46-47; B. R. Barber, *পূর্বোক্ত।*

(৮৯) Kaj Bago, *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৩—১৫।

(৯০) K. M. Banerjea, 'The Relation Between Christianity and Hinduism' (Oxford Mission, Occasional Papers, No. 1), Calcutta S. G.

(৯১) J. N. Farquhar, *Crown of Hinduism*, 1913; Kaj Bago, *পূর্বোক্ত* pp. 14, 71, 78, 79.

(৯২) হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত* Julius J. Lipner, *পূর্বোক্ত* ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাস অনুসন্ধানে*-তে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী।

(৯৩) Report of the Baptist Missionary society, 1909, 1910, 1911; Papia Chakravorty, *Hindu Response to Nationalist Ferment*, Calcutta 1992, pp. 16-18; Sekhar Bandyopadhyay, Caste and Politics in Eastern Bengal : The Namasudras and the Anti-Partition Agitation.

(৯৪) B. Animananda, *The Blade*, p. 72, Lipner, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১২৪ *The Twentieth centrury*, March 1901, Christanity in India; হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত* পৃ ৬৭।

(৯৫) *Sophia.* June 30, 1900; *Sophia*, July 21, 1900.

(৯৬) ব্রহ্মবান্ধব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি লিখিত বিবৃতি পেশ করেন (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭): 'I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of swaraj, I am in any way accountable to the alien people.....

(৯৭) Animananda, *পূর্বোক্ত* পৃ ১৭৩।

(৯৮) Lipner, *পূর্বোক্ত* পৃ ৩৭৭। *The Twentieth Century*, July 31, 1910.

(৯৯) Animananda, *পূর্বোক্ত* পৃ ১৭৩।

(১০০) *Sophia*, October 27, 1900.

(১০১) Kaj Bago, পৃ ২৯, নোবিলির দৃষ্টান্ত Animananda, পৃ ৩৮ *Harmony* পত্রিকায় উপাধ্যায়ের লেখা।

(১০২) *Sophia* July 1897, 'Are we Hindus?', Animananda, পৃ ৭২-৭৪।

(১০৩) *Sophia* (Weekly) October 27, 1900; Lipner, পৃ ২৩৪

(১০৪) Lipner, ২৪৩ ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা, কলিকাতা ১৮৮২, পৃ ২১, ৪৭।

(১০৫) Lipner, পৃ ২৪৮, A. Copley, *পূর্বোক্ত*, পৃ ২১৪।

(১০৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চার অধ্যায়*, প্রথম সং, ভূমিকা।

(১০৭) হরিদাস ও উমা মুখার্জী, *পূর্বোক্ত* পৃ ৬৬-৬৭, *The Twentieth Century* তে খ্রিষ্টদর্শনের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের আলোচনা চলত পাশাপাশি, এই দুই ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান ছিল উদ্দেশ্য— 'Sankara's Introduction to Vedanta, January, 1901; 'Vedic Theism (মে, ১৯০১) 'Christ's Claim to Attention' (এপ্রিল ১৯০১)। খ্রিষ্টান মিশনারিরা যে তখনও ভারতের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে অবস্থিত, তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

(১০৮) দ্রষ্টব্য : Sathianathan Clarke, *Dalits and Christianity: Subaltern Religion and Liberation Theology in India*, New Delhi 1999.

(১০৯) হরিদাস ও উমা মুখার্জী, পৃ ১৩৫।

(১১০) K. P. Aleaz, *Jesus in Neo-Vedanta : A Meeting of Hinduism and Christianity*, Delhi 1995, p. 39; K. P. Aleaz, *The Gospel of Indian Culture*, Calcutta 1994, pp. 214–256.

(১১১) A. Copley, p. 215, K. P. Aleaz, Jesus in pp. 38–40.

(১১২) Harold Coward (ed), *Hindu Christian Dialogue : Perspectives and Encounters*, Delhi 1993, Foreword – The Ongoing Dialogue by R. Panikkar, Eric Sharpe, *Faith Meets Faith*, Delhi 1976.

(১১৩) Marcus Braybrooke, *The Undiscovered Christ*, Madras 1973; S. J. Samartha, *The Hindu Response to the Unbound Christ*, Madras 1974.

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত বিদ্বজ্জন, প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদকে আমাকে এই সম্মান প্রদান করবার জন্য। বিশেষ করে ভালো লাগছে এই ভেবে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি আমার কর্মজীবন শুরু করি সেখানেই আমি আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ পাচ্ছি। তবে একটা ব্যাপারে খারাপও লাগছে। যে তিনজন - আমার পিতৃবন্ধুঅধ্যাপক সন্তোষ বসু, আমার শিক্ষকতুল্য অধ্যাপক তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় এবং আমার পূজনীয় শিক্ষক অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত - যাঁদের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি, তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি।

আমার প্রতিবেদনের বিষয় ঃ

পাক-ভারত সহযোগিতামূলক দ্বিপাক্ষিকতা ও দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা

সুরঞ্জন দাস

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য আগে অনীক (১৯৯৯, সেপ্টেম্বর - অক্টোবর) ও *Economic and Political Weekly* (Vol. XXXV, No.49, 2nd December, 2000) প্রকাশিত হয়েছে। এ সব ভিত্তি করেই আজকের প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছি। জন্মলগ্ন থেকেই রাষ্ট্রীয় স্তরে পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে রয়েছে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। দুই দেশের মধ্যে তিনটি বড়ো যুদ্ধ হয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যখন পাকিস্থান বেছে নেয় আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী জোট, তখন ভারত হয় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের এক কর্ণধার। জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্থান লিপ্ত রয়েছে Proxy War এ, আবার ইসলামাবাদ ভারতের গুপ্ত হাত দেখতে পায় সিন্ধু প্রদেশ, বালুচিস্থান ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে।

কিন্তু একজন সমাজ সচেতক সমাজবিজ্ঞানীর কাছে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, তাহলে কি দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই Successor States এর মধ্যে সর্বদাই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক থাকবে? সুখের কথা আধুনিক গবেষণা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এটাও উত্তরোত্তর প্রমাণিত হচ্ছে যদিও দুই দেশের শাসক গোষ্ঠী নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে দু দেশের মধ্যে সংঘাতমূলক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তাহলেও পাকিস্থান ও ভারতের সাধারণ জনগণ নিজেদের মধ্যে মৈত্রী ও গঠনমূলক আদান প্রদানে খুবই

উৎসাহী। এই প্রেক্ষাপটে আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা দায়িত্ব আছে — সেটা হচ্ছে পাক - ভারত সহযোগিতামূলক দ্বিপাক্ষিকতার সম্ভাবনার বিষয়ে দু দেশের মানুষের চিন্তাভাবনাকে একটা সংগঠিত রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা। তাহলেই পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও কাশ্মীর সমস্যার মধ্য দিয়ে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও, তা শেষ বিচারে গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিকতার সম্ভাবনাকে রুখতে পারবে না। আজ যখন দু দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি আরও বেশি করে অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সহযোগিতামূলক বিকল্প খুঁজতে চাইছে, সে সময়ে তাত্ত্বিক বা academic ভাবনায় শান্তি আনার পথ অত্যন্ত জরুরি। আমার আজকের নিবেদন এই আশা নিয়ে যে, এটি এই প্রচেষ্টায় তার অবদান রাখবে।

মূল বিষয়বস্তুতে আসবার আগে এটা হয়তো পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন যে আন্তর্জাতিক ইতিহাসের গবেষণার প্রেক্ষিতে আমার বর্তমান প্রবন্ধটি সেই ধারার অঙ্গ যা বিশ্বাস করে বিশ্ব রাজনীতি সামাজিকভাবে সংগঠিত এবং যে কোন পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আত্মপরিচয় ও তাদের বাস্তব অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। এই বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধটি ভারত-পাক গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিকতার সম্ভাবনা বিচার করবে, যে দ্বিপাক্ষিকতা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সুরক্ষার শর্ত পূরণ করতে পারে।

আজকের দক্ষিণ এশিয়া ঃ ভারত-পাক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

দক্ষিণ এশিয়া নানারকমের স্ববিরোধিতায় ভরা। পৃথিবীর আয়তনের ৩ শতাংশ নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলে বিশ্বের জনসংখ্যার ২১ শতাংশের বাস। এই অঞ্চল প্রধানত অব্যবহৃত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার হলেও পৃথিবীর দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলোর অন্যতম। এই উপমহাদেশে শিল্পের বৃহত্তম বাজার তৈরির সম্ভাবনা থাকলেও এখনো এ অঞ্চল অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে অনুন্নত — বেকারত্ব, অপর্যাপ্ত অর্থনৈতিক বিকাশ ও অপ্রতুল সামাজিক প্রগতির সমস্যায় জর্জরিত। দক্ষিণ এশিয়া একটি একত্রিত বাস্তুচক্র, সাধারণ নদী, মহাসাগর ও পর্বতমালার সমন্বয়ে গঠিত একটি সুসঙ্গত পরিবেশ অঞ্চল, একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও সমৃদ্ধ। তা সত্ত্বেও এই অঞ্চল 'অপৃথকীকৃত শক্তি সম্ভাবনার স্তর, কৌশলগত অনৈক্য ও রাজনৈতিক জটিলতা' নিয়ে একটি বিচ্ছিন্ন সত্তায় পর্যবসিত হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রধান দেশ, ভারত ও পাকিস্তান, স্বভাবতই এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকৃতির ভাগীদার। নিম্নোক্ত সূচকগুলো এর ব্যাখ্যা করবে।

১৯৮০ থেকে ১৯৯২-এর মধ্যে ভারত ও পাকিস্থানের মোট জাতীয় আয় বা জিডিপি-র গড় বার্ষিক বৃদ্ধিহার ছিল মাত্র ৩.১ শতাংশ। অন্যদিকে মানব উন্নয়ন সূচক বা Human Development Index-এর শতকরা বৃদ্ধি ১৯৬০-এর দশকে ৪৩.৭ শতাংশ থেকে নেমে ১৯৯৩-তে ২৯ শতাংশ-এ দাঁড়িয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রে। এই একই সময়ে পাকিস্থানের

ক্ষেত্রে এই হার কমেছে ৫৬.৮ শতাংশ থেকে ৩৬.৯ শতাংশে। ১৯৯৩-তে ভারতে প্রতি হাজার শিশুজন্মে অনূর্ধ্ব-পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যুর হার ১২২, পাকিস্তান তা ১৩৭। প্রতি একশ জন মানুষের জন্য ১৯৯০-তে চিকিৎসকের সংখ্যা ভারতে ছিল ২.৫ এবং পাকিস্তানে ২.৯। ১৯৯২-তে ভারতে পূর্ণবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৯.৯ শতাংশ, পাকিস্থানে ৩৫.৭ শতাংশ। ভারত ও পাকিস্তানের সরকার বার্ষিক বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে যথাক্রমে ১৭ শতাংশ ও ২৮ শতাংশে ব্যয় করে, অথচ কোনো দেশেরই জাতীয় পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে ব্যয় ৪ শতাংশ ছাড়ায় না। ভারত ও পাকিস্তান — এই দু'দেশেই প্রবলভাবে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। ফলে এই দুই দক্ষিণ এশিয় দেশেই উন্নয়নের ফসল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কুক্ষিগত হয়েছে।

ভারত ও পাকিস্তানে উন্নয়নের এ হেন সমস্যার সমাধান করতে হলে এই দুই দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির গঠনগত পরিবর্তন নিশ্চয় প্রয়োজন। তাহলেও দুই দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভারসাম্যের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে কিছু স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়া যেতেই পারত। এর জন্য অবশ্য প্রতিরক্ষা ব্যয় কমিয়ে সামাজিক ও আর্থিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। একটি হিসেব অনুযায়ী দুই দেশের বার্ষিক সামরিক বাজেট মাত্র ৫ শতাংশ কমালেই ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হাতে আসবে যা দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের ন্যূনতম সামাজিক প্রয়োজনগুলো অনেকাংশে মেটানো সম্ভব।

পাকিস্তানের এক বছরের প্রতিরক্ষা ব্যয় উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হলে তা দিয়ে ২৩০ লক্ষ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত হয় আর গ্রামবাসীদের ৫ লক্ষ নলকূপ দেওয়া যায়। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাজেটে একইরকম কাটছাঁট করা হলে আরো বেশি সুযোগসুবিধা দেওয়া যায় কারণ আর্থিক হিসেবে এই টাকার পরিমাণ আরো অনেক বেশি। প্রখ্যাত পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ মেহবুব-উল-হক তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিশুর পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সুরক্ষিত করতে দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৯৫-২০১০ এই ১৫ বছরের জন্য ১২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা বছর প্রতি ৮.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার চাই। জিডিপি-র বার্ষিক বৃদ্ধি ৫ শতাংশ ধরলে এই অর্থ এই অঞ্চলের জিডিপি-র মাত্র ১৬ শতাংশ। হক জোরালো যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহজেই এই অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

অবশ্য ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস না পেলে এবং বিরুদ্ধতার ও সন্দিগ্ধতার পরম্পরাগত ধারণাকে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আস্থা দিয়ে বদলানো না গেলে, এ হেন আঞ্চলিক সহযোগিতা রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয়। অনেকগুলো সামরিক CBM দুই দেশের সম্পর্ককে ইতিমধ্যেই উন্নত করেছে কিন্তু প্রত্যাশিত ফল থেকে তারা এখনো ঢের দূরে। বর্তমান প্রবন্ধে বলতে চাওয়া হয়েছে যে দুই দেশের

মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, তথ্যাদির অবাধ সঞ্চালন, আর্থিক সহযোগিতা ও উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ব্যবস্থা ক'রে, পারস্পরিক আস্থার বিকাশ ও সহযোগিতামূলক চুক্তিগুলোকে যাচাই করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভারত-পাক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এই প্রবন্ধে কৌশলগত বা সামরিক চিন্তাকাঠামোকে অতিক্রম করে দেখানো হবে যে সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ভারত-পাকিস্তানের অবিশ্বাস ও আশঙ্কার অনেকটাই মুছে ফেলে এই অঞ্চলের অমীমাংসিত সামরিক, রাজনৈতিক ও কৌশলগত দ্বন্দ্বগুলিকে সমাধানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিবর্তনশীল গতিপ্রকৃতি ভারত-পাকিস্তানের ওপর নিজেদের বিকাশের গতি অব্যাহত রাখতে দ্বিপাক্ষিক আর্থিক ও প্রযুক্তিগত যৌথ উদ্যোগের নতুন আবশ্যিকতার সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, সরকারিভাবে পশ্চিমী আর্থিক সহায়তার সিংহভাগ পাচ্ছে পূর্বতন সোভিয়েত ব্লকের উত্তরসূরি দেশগুলো, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য মাথাপিছু আন্তর্জাতিক সাহায্যের পরিমাণ বর্তমানে মাত্র ৫ মার্কিন ডলার। দ্বিতীয়ত, প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোর আর্থিক বৃদ্ধির হার আগামী বছরগুলোতে তুলনামূলকভাবে কম হতে চলেছে। এর অর্থ, ভারত ও পাকিস্তান তাদের রপ্তানির জন্য পূর্বতন পশ্চিমী বাজারের ওপর নির্ভর করতে পারবে না। তৃতীয়ত, North American Free Trade Area (NAFTA), European Economic Community (EEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), Latin American Free Trade Area (LAFTA), Andean Sub-regional Group, Central African Customers and Economic Union, East African Community, Arab Common Market (ACM), New Zealand Australian Free Trade Area এবং Common Market of the Southern Corner (MERCOSUR)-র মতো আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের গঠন ঐ সব অঞ্চলে ভারত-পাকিস্তানের বাণিজ্যের বিস্তারকে বাধা দেবে। চতুর্থত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন মানেই দক্ষিণ এশিয়ার বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র সংকোচন; বিশেষত ভারতের ক্ষেত্রে। পূর্ব ইউরোপে ভারতের রপ্তানি ১০ শতাংশ কমে গেছে। পঞ্চমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং আফগানিস্তানের থেকে আমেরিকার পাততাড়ি গুটোনোর ফলে ভারত-পাকিস্তান পূর্বতন আন্তর্জাতিক টানাপোড়েন থেকে মুক্ত হয়ে আরো বেশি করে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকানোর সুযোগ পেয়েছে। ষষ্ঠত, পাকিস্তানের পূর্বতন জোটসঙ্গী—আমেরিকা, চীন ও ইরান—ইসলামাবাদকে নতুন দিল্লীর সঙ্গে বিরোধিতার বদলে সহযোগমূলক মনোভাব গ্রহণে চাপ দিচ্ছে।

ভাষ্যকাররা মনে করেন যে দুই দেশে সাম্প্রতিক কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির দরুণ

ভারত-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা বেড়েছে। ১৯৯২-৯৩ থেকে ভারতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে বাড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, ১৯৯৭ তে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৭ শতাংশ। দীর্ঘদিনের মন্থরতা কাটিয়ে পাকিস্তানও ১৯৯৭-তে প্রায় ৬.৪ শতাংশ জিডিপি বাড়িয়েছে। '৯০-এর দশকে দুই দেশের ক্ষেত্রগত বিন্যাসে (Sectoral Composition) পরিবর্তন দেখা গেছে। ভারত ও পাকিস্তানের জিডিপি-তে কৃষিকার্যের অবদান কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে এক-তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশ। অন্যদিকে বাণিজ্য ও পরিবহণ ক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দক্ষিণ এশিয় দেশগুলোতে সঞ্চয় বিনিয়োগের অনুপাতেরও বৃদ্ধি হয়েছে। তাছাড়া সাধারণভাবে উন্নয়নশীল দুনিয়ার তুলনায়, ভারত ও পাকিস্তান তীব্র মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। South Asia's Integration into the Global Economy (1997) বিষয়ক বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে আশা করা হয়েছে যে এই অঞ্চল ভারতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০২৮ পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে দ্রুততম স্থান পাবে।

দুর্ভাগ্যবশত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে থেকে প্রচুর ঋণ গ্রহণের ফলে আর্থিক বৃদ্ধির আপাত লক্ষণগুলোর বেশির ভাগই ভারত ও পাকিস্তানের বহিঃঋণের অভাবনীয় বৃদ্ধির কাছে ম্লান হয়ে গেছে। ১৯৯২-তে ভারত ও পাকিস্তানের মোট বহিঃঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে জিডিপি-র ২৫.৯ শতাংশ ও ৩৬.৮ শতাংশ। এই সময়ে মোট ঋণ পরিষেবার শতকরা হার ছিল ভারতের ক্ষেত্রে মোট রফতানি আয়ের ২৫.৩ শতাংশ ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ২৩.৬ শতাংশ।

ভারত-পাকিস্তান তাই আজ এক স্ববিরোধী পরিস্থিতির সম্মুখীন - আর্থিক বৃদ্ধির সম্ভাবনার পাশাপাশি আছে ক্রমবর্ধমান বহি:ঋণের বোঝা। দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে সাধারণভাবে দেখা হয় আমেরিকার নেতৃত্বে একমেরু বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে, উত্তর গোলার্ধের আধিপত্যাধীন নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের খপ্পর থেকে উদ্ধার পেতে হলে ভারত পাকিস্তানের দরকার তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং (এক পাকিস্তানি প্রবন্ধকারের ভাষায়) তাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত পাকিস্তানের বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা যেতে পারে যেগুলো দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক উত্তেজনার সমাধান বা প্রশমনে সাহায্য করবে। এই সম্ভাবনাগুলো বাস্তবে পরিণত করা হলে ভারত-পাক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতির সম্ভাবনাও বাড়বে। কারণ ভারত-পাক উত্তেজনাই দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক রাজনীতিতে অস্থিরতার মূল উপাদান।

ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঃ পরিবর্তনের সম্ভাবনা

উত্তরাধিকার :

১৯৪৭-এর ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান ছিল একই অর্থনৈতিক এককের অংশ। ব্রিটিশ ভারতে যে এলাকাগুলোর শিল্পায়ন ঘটেছিল দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তান সে এলাকাগুলোর উত্তরাধিকার পায়নি। ১৯৪৭-এ এই উপমহাদেশের শিল্পকর্মোদ্যোগের মাত্র ৭ শতাংশ ছিল পাকিস্তানে। দেশভাগের প্রতিকূল প্রভাবকে কমাতে ১৯৪৭-এর আগষ্টে একটি চুক্তি হয় যার ফলে ১৯৪৮-এর ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারত-পাক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্বাবস্থা বজায় থাকে। কিন্তু এই চুক্তি পালিত হবার চেয়ে লঙ্ঘিত হল বেশি। তা সত্ত্বেও, ১৯৪৮-৪৯ এ পাকিস্তানের বাণিজ্যিক বিনিময়ের ৭০ শতাংশ এর বেশি হয়েছিল ভারতের সঙ্গে, ভারতের রপ্তানির ৬৩ শতাংশ ছিল শিল্পজাত দ্রব্য এবং পাকিস্তানের আমদানির ৯২ শতাংশ ছিল খাদ্য ও কাঁচামাল। কিন্তু ১৯৪৯-এর শেষদিকে ভারত-পাক বাণিজ্যিক সম্পর্ক দ্রুত নিম্নগামী হল। মে ১৯৪৮ থেকে মার্চ ১৯৬০-এর মধ্যে ১১টি ভারত-পাক বাণিজ্য ও অর্থপ্রদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও, সরকারিভাবে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ১৯৪৮-৪৯ এ ভারতীয় মুদ্রায় ১৮৪.০৬ কোটি থেকে কমে ১৯৬৮ তে ১৩.৬৩ কোটিতে দাঁড়ায়। এই বাণিজ্যের পরিমাণ সবচেয়ে কমে যায় ১৯৬৫-৬৬ সালে (১০.৫৩ কোটি) যে বছর ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় ভারত-পাক যুদ্ধ হয়। চড়া শুল্ক ও সীমান্তের ওপার থেকে আমদানিক্ষেত্রে পরিমাণগত কড়াকড়ির জন্য পাক অর্থনীতি ভারতের থেকে বিশেষভাবে সুরক্ষিত ছিল।

পরিবর্তনের লক্ষণ ঃ

সাম্প্রতিককালে সীমান্তের দু'পারের তথ্যাভিজ্ঞ লোকেরা বুঝতে পেরেছেন যে, ১৯৪৯-উত্তর সময়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কে ছেদ পড়ায় পাকিস্তান ও ভারত এমন কিছু আর্থিক পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছিল যে তার ফলে তাদের স্বনির্ভরতা লাভের চেষ্টা ব্যাহত হয়। পাকিস্তানের দ্রুত শিল্পায়নের পরিকল্পনা পশ্চিমী প্রযুক্তি ও মূলধনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পাকিস্তানকে পশ্চিমী দুনিয়া, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কয়লা, ইস্পাত ও লোহা আমদানি করতে হত যখন সেগুলো ভারতের কাছ থেকে অর্ধেক দামে পাওয়া সম্ভব ছিল। অনুরূপভাবে এই অঞ্চলের বাইরে হাত না পেতে ভারত থেকেই তারা ভিসকোস ফিলাসেন্ট তন্তু বা ভিসকোস স্টেশন তন্তু আমদানি করতে পারত। ভারতের যে রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত অ্যালুমিনিয়াম আছে, পাকিস্তান স্বল্পমূল্যে তা কাজে লাগাতে পারত। এমনকি গমের মতো কৃষিদ্রব্যের জন্য ইসলামাবাদকে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হাত পাততে হয়েছিল যখন ভারত থেকে কম দামে আমদানি করে বিদেশী মুদ্রা বাঁচানো যেত। পাকিস্তানের পূর্বভাগ যখন ১৯৭১ এ বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করল তখন পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুনরায় সমঝোতা

করতে বাধ্য হল। এই সময়ে ভারতকেও স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের দরুন অনেক দাম দিতে হয়। যেমন, সীমান্তের ওপারে কাঁচা পাট রপ্তানিতে পাকিস্তান নিষেধাজ্ঞা জারি করায় এই সংকট ঠেকাতে ধানচাষের উপযোগী জমিতে পাটচাষ করতে হয়। ভারতকে এই অঞ্চলের বাইরে থেকে ঢালাই না করা লোহা (Pig iron) আর ছাঁট লোহা (iron scrap) আমদানি করতে হয়েছিল, যদিও বিশেষত: দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জন্য, অনেক কম পরিবহন ব্যয়ে পাকিস্তানের কাছ থেকে তা কেনা সম্ভব ছিল। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকলে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিরাট অভাব পূরণের জন্য ভারত পাকিস্তানের ওপর ভরসা করতে পারত।

সোভিয়েত-উত্তর যুগে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির নতুন কাঠামো ও জিয়া-উত্তর যুগে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের জয়লাভের ফলে ভারত-পাক বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ১৯৭২-এর সিমলা চুক্তির পর ১৯৭৪-এর নভেম্বর থেকে সরকারিভাবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে। ১৯৮৮-৮৯-এ তার পরিমাণ ভারতীয় টাকায় ১০৮.১৮ কোটিতে পৌঁছেছে। ১৯৮১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে দিল্লীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পাকিস্তান যোগ দেয়। এরপর থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদলের বিনিময় ঘটেছে। ১৯৮৬-তে ভারত ও পাকিস্তান সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল কো-অপারেশন বা সার্ক (SAARC) এর চূড়ান্ত দলিলে সই করে, যাতে 'দক্ষিণ এশিয়ার মানুষেব কল্যাণ; জীবনাযাত্রার মানের উন্নয়ন, আর্থিক বৃদ্ধি, সামাজিক কর্মসূচি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা' সাধারণ সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে সাধারণ নীতি ও পন্থা নির্ণয় করা'র ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৮৯-এর জুলাইয়ের মধ্যে পাকিস্তান ভারত থেকে ৩২২টি দ্রব্য আমদানি করতে সম্মত হয়। ১৯৯১তে নওয়াজ শরিফ সরকার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-পাক বাণিজ্যে নতুন জোয়ার আসে; এর পরিমাণ ১৯৯০-৯১তে ভারতীয় টাকায় ১৬৮.০৯ কোটি থেকে ১৯৯২-৯৩তে বেড়ে দাঁড়ায় ৫২২.৫৯ কোটি। তাছাড়া, যত দিন যাচ্ছে, নতুন দিল্লী ও ইসলামাবাদ বুঝতে পারছে যে সীমান্তে বেআইনি চোরাচালানের ফলে দুপক্ষই প্রচুর শুল্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বেআইনি বাণিজ্যের পরিমাণ বছরে ১৬ বিলিয়ন ভারতীয় টাকা যা দু'দেশের মধ্যে সরকারি বাণিজ্যের চারগুণ। তৃতীয় দেশের মাধ্যমে আদানপ্রদানের হিসাব নিলে দেখা যাবে যে এই বে-আইনী বাণিজ্য বছরে ভারতীয় টাকায় ২০ বিলিয়নের কাছাকাছি। ভারতের বয়ন যন্ত্রাংশ, চর্মশিল্প উপাদান, রাসায়নিক দ্রব্য, ভিসকোস তন্তু, স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্র, প্রসাধনী, কাজুবাদাম, সুতিবস্ত্র, আয়ুর্বেদিক ওষুধ, মিষ্টি, গবাদি পশু প্রভৃতি দুবাই, হংকং ও সিঙ্গাপুরস্থিত সরবরাহকারীর মাধ্যমে পাকিস্তানে পৌঁছয়। যেসব পাকিস্তানি দ্রব্য চোরাপথে ভারতে আসে তাদের মধ্যে আছে প্লাস্টিক দ্রব্য, তন্তুজাত বস্ত্র, পুরনো জামাকাপড়, ডিনারসেট, পশম, উদ্ভিজ্জ তেল প্রভৃতি।

১৯৯৬তে দিল্লীর প্রথম SAARC শিল্প প্রদর্শনীতে পাকিস্তান অংশ নেয়। Punjab-Haryana-Delhi Chambers of Commerce and Industries এর সহযোগিতায় ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের সম্ভাব্য রূপরেখা তৈরি হয়। যেমন জানা যায়, পাকিস্তান যেমন ভারত থেকে চা, ওষুধ ও বয়ন যন্ত্রাংশের আমদানি এখন বাড়াতে পারে; তেমনি ভারতও অল্প সময়েই পাকিস্তান থেকে আকরিক লোহা ও ঢালাই-না-করা লোহার আমদানি প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে পারে। বোঝা যায় যে মুক্ত বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকগুলো সরিয়ে নিলে ভারত ও পাকিস্তানের শিল্পের উদ্বৃত্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর আঞ্চলিক বাজারের চাহিদা পূরণ করা যায়। সেসময় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ২০৭টি রপ্তানিযোগ্য ও ৩৪টি আমদানিযোগ্য দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করেন। পাকিস্তানিরাও ৫৩ ও ১৫২টি তালিকা প্রস্তুত করেন। পাকিস্তানে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে ছিল কৃষি যন্ত্রাংশ, ট্র্যাক্টর, মোটরসাইকেল ও অটোমোবিলের যন্ত্রাংশ; ডিজেল ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক মোটর; রঞ্জক (dyes) ও বয়নযন্ত্রাংশ; সিমেন্ট; খাদ্য প্রস্তুতি প্রযুক্তি; দূরসঞ্চার ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি; রেললাইন ও জেনারেটর শিল্প ও ফার্মাসিউটিক্যাল ও রাসায়নিক দ্রব্য; বিড়ি ও পানের পাতা, গম, পেঁয়াজ ও আলু, চা, কয়লা ও আকরিক লোহা। ভারতে রপ্তানির জন্য পাকিস্তানি দ্রব্যের সম্ভাব্য তালিকায় ছিল চামড়া, ক্রীড়া ও শল্য চিকিৎসকের উপকরণ; শিল্পজাত অ্যালকোহল, স্টেনলেস স্টিল; কীটনাশক; সার; মূল্যবান রত্ন; কাঁচা তুলা; পশম ও মিশ্রিত কাপড় (blended fabrics); ওষধি (medicinal herbs) ; খনিজ দ্রব্যাদি; উদ্ভিজ্জ তেল ও বাদাম।

এই প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক কাঠামোটি বাস্তবায়িত করতে পৃথিবীর অন্য যে কোনো অংশের সঙ্গে এই সব দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় অনেক কম আর্থিক ব্যয় হবে। তাই তা দুই দেশের পক্ষেই সবচেয়ে সুবিধাজনক। ইদানীং দুই দেশ নিজেদের এলাকার মধ্য দিয়ে. মাল চলাচলের অধিকার নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। এর ফলে ভারত সহজেই মধ্য এশিয়ার বাজারের নাগাল পাবে আর ভারতের মধ্যে দিয়ে চলাচলের সুযোগের ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের বাণিজ্যের সুবিধা হবে। তাছাড়া ভারত ও পাকিস্তান যৌথ আমদানি-রপ্তানির কৌশল গ্রহণ করলে দুদেশেরই প্রচুর আর্থিক সুবিধা হবে। যেমন বিশ্বের বাজারে চাল ও সামুদ্রিক দ্রব্যাদির রপ্তানির জন্য এই দুদেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। একটি যৌথ বাণিজ্যিক নীতি গ্রহণ করলে উভয়েই বিশ্বের বাজারে এইসব দ্রব্যাদির জন্য বেশি দাম পেতে পারে। একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থার মাধ্যমে কাজ করলে ভারত-পাকিস্তান উভয়েই সুবিধাজনক শর্তে আমদানি করতে পারবে।

সাউথ এশিয়ান রিজিওন্যাল কর্পোরেশনের ছত্রছায়ায়, এই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত পরিবর্তন শুরু হয়েছে তা পাক-ভারত বাণিজ্যিক

সম্পর্কের উন্নতির গতি বৃদ্ধি করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ এখনো খুব কম --মোট আমদানির ৩.১ শতাংশ এবং মোট রপ্তানির ৩.৮ শতাংশ — যেখানে পশ্চিম ইউরোপের মোট বিশ্ববাণিজ্যের ৬৩.৪ শতাংশই হয় ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটির দেশগুলির নিজেদের মধ্যে। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের অবস্থানও ভাল কিছু নয়। পাকিস্তানের মোট আমদানির মাত্র ১.৫ শতাংশ ও রপ্তানির ৪.৯ শতাংশ হয় তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে। কিন্তু ডিসেম্বর ১৯৯৫-এ অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান প্রেফারেনসিয়াল ট্রেডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট (SAPTA) এই অঞ্চলে একটি সুসংহত আঞ্চলিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সূচনা করে। SAPTA-এর প্রথম দফার আলাপ আলোচনার (SAPTA-I) ফলে এতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে ২২৬টি পণ্যের ক্ষেত্রে করের ছাড় দেওয়ার বাবস্থা হয়েছে। দ্বিতীয় দফার আলোচনায় (SAPTA-II) এই রকম সুবিধা দেওয়া হবে এমন পণ্যের সংখ্যা বেড়ে হয় ২০১৩টি। ভারত পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ৩৭০টি পণ্যের ছাড় ঘোষণা করে, পাকিস্তান ভারতের ক্ষেত্রে অনুরূপ ছাড় ঘোষণা করে ২৩০টি পণ্যের ক্ষেত্রে। সার্ক চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ তো বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াতে এবং এই অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক দূরত্ব দূর করতে একটি দক্ষিণ এশিয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন (South Asian Economic Union) তৈরির কথা ভাবছে। মার্কিন সংস্থা সেন্টার ফর ট্রেড ডেভলপমেন্ট-এর হিসাব অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের নিষেধাজ্ঞাগুলি তুলে নিলে ও শুল্ক হার কমালে ২০০০ সালের মধ্যে সার্ক দেশগুলির নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য বর্তমানের ৩ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে হবে ১৫ বিলিয়ন ডলার। ভারত ও পাকিস্তান যেহেতু এই অঞ্চলের আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান দেশ, এই বাণিজ্যের এরকম উন্নতি তাই এই দুটি দেশের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

দুঃখের বিষয় SAPTA-II -র কাঠামোয় বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা পুরোপুরি বাস্তাবায়িত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভারত পাকিস্তানের কাছ থেকে ৩৭৫টির জায়গায় মাত্র ১৭টি পণ্য আমদানি করে এবং বিশেষ ছাড়ের সুবিধা ছিলো যে ২৩০টি পণ্যের ক্ষেত্রে তার মধ্যে মাত্র ৩৭টি পণ্য রপ্তানি করে। পাকিস্তানে যেসব বহুজাতিক উঁচু দামে ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করে তারা এবং তাদের সহযোগিরা ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য স্বাভাবিকীকরণকে বাধা দিচ্ছে। এছাড়াও ইসলামাবাদের সন্দেহ যে SAPTA-II থেকে পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের লাভ বেশি হবে। যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে ভারত শুল্ক ছাড় পাবে সেগুলির মধ্যে ১৪টি, পাকিস্তানে ভারত এখনই যে ৫০টি পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে, তার মধ্যে পড়ে। কিন্তু ইসলামাবাদের ক্ষেত্রে এরকম পণ্যের সংখ্যা মাত্র ৫টি। SAPTA-র ভবিষ্যত আলাপ আলোচনায় এই পার্থক্যটি ঘোচাতে হবে। আরো অভিযোগ, পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের বাণিজ্য নীতি কম স্বচ্ছ, আরোও বেশি জটিল

ও বিধিনিষেধযুক্ত। আগেই বলা হয়েছে এই অঞ্চলের প্রতিটি দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, SAPTA তারই একটা। এই ব্যবস্থাটি নেওয়া হয়েছিল মূলত প্রতিটি পণ্য ধরে ধরে মুক্ত বাণিজ্যের পরিকল্পনা করার জন্য। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এখন বলছেন যে SAPTA-কে কার্যকর করতে হলে তাকে পুরোপুরি একটা বাণিজ্য মুক্তকরণ ব্যবস্থায় পরিণত করতে হবে।

কিন্তু দেওয়ালের লিখন অদূর ভবিষ্যতে ভাল ভারত পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথাই বলছে। দুদেশের ব্যবসায়িক গোষ্ঠীই এখন বুঝতে পেরেছে যে ভারত এবং পাকিস্তান এমন সব পণ্য উৎপাদন করে যেগুলি এই অঞ্চলের মোট ৩০০ বিলিয়ন ডলার জিডিপি এবং বড় একটি আঞ্চলিক বাজারের (শুধু চীনের চেয়েই ছোট) চাহিদা মেটাতে পারে। একই ধরণের রুচি ও সংস্কৃতি থাকার কারণে এই অঞ্চলের যে কোন স্থানে উৎপাদিত দ্রব্যের আঞ্চলিক বাজার তৈরি করা সহজ হবে। পাকিস্তানের বিশেষজ্ঞরা নিজেরাই দেখিয়েছেন তাদের দেশ কেমন করে ওষুধের মত দ্রব্যাদি ভারত থেকে আমদানি করলে লাভবান হবে— ভারতের ঔষধের দাম পাকিস্তানের চাইতে ৩০ শতাংশ কম। জে এন দীক্ষিত, যিনি ১৯৪৯ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন, আর ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সালে ছিলেন ভারতের বিদেশ সচিব, তিনি জানিয়েছেন লাহোর, করাচি, পেশোয়ার ও কোয়েটার বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের সরকারের এই চিরাচরিত বক্তব্য মানেন না যে রাজনৈতিক সামাজিক দ্বন্দ্বের অবসানের আগে ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করলে পাকিস্তানের জনগণ তার বিরোধিতা করবে। লাহোর চেম্বার অফ কমার্সের একজন সদস্য এক ভারতীয় সাংবাদিককে বলেন : "রাজনীতিকরা যা চাইছেন করুন, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান, জনপ্রিয় হওয়ার সব প্রচেষ্টা। কিন্তু দুদেশের ব্যবসায়ীদের তারা এসবের বাইরে রাখুন, তাদের নিজেদের কাজ করতে দিন।"

একইভাবে অভয় কুমার কালসিওয়ালের মত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নেতা, ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট, সার্ক-এর এক অনুষ্ঠানে জোর দিয়ে বলেন, "আমরা এখন (এই অঞ্চলে) এমন একটা পরিবেশ দেখছি যেখানে ব্যবসায়ীরা পরস্পরের উপর চাপ না দিতে শিখেছি, শিখেছি দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের উন্নয়নে কাজ করতে।"

রাজনৈতিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যে অর্থনৈতিকভাবে দ্বিপাক্ষিক কার্যকলাপ সম্ভব তা ১৯৯০ সালের হেমন্তে দেখা গেল, যখন ভারত পাকিস্তানের আলু ও পেঁয়াজের সংকট কাটাতে সাহায্য করে, তুরস্ক, চীন ও স্পেন থেকে আমদানি না করতে পারায় ঐ সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ সময়ের ভারতীয় হাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত বলেন যে যদিও ইসলামাবাদ ভারত থেকে আমদানির কথা জনসাধারণকে জানাতে চায় নি, 'সবাই

কিন্তু সত্যটা জেনে গিয়েছিল।' তারপর আবার ১৯৯৭ সালের প্রথমদিকে হঠাৎ ঘাটতি সামাল দিতে পাকিস্তান ভারত থেকে ৫০,০০০ টন চিনি আমদানি করে। ঐ বছরের মার্চ মাসে পাকিস্তানের ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন ইসলামাবাদের কাছে ১৯৭৫-এর প্রোটাকল চুক্তি বাতিল করার আর্জি জানায়, যে চুক্তির ফলে তৃতীয় দেশে পণ্য পরিবহনের জন্য পাকিস্তানি জাহাজ ভারতের বন্দর থেকে মাল নিতে পারে না। ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও নয়া দিল্লীকে বারবার অনুরোধ করছে একপাক্ষিকভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে 'পুরোপুরি' মুক্ত বাণিজ্য চালু করার জন্য। পাঞ্জাব-হরিয়ানা-দিল্লী চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ -এর সেক্রেটারী জেনারেল এইচ এস ট্যান্ডন নিঃসংশয়—

"যে বিরাট পরিমাণে বেআইনী ব্যবসা চলে এই দুই দেশের মধ্যে তা দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায় দুপক্ষের লাভের সম্ভাবনা ও দুদেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসা করার তীব্র অবদমিত আকাঙ্খার সূচক। এই বাণিজ্য খুলে দিলে এবং ব্যবসায়ীদের আসা যাওয়া শুরু হলে পরস্পরের সুবিধার্থে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরালো হবে।"

নয়া দিল্লী পাকিস্তানকে ইতিমধ্যেই "সবচেয়ে সুবিধা দেওয়া দেশের" (Most Favored Nation Status) দান করেছে। ইসলামাবাদ থেকে এর প্রত্যুত্তর আসা উচিত, বিশেষ করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই যখন এর জন্য চাপ রয়েছে। ১৯৭৮ সালে ইটালিয়ান ভেস্পা স্কুটারের এক পাকিস্তানি ডিলার সীমান্তের অপর পার থেকে বেসরকারি বাণিজ্য বন্ধের জন্য তাঁর নিজের প্রভাব খাটান, যাতে করে কম দামের ভারতীয় বাজাজ স্কুটার এসে তাঁর ব্যবসা মার না খাওয়াতে পারে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে লাহোর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রেসিডেন্ট তারিক সয়ীদ সায়গল এক সেমিনারে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরালো করার কথা বলেন, অবশ্য সে দেশের শিল্পের স্বার্থ বিপন্ন না করে। পাকিস্তানের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী আহমেদ মুফতার ১৯৯৬ সালে দিল্লীতে সার্ক বাণিজ্য মন্ত্রীদের সভায় তাঁর দেশের প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেন ভারতকে Most Favored Nation Status দেওয়াটা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা একমত হন যে মুক্ত ভারত-পাক বাণিজ্য বিশেষ করে পাকিস্তানের পক্ষে লাভজনক হবে— যদিও সেদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী চৌধুরী আহম্মেদ মুফতার 'ধাপে ধাপে' এগোনোর কথা বলেন। অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তারিক ইকরাম অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে ভারত পাকিস্তান দুই দেশ পরস্পরের সাথে বাণিজ্য করতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন আর ওঠে না, প্রশ্ন হল এই বাণিজ্য থেকে পাকিস্তান কিভাবে লাভ করতে পারে। আলোচনায় অংশ নিয়ে এক বড় পাকিস্তানি টেক্সটাইল দ্রব্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক তারিক সয়ীদ সায়গল ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্পের সঙ্গে

বাণিজ্যের বিষয়ে ভীতি নিরসন করে বলেন যে তাঁর সহযোগী উৎপাদকরা যদি উৎপাদন ব্যয় কম রাখেন এবং উচ্চমানের উৎপাদন করতে পারেন তাহলে ভয়ের কিছু নেই। ভারত থেকে অল্প দামে যন্ত্রপাতি কিনে পাকিস্তানের কৃষি কিভাবে লাভবান হতে পারে সে আলোচনাও হয়।

১৯৯৭ সালে নয়াদিল্লীতে সার্ক-এর এক আলোচনায় পাকিস্তানের বাণিজ্য দপ্তরের সচিব ফয়েজ আহমেদ বলেন, "আমাদের শুল্ক হার কমানোর ফলে পাকিস্তান থেকে ভারত ও অন্যান্য সার্ক ভুক্ত দেশে পণ্য চলাচল বাড়ছে, এ বিষয়ে আমি আশাবাদী"। অন্য এক সময়ে পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ডঃ মুনাশির হাসান একথাও বলেন যে, রাজনীতিকরা নয় — তারা তো কিছুদিনের জন্য ক্ষমতা লাভ করেন— বরং সীমান্তের দুপারের ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলিই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নতকরার ব্যাপারে গঠনমূলক সহায়তা করতে পারেন।

ইন্দো-পাক বাণিজ্য সম্পর্কের এই নতুন ও ভাল আবহাওয়ার প্রকাশ ঘটে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FICCI) ও ফেডারেশন অফ পাকিস্তান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FPCCI)-র মধ্যে, যখন ১৯৯৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্টান্ডিং বা মউ স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ও ফেডারেশন অফ পাকিস্তান চেম্বার্স অফ ট্রেডার্স অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মধ্যে একটি চুক্তি হয়। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারত ও পাকিস্তান সরকারি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য যে যে পণ্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তার সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। দুদেশের দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর জন্য দুদেশের প্রধানমন্ত্রীদের নেতৃত্বে একটি মুক্ত বাণিজ্যের জন্য ভারত-পাক কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন পর্যবেক্ষকরা।

তবে পাকিস্তানের যে ভয়, যে সেদেশের অর্থনীতি উন্মুক্ত করলে সে দেশের বাজারে ভারতীয় আধিপত্য দেখা দেবে, এই ভয় দূর করতে হবে ভারতকে। ভারতের পাকিস্তানকে আশ্বাস দিতে হবে যে অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশনে অংশ নিয়ে ভারত সার্ককে ছোট করবে না। পাকিস্তানের ভীতি ঘোচাবার একটি পথ হল বাণিজ্যিক বাধা অপসারণ 'ধাপে ধাপে' করা। লক্ষণীয় যে ভারত ও পাকিস্তানের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি ইতিমধ্যে বিনিময়যোগ্য পণ্যগুলিকে অ-প্রতিযোগিতামূলক, প্রতিযোগিতামূলক ও ছাড়প্রাপ্ত, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করার কথা বলেছেন এবং সেগুলির ক্ষেত্র শুল্ক ছাড় দেওয়ার ভিন্ন ভিন্ন সময়সীমা নির্ধারণের কথা বলেছেন। অপ্রতিযোগিতামূলক পণ্যের মধ্যে পড়ে সেই সব কাঁচামাল, আংশিক উৎপাদিত ও উৎপাদিত দ্রব্য যেগুলি পাকিস্তান ভারত থেকে আমদানি করবে এবং যেগুলি পাকিস্তানে উৎপাদিত হয় না। বাণিজ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রথম ধাপে এইসব পণ্যের শুল্ক তুলে নেওয়া যেতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সেইগুলি যেগুলি ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশেই উৎপাদিত হয় এবং যেগুলির ক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্য দেশের নিজস্ব শিল্পের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। এই পণ্যগুলির ক্ষেত্রে শুল্ক হার কমাতে হবে ধীরে ধীরে, ভাবনা চিন্তা ক'রে। ছাড় পাওয়া পণ্য সেইগুলি যেগুলির উৎপাদন নিয়ে দেশগুলি স্পর্শকাতর, তাদের ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় এখনই দেওয়ার দরকার নেই। এই রকম ধাপে ধাপে শুল্ক ছাড় দিলে "পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা সমানে সমানে লড়তে" পারবেন। এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমরা এখন সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া বা SAFTA থেকে সাউথ এশিয়ান প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট গড়ার পথে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছি। একজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন:

"কেবলমাত্র সুষম বাণিজ্যের মাধ্যমেই—এটা আবার বড় দুটি অর্থনীতি ভারত ও পাকিস্তানের মনোভাবের উপর অনেকটাই নির্ভর করে— এই অঞ্চল আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে পারে, পশ্চিমের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারে—পণ্যের যোগানদার ঋণও দিতে পারে, এছাড়া পশ্চিমী উৎসের কোন বিশেষ সুবিধা নেই।"

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যের অর্থনৈতিক সুবিধার বিষয়ে খান ঠিকই বলেছেন: "মুক্ত বাণিজ্য এলাকা ভারত ও পাকিস্তানের উৎপাদনী থেকে উৎপাদন ব্যয়ের দক্ষতা (Cost efficiency) অনেক বাড়াতে পারে। দুই দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে শিল্পপতিরা সস্তা উৎপাদনী দ্রব্য (শিল্পের কাঁচা মাল, অন্তবর্তী উৎপাদন, উৎপাদিত মূলধনী দ্রব্য) ও কম পণ্য পরিবহণ ব্যয় থেকে লাভবান হবেন।"

প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ভারত পাক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ঃ একটি ছক:

উন্নত বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সম্পর্ক এই সম্পর্ককে ধরে রাখতে সাহায্য করবে। প্রযুক্তি যে "একবিংশ শতকের উন্নয়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ" হবে সেকথা স্বীকার করে অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপর সার্ক-এর একটি স্টাডি গ্রুপ বিশ্বের (বিশ্বায়নের) প্রতিযোগিতার প্রয়োজন মেটাতে আঞ্চলিক স্তরে প্রযুক্তিগত সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা বলেন। এই প্রকল্পটি সঠিকভাবেই আঞ্চলিক প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জের তিনটি মাত্রার কথা বলেঃ

(ক) যে সব ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার ডাকে সাড়া দিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হবে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে।

(খ) যে সব ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ক্রমশ দ্রুত আরো উন্নত হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আরো উন্নত করা।

(গ) পরিবেশগত কারণে পুরনো প্রযুক্তির পরিবর্তন।

এই তিনটি ক্ষেত্রেই ভারত-পাক সহযোগিতার সম্ভাবনা প্রচুর।

এই অঞ্চলে মোট উৎপাদিত মূল্যের ৭৮ শতাংশ উৎপাদন করে ভারত— মূলধনী

দ্রব্য ও অন্তবর্তী দ্রব্যের উৎপাদনে ভারতীয় প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব (এই অঞ্চলে) অনস্বীকার্য। ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লীর মধ্যে প্রযুক্তিগত অংশীদারত্ব ইসলামাবাদকে খুব সাহায্য করবে। কারণ সেদেশের উন্নয়ন বাজেটের ৬০ শতাংশ ব্যয় হয় মূলধনী ও অন্তর্বর্তী দ্রব্য কিনতে। টেক্সটাইল, চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদন, পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন, চা ও রবারজাত দ্রব্যাদি, মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স, বায়ো টেকনোলজি ও ফোটো ভোল্টইক-এর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার মুখে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতায় লাভবান হবে দুপক্ষই।

আশির দশকে পাকিস্তানের হাজারা এলাকায় রক ফসফেট-এর বড় ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়— এই রক ফসফেট ভারতীয় প্রযুক্তি দিয়ে কম খরচে উৎপাদন করা সম্ভব। একইভাবে টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির মত ভারতীয় সংস্থা পাকিস্তানি কয়লার অ্যাশ-এর পরিমাণ কমানোর জন্য কারখানা স্থাপনে সাহায্য করতে পারে। সীমান্তের দুপারের মধ্যে টেলিযোগাযোগ চিন্তার চলাচল বাড়াতে পারে। সার্ক-নেট নামে একটি কমপিউটার ডাটাবেস তৈরির কথা ভাবা হয়েছে যাতে দুদেশের জাতীয় নীতি নির্মাতা, ব্যবসায়ী ও অ্যাকাডেমিকদের মধ্যে আদান প্রদানের সুযোগ বাড়ে। কাপড়ের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারত ও পাকিস্তান পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বর্তমান কাঠ নির্ভর প্রস্তুতপ্রণালীর পরিবর্তে আখ প্রভৃতির ছিবড়ে থেকে কাগজ প্রস্তুতির প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে এগোতে পারে— যা পরিবেশের পক্ষে শুভ হবে। ভারতে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ সংস্থা শিল্প প্রযুক্তিতে ২০০০টির বেশি পেটেন্টের মালিক, এই জ্ঞানভান্ডার পাকিস্তান পেতে পারে। অন্যদিকে পাকিস্তান কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ খাদ্য ও গাঁজিয়ে তোলার প্রক্রিয়া, খনিজ দ্রব্য প্রস্তুতি, ধাতু প্রস্তুতি, কাঁচ ও সেরামিক্স, রঙ ও প্লাস্টিক, পলিমার, শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক ও চর্মশিল্পে অনেক উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এসব থেকে ভারত লাভবান হতে পারে। পাকিস্তানের কৃষি গবেষণা সংস্থা ও ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা ভারত ও পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদন শুধু বাড়াতেই যে সাহায্য করতে পারে তাই নয়, উৎপাদন ব্যয় কমানোর ক্ষেত্রেও সাহায্য করতে পারে। এই দুই সংস্থার মধ্যে সহযোগিতামূলক গবেষণা ইতিমধ্যেই জার্ম প্লাজম ও বীজ তৈরির বিষয়ে সুফল দিয়েছে। ভারতের ইনস্যাট ও পাকিস্তানের বদর-I ও বদর-II মধ্যে গবেষণার ফল বিনিময় করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে যৌথ মহাকাশ কর্মসূচি দারুণ সুফল দিয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া সংস্থা ও চীনের আবহাওয়া সংস্থার মধ্যে আবহাওয়া বিজ্ঞান ও আবহাওয়া প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ইতিমধ্যেই সরাসরি উচ্চগতির উপগ্রহ ডাটা-লিংকের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যেও এধরণের সহযোগিতামূলক কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে।

এছাড়াও ভারত-পাক যৌথ কর্মসূচি নেওয়ার অনেক সম্ভাবনা আছে। আর ভারত

এই অঞ্চলের বাইরে এধরণের কর্মসূচির ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভারতের এই পারদর্শিতা কাজে লাগানো যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের গবেষণা প্রমাণ করেছে যে ভারত-পাক যৌথ উদ্যোগ পাকিস্তানী ভোগ্যপণ্য উৎপাদনেব ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ হবে, এমন কোন কথা নেই; বরং তা উন্নত বিশ্ব থেকে আমদানি করা দামী প্রযুক্তির বদলে সস্তা অথচ শ্রমঘন প্রযুক্তির সন্ধান দিতে পারে।

একই সাথে বপ্তানির উদ্দেশ্যে ভারত পাক যৌথ উদ্যোগেব পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এই দুই দেশের মধ্যে যেসব বহুজাতিক শিল্প রয়েছে, তাদের মধ্যে সহযোগিতা— সম্ভবত শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে— উৎপাদনকে আঞ্চলিক স্তরে বাঁধতে পারবে ও একসঙ্গে বেশি পরিমাণে উৎপাদনেব সুবিধা (benefit of scale) নিতে পারবে। এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহজেই করা যায় এখনই বর্তমান সুজুকি গাড়ি ও ইয়ামাহা মোটরসাইকেল কারখানার ক্ষেত্রে। সীমান্তের দুপারের শিল্পপতি গোষ্ঠী, দুই দেশেব সরকার ও সার্ক সেক্রেটারিয়েটের টাস্ক ফোর্স দ্বারা প্রস্তুত পলিসি পেপারগুলিতে ভারত-পাক প্রযুক্তিগত সহযোগিতাব জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয়েছে ঃ

১) মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ, সাইকেল
২) কাঁচ প্রস্তুতি
৩) ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি
৪) টেলিযোগাযোগ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি
৫) প্লাস্টিক ও কৃষি প্রযুক্তি
৬) সিমেন্ট
৭) বন্দর ও জাহাজ সারানোব ব্যবস্থা
৮) লোহা ও ইস্পাত
৯) খাদ্য প্রস্তুতি ও কৃষি নির্ভর শিল্প, সার
১০) পাট, টেক্সটাইল, চর্মশিল্প
১১) রবার ও প্লাস্টিক দ্রব্য
১২) খনিজ ভিত্তিক শিল্প
১৩) ঔষধ ও রাসায়নিক
১৪) টেলি যোগাযোগ; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি
১৫) খেলার সরঞ্জাম

সার্কের একটি স্টাডি গ্রুপ এমনকি আঞ্চলিক শিল্পের নববিন্যাসের কথাও বলেছে

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধাঁচে। এর অর্থ, অঞ্চলের উন্নত অর্থনীতি কম উন্নত অর্থনীতির জন্য, যারা প্রযুক্তি ও উৎপাদন বহুমুখী করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, তাদের জন্য উৎপাদনের কিছু কিছু ধাপ ছেড়ে রাখবে। এর জন্য শিল্পের নতুন অবস্থানের (Location) নতুন ধরণ স্থির করতে হবে এবং দেশগুলির মধ্যে আদানপ্রদানের জন্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই ধরণের আঞ্চলিক শিল্প বিন্যাস কর্মসূচি সফল হবে কিনা তা ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর অনেকটাই নির্ভর করে— কারণ তারাই এ অঞ্চলের দুই প্রধান শিল্প শক্তি।

ভারত-পাক প্রযুক্তিগত সহযোগিতার আর একটি ক্ষেত্র হল দু'দেশের সাধারণ পরিবেশতন্ত্রের কার্যকর ব্যবহার। ১৯৬০ সালে ভারত-পাক সিন্ধুর জল চুক্তি ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে সেচ সম্ভব করেছিল। উন্নয়নের পক্ষে জল, শক্তি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সিন্ধু চুক্তির ধারায় চললে মানবজাতির এক পঞ্চমাংশ প্রভূত উপকৃত হবে। বিভিন্ন গবেষণায় ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে, এই অঞ্চলের জল সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে কেমনভাবে অঞ্চলের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ করা যায়। জলবিদ্যুতের এই সম্ভাবনা ভারতের ক্ষেত্রে ৫০,০০০ মেগাওয়াট আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ২১,০০০ মেগাওয়াট—এর যথাক্রমে মাত্র ৮.৬ শতাংশ ও ১১.২ শতাংশ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু ২০১৮ সালের মধ্যে শুধু পাকিস্তানেই বিদ্যুত উৎপাদন বর্তমানের ১২,৮৫০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে করতে হবে ৫৫,০০০ মেগাওয়াট, ভারত ও পাকিস্তানের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর একটা উপায় মধ্য এশিয়া ও হিমালয় অঞ্চলের জলবিদুৎ সম্ভাবনাকে যৌথভাবে ব্যবহার করা ও পাওয়ার গ্রিডের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশে তা সরবরাহ করা। ঝিলম নদী পাকিস্তানে ঢোকার আগে ভারতের পাঞ্জাব দিয়ে যায়— ঝিলমের জল ভাগাভাগির বিষয়ে আলোচনা চলছে। জলবিদ্যুতের ব্যাপারে ভারত নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে সহযোগিতা করে সুফল পেয়েছে— এবং এই বিদ্যুতের কিছুটা পাওয়ার গ্রিডের মাধ্যমে পাকিস্তানে পাঠানো যায়। একইভাবে তাজাকিস্তান ও কিরঘিজস্তান থেকে পাকিস্তান যে বিদ্যুৎ আমদানি করে তা উপমহাদেশে বন্টিত হতে পারে। যৌথ/সাধারণ একটি গ্রিড ব্যবস্থা উত্তর আমেরিকায়, ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে চালু আছে। যুক্তি বলে, দক্ষিণ এশিয়ায়ও তা চালু করা সম্ভব। একটি যৌথ ভারত-পাক গ্রিড ব্যবস্থা কোন কল্পকথা নয়, তা সম্ভব ও সাশ্রয়ী। জানুয়ারি, ১৯৮৮ তে ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান ত্রিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্মেলনে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল সরকারিভাবে দক্ষিণ এশিয় বৈদ্যুতিক গ্রিড ব্যবস্থার কথা বলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দীর্ঘকালীন বিচারে জলবিদ্যুৎ তাপ বিদ্যুতের (ভারত ও পাকিস্তান যে বিদ্যুতের উপর প্রধানত নির্ভরশীল) চেয়ে সস্তা ও পরিবেশগতভাবে ভাল। তাছাড়া ভারত বিশ্বের এক প্রধান সৌর শক্তি কর্মসূচিবিশিষ্ট দেশ। ভারত এই

প্রযুক্তি পাকিস্তানকে দিতে পারে; পাকিস্তানের সিন্ধের প্রকৃতি ও পরিবেশ ভারতের রাজস্থানের মত— রাজস্থান একটি স্বীকৃত সৌরশক্তি এলাকা। জ্বালানীকাঠ, কাঠকয়লা, প্রাণীজ বর্জ্য, এ ধরণের নবীকরণযোগ্য (renewable) শক্তি উৎসের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রস্তাব এসেছে। শক্তি (energy) সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি পরিকাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে, বিশেষত : বায়োগ্যাস, বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি ও ক্ষুদ্র বিদ্যুতশক্তির ক্ষেত্রে।

শিল্পোন্নয়নের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রাকৃতিক গ্যাস, দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশেই যার অভাব। ১৯৯৮-৯৯ সালে পাকিস্তানের (আনুমানিক) কম পড়বে দিনে ১.৬ বিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস, আর ভারতের দৈনিক প্রয়োজন বর্তমানে ৬৫ মিলিয়ন কিউবিক ফিট বেড়ে ২০১০ সালে হবে ২৮০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট। এই প্রয়োজন ভারত-পাকিস্তান মেটাতে পারে যদি তারা যৌথভাবে পারস্য উপসাগর ও দক্ষিণ এশিয়ার পৃথিবীর দুই বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডার, যা ভৌগোলিকভাবেও দূরে নয়, থেকে গ্যাস আহরণ করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা ইরান, তুর্কমেনিস্থান ও কাতার থেকে পাকিস্তান হয়ে ভারত পর্যন্ত একটি পাইপলাইনের প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী গ্যাস নেওয়া যাবে পাকিস্তানের করাচি ও সুই থেকে এবং ভারতের গুজরাট থেকে— ভূপ্রাকৃতিক দিক থেকে এই দুই অঞ্চল এক ধরণের, ফলে পাইপলাইন পাততে প্রযুক্তিগত অসুবিধা হবে না। ভারতের কোন কোন গোষ্ঠী অবশ্য এই পরিকল্পনার বিষয়ে সন্দিহান। তারা মনে করেন ভারত-পাক দ্বন্দ্ব হলে পাকিস্তান এই লাইন কেটে দিতে পারে।

কিন্তু এ ধরণের ভীতি অমূলক। মনে রাখতে হবে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের কালেও সাইবেরিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের গ্যাসের লাইনের যোগ ছিল। ইজিপ্ট ও ইজরায়েলও এখন গ্যাস পরিবহন নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। তাছাড়া পাকিস্তান গ্যাসের লাইন ইচ্ছা হলে বন্ধ করে দিতে পারে এমন পরিস্থিতি যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য ভারত এই লাইন ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ASEAN দেশগুলিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে। প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে ভারত-পাক সহযোগিতার সম্ভাবনার বিষয়ে ভারতের পেট্রোলিয়াম সেক্রেটারী বিজয় কেলকার বলেছেন—

> "তেল নিয়ে যেমন দ্বন্দ্ব হতে পারে, প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে তা নয়। সেক্ষেত্রে সহযোগিতা চলতে পারে। এর সহজ কারণ এই যে প্রাকৃতিক গ্যাসের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সমতা বেশি, এবং চুক্তিগুলি দীর্ঘকালীন"।

এছাড়াও খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ রুখবার জন্য ভূকম্পন, আবহাওয়া

ও অন্যান্য পরিবেশগত পরিবর্তনের দিকে নজর রাখার ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান লাভজনকভাবে সহযোগিতা করতে পারে। এই অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্যও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এখানে ১৯৯৪ সালে ডিসেম্বর মাসে কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত সাসটেনেবল্‌ ডেভলপমেন্ট অফ মাউন্টেন এরিয়াজ অফ এশিয়া-র আঞ্চলিক কনফারেন্স-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে সহযোগিতার ভিত্তিতে পার্বত্য অঞ্চল রক্ষা ও পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতির একটি রূপরেখা তৈরির জন্য নীতিপ্রণেতা নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলি ও দাতা সংস্থাগুলি একত্রে মিলিত হয়েছিল। এটা পরিষ্কার যে এই ধরণের উচ্চাকাঙ্খী পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হলে ভারত ও পাকিস্তানের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগের মাধ্যমে আরো শক্তিশালী হবে। ফিনান্সিয়াল পুঁজি-বাজারের একীভবন, আঞ্চলিক আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক ও ভারত-পাক অর্থ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা— অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। দুই দেশ এমনকি আঞ্চলিক পরিকল্পনার কথাও ভাবতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় এবছরের শেষে আঞ্চলিক বিনিয়োগের উপর একটি দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক কনভেনশন হওয়ার কথা আছে।

কথা আছে তারপর একটি চুক্তি হবে যাতে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও বিনিয়োগকারী ও সরকারি অফিসারদের জন্য একটি আচরণবিধি থাকবে, যাতে করে এই নতুন অবস্থায় তারা কাজ করার দিকনির্দেশ পায়। কোন কোন ব্যাখ্যাকার এমনকি এ কথাও বলেছেন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বল্পকালীন দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত একটি আঞ্চলিক কাস্টমস ইউনিয়ন গড়ে তুলবে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো হয় অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ক্লোজার ইকনমিক রিলেশন ট্রেড এগ্রিমেন্টকে।

উপসংহার

আশা করব উপরের আলোচনা, ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে পেরেছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, শিল্প ও প্রযুক্তিগত পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সাধারণ সাশ্রয়কারী ব্যবহার এই সহযোগিতার কয়েকটি মূল এলাকা। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির কিছু বাধ্যবাধকতা এবং সার্ক-এর দেশগুলির নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টা ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্ভাবনাকে জোরদার করেছে। দুদেশের জনগণের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার জন্য ক্রমবর্ধমান সচেতনতার বিষয়টি ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে ইসলামাবাদে এক ভারতীয় সাংবাদিক ও দুজন UNDP পদাধিকারীর কাছে প্রকাশ

পায় যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এক পাকিস্তানি যুবক তাদের বলেন, "কে সাবমেরিন আর বন্দুক চায়? আমরা চাই স্কুল আর হাসপাতাল"। এ প্রসঙ্গে ১৯৯৬ সালে কলকাতায় পাকিস্তান-ভারত পিপলস ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসির মিটিংয়ের সময় কলকাতার রাস্তায় সংহতি ও উচ্ছ্বাসের দৃশ্যগুলির কথাও মনে করা যায়। সীমান্তের দুধারের নারী স্বাধীনতা ও আইনী অধিকার কর্মীরা একত্র হয়ে এবিষয়ে জনমত তৈরি করেছে যে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। বিখ্যাত পাকিস্তানি ভাষ্যকার সমিমুল্লা এস কোরেশি তাঁর দেশের ক্রমশ জনপ্রিয় চিন্তার কথাই বলেন তাঁর লেখায় ঃ

"সমস্যায় (রাজনৈতিক) সমাধানের জন্য অপেক্ষা না করে ভারত ও পাকিস্তান আস্থা তৈরির জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে, যেগুলি আলাপ আলোচনার পরিবেশ তৈরি করবে। আমরা ধাপে ধাপে এগোতে পারি। প্রথমে আস্থা তৈরির পদক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রিতভাবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য শুরু করা, বাকিটা পরে করা যাবে।"

এই নতুন মনোভাব সম্পর্কে আর এক পাকিস্তানি সাংবাদিক মন্তব্য করেন,

"দুদেশের মানুষের মনোভাব এখন ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর পক্ষে। (দেশভাগের ফলে) বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলো তো এটা চায়ই, ব্যবসায়ীরাও চায় সীমান্ত পেরিয়ে পণ্যের যাতায়াত। বাজেট পরিকল্পনাকারীরা যেখানেই সম্ভব সাশ্রয় করার উপায় খুঁজছেন... এখন দুই দেশের রাজনৈতিক নেতাদের উপর দায়িত্ব সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া, পুরনো অবস্থান আঁকড়ে থাকা নয়।"

কৌতূহলের বিষয় এই যে পাকিস্তানে গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তেমন গুরুত্ব পায়নি। নওয়াজ শরিফ তাঁর নির্বাচনী প্রচারের সময় শান্তিপূর্ণভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করতে তাব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবস্থানের কথা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি ভারতের সঙ্গে সরকারি স্তরে আলোচনার জন্য কোনও পূর্বশর্ত আরোপ করেননি। তিনি বলেন, 'আমরা ৪৭ বছর দেরি করে ফেলেছি, আর দেরি করা যায় না'। পাকিস্তানি পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, নওয়াজ শরিফ পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, তিনি ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল করার ক্ষেত্রে বাধাগুলি দূর করার কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করলেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরালও বলেছেন, 'আমরা অতীতের বন্দী হয়ে থাকতে চাই না, আমরা পুরনো বদ্ধ ধারণার বাইরে আসতে চাই'। গুজরালতত্ত্ব ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সম্পর্কের উন্নতির প্রচেষ্টা করতে চায়, প্রতিদানের উপর জোর না দিয়েই। এভাবে তারা উপমহাদেশকে একটি 'সহযোগিতামূলক প্রতিবেশী অঞ্চলে' পরিণত করতে চায়। ১৯৯৭ সালের মে মাসে মালেতে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে শরিফ

ও গুজরাল দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য কোনও বিশেষ প্রস্তাবে রাজি হওয়ার যে সাবেক প্রথা তা প্রথম ভাঙলেন, সেটাও গুরুত্বহীন নয়। সার্ক-এর কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করে আরও কার্যকর ও প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে এডিনবরার কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনেও শরিফ ও গুজরালের ব্যক্তিগত স্তরে চমৎকার বোঝাপড়া প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী দুদেশের বিদেশ সচিবরা 'আলোচনা চালানোর জন্য' বসেন। জানুয়ারি ১৯৯৮-এ ঢাকায় ত্রিপাক্ষিক বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলনে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরা আবার দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নততর করতে ভারত-পাকিস্তানের দৃঢ় ইচ্ছার কথা জানান। ভারতীয় বিদেশ সচিব কে রঘুনাথের কথায় :

'আমরা এই চিন্তার শরিক যে আমরা আলোচনা চালাব। বিশেষ কোনও বিষয়ে মতপার্থক্য আমাদের আলাপ আলোচনা থেকে বিরত করতে পারবে না।'

ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী গুজরাল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মাল পরিবাহী ট্রেনের সংখ্যা মাসে ১৫টি থেকে বাড়িয়ে ৩০টি করার প্রস্তাব দেন, ফাস্টট্র্যাক্ট বিনিয়োগ ও যৌথ সংস্থার প্রস্তাব দেন। পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ অর্থনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বাধাসমূহ অপসারণের আশ্বাস দেন এবং ১৯৯৮ সালে একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্মেলন ডাকার কথা ঘোষণা করেন। ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনের যৌথ ঘোষণায় বিদেশী পুঁজি আকর্ষণের জন্য আঞ্চলিক বিধি নিয়মের মধ্যে সমতার কথা বলা হয়। গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিকতার এইসব সূচক দেখায় যে সহযোগিতার নীতি নিলে দুটি চিরাচরিত শত্রু দেশের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব। ভারত-পাক গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিকতার এই ধারা সহযোগিতার রাজনীতি যে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতির পক্ষে সহায়ক হতে পারে সে সম্পর্কে সন্দিহানদের সন্দেহের বিপরীতে দাঁড়ায়।

ভারতীয় এক ভাষ্যকারের ভাষায়, 'দক্ষিণ এশিয়া আমাদের আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নতি করতে ও তাকে আরো উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে ডাকছে।' ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিরও আগে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্স ডেকেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন উপনিবেশ থেকে মুক্ত দক্ষিণ এশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। ভারত যেহেতু এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড় শক্তি, আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্যোগ নিতে হবে ভারতকেই, বিশেষত : পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের রাজনীতির কয়েকটি ধারা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেমন ধর্মীয় গোষ্ঠীবাদ। এগুলি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে পাকিস্তানের সঙ্গে আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নষ্ট হবে। হিন্দু উগ্রজাতীয়তাবাদীদের গুণ্ডামি যখন পাকিস্তানি গজল গায়ক

গুলাম আলির সঙ্গীতানুষ্ঠান পণ্ড করে বা বিখ্যাত চিত্রকর মকবুল ফিদা হোসেনের বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে, সীমান্তের ওপারে তা খারাপ সংকেত পাঠায়। অন্য ক্রেতারা যেহেতু নগদে কিনতে রাজি ছিল সেহেতু গত বছর পাকিস্তানকে গম বিক্রি না করার মত ঘটনাও ঘটতে না দেওয়াই ভাল। একইভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মৌলবাদী শক্তি, যেমন জামাত-ই-ইসলাম যারা ভারতকে Most Favored Nation Status দেওয়ার বিরোধী, তাদের কোণঠাসা করতে হবে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানি নেতৃত্বর ভয় পেলে চলবে না যে এতে জনগণ নারাজ হবে। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি প্রেমদাস একবার বলেছিলেন, 'এমন কোনও কোনও সময় আসে যখন নেতৃত্বকে নেতৃত্ব দিতে হয়, জনগণের মতামতের অপেক্ষা করলে চলে না।' পাকিস্তানি কূটনীতিকদেরও উচিত হবে ভারত-পাক সম্পর্কের এই নতুন যুগকে নষ্ট হতে না দেওয়া।

অবশ্য একথা মোটামুটি জোরের সাথে বলা যায় যে নয়া দিল্লী বা ইসলামাবাদের কোনও শাসক গোষ্ঠীই নাগরিকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে 'যুদ্ধের বদলে সহযোগিতার পথ ধরা উচিত,' এই ক্রমবর্ধমান চেতনাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না— এই নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী ও নবীন এক প্রজন্ম যারা দেশভাগের আঘাতে মূঢ় হয়ে পড়েনি। পোখরান বিস্ফোরণের পর পর যে 'জাতীয়তাবাদী' হিস্টিরিয়া গড়ে তোলা হয় তা সত্ত্বেও ভারতের বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা পরমাণু বোমার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বড়বড় শহরে এর বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল হয়েছে, খবরের কাগজে, টিভি ও রেডিওতে, লোকসভায় বিরোধী কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বামপন্থীরা, বিশেষত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ক্ষতির দিক নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। বলা হয়েছে, আর বলার কারণও আছে যে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে নয়াদিল্লীর কোয়ালিশন সরকারের গদী বাঁচাতে যুদ্ধবাদ ছড়াতে। পাকিস্তানেও পাকিস্তান ভারত পিপলস ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্রাসির মত শান্তি সংগঠন ১৪ মে ১৯৯৮ ইসলামাবাদের রাস্তায় নামে এই ধ্বনি নিয়ে যে পাকিস্তান যেন এর উত্তরে বোমা না ফাটায়, সে যেন দু দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রী ও শান্তির স্বার্থে প্রত্যুত্তরদানের বিরত থাকে। ২৪ মে তিন বালুচি পাকিস্তানি এয়ারলাইন্সের একটি প্লেন ছিনতাই করে এই দাবি নিয়ে যে পাকিস্তান যেন বালুচিস্তানে পরমাণু বোমা পরীক্ষা না করে। ভারত সরকারও পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে (রাজনৈতিক কূটনৈতিক) ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার চেষ্টা করছেন। পারমাণবিক দ্বন্দ্ব যে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রত্যাশার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে না তার একটা প্রমাণ পাই যখন ১৯৯৮-র ১১ই ডিসেম্বরের সার্কের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় ও পাকিস্তানি শিল্পপতিদের আলোচনা

সভা। আবার, সিয়াচীন নিয়ে থমথমে ভাবের মধ্যেও ১৯৯৯-র ফেব্রুয়ারিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর ঐতিহাসিক দিল্লী-লাহোর বাস যাত্রাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এটা ঠিক যে ১৯৯৯-এর মে-জুনে কার্গিল সংকট দুই দেশের সম্পর্কের উপর দুভার্গ্যজনক ছায়া ফেলেছে। উভয় দেশের শাসক-শক্তি এই সংকটের মধ্য থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তুলেছে। নওয়াজ শরিফ যেমন পাকিস্তানের ভেতরের বিভিন্ন সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে কার্গিলের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তেমনি দিল্লীর শাসকবর্গ পাক মদতকারী অনুপ্রবেশকারীদের হটিয়ে দেওয়াকে উপযুক্তরূপে নিজেদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনে বা সরকার গঠনে কাজে লাগিয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে কার্গিল উপাখ্যানকে কাজে লাগানো হয়েছে সংখ্যালঘুদের প্রতি গভীর ক্রোধের মাধ্যম হিসাবে এবং ভারতের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এমনকি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ১৯৯৯-র ২৮ শে জুলাই থেকে ২৬ শে আগস্ট মাস ব্যাপী কর্মসূচি নেয় কার্গিল শহীদদের জন্য অর্থ সংগ্রহ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা এবং ধর্মের মাধ্যমে জনগণকে উজ্জীবিত করতে। এমনকি বলিউড কার্গিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক অন্ধ দেশপ্রেম মূলক সিনেমা তৈরি করে।

এই কার্গিল সংকটের উল্টোপিঠটি কিন্তু একেবারেই অন্যরূপ। সংকটের পরবর্তীকালে দুই দেশই অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। এই যুদ্ধে ভারতরে খরচ দু'হাজার কোটি থেকে আড়াই হাজার কোটির মধ্যে, দৈনিক প্রায় ২০-২৫ কোটি টাকা। ভারতের Associated Chambers of Commerce and Industry জুলাই ১৯৯৯-র রিপোর্টে জাতীয় অর্থনীতিতে কিছু ক্ষতিকর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে যেমন,

(১) কার্গিল সংকট ১৯৯৯-২০০০ র ১৬.১% নির্ধারিত প্রতিরক্ষা বাজেটকে প্রায় ২০% বৃদ্ধি করে- যার ফলে রাজকোষের ঘাটতি ৪.৫% বৃদ্ধি পাবে এবং তদনুসারে সুদের হারও বৃদ্ধি পাবে।

(২) এই যুদ্ধ দেশে মূলধন আমদানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা নষ্ট করবে।

(৩) দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ মজুত তেল ভান্ডার নিঃশেষিত করবে এবং এর ফলে তেলের অভাব দেখা দেবে।

অন্য দিকে কার্গিল কান্ড পাক অর্থনীতিতেও আঘাত হানে। ১৯৯৯-২০০০ সালে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ১০.৯% বৃদ্ধি পায় যেখানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৬% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩% দাঁড়ায়। যুদ্ধের পরিণামে পাকিস্তানের ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থা সমূহ বিশৃঙ্খলতার সম্মুখীন হয়, বেকারি ও দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান হয়, স্বাস্থ্য কাঠামো হয় বিপদাপন্ন।

এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই এই সংঘর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের অসন্তোষ প্রকাশ পায়। যেমন ১৯৯৯-এর ১৯ শে জুন আফ্রসিয়ার খটাক *দি ফ্রন্টিয়ার পোস্ট* এ দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেন যে ভারত-পাক যুদ্ধ দু দেশের ক্ষুধা, রোগ ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভীষণ ক্ষতিকারক হবে। এই দৈনিক পত্রিকায় বারংবার সতর্ক করে বলা হয় যে সরকারকে অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি থেকে সাময়িক বিরাম মাত্র এনে দিয়েছে কার্গিল কান্ড। ১৮ই জুলাই ১৯৯৯ *দি ডন*-এ একটি নিবন্ধে বলা হয় পাকিস্তানের সমস্ত জনগণ কার্গিল ক্ষেত্রে সরকারের প্ররোচনাকে সমর্থন করেনি। ১৯৯৯-র জুলাই-এ লাহোরে এক আলোচনা সভায় আসমা জাহাঙ্গীর বলেন পাকিস্তানি মহিলারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কারণ তারাই যুদ্ধ, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংঘর্ষে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই লাহোর কনফারেন্সের প্রস্তাবে পাকিস্তানে জনমতের একটি বৃহৎ অংশ যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এটা স্মরণ করা উচিত যে কার্গিল সংকটের চরম সময়ে পাকিস্তানে একাধিক জনসমাবেশে দক্ষিণ এশিয়াতে পারমাণবিক শক্তির প্রতিযোগীতার বিরুদ্ধে এবং দু' দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের সপক্ষে দাবি করা হয়। এছাড়া কার্গিল দ্বন্দ্ব লাহোর-দিল্লী বাস যোগাযোগ কে বিঘ্নিত করে নি। পাকিস্তান হতে আগত প্রায় সব বাস যাত্রীই সীমান্তে সংঘর্ষের বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

ভারতের দিক থেকেও ভারত-পাক শুভেচ্ছার দিকটি প্রতীয়মান হয়। যেমন, যখন সেনারা কার্গিল সংঘর্ষরত তখন সীমান্তের মানুষেরা শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। সুখজিন্দার সিং নামে এক কৃষক বলেন, 'আমরা আর যুদ্ধ চাই না।' বলিন্দার নামে অন্য এক কৃষক আক্ষেপ করে বলেন যে তারা যুদ্ধের ভয়ে কোনও দিন পাকা বাড়ি তৈরি করতে পারেন নি এবং দু'দেশের সরকারের কাছে শান্তির জন্য আবেদন করেন। বলিন্দারের এই আবেদন এই উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশের অনুভূতিরই প্রকাশ। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে কার্গিলত্তোর সময়ে সার্কের দেশগুলির ৪৪ জন অংশগ্রহণকারী কে নিয়ে কলকাতাতে Engineering Export Promotion Council of India ক্রেতা বিক্রেতাদের একটি সম্মেলন ডাকে, যেখানে ৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ব্যবসা হয়। সাম্প্রতিক ইন্দো-পাক উত্তেজনার মধ্যেও এই সম্মেলন পণ্যের অবাধ চলাচল ও শুল্ক-বাধা অপসারণ করে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখে। বস্তুতঃ ভারত এবং বাংলাদেশ ছিল পাটের বড় উৎপাদক আবার ভারত ও পাকিস্তান সবচেয়ে বড়ো তুলা উৎপাদক এবং শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো চা উৎপাদক। এই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়ে Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry এর সভাপতি সুধীর জালান ১৯৯৯-র মাঝামাঝি এক আলোচনাচক্রে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে দেখান কিভাবে ব্যাবসায়িক সম্পর্কের উন্নতি তথা পণ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশ আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হতে পারে। তিনি এজন্য উদ্যোগের

ও সঠিক কৌশলের উপর গুরুত্ব দেন। লক্ষণীয় যে, উভয়দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে শান্তির জন্য ক্রমশ গ্ভীর আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে। দু দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত Association of People of South Asia এবং Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy- এই দুই সংগঠন নতুন দিল্লী ও ইসলামাবাদের কাছে নিয়ন্ত্রণরেখাকে মান্য না করা, নতুন করে আলাপ-আলোচনা শুরু করা, পারমাণবিক দ্বন্দ্ব বর্জন করা এবং মানুষে মানুষে কথাবার্তার জন্য ক্রমাগত আবেদন রাখছে।

১৯৯৯-র ১২ই অক্টোবর পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মুশারফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ভারতকে নতুন করে আঘাত করে। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইসলামাবাদের এই সামরিক প্রশাসন ১৭ই অক্টোবর সীমান্ত বরাবর 'Unilateral military deescalation'-এবং দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর করার জন্য ভারতের সঙ্গে একসাথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বস্তুত উভয় দেশের সম্পর্কে 'Flawed Inheritance' থাকা সত্বেও কোন দেশের শাসকেরা দীর্ঘস্থায়ীভাবে ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের সুসম্পর্ক স্থাপনের মানসিকতার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে থাকতে পারবে না। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের যে কোন শাসক শক্তি যতই ঝড় তুলুক না কেন উভয় দেশের মানুষ ক্রমেই পরস্পরের কাছাকাছি আসার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছেন। এর বড়ো উদাহরণ হল সামরিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভারত বা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে নি। এই বাস্তবতাই বলে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্কের পথ দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু উভয় দেশের শান্তি-কামী মানুষ এবং সমাজ সচেতক সমাজবিজ্ঞানীরা ভারত-পাক সহায়তামূলক আদান প্রদানের পক্ষে উৎসাহী।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সমাজ-চিত্র ঃ কয়েকটি সমস্যা

আবীরা বসু চক্রবর্ত্তী

সাধারণত ঃ একটি ধারণা কাজ করে যে, ইতিহাস শুধুমাত্রই রাজ্য-সম্রাট-অমাত্য-আনুগত্য এবং রাজার পরে রাজার বংশাবলী। অথচ ইতিহাস নিয়ে চর্চা যাঁদের তাঁরা বোঝেন যে, ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে জনসাধারণের জীবনকে ইতিহাসের আলোয় বিশ্লেষণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

সমাজ এবং সংস্কৃতি প্রকৃতই অচ্ছেদ্য। তাই সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণেই গড়ে তোলা সম্ভব সেই সমাজের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রটি। এই ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করে থাকে সাহিত্য। যেহেতু সাহিত্য তৈরি হয় সমাজ থেকেই তাই সমাজের বিবর্তনও ধরাপড়ে সাহিত্যে। সেই অর্থে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মানসিকতার বিবর্তনের দলিল।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যে সাহিত্যের উপরে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিশেষরূপে নির্ভরশীল সেই প্রাচীন সাহিত্য কখনই তার সমসাময়িক সমাজকে নির্দ্বিধায় উপস্থাপিত করে না। রীতিমত সমস্যা দেখা দেয় যখন কোনও একটি গ্রন্থের সময়কালে স্পষ্ট নির্ধারিণ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সময়কে দুই ভাবে ভাগ করা যায় — একটি সামাজিক কালবিভাগ এবং অন্যটি রাজনৈতিক কালবিভাগ। সামাজিক ইতিহাসের বা সমাজ চিত্রের কোনও নির্দিষ্ট কাল হয় না, একে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের বন্ধনীতে আটকে রাখা যায় না। বলা উচিত সময়ের পরিবর্তন সমাজকে যে বিবর্তনের পথে নিয়ে যায়, সমাজ-চিত্রও সেইভাবেই পরিস্ফুটিত হয়। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, সমাজ কখনই রাজনীতির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হতে পারে না বা রাজনৈতিক পরিবর্তনে প্রভাবিত না হয়েও থাকতে পারে না। তাই সামাজিক ইতিহাসকে যদি রাজনৈতিক কালবিভাগের অন্তর্গত করা হয় তাহলে বোধহয় ভীষণ অন্যায় হয় না। এই সমাজ চিত্রেরও দুটি রূপ আছে। একটি হল সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কার, মানুষের সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি নিয়ে গঠিত সমাজচিত্র অর্থাৎ সমাজের অন্তরঙ্গ রূপটি। অপরটি হল আরেক ধরণের সমাজ-চিত্র, যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'Material Culture' বা নিতান্ত পার্থিব জগতের সংস্কৃতির বা সমাজের বহিরঙ্গের রূপটি। অর্থাৎ নগর পরিকল্পনা, বিভিন্ন

আকারের গৃহ, বিভিন্ন দিকে তাদের অবস্থান, দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, বাসন-পত্র, বিভিন্ন দ্রব্যের এবং আকৃতির গহনা প্রভৃতি থেকেও একটি স্পষ্ট সমাজ চিত্র উঠে আসে সমান সত্যতায়। কিন্তু কোন গ্রন্থের সময়কাল নির্ধারণ না করতে পারায় সেই গ্রন্থের থেকে উঠে আসা সমাজ চিত্রটিরও সঠিক মূল্যায়ন হয় না। কোনও কোনও গ্রন্থের তো নির্দিষ্ট লেখকই খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এই সমস্যা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এর থেকে বেরোনর পথ বোধহয় অতি শীঘ্রই খুঁজে বার করা উচিত। এই সমস্যায় আচ্ছন্ন বহু গ্রন্থের নামই এই আলোচনায় আসতে পারে, কিন্তু স্বল্প পরিসরে বড় আলোচনা সম্ভব নয়, তাই আমি কয়েকটি মাত্র গ্রন্থই নির্বাচন করেছি। যে গ্রন্থগুলি আমি নির্বাচন করেছি সেগুলি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ এমনকি বলা যেতে পারে দিকনির্ণায়ক হিসাবে পরিচিত।

যেমন প্রথমেই ধরা যাক — জাতক। ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত জাতকসংখ্যা মোট পাঁচশত পঞ্চাশ এবং জাতকের সময়কাল হিসাবে ধরা হয় খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতক থেকে খ্রিঃ প্রথম শতক পর্যন্ত। এই সময়কালের বন্ধনীতে আমরা পাই ষোড়শ মহাজনপদ, ক্রমান্বয়ে মগধের উত্থান, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও পতন, শুঙ্গ এবং কন্ব বংশ এবং কুষাণ সাম্রাজ্যের উত্থান। অর্থাৎ পশুচারণ অর্থনীতি থেকে কৃষি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরজীবনের পুনরাবির্ভাব এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল বাণিজ্যের বিকাশ। এই বিরাট এবং সদাপরিবর্তনশীল সময়কে জাতকে সঠিকভাবে পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জাতক পাঠ করলে যে এই বিরাট পরিবর্তন বিশেষ নজরে পড়ে তা কিন্তু নয়। বরঞ্চ সমাজ অর্থনীতিতে বাণিজ্যের বিকাশ ও বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ গল্পই বণিক সমাজ বা ক্ষত্রসমাজকে নিয়ে রচিত। অঙ্গুলিমালের উপাখ্যান জাতীয় কয়েকটি ক্ষেত্র বাদ দিলে সমাজের একদম সাধারণ স্তরের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। এছাড়া জাতকে প্রাচীন ভারতবর্ষের কোশল, বৈশালী, মগধ, বারাণসী প্রভৃতি রাজ্যের অনেক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। কিন্তু কয়েকটি আখ্যানব্যতীত অধিকাংশ জাতককেই কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমায় আনা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে এইটুকু মাত্র বোঝা যায় যে, আখ্যানটি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তী কালে রচিত। এই আখ্যানগুলিতে বুদ্ধঅর্চনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে চৈত্য, অশ্বত্থ বৃক্ষ, বোধিদ্রুম ইত্যাদি শব্দ। এমনকি চতুর্থখণ্ডের অন্তর্গত 'মাতৃ পোষক জাতকে' বলা হয়েছে যে, বোধিসত্ত্বের একটি শীলাময়ী মূর্তি - গঠন করে মহাসম্মান সহকারে পূজা হত (আখ্যান সংখ্যা ৪৫৫)। তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'সুজাত জাতক'- এ বর্ণনা করা হয়েছে - "..অস্থি আহরণ করিয়া, উদ্যানে মৃত্তিকাস্তূপ নির্মাণ পূর্বক... পুষ্পদ্বারা সেই স্তূপের পূজা করিতেন"(আখ্যান সংখ্যা ৩৫২)। কিন্তু অধিকাংশ জাতকেরই সময়কাল অজ্ঞাত থাকায় কোন পরিচ্ছন্ন চিত্রঅঙ্কণে বড়ই

অসুবিধা হয়ে থাকে। এমনকি, বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় রচিত জাতকগুলির কালানুক্রমিক সজ্জা অসম্ভব। এছাড়া বহু জাতক আছে যা অন্য আখ্যান দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত যার ফলে তাদের কালনির্ণয় সম্ভবপর হয় না। যেমন— দশরথ জাতক। এটি রামায়ণেরই গল্প এবং সমস্ত ঘটনাক্রম জাতককার রামায়ণ থেকেই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ঈশপের বেশ কয়েকটি আখ্যান জাতকের পরিচ্ছদে বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে সুবর্ণহংসজাতক (The Goose with golden eggs); দ্বীপিজাতক(The wolf and the lamb); সিংহ চর্ম্মজাতক (The Ass in a lion's skin) ইত্যাদি। প্রায় পাঁচশত পঞ্চাশটি জাতকের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র, ঈশপ, হিতোপদেশ, রামায়ণ প্রভৃতির ছাপ সমন্বিত জাতকের সংখ্যা প্রচুর। কোনও কোনও আখ্যানে বৌদ্ধভাব বিশেষ প্রবল হওয়ায় বোঝাই যায় যে, ঐ আখ্যানগুলি বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃক রচয়িত। অতএব, আখ্যানিকার কোন আমলের তা স্পষ্ট না হওয়ায় জাতকের নির্দিষ্ট কাল নির্ণয়ও সম্ভব হচ্ছে না। ঈশানচন্দ্র ঘোষ স্পষ্টতর মনে করেন, ".... জাতক নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। যিনি যখন সুবিধা পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন আখ্যানকে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া জাতক নামে চালাইয়া গিয়াছেন" (উপক্রমণিকা, জাতক প্রথম খণ্ড, চতুর্থপাতা)।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি সমস্যার কথা চলেই আসে। তা হল প্রায় সমস্ত জাতকেই যে কোনও নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে বিশাল আয়তন বিশিষ্ট নগর, তোরণশোভিত একাধিক প্রবেশদ্বার, অট্টালিকার পর অট্টালিকা এবং হর্ম্য দ্বারা শোভিত রমনীয় নগর, নগরীর ছয়টি দানশালা যেগুলির অবস্থান আবশ্যিকভাবেই নগরীর চতুর্দ্বারে চারটি, মধ্যভাগে একটি এবং প্রাসাদের পার্শ্বে বা পুরোভাগে একটি, এছাড়াও বর্ণনায় আসে সপ্ত ভূমিক প্রাসাদ। ঐতিহাসিক রণবীর চক্রবর্তী তাঁর 'অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে' গ্রন্থে লিখেছেন- "এই বাঁধাগতের বর্ণনা থেকে নগরের বাস্তব অবস্থা ও বিন্যাস বোঝা শক্ত; ঐতিহাসিকেরা তাই যুক্তিযুক্ত কারণেই পালি সাহিত্যের প্রথাগত বিবরণের উপর পূর্ণ আস্থা রাখেন না" (অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, রণবীর চক্রবর্তী, পৃঃ ৮৬)। অতএব জাতকের উপর ভরসা করে বৌদ্ধপর্যায়ের সমাজচিত্র অঙ্কণ কোনমতেই সম্ভব নয়।

এরপর আসা যাক 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটির প্রসঙ্গে। এই গ্রন্থেরও সময় এবং লেখক পরিচিতি নিয়ে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই মত পোষণ করেন যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থটি হয়ত কৌটিল্য বা চাণক্য নামক ব্যক্তির একক রচনা নয়। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের ভূমিকায় একথা ব্যক্ত করেছেন যে, পূর্বের আচার্যগণ রচিত রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করে সেগুলি থেকে শাস্ত্রীয় বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তাকারে নিজনামে প্রচলিত অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের প্রকৃত উৎপত্তি কি করে, কিভাবে তা কিছুই বোঝা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সমস্যাই এই যে,

বেশিরভাগ গ্রন্থ সম্পর্কেই কোন অবিচল সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না, যা সময়বিশেষে বড়ই অসুবিধাজনক। অর্থশাস্ত্রে সর্বমোট পনেরোটি অধিকারণ বা অধ্যায় আছে, যার মধ্যে দ্বিতীয় অধিকরণ বা 'অধ্যক্ষপ্রচার' অংশটির মধ্যেই মৌর্যদের ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রয়েছে। কিন্তু বাকি ত্রয়োদশ অধিকরণে যদিও সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থা, রাজকর্তব্যাবলী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই মত প্রকাশিত আছে, তবু ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কালক্রম এবং লেখক সম্পর্কে তথ্য জানা না থাকায় সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থেরই লেখকের সময় বা কাল, বিভিন্ন লেখকের লেখা অংশীভূত হয়ে থাকলে সেগুলির কালক্রম এসমস্ত তথ্য থাকায় গ্রন্থগুলি যে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত গবেষকদের কাছে তাতে অবশ্যই কিছুটা অসুবিধা রয়ে গেছে। এই জাতীয় অস্পষ্টতা গবেষণাকারী এবং ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট দোলাচলের মধ্যে ফেলে দেয়— বোঝা যায় না কিভাবে এর সমাধান সম্ভব।

এরপর আসি রামায়ণ এবং মহাভারত প্রসঙ্গে। প্রাচীনতম কাল থেকে আজ একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আর কোনও রচনা ভারতীয় জনমানসকে এভাবে আপ্লুত রাখতে পারেনি। যা এই মহাকাব্যদ্বয় পেরেছে। এই দুই মহাকাব্য ভারতের অন্তরে বিরাজমান। সাধারণতঃ রামায়ণের সময় নির্দেশ করা হয় আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় বা দ্বিতীয় অব্দ থেকে খ্রিঃ দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। যে কোনও হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মতো (যদিও রামায়ণ ধর্মগ্রন্থ কি না তা এখনও খুব স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় নি) রামায়ণের মূল কাহিনীও বহুবার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বর্তমানের বিরাট কলেবর লাভ করেছে। অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিটি পরিবর্তনের সময় নিশ্চয়ই সমসাময়িক সমাজ ঐ গ্রন্থে তার নিজস্ব ছাপ রেখে গেছে, যা পরবর্তীকালে অনুধাবন করতে পারা দুঃসাধ্য। কেউ কেউ মনে করেন প্রায় ছশো বছর ধরে এর নির্মাণ। কোনও কোনও মতে, রামায়ণ কথায় অন্তত তিনটি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র উপাখ্যানের সমাবেশ বা সংমিশ্রণ ঘটেছে— অযোধ্যার কথা, কিষ্কিন্ধ্যার কথা এবং লঙ্কার রাবণের কথা।

এই কথা মহাভারত প্রসঙ্গেও বলা চলে কারণ মহাভারত প্রায় আটশত থেকে হাজার বছর ধরে রচিত। সময়ের বিস্তার দেখে মনে হয়, হয়ত রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনীর মূল অংশটি বহু বৎসর যাবৎ লোককথায়, আখ্যানে সঞ্চারিত ছিল। এবং এটা প্রায় স্পষ্টই যে, রামায়ণ যদি উপজাতীয় ঐতিহ্যের ধারক হয় তবে মহাভারত হল বর্ণাশ্রমধর্মী, উচ্চবর্গীয় সমাজের এবং বৈদিক ঐতিহ্যের প্রতীক। সাহিত্য ব্যতিরেকে সমসাময়িক সমাজের প্রকৃত চিত্রটি পাওয়া সম্ভবপর নয়, অথচ সেই ক্ষেত্রে নির্দিষ্টতা না থাকলে গবেষকদের বা ঐতিহাসিকদের প্রকৃত বিষয় অনুধাবনে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রত্নতত্ত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়ালেও, তেমন বিস্তারিতভাবে বিশেষ কোনও গ্রন্থ নির্ভর কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যেমন — মহাভারত প্রসঙ্গে

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিশেষ নতুন না হলেও রামায়ণ প্রসঙ্গে এই ভাবনা সাম্প্রতিক। কিন্তু সেক্ষেত্রেও গবেষণা বিশেষ কোনও নির্দিষ্টতা লাভ করে নি। যেমন— অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা প্রভৃতি নগরীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মত যে, এই নগরীগুলি কুষাণ এবং গুপ্তযুগের মধ্যবর্তী সময়ে গঠিত। অন্যদিকে, অযোধ্যার বিবরণানুসারে কোনও কোনও ঐতিহাসিক খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ -তৃতীয় শতকে ঐ নগরীর উত্থান ঘটেছিল বলে মনে করেন। অপরপক্ষে সাংকালিয়া কিন্তু মনে করেন যে, অযোধ্যা স্থাপিত হয়েছিল খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ বা খ্রিঃ পূঃ ১০০০ অব্দে। অস্ত্রে বিভিন্ন রকমফের, নগরীর চরিত্র নির্ণয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্ব কিছু আশার আলো দেখালেও, আরও গবেষণার প্রয়োজন। প্রত্মতত্ত্বের ক্ষেত্রেও বহু স্থানে খননকার্য হলেও যথাযথ সময়ে তার অপ্রকাশনা একটি বড় বাধাস্বরূপ। যাই হোক, বি.বি. লাল, ডঃ চাজানা, চকাশাম্বী, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, সাংকালিয়া — এঁদের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই সমস্যাগুলিতে যথেষ্ট আলোকপাত করবে, এই আশা রাখি। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে হয়ত নেই কারণ বহু সংখ্যক রচনা প্রকাশের জন্য প্রস্তুত। তবে ইতিহাস যেহেতু কালনির্ভর, তাই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন শাখায় উল্লিখিত সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সমস্যা এবং দ্বিধা থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারব।

সূত্র নির্দেশ

১) ঈশানচন্দ্র ঘোষ — জাতক (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)— করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

২) বসাক, ডঃ রাধাগোবিন্দ— কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (১ম খণ্ড - ১৯৬৪, ২য় খণ্ড - ১৯৬৭), General Printers & Publishers Pvt. Ltd., কলকাতা।

৩) ভট্টাচার্য, সুকুমারী — প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য (১৪০১), আনন্দ, কলকাতা।

৪) সেন, সুকুমার — ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস — (১৯৯২) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫) চক্রবর্তী, রণবীর — অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (১৩৯৮), আনন্দ, কলকাতা।

৬) কোরক সাহিত্য পত্রিকা — রামায়ণ সংখ্যা (শারদ, ১৯৯৮), কলকাতা।

৭) Keay, John — India A History (2000) — Harper Collins Publisher India.

৮) Ghosh, A— The City in Early Historical India (1973) — Indian Institute of Advanced study, Simla.

প্রাচীন আভীরগোষ্ঠী বিষয়ে একটি আলোচনা

সুপর্ণা ধর

লেখমালা ও অন্যান্য সাহিত্যগত উপাদন সমূহ থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের নানা যাযাবর উপজাতিদের সম্পর্কে জানতে পারি। এইরূপ একটি যাযাবর উপজাতি ছিল আভীরগোষ্ঠী। সম্ভবতঃ এই বিদেশী গোষ্ঠীটি পূর্ব ইরানের কোন অঞ্চল দিয়ে শকদের সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী কোন সময়ে ভারতে প্রবেশ করে। হেরাত ও কান্দাহারের মধ্যবর্তী 'আভিরবণ' এর বসবাসকারী হিসাবে তাদের নামকরণ আভীর হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের পতঞ্জলিব মহাভাষ্যে আভীরদের উল্লেখ পাওয়া যায় শূদ্র হিসাবে। মহাভারতের কোন কোন স্থানে আভীররা শুদ্র হিসাবে আবার কোন কোন স্থানে অপরান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবর জাতি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে।[১] আবার মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায় যে বৈরাম, পারদ প্রমুখ অভ্যাগতদের সঙ্গে আভীররাও অন্যান্য উপহার ও বিবিধ কম্বল যুধিষ্ঠিরকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। তাছাড়া বৈরাম, পারদ, কিতব সহ আভীর প্রভৃতি পার্বত্যজাতীয় অভ্যাগতগণ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসূয়যজ্ঞে উপায়ন স্বরূপ যে সকল দ্রব্য এনেছিলেন, তারমধ্যে ফলজাত মধুই ছিল প্রধান।

"তে বৈরামা ঃ পারদাশ্চ আভীরাঃ কিতবৈঃ সহ।

বিবিধং বলিমাদায় রত্নানি বিবিধানি চ।।

অজাবিকং গোহিরণ্যং খরোষ্ট্রং ফলজং মধু।

কম্বলান্ বিবিধাং শ্চৈব দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ"[২]

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব থেকে জানা যায় যে পরশুরামের ভয়ে দ্রাবিড়, আভীর, পুন্ড্র, শবর প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ তাদের ক্ষত্রিয়বৃত্তি ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় বৃষল বা গোপালকের বৃত্তি অর্থাৎ শূদ্রত্ববরণ করেছিলেন।—

"এবং তে দ্রাবিড়াভীরাঃ পুন্ড্রশ্চ শবরৈঃ সহ।

বৃষলত্বং পরিগতা ব্যুত্থানাৎ ক্ষত্রিধর্ম্মিণঃ।।"[৩]

মনুর সময় আভীরদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কারণ মনু নিজ রচনায় আভীরদের একটি মিশ্রজাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যমাতার সন্তানকে আভীর বলে উল্লেখ করেছেন। পুরাণ সমূহে আভীররা ম্লেচ্ছ ও দস্যু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে আবার অমরকোষে মহাশূদ্রী হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায় আভীরীদের।

মহাভারতে আভীররা দঃ পাঞ্জাব বা উঃ রাজস্থানের সরস্বতীর নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করত বলে বর্ণিত হয়েছে। 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি'তে 'অবেরিয় নামটি পাওয়া যায়। যা আভীরদের বাসস্থান হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। সুবাস্ট্রিনির (সৌরাষ্ট্র) উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবেরিয় অবস্থিত। টলেমি তাঁর 'ভূগোল'-এ 'অবিরিয়'কে সিন্ধুর ব-দ্বীপ এর উপরে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ সিন্ধুনদের ব-দ্বীপ এলাকা থেকে কাথিয়াবাড় উপকূল পর্যন্ত আভীরদের বসতি গড়ে উঠেছিল।[৪]

বিবিধ পুরাণে দশজন আভীর রাজার নাম পাওয়া যায়। যারা ৬৭ বছর ধরে রাজত্ব করেন। তাছাড়া আরো জানা যায় যে আভীররা অন্ধ্রজাতি বা সাতবাহনদের অধীনে রাজত্ব করত। সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর আভীররা নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করেন। কারণ পুরাণ সমূহ থেকে জানা যায় যে আভীররা অপরান্ত অঞ্চলে বসবাস করত। সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি তাঁর নাসিক প্রশস্তিতে এই অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। পুরাণ ও দেবীমোরি লেখসহ অন্যান্য লেখ থেকে কয়েকজন আভীর রাজার নাম জানতে পারা যায়। যাদের মধ্যে ঈশ্বর সেন, রুদ্র সেন প্রমুখরা প্রধান। অজন্তার সপ্তদশ গুহালেখ (ভগ্ন বা অসম্পূর্ণ) থেকেও এই বংশের পরবর্তী অন্ততঃ দশ প্রজন্মের কথা জানতে পারা যায়।[৫]

১৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রদত্ত বর্তমান সৌরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত লেখতে আভীর সেনাপতি বাপক-এর পুত্র রুদ্রভূতি কর্তৃক কূপখননের বর্ণনা নথি ভুক্ত করা আছে।[৬]

আভীর শিবদত্ত ও মাঢরী পুত্র ঈশ্বর সেনের নবম রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত নাসিক লেখ থেকে জানা যায় যে নাসিক জেলার ত্রিরশ্মি পর্বতের বৌদ্ধমঠ ও বিহারের সন্ন্যাসীদের ঔষধ সরবরাহের জন্য গোবরধন জেলার বাণিজ্যিক সংগঠনকে তিনি চার পর্যায়ে অর্থ দান করেন। যারমধ্যে প্রথম পর্যায়ে কুলরিক সংগঠনকে এক সহস্র কার্ষাপণ ও তৃতীয় পর্যায়ে পাঁচশত কার্ষাপণ অপর এক সংগঠনকে দান করেন যার নাম মুছে গেছে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭]

আনুমানিক খ্রিঃ তৃতীয় শতকের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ ৩৩০-৪৮ খ্রিঃ বাসিশ্ঠীপুত্র আভীর বসু সেন কর্তৃক তাঁর ত্রিশতম রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত নাগার্জুনী কোন্ডা লেখতে তিনি সেতাগিরিতে কাষ্ঠ নির্মিত ভগবান অষ্টভূজস্বামীন বা বিষ্ণুর মূর্তি স্থাপন করেছেন বলে দাবি করেছেন। শুধু তাই নয় এই লেখ থেকে আরো জানা যায় যে সঞ্জয়পুরের (বর্তমান

সঞ্জান) যবনরাজ, অবন্তির শকরাজ রুদ্রদামন এবং বনবাসীর বিষ্ণুরুদ্রবিশলাসন্দ সাতকর্ণিসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ খ্রিঃ তৃতীয় শতকে আভীর গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি[৮] বৃদ্ধি পায় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণের সঙ্গে আভীরদের রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

হরিষেন বিরচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে খ্রিঃ চতুর্থ শতকে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত উপজাতি ও অরণ্যবাসীগণের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় তারমধ্যে আভীরগণ অন্যতম।[৯] সেইসময় আভীরগণ কাঁসি ও ভিলসার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পরাজিত হবার পর আভীররা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হিসাবে বসবাস করে।

রাজস্থানের অন্তর্গত যোধপুরের ঘটিয়াল থেকে প্রাপ্ত ৯১৮ সম্বৎসর অর্থাৎ ৮৬০/৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিহার রাজ কক্কুক কর্তৃক প্রদত্ত একটি লেখতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাজস্থানের রোহিনী সকুপক থেকে কক্কুক দারুণ অর্থাৎ বিপজ্জনক আভীরজনদের সমূলে উৎপাটিত করে দিয়ে সেখানে ব্রাহ্মণদের বসতি গড়ে তোলেন। শুধু তাই নয় তিনি এখানে নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র এবং বিপ্রসংঘ স্থাপন করেন। যা ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে ক্ষত্রিয়দের এক আদর্শ কর্ম হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে।

> *"রোহিন্সকুপকগ্রামঃ পূর্ব্বমাসোদনা—*
>
> *শ্রয়ঃ। অসেব্যঃ সাধুলোকানাং আভীরজন দারুণঃ।"*[১০]

আভীরগণ শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রেই নয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের ভাষা ক্রমে ভারতীয় নাটকে অপভ্রংশ (বা নিম্ন প্রাকৃত) উপভাষা হিসাবে একটি সুস্পষ্ট স্থান অধিকার করে নেয়। ভারতীয় সঙ্গীত জগতের উন্নয়ণেও তাদের অবদান অনস্বীকার্য। প্রায় সব সঙ্গীত সংক্রান্ত কার্যই 'রাগিনী' (সুর) আভীরী বা আহীরী নামে স্বীকৃত। তবে কৃষ্ণ নামক মেষপালকের জীবনী ও গোপীনীদের সঙ্গে তাঁর প্রণয়লীলা সংক্রান্ত লোককাহিনী গঠনে তাদের অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ভারতের বিভ্নি অংশে আহীরদের (আভীরদের বংশধর) বিক্ষিপ্ত ভাবে সন্ধান পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, আভীরদের নামানুসারে ভারতের একাধিক অঞ্চলের নামকরণ হয়েছিল।[১১]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে আভীররা একটি বিদেশী জনগোষ্ঠী হিসাবে ভারতে প্রবেশ করে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে এবং যখনই তারা উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতির সুযোগ পায় তখনই তারা ক্ষমতা বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করে। এমনকি তারা 'ক্ষত্রপ' বা 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করে মুদ্রাও প্রদান করেন। ক্রমে তারা ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের বর্ণজাতি

প্রথায় গ্রথিত ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যদিও তারা খুব কম সময়েই সমাজে উচ্চবর্ণের মর্যাদা পেয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১) আর. সি. মজুমদার (সম্পা) *দ্য এজ অব ইম্পিরিয়াল ইউনিটি*, বম্বে, ১৯৫৫, পৃঃ ২২১-২৩।

২) *মহাভারত*, বঙ্গবাসী সং, সভাপর্ব, ৫১/১২-১৩, পৃঃ ২৬১।

৩) *মহাভারত*, অশ্বমেধপর্ব, ২৯/২৬, সুখময় ভট্টাচার্য, *মহাভারতের সমাজ*, শান্তিনিকেতন, ১৯৮৩, পৃঃ ১৫৯।

৪) দেবলা মিত্র, 'ফরেন এলিমেন্টস ইন ইন্ডিয়ান পপুলেশন', সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি) *দ্য ক্যালচরাল হেরিটেজ অব ইন্ডিয়া*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৬২২।

৫) আর. সি. মজুমদার (সম্পা) *এ কমপ্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া*, ৩য় খণ্ড, ১ম পর্ব, দিল্লী, ১৯৮১, পৃঃ ১৪৭-৪৯।

৬) আর. সি. মজুমদার (সম্পা) *দ্য এজ অব ইম্পিরিয়াল ইউনিটি*, বম্বে, ১৯৫৫, পৃঃ ২২১-২৩।

৭) ই. সের্নাট, 'নাসিক ইনসক্রিপশনস,' *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা*, ৮ম খণ্ড, নিউদিল্লী, ১৯৮১, পৃঃ ৮৮-৮৯।

একই লেখার জন্য দ্রষ্টব্য -

ভি.ভি. মিরাশি *করপাস ইনসক্রিপশনাম ইণ্ডিকেরাম*, ৪র্থ খণ্ড, ১ম পর্ব, উটকামাণ্ড, ১৯৫৫, পৃঃ ১-৪।

৮) ডি. সি. সরকার, 'নাগার্জুনকোণ্ডা ইনস্ক্রিপশন অব আভীর বসুষেণ', *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা*, ৩৪ খণ্ড, ১৯৮৭, পৃঃ ১৯৭-২০৩।

৯) ডি. সি. সরকার, সিলেক্ট ইনসক্রিপশনস বিয়ারিং অন্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি এনড্ সিভিলাইজেশন, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ২৬২-৬৮।

১০) ই. হুলৎজ্ এবং স্টেন কোনোর দ্বারা সম্পাদিত এই ঘটিয়াল লেখটির জন্য *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা*, ৯ম খণ্ড, ১৯৮১, পৃঃ ২৭৭-৮১ দ্রষ্টব্য।

এছাড়াও এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *দ্য মেকিং অব আর্লি মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৯৪, পৃঃ ৯২-৯৩।

১১) দেবলা মিত্র, 'ফরেন এলিমেন্টস ইন ইণ্ডিয়ান পপুলেশন' *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬২৩।

ঘন্টসালের মহানাবিক

সুচন্দ্রা ঘোষ

খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত প্রাপ্ত লেখমালাতে আমরা বৌদ্ধ সংঘ এবং জৈন প্রতিষ্ঠানে প্রচুর দানের উল্লেখ পাই। দান লেখগুলিতে সাধারণত দানের উদ্দেশ্য, দাতাদের নাম, তাঁদের বাসস্থান, পেশা, কি দান করা হচ্ছে ইত্যাদি উল্লিখিত হয়। এই ধরণের দান লেখর উপস্থিতি ভারতবর্ষের বহু এলাকায় দেখা যায়। রাজকীয় দানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরী পেশায়যুক্ত লোকেরাও প্রচুর পরিমাণে দানে অংশ নিতেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও পুণ্যের আশায়। দানের ক্ষেত্রে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না।[১]

বর্তমান প্রবন্ধে, এই ধরণের একটি দানলেখ আলোচনা করা হবে।[২] লেখটি অন্ধ্র উপকূলের বিখ্যাত বন্দর মসুলিপত্তনমের কাছে অবস্থিত ঘন্টসাল থেকে পাওয়া। উল্লেখ্য যে এখানে আরো চারটি দানলেখ পাওয়া গেছে। এটি একটি পাথরের ওপর ব্রাহ্মী লিপি এবং প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ। লেখটি তারিখ বিহীন। জে ফোগেল এটির সম্পাদনা করেছেন, কিন্তু তিনি লেখটির কোন কালনির্দেশ করেননি। পুরালেখ বিদ্যার নিরিখে লেখটিকে সম্ভবত আনুমানিক খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের বলা যায়। লেখটির কালনির্ণয়র ক্ষেত্রে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে সাহায্য করেছিলেন; এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

লেখটিতে ধর্মীয় দান হিসেবে বৌদ্ধ সংঘে একটি আয়কস্তম্ভ দানের উল্লেখ করা হয়েছে। দাতা উতরদতা (উত্তরদত্তা) নামক একজন মহিলা। তিনি গহপতি সবরের পুত্র মহানাবিক সিবকের ঘরণী অর্থাৎ পত্নী। দানকার্যটি তিনি পতি, কন্যা, বন্ধু ও সঙ্গীদের সহযোগে সম্পন্ন করেছেন।

[১। গহপতিনো সবরস পুতস মহানাবিকস সিবকস।

২। (ভ) রিয়য় ঘরনিয় উতরদতয়

সিধথমিতয় স-পতিকায়

৩। স-দুহুতকায় স-মিতামচায় অয়ক

(থ)ভ (দে) য়ধম]

লেখটি ক্ষুদ্র হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। লেখতে মহানাবিকের প্রাচীনতম উল্লেখ (খ্রিষ্টীয়

১ম শতক) সম্ভবত এখানে দেখা যায়। এই লেখর অন্তত চারশ বছর পরে মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেসলি অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি লেখতে আমরা রক্তমৃত্তিকা থেকে আগত মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের কথা জানতে পারি।[৩] অবশ্য খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের চারসাদা অঞ্চলের একটি ''খরোষ্ঠী'' দানলেখতে 'বেস' নামক একজন নাবিকের উল্লেখ আছে।[৪]

'মহানাবিক' শব্দটিও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আক্ষরিক অর্থে যদিও নাবিকদের প্রধানকে মহানাবিক বলা হয়, দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে নাবিকদের প্রধান ছাড়াও যিনি 'মহা নৌ' (অর্থাৎ বৃহৎ জলযান) চালান তাঁকেও মহানাবিক বলা যায়।[৫]

আলোচ্য লেখটির সঙ্গে প্রাপ্ত অন্য দুটি লেখতে কন্টকসোলা নামের উল্লেখ পাই। কাজেই আজকের ঘন্টসালকে প্রাচীন কন্টকসোলা এবং টলেমীর 'কন্টকস্‌সিলা' সাথে চিহ্নিত করা যায়। বৌদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে প্রখ্যাত অমরাবতী, জগ্গয়পেটা, নাগরজুনিকোণ্ডা এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। কেবল মাত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্রই নয়, এই অঞ্চল বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। টলেমী, তাঁর ভূগোলে কন্টকস্‌সিলাকে বাণিজ্যিক কেন্দ্র আখ্যা দিয়ে এর বাণিজ্যিক গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৬] কন্টকস্‌সিলা. টলেমীর মাইসোলিয়া এবং পেরিপ্লাসের মাসালিয়া[৭] অঞ্চলের অন্তর্গত। ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত বন্দর সমূহের মধ্যে মাসালিয়া (-মাসুলিপটনম) উল্লেখযোগ্য। ফলে ঘন্টসালের মত একটি উপকূলবর্তী বাণিজ্যিক কেন্দ্রে মহানাবিকের উপস্থিতি আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে।

আমরা যদি দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতের সঙ্গে একমত হই, তাহলে একজন মহানাবিক, মহা নৌ মানে বড়জলযান চালাতেন। বড়জলযান সাধারণত দূর পাল্লার বাণিজ্যের প্রয়োজন হত। অর্থশাস্ত্রেও বড় জলযানকে মহা নৌ বলা হয়েছে।[৮] জৈনগ্রন্থ অঙ্গবিজ্জায় আমরা মহাবকাশ অর্থাৎ অর্থাৎ বৃহৎ জলযানের উল্লেখ পাই। পেরিপ্লাসের লেখক আমাদের কোলান্দিও ফোন্টা (Kolandio phonta)[৯] নামক খুব বড় জলযানের সাথে পরিচয় করান যা পূর্ব উপকূলের বন্দরের মধ্যে চালানো হত। তাছাড়াও কোলান্দিও ফোন্টা'র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও যাতায়াত ছিল। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে আমাদের লেখর মহানাবিক সিবক দূর পাল্লার বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল কোথায় যেতেন এই মহানাবিক তাঁর নৌবহর নিয়ে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব যদি আমরা তৎকালীন বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক যোগাযোগের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করে রুলেটেড (Rauletted) মৃৎপাত্রে উপস্থিতি। বৈগাই বদ্বীপ অঞ্চলের অলগনকুলম, কাবেরীপট্টিনম, নট্টমেদু, আরিকামেদু, কাঞ্চিপুরম, শালিহুণ্ডম, উত্তর অন্ধ্রউপকূলের কলিঙ্গ

পটনম, চিল্কার পাশবর্তী মানিকপটনম, শিশুপালগড়, গাঙ্গেয় বদ্বীপের তমলুক এবং চন্দ্রকেতুগড়ে প্রচুর পরিমানেণ রুলেটেড মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।[১০] এছাড়া শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এই পাত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই ধরণের পাত্র আমরা খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত দেখতে পাই। এটি নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে উপকূলবর্ত্তী যোগাযোগের ইঙ্গিত দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে ভি.ডি. গোঘটে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত রুলেটেড মৃৎপাত্রে ব্যবহৃত মাটির বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রুলেটেড মৃৎপাত্রের উৎপত্তি স্থল ছিল চন্দ্রকেতুগড়-তমলুক অঞ্চল।[১১] এখান থেকেই পূর্বউপকূলবর্ত্তী বিভিন্ন অঞ্চল সমূহে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই পাত্র পাঠানো হত। উপকূলবর্ত্তী বাণিজ্যিক যোগাযোগের ইঙ্গিত আমরা খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সাতবাহনদের জারি করা জলযানের প্রতিকৃতি সম্বলিত এক বিশেষ ধরণের মুদ্রা থেকেও পাই।[১২] সাতবাহন রাজারাও হয়তো ওইসময়ে সামুদ্রিক ও উপকূলবর্তী বাণিজ্যের গুরুত্ব বুঝে এই ধরণের মুদ্রা জারি করেছিলেন। সম্ভবত মহানাবিক সিবক উপকূলবর্তী বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দাতা মহিলার বংশ পরিচয় থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এঁরা সম্ভ্রান্ত এবং সম্পন্ন। মহানাবিক সিবকের পিতা সবর একজন 'গহপতি'। ফোগেল গহপতি শব্দটিকে সংস্কৃত গৃহপতি সঙ্গে সমার্থক ধরে নিয়ে সবরকে পরিবারের প্রধান বলেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে গহপতি শুধুমাত্র একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী এবং সেই সুবাদে সমাজে গহপতির একটি স্বতন্ত্র উচ্চ মর্যাদা ছিল।[১৩] পালি সাহিত্যে এবং বিভিন্ন লেখ থেকে খুব স্পষ্ট ভাবেই জানাযায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই বিত্তশালী গহপতিরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে একজন গহপতির পুত্রবধুর বৌদ্ধ সংঘে একটি স্তম্ভ দান খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে লক্ষণীয় যে গহপতির পুত্র কিন্তু একজন গহপতি নন। তিনি একজন মহানাবিক।

তিনছত্রের এই ক্ষুদ্র লেখটিতে আমরা শুধুমাত্র 'মহানাবিক' শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখই পাইনা, এই শব্দের উপস্থিতি আমাদেরকে অন্ধ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের সমুদ্র বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে গহপতির পুত্র পৈতৃক বৃত্তি অনুসরণ না করে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছিলেন এবং পিতৃ পরিচয় দিয়ে তাঁর পারিবারিক বিশিষ্ট অবস্থানের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১) জেমস বার্জেস ও ভগবানলাল ইন্দ্রজি, *ইনসক্রিপশনস ফ্রম দ্য কেভ টেম্পলস অফ ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া*, বারানসী, ১৮৮১, রিপ্রিন্ট, দিল্লী, ১৯৭৬ ; এইচ লুডর্স, 'এ লিস্ট অফ

ব্রাহ্মী ইনসক্রিপশনস্ ফ্রম দ্য আরলিয়েস্ট টাইমস টু এবাউট এ.ডি. ৪০০ উইথ দ্য এক্সেপসন অফ দোজ অফ অশোক' বিইঙ এন এপেণ্ডিক্স টু *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা* ভল্যুম, ১০, ১৯০৯-১৯১০।

২) জে. পি, এইচ ফোগেল, 'প্রাকৃত ইনসক্রিপশনস্ ফ্রম ঘন্টসাল', *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা*, ভল্যুম ২৭, পৃঃ ৪।

৩) ডি. সি. সরকার, *সিলেক্ট ইনসক্রিপশনস বেয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি এণ্ড সিভিলাইজেশন*, ভল্যুম ১, ক্যালকাটা, ১৯৪২, পৃঃ ৪৯৭।

৪) সুচন্দ্রা ঘোষ, 'বেস, এ বুদ্ধিস্ট, ডোনর ঃ গ্লীনিংস ফ্রম এন ইনসক্রিপশন ফ্রম চারসাদা', *প্রসিডিংস অফ দ্য ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, কালিকট*, ১৯৯৯, পৃঃ ১০৯২-১০৯৬।

৫) ডি. সি. সরকার, *অপ-সিট্*।

৬) জন ডব্লিউ ম্যাকক্রিন্ডল, *এন্সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এজ ডিস্ক্রাইবড্ বাই টলেমী*, নিউ দিল্লী, ২০০০ (রিপ্রিন্ট), পৃঃ ৬৬।

৭) এল. ক্যাসন (অনুবাদ), *দ্য পেরিপ্লাস মারি এরিথ্রেই*, প্রিন্সটন, ১৯৮৯, পৃঃ ৮৯ ও ২৩২।

৮) *অর্থশাস্ত্র* ২,২৮,১৩।

৯) এল. ক্যাসন, *দ্য পেরিপ্লাস মারি এরিথ্রেই, প্রিন্সটন*, ১৯৮৯, পৃঃ ৮৯।

১০) বিমলা বেগলে, 'সিরামিক এভিডেন্স অফ প্রি পেরিপ্লাস ট্রেড অন দ্য ইণ্ডিয়ান কোস্ট,' ইন বিমলা বেগলে ও রিচার্ড দ্যনিয়েল দ্য পুমা (সম্পাদকয়দ্বয়), *রোম এণ্ড ইণ্ডিয়া ঃ দ্য এন্সিয়েন্ট সী ট্রেড*, দিল্লী, ১৯৯২, পৃঃ ১৫৭-৯৬।

১১) ভি. ডি. গোঘটে, 'দ্য চন্দ্রকেতুগড়-তমলুক রিজিয়ন অফ বেঙ্গল ঃ সোর্স অফ দ্য আর্লি হিস্টরিক রুলেটেড ফ্রম ইণ্ডিয়া এন্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া,' *ম্যান এণ্ড এনভাইরনমেন্ট*, ২২, ১৯৯৭, পৃঃ ৭৮।

১২) এম. দত্ত. *এ স্টাডি অফ দ্য সাতবাহন কয়েনেজ*, নিউ দিল্লী, ১৯৯০।

১৩) এন. কে. ওয়াগ্লে. *সোসাইটি এ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য বুদ্ধ*, লণ্ডন, ১৯৬৩, পৃঃ ১৫১-১৫৪।

জাতকে বর্ণিত অমাত্যকুল

রুদ্রনীল ভট্টাচার্য্য

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান বা অঙ্গ আছে। এদের মধ্যে স্বামী বা রাজার স্থান সর্বাগ্রে। স্বামী বা রাজার পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অমাত্যের। অমাত্য শব্দটি সর্বত্র না হলেও বহুক্ষেত্রেই মন্ত্রী ও সচিবের সমার্থক। অতএব অমাত্য বলতে মন্ত্রী সহ উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের বোঝায়। পালি সাহিত্যে অমাত্যরা অমচ্চ বলে অভিহিত। এই প্রবন্ধে অমচ্চকুল বা অমাত্যগোষ্ঠী নিয়ে একটি আলোচনা করা হয়েছে। জাতকে আমরা সার্বভৌম নৃপতির উল্লেখ পাই, কিন্তু তারই সঙ্গে রাজার পরামর্শদাতা বা মন্ত্রণাদাতা রূপে এক বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ পাই যা অমাত্য বা মন্ত্রীরূপে জাতকে চিহ্নিত হয়েছে। বৌদ্ধ কাহিনীতে অমাত্যরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসক হিসেবে নিশ্চয়ই উপস্থিত। কিন্তু তাঁরা একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুল শব্দের অর্থ পরিবার। বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক গোষ্ঠী। আমরা গন্ধার জাতক থেকে জানতে পারি যে রাজা তার রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অমাত্যদের পরামর্শ নিতেন, সিংহাসনে যোগ্য উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

[১]শুধু তাই নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারাও ছিলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ঘটজাতক থেকে আমরা জানতে পারি যে রাজা যখন পার্থিব জগতের প্রতি অনীহা পোষণ করেন এবং বানপ্রস্থে যাবার জন্য প্রস্তুত হন তখন তিনি তাঁর রাজ্যপাট সবকিছু অমাত্যদের হাতে সমর্পণ করেন।[২] (রাজ্জম্ অমাচ্চানাম নিয্যাদেত্বা)।

অমাত্যদের আমরা চতুঃবর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনা। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে যে অমাত্যরা কোন বর্ণ-ভুক্ত? এখানে আমাদের প্রথমেই বিচার করতে হবে যে অমাত্যরা কোনো বিশেষ বর্ণের লোক নন, তাঁদের প্রধান পরিচয় একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী হিসেবে। প্রথমে তাঁদের হয়তো নির্বাচন করা হোত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের মধ্য থেকে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কায়স্থ বা রাজপুতদের মতো তাঁরা প্রাধান্য পেতে থাকে একটি বিশেষ জাতি হিসেবে। তাঁদের মধ্যে শ্রেণীগত চেতনার উন্মেষ দেখা দেয় যা তাঁদের সংঘবদ্ধ করতে আরো সাহায্য করে। তাঁরা বংশগত পারিবারিক পেশা গ্রহণ করেন, সবজাতিদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হন, শুধু তাই নয় খাদ্যাখাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তাঁরা অন্য জাতির

সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে ভোজন করা অনুচিত বলে মনে করেন এবং বিবাহ, আচার, অনুষ্ঠান, রীতি নীতি, সবক্ষেত্রে একটি পৃথক নিয়ম অনুসরণ করেন যা অন্য জাতির থেকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র। যখন একজন মন্ত্রীকে তাঁর জাতি জিজ্ঞাসা করা হয় সে কখনোই উত্তর দেয়না যে সে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, সে উত্তর দেয় যে সে অমচ্চকুলভুক্ত। আমরা মহারাজা বিম্বিসারের দুজন অমাত্যের কথা জানতে[৩] পারি বিনয়পিটকের চল্লবগ্গ থেকে, একজনের নাম বসসকার যাকে রাজা নিযুক্ত করেছিলেন একটি দুর্গ নির্মাণের কার্যে, তিনি ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। আর একজন অট্‌কধম্মানুশাসকঅমচ্চ যিনি রাজার পথপ্রদর্শক ছিলেন পার্থিব এবং আধ্যাত্মিসক জগতের ক্ষেত্রে এবং তিনিও ছিলেন ব্রাহ্মণ।

মেগাসথেনিস সেলুকাসের[৪] রাজদূত হিসেবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে। তিনি তাঁর ইন্ডিকা নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের সমাজকে সাতটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর ইন্ডিকা নামক গ্রন্থটি হারিয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের মূলতঃ তিনজন পরবর্তী গ্রিক লেখক আরিয়ান, স্ট্রাবো এবং ডিওদোরাসের তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। আরিয়ানের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি সপ্তম গোষ্ঠীকে উল্লেখ করেছেন, রাজার প্রশাসক, পরামর্শদাতা ও স্বশাসিত নগরের শাসক রূপে। সংখ্যার দিক থেকে এঁরা ছিলেন খুবই ছোট, কিন্তু এঁদের অন্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যেত না কেননা এঁরা সমাজে পরিচিত ছিলেন খুবই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে, এঁরা ছিলেন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী এবং এঁদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নানা প্রকার আধিকারিক, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নৌবাহিনীর প্রধান এবং কৃষিকার্য পরিচালনা করবার জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে নিযুক্ত করা হোত। ডিওদোরাসের বিবরণ অনুযায়ী আমরা জানতে পারি[৫] যে তিনিও সপ্তম গোষ্ঠীকে উল্লেখ করেছেন রাজার পরামর্শদাতা এবং প্রশাসক রূপে— যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। তিনিও উল্লেখ করেছেন যে তাঁরা ছিলেন খুব ছোট একটি গোষ্ঠী, কিন্তু চারিত্রীক বৈশিষ্ট্যে তাঁরা ছিলেন খুবই সম্মানিত। এদের মধ্য থেকেই রাজার মন্ত্রণাদাতা, কোষাধ্যক্ষ, মধ্যস্থতাকারী, সেনাপতি, প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতিকে নিবার্চন করা হোত।[৬] স্ট্রাবোও সেই একই কথার পুনরুক্তি করেছেন এবং বলেছেন যে দেশের প্রধান কার্যালিয়ের কর্ণধার, বিচারক এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করতেন এই গোষ্ঠীর মানুষেরা সকলেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে কোনো গোষ্ঠী[৭] অন্য কোনো গোষ্ঠীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেনা এবং তাঁরা তাঁদের বংশগত পারিবারিক পেশা বদল করতে পারবেনা। মেগাসথেনিস বর্ণিত এই বিশেষ শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের জাতকে বর্ণিত অমাত্যদের সঙ্গে আমরা একভাবে দেখতে পারি। এর মূল কারণ হল যে তাঁদের দুজনেরই প্রধান পরিচিতি সমাজে রাজার পরামর্শদাতা বা মন্ত্রণাদাতারূপে। শুধু তাই নয় সমাজে একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী হিসেবে প্রাধান্য পেতে গেলে যে সমস্ত নিয়মগুলি অতি আবশ্যিক তা সমস্তই ছিল তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান।

অমাত্য বা অমচ্চরা নিঃসন্দেহে শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা ছাড়াও তাঁরা নিঃসন্দেহে সমাজের উচ্চপর্যায়ে অবস্থিত ছিলেন। জাতকগ্রন্থ ও মেগাসথেনিসের বর্ণনা যৌথভাবে বিচার করলে বোঝা যায় তাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র চিহ্নিত হতো বংশানুক্রমিক পেশা ও আন্তর্বিবাহের দ্বারা। এরজন্যই অমাত্য জাতি ও প্রশাসকেরা কালক্রমে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন সামাজিক গোষ্ঠীরূপে দেখা দিলেন।[৮]

সূত্র নির্দেশ

১) গন্ধার জাতক, জাতক সংখ্যা ৪০৬, ই.বি. কাওয়েল, অনু, *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৯ (পুনর্মুদ্রণ) পৃষ্ঠা ২২১-২২৪।

২) ঘটজাতক, জাতক সংখ্যা ৩৫৫, ই.বি. কাওয়েল, *পূর্বোক্ত*, জাতক, তৃতীয় খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৯ (পুনর্মুদ্রণ) পৃষ্ঠা ১১১-১১২।

৩) রিচার্ড ফিক— *The Social organisation in North-East India in Buddha's Time.* পৃষ্ঠা ১৪৪।

৪) রিচার্ড ফিক— *The Social organisation in North-East India in Buddha's Time.* পৃষ্ঠা ১৪৪।

৫) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *The Classical Accounts of India.* পৃষ্ঠা ২২৬।

৬) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *The Classical Accounts of India.* পৃষ্ঠা ২৩৮।

৭) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *The Classical Accounts of India.* পৃষ্ঠা ২৬৮।

৮) জাতকে বর্ণিত অমাত্যদের বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, রিচার্ড ফিক— *The Social organisation in North-East India in Buddh's Time.* এবং বিনয় চন্দ্র সেন - *Studies in the Buddhist Jatakas.*

বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের পটভূমি

জিনবোধি ভিক্ষু

খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতকে অর্থাৎ প্রাক-বুদ্ধযুগে ভারতবর্ষে ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসে অতি উচ্চমার্গীয় পটভূমির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন এতই উন্নততর পথে এগিয়ে গিয়েছিল যে, কৃচ্ছ্র তায় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনায়, অলৌকিক ঋদ্ধি (অসাধারণ শক্তি) প্রদর্শনে এবং সমাপত্তি জ্ঞান লাভে অনেকে একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই উচ্চ ঋদ্ধিসম্পন্ন সমাপত্তি লাভী গুণী-জ্ঞানীদের মধ্যে প্রকৃত বিমুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শনের উদ্ভব হতে থাকে। দীর্ঘনিকায়ের পাসাদিক সূত্রে ভগবান বুদ্ধ শ্রামণের চুন্দকে বলেছিলেন— "চুন্দ, যখন ধর্মবিনয়ের ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহার প্রচার অফলপ্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত করতে এবং শান্তি প্রদানে উহা অক্ষম হয় সম্যক্ সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষণা হয় না, তখন এইরূপই (নিগণ্ঠনাথ পুত্রের মৃত্যুর পর অবস্থা) হয়ে থাকে।"[১] শুধু তাই নয়, তারা স্ব স্ব মতাদর্শের প্রতি অমোঘ প্রত্যয় নিয়ে তাদের মতবাদের চাইতে উন্নততর ধর্ম ও দর্শনের প্রতি উদাসীনতা ও অনুৎসৌক্যের ভাব প্রদর্শন করতে থাকেন। মহাবগ্গ গ্রন্থে উল্লেখ আছে ভগবান বুদ্ধ উরুবেল কশ্যপকে ১৬(ষোল) প্রকার প্রাতিহার্য প্রদর্শন করার পরও উরুবেল কশ্যপ চিন্তা করছিলেন— "মহাশ্রমণ মহাদিব্যশক্তি ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন বটে, কিন্তু তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"[২] এতৎসত্ত্বেও তৎকালীন সময়ে ভারতীয় দার্শনিকগণ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, ভারতের প্রাচীন যাগযজ্ঞ "ভণ্ডো, ধুর্তো, নিশাচরঃ" কর্তৃক প্রভাবিত। তাই তাদের মধ্যে বৃহস্পতি ধীষণ প্রমুখ ব্যক্তিদের মধ্যে চার্বাক, লোকায়ত প্রভৃতি নাস্তিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্য মতবাদগুলি সংগ্রহ করে মাধবাচার্য সর্বদর্শন সংগ্রহে গৌতমের ন্যায়দর্শন, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, কপিলের সাংখ্য দর্শন, পতঞ্জলির পাতঞ্জল দর্শন, জৈমিনির মীমাংসা দর্শন এবং ব্যাসের বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি ষড় দর্শন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া বুদ্ধের সমসাময়িক আমলে ভারতে পুরাণ কাশ্যপ অক্রিয়বাদী, পকুদকচ্চায়ন (প্রকুধ বা ককুদ কাতায়ন) শাশ্বতবাদী, অজিত কেশকম্বলী উচ্ছেদবাদী, মক্খলী গোসাল (মস্করিণ গোশাল পুত্র) অহেতু অপ্রত্যয়বাদী, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্র অমরবিক্ষেপবাদী এবং নিকণ্ঠনাথ পুত্র চতুর্যাম সংবর ও কৃচ্ছ্র সাধনব্রত হিসেবে স্ব স্ব ধর্ম ও দর্শন প্রতিষ্ঠিতকল্পে মোক্ষলাভের উপায়ে উৎকৃষ্ট পন্থা বলে প্রচার করছিলেন।[৩]

বুদ্ধবংস গ্রন্থের অর্থকথা মধুরত্থবিলাসিনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দেবতাগণ যখন বোধিসত্ত্বকে বুদ্ধরূপে জগতে আবির্ভাব হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তখন বুদ্ধ, পঞ্চ মহাবিলোকন করেছিলেন (সময়, মহাদ্বীপ, প্রদেশ, পরিবার, মাতার আয়ুষ্কাল)।[৪] কারণ জগতে বুদ্ধের আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্রের সৃষ্টি হলে তখন বুদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে ভারতের অধিবাসীগণ অষ্টাদশ শিল্পকলায় বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে জীবন ও জীবিকার একটা উন্নত ক্ষেত্র রচিত করেছিলেন। তারা উপরিউক্ত ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা গবেষণা করেছিলেন। সময়, দেশ, প্রদেশ, পরিবার ও মাতার আয়ুষ্কাল প্রভৃতি পঞ্চ মহাবিলোকন পর্যালোচনা করে বোধিসত্ত্ব জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে প্রকৃত দিক নির্দেশনা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে তৎকালীন ধর্মপ্রচারকগণ বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিতে নিমজ্জিত থেকে দুঃখমুক্তির উপায় নির্ধারণ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।[৫] মহামানব বুদ্ধ ব্রহ্মজাল সূত্রে এই বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করে প্রমাণ করেছিলেন যে, এই পথে প্রকৃত মুক্তির অবকাশ নাই। মিথ্যা দৃষ্টির দুই ভাগ হল— ১. পূর্বকল্পিক অর্থাৎ যে সকল দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মা ও জগতের প্রারম্ভ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আঠার প্রকার এবং ২. অপরান্তকল্পিক অর্থাৎ যে সকল দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মা ও জগতের বিলয় (অবসান) সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে চুয়াল্লিস প্রকার। বুদ্ধ বলেছেন এইসব দৃষ্টিভঙ্গিগুলি শুধু ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে মিথ্যাদৃষ্টি সৃষ্টি করে না। এইগুলি যথার্থ জ্ঞানলাভের অন্তরায়, কারণ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মুখ্য বিষয় ছিল জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, স্থিতি ও চ্যুতি বা পরিণাম সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা। তাই তাদের মধ্যে জগৎসৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে এক ভীতির সঞ্চার হওয়াতে কাল্পনিক যাগযজ্ঞের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির আশ্রয় নিয়েছিলেন। জগতে একমাত্র বুদ্ধ তাঁর আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম দর্শনের ভিত্তিতে অন্যান্য সকল মিথ্যাদৃষ্টিমূলক মতবাদ খণ্ডন করে আপন সম্যক্ দৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের (ধ্বংস) কারণ প্রদর্শনের জন্য তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি বা কার্যকারণতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাই তিনি দুই অন্ত অর্থাৎ ১. চরম কামভোগ এবং ২. কৃচ্ছ্র সাধনায় কষ্টভোগ পরিহার করে মধ্যমপন্থা বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করে দুঃখ নিবৃত্তির পথের ধর্ম ও দর্শন প্রবর্তন করেছিলেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যের জাতকাদি গ্রন্থাবলীতে মানুষের প্রাক্-ঐতিহাসিক সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্য, কৃষ্টি সংস্কৃতির নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে। জাতক গ্রন্থাবলীতে তক্ষশিলায় শিক্ষার্থীদের ত্রিবেদ ও অষ্টদশ শিল্পকলা শিক্ষার সুবর্ণসুযোগ ছিল বলে উল্লেখ আছে। দীর্ঘনিকায়ের অগ্গঞ্ঞ সূত্রে উল্লেখ আছে সত্ত্বগণের মধ্যে যারা অরণ্যে পর্ণকুটিরে ধ্যান সম্পন্ন হতে অসমর্থ হয়ে গ্রাম নিগম সমূহের নিকটস্থ স্থানে গমনপূর্বক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, মানুষগণ

তাদিগকে দেখে বলল— "এই সকল সত্ত্ব অরণ্যে পর্ণকুটিরে ধ্যান সম্পন্ন করতে অসমর্থ হয়ে গ্রাম ও নিগম সমূহের নিকটস্থ স্থানে গমণ পূর্বক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত। ইহারা এক্ষণে ধ্যান করে না, বাসেট্‌ঠ, ইহারা এক্ষণে ধ্যান করে না। ইহা হতে অধ্যয়নরূপ তৃতীয় নামের আবির্ভাব হল।"[৬] এই গ্রন্থ রচয়িতাগণ হলেন বর্তমান ত্রিবেদ গ্রন্থাবলীর লেখক। দীর্ঘনিকায়ের অম্বট্‌ঠ সূত্র, তেবিজ্জ সূত্র প্রভৃতি সূত্রে এই লেখকদের তালিকা পাওয়া যায়। যথা— অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু প্রভৃতি। তাঁরা ধ্যানে অনভ্যস্ত হয়ে চিত্ত বিতর্কের প্রভাবে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়ে কতকগুলি যাগযজ্ঞের মন্ত্র লিপিবদ্ধ করেছিল। এইগুলি মানুষের মধ্যে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, মানুষ এইগুলিকে দৈব সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করতে লাগল। এই গ্রন্থগুলি বর্তমান বেদ নামে আখ্যাত। প্রাচীনকাল হতে শিক্ষার্থীদের এই বেদ অধ্যয়ন করতে হত। তাছাড়া জাতকে নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে প্রাচীনকালে মানুষ অষ্টাদশ শিল্পকলা অনুশীলন করত বলে উল্লেখ আছে।

সুতি সম্মুতি, সাংখ্যা চ যোগা নীতি বিসেসকা,
গন্ধরব, গণিকা চেব ধনুবেধা চ পূরাণা।
তিকিচ্ছা ইতিহাস চ জ্যোতি মায়া, ছন্দতি,
কেতু চ মন্তা সিপ্পট্‌ঠ্‌ রসা'ইমে।

অর্থাৎ— শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য, যোগ, নীতি (ন্যায়শাস্ত্র), বৈশেষিক, গন্ধর্ব (সংগীত), গণিকা, ধনুর্বেদ, পুরাণ, চিকিৎসা, ইতিহাস, জ্যোতিষ, মায়া, ছন্দ, কেতু, মন্ত্র ও শব্দ— এই অষ্টাদশ শিল্প বা বিদ্যা নামে অভিহিত।

১। **শ্রুতি ঃ** শ্রু + ক্তি-করণ → শ্রুতি, যাহা শ্রুত হয়, লিখন পদ্ধতিপূর্বে মানুষ-ধর্ম ও দর্শন শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতিপরম্পরা শিক্ষা করে অনুশীলন ও অনুকরণ করে আসছিল, তাই এরূপ ধর্ম ও দর্শন শিক্ষাকে শ্রুতি বলা হয়। পরে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে শিষ্যানুশিষ্যপরম্পরা শ্রুতি নামে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রুতির গুরুত্ব অনেক। এখানে শ্রুতি বলতে বিদ্যার্জনকে বুঝানো হয়। বিদ্যা মানুষকে সঠিক লক্ষ্যে উপনীত করতে সহায়তা করে। তাই বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রুতিকে নৈতিক ও মানসিক জ্ঞান ভাণ্ডার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দুমতে শ্রুতি দুই প্রকার। ১. ***কর্মকাণ্ড*** ও ২. ***জ্ঞানকাণ্ড***। কর্মকাণ্ডে ব্রাহ্মণ ও সংহিতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং জ্ঞানকাণ্ডে উপনিষদকে ধরা হয়েছে। আবার বেদান্তের অপর নামও শ্রুতি। বেদান্তের ছয় প্রকার ভাগ আছে। যথা— (ক) কল্প, (খ) শিক্ষা, (গ) ছন্দ, (ঘ) ব্যাকরণ (ঙ) নিরুক্তি ও (চ) জ্যোতিষ।

২। **সম্মুতি ঃ** (স্মৃতি) — স্মৃতি-ক্তি; কর্ম— স্মরণ অর্থাৎ পূর্বানুভূত বিষয়ে জ্ঞান।

স্মৃতি বলতে যাহা মানুষের স্মৃতিশক্তিতে আছে এবং গুরু পরম্পরা প্রচলিত হয়ে আসছে এবং মানুষের স্মৃতিতে সত্য বলে বিবেচিত তাহাই স্মৃতি। মানুষের স্মৃতিতে যাহা কল্যাণকর ও মঙ্গলদায়ক অভিজ্ঞতা তাহাই স্মৃতি। হিন্দু শাস্ত্রে— বেদান্ত, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থাবলী স্মৃতি শাস্ত্রের অনুর্ভুক্ত।

৩। **সাংখ্য ঃ** (সম > সম্যক-খ্যা অর্থ জ্ঞান) সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ জ্ঞানের উপায় উপদ্দিষ্ট থাকায় কপিলকৃত দর্শনকে সাংখ্যদর্শন নামে আখ্যায়িত করা হয়। অনেকের মতে সংখ্যা হতে উৎপন্ন হয়েছে। সাংখ্য দর্শন সংখ্যা সম্পর্কিত। কপিল প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন। প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্র-পূর্বে-কৃতিসৃষ্টি। অর্থাৎ যাহা সৃষ্টির পূর্বে ছিল। আবার প্রকৃষ্টরূপে কার্য করে এই অর্থে প্রকৃতি। প্রকৃতি অচেতন-স্বরূপ জড়। এরই পরিণামে অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব ব্যাপার উৎপন্ন হয়েছে। এই প্রকৃতি আদিকরণ। এই আদিকারণের সহিত অন্যান্য কার্য পরম্পরা যুক্ত হলে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

পুরুষ চেতন স্বরূপ কিন্তু দুঃখ সুখাদি শূন্য, উহা অপরিণামী অর্থাৎ বিকারশূন্য এবং অকর্তা অর্থাৎ কোন কার্যই করেনা। সমস্ত বিশ্বের ব্যাপার প্রকৃতির কার্য। পুরুষ প্রাণিদের আত্মাস্বরূপ, প্রকৃতি পুরুষকে আপনার অবস্থা বিশেষ এবং রূপসমূহ প্রদর্শন করে। পুরুষেরা ইহার সাক্ষী এবং স্রষ্টা। পুরুষ সত্ত্ব রজঃ তম প্রভৃতি উপাদানের অতীত বলে গুণাতীত এবং কৈবল্যযুক্ত। এই আত্মা জানতে পারলে কৈবল্য জ্ঞান হয় এবং ত্রিবিধ দুঃখ হতে নিবৃত্তি পাওয়া যায়।

সাংখ্যদর্শন বিবর্তনবাদী ঃ সত্ত্ব রজ, তম, সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। কোন কারণে প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থা বিঘ্ন হলে পরিণাম আরম্ভ হয়। এই বিঘ্ন হওয়া নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু কারণ আছে বলে মেনে নিতে হয়। প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহৎতত্ত্ব, মহৎ হতে অহং এবং উৎপত্তি হয়। অহংকার তত্ত্বের পরিণাম দুইটি। যথা— ইন্দ্রিয় ও তন্মত্রে পুরুষ-১, প্রকৃতি-১, মহৎতত্ত্ব-১, অহংকার-১, মন-১, জ্ঞানেন্দ্রিয়-৫, কর্মেন্দ্রিয়-৫, তন্মাত্র-৫, মহাভূত-৫, মোট ২৫ প্রকার তত্ত্ব।

৪। **যোগ ঃ** √ যুজ্ ধাতু নিষ্পন্ন— √ যুঞ্জতি অর্থ যুক্ত করা অথবা যুক্ত হওয়া। যোগ অর্থ সংযুক্ত, বন্ধন, উপায়, প্রয়োগ দ্রষ্টা ইত্যাদি।

যোগ যাহা জীবগণের জন্মমৃত্যু চক্রে বা জীবনের ঘূর্ণিপাকে সংযুক্ত রাখে, তাই বৌদ্ধ সাহিত্যে কোন অবলম্বনের অনুশীলন বা সাধন প্রণালী বুঝায়। পাতঞ্জল দর্শনে যোগ হল যোগাচ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগ।[৮] চিত্তবৃত্তি পঞ্চবিধ— ১. প্রমাণ, ২. বিপর্যয়, ৩. বিকল্প, ৪. নিদ্রা ও ৫. স্মৃতি। প্রমাণ হল ইন্দ্রিয়জনিত যথার্থ জ্ঞান, বিপর্যয় হল অযথার্থ জ্ঞান। বিকল্প হল বস্তুশূন্য শব্দ জ্ঞান। নিদ্রা হল অজ্ঞান মাত্রাবলম্বীকাল। স্মৃতি হল সংস্কার প্রভাবে প্রাদূর্ভূত বিষয়ের প্রতীতি। পাতঞ্জলদর্শনে

যোগ ৪ প্রকারে বিবৃত হয়েছে। যথা— ১. সমাধিপাদ, ২. সাধন পাদ, ৩. বিভূতি পাদ, ৪. কৈবল্য পাদ।

যোগতত্ত্ব উপনিষদে যোগ চার প্রকার। যথাঃ— ১. মন্ত্র যোগ, ২. লয় যোগ, ৩. হঠযোগ ও ৪. রাজযোগ। কিন্তু গীতায় প্রধানত তিনটি যোগের কথা উল্লেখ আছে। যথাঃ— ১. ভক্তিযোগ, ২. জ্ঞানযোগ ও ৩. কর্মযোগ।

সাংখ্যদর্শন পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী, পাতঞ্জল যোগদর্শন ষড়বিংশতি তত্ত্ববাদী। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে ষড়বিংশতি তত্ত্ব হয়েছে।

৫। **নীতি বা ন্যায়দর্শন ঃ** নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়। নী + অ = ন্যায়, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা ন্যায়। ন্যায় বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধান, সুতরাং ন্যায় অর্থ তর্ক এবং যে চিন্তা সমাধি তর্ক সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করে, তাহাই ন্যায়শাস্ত্র। ন্যায় অর্থ ঠিক। অতএব ন্যায়শাস্ত্রের অর্থ সঠিক তর্কের বিজ্ঞান। তাই ন্যায়দর্শনকে তর্কশাস্ত্র হেতুবিদ্যা ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যাও বলা হয়। হেতুবিদ্যা হেতু ও কার্যকারণের উপর সর্বশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অর্থ অনু-পশ্চাৎ, ঈক্ষা ধাতুর অর্থ মনন, বা দর্শন।

৬। **বৈশেষিক দর্শন ঃ** বিশেষ শব্দের অর্থভেদ। কণাদ মুণি বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। কণাদ মুণি অনুমান করেন যে প্রত্যেক শ্রেণীর পরমাণুতে বা পরমাণুরূপ আশ্রয়ে এমন এক পদার্থ আছে যাহা থাকাতে বায়বীয়, জলীয়, পার্থিব ইত্যাদি প্রকার অক্ষুণ্ণ থাকে। এই প্রকার প্রভেদকে নাম দেওয়া হয়েছে বিশেষ বা ভেদক পদার্থ। এদিক দিয়ে বিচার করলে বৈশেষিক দর্শন এক বস্তুবাদী ও বস্তুতত্ত্ববাদী দর্শন। বৈশেষিক দর্শনের বিষয় মূল জ্ঞানের বিষয় বা প্রমেয়ও বলা যেতে পারে। প্রমেয় ২(দুই) প্রকার— ভাব ও অভাব। ভাববস্তু অস্তিত্ব বুঝায় এবং অভাববস্তু নাস্তিকত্ব বুঝায়। ভাববস্তু আবার ষড়বিধ-দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। যদিও কণাদ মুণি অভাববস্তু সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই, পরবর্তীকালে বৈশেষিক দর্শনে অভাব একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। তাই অভাবকে সপ্তম পদার্থ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। অভাব ২ প্রকার— ১. সংসর্গাভাব, ২. অন্যোন্যাভাব। কোন কিছুতেই অন্যান্য পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধের অভাব উহা সংসর্গাভাব বলে। যেমন— উদ্যানে ফুল নাই। দুই বস্তুর মধ্যে পরস্পরের ভিন্নতাকে অন্যোন্যাভাব বলে। যেমন— ঘোল দধি নহে।

৭। **গন্ধর্ব ঃ** গন্ধর্ববিদ্যা বা সংগীতবিদ্যা নৃত্যগীত বাদ্য কলা। গন্ধর্ব অর্থ স্বর্গীয় গায়ক। তারা গন্ধর্ব লোকের অধিবাসী। গন্ধর্ব লোক গুহ্যক লোক ও বিদ্যাধর লোকের মধ্যে অবস্থিত স্থান।[৯] দেবতাদের মধ্যে তারা নিম্নশ্রেণীর দেবতা হিসাবে পরিগণিত। এক সময়

তারা অতি রূপবান এবং অদ্বিতীয় সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল কিন্তু সোমরস প্রস্তুত করতে গিয়ে অধিক সোমরস সেবনে তাদের এই পরিণতি হয়েছিল। আবার সোমরস দিয়ে দেবতাদের চিকিৎসা করা হত বলে গন্ধর্বদের স্বর্গীয় বৈদ্য বলা হয়। গন্ধর্বগণ মর্তে আগমন করে সুন্দরী নারীদের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের সহিত অবাধ মেলামেশা করে বিবাহ করত বলে এপ্রকার বিবাহকে গন্ধর্ব বিবাহ বলা হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে গন্ধর্বগণ চতুর্মহারাজিক স্বর্গের উপদেবতা হিসাবে অবস্থান করে এবং তারা দেবতা হিসাবে সর্বনিম্ন শ্রেণীর দেবতা হিসাবে পরিগণিত। গন্ধর্বগণ অসুর ও নাগ উপদেবতা পর্যায়ে পড়ে। তারা স্বর্গীয় সংগীতজ্ঞ হিসাবে চিহ্নিত। ডিম্বরু তাদের মধ্যে অন্যতম সংগীতজ্ঞ। ইন্দ্ররাজ সভায় গন্ধর্বগণ সংগীত পরিবেশন করে দেবতাদের মনোরঞ্জন করে থাকে। শক্রপ্রশ্ন সূত্রে ইন্দ্র পঞ্চশিখ গন্ধর্বকে বুদ্ধের নিকট নিয়ে এসে বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গের জন্য সংগীত পরিবেশন করতে নিয়োগ করেছিলেন।[১০] সংযুক্ত নিকায়ে গন্ধর্বদের উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ আছে— কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুকৃতির ফলে তাদের ইচ্ছানুযায়ী বৃক্ষগুলির সুগন্ধ, বৃক্ষপত্রের সুগন্ধ, বৃক্ষকান্ডের সুগন্ধ, বৃক্ষ মজ্জার সুগন্ধ, বনফুলের সুগন্ধ রক্ষা করে, গন্ধর্ব দেবতাগণ দেবরূপ ধারণ করে।

৮। **গণিকা ঃ** প্রাচীন ভারতে গণিকাবৃত্তিকে এক উচ্চধরণের শিল্পকলা হিসাবে চিহ্নিত করা হত। মহাভারতের আদিপর্বে উল্লেখ আছে মহর্ষি উদ্দালক তার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন— "হে পুত্র, ক্রুদ্ধ হয়ো না, ইহা সনাতন ধর্ম, গাভীদের ন্যায় স্ত্রীরাও অরক্ষিতা," শ্বেতকেতু তার মাতাকে এক ঋষি ভোগের জন্য নিতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক সর্বজনভোগ্য পণ্য হিসাবে চিহ্নিত ছিল। শ্বেতকেতু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, স্ত্রীলোকদের সামাজিক বিবাহপন্থা মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বৌদ্ধসাহিত্যের মহাবর্গে উল্লেখ আছে "আম্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা-প্রসাদ উৎপাদিকা, প্রথম রূপবতী এবং নৃত্যগীত বাদ্যে নিপুণা, যে প্রার্থীর নিকট থেকে প্রতিরাত্রি পঞ্চাশ মুদ্রা নিয়ে অভিসারে গমন করে। তাঁর উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকতর শোভা পাচ্ছে।[১১] রাজগৃহেও শালবতী নাম্নী কুমারী অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা প্রসাদ উৎপাদিকা পরম সুন্দরী কুমারীকে গণিকা বৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাহা ছাড়া মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে আমরা বিন্দুমতী নামে এক নারীকে গণিকাবৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে দেখতে পাই।"[১২] এইসব নারীগণ গণিকা বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকলেও তারা সমাজে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী ছিলেন।

৯। **ধনুর্বিদ্যা ঃ** ধনুর্বিদ্যা বোধক শাস্ত্র বা শাস্ত্র বিদ্যা ; যে অস্ত্র দিয়ে বাণ নিক্ষেপ করা হয় তাহাই ধনু। ধনু, এখানে শুধু তীর বা বাণ নিক্ষেপ করে না। তারা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে। অতি প্রাচীন কাল হতে তক্ষশিলায় অতি উন্নত ধরণের ধনুর্বেদ শিক্ষা দেওয়া হত।[১৩] এখানে কোশলরাজের সেনাপতি বন্ধুল লিচ্ছবি রাজাদিগের

অর্থ অনুশাসক মহালি, লিচ্ছবি এবং বৈশালীর সিংহ সেনাপতি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে।[১৪]

১০। **পুরাণ ঃ** কোন জাতি বা দেশের পরিচিতিমূলক সুপ্রাচীন কাহিনী ভিত্তি করে রচিত গ্রন্থাবলী পুরাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়। সর্গ, উপসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশান্ত চরিত— এই পঞ্চ লক্ষণ বিশিষ্ট গ্রন্থশ্রেণী প্রাচীন মুণি ঋষিদের দ্বারা প্রণীত বলে পুরাণের মূল্য সমধিক। মৃষ্ঠ, ঋষি, রাজন্যমণ্ডলীর বংশ, একমন্বন্তর শাসনকাল এই পাঁচ মূল বিষয় সম্বন্ধে পুরাণে বিশদ বর্ণনা রয়েছে।[১৫] প্রাচীন ভারতের লোকজীবন তথা গণজীবনের প্রতিচ্ছবি এই পুরাণ গ্রন্থসমূহ। পুরাণ আঠারটি যথা— ব্রাহ্ম, পদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্যৎ, ব্রাহ্মবৈবর্ত, লৈঙ্ক, বায়াহ, কান্ধ, বামন, কৌর্ম, মাৎস্য, গারুড়, ব্রহ্মান্ড। তাহা ছাড়া আরও আঠারটি উপপুরাণ আছে।

১১। **চিকিৎসা ঃ** প্রাচীনকাল হতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তক্ষশিলায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে শিক্ষার্থীগণ আগমন করতেন। আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যে চিকিৎসক জীবকের জীবন বৃত্তান্ত হতে তক্ষশিলায় উন্নত চিকিৎসাবিদ্যা প্রদানের ইতিহাস জানতে পারি।

১২। **ইতিহাস ঃ** ইতি-ই-ক্তি ভাব— এই প্রকার, হাস-আস ধাতুনিষ্পন্ন—স্থিতি, ইতিহাস— এই প্রকার অবস্থা বা স্থিতি। ইতিহাস বলতে পূর্বে যাহা ঘটেছিল বা অবস্থা ছিল তাহা বুঝায়। তাই ইতিহাস অর্থ পূর্ব বৃত্তান্ত ইতিবৃত্ত, পূর্ববৃত্ত বর্ণন গ্রন্থ। তাই ইতিহাস মানব জাতির পূর্ব বৃত্তান্ত। ইহা সত্য এবং বাস্তবতার দলিল নামে অভিহিত।

১৩। **জ্যোতিষ ঃ** গ্রহ নক্ষত্রে গতিবিধি নির্ণয়ের বিদ্যাকে জ্যোতিষ বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। সৌরজগতের মধ্যে গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান এবং গতি পরিবর্তন সম্বন্ধে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে তাহাই জ্যোতিষ বিদ্যা। সূর্যের বার্ষিক গতির পথে বার বিভাগ বা রাত্রি এবং চক্রের তিন শত ষাট ভাগ আছে। সূর্যের এই বারটি রাশিকে বারটি আদিত্য বলা হয়। এইরূপ চন্দ্রের সাতাশটি ভাগকে নক্ষত্র বলা হয়। চন্দ্র এবং সূর্যের বার্ষিক চক্রকে চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসর বলা হয়। চন্দ্র ও সৌর সময়ের আরো সূক্ষ্ম হিসাব করে সাবন বৎসর হিসাব করা হয়।

১৪। **মায়া ঃ** মায়া অর্থ মমতা, শঠতা, চাতুরি, ইন্দ্রজাল, কুহক, ছদ্মবেশ, ভূমিকা, প্রকৃতি, অবিদ্যা, মিথ্যাবুদ্ধিহেতু অজ্ঞান, কৃপা, ভ্রান্তি Illusion। মা + যৎ কতৃ + মা (মোহ), মায়াকে শাস্ত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে যে বিশ্ব সংসারে প্রত্যেকটা ঘটনাপ্রবাহ একটা অদৃষ্ট শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই অদৃষ্ট শক্তিকে মায়া বলা হয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে মায়া ঈশ্বরের অধীন সৃষ্টি শক্তির মায়া দ্বারা ঈশ্বর এই অব্যক্ত ভাবকে বস্তুরূপ দেন। সৃষ্টির পূর্বে নামরূপাত্মক জগতের স্বরূপ সারসত্ত্বারূপে ঈশ্বরের জ্ঞানে ছিল। তিনি মায়া দ্বারা জগৎ ও জীব সৃষ্টি করেন।

১৫। **ছন্দ ঃ** ছন্দ বা ছন্দস অর্থ লয়সমন্বিত গতি। পদ্যের ভেদবোধক সংজ্ঞা বা জাতি। ত্রিবেদেব ভ্রষাকে ছন্দ ভাষা বলে।

১৬। **কেতু ঃ** কেতু-দিত + উ কৃত অথ— চিহ্ন, পতাকা, ধ্বজ, উৎপত্তি চিহ্ন, ধূমকেতু। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু ও কেতু গ্রহের মধ্যে পরিগণিত। কেতু নামক একজন দানব ছিল। দানব বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহীর গর্ভে জন্ম নিয়ে সমুদ্র মন্থনকালে দেবতার ছদ্মবেশে এই দানব অন্যান্য দেবতার সহিত অমৃতপানে প্রবৃত্ত হয়। কণ্ঠে অমৃত পৌঁছবার পূর্বে দেবতারা তার স্বরূপ বুঝতে পেরে তার মস্তক ছিন্ন করেন। এই দানবের এক অংশ রাহু এবং অন্য অংশ কেতু নামে অভিহিত হয়।

১৭। **মন্ত্র ঃ** মন্ত্র + খঞ কর্ম রহস্য। ব্রত বা কর্মের রহস্য। গুরুদত্ত বাক্য। যে বাক্যের দ্বারা দেবতাবিশেষের উপাসনা করা হয়। যে কোন জীবের বশীকরণ বা সাধন তন্ত্রোক্তি বাক্য।

১৮। **শব্দ ঃ** আপ্তোপদেশ শব্দ।[১৬] আপ্তোপদেশ অর্থ আপ্ত বাক্য। তাহা বস্তুর যথার্য বোধ জন্মায় বলে শব্দ নামধেয় প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হউক বা না হউক, সে স্থলে কেবল মাত্র শব্দোল্লেখের দ্বারা বস্তুবিষয়ক জ্ঞান জন্মে। সে স্থলে শব্দ প্রমাণ ও যে বোধ তাহা হল প্রমাণ। এই মহাধিকার প্রমাণ জগদ্ব্যাপী ত্রিকালব্যাপী ও ঋষি।

আপ্ত শব্দের অর্থ পাওয়া বা জ্ঞানে পাওয়া। সে পুরুষ লৌকিক প্রত্যক্ষে অলৌকিক প্রত্যক্ষে আর্য জ্ঞানে, যোগ প্রত্যক্ষে অথবা নির্দোষ অনুমানে বস্তু পেয়েছে অর্থাৎ বিজ্ঞাত হয়েছে সেই পুরুষই শাস্ত্রীয় ভাষায় আপ্ত নামে প্রখ্যাত।

শব্দবোধ শক্তিকে উজ্জীবিত করে। তাই শব্দ শক্তির মধ্যে শব্দের বোধ্য বোধকের সম্পর্ক আছে। উপরিউক্ত শিল্প সাহিত্য ছাড়া বুদ্ধ সে যুগসন্ধিক্ষণে জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ভারতে ধর্ম ও দর্শন এমনকি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এক উন্নত ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। সেই সময়ে পুরাণকাশ্যপ অক্রিয়াবাদ, মকখলীগোসাল অহেতুক অপ্রত্যয়বাদ অজিত কেশকম্বলী, উচ্ছেদবাদ, পকুদকচ্চায়ন শাশ্বতবাদ, সঞ্চয়বেলট্টিপুত্র অমরবিক্ষেপবাদ এবং নিগণ্ঠনাথ পুত্র চতুর্যান সংবর এবং কৃচ্ছ্র সাধনবাদ প্রচার করেছিলেন। আবার কালাম এবং রামপুত্র রূদ্রক প্রভৃতি ঋষিগণ আধ্যাত্মিকতায় অতি উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দিক নির্দেশনা কোন ধর্ম দর্শনে প্রদর্শিত হয় নাই। তাই তিনি নিজ প্রচেষ্টায় দুঃখমুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ছয় বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ সম্বোধি লাভের প্রচেষ্টায় মুক্তির জন্য চতুরার্যসত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা দুঃখ মুক্তির পথ লাভ সম্ভব নহে। তাই এই দুই অন্ত ত্যাগ করে মধ্যম পন্থাই দুঃখ মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখতে পান নাই।

এইগুলিকে মিথ্যা দৃষ্টি নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি এইসব মিথ্যাদৃষ্টি বাষট্টি প্রকারে বিভক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মজাল সূত্রের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদানকালে বুদ্ধ বলেছিলেন ঃ

"ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যারা পূর্বান্তকল্পিক, অপরান্তকল্পিব একাধারে পূর্বান্ত ও অপরান্ত কল্পিক, পূর্বান্তাপরান্ত দৃষ্টি যাঁরা মিথ্যা কারণে এই সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করে থাকেন, সে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী হয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করেন, তাঁরা সকলেই উক্ত দ্বিষষ্টি কারণে কিংবা উহাদের এক অথবা অপর কারণে এইরূপ মতবাদী হয়ে থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নহে"।

বুদ্ধ আরো বলেছিলেন ঃ

"ভিক্ষুগণ, এই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হয়ে এই গতিপ্রাপ্ত হবে। এই সকল আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই দশায় উপনীত হবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অধিক জানেন কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হয়ে তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন। বেদনানুভবের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হয়ে আসক্তি বর্জিত হয়ে তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন"[১৭]।

ব্রহ্মজাল সূত্রে বলা হয়েছে ঃ ১. শাশ্বতবাদী কারণ চারটা। ২. আংশিক শাশ্বত এবং আংশিক অশাশ্বতবাদী চারটা কারণ, ৩. জগৎ অনন্ত অথবা অনন্তবাদী চারটা কারণ, ৪. অমরা বিক্ষেপিকবাদী চারটা কারণ এবং ৫ জগৎ অকারণ সম্ভূতবাদী দুই কারণ মোট আঠার কারণে পূর্বান্তবাদীরা মত পোষণ করেন। ১. আত্মার অচৈতন্যবাদী ষোল কারণ, ২. আত্মার সচৈতন্যবাদী আট কারণ, ৩. উচ্ছেদবাদী সাতকারণ ৪. দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদী পাঁচ কারণ— মোট চুয়াল্লিস কারণে অপরান্তকল্পিকগণ মত পোষণ করে থাকেন।

উপসংহার ঃ ভগবান বুদ্ধ এইসব মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন মতবাদের বিরুদ্ধে জগৎ সৃষ্টি প্রলয়ের বিবর্তন সম্বন্ধে প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাখ্যা করেন, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মাবাদ প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর ধর্ম ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তৎকালীন উন্নততর ক্ষেত্রে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করতে বুদ্ধকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় নাই। কারণ সম্বোধি লাভের পর বুদ্ধ চিন্তা করেছিলেন যে, তাঁর অধীত ধর্ম— গম্ভীর, দুর্দশ, দুরনুবোধ্য, শান্ত প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়।[১৮] জনসাধারণ আলয়ারাম, আলয়সম্মোদিত তাদের পক্ষে ইদপ্রত্যয়তাও প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব দর্শন দুষ্কর হলেও জগতে বর্তমান স্বল্পরজঃ জাতীয় সত্ত্বগণ তাঁর ধর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন।

টীকা

<u>পূরণ বা পূর্ণ কাশ্যপ ঃ-</u>

বৌদ্ধগ্রন্থ অনুযায়ী পূরণ কাশ্যপ (পূর্ণ কাশ্যপ) একজন প্রাচীন অভিজ্ঞ ধর্মগুরু ছিলেন।

তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় এবং মগধরাজ অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি একটি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তীর্থঙ্কর ছিলেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদে - বিশ্লেষিত হয়েছে যে - যখন আমরা কোন কাজ করি অথবা কোন কাজ অন্যের দ্বারা সম্পন্ন করাই তখন আত্মার দ্বারা তা কখনো সম্পন্ন হয় না। তিনি আরো মনে করতেন আত্মা নিষ্ক্রিয় পদার্থ, অর্থাৎ আত্মা সুকর্ম বা দুষ্কর্ম - কোন কর্মেরই ফল ভোগ করে না, দেহই কাজ করে, দান-ধ্যান, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সৎকর্মেও সেরূপ পূণ্যার্জিন হয় না। তদ্রুপ প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা ভাষণ দেওয়া ইত্যাদি অসৎ কর্মেও মানুষের কোন রূপ পাপ হয় না। মানুষ ভাল-মন্দ যে কাজই করুন না কেন আত্মা এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয় না, দেহই ভোগ করে কর্মের ফল। এককথায় তাঁর মতে কারণ নেই অথচ কার্য রয়েছে। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে অহেতু থেকেই হেতুর জন্ম হয়। জৈন 'সূত্র কৃতাঙ্গ' কাশ্যপের মতবাদকে অক্রিয়াবাদ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। শীলাঙ্ক ইহাকে বলেন অকারণবাদ। বুদ্ধের দৃষ্টিতে কাশ্যপের মতবাদ অধিচ্চসমুপ্পাদ (a hypothesis of fortuitous origin) অর্থাৎ অনস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্ব উদ্ভব হয়। কিন্তু বুদ্ধ নিজের মতবাদ পটিচ্চসমুপপ্পাদ (theory of causal genesis) অর্থাৎ অনস্তিত্ব হতে কিছুই উদ্ভব হয় না। অন্যত্র বুদ্ধ কাশ্যপের মতবাদকে 'অহেতু অপচ্চয়বাদ' অর্থাৎ (a theory of noncaustion) বলে বর্ণনা করেছেন। (Silankara 1.1, 1.13. বুদ্ধ ও বৌদ্ধ পৃঃ ৯, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পৃঃ ১২-১৩, ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব পৃঃ ৫৫-৫৬)

প্রকুধ বা ককুদ কাত্যায়ন ঃ-

প্রকুধ কাত্যায়ন বুদ্ধের অগ্রজ সমসাময়িক ধর্মপ্রচারক ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁকে পুরণ কাশ্যপ ও অন্যান্যদের মত একজন তিত্থিয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাত্যায়ণ ছিলেন অনন্তবাদী দার্শনিক। অনন্তবাদীরা দ্রব্য বা পদার্থের পরিবর্তনের বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি স্থায়ী পদার্থের বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। অনন্তবাদীরা মনে করেন সত্তা এক ও অভিন্ন, অদ্বিতীয়। তিনি মনে করেন সমস্ত পদার্থ বা দ্রব্যের মূলে রয়েছে - চারি মহাভূত ; যথা ঃ— ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। এদের স্বভাবগুণে এরা স্থায়ী অর্থাৎ এদের পরিণামগত কোন পরিবর্তন হয় না। তাঁর মতে এই সমস্ত পরিবর্তনের মূলে দুইটি সূত্র বা নীতি বিরাজমান রয়েছে। একটি হচ্ছে মৈত্রী বা প্রেম যা পদার্থ সমূহের মধ্যে বন্ধনের সৃষ্টি করে আর অপরটি হচ্ছে ঘৃণা বা বিদ্বেষ যা পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ডেকে নিয়ে আসে। কাত্যায়ন চারি মহাভূতের অস্তিত্বকে স্বীকার করা ছাড়াও সুখ ও দুঃখকে জীবনের দুইটি অপরিহার্য নিয়ম বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে এই দুইটি হচ্ছে পরিবর্তনের মূলসূত্র। বৌদ্ধ সুত্তগুলিতে কাত্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে শাশ্বতবাদ (Eternalism) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রকুধের মতে জগতের যাবতীয় পদার্থ শাশ্বত ও অব্যয়, পর্বত চুড়ার ন্যায় স্থির ও দৃঢ়। তিনি আরো বলেন— ঘাতক, শ্রোতা ও

উপদেষ্টা কিছুই নেই। জীবহত্যার অর্থ হল ভূত সমষ্টি পৃথক করা। (বুদ্ধ ও বৌদ্ধ - পৃঃ ৮, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস - পৃঃ ১৬)

অজিতকেশকম্বলী ঃ-

অজিতকেশকম্বলী বুদ্ধের অগ্রজ সমসাময়িক আচার্য নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি এবং তাঁর শিষ্যবর্গ কেশদ্বারা তৈরি পোষাক ব্যবহার বা সদা সর্বদা একটি কেশের কম্বল স্কন্ধে বহন করতেন বলে তাঁরা কেশকম্বলী নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন ঘোর জড়বাদী দার্শনিক। কোন তত্ত্বেই তাঁর আস্থা নেই। নেই নেই এই ভাবনার মধ্যে তাঁর সমস্ত চিন্তাধারা বিধৃত হয়ে আছে। তাঁর মতে যুক্তি নেই, অনুমোদন নেই, মৃতের উদ্দেশে পিন্ডদানের কোন ফল নেই, ভবিষ্যৎ জীবন বলতে কিছু নেই। মৃত্যুর পরে ব্যক্তির অস্তিত্বও নেই। তিনি আরো মনে করতেন যাঁরা মনে করেন এই জীবনের পরও আরও একটা জীবন রয়েছে তাঁদের মত নির্বোধ সংসারে আর কেউ নেই। তাঁর মতে জীব পঞ্চভূতের সমষ্ঠি মাত্র অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এর সমষ্ঠি এবং মৃত্যুর পর এগুলি পুনরায় পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যায়। এক কথায় দার্শনিক হিসাবে অজিতকেশকম্বলী ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী। দীর্ঘ নিকায়ের অন্তর্গত সামঞ্‌ঞফল সূত্ত থেকে জানা যায় তাঁর সমস্ত বাণী নঞর্থক চিন্তা ও চেতনায় পরিপূর্ণ। বুদ্ধ ও মহাবীর তাঁর দর্শনকে এক কথায় বলেছেন — 'তং জীব তং শরীরবাদ'। (দীর্ঘনিকায় ১ম খণ্ড - পৃঃ ১৬৭, ২য় খণ্ড - পৃঃ ১৬১, HPBIP - P 289, সংযুক্তনিকায়, ৩য় খণ্ড - পৃঃ ১০১)

মস্করিণ গোশাল পুত্র ঃ-

বুদ্ধের সমসাময়িককালের তিনি একজন প্রখ্যাত আচার্য ছিলেন। তিনি শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী সরবণ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভগবান মহাবীর জীব এবং অজীব এই দুইয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মস্করিণ গোশাল পুত্র কেবলমাত্র জীবে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন পরিবর্তন বস্তুর স্বভাব ধর্ম। পরিবর্তনের মধ্যে পরিশুদ্ধিতার আগমন ঘটে। পরিবর্তন বলতে তিনি মন্দ থেকে ভাল, ভাল থেকে মন্দ হওয়াকে বুঝিয়েছেন। তথাগত বুদ্ধের মতে এই পরিবর্তনের ধারাকে নতুন নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তায় প্রতীত্যসমুৎপদ নীতির মধ্যে। জৈন ভগবতী সূত্র তাঁর মতবাদকে রূপান্তরবাদ নামে অভিহিত করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে একে বলা হয়েছে 'সংসার বুদ্ধি' গোশাল পুত্র নিজে রূপান্তরকে পরিণাম বা পরিণত বলেছেন। অধ্যাপক রীচ ডেভিডস রূপান্তর বা অনুগমনকে বলেছেন আত্মার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। মহাবীর এবং গোশাল পুত্র উভয়েরই মত বিশুদ্ধ পদার্থ কতকগুলি অশুভচিন্তা এসে পরিশুদ্ধ আত্মাকে দুষিত করে তোলে। তাছাড়া তিনি আরো বলেছেন — মোক্ষলাভের জন্য জীবের বারংবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়, সত্তার বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং প্রত্যেক সত্তাই

অনন্ত। এককথায় তিনি 'নিয়তিসঙ্গতিবাদ' মতবাদটি পোষণ করতেন। (বুদ্ধ ও বৌদ্ধ - পৃঃ ৭, HPBIP - P. 302 - 18)

সঞ্জয় বেলটঠিপুত্র ঃ-

তিনি ও বুদ্ধের সমসাময়িক একজন আচার্য ছিলেন। সঞ্জয় বেলটঠিপুত্র একজন পরিব্রাজক এবং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান বলে বর্ণিত হয়েছে। তিনি সংশয়বাদী দার্শনিক নামে খ্যাত ছিলেন। বৌদ্ধ পরিভাষায় একে অজ্ঞানবাদী রূপেও অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবী শাশ্বত না অশাশ্বত বিশ্ব অসীম না সসীম? মৃত্যুর পরে আত্মা ধ্বংস হয় কী, হয় না? এই জগতে যিনি পরিশুদ্ধিতা অর্জন করেছেন মৃত্যুর পর ও কী তিনি বজায় রাখতে সক্ষম হন? সব কিছুর অস্তিত্বে তিনি অবিশ্বাস স্থাপন করতেন। স্থির বিশ্বাস তাঁর মনের মধ্যে কখনও স্থান পেত না। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সঞ্জয়ের দার্শনিক জিজ্ঞাসাগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ জীবনের জটিল প্রশ্নগুলির তিনি সার্বিক সমাধান প্রদান করতে পারেন নি। এসব ব্যাপারে হয় তিনি নীরব ছিলেন নতুবা উত্তর এড়িয়ে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অর্থহীন অনুসন্ধিৎসায় বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছেন। ফলে মানুষের মনে অধীরতা বহুমাত্রায় বেড়ে গেছে। বস্তুতঃ তাঁর মতবাদ অজ্ঞানবাদ নামে অভিহিত। বুদ্ধের প্রধান দুই শিষ্য সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লায়ন প্রথম জীবনে সঞ্জয়ের অনুগামী ছিলেন।

নিগণ্ঠনাথ পুত্র ঃ-

বুদ্ধের সমসাময়িক আচার্যগণের মধ্যে নিগণ্ঠনাথ পুত্র ছিলেন জৈনধর্মমতের প্রধান প্রবক্তা। তিনিই হলেন স্বনামধন্য জৈনগুরু ভগবান মহাবীর। তাঁর জন্মস্থান বৈশালী। তাঁর দার্শনিক মতবাদ হচ্ছে ক্রিয়াবাদ বা কর্মবাদ। তিনি কর্মের ফলা-ফলের খুবই জোর দিতেন। সৎকর্মের সুফল এবং অসৎকর্মের কুফল বিষয়ে তিনি সদাসর্বদা সতর্ক করে দিতেন। তিনি প্রচার করতেন যে কেউই পাপকর্ম হতে কাকেও রক্ষা করতে পারে না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব-কর্মের ভোক্তা বা নির্মাতা। সুখ বা দুঃখ পাওয়া তার নিজের সুকর্ম বা দুষ্কর্মের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতবাদে আত্মা, জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, নরক ইত্যাদির স্থান ছিলনা। অপর দিকে তিনি জ্ঞান, সদাচার ও প্রবল কৃচ্ছ্র সাধনার মাধ্যমে মোক্ষলাভের সম্ভাবনার কথা বলেছেন, তাই তাঁর মতবাদকে বলা হয়ে থাকে বিনয়বাদী দর্শন। বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা তাঁর দর্শনে কৃচ্ছ্র সাধনের প্রবণতা বেশি। সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসরকাল ধর্মপ্রচার করে পাবাতে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন। কথিত আছে, রাজা বিম্বিসারের পুত্র রাজকুমার অভয় তাঁর একান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর শিষ্য বর্গের মধ্যে গৌতম, ইন্দ্রভূতি ও সুধর্মান ছিল অন্যতম। (বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম - পৃঃ ১৪১, HPBIP - 375, EM. B. পৃঃ ৩১, বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম- পৃঃ ৮)

সূত্র নির্দেশ -

১) ভিক্ষু শীলভদ্র— অনুঃ *দীর্ঘনিকায়,* ৩য় খণ্ড, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩৬১ বাংলা পৃ. ১০৪।

২) স্থবির প্রজ্ঞানন্দ, অনুঃ *মহাবর্গ,* যোগেন্দ্র রূপসী বালা ত্রিপিটক ট্রাষ্ট বোর্ড, কলিকাতা, ১৯৩৭ পৃ. ৩৪।

৩) ভিক্ষু শীলভদ্র-অনুঃ *দীর্ঘনিকায়,* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭-৬৩।

৪) I.B. Horner-Translate, *The Clarifier of the Sweet Meaning.* (Madhurattavilasini), P.T.S. London 1978, p. 388.

৫) *দীর্ঘনিকায়,* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত- পৃ. ৭৭।

৬) *দীর্ঘনিকায়,* তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত- পৃ. ৭১।

৭) ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা।

৮) দত্ত, রমেশ চন্দ্র, সম্পাদিত *হিন্দুশাস্ত্র* অখণ্ড, নিউ লাইট, প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩০০ বাংলা, পৃ. ৪৩।

৯) সরকার, সুধীর চন্দ্র সংকলিত, *পৌরাণিক অভিধান,* এম. সি. সরকার এণ্ড প্রাঃ লিঃ কলিকাতা ১৩৬৫, পৃ. ১৪৩।

১০) *দীর্ঘনিকায়,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২।

১১) *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৩।

১২) মহাস্থবির পণ্ডিত ধর্মাধার, *মিলিন্দ প্রশ্ন* অনুঃ পণ্ডিত ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭।

১৩) জাতক ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত।

১৪) স্থবির রাজগুরু ধর্মরত্ন, *মহাপরিনির্বাণ* সূত্র, অনুঃ চট্টগ্রাম ১৯৪৩, পৃ. ২৬০।

১৫) হিন্দু শাস্ত্র প্রাগুক্ত, অষ্টাদশ, পুরাণ, পৃ ১।

১৬) প্রাগুক্ত, ষড়দর্শন, পৃ. ১২।

১৭) *দীর্ঘনিকায়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১৮) *মহাবর্গ* পৃ. ৫।

মৌর্য-গুপ্ত যুগের রাজতান্ত্রিক আদর্শঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

পরেশ রায়চৌধুরী

প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রাজবংশ স্বমহিমায় শাসনকার্য পরিচালনা করে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি প্রভৃতির ধারকবাহক রূপে ভারতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতের এমনই দুইটি উল্লেখযোগ্য রাজবংশ হল মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশ। এই দুই রাজবংশের রাজাদের রাজতান্ত্রিক আদর্শের তুলনামূলক পর্যালোচনাই আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 'রাজতান্ত্রিক আদর্শ' শব্দটি আমি ইংরাজি 'Kingship'- এর প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছি)।

আলোচনার প্রারম্ভে 'রাজতান্ত্রিক আদর্শ'-এর উৎপত্তি ও বিবর্তন বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। সাধারণভাবে মনে করা হয় শত্রুপক্ষীয় চাপই রাজতান্ত্রিক আদর্শের উৎপত্তি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।[১] প্রাচীন ভারতে রাজতান্ত্রিক আদর্শের উৎপত্তি সংক্রান্ত দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমত ঃ রাজতান্ত্রিক আদর্শের উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্রাহ্মণ্য মতবাদ, দ্বিতীয়ত ঃ রাজতান্ত্রিক আদর্শের উৎপত্তি সংক্রান্ত বৌদ্ধ মতবাদ।[২] ব্রাহ্মণ্য ধারণা অনুসারে, রাজতন্ত্রের স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর স্বয়ং (মনু মনে করেন প্রজাপতি স্বয়ং ছিলেন এই ঈশ্বর)।[৩] বৌদ্ধধারণা অনুসারে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] এই দুই মতবাদ মৌর্য ও গুপ্ত রাজাদের রাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

মৌর্য রাজতন্ত্রে অনেকাংশ রাজতান্ত্রিক আদর্শের উৎপত্তি সংক্রান্ত বৌদ্ধ ধারণার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। মৌর্য যুগের রাজতান্ত্রিক আদর্শ বলতে মূলতঃ মহামতি অশোকের রাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ঐতিহাসিক উপাদানের অপ্রতুলতার কারণে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিশেষত বিন্দুসারের রাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে আলোকপাত করা কষ্টসাধ্য। তবে মেগাস্থানিসের 'ইন্ডিকা' কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন একতন্ত্রী শাসক, তিনি সকল ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন।

অশোকের রাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা বহুলাংশে বৌদ্ধধারণার (রাজতান্ত্রিক আদর্শ সংক্রান্ত) অনুসারী ছিল--- সন্দেহ নেই। শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সব কিছুর উর্দ্ধে ধর্মকে স্থান দিয়েছিলেন। 'পূর্বতন ধর্মময় সমাজ'[৫] কে রক্ষা করাই অশোকের একমাত্র

কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। এ কারণেই অশোক জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের দিকেও নজর দিয়েছিলেন। তবে লক্ষণীয়, কখনই বা কোন ক্ষেত্রেই ধর্মের ওপর রাজাদেশ আরোপ করেন নি। বাস্তবিকভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ধর্মের রক্ষক বা ধর্মের প্রতিপালক। এমন কি তাঁকে ধর্মের রাজা (প্রকৃত ধর্মকে অনুসরণকারী রাজা) বললেও হয়ত অত্যুক্তি হয় না।

অশোক ধর্মের প্রতিপালক হিসাবে শাসন পরিচালনা করলেও কখনো কখনো সংঘের ভিক্ষু - ভিক্ষুনীদের ওপর নিজেকে স্থাপন করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী যদি সংঘভেদ করে তাঁকে পীতবস্ত্রের পরিবর্তে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে অনাবাসে জীবন অতিবাহিত করতে হবে।[৬] তিনি কেবল এই রূপ আদেশ জারি করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, রাজাদেশ ভিক্ষুরা অনুসরণ করছেন কিনা তা জানবার জন্য উপবাস দিবসে ভিক্ষুদের সভাতে একজন মহামাত্যকে প্রেরণ করা হত। তবে এক্ষেত্রেও তিনি ধর্মের ওপর রাজাকে স্থাপন করেন নি। বুদ্ধ নির্দেশিত রীতিনীতি অমান্য করে ভিক্ষু ভিক্ষুনীরা যাতে ব্যভিচারী হয়ে উঠতে না পারে - সে কারণেই অশোক এরূপ কঠোর মনোভাব পোষণ করেছেন। এখানে অশোক ভিক্ষু ভিক্ষুনীদের ওপর রাজাকে প্রতিস্থাপন করেছেন। কিন্তু ধর্মের উপর নয়। এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে রক্ষা করা।

অশোক প্রবর্তিত রাজতন্ত্র আবার পিতৃত্ববোধের উদ্বুদ্ধ ছিল।[৭] তিনি ঘোষণা করেছিলেন, '...... সবে মুনিষে পূজা সমা।'[৮] অশোক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে প্রজাপুঞ্জের ওপর পিতৃত্ববোধের ধারণাকে প্রচার করে জনসাধারণের নিকট হতে পিতার ন্যায় আনুগত্য লাভে সচেষ্ট হয়েছেন— এমন মনে করাও অস্বাভাবিক নয়। তবে পিতা হিসাবেও প্রজাসাধারণের নিকট অশোকের কিছু দায়বদ্ধতা থেকে যায়। কিন্তু অশোক জনসাধারণের জন্য যেসকল কাজ করেছিলেন সেগুলো আদর্শ নৃপতি হিসাবে সকল সম্রাটের সম্পাদন করা উচিত। এর জন্য রাজা-প্রজার মধ্যে পিতৃত্ববোধের সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর কোন বাড়তি গুরুত্ব না দিলেও হয়ত হত। এমনও হতে পারে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই প্রজাপুঞ্জের ওপর কেবল সম্রাটের অধিকার নয়, পিতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যই অশোক এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

গুপ্ত রাজতন্ত্রে ব্রাহ্মণ্য ধারণা (রাজতান্ত্রিক আদর্শ সংক্রান্ত) ছাপ সুপষ্ট। গুপ্তরাজারা 'রাজধর্ম' অনুসারে শাসন পরিচালনা করতেন। জনগণের মঙ্গল সাধনের জন্য সম্রাট তাঁর বিবেচনা প্রসূত আদর্শ ন্যায়নীতির মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করবেন। বস্তুতপক্ষে রাজধর্ম হল 'ইষ্ট পরিপালম্, দুষ্ট নিগ্রহম্' অর্থাৎ দুষ্টজনকে সংহার করে সাধুব্যক্তিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা। রাজধর্মে বর্ণপ্রথার ওপর গুরুত্বরোপ করা হয়। এ কারণে গুপ্তরাজতন্ত্র জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করতে পারে নি। বর্ণপ্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণরা পূজার্চনা, ক্ষত্রিরা শাসন পরিচালনা করবে। ফলতঃ গুপ্ত যুগে বর্ণপ্রথা তাৎপর্যপূর্ণ স্থান

দখল করেছে। মৌর্য রাজারা এ বিষয়ে অনেক উদার ছিলেন। প্রমাণ হিসাবে তৎকালে অ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের (জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ধর্ম) উত্থানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

গুপ্তযুগে বিভিন্ন রকমের যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমুদ্রগুপ্তের মতো পরাক্রমশালী সম্রাটেরাও মনোনিবেশ করেছেন। বাজতান্ত্রিক আদর্শের উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্রাহ্মণ্য মতবাদে বলা হয়েছে, রাজাকে ক্ষত্রিয় হতে হবে এবং বারবার যজ্ঞ সম্পাদন করতে হবে। বারবার যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে রাজা নিজের ক্ষমতাকে ঝালিয়ে (recharge) নেবে এবং ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করবে। গোন্ডার মতে, রাজকীয় যজ্ঞগুলো একধরণেব সংস্কারযুক্ত অথবা রাজার উন্নতরূপলাভের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা যজ্ঞকারীকে বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে অধিক শক্তিশালী করে তোল।[৯] যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের রাজক্ষমতা লাভের উল্লেখ আমরা ব্রাহ্মণে পেয়ে থাকি।[১০] এই কারণেই হয়ত গুপ্ত রাজারা রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের সম্পাদন করেন। যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনায় গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণশ্রেণী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। একারণেই সে সময়ে গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট রাখতেন। এ জন্য ধর্মীয় ক্ষেত্রে গুপ্ত সম্রাটেরা কোন রূপ হস্তক্ষেপ করতেন না, ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। তৎকালে যজ্ঞানুষ্ঠানই রাজার সামরিক বিজয়কে স্বীকৃতি প্রদান করত।[১১]

গুপ্তযুগে রাজস্বার্থ ও ব্রাহ্মণশ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ছিল বলেই মনে হয়। গুপ্ত রাজারা বিভিন্নভাবে ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট রাখার ফলে তারা রাজাকে যজ্ঞ সম্পাদন সাহায্য করে রাজার ক্ষমতার উন্নয়নে এবং জনসমক্ষে রাজার ক্ষত্রিয়ত্ব ও দেবত্ব প্রচার করে রাজমহিমাকে উজ্জ্বলতম করে তোলার চেষ্টা করতেন— এমন ধারণা নিতান্ত অযৌক্তিক নয় বলেই মনে হয়। জাতিগত দিক থেকে গুপ্তরা কি ছিলেন— সে বিষয়টি বিতর্কিত। হয়ত গুপ্তরা নিম্নবংশ জাত ? হওয়ার কারণেই ব্রাহ্মণশ্রেণীকে তোষণের মাধ্যমে এই অপবাদ দূর করতে চেয়েছিলেন। জাতিভেদ প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণ শ্রেণী ছিলেন সর্বোচ্চ! ফলতঃ তৎকালের সমাজ ব্যবস্থায় তাঁদের প্রতাপ ছিল অবিসংবাদিত, তাঁদের অভিমত মর্যাদা ছিল যথেষ্ট। সে জন্য গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণদের রাজার প্রতি অনুগত করে তুলতে চেয়েছিলেন।

গুপ্তদের মতো মৌর্যদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ (নিম্নবংশজাত) থাকা সত্ত্বেও- যদিও বিষয়টি বিতর্কিত— মহামতি অশোক কিন্তু কোনভাবেই পুরোহিততন্ত্রকে পাত্তা দেন নি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশই অর্থহীন এবং রাজপুরোহিতদের আয়ের একটা উৎস বলে তিনি মনে করতেন। একারণেই প্রথম প্রধান শিলালেখর মাধ্যমে অশোক পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যারা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকর্ম প্রতিপালন করেন তাঁদের আক্রমণ করেছেন।[১২] তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সমর্থন না করে অপেক্ষাকৃত উদার ধর্মের দিকে (বৌদ্ধধর্ম) ঝোঁকার নীতি নেন।

উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন লেখ থেকে জানা যায় গুপ্তরাজারা 'অচিন্ত্যপুরুষ'; 'লোকধামদেব'; 'পরমদেবত' ইত্যাদি আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি গ্রহণ করেন।[১৩] এমন কি হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তকে ধনদ (কুবের), ইন্দ্র, বরুণ, অন্তক (যম) - এর সমকক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৪] ডঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মনে করেন এই সকল উপাধির দ্বারা তাঁরা চূড়ান্ত দেবত্বের দাবি করতেন।[১৫] গুপ্ত সম্রাটদের এই 'দেবত্ব' জনসমক্ষে ব্রাহ্মণেরা প্রচারও করতেন। কিন্তু মৌর্যরাজাদের ওপর কখনই 'দেবত্ব' আরোহিত হয়নি। অশোক নিজেকে 'দেবনং পিয়স অশোক' অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় অশোক বলে অভিহিত করেছেন।[১৬] কিন্তু অশোককে কখনই দেবতাদের সমকক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়নি।

মৌর্য সম্রাটেরা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। দেশশাসনের ক্ষেত্রে তাঁরা চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, মৌর্য শাসন ব্যবস্থা ছিল নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র। মৌর্য শাসকদের তুলনায় শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে গুপ্তরা অনেক ঢিলেঢালা, উদারতান্ত্রিক। সামন্ত প্রথার উদ্ভব থেকে এটাও সুপষ্ট যে, গুপ্ত শাসকেরা বিকেন্দ্রীকরণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। অপরদিকে, মৌর্যযুগে কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে সমাজের নিচুতলার মানুষের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার মাধ্যম ছিল রাজুক, মহামাত্র, স্ত্রীমহামাত্র, সংস্থাঃ, সঞ্চরাঃ নামক বিভিন্ন রাজকর্মচারী।[১৭] গুপ্ত সম্রাটদের ওপর 'দেবত্ব' আরোহিত হওয়ার কারণে প্রজাসাধারণের সঙ্গে সম্রাটদের ব্যবধান বেড়েই গিয়েছিল।

ডঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মৌর্য-গুপ্ত যুগের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দুই ব্যক্তিত্ব মহামতি অশোক ও মহাপরাক্রমশালী সমুদ্র গুপ্তের রাজতান্ত্রিক আদর্শের বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করেছেন।[১৮] ডঃ রায়চৌধুরীর এই চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণের প্রতি আলোকপাত করে প্রবন্ধটির ইতি টানা যেতে পারে। তাঁর মতে, অশোক ও সমুদ্রগুপ্ত উভয়েই 'পরাক্রম' দ্বারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করলেও দুইজনের নিকট পরাক্রমের অর্থ ছিল ভিন্ন। অশোক 'পরাক্রম' বলতে প্রাচীন ভারতের প্রচলিত বিধিবিধানকে মর্যাদা দিয়ে 'ধম্ম' প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করাকে বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে সমুদ্রগুপ্তের নিকট 'পরাক্রম' ছিল প্রবলভাবে যুদ্ধজয় ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। উভয়েরই ধর্মবিজয়ীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে অশোক এক্ষেত্রে 'ধম্ম' প্রচারের ওপর গুরুত্ব দেন, যেখানে সমুদ্রগুপ্ত 'ধর্ম' ও বিজয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছিলেন। অধ্যাপক সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, "মানবিক এবং বিশ্বজনীনতার দিক থেকে অশোকের নীতি ছিল মহত্তর, কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে এর ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের দায়ভাগ আংশিকভাবে অশোককে বহন করতে হয়, কিন্তু সাম্রাজের পতনের জন্য সমুদ্রগুপ্তকে তা করতে হয় না। বরং বলা যায় যে, অনাগত যুগের প্রবল জড় ও চিন্ময়ী শক্তির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক এবং এই যুগ অনেকাংশে তাঁরই সৃষ্টি।"[১৯]

সূত্র নির্দেশ

1) C. Drekmeir – *Kingship and Community* in *Early India* (California, 1962)

2) V. P. Varma – *Studies* in *Hindu Political Thought and Its Metaphysical Foundation* (Bihar Research society, 1954) 'Buddhhist Thories of Kingship' এবং 'Brahmanical Theories of Kinghips' নামক দুই অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

3) *Manusmriti*

4) *Dialogues of Buddha* – English translation by Rhys Davids, iii P.P. - 77-94.

5) Ibid P - 88.

6) Sarnath Pillar Inscription

7) সুমন চট্টোপাধ্যায় — *প্রাচীন* ভারত (ভাষান্তর '*Ancient India*' – R. S. Sharma'); পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৯, পৃঃ ১২৯

8) Kalinga, Edict II

9) J. Ganda – *Ancient Indian Kingship from Religious* Point of View, P - 100.

10) *Aitareya Brahmana,* iii, 4.12

11) N. C. Bandyopadhyay — *Development of Hindu Polity* and *Political Theories*, PP - 166-167.

12) R. Thapar — *Asaka and the Decline of Mauryas* Oxford, 1961, P - 162.

13) D. K. Ganguli – *Aspects of Ancient Indian Administration*, Delhi 1978.

14) Allahabad Pillar Inscription

15) H. C. Roy Choudhuri — *Political History of Ancient India*, Calcutta 1996, P - 559

16) Maski inscription

17) Rock Edict III

18) H. C. Roy Choudhuri — *Political History of Ancient India* (Commentry By B. N. Mukherjee) PP - 485-486.

19) সুনীল চট্টোপাধ্যায় — *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃঃ ৩৭৪-৩৭৫।

ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণের প্রভাব

শিল্পী গাঙ্গুলি

পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত যাযাবর হূণ জাতি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি শাখা ইওরোপ অভিমুখে যাত্রা করে এবং অন্য শাখাটি অক্ষু উপত্যকার দিকে অগ্রসর হয়। ইওরোপগামী হূণরা তাদের নেতা অ্যাটিলার নেতৃত্বে রোমাণ সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। অন্যশাখা যারা 'শ্বেতহূণ' নামে পরিচিত ছিল তারা হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে কুষাণ পরিচালিত গান্ধার রাজ্যে প্রবেশ করে। গান্ধার পদদলিত করে এরা ভারতের গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে।

গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত (আনুমানিক৪৫৫-৪৬৮ খ্রিঃ) সাফল্যের সঙ্গে হূণ আক্রমণ প্রতিহত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে হূণনেতা তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে ভারতে পুনরায় হূণ আক্রমণ ঘটে। মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূণরা পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং মালবের পূর্বাঞ্চল দখল করে। ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ সাহিত্য সমূহে মিহিরকুলকে রক্তপিপাসু, নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েঁ হিন্দুরাজগণ মিহিরকুলকে দমনের জন্য অগ্রসর হন। গুপ্তবংশের নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য এবং মান্দাসরের যশোধর্মা ৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের কিছুপূর্বে মিহিরকুলকে পরাজিত করেন। মিহিরকুলের পরাজয়ের ফলে ভারতে হূণ আধিপত্যের অবসান ঘটে। পরবর্তী প্রায় পাঁচশত বৎসরের অধিককাল প্রায় মুসলমান আক্রমণের পূর্বপর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে ভারত অব্যাহতি লাভ করে। যদিও কোন কোন ক্ষুদ্র হূণ শাসক পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাদের রাজত্ব অক্ষত রাখেন। বাণভট্ট প্রণীত 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধনও হূণ গুর্জরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলে দাবি করেন।[১] মিহিরকুলের পরাজয়ের ফলে ভারতে হূণশক্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কালক্রমে হূণরা তাদের স্বাতন্ত্র্য হারায় এবং শেষপর্যন্ত এই বিদেশী আক্রমণকারীরা হিন্দুসমাজে অনুপ্রবেশ করে। হূণ আক্রমণ ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সংযোজনা করেছে। প্রায় পঁচাত্তরবর্ষব্যাপী ভারতে হূণ আক্রমণের প্রভাব ছিল দ্বিমুখী — ইতিবাচক এবং নীতিবাচক।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে হূণদের নিষ্ঠুরতা ও যুদ্ধবিগ্রহ এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণ আক্রমণ প্রতিহত করে ভারতের স্বাধীনতার

রক্ষায় সমর্থ হলেও হূণ আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ইহার পরিণতিতে, সম্রাট স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে গু প্তসাম্রাজ্য তার অখণ্ডতা হারায়। সৌরাষ্ট্র, মালবের পশ্চিমাঞ্চল গুপ্তসাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘকালব্যাপী নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহের ফলে গুপ্তসম্রাটগণ সাম্রাজ্য স্থাপনের মাধ্যমে ভারতে যে রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শক্তিশালী গুপ্তসাম্রাজ্য যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল, তার থেকে আর পুনরুত্থান করা সম্ভব হয় নাই। এই অবস্থায় দুর্বল গুপ্তরাজগণ রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণে বাধ্য হন; যার পরিণতিতে, সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলগুলির উপর তাদের অধিকার লুপ্ত হয়। সম্রাটদের দুর্বলতা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহকে উৎসাহিত করে। ফলে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে, হূণরা পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা দুর্বল গুপ্ত সম্রাটদের ছিল না। হূণ আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্যের শক্তি, সংহতি, একতা লুপ্ত হয়, দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, শান্তি সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হয়, এবং জনগণের অতীব দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। হূণ আক্রমণের ফলে ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। মালব, যৌধেয়, কুনিনদা প্রভৃতি রাজ্যগুলি ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়।

কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন সামন্তগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিরন্তর পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ হূণ আক্রমণ ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যস্ত করে।

অন্যদিকে আবার হূণ আক্রমণকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় রাজাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি হয়েছিল। হূণদের বর্বরোচিত আক্রমণ একমাত্র ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দূর করা সম্ভব — এই অনুভূতির ফলে গুপ্তসম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য এবং মান্দাসরের যশোধর্মনের পক্ষে একযোগে হূণ বিতাড়নে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল এবং তারা মিলিতভাবে হূণশক্তি প্রতিহত করতে সক্ষমও হয়েছিলেন। সুতরাং ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে একটি জাতীয়ভাবের অভ্যুদয় হয়েছিল বলা যায়। হূণ বিতাড়নে ভারতবাসীকেই অগ্রসর হতে হবে — এই চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে হূণ আক্রমণে ভারত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জনৈক আধুনিক পণ্ডিতের মতে মধ্যএশিয়া ও কাশ্মীর হূণরা অধিকার করলে বহির্বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত সড়কগুলি অচল হয়ে পড়ে।[২] প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, ভারতে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয় ও দেশ দেউলিয়া হয়ে যায়। ইহার পরিণতিতে, স্কন্দগুপ্ত মুদ্রায় সোনার পরিমাণ হ্রাস করতে বাধ্য হন পরবর্তী গুপ্তরাজাদের আমলে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।

সমৃদ্ধ জনপদ এবং ঐশ্বর্যের কেন্দ্রস্থল বৌদ্ধমঠগুলি লুণ্ঠণ ও ধ্বংস হলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা বৃদ্ধি পায়।

কৃষিব্যবস্থা ধ্বংস হয়, শস্যশ্যামল ক্ষেতগুলির উপর দিয়ে বেপরোয়া অশ্বচালনার ফলে দেশের খাদ্যসঙ্কট তীব্র হয়।

হূণদের অত্যাচারে গ্রামবাসীরা হয় তাদের উর্বর অঞ্চলগুলি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, নতুবা মৃত্যু ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে গ্রামগুলিকে ধ্বংস করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, গ্রামীণ অর্থনীতির পতন শুরু হয়।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে, হূণ আক্রমণ ভারতে এক বিপর্যয় এনেছিল। হূণরা ছিল বর্বর জাতি, মানবতা কিংবা পবিত্রতা সম্বন্ধে তাদের কোন অনুভূতি ছিল না। হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে তারা হত্যা করেছিল, বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠগুলিকে নির্দয়ভাবে ধ্বংস করেছিল। ভারতে বৌদ্ধধর্ম হূণ আক্রমণে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যেমন— তক্ষশীলা, কাশিয়া, কৌশাম্বী, নালন্দা, পাটলীপুত্র — হূণদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। ইহার পরিণতিতে, ভারতের সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনগুলির অধিকাংশই হূণ আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ইতিবাচক দিক থেকে, সামাজিক ক্ষেত্রে, হূণ আক্রমণ ভারতীয় ইতিহাসে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। মিহিরকুলের মৃত্যুর পর হূণরা তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য হারায়। অতঃপর তারা ভারতে বসতি স্থাপন করে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিলিত হয় এবং ক্রমশঃ তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। বস্তুতঃ, হূণ এবং ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং বিবাহের ফলে এক নতুন জাতিগত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই নতুন শ্রেণী যোদ্ধৃ অভিজাত শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে যারা 'রাজপুত' নামে পরিচিত হয়। অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে 'রাজপুত' জাতির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। রাজপুত রাজারা নিজেদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন। তারা কখন নিজেদের চন্দ্রবংশীয়, কখন সূর্যবংশীয় বলে উল্লেখ করে নিজেদের বংশমর্যাদাকে মহিমান্বিত করেছেন। ভারতীয় জনসমষ্টি থেকে কোন কোন 'রাজপুত' বংশের সৃষ্টি হলেও তাদের অধিকাংশই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর বহিরাগত জাতির মিশ্রণে সৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বহিরাগত জাতির মধ্যে হূণরা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিকই, রাজপুতদের ছত্রিশটি গোষ্ঠীর মধ্যে হূণরা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল। ডঃ স্মিথের মতে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে হূণ ও অন্যান্য বৈদেশিক জাতির আক্রমণে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে যার পরিণতিতে, ভারতীয় ঐতিহ্য ও জাতিভেদ ব্যবস্থা শিথিল হয়, প্রাচীন রাজপরিবারগুলির পরিবর্তন দেখা যায়।[৩] ব্রাহ্মণদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তারা পূর্বের মতই ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে। কিন্তু প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশগুলির মধ্যে ভাঙ্গন দেখা যায়। ইহার পরিণতিতে, বহিরাগত জাতিগুলি যারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের মর্যাদা ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এইভাবে হূণদের বংশধররাই পরবর্তী কালে ক্ষত্রিয় রাজপুত হিসেবে হিন্দু

সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে দেখা যায় যে, কলচুরী রাজাগণ হূণ রমনীদের বিবাহ করে সামাজিক পরিবর্তন ঘটান। ইতিহাসের নির্মম পরিহাসস্বরূপ হূণ বংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় রাজপুতগণই পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের ধর্মের ও সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা হিসেবে বিধর্মী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১) 'হর্ষচরিত' — কোয়েল এবং টমাস দ্বারা অনূদিত, পৃঃ ১০১।

২) 'দি হূণস্ ইন ইণ্ডিয়া' - উপেন্দ্র ঠাকুর, পৃঃ ২২৫।

৩) 'দি আর্লি হিষ্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া'— ভিনসেন্ট স্মিথ, পৃঃ ৪২৬

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) দি গেজেটর অব্ ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী, ১৯৭৩

২) চট্টোপাধ্যায়, এস.— 'আর্লি হিষ্ট্রি অব্ নর্থ ইণ্ডিয়া'-কলকাতা- ১৯৫৮

৩) কোশাম্বী, ডি. ডি. — 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অব্ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি' বম্বে, ১৯৫৬

৪) মজুমদার, আর. সি.— 'অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' নয়া দিল্লী, ১৯৭৭

৫) মজুমদার, আর. সি. ও পুশলকর এ. ডি. — 'দি ক্ল্যাসিক্যাল এজ' বম্বে, সেকেণ্ড ইম্প্রেশন, ১৯৬২

৬) পানিক্কর, কে. এম. — 'এ সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি' তৃতীয় সংস্করণ, বম্বে পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৭

৭) রায়চৌধুরী, এইচ্. সি.— 'পলিটিকাল হিষ্ট্রি অব্ অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া', সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৭২

৮) স্মিথ, ভিনসেন্ট — 'দি আর্লি হিষ্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া', চতুর্থ সংস্করণ, অক্সফোর্ড, ১৯২৪

৯) ঠাকুর, উপেন্দ্র — 'দি হূণস্ ইন ইণ্ডিয়া' বারাণসী, ১৯৬৭

১০) ত্রিপাঠী, আর এস. — 'হিষ্ট্রি অব্ কনৌজ', দিল্লী, ১৯৬৪

উনগ্রামের একটি নামহীন মন্দির

স্বাতী মণ্ডল অধিকারী

আনুমানিক সহস্রাব্দপ্রাচীন একটি নামহীন মন্দির বর্তমান প্রবন্ধটির আলোচনার বিষয়। মন্দিরটি মধ্যপ্রদেশের খারগোন জেলার উনগ্রামে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি একদা প্রাচীন মালয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং ইতিহাসখ্যাত পরমার রাজবংশের শাসনাধীন ছিলো। আনুমানিক অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরমার শাসকগণ মালয়া অঞ্চলে শাসনকার্য চালান। তাঁরা কেবলমাত্র সুশাসক ও সুযোদ্ধাই ছিলেন না, বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। এই রাজবংশের শাসনকালে উনগ্রামে বহু মন্দির নির্মিত হয়। এখানকার সর্ববৃহৎ মন্দির চৌবারা ডেরার অন্তরাল অংশে রয়েছে একটি লেখ, যাতে পরমার শাসক উদয়াদিত্যের (রাজত্বকাল ১০৫৯-১০৮৬ খ্রিঃ) নামোল্লেখ রয়েছে।[১] আলোচ্য নামহীন মন্দিরটিতে কোন লেখ নেই। কিন্তু চৌবারা ডেরার পার্শ্ববর্তী এই মন্দিরটির গঠনশৈলী ও ভাস্কর্যশৈলীর সঙ্গে চৌবারা ডেরার মিল থেকে বোঝা যায়, এটিও পরমারযুগে নির্মিত হয়েছিলো।

আলোচ্য মন্দিরটি উনগ্রামের ক্ষুদ্র মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। এটি পূর্বাভিমুখী মন্দির। একই অক্ষরেখায় অবস্থিত গর্ভগৃহ, অন্তরাল ও মুখমণ্ডপ নিয়ে গঠিত মন্দিরটি একটি নাতিউচ্চ পীঠের ওপর অবস্থিত। এটি একটি নিরন্ধ (প্রদক্ষিণপথ বিহীন) মন্দির। পীঠের সামনের দিকে রয়েছে কারুকার্যখচিত সিঁড়ি।

গর্ভগৃহটি ভিতরের দিকে বর্গাকার। কিন্তু বিমানের (মূল মন্দির) বহির্নক্সা তারকাকৃতি। পঞ্চরথ বিমানের প্রতিটিদিকে ভদ্র বা মধ্যরথ অংশটি গর্ভগৃহের সঙ্গে সমান্তরাল। কিন্তু অন্য রথগুলি তা নয়। এরা সূক্ষ্মকোণবিশিষ্ট এবং চক্রাকারে গর্ভগৃহটিকে বেষ্টন করে আছে। ফলতঃ, বহির্নক্সা তারকাকৃতি ধারণ করেছে।

উলম্বরেখায় মন্দিরের তিনটি অংশ হল অধিষ্ঠান, মণ্ডোবর ও শিখর। শিখরের ওপরের অংশ ভগ্ন। অনুমান করা যায়, উনের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় শিখরের ওপরে আমলক স্থাপিত হয়েছিলো।

অধিষ্ঠান (storied basement) অংশটি ঢালু। এখানে মোল্ডিংএর যে স্তরগুলি দেখা যায় তাতে বিশেষ কারুকার্য নেই। ঢালু অধিষ্ঠানের ওপর খাড়া বেদীবন্ধ অংশটি কয়েকটি ভূসমান্তরাল মোল্ডিংএর সমন্বয়ে গঠিত। এখানে খুরক নামক মোল্ডিংটি ক্ষুদ্রাকৃতি কুলুঙ্গি দ্বারা সজ্জিত। খুরকের ওপর রয়েছে কুম্ভ নামক মোল্ডিং।

জঙ্‌ঘা (দেওয়াল) অংশটি কারুকার্যখচিত। বর্তমানে শুধু দক্ষিণদিকের জঙ্‌ঘা অংশটি অটুট রয়েছে। দক্ষিণদিকের ভদ্রে বৃহদাকার কুলুঙ্গিতে ব্রহ্মামূর্তি স্থাপিত। জঙ্‌ঘার অন্যান্য অংশ ক্ষীণাঙ্গ অর্ধস্তম্ভ দ্বারা সজ্জিত। এখানে উল্লেখ করা যায়, শিখরের সম্মুখভাগে একটি আয়তাকার প্যানেলে দক্ষিণে ব্রহ্মা, মধ্যে শিব ও উত্তরে বিষ্ণুমূর্তি আছে। লক্ষণীয়, দক্ষিণদিকের ভদ্রে এরসঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে ব্রহ্মামূর্তির সংস্থাপন করা হয়েছে। অনুমান করা যায়, অনুরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করে পশ্চিম ভদ্রে শিব ও উত্তরভদ্রে বিষ্ণুমূর্তি স্থাপিত ছিলো।

খাড়া দেওয়াল ও অন্তর্মুখী ধনুকাকৃতি বক্রতাযুক্ত শিখরকে বিভাজিত করেছে বরন্তিকা (moulded parapet) নামক একটি অংশ। এই অংশটি ভূসমান্তরাল মোল্ডিং দ্বারা গঠিত।

শিখরটি বর্তমানে অর্ধভগ্ন। বিমানের প্রতিটিদিকে ভদ্র অংশটি শিখরশীর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত। শিখরদেহের এই উদগত অংশটি ক্ষুদ্রাকৃতি চৈতগবাক্ষ সমন্বিত জালি কারুকার্য দ্বারা শোভিত। এই অংশটিকে লতা[২] বলা হয়। প্রতি দুটি লতার মধ্যভাগে রয়েছে স্তম্ভকূটের[৩] (ক্ষুদ্রাকৃতি স্তম্ভের ওপর স্থিত ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর) একাধিক লম্বমান সারি। শিখরের সম্মুখে অন্তরালের ওপর শুকনাসায়[৪] (শিখরের সম্মুখে লতা নামক অংশটির ঠিক নীচে একটি বৃহদাকার চৈত্যগবাক্ষ যার মধ্যে থাকে একটি ভাস্কর্যশোভিত গোলাকার পদক) রয়েছে নৃত্যরত নটরাজ ও দুইদিকে দুটি চামরধারিণী। শুকনাসার নীচে রথিকায় (এটি একটি কুলুঙ্গিযুক্ত আয়তাকার প্যানেল) পাশাপাশি পাঁচটি কুলুঙ্গিতে রয়েছে দক্ষিণদিক থেকে যথাক্রমে ব্রহ্মা, চামরধারিণী, শিব, চামরধারিণী ও বিষ্ণু। শিখরের অন্যান্যদিকে লতার ঠিক নীচে ছিলো সূরসেনক।[৫] প্রকৃতিতে এটি শুকনাসার ন্যায় হলেও আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ছোট। বর্তমানে শুধুমাত্র শিখরের দক্ষিণদিকের ভগ্নাংশে সূরসেনকটি চোখে পড়ে। যদিও এর পদকস্থিত ভাস্কর্যটি ভগ্ন।

গর্ভগৃহটির দ্বার পঞ্চশাখ বিশিষ্ট। মধ্যশাখে নিম্নভাগে রয়েছে প্রতিহারমূর্তি ও অন্যান্য শাখায় নিম্নভাগে চামরধারিণী ও ঘটহস্তে পরিচারিকামূর্তি। দ্বারের ওপরে ললাটবিম্বস্থানে (দ্বারের ওপরে সর্দলের মধ্যভাগে ঠিক কেন্দ্রস্থানে) রয়েছে চতুর্হস্ত উপবিষ্ট গণেশমূর্তি। গর্ভগৃহটির পেছনের ও উত্তরদিকের দেওয়াল এবং মেঝে সম্পূর্ণ ভগ্ন। বর্তমানে গর্ভগৃহে কোন অধিষ্ঠিত দেবমূর্তি নেই।

আয়তাকার অন্তরাল অংশটি গর্ভগৃহ ও মুখমন্ডপটিকে সংযুক্ত করেছে। অন্তরালে দুইদিকের দেওয়ালে দুটি কুলঙ্গি আছে। অন্তরালের সর্দল ক্ষুদ্রাকৃতি চতুর্ভূজবিশিষ্ট পদ্মাসনে আসীন শিবমূর্তি দ্বারা সজ্জিত যার ওপরের দুইহাতে রয়েছে ত্রিশূল ও সাপ। সর্দলের ভারবাহক স্তম্ভগুলির ওপরে রয়েছে কীচক-কীচকি যুগ্মমূর্তি, এর ব্যবহার হয়েছে ব্র্যাকেটরূপে।

চতুর্ভূজ মুখমন্ডপটি সম্পূর্ণভাবে দেওয়াল দ্বারা আবৃত নয়। বরঞ্চ অর্ধেকখোলা এই মুখমন্ডপটিতে পর্যাপ্ত আলো ও হাওয়ার সুবিধা রয়েছে। উনের অন্যান্য পরমারকালীন সমশৈলীর প্রতিবেশী মন্দিরগুলির ন্যায় সম্ভবতঃ আলোচ্য মন্দিরটির এই অংশের ওপর সম্বরণ বা bell roof ছিলো, যা বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। মুখমন্ডপের বাইরের দেওয়াল ক্ষুদ্রাকার অর্ধস্তম্ভ, কীর্তিমুখ (একপ্রকার অলঙ্করণ), ডায়মণ্ড (এক প্রকার অলঙ্করণ) দ্বারা সুসজ্জিত।

কোন কোন পণ্ডিতব্যক্তির মতে[৬], এখানে একটি পঞ্চায়তন দেবস্থান ছিলো। আলোচ্য মন্দিরটির পার্শ্ববর্তী চৌবারা ডেরামন্দিরটি ছিলো এই পঞ্চায়তন দেবস্থানের মুখ্যমন্দির এবং তার চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র মন্দির ছিলো। চারটি ক্ষুদ্র মন্দিরের একটি হল আলোচ্য মন্দিরটি। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। পরমার রাজা উদয়াদিত্যের নির্মিত সপ্তায়তন দেবস্থান উদয়পুরের (জেলা বিদিশা) নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মুখ্য মন্দিরটি ও ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি একই চত্বরে একই ভূমিতলে অবস্থিত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে চৌবারা ডেরা ও আলোচ্য মন্দিরটি এক ভূমিতলে অবস্থিত নয়। আলোচ্য মন্দিরটি মেঝে চৌবারা ডেরা অপেক্ষা প্রায় ১০০ সেমি উঁচুতে। তাছাড়া অন্য তিনটি ক্ষুদ্র মন্দিরের কোন চিহ্নই নেই। সুতরাং, আলোচ্য মন্দিরটিকে কোন পঞ্চায়তন মন্দির সমাবেশের অংশ বলা যায় কিনা বা চৌবারা ডেরাকে পঞ্চায়তন দেবস্থান বলা যায় কিনা, তা ভাবনার অবকাশ রাখে।

ICONOGRAPHY

শিব নটরাজ অষ্টভুজ ঃ

অবস্থান	ভঙ্গিমা	আয়ুধ	উল্লেখযোগ্য তথ্য
শুকনাসার অন্তর্গত গোলাকার পদকে।	উর্ধ্বজানু ভঙ্গিতে নৃত্যরত। বামপদ মাটিতে স্থিত, দক্ষিণপদ মাটি থেকে উঁচুতে স্থাপিত।	clockwise উচ্চতম দক্ষিণহস্ত থেকে উচ্চতম বামহস্ত - ১) নৃত্যভঙ্গিমা ৫) ডমরু ২) সর্প ৬) নৃত্যভঙ্গি ৩) খট্টাঙ্গ ৭) ত্রিশূল ৪) ভগ্ন ৮) রুদ্রাক্ষমালা	• বাহন অনুপস্থিত। • নটরাজের পায়ের পাশে রয়েছে মৃদঙ্গবাদক ও একটি অর্ধভগ্ন মূর্তি। • নটরাজের দুইদিকে রয়েছে দুটি দ্বিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা চামরধারিণী। • দেবতামস্তকে জটামুকুট ও অন্যান্য আভূষণে সুসজ্জিত।

শিব চতুর্ভূজ ঃ

অবস্থান	ভঙ্গিমা	আয়ুধ	উল্লেখযোগ্য তথ্য
রথিকায় কেন্দ্রস্থানে	ললিতাসনে	উচ্চ দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল।	• বাহন অনুপস্থিত।

অবস্থান	ভঙ্গিমা	আয়ুধ	উল্লেখযোগ্য তথ্য
কুলুঙ্গিতে।	আসীন।	উচ্চ বামহস্তে সর্প। নিম্ন দক্ষিণহস্তে রুদ্রাক্ষমালা। নিম্ন বামহস্তে ভগ্ন।	● জটামুকুট ও অন্যান্য আভূষণে সুসজ্জিত।

ব্রহ্মা চতুর্ভূজ ঃ

অবস্থান	ভঙ্গিমা	আয়ুধ	উল্লেখযোগ্য তথ্য
দক্ষিণ ভদ্রে কুলুঙ্গি।	সমপদস্থানকে দন্ডায়মান।	উচ্চ দক্ষিণহস্তে সূর্ক। উচ্চ বামহস্তে বেদ। নিম্ন দক্ষিণ হস্তে রুদ্রাক্ষমালা। নিম্ন বামহস্ত ভগ্ন।	● বাহন অনুপস্থিত। ● দুইদিকে অঞ্জলিমুদ্রায় দুটি ভক্ত উপবিষ্ট। ● জটামুকুট ও অন্যান্য আভূষণে সুসজ্জিত।

ব্রহ্মা চতুর্ভূজ :

অবস্থান	ভঙ্গিমা	আয়ুধ	উল্লেখযোগ্য তথ্য
রথিকাব দক্ষিণ দিকের কুলুঙ্গি	ললিতাসনে আসীন।	উচ্চ দক্ষিণহস্তে সূর্ক। উচ্চ বামহস্তে ভগ্ন। নিম্ন দক্ষিণ হস্তে রুদ্রাক্ষমালা। নিম্ন বামহস্ত ভগ্ন।	● বাহন অনুপস্থিত। ● জটামুকুট ও অন্যান্য আভূষণে সুসজ্জিত।

বিষ্ণু চতুর্ভূজ :

অবস্থান	ভঙ্গিমা	আয়ুধ	উল্লেখযোগ্য তথ্য
রথিকার বামদিকেব কুলুঙ্গি	ললিতাসনে আসীন।	উচ্চদক্ষিণহস্তে পদ্ম। উচ্চ বামহস্তে চক্র। নিম্ন দক্ষিণ হস্তে ভগ্ন। নিম্ন বাম হস্ত ভগ্ন।	● বাহন অনুপস্থিত। ● কীরিটমুকুট ও অন্যান্য আভূষণ সুসাজ্জিত।

সিদ্ধান্ত— যদিও মন্দিরটির গর্ভগৃহে কোন মূর্তি নেই, কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এটি শিবমন্দির ছিলো। লক্ষণীয়, মন্দিরের শুকনাসায় শিব-নটরাজ, রথিকায় কেন্দ্রস্থানে শিব ও ক্ষুদ্রাকৃতি চতুর্হস্ত শিবমূর্তি দ্বারা সজ্জিত অন্তরালের সর্দল। গর্ভগৃহের দ্বারশাখে যে চতুর্ভূজ বিশিষ্ট প্রতিহার মূর্তিদুটি রয়েছে, তারা জটামুকুট পরিহিত ও তাদের ওপরের দুইহাতে রয়েছে সর্প ও ত্রিশূল। এই শৈবপ্রতিহারমূর্তিদুটিও ইঙ্গিত দেয় যে এটি শিবমন্দির ছিলো।

মন্দিরটির গঠনবৈশিষ্ট থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, এটি ভূমিজ রীতিতে নির্মিত মন্দির। ভূমিজ রীতি হল মালয়া অঞ্চলের নাগরশৈলীর একটি নিজস্ব ধারা যাতে নাগরশৈলীর মূল বৈশিষ্ট গর্ভগৃহের ওপর ধনুকাকৃতি বক্রতাযুক্ত শিখর ও ক্রুশাকার বিমান[৭] ব্যতীত
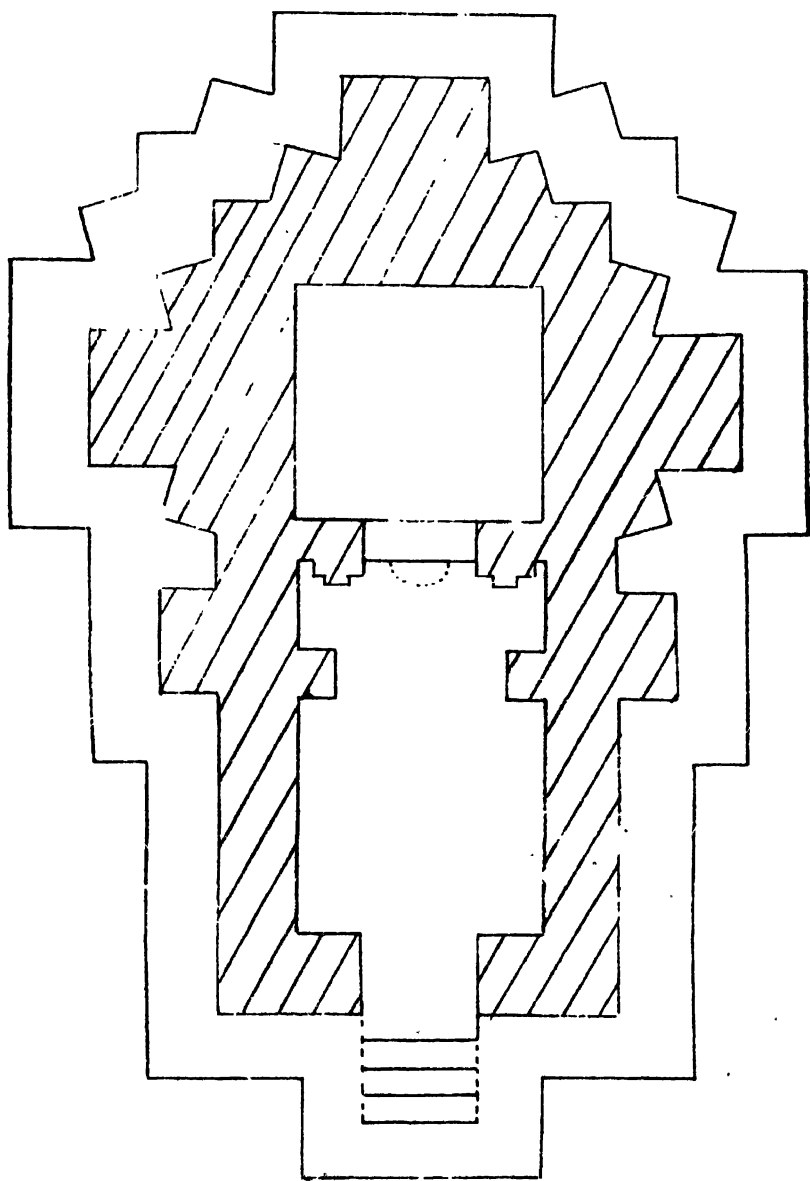
উনগ্রামের নামহীন শৈব মন্দির

নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্টের (যেমন- শিখরের সজ্জায় উলম্বরেখায় স্তম্ভকূটের বিন্যাস, লতা ও শুকনাসা, তারকাকৃতি বহির্নক্সা) সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে মেলবন্ধন ঘটেছে। ভূমিজ রীতি পরমারযুগে পূর্ণবিকাশলাভ করে। উনে নির্মিত হয় একাধিক ভূমিজ রীতির মন্দির। এইযুগেই আলোচ্য মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, উন নামক গ্রামাঞ্চলটি পরমার যুগে শৈবধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিলো।

সূত্র নির্দেশ

1) H.V. Trivedi -- Corpus Inscriptionum Indicarum, Inscriptions of the Paramāras; Vol. VII, pt-2; New Delhi; 1978.
2) Krishna Deva – 'Bhūmija Temples', Studies in Indian Temple Architecture; University of Chicago; 1975; p-90.
3) Ibid. p - 91.
4) Ibid. p - 91.
5) Ibid. p - 91.
6) M. D. Khara – 'Un-An Important Centre of Paramāra Art and Architecture', Art of the Paramāras of Mālwā; Delhi; p - 49.
7) S. K. Saraswati – Chatper XX Art. 1 Architecture', in R.C. Majumdar et. el., ed. *Struggle for Empire*; Bombay; 1979; p - 531.

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী

D. C. Ganguly – History of the Paramāra Dynasty.
L. C. Dhariwal – Indore State Gazetteer; Vol - I; Indore; 1931.
M. A. Dhaky, Meister – Encyclopedia of Indian Temple Architecture.
Indian Archaeology -- A Review, 1984 - 85.
J. N. Banerjee – The Development of Hindu Iconography.

খ্রিষ্ট্রীয় দশম শতাব্দীতে হরিকেল অঞ্চলে জমির দাম

মলয় কুমার দাস

প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের লিপিচিত্র অঙ্কণ করতে গেলে যে সময় কালটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, তা হল ভারত ইতিহাসের আদি মধ্যযুগ। এই পর্বের সময় কাল হল আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।[১] এই সময় কালে অর্থনীতির অবক্ষয়, না কৃষি অর্থনীতির বিস্তার; সামন্ত প্রথার ধারণা, না অন্য কোন ধারণা তাহা নিয়ে গত তিন দশক গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক ও আলোচনা বিশেষ মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। একটি যুগের ভাবধারা ও বৈশিষ্টের ভিন্নতার ভিত্তিতে এই বিভাজনের চেষ্টা হয়েছে। আদি ঐতিহাসিক পর্ব থেকে মধ্যযুগে রূপান্তরের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রাচীন ভারতেব পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে। আদি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট হলঃ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সামন্তপ্রথা অথবা অগ্রহার প্রথা। অপর যে লক্ষণ গুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল, এই সময় সমগ্র ভারত জুড়েই কৃষির সম্প্রসারণ দেখা যায়। বিস্তীর্ণ অনাবাদী এলাকাকে চাষের অধীনে আনার ফলেই কৃষির বিস্তারের পাশাপাশি বহু নতুন জনপদের সৃষ্টি। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আঞ্চলিকতার প্রভাব স্পষ্ট।[২] বিকেন্দ্রীকৃত অবস্থা ব্যবস্থার বিচার করে কেউ কেউ একে 'ভারতীয় সামন্ততন্ত্র'[৩] - এর তত্ত্বগত কাঠামোর ভিত্তিতে আলোচনা করতে উৎসাহী। এই সময়ের কৃষি অর্থনীতিকে প্রকৃত অর্থে সামন্ততন্ত্র বলা যাবে কিনা সে বিস্ময়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য ও বিতর্ক আছে।[৪] একথা ঠিক যে অগ্রহার ব্যবস্থাই অনেকবেশি গ্রহণ যোগ্য। অগ্রহার ব্যবস্থার মূল দিক হল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, বৌদ্ধ বিহার ও জৈন দেবদেবীর মন্দিরের উদ্দেশে নিষ্কার ভূ-সম্পদদান, ভূমির মালিকানার হাত বদল, জমি ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে "অগ্রহার" ব্যবস্থায় সূচনা খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক বা গুপ্ত আমলে এর নিয়মিত প্রকাশ এবং আদি মধ্যযুগ (৬০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)-এ সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। তখন থেকেই এর ব্যাপকতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।[৫] আলোচ্য শতকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচীন বাংলার কৃষি-অর্থনীতিতে 'অগ্রহার' ব্যবস্থার বৈশিষ্টগুলি যথেষ্টই স্পষ্ট। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতেসমগ্র প্রাচীন বাংলা ও হরিকেল অঞ্চলে 'অগ্রহার' -এর বৈশিষ্ট্যও ব্যতিক্রম নয়।

বর্তমান সময়ের মতো প্রাচীন কালে 'বাংলা' নামে কোন ভৌগলিক এলাকা বা

নির্দিষ্টদেশ বা জনপদ ছিল না। সে সময়ে বাংলা পুন্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ, বঙগাল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত ছিল। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কিছু অঞ্চল নিয়ে ছিল গৌড় রাজ্য। আলোচ্য অঞ্চলগুলিতে একসঙ্গে কোন বিশেষ রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির শাসন কায়েম হয়েছিল।[৬] আলোচনায় সুবিধার জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মিলিয়ে সমগ্র ভূ-খন্ডকেই প্রাচীন বাংলা বলে ধরা হয়। আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয় হল 'হরিকেল' জনপদ বা অঞ্চল।

এখনকার বাংলাদেশের মেঘনা নদীর পূর্বদিকের নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সংযুক্ত এলাকা হল প্রাচীন বাংলার অন্যতম ভৌগলিক এলাকা হরিকেল জনপদ বা অঞ্চল।[৭] কেশরের 'কল্পদ্রুকোল', চীনা পরিব্রাজকদের রচনায়, 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প'- গ্রন্থে হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি'-তে, 'রুদ্রাক্ষ মাহাত্য' এবং 'রূপচিন্তা মোণিকোষ' নামক পান্ডুলিপিদ্বয়ে, রাজশেখরের 'কর্পূর মঞ্জুরী' গ্রন্থে, 'ডাকার্ণব' - গ্রন্থে, শ্রীচন্দের রামপাল লিপিতে, কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লেখতে এবং প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদিতে হরিকেল জনপদ বা অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়।[৮] বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে জানা যায় যে সমতটের পূর্বদিকে হরিকেল নামক একটি জনপদ ছিল। এটি আবার হরিকেলি, হরিকেলা, হরিকোল প্রমুখ নামে পরিচিত।[৯] ভারতে আগত চীনা পরিব্রাজক ই-চিঙে র কথা অনুযায়ী বলা যায় যে, হরিকেল পূর্বভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ছিল।[১০] অভিধান চিন্তামণি'তে আবার হরিকেল দেশটিকে বঙ্গের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়েছে।[১১] অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় হরিকেল জনপদকে শ্রীহট্ট বা সিলেট-এর সঙ্গে সনাক্তকরণ করেছেন।[১২] অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও পূরাতত্ত্ববিদ দেবলা মিত্র হরিকেল রাজ্যটি বর্তমান কালের চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং তার সাথে সংযুক্ত কিছু পার্শ্ববর্তী এলাকা চিহ্নিত করেছেন।[১৩] ভৌগলিক দিক দিয়ে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম সংলগ্ন অঞ্চল যথেষ্টই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে। কেননা এ সময় প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্ত তার গুরুত্ব হারায়। অনেকে মনে করেন গুপ্তযুগেই ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অর্থাৎ চট্টগ্রামে নগর বন্দরাদি গড়ে উঠেছিল। চীনা পরিব্রাজক ই-চিঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি সামুদ্রিক পোতে নাগপত্তন ও সিংহল হয়ে জম্বুদ্বীপের (ভারতবর্ষের) পূর্বসীমায় অবস্থিত হরিকেল দেশে উপস্থিত হন।[১৪] আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহার যোগ্য সামুদ্রিক পথে এই সময় চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছিল। সেহেতু দশম ও একাদশ শতাব্দীতে 'হরিকেল' অঞ্চল বলতে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বোঝান।[২৩]

প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসন গুলিতে জমির কেমন দাম ছিল সে সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যায়। লেখমালা থেকে ভূ-সম্পদ দান ও শর্ত ছাড়াও, ক্রয়-বিক্রয়ের রীতি, ভূমি-বিন্যাস বা জমির প্রকার ভেদ, জমির চাহিদা, যোগান ও তার পরিমাপ, জমির

দাম, উপস্বত্ব, কর, উপরিকর, জমি ও ফসলের প্রশ্ন, মালিকানা এবং শাসক শ্রেণীর কার্যকলাপ ইত্যাদি কৃষি-অর্থনীতির বহু অজানা অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য জানা যায়।[১৫] ক্রয় বিক্রয় যোগ্য পণ্য হিসাবে জমির গুরুত্ব যে ক্রমশ বাড়ছিল একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন বাংলার অন্যতম একটি প্রশাসনিক অঞ্চল 'হরিকেল'-এ খ্রিষ্টীর দশম শতাব্দীতে জমির দাম কিপ্রকার ছিল, তাহা আলোচনা করাই হল এই প্রবন্ধটির মূখ্য বিষয়।

বর্তমান বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত ও উৎকীর্ণ ধাতব পাত্রটি (Inscribed metal vase) থেকে জানা যায় যে খ্রিষ্টীয় দশম শতব্দীতে হরিকেল অঞ্চলে বা মন্ডলে জমির দাম টন্ডক-এর (Tandaka) সাহায্যে দেওয়া হত।[১৬] ধাতব পাত্রটির গায়ে বাইসটি পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। এই পাত্রটি উচ্চতায় ৩৮ সেন্টিমিটার।[১৭] এটি আবিষ্কৃত হয়েছে বা পাওয়া গেছে প্রাচীন হরিকেল অঞ্চল বা বর্তমান চট্টগ্রাম থেকে। ধর্মীয় দান হিসাবে সাধারণত পাত্রটি দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। পাত্রের গায়ে লিপি উৎকীর্ণ করে যে বিবরণ দেওয়া আছে তা থেকে ভূমি-দান সম্পর্কিত বিবরণ এবং জমি ক্রয় বিক্রয়ের তথ্য পাওয়া যায়। এটি হল বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের তথ্য ও তত্ত্ব সম্মিলিত দলিল। মোট ৩৩ পাঠক জমি ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে, তা ধাতব পাত্রের গায়ে লেখা বিবরণ থেকে জানা যায়। এর মধ্যে ২৮ পাঠক জমির কিছু পরিমাণ অংশ ৫৮ টন্ডক দিয়ে কেনা হয়েছিল।[১৮] হরিকেল অঞ্চলে জমি কেনা-বেচার টন্ডক-এর ব্যবহার নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এরূপ পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে হরিকেল অঞ্চলে ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য পণ্য হিসাবে জমির গুরুত্ব যথেষ্টই ছিল। কেন না আন্তর্জাতিক বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে চট্টগ্রাম ইতিপূর্বেই সু-পরিচিত।[১৯] খ্রিষ্টীয় নবম শতকের শেষ ও দশম শতকের গোড়া থেকে আবর বিবরণীতে সমন্দর নামক এক অতি সমৃদ্ধ বন্দরের কথা জানা যায়।[২০] এই বন্দর যে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কাছেই অবস্থিত ছিল তা আরব রচয়িতা (৯৮২), ইবন খোরদাদবা ও অল ইদ্রিসির বিবরণেও চট্টগ্রাম বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[২১] বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই অঞ্চল আদি মধ্যযুগের প্রধান বন্দর রূপে পরিচিত। এমনকি কামরূপের পণ্য সামগ্রীও এই বন্দর দিয়ে চলাচল করত।[২২] এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা লাভ যথেষ্ট পরিমাণে করতেন। ইবন বতুতার রচনায় চট্টগ্রাম বন্দর সুদকাওয়ান নামে অভিহিত।[২৩] এই বন্দর প্রাচীন বাংলাকে আদি মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়া ও দঃপূঃ এশিয়ার সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে। স্বাভাবিক ভাবেই হরিকেল অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ নগর বা জনপদ হিসাবে গড়ে ওঠে। বহুলোকের আনাগোনা-র ফলে তাদের জমির প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় বাসস্থান বাণিজ্যকেন্দ্র, ধর্মস্থানের। ফলে জমি কেনা-বেচা চলতে থাকে। অনেক পূর্ণার্জনের জন্য

(সাধারণ মানুষ, ধর্মপ্রাণ মানুষ, শাসক প্রমূখ) জমি বা ভূ-সম্পদ দান বা বিক্রি করতে থাকে। অনেকে জমি কিনে তারপর দান করছেন। ফলে জমির চাহিদা বাড়তে থাকে। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধান থাকলে জমির দামের হেরফের হয়।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বে বাংলায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন গুলি থেকে জমির দাম কেমন ছিল সে সম্পর্কে অনেক তথ্য পাই। দামোদরপুর তাম্রশাসনে (পাঁচটি) উল্লিখিত আছে যে পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত (উত্তরবঙ্গ) জমির দাম 'কূল্যবাপ' প্রতি তিন স্বর্ণদীনার।[২৪] আবার বৈগ্রাম, জগদীশপুর, পাহাড়পুর, নন্দপুর তাম্রশাসন গুলি অন্যকথা বলছে। এদের কথায় পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত জমির দাম হল, ১ কুল্যবাপ = দুই স্বর্ণদীনায়।[২৫] গুপ্ত পরবর্তী বাংলার শাসকগণ অর্থাৎ ধর্মাদিত্য সমাচায় দেব ও গোপচন্দ্রর রাজত্ব কালে বাংলার কিছু অঞ্চলে (বিশেষ করে পূর্ববাংলা) জমির দাম ৪ দীনারে '১' এক কুল্যবাপ ছিল।[২৬] মোটামুটি পঞ্চাশ বছর ধরে এই দাম বিরাজ করেছিল। উক্ত রাজাদের ফরিদপুর, খুখরাহাটি, মল্লসারুল পট্টোলীগুলি (তাম্রশাসন) এই স্বাক্ষ্য দেয়। লেখমালার স্বাক্ষ্য অনুযায়ী সহজেই অনুমান করা যায় যে বিভিন্ন বিষয়ে জমির দাম বিভিন্ন রকমের ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পঞ্চনগরী বিষয়ে কূল্যবাপ প্রতি দুই দীনার, কোটিবর্ষ বিষয়ে তিন দীনারে এক কুল্যবাপ জমির, ফরিদপুর অঞ্চলে চার দীনার।[২৭] জমির চাহিদা বৃদ্ধির ফলেই যে দাম ক্রমশ বাড়ছিল একথা মনে করা যেতে পারে। আবার বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমির উর্বরতা, চাহিদা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি স্থানীয় জীবিকা মান-সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করে জমির দাম।[২৮] সেক্ষেত্রে আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একথা পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যে স্থান এবং কাল বিশেষে জমির মাপ এবং দামের পার্থক্য অপ্রাসঙ্গিক কোন ঘটনা নয়। দশম শতকের শ্রীহট্টে জমি মাপের ক্ষেত্রে এক পাটক দাম দ্রোণের সমান ছিল। কিন্তু ষষ্ঠ শতকে সেখানে একপাটক অন্তত চলিশ দ্রোণের সমান ছিল। ষষ্ঠ থেকে দশম শতকের মধ্যে পাটক ও দ্রোণের অনুপাতের ক্ষেত্রে সংকোচন ঘটে।[২৯] অষ্টম শতক বা তার পরবর্তী যুগে বিশেষ করে পাল ও সেন যুগে জমির দাম কোথায় কেমন ছিল তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাম্রশাসন গুলি এ ব্যাপারে নীরব। তবে কোন তাম্রশাসন বিশেষ করে বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষৎ লেখতে, কোশব সেনের ইদ্দিল পুর শাসনে (পট্টোলী), লক্ষণ সেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে ইত্যাদিতে পরোক্ষ ভাবে কিছুটা জমির দামের ইঙ্গিত দিয়েছে।[৩০] এগুলিতে সমগ্র জমির বা গ্রামের বার্ষিক আয় উল্লিখিত আছে। মনে হয় এর থেকে জমির দামের একটা অস্পষ্ট পরিচয় হয়ত পাওয়া যেতে পারে। জমির বার্ষিক আয় হিসাবে আলোচ্য পট্টোলীগুলিতে দুইশত মুদ্রা (কপর্দক পুরাণ), পাঁচ শত পুরাণ, নয়শত পুরাণ ইত্যাদি বলা আছে।[৩১] পূর্বাঞ্চলের সাগরশায়ী দোণগুলির[৩২] জমির দাম যে ক্রমশ উর্ধমুখী তাহা লেখমালার নিরিখে আলোচনা করলে বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ টন্ডক এর কথা বলা যায়। যেখানে জমি কেনা-বেচার (হরিকেল অঞ্চলে)

নতুন ধরণের বিনিময়ের মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে।[৩৩] তাহা ছাড়া খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জমির দামের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত লিপি উৎকীর্ণ ধাতব পাত্রটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্য পূর্ণ উপাদান।

টঙ্কক শব্দটি প্রধানত এসেছে টঙ্ক্ ধাতু থেকে, অর্থ হল কোন পদার্থকে পিটিয়ে বা পিটানো হয়েছে এমন। টঙ্কক শব্দের তাই প্রসংগত অর্থ করা যেতে পারে এই ভাবে যে সম্ভবতঃ কোন চ্যাপ্টা ধরণের ধাতব মুদ্রা। যার সাহায্যে উক্ত ২৮ পাটকের কিছু অংশ জমি কেনা হয়েছিল। প্রাচীন বাংলার জমি মাপের একক বিশেষ হ'ল 'পাটক'।[৩৪] আদি মধ্যকালীন বাংলার কমপক্ষে এগারোটি তাম্রশাসনে 'পাটক'-এর কথা বলা আছে। পাটকের তুলনায় দ্রোণ ক্ষুদ্রতর একক।[৩৫] কৃষি অর্থনীতির প্রসার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির উপর চাপ বাড়ায় পাটক ও দ্রোণের অনুপাতে হ্রাস ঘটাতে হয়েছিল। তবে উল্লেখিত টঙ্কক মুদ্রার ওজন বা তৌল্যরীতি কত ছিল সে সম্পর্কে স্পষ্টধারণা দেওয়া এই মুহূর্তে কঠিন। কেন না অন্য কোন উপাদান থেকে এর কথা বা পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

উপরের আলোচনা প্রসংগে এইকথা বলা যেতে পারে যে প্রাচীন হরিকেল রাজ্যের (নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশ) কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। দঃপূঃ বাংলাদেশের ময়নামতীতে উৎখননের দ্বারা আদি মধ্যযুগীয় পর্বের এই রৌপ্যমুদ্রাগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।[৩৬] কেউ কেউ এই মুদ্রার সঙ্গে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় মুদ্রার তুলনা করেছেন। প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির সময় কাল হল খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। অবশ্য খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ - ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও হরিকেলের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।[৩৭] এই মুদ্রাগুলিকে হরিকেল মুদ্রা বলা হচ্ছে, এই কারণে যে মুদ্রাগুলির গায়ে হরিকেল, পট্টিকের (পাইটকারা, বাংলাদেশ) প্রভৃতি স্থানের নাম লেখা আছে।[৩৮] সপ্তম ও অষ্টম শতকে প্রাপ্ত হরিকেল মুদ্রাগুলির ওজন হল ৫ গ্রাম - ১.৮ গ্রাম, ১.৮ গ্রাম, ৫-৭.৫ গ্রাম আবার কখনও ৮ গ্রাম। এর ব্যস ২.৬ সেঃ মিঃ থেকে ৩.০৭ সেঃ মিঃ দশম শতাব্দী বা তার পর থেকে মুদ্রাগুলি বড় আকারে হতে থাকে অর্থাৎ এর ব্যস ২৩৪.৮ সেঃ মিঃ থেকে ৫২৫ সেঃ মিঃ। আকারে বড়, পাতলা ও হালকা হত ঠিকই কিন্তু ধাতুগত বিশুদ্ধি অটুট ছিল। ওজন ছিল ২.৩৮০০-৩.৩৬৬০ গ্রাম। এদের একপিঠে নকসা আঁকা হত। হরিকেল মুদ্রার একদিকে উপবিষ্ট বৃষমূর্তি ও বিপরীত দিকে ত্রিশূল জাতীয় বস্তুর প্রতিকৃতি আছে।[৩৯] অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে হরিকেলের রৌপ্যমুদ্রাগুলির ব্যবহার ছিল যথেষ্টই।[৪০] ত্রিপুরা রাজ্যের বেলোনিয়াতেও বেশ কিছু হরিকেল মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে।

হরিকেলে প্রচলিত বেশ কিছু মুদ্রাকে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছাপযুক্ত হিসাবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ কোন ধাতব পদার্থকে পিটিয়ে তার উপর ছাপ দিয়ে মুদ্রা

হিসাবে ব্যবহার করা হত। এখানে ধাতব পদার্থটি হল রৌপ্য বা রূপা। কেননা প্রাপ্ত হরিকেলীয় মুদ্রার অধিকাংশই হল রৌপ্য নির্মিত। এবারে *টঙ্কের* কথায় আসা যাক। বিনিময়ের জন্য যাহা ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক সভ্যতার মূল চাবিকাটি হল মুদ্রা। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে এর অপরিহার্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। তাই বলা যেতে পারে যে *টঙ্ক* ও হল এক প্রকার মুদ্রা। তবে প্রাচীন বাংলার বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে 'দ্রম্ম', 'পুরাণ', 'কার্ষাপণ' এবং 'পুণা-' এদের সাথে *টঙ্ক*-এর কি সম্পর্ক তা বলা খুবই শক্ত। টঙ্ক শব্দটি মূলতঃ টঙ্ ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হোল কোন কিছুকে পিটানো। এদিকে টঙ্ক যে জমি কেনা বেচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রমাণ উক্ত লেখমালায় উপস্থিত। কাজেই টঙ্ক শব্দটির প্রাসঙ্গিক অর্থ এভাবে করা যেতে পারে যে কোন ধাতব পদার্থকে (সম্ভবত রুপো বা রৌপ্য) পিটিয়ে মুদ্রাকারে, তার উপর ছাপ দিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। তাই এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে টঙ্ক হল আসলে ছাপ যুক্ত হরিকেল মুদ্রা অথবা হরিকেল মুদ্রা সম্ভবত খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে টঙ্ক নামে পরিচিত ছিল। তবে একই হরিকেল মুদ্রা কখনও টঙ্ক কখনও হরিকেল হিসাবে পরিচিত ছিল এমন ধারণা করাও কঠিন। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে হরিকেলীয় মুদ্রা ব্যবস্থার এরূপ মনে হয় উত্তর ভারতের দ্রম্ম, কার্ষাপণ, পুরাণ প্রভৃতি মুদ্রার সঙ্গে ওজনের দিক দিয়ে বিনিময় যোগ্য করে তোলায় লক্ষ্যে করা হয়েছিল। এমনকি পশ্চিম এশিয়ার দিরহাম জাতীয় রৌপ্য মুদ্রার ওজনের সাথে হরিকেলীয় রৌপ্যমুদ্রার সমতা দেখা যায়।[৪১]

দীর্ঘক্ষণ ধরে আমরা যে বিষয়টিকে নিয়ে পর্যালোচনা করলাম তার নিরিখে বলা যায় যে অষ্টম শতকের পূর্বে ভূমিদান বা বিক্রয় সংক্রান্ত লেখমালা গুলিতে জমির যে দাম দেওয়া আছে তা দেওয়া হত দীনারে। দীনার যে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা ছিল তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। পাল-সেন যুগে বা অষ্টম শতক বা তারপরবর্তী শতকে জমি দান বা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেখমালা গুলিতে জমির দাম সংক্রান্ত তথ্যের অনুপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। সেদিক থেকে বলা যায় খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রাপ্ত হরিকেলের লেখমালাটি যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করছে জমির দামের ক্ষেত্রে। বাণিজ্যিকে ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে উক্ত শতকের টঙ্ক মুদ্রা বা হরিকেল মুদ্রায় অসাধারণ গুরুত্ব প্রমাণ করে। আদি মধ্যযুগে অগ্রহার ব্যবস্থায় বা সামন্ত ব্যবস্থায় বাংলায় বাণিজ্যের অবক্ষয় বিশেষত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমহ্রাসমানতা এবং নগরের গুরুত্ব হ্রাস ও মুদ্রাবিহীন আবদ্ধ অর্থনীতির এই যুক্তিকে আজ বাতিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। হরিকেল অঞ্চলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাকে এখন আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আরব বিবরণীতে প্রসংশিত সমন্দর বা সুদকাওয়ান বন্দর (চট্টগ্রাম) এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। এই যুগে বাংলায় কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি (পুরাণ, দ্রম্ম, চুর্ণী, কার্যাপণ

প্রভৃতির নাম অবশ্য পাওয়া গেছে) একথাটি ও মানা সম্ভব নয়। কারণ দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে মুদ্রার নিয়মিত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কড়ি ব্যবহারের স্পষ্ট প্রমাণ তো আছেই। হরিকেল মুদ্রা এবং টঙ্ক মুদ্রায় ব্যবহারতো উত্তর ভারতে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যথেষ্টই হত। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে হরিকেল জমির গুরুত্ব ছিল। এখানে লোক বসতি বেড়েছিল। তাই জমি কেনা-বেচা হত। হরিকেল বা টঙ্ক মুদ্রার সঙ্গে সহজেই কড়ি ও পুরাণ জাতীয় রৌপ্য মুদ্রা বিনিময় যোগ্য ছিল। কেন না হরিকেলের রৌপ্য মুদ্রার সাথে কড়ি বা পুরাণ সমতুল ছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে যে আবদ্ধ অর্থনীতির প্রমাণ কখনই পাওয়া যায় না। আগামী দিনে হয়ত টঙ্ক মুদ্রা সম্পর্কে নতুন কোন যুক্তিপূর্ণ, তথ্য সম্বলিত আলোচনা গবেষকরা করবেন এই আশা করা যেতেই পারে।

সূত্র নির্দেশ

১) রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, কলকাতা, বৈশাখ - ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫৪-১৯৪। রামশরণ শর্মা *আদি মধ্যযুগে ভারতে সামাজিক পরিবর্তন*, কলকাতা, এবং *পারস্পেকটিভস ইন দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড ইকনমিক হিস্ট্রি অভ আর্লি ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৮৩। দীনেশ চন্দ্র সরকার, *ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফি*, দিল্লী, ১৯৬৫, এপিগ্রাফিক ডিসকভারী *ইন ইষ্ট পাকিস্তান*, কলকাতা ১৯৭৩, এবং *সিলেক্ট ইনসক্রিপসন* এর দুটি খণ্ড। লেখমালার তথ্য জানার জন্য এগুলি দরকারি উপাদান। জে. এফ. ফ্লীট, করপাস ইনসক্রিপশনাম ইন্ডিকেরাম তৃতীয় খণ্ড, দিল্লী ১৯৮১,

২) রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, কলকাতা, ১৩৯৮, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৯৪ রামশরণ শর্মা, *আর্বাণ ডিকে ইন ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৮৭ প্রণবানন্দ যশ সম্পাদিত, *রিলিজিয়ন এণ্ড সোসাইটি ইন এনশেন্ট ইন্ডিয়া*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃষ্টা ৪০০-৪৫০। প্রণবানন্দ যশ সম্পাদিত, এপিগ্রাফিক রেকর্ডস অন মাইগ্রান্ট ব্রাহ্মণস ইন নর্থ ইন্ডিয়া, *ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিয়্যু* ১৯৭৮-৭৯।

৩) রামশরণ শর্মা, ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম, দিল্লী, ১৯৮০, ঐ, ভারতের সামন্ততন্ত্র (বাংলা অনুবাদ) কলকাতা ১৯৮৫ রামশরণ শর্মা, *আদি মধ্যযুগীয় ভারতে সামাজিক পরিবর্তন*, কলকাতা, ১৯৭৪। ডি.ডি. কোসাম্বী, *ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অভ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী*। ডি. এন. ঝা, (সম্পা), *ফিউডাল সোশ্যাল ফর্মেশনস ইন আর্লি ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৮৭

এন.এস. যাদব, *সোসাইটি অ্যাণ্ড কালচার ইন নর্দাণ ইন্ডিয়া ইন দ্য টুয়েলফথ সেঞ্চুরী*, এলাহাবাদ ১৯৭৩

এন.এস. যাদব, '*দ্য অ্যাকাউন্টস অভ কলি এজ অ্যাণ্ড দ্য সোশ্যাল ট্রানজিশন ফ্রম অ্যান্টিকুইটি টু দ্য মিডল এজেস*, এলাহাবাদ ১৯৭৩।

৪) দীনেশ চন্দ্র সরকার, *ল্যাণ্ডলর্ডিজম অ্যাণ্ড টেনান্সি ইন এনশেন্ট অ্যাণ্ড মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া অ্যাজ রিভিল্‌ড বাই এপিগ্রাফিক্যাল রেকর্ডস*, লক্ষ্মৌ, ১৯৬৯,। হরবন্স মুখিয়া,

ওয়াজ দেয়ার ফিডডালিজম ইন এনসেন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি? *জর্নাল অভ প্রেজেন্ট স্টাডিজ,* ৮,৩, এপিল, ১৯৮১। দীনেশ চন্দ্র সরকার, (সম্পা) *ল্যান্ড সিস্টেম অ্যাণ্ড ফিউডালিজম ইন এনশেন্ট ইণ্ডিয়া,* কলকাতা, ১৯৬৬

ইরফান হাবিব, সেমিনার নং ৩৯; *পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট,* নতুন দিল্লী, ১৯৫৭

৫) রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে,* কলকাতা, ১৩৯৮, পৃষ্ঠা - ১৭৯-১৮৭

অগ্রহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে অবশ্যই লেখমালার সাহায্য নিতে হয়। যার বেশি অংশই হল তাম্রশাস। এ প্রসঙ্গে :-

দীনেশ চন্দ্র সরকার — *ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফি,* দিল্লী, ১৯৬৫,

ঐ — *এপিগ্রাফিক ডিসকভারী ইন ইষ্ট পাকিস্তান,* কলকাতা, ১৯৭৩

ঐ — *সিলেক্ট ইনস্‌ক্রিপসন্‌,* দুই খণ্ড।

ঐ — *শিলালেখ তাম্রশাসনাদিয় প্রসঙ্গ,* কলকাতা, ১৯৮২,

ঐ — *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত,* কলকাতা, ১৯৮৫,

ঐ — *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত,* কলকাতা, ১৯৮২,

জে. এফ. ফ্লীট, *করপাস ইনস্‌ক্রিপশনাম ইন্ডিকেরাম* তৃতীয় খন্ড, দিল্লী, ১৯৮১।

প্রণবানন্দ যশ, *এপিগ্রাফিক রেকর্ডস অন মাইগ্রান্ট ব্রাহ্মণস ইন নর্থ ইন্ডিয়া,* ইন্ডিয়ান *হিস্টারিক্যাল রিভিয়্যু,* ১৯৭৮-৭৯। ননীগোপাল মজুমদার, ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল- ইত্যাদি বইগুলি যথেষ্টই গুরুত্ব পূর্ণ।

৬) রীতা ঘোষ রায়, সমতট হরিকেলের লেখমালায় ভূমির প্রকার ভেদ, প্রবন্ধ, *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ৯, পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৫। রীতা ঘোষ রায়, প্রাচীন বাংলায় পাটকের হিসাব, প্রবন্ধ, ইতিহাস অনুসন্ধান - ৮ পৃষ্ঠা ২০০। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত,* কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা ৩-৬

৭) অমিতাভ ভট্টাচার্য, *হিস্টরিক্যাল জিওগ্রাফি অভ এনশেন্ট অ্যান্ড মিডিভ্যাল বেঙ্গল,* কলকাতা, ১৯৭৭ : পৃষ্ঠা ৪০-৮০। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত,* কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩। রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে,* কলকাতা, ১৩৯৮, পৃষ্ঠা- ২১২। রীতা ঘোষ রায়, সমতট হরিকেলের লেখমালায় ভূমির প্রকারভেদ, প্রবন্ধ, *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ৯, পৃষ্ঠা - ১৫৫.

৮) নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদি পর্ব, কলকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা, ১১২।

৯) দীনেশ চন্দ্র সরকার, *পাল-পূর্বযুগের বংশানুচরিত,* কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা - ৪৮।

দীনেশ চন্দ্র সরকার, *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত,* কলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা - ১০৩।

১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০, ৪৮

১১) পূর্বোক্ত,

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, কলকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা- ১১২।

১২) রাধাগোবিন্দ বসাক, *এপিগ্রাফিক ইন্ডিকা,* xxviii, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা - ৫৪,

১৩) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (B. N. Mukherjee), *বাংলাদেশ ললিত কলা,* ১-২,. ১৯৭৫ পৃষ্ঠা ১১৫-১১৯। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (B. N. Mukherjee), *বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত,* কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা - ২১২। দেবলা মিত্র, *জার্নাল অফ্ এশিয়াটিক সোসাইটি* (JAS), ১৮, ১-৪, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা - ৭৩-৭৪।

১৪) দীনেশ চন্দ্র সরকার, *পাল -পূর্ব যুগের বংশানুচরিত,* কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা - ৪৮, ৬৪, ১২৫, ১২৮, ১৪৬। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, কলকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা-১১২।

১৫) মলয় কুমার দাস, জমির চাহিদা, যোগান ও তার পরিমাপ ঃ প্রাচীন বাংলা, প্রবন্ধ, *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ১৫, কলকাতা। অরুণ কুমার সেন, ভারতীয় অর্থনীতিতে জমির অবদান, কলকাতা। ভূমি বিন্যাস এর জন্য দ্রষ্টব্য নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা - ১৭৩-২০৭।

১৬) দেবলা মিত্র, সম্পাদিত. গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধ, এ প্রিলিমাবী রিপোর্ট অন্ দ্যা ইন্স্ক্রাইবড্ মেটাল ভাস ফ্যম্ দ্যা ন্যাশানাল মিউজিয়াম অফ্ বাংলাদেশ, *এক্সপ্লোরেশন ইন আর্ট অ্যান্ড আরকিউওলজী অফ্ সাউথ এশিয়া,* কলকাতা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ২৩৭-২৪৫।

১৭) পূর্বোক্ত

১৮) পূর্বোক্ত

১৯) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত,* কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ১৪

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কয়েনস্ অ্যাণ্ড কারেন্সী সিসটেম অফ্ পোস্ট গুপ্ত বেঙ্গল, দিল্লী, পৃষ্ঠা - ৩০-৩৪। সাইমন ডিগবী, 'ম্যারিটাইম ট্রেড', তপন রায়চৌধুরী এবং ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), কেম্‌ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রী অভ ইণ্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, কেম্‌ব্রিজ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১১৮-১৬৫। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, ট্রেড অ্যান্ড আর্বান সেন্টার্স ইন আর্লি মিডিভ্যাল নর্থ ইন্ডিয়া, *ইন্ডিয়ান হিস্ট্রোরিক্যাল রিসার্চ,* ১, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা- ২০৩-২১৯। রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে,* কলকাতা, ১৩৯৮, পৃষ্ঠা-২০৯-২১৩।

২০) ঐ ঐ ঐ

২১) পূর্বোক্ত।

২২) পূর্বোক্ত।

২৩) পূর্বোক্ত।

২৪, ২৫, ২৬, ২৭) রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে,* কলকাতা- ১৩৯৮, পৃষ্ঠা-১৫৯-১৬০। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদি পর্ব, কলকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা - ১৯১-১৯৩। দীনেশ চন্দ্র সরকার, *সিলেক্ট ইনস্‌ক্রিপসন।*

২৮) ঐ ঐ ঐ

২৯) রণবীর চক্রবর্তী, প্রবন্ধ, অভিন্ন দেবতা, ভিন্ন মঠ : প্রাচীন শ্রীহট্টের একটি 'ব্রহ্মপুর', *আকাদেমী পত্রিকা,* ৪ঠা মে, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩৮।

৩০) নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, কলকাতা ১৪০২, পৃষ্ঠা - ১৯২-১৯২

৩১) তদেব

৩২) তদেব

৩৩) দেবলা মিত্র (সম্পা), এন. জি. মজুমদার সম্মান সংখ্যা, এক্সপ্লোরেশন ইন আর্ট এ্যান্ড আরকিওলজী অফ্ সাউথ এশিয়া, কলকাতা, ১৯৯৮। গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য-এ প্রিলিমারী রিপোর্ট অন্ দ্যা ইন্সক্রাইবড্ মেটাল ভাস ফ্র্যম্ দ্যা ন্যাশানাল মিউজিয়াম অফ্ বাংলাদেশ, প্রবন্ধ।

৩৪) রীতা ঘোষ রায়, প্রবন্ধ, প্রাচীন বাংলায় পাটকের হিসাব, *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৯৯-২০৫।

৩৫) পূর্বোক্ত।

৩৬) দীনেশ চন্দ্র সরকার, পাল-পূর্বযুগের বংশানুচরিত, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৪৯।

দীনেশ চন্দ্র সরকার, পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত, কলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-১৯৬।

৩৮) বি. এন. মুখার্জী, হরিকেল এ্যন্ড রিলেটেড কয়েনেজ, *জার্নাল অফ্ এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রি*, দশম খণ্ড (X), কলকাতা, ১৯৭৬-৭৭। পি. এল, গুপ্ত এবং এ.কে. ঝা, সম্পাদিত, বেয়ারিংস অফ্ এক্সকাভেসনস্ এ্যাট ময়নামতি (বাংলাদেশ) অন্ দ্যা লোকাল সিলভার কয়েনেজ, নিউসমেট্রিক্স এন্ড অ্যারকিওলজি, নাসিক, ১৯৮৭, রণবীর চক্রবর্ত্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, কলকাতা, ১৩৯৮, পৃষ্ঠা-২১২-২১৩

৩৯) পূর্বোক্ত, বি. এন. মুখার্জী, কয়েনস এ্যান্ড কারেনসী সিষ্টেম অফ্ পোষ্ট গুপ্ত বেঙ্গল, দিল্লী, পৃষ্ঠা-৩২-৪৯।

৪০) পূর্বোক্ত

৪১) পূর্বোক্ত এবং রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'কমার্স অ্যান্ড মানি ইন ওয়েস্টার্ণ অ্যান্ড সেন্ট্রাল সেকটর্স অভ ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া', *ইন্ডিয়ান মুজিয়ম বুলেটিন*, ১৭ কলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্টা-৬৫-৮৩।

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ঃ লেখমালার আলোকে

শম্ভুনাথ কুণ্ডু

বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম সূত্রপাত তথা প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস জানতে হলে প্রাচীন বঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটির দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। প্রায় সব গবেষকই একমত যে, আর্যধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য থেকেও তা সমর্থিত হয়।

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে রচিত শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত একটি কাহিনীতে বৈদিকধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাচ্য দেশাভিমুখী যাত্রা বলেই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। জনৈক বিদেঘ সাথব যজ্ঞের পূতাগ্নি নিয়ে সরস্বতী নদীতীর থেকে যাত্রা শুরু করে সরযু, গন্ডকী ও কুশীনদী অতিক্রম করে সদানীরা নদীর অপর পারে বিদেহ দেশ (সিমথিলা) পর্যন্ত এসেছিলেন।[১] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (আ. খ্রি: পূ: সপ্তম শতক) পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় যাদের দস্যুশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণনা করা হয়েছে— "তে এতেহন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ"। পুণ্ড্রদেশ দস্যু অধ্যুষিত দেশ বলেই বর্ণিত। বেদমন্ত্রে 'দস্যু' শব্দটি বহুব্যবহৃত, যার অর্থ বেদাচারবিরোধী অনার্য। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে 'বঙ্গবগধ' জাতির প্রতি অবজ্ঞা করে পড়েছে— বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের পাদাঃ"।[২] তাদের 'বয়াংসি' বলা হয়েছে যারা পাখীর মতো দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে (আ. খ্রি: পূ: ষষ্ঠ শতক) পুণ্ড্র, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে গমনকারীদের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩] অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদের 'সংকীর্ণ যোনয়ঃ' বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এগুলি থেকে অনুমিত হয় যে, ব্রাহ্মণ-আরণ্যক -উপনিষদ্-সূত্রসাহিত্যের যুগে আর্যসভ্যতা এদেশে প্রবেশ করতে পারেনি।[৪]

বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ অঙ্গুত্তরনিকায়ে (আ: খ্রি: পূ: ষষ্ঠ - পঞ্চম শতক) ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় বঙ্গদেশের উল্লেখ নাই। অবশ্য জৈন ভগবতীসূত্রে (আ: খ্রি: পূ: চতুর্থ শতক) ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় 'বঙ্গ' ও 'লাঢ়' দেশের নাম পাওয়া যায়। জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে (আ: খ্রি: পূ: তৃতীয় শতক) রাঁঢ় জনপদের দুটি বিভাগের নাম পাই — বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমি। মহাবীর বর্ধমানের প্রতি রাঢ়বাসীদের রূঢ় আচরণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দিকে 'লাল' (রাঢ়) জনপদের মানুষেরা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।[৫] অষ্টাধ্যায়ী-

প্রণেতা পাণিনি (আ: খ্রি: পূ: পঞ্চম শতক) ভারতবর্ষের জনপদগুলির তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম অথবা বঙ্গের কোন উল্লেখ নাই।[৬] মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও (খ্রি: পূ: দ্বিতীয় শতক) প্রাচ্যজনপদের মধ্যে অঙ্গ ও বঙ্গদেশকে ভারতবর্ষের সীমাবহির্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] মনুসংহিতাতেই (খ্রি: পূ: দ্বিতীয়-খ্রি: দ্বিতীয় শতক) বঙ্গদেশের আর্যাভুক্তির স্পষ্ট উল্লেখ পাই।[৮]

গুপ্তশাসনকালেই বঙ্গদেশে আর্যিকরণ সম্পূর্ণতালাভ করেছিল বলেই অধিকাংশ গবেষক মনে করেন। তবে তার সূত্রপাত যে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল তা ধারণা করা অসঙ্গত হবে না। কারণ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে পূর্বভারতে যে বেদবিরোধী ধর্মান্দোলন শুরু হয়েছিল স্থানিকনৈকট্যহেতু, জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধ- এই ধর্মগুলি যে কোন না কোনভাবে বঙ্গদেশে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল— আচারাঙ্গসূত্র তারই সাক্ষ্য বহন করে।

বঙ্গদেশের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিনিধিদের তাচ্ছিল্য ও উন্নাসিকতা থাকায় এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রচারের তেমন কোন উদ্যোগ চোখে না পড়লেও জৈন, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। তাঁরাই আর্যভাষা, আর্যধর্ম ও আর্যসংস্কৃতির মূল উপাদানগুলি বহন করে এনেছিলেন। আর্যকরণের প্রথম ঊষালগ্নে এই দুই ধর্মকে অবলম্বন করেই আর্যভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম এদেশে দৃঢ়মূল হয়েছিল। এ-ব্যাপারে সম্ভবতঃ জৈনধর্মপ্রচারকেরা পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আচারাঙ্গসূত্রে মহাবীরের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা তার সাক্ষ্য দেয়। জৈন কল্পসূত্রে (খ্রি: পূ: প্রথম শতক) তামলিত্তিয়া, কোডিবর্ষীয়া, পোংডবর্ধনীয়া এবং খব্বডিয়া নামে জৈন গোদাসগনীয় ভিক্ষুদের চারটি শাখার পরিচয় পাই।[৯]

সংযুক্তনিকায়ে উল্লেখ আছে বুদ্ধদেব একবার সুহ্মভূমির অন্তর্গত 'শেতক' নগরে ধর্মপ্রচারার্থে বাস করেছিলেন। একাদশশতকে রচিত ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা থেকে জানা যায়, অনাথপিন্ডদসুতা সুমাগধার আকুল আহবানে বুদ্ধদেব স্বয়ং পুন্ড্রবর্ধনে এসে ছয়মাস অতিবাহিত করেন।[১০] ঐতিহাসিকেরা এই ঘটনাকে সত্য বলে মনে করেন না। তবে মৌর্যসম্রাট অশোক যে এদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন তা জানা যায়। 'দিব্যাবদন' ও হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে। দিব্যাবদানে বলা হয়েছে যে পুন্ড্রবর্ধনের নির্গ্রন্থদের (জৈনদের) অপরাধে পাটলীপুত্রের আঠারো হাজার আজীবিকদের হত্যা করেছিলেন।[১১] কিংবদন্তির অতিশয়োক্তিটুকু বাদ দিলেও আজীবিক ধর্মাবলম্বীরা যে বঙ্গ দেশে বৌদ্ধ জৈনদের পূর্বেই এসেছিলেন তা জানা যায়। মহাবীরও এদেশে দীর্ঘবংশদন্ডধারী অসংখ্য আজীবিক ভিক্ষুর দর্শন পেয়েছিলেন। 'মিলিন্দ পঞহো', 'ললিতবিস্তর' প্রভৃতি গ্রন্থেও আজীবিক নামটি অপরিচিত ছিল না।

প্রাচীন বঙ্গদেশের প্রেক্ষাপটটির আভাস এইভাবে সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতে জানতে পারি যার মধ্যে কিছু অনুমান, কল্পনা কিছুবা কিংবদন্তিও মিশে আছে।

আর্যধর্মের বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের এদেশে আগমনের পাথুরে প্রমাণ মেলে পুণ্ড্রবর্ধনের মহাস্থানগড়ে আবিস্কৃত খণ্ডিত শিলালেখটি থেকে।[১২] উত্তরবঙ্গের বগুড়ায় অবস্থিত এই মহাস্থানগড় যার প্রাচীন নাম ছিল পুডনগল বা পুন্ড্রনগর (বর্তমান বাংলাদেশ)। খন্ডিত এই শিলালেখটি অশোকের অনুশাসনের লিপিছাঁদে প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ। আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকের বলেই লিপিবিশারদদের ধারণা। শিলালেখটি ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই শিলালেখে থেরবাদী ভিক্ষুদের উল্লেখ আছে— 'সংবগিয়ানং' যার সংস্কৃতরূপ 'ষড়্বর্গিকানাম্' বলেই ডঃ বড়ুয়া মনে করেন— 'Of persons of Sadvargika Sect of the Buddhists '।[১৩] আত্যয়িককালে অর্থাৎ কোন দুর্যোগের সময় শস্যাগার থেকে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুদের ধান্য, গন্ডক, মুদ্রাদি দানের আদেশ এখানে নথিবদ্ধ আছে। অশোকোত্তরযুগে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণরূপে এই লেখটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুণ্ড্রবর্ধনের যে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছিল তারও দু'একটি শিলালিপিগত সাক্ষ্য মেলে। সাঁচী স্তূপের প্রতোলী বা তোরণ নির্মাণের ব্যয়ভার বহনকারীদের অন্যতম ছিলেন ধমতা (ধর্মদত্তা) নাম্মী এক বুদ্বোপাসিকা— 'ধর্মতায় দানং পুঞবদনিয়ায়' (পুণ্ড্রবর্ধনের ধমতা বা ধর্মদত্তার দান)।[১৪] প্রসিদ্ধ লিপিবিশারদ পন্ডিত ব্যূহ্লারের মতে এই শিলালিপির সময় খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকের শেষভাগে কিংবা খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ। সাঁচীস্তূপের আর একটি তোরণের ব্যয়ভার যাঁরা বহন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনেরই 'ইসিনদন' (ঋষিনন্দন)।[১৫] খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ নাগার্জুনীকোন্ডার একটি শিলালেখে উল্লেখ আছে যে স্থবিরবাদী ভিক্ষুসঙ্ঘের অন্যতম কেন্দ্র ছিল বঙ্গ।[১৬]

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজ বৈন্যগুপ্তের একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায় ত্রিপুরা জেলার গুনাইঘর গ্রামে।[১৭] দ্বাদশশাদিত্য বিরুদধারী মহারাজ বৈন্যগুপ্ত 'মহাদেবপাদানুধ্যাতঃ' বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মগধের গুপ্তসম্রাটদের বংশধর ছিলেন।[১৮] তিনি তাঁরই এক সামন্তরাজা মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে ভূমিদান করেছিলেন তিনটি উদ্দেশে। এক, মহাযানপন্থী ভিক্ষু শান্তিদেবের জন্য রুদ্রদত্ত 'আর্য অবলোকিতেশ্বর' নামে যে 'আশ্রমবিহার' নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তার সংরক্ষণের জন্য; দুই, শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত 'বৈবর্তিক' নামে মহাযানী ভিক্ষুসংঘ ঐ বিহারে যে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার দৈনন্দিন বারত্রয় গন্ধ, পুষ্প ধূপাদিসহ পূজার জন্য এবং তিন, ঐ বিহারবাসী ভিক্ষুসংঘের অশন, বসন, শয্যা ও ভেষজের ব্যয়নির্বাহের জন্য।

শুধু তাই নয়, এই তাম্রশাসনে নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত 'রাজবিহার' নামে

অপর একটি বৌদ্ধবিহারের উল্লেখ আছে যা রুদ্রদত্ত-প্রতিষ্ঠিত 'আশ্রম-বিহার' প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে রাজবিহার যে কোন রাজার প্রতিষ্ঠিত বিহার এবিষয়ের সংশয় না থাকলেও সেই 'রাজা' যে কে ছিলেন তা জানা যায় না।

গুপ্তসম্রাটগণ ছিলেন পরমভাগবত বা পরমবৈষ্ণব কিন্তু শৈবধর্মাবলম্বী বৈন্যগুপ্ত ভূমিদান করেছেন বৌদ্ধবিহারের জন্য। পরমতসহিষ্ণুতার এমন উদাহরণ আমরা অনেক পেয়েছি। তবে পঞ্চমশতাব্দীর শেষভাগেস কিংবা ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমপাদেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে কুমিল্লা অঞ্চলে মহাযানপথ যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা গুণাইঘর তাম্রশাসন থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

বঙ্গদেশে গুপ্তাধিকার ষষ্ঠশতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তারপর আর্যাবর্তে হর্ষবর্ধন যখন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে আবির্ভূত তখন বঙ্গদেশে তাঁরই প্রবলপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়াধিপ শশাঙ্কের রাজত্ব। কবি বাণভট্ট, হিউয়েন সাঙ্ শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষীরূপে চিহ্নিত করতে সদাতৎপর হলেও শশাঙ্ক যে আদৌ তা ছিলেন না হিউয়েন বিবরণী তারই প্রমাণ দেয়। সম্ভবতঃ তিনি ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙলার এসে পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তিতে সত্তরটিরও বেশি সংঘারাম দেখেছিলেন। সেগুলিতে বসবাসকারী স্থবিরবাদী, সম্মিতীয় আটহাজার ভিক্ষুর উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে তিনভাগ হীনযানী ও একভাগ মহাযানী ছিলেন। তিনি কর্ণসুবর্ণে তিনটি সংঘারামে দেবদত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্রোহী বৌদ্ধভিক্ষু দেখেছিলেন। এই চৈনিক পণ্ডিত শশাঙ্কের যা ক্ষতি-করেছিলেন মিথ্যা কলংক লেপন করে, হর্ষবর্ধন বা ভাস্করবর্মাও তা পারেননি।[১৯] নালন্দার অধ্যক্ষ মহাস্থবির শীলভদ্র তো বঙ্গদেশীয় কোন এক রাজবংশের সন্তান ছিলেন। প্রখ্যাত বৌদ্ধ বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসী।

পরমবৈষ্ণব শ্রীধারণরাতের কৈলান তাম্রশাসনে (আ. ৬৬৫-৭৫ খ্রি:) দেখি মহাসন্ধিবিগ্রহাধিক (সমরবিভাগের মন্ত্রী) জয়নাথ রাজার কাছে একই সঙ্গে ১৩ জন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণকেচ এবং বৌদ্ধমঠের উদ্দেশে পঁচিশ পাটক ভূমিদানের প্রার্থনা জানিয়েছেন।[২০] এটিও সমতট (বর্তমান কুমিল্লা) অঞ্চলে প্রাপ্ত। লিপিবিদ্যার নিরিখে এটি কিঞ্চিৎ শশাঙ্ক-পরবর্তী।[২১] জয়নাথ স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু ধর্মবিষয়ে তাঁর এই উদারতা লক্ষণীয়।

শ্রীধারণরাতের পরবর্তী খড়্গবংশীয় রাজারাও ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন। ঢাকার নিকটবর্তী আসরফপুরে প্রাপ্ত দুটি তাম্রশাসনে বৃষভাঙ্কিত মুদ্রা দেখে গবেষকরা মনে করেন তাঁরা প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। খড়্গবংশীয় রাজা তৃতীয় দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজ বা রাজরাজভট্টের বৌদ্ধধর্মের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তির পরিচয় আমরা পাই (সঙচি নামক চৈনিক শ্রমণের বিবরণ থেকে। এই রাজভট্ট প্রতিদিন

বুদ্ধের একলক্ষ মৃণ্ময় মূর্তি গড়িয়ে পূজা করতেন এবং প্রত্যহ 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে'র একলক্ষ শ্লোক পাঠ করতেন। তিনি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি সামনে নিয়ে শোভাযাত্রায় বের হতেন এবং প্রচুর দানধ্যাণ করতেন।[২২] উল্লেখ্য যে, এই দেবখড়্গের স্ত্রী, রাজরাজভট্টের মাতা প্রভাবতী দেবীর অষ্টধাতুনির্মিত শর্বাণীমূর্তির পাদপীঠের লেখ থেকে এই বংশসম্বন্ধে জানা যায়।[২৩]

মাত্র ত্রিশবছর পূর্বে হিউয়েন সাঙ্ যে সমতটে দু হাজার স্থবিরবাদী শ্রমণ দেখেছিলেন সেখানে সেঙ্‌চি মহাযানী প্রভাবপুষ্ট চারহাজার ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীর সন্ধান পান। তাঁরা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সেটা বড় কথা নয়, সেঙ্‌চির সময় বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে যথেষ্ট প্রবলতর হয়েছিল।[২৪]

ইৎ-সিং জানিয়েছেন যে শ্রীগুপ্ত নামে এক মহারাজ উত্তরবঙ্গের মৃগস্থাপন স্তূপের কাছে 'চীনমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলে ফা-হিয়েনের শতবর্ষ পূর্বেও চৈনিক ভিক্ষুরা এখানে এসে বৌদ্ধধর্ম চর্চা করতেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটি একটি মূল্যবান তথ্য। সমতটের দেববংশীয় রাজাদের মধ্যে আনন্দদেব বঙ্গালমৃগাঙ্ক (আ. ৭৫০-৭৫ খ্রি:), ভবদেব অভিনবমৃগাঙ্কের তাম্রশাসন এবং আরও তিনটি তাম্রশাসন শালবনবিহার খননকার্যের ফলে পাওয়া গেছে যেগুলির পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত হয়নি। অনুমিত হয়, এই দেববংশটিও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল।[২৫]

শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসে নয় ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে পাল রাজাদের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল (আ. ৭৫০-১১৪০ খ্রি:) গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাল নরপতিরা প্রায় সকলেই প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ছিলেন — তাঁরা ছিলেন মহাযান মতাবলম্বী। শুধু ভারতবর্ষে নয় বহির্ভারতেও তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় দেখা যায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে। ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, সোমপুরী, জগদ্দল মহাবিহার এই আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'গৌড়ীদ্বীপগুরু' কুমারঘোষ, বীরদেব, রত্নাকার শান্তি, অদ্বয়বজ্র, অতীশ দীপঙ্কর, অভয়াকরগুপ্ত প্রমুখ দিক্‌পাল বৌদ্ধচার্যগণের আবির্ভাব এই সময়কে বিশিষ্টতা দান করেছিল। অজস্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, অসংখ্যা বৌদ্ধমূর্তিও তারই সাক্ষ্য বহন করে।

পালরাজাদের শাসনগুলিতেও বৌদ্ধধর্মবিজ্ঞাপক ধর্মচক্রমুদ্রা এবং ধর্মচক্রের উভয়পার্শ্বে দুটি মৃগমূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি তাম্রশাসনই শুরু হয়েছে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে বন্দনাশ্লোক দিয়েই আর দানকার্য সমাধা হয়েছে 'বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য'। নিজেদের তাঁরা পরমসৌগত বলে পরিচয় দিতে শ্লাঘা অনুভব করেছেন— দু'একটি ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত আছে।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলীন হয়ে যাছিল তখন এই পূর্ব ভারতে পালরাজাদের আনুকূল্যে এই বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মের মর্যাদালাভ করে আরও প্রায় চারশো বছরের পরমায়ু লাভ করে।

প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ধর্মপাল থেকে শুরু করে মদনপালের মন্‌হলি তাম্রশাসন পর্যন্ত বৌদ্ধ পালরাজাদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে যদিও নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে (ভগবন্তং শিবভট্টারকমুদ্দিশ্য)[২৬], তৎপুত্র রাজ্যপালের ভাতুরিয়া তাম্রশাসনে (শম্ভুর স্তুতিগান দিয়ে শুরু),[২৭] নয়পালের আমলে উৎকীর্ণ মূর্তিশিবের বাণগড় শিলালেখে, নয়পাল বা তৎপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের সিয়ান শিলালেখে (নমো ভগবতে বাসুদেবায়), তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালীন নিমদীঘি তাম্রশাসনে (শম্ভুবন্দনা) পালরাজাদের পৌরাণিক শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। এই আনুগত্যের অনেক সঙ্গত কারণ আছে, আলোচ্য প্রবন্ধে যার বিশ্লেষণের সুযোগ নাই। অন্য একটি প্রবন্ধে তা আলোচিত হয়েছে।[২৮]

সমকালীন কম্বোজান্বয় নরপতি নয়পালের ইদা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে রাজ্যপাল (পিতা) পরম সৌগত হলেও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণপাল ছিলেন বাসুদেবভক্ত এবং অপরপুত্র নয়পাল ছিলেন পরমশৈব[২৯] কান্তিদেবের (আ. ৮০০-৮২৫ খ্রি:) চট্টগ্রাম তাম্রশাসন আমাদের অবহিত করে যে পিতা ধনদত্ত বৌদ্ধ হলেও মা বিন্দুরতি ছিলেন শিবের উপাসিকা— 'শিবপ্রিয়া'। তাঁর রাজকীয় সীলটি অভিনবত্ব দাবি করে যাতে বৌদ্ধ ও শৈবধর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন তিনি।[৩০]

দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজারাও পরমসৌগত ছিলেন। এইবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি শ্রীচন্দ্রের শাসনগুলি বুদ্ধের উদ্দেশে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই শুরু হয়েছে। তিনি ব্রহ্মা, অগ্নি, যোগেশ্বর, জৈমিনী ও মহাকালের মঠ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এবং বিশাল ভূখণ্ড দান করেছিলেন ছয় হাজার বৈদিক ব্রাহ্মণদের বসতিবিস্তারের জন্য। শ্রীচন্দ্রের পৌত্র লড়হচন্দ্র অবশ্য বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে লড়হমাধব ভট্টারকের নামে ভূমিদান করেছেন— এই সংবাদ আমরা ময়নামতী তাম্রশাসনে পাই। তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী শাসনে দেখি যে তিনি শিবভট্টারকমুদ্দিশ্য নর্তেশ্বর ভট্টারকের (নৃত্যরত শিব) উদ্দেশে ভূমিদান করেছেন।[৩১] এই ধর্মীয় আদানপ্রদানের তথা সমন্বয়ের চিত্রটি ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত একাদশ শতকের একটি কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ আছে যেখানে বুদ্ধ ও বাসুদেবকে একই সঙ্গে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে।

বর্মণ রাজবংশ ছিল পরমনৈষ্টিক ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত। তাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করতেন তা রাজা হরিবর্মদেবের মহাসন্ধিবিগ্রহিক স্মার্তপণ্ডিত ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিটিই প্রমাণ। 'বালবলভিভুজঙ্গ' ভবদেব দাবি করেছেন যে তিনি অগস্ত্যের মত বৌদ্ধধর্মরূপ সমুদ্র শোষণ করেছিলেন এবং পাষণ্ডী বৈতণ্ডিকদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন— "বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভবঃ মুনিঃ পাষণ্ডবৈতণ্ডিক প্রজ্ঞা -খন্ডন-পন্ডিতোহ য়মবনৌ সর্বজ্ঞো লীলায়তে"[৩২] সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৌদ্ধধর্ম প্রচন্ড বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিল এই আমলে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন

হরিবর্মার ভ্রাতা সামলবর্মা। তাঁর বজ্রযোগিনী তাম্রশাসনের ভগ্নাংশ থেকে জানা যায়, বাসুদেবভক্ত হয়েও তিনি ভীমদেব প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদেবী প্রজ্ঞাপারমিতামূর্তির সেবা ও পূজার জন্য ভূমিদান করেন।[৩৩]

বর্মণদের মতো সেনারাজারাও ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। তাঁদের দেড়শো বছরের শাসনে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকে। বল্লালসেন তো তাঁর দানসাগর গ্রন্থে দাবি করেছেন যে নাস্তিক বৌদ্ধদের পদোচ্ছেদের জন্যই প্রত্যক্ষ নারায়ণরূপী তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। এমনকি, পাষণ্ডদের দ্বারা প্রক্ষিপ্তদোষ দুষ্ট বিষ্ণুপুরাণ ও শিবপুরাণকে দানসাগরে পরিত্যাগ করেছিলেন।[৩৪]

লক্ষ্মণসেনের মতো পরমবৈষ্ণব রাজাও যে পরোক্ষ ভাবে বৌদ্ধবিদ্বেষ থেকে মুক্ত ছিলেন না তা তাঁর তর্পণদীঘি তাম্রশাসন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। শাসনে প্রদত্ত ভূমির পূর্বপ্রান্তের সীমায় অবস্থিত বৌদ্ধবিহারের ভূমি যাতে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ হয়ে যায় তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে।[৩৫]

সেন আমলের পরও বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম একেবারে বি লুপ্ত হয়নি। ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে পট্টিকেরার মহারাজ রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের ময়নামতী শাসনে দৃষ্ট হয় যে তাঁর সহজপন্থী প্রধানমন্ত্রী শ্রী ধবিএব দুর্গোত্তিরার একটি মন্দির নির্মাণ করান।[৩৬] এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকলো। ধর্মপাল দেবপালদের শাসনে যে বৌদ্ধধর্মের দীপ্তি বহির্বিশ্বকে আলোকিত করেছিল তা নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পৌরাণিক ধর্মের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বকে সংকুচিত করেছিল।

পালযুগেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রাধান্য পেয়েছিল এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সঙ্গে মহাযানী তান্ত্রিকতা মিলে মিশে নিজস্বতা হারিয়ে পৌরাণিক ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়লো। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের দশাবতারস্তোত্রে তারই ইঙ্গিত দ্যোতিত হোল বুদ্ধকে নবম অবতাররূপে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেই। এই অন্তর্ভুক্তি প্রবল পৌরাণিক ধর্মের স্রোতে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিলীনতার স্মৃতির বহন করে।[৩৭]

সূত্র নির্দেশ

১) Datta Roy, RB, Vedicism in Aucient Bengal, Calcutta, ১৯৭৪, p. ৮ History of Bengal, Vol. I, pp. 293, ff; শতপথব্রাহ্মণ, ১।৪।১।১৪

২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।১৮

৩) বৌধায়ন ধর্মসূত্র, ১।১।৩০; Mukherjee R.K., Hidnu Civilization, vol. I, London 1936. p. 128.

৪) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমাব, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃ. ৩৫

৫) আচারঙ্গ সূত্র, ১।৮।৩; বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃ. ৪০

৬) অষ্টাধ্যায়ী, ৪।১।১৬৮

৭) Puri, B. N, India in the Time of Patanjali, Bombay, 1957, pp. 69, 82-83; মহাভাষ্য, ৬।১।২

৮) আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োবেরান্তরং গির্যোরার্যবর্তং বিদুর্বুধাঃ — মনুসংহিতা, ২।২২

৯) রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ১৪০০ সাল, পৃ. ৪৯৩

১০) দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ, বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, কলি. ১৩৫৫, পৃ. ৩২-৩৩

১১) তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭

১২) Epigraphia Indica (E.I.), Vol. XXI, p. 83

১৩) Mukherjee. R. R. & Maity, S. K., Corpus of Bengal Inscriptions, Cal, 1967 p. 40

১৪) E. I. Vol. II, p. 108, No. 102.

১৫) Ibid, p. 380, No. 217

১৬) Ibid, Vol. XX, p. 22

১৭) Sircar, D. C. Select Inscriptions, Vol. I pp. 340 ff.

১৮) I. H. Q. Vol. VI, p. 572.

১৯) বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, পৃ ৫২

২০) "ভগবতস্তথাগতো রত্নস্য গন্ধধূপদীপমাল্যানুলেপনার্থন্তদুপদিষ্টমার্গস্য ধর্মস্য লেখনবাচনার্থমার্যসংঘস্য চ চীবর পিণ্ডপাতাদিবিবিধোপচারার্থমধিগতবিদ্যানামপি ব্রাহ্মণার্যানাং পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্তনার্থং..... — ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৩শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৪১-৫৩

২১) সরকার, দীনেশচন্দ্র, শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলি, ১৯৮২ পৃ. ৬৬

২২) বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, পৃ. ৬৫-৬৬

২৩) কুণ্ডু, শম্ভুনাথ, 'দেউলবাড়ি প্রতিমালেখের দেবী শবণী,' ইতিহাস অনুসন্ধান-১০, পৃ. ২০১-২০৫

২৪) বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, পৃ ৬৭

২৫) সরকার, দীনেশচন্দ্র, পালসেনযুগের বংশানুচরিত, কলি, ১৯৮২, পৃ. ১০১-১০৩

২৬) মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার, গৌড়লেখমালা, রাজসাহী, ১৩১৯, পৃ. ৫৫-৬২

২৭) E. I. Vol. XXII, p. 150 ff.

২৮) কুণ্ডু, শম্ভুনাথ, 'পাললেখে পৌরাণিক দেবভাবনার প্রকৃতি' ইতিহাস অনুসন্ধান-৮, পৃ. ২৩৬-২৪৪

২৯) E. I. Vol. XXXIII, p. 150 ff.

৩০) Kundu, Sambhunath, 'A Unique Seal of the Early Medieval Bengal', Journal of the Numismatic Society of India, Vol. LI, 1989, Part I&II, pp. 64-65.

৩১) -Do-, Religions Policy of the Candra Kings, Proceedings of the 2nd State Sanskrit Conference, 1999, B.U., P. 162 ff.

৩২) Corpus of Bengal Inscriptions, p. 352

৩৩) E. I. Vol. XXX, p. 259 ff.

৩৪) ধর্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ।
শ্রীকান্তোহপি সরস্বতী পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ।।

— Danasagara of Vallalsena. ed. by B. Chatterjee, Cal. 1955, p. 720.

৩৫) 'বুদ্ধবিহারী দেবতা নিকর - দেয়াস্মণভূম্যটাবাপ পূর্বালিঃ সীমা' — Corpus of Bengal Inscription, p. 293

৩৬) Bhattacharya, D. C., I. H. Q. Vol. IX, pp. 282 ff.

৩৭) কুণ্ডু শম্ভুনাথ, প্রাচীনবঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃঃ ৪২৩-৪২৪

বাঙালির দুর্গা কখন মহিষমর্দিনী হলেন

সরিতা ক্ষেত্রী

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ বাংলায় (বর্তমান পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশ) বার্ষিক শারদীয় দুর্গাপূজা বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট উৎসব। এই উৎসবে মাতৃদেবী দুর্গা তাঁর পরিবার সহ সিংহবাহিনী ও অসুরঘাতিনী রূপে পূজিত হন। বাঙালির কল্পনায় প্রতিমায়িত দুর্গার রূপটি হল— দেবী দুর্গা তাঁর পরিবারবর্গের অর্থাৎ সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিকেয় সহ বাহন সিংহের উপর স্থাপিত এবং মহিষাকৃতি অসুরকে মর্দনরত। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে প্রাচীন যুগ থেকে দৈবী রূপমণ্ডিত দুর্গার যে সমস্ত প্রত্ন-উপাদান আমরা পেয়েছি সেখানে পরিবারকর্ত্রী মাতৃদেবী দুর্গার সঙ্গে মহিষমর্দিনী রূপের কোন সম্পর্কের প্রমাণ পাই না। প্রাচীণ যুগ থেকে আদি-মধ্য-যুগ হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেবী দুর্গার দৈবী রূপের যে ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার দুটি নির্দিষ্ট কাল পর্বে দুটি ভিন্ন দৈবী রূপের প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। ভিন্ন দুই কালের ভিন্ন এই দুই রূপের মধ্যে সংযোগ সাধনের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ যদি আমরা পাই না সেজন্যই বিগত ইতিহাস চর্চা কালে এই দুই রূপ-সম্মিলনের সময় নিরূপণ করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই পরিবারকর্ত্রী দুর্গার মহিষমর্দিনী তে রূপান্তরের ধারা অন্বেষণ করা ও এর কাল পর্বের উপর আলোকপাত করারই প্রয়াস পেয়েছি।

ইতিহাসের কোন যুগে ভারতীয়দের দেব-দেবী কল্পনায় দুর্গার পূর্ণ পরিবার গড়ে উঠে ছিল তার নির্দিষ্ট তারিখ আজও নির্ণয় করা যায় নি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষতঃ পুরাণগুলি[১] তে দুর্গার সন্তান রূপে গণেশ ও কার্তিকেয়র উল্লেখ থাকলেও দুই কন্যার সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাই না। কিন্তু সাহিত্যিক উপাদানে না থাকলেও নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত কিছু ভাস্কর্যে দুর্গা পরিবারের মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্পষ্ট রূপে চিহ্নিত। এ বিষয়ে মণ্ডাইলে[২] প্রাপ্ত একটি মূর্তি বিশেষ উপস্থাপিত। এই মূর্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দেবীর দুই পুত্র গণেশ ও কার্তিকের অবস্থান। অনুরূপ বৈশিষ্ট্য যুক্ত আরো দুটি ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, যথাক্রমে দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে[৩] এবং বিহার থেকে বর্তমান যা ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত।[৪] এ বিষয়ে তথ্যবাহী চতুর্থ মূর্তিটি পাওয়া গেছে বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা থেকে। মূর্তিটি গোধিকা সহ গৌরীর। এই

মূর্তির দু পাশে কয়েকটি নারী মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে বাঁ দিকে উপবিষ্টা নারীকে লক্ষ্মীর প্রতিরূপ বলে সনাক্ত করা যেতে পারে।[৫]

আলোচ্য বিষয়ে অধিকতর স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় আবিষ্কৃত দ্বাদশ শতকের একটি ভাস্কর্যে।[৬] বর্তমানে এটি রাজশাহী বরেন্দ্র-রিসার্চ-ম্যুজিয়ামে সংরক্ষিত। সম্প্রতি অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মূর্তিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্যণ করেছেন। এই মূর্তিটি হচ্ছে 'ললিতারূপী' দুর্গা বা উমার। তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবারে সকলেই উপস্থাপিত। এর সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে গৌরী বা উমার (দুর্গার) সংসার গঠন দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে[৭] বরেন্দ্রীতে উমার পূজার উপলক্ষ্যে উৎসবের ইঙ্গিত আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পাঁচটি ভাস্কর্যেই কিন্তু দেবীর মহিষমর্দিনী রূপটি অনুপস্থিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে তাহলে দুর্গার মহিষমদির্নীর রূপের ধারণা কত প্রাচীন। দেবীর মহিষমর্দিনী রূপটি প্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিল। দেবী মহিষমর্দিনীর প্রাচীনতম যে মূর্তিটি আমরা পাই তা খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের দ্বিতীয় ভাগে নির্মিত বলে মনে করা যেতে পারে। মূর্তিগুলি প্রধানতঃ কুষাণ-যুগের। এর মধ্যে কতকগুলি মথুরার নিকটবর্তী সঙ্ঘে[৮] খননকার্যের ফলে কুষাণকালীন স্তর থেকে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাস্কর্যটি রাজস্থানের নাগরে উৎখননের ফলে পাওয়া গেছে।[৯] পোড়া মাটির এই ফলকটিতে দেবী প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। একটি হাত দিয়ে মহিষের জিভ টেনে বার করছেন এবং অন্য হাত দিয়ে পশুটির পিঠ সজোরে মর্দন করছেন। অবশ্য এই নিদর্শনে দেবীর প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল দৃশ্যমান। ফলকটি কুষাণ যুগের বলে চিহ্নিত হয়েছে। মূর্তিটি বর্তমান জয়পুরের নিকটস্থ আমেরে রক্ষিত। বেলেপাথরের অনুরূপ একটি গুপ্তকালীন মূর্তি ভীটা[১০] থেকে পাওয়া গেছে। ভীটার মূর্তি ছাড়াও মহিষমর্দিনীর পরবর্তীকালের বহু ভাস্কর্য ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলির সাহায্যে আমরা অনুমান করতে পারি যে খ্রিষ্টীয় শতকের সূচনা থেকে গুপ্তপরবর্তী যুগে দেবী মহিষমর্দিনীর আরাধনা ভারতীয় জনসমাজে প্রবহমান ছিল।

প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি ছাড়াও পৌরাণিক সাহিত্য যেমন বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,[১১] মৎস্য পুরাণ[১২] ও অগ্নিপুরাণে[১৩] দেবী মহিষমর্দিনী রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্কন্ডেয় পুরাণের 'দেবী মাহাত্ম্য[১৪] অংশে মহিষাসুরের যুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন কালে মহিষমর্দিনী রূপে দেবীকে সাধারণত এককভাবেই (পরিবার ছাড়াই) পূজা করা হত। এমকি আনুমানিক একাদশ শতকে সংকলিত কালিকা পুরাণে, দেবী একক ভাবেই বর্ণিত হয়েছেন। অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রথম খ্রিষ্টাব্দের দ্বিতীয় ভাগে মহিষমর্দিনী সংক্রান্ত যে ধর্ম-বিশ্বাসের উদভব হয়েছিল, আদিমধ্য যুগের প্রান্ত পর্যন্ত সেই বিশ্বাসের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল।

এখন আমাদের প্রশ্ন হল যে একাদশ-দ্বাদশ শতকের পরে কোন সময় পরিবার কর্ত্রী দুর্গার সঙ্গে মহিষমর্দিনীর সম্পর্ক গড়ে উঠে ছিল। পূর্বে উল্লিখিত রাজশাহী বরেন্দ্র-রিসার্চ ম্যুজিয়ামে সংরক্ষিত দ্বাদশ শতকে নির্মিত ভাস্কর্যের চারশ বছর পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষ পাদে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'কবিকঙ্কণ চন্ডী' তে পরিবারের অন্যান্যদের (অর্থাৎ শিব, লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী ও কার্তিকেয়) সঙ্গে দশভূজা চন্ডিকার (অর্থাৎ দুর্গা) সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী রূপ বর্ণির্ত হয়েছে। অতএব উপরে বর্ণিত তথ্যগুলির কাল পরম্পরা বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে কোন এক সময়ে কল্পনায় প্রতিমায়িত পরিবার কর্ত্রী দুর্গার সঙ্গে মহিষমর্দিনীর রূপের অভিন্নকরণ ঘটে ছিল যার ফলস্বরূপ দেবী কল্পনার দুটি ধারা মিলে সৃষ্টি হল পুত্রকন্যা সহ মহিষমর্দিনী দুর্গার প্রতিমা।

সূত্র নির্দেশ

১) *মৎস পুরাণ*, ১৫৪, ৫০১-২; *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ*, মধ্যখণ্ড, ২০-৩২।

২) আর. ডি. ব্যানার্জী, *ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ মিডিভ্যাল স্কাল্‌প্‌চার*, কলিকাতা, ১৯৩৯, পৃঃ ১১৫ এবং চিত্রপত্র ৫৭, নং এ-বি, এনামুল হক, *বেঙ্গল স্কাল্‌প্‌চারস, হিন্দু আইকোনো-গ্রাফি আপটু সি. ১২৫০ এ. ডি.* ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ২৩২-২৩৬ এবং মূর্তির তালিকা, নং ১১৫২-১১৬৯।

৩) আর. ডি. ব্যানার্জী, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৫।

৪) ঐ. পৃঃ ১১৬।

৫) ঐ, চিত্রপত্র ৫৭, নং সি।

৬) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত*, কলিকাতা, ২০০০ পৃঃ ৬৯, চিত্র নং ৪১।

৭) সন্ধ্যাকর নন্দী, *রামচরিত*, ৩, ২৫।

৮) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *শক্তির রূপ*, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ১৫

৯) বি. এন. মুখার্জী, *ননা অন্ লায়ন - এ স্টাডি ইন কুষাণ ন্যুমিসম্যাটিক আর্ট*, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ২০.

১০) ঐ

১১) টি, গোপীনাথ রাও, *এলিমেন্টস অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি*. খণ্ড নং ১, অংশ নং ২, *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি. পৃঃ ১১২।

১২) *মৎস্য পুরাণ*, ২৬০, ৫৫-৭০।

১৩) *অগ্নি পুরাণ*, ৫০-১-৬।

১৪) *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*, ৮২-৮৩।

১৫) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণ চণ্ডী* (অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) কলিকাতা, পৃঃ ৮৬।

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গঠনে ও সংস্কৃতিতে কম্বোজ উপজাতির অবদানের সমীক্ষা ঃ

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন বঙ্গের চতুর্দিক দিয়ে বহুবিধ উপজাতিগোষ্ঠীর (Tribe) অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। বহিরাগত উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত কম্বোজনামক উপজাতি গোষ্ঠীর নাম উল্লেখনীয়। লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে কম্বোজগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তের আংশিক চিত্র পাওয়া যায়। এই নিবন্ধে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গঠনে ও সংস্কৃতিতে কম্বোজগোষ্ঠীর অবদানের সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। নিবন্ধের শিরোণামের মূল্য নিরূপণের জন্য কম্বোজ শব্দের মূলগত, ভাষাগত উৎপত্তি, অর্থ ও কম্বোজগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ, বসতি, শারীরিক গঠন প্রকৃতি, বর্তমানে কম্বোজগোষ্ঠীর সহিত বহুল সাদৃশ্যযুক্ত বংশধর বলে পরিচিত জনগোষ্ঠীর সমীকরণ করার প্রক্রিয়া ইত্যাদি আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিষয়বস্তু ও বক্তব্যকে নির্ধারিত পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কারণে বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করে শুধুমাত্র সারাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বাঙালিজন ও সংস্কৃতির সহিত কম্বোজগোষ্ঠীর ক্রমানুক্রমিক অন্তর্লীন হয়ে একাত্মকরণের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত শিরোণামের বিশ্লেষণী সমীক্ষায় সর্বাগ্রে আলোচ্য বিষয় কম্বোজ শব্দের মূলগত, ভাষাগত উৎপত্তি ও অর্থ নির্ণয়। এ প্রসঙ্গে লেভি সাহেব নিরুক্তের (১১.১.৪) শ্লোকের উপর ভিত্তি করে মূলগত উৎপত্তি নির্ণয় করেছেন - কম্ + ভোজ = কম্বোজ এইভাবে।[১] আবার কম্বোজ শব্দটি তিব্বতীয় ব্রহ্মদেশীয় ভাষাভুক্ত (Tibeto-Burmese) কিন্তু সংস্কৃতে রূপান্তরিত।[২] এইরূপ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় শব্দটি আর্যেতর (non-Aryan)।

আবার সুপ্রাচীনকাল থেকে কম্বোজ উপজাতিগোষ্ঠী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বঙ্গের সমতলভূমি জুড়ে বসতি স্থাপন করেছিল তার উল্লেখও পাওয়া যায় লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে। বঙ্গে কম্বোজগোষ্ঠীর বসতি ও উপস্থিতির সপক্ষে বলা যায় যে হয়তো তারা তাদের মূল বাসস্থান ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। অন্যদিকে বলা যায় মূল কম্বোজগোষ্ঠীর আর একটি শাখা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতে আরম্ভ

করেছিল। সেখান থেকে তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে গুর্জর প্রতিহারদের আগমনের সঙ্গে কম্বোজগণও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে বঙ্গদেশে এসেছিল।[৩] আবার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে বঙ্গে অনুপ্রবেশের সপক্ষে তথ্যসম্বলিত অনেক উপাদানও রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ, ঐতিহাসিক হেম রায়, নীহাররঞ্জন রায় ও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত সমর্থন করে প্রত্নতত্ত্ববিদ সুধীররঞ্জন দাশও মনে করেন বঙ্গে কম্বোজ অনুপ্রবেশ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকেই হয়েছিল।[৪] অধুনা নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিরিক্ষার ফলশ্রুতি এই মতবাদ সমর্থনের পক্ষে যুক্তিসংগত।

যাস্কর নিরুক্তে, বৌদ্ধ গ্রন্থ জাতকে, জৈন গ্রন্থে, রামায়ণ, মহাভারতে, বৃহৎসংহিতা, মনুসংহিতা, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদান বিশেষ করে ১ম মহীপালের বানগড় তাম্রশাসন ও বানগড় স্তম্ভলেখ, কম্বোজরাজ নয়পালের বালেশ্বর ও ইর্দা তাম্রশাসনে, নারায়ণপালের বাদাল স্তম্ভলেখ, দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন ইত্যাদিতে কম্বোজ উপজাতির বহুবিধ তথ্য সংকলিত আছে।[৫]

বৃহৎসংহিতায় (ষষ্ঠ শতাব্দীর) কম্বোজগণ পূর্বভারতের অধিবাসী ও বঙ্গ, সুহ্ম, মগধ, শবর প্রভৃতি পূর্বভারতের তথা বঙ্গের উপজাতিদের সংগে উল্লিখিত হয়েছে।[৬] পূর্বাঞ্চলের তথা বিশেষ করে বঙ্গের প্রাচীন উপজাতিগোষ্ঠীর সংগে কম্বোজগণ বঙ্গের অধিবাসী ছিল পূর্বাঞ্চলের তো সন্দেহাতীত। উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্যস্থান থেকে কম্বোজগণের বঙ্গে প্রবেশ প্রসঙ্গ ফাউচার (Foucher) মন্তব্য করেছেন-তিব্বতই কম্বোজদের দেশ আর তিব্বতীয় ভাষাই কম্বোজদের ভাষা।[৭] নেপালীদের কিংবদন্তি ও লোকপরম্পরায় উপরিউক্ত বক্তব্যই বিধৃত হয়েছে। রমাপ্রসাদ চন্দ ফাউচারের মতবাদ সমর্থন করেন। দিনাজপুর জেলায় বানগড়ে স্তম্ভলেখতে 'কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি' উল্লিখিত আছে।[৮] ইর্দা তাম্রশাসনেও এঁদের উল্লেখ আছে।[৯] ১ম মহীপালের বানগড় তাম্রশাসন থেকে জানা যায় মহীপাল তাঁর পৈত্রিক সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। যাঁরা বাহুবলে ও ক্ষমতায় বলীয়ান ছিল ও এই রাজ্যে তাঁদের বংশপরম্পরায় কোন দাবি ছিল না। তাঁদের আক্রমণে পালরাজবংশ উত্তরে এই অঞ্চলে তাদের অধিকার হারিয়েছিল।[১০] মদনপালের মনহলি শাসনেও এর উল্লেখ আছে।[১১] চন্দ মহোদয়ের অভিমতে কম্বোজবংশের গৌড়পতি সম্ভবত তিব্বত, ভুটান ও হিমালয়ের সানুদেশের অঞ্চল সমূহ থেকে মঙ্গোলীয় জাতির নেতা হিসাবে বঙ্গে তাঁর অভিযান চালিয়ে সাফল্যমন্ডিত হয়েছিলেন।[১২] তিব্বতীয় গ্রন্থ প্যাং সাম্ জন জ্যাং (Pang-Sam-Jon-Jang) থেকে জানা যায় ব্রহ্মদেশ ও লুসাই পার্বত্য অঞ্চলে কম্বোজদের বসবাস ছিল।[১৩] কিন্তু এই গ্রন্থটি অনেক পরের লেখা। সেকারণে এই গ্রন্থের তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না, আবার একেবারে অস্বীকার করাও যায় না। যাই হোক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় একাধিকবার

মঙ্গোলীয়দের আক্রমণ ও করোতোয়া নদী অতিক্রম করে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া,[১৪] ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনের তথ্যের ভিত্তিতে আসাম থেকে উত্তরবঙ্গ আক্রমণের বিবরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাচীনবঙ্গে কম্বোজগোষ্ঠীর বসতির পূর্বে উত্তর-পূর্ব ভারতে তাদের আবাস ছিল।[১৫] এই অঞ্চলে তাদের ভাষা ছিল তিব্বতীয় চিনা (Tibeto-Chinese)

বঙ্গে বসতির ফলে কম্বোজগোষ্ঠী ধীরে ধীরে অন্যান্য অধিবাসীদের সংগে নানাভাবে মিলেমিশে গিয়েছিল। ক্রমে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল— হওয়াই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পালরাজবংশের সহিত কম্বোজদের বৈবাহিক বন্ধনের ইতিকথা।[১৬] সম্পর্ক এতই গভীর ও নিবিড় হলো যে কম্বোজদের নামের অন্তে 'পাল' শব্দ সংযুক্ত হতে লাগলো।[১৭] ক্রমশ কম্বোজগোষ্ঠী বাঙলাদেশেরই বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল এবং এ দেশেরই বিশাল জনসমুদ্রে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে দেখা যায়, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গঠনে ও ধমনীতে কম্বোজগোষ্ঠীর রক্তকণার অনুপ্রবেশ। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গঠনে কম্বোজগোষ্ঠী একটি উপাদানে পরিগণিত হলো। লিখিত গ্রন্থে কম্বোজগোষ্ঠীর শারীরিক গঠনের পুঙ্খানুপুঙ্খ কিছু কিছু বিবৃতি পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ রামায়ণের বিবৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে যথা-কম্বোজগণ রবিসন্নিভঃ অর্থাৎ তাদের গাত্রবর্ণ সূর্যের রশ্মির মতন।[১৮] হরিবংশে শক, যবন, পহ্লব ও কম্বোজদের চুল, দাড়ি ও মুণ্ডিত মস্তকের বর্ণনা আছে।[১৯] কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও এরূপ বিবৃতিই পাওয়া যায়-যেমন কম্বোজগোষ্ঠী মথে (মাথায়) নাহি রাখে কেশ (চুল)।[২০] এই সব বিবৃতি থেকে অনুমিত হয় যে কম্বোজগণ মস্তকে ছোট ছোট চুল রাখতো। আবার এও দেখা যাচ্ছে কম্বোজগণের শরীরের গঠন প্রণালী হিমালয়ের পাদদেশের শক, হূণ, কিরাতদের মত। সেক্ষেত্রে কম্বোজদের সঙ্গে তিব্বতীয়, নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের সাদৃশ্য দেখা যায়। তবকৎ-ই-নাসিরিতে কোচ ও থারু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুর্কিদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তুর্কি, কোচ, রাজবংশী ও মেচদের শারীরিক গঠন মোঙ্গলজাতির শারীরিক গঠনের ন্যায়।[২১] এইসব বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা নিরিক্ষা করেছেন ক্যাম্পবেল (Campbell), রিজলী (Risley), ওয়াডেল (Waddell), ও' ডোনেল (O' Donnell), ডাল্টন (Dalton), হডগসন (Hodgson), গেট (Gait), হ্যাডন (Haddon), দত্ত (Datta) প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ।[২২] এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় যে, রিজলী বলেছেন বাঙলার কোচগণের মধ্যে দ্রাবিড়ভাষাভাষীগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে। আবার আমাদের কোচগণ মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত।[২৩] এর থেকে মনে হয় বহুবিধ ভাষাভাষী বহুজাতির বহুল মিশ্রণের ফলেই এরূপ হয়েছে। সম্ভবত মেডিটেরেনিয়ান ও মঙ্গোলয়েড জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর মিশ্রণের ফলশ্রুতি।[২৪] উত্তরবঙ্গে কোচ, পালিয়া, রাজবংশী কম্বোজদের বংশধর বলেই কথিত।[২৫] অতএব আদিকালের কম্বোজগণও মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কিন্তু কালক্রমে কম্বোজগোষ্ঠী

প্রাচীন বঙ্গের অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে যাওয়ার ফলে তাদের নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়েছিল ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বহুল পরিবর্তন হয়েছিল। তথাপি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গঠনে মঙ্গোলীয় উপাদান কম্বোজগোষ্ঠীর অবদান। অবশ্য মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র কম্বোজগোষ্ঠীই নয়, আরো অনেক সম্প্রদায়েরই মঙ্গোলীয় অবদান আছে।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিমন্ডলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুধুমাত্র উত্তর বঙ্গেই নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গেও কম্বোজবংশীয় রাজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর সাক্ষ্য বহন করছে বানগড় শুম্ভ লেখর গৌড়পতি যিনি কম্বোজবংশীয়।[২৬] অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন সমতটে চন্দ্রবংশীয়দের অভিযানের পূর্বে সমতট রাজ্যের রাজধানী ক্ষীরোদা নদীর তীরে অবস্থিত দেবপর্বত সম্ভবত কম্বোজদের আক্রমণে[২৬ক] বিধ্বস্ত হয়েছিল। মহাভারতে কম্বোজ রাজার নাম পাওয়া যায়।[২৭] তাছাড়া 'গণ' বা প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থারও উল্লেখ আছে।[২৮] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কম্বোজদের 'বার্তাশিস্ত্রোপজীবী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৯] এইভাবে অর্থশাস্ত্রে কম্বোজগণ অস্ত্র-শস্ত্র জীবিকা গ্রহণকারী অর্থাৎ সৈনিক বা যোদ্ধা বলে চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রাচীন বঙ্গে কম্বোজদের ছিল কি ছিল না তা অজ্ঞাত। কিন্তু বঙ্গে তারা রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি রাজা বা নৃপতি রূপে প্রতীয়মান হয়েছে।[৩০] তবে তারা যে দক্ষ যোদ্ধা ছিল তাতে কোন সন্দেহই নাই।

কম্বোজগণ একদিকে কিরাত, শক, চীনাদের সঙ্গে, অন্যদিকে বঙ্গ, সুহ্ম, শবরদের সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত হয়েছে।[৩১] তাদের ভাষা তিব্বতীয় ব্রহ্মদেশীয় ও তিব্বতীয় চৈনিক। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তারা আর্যেতর ভাষায় কথা বলে। এর সমর্থন পাওয়া যায় ভূরিদত্ত জাতকে।[৩২] বঙ্গে আর্যভাষীদের আগমণে ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কম্বোজসম্প্রদায়ও প্রভাবিত হয় ও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য পরিকাঠামোতে স্থান পায়। এর প্রমাণ মেলে বংশব্রাহ্মণে যেখানে বলা হচ্ছে কম্বোজদেশ ব্রাহ্মণদের শিক্ষাক্ষেত্র।[৩৩] আবার মজ্ঝিমনিকায়তে বলা হচ্ছে আর্যভাষাভাষীদের কম্বোজদেশে দেখা যাচ্ছে।[৩৪] এইভাবে কম্বোজদের ব্রাহ্মণ্যপরিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। কখনো তাদের ক্ষত্রিয় বলে উচ্চবর্গে স্থান দেওয়া হচ্ছে আবার মনুসংহিতায় শূদ্র বলে অভিহিত করে সমাজের নিম্নে স্থান দেওয়া হচ্ছে।[৩৫] কারণ সম্ভবত তারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল।

বাঙালির সংস্কৃতিতে কম্বোজগোষ্ঠীর অবদান প্রসঙ্গে তাদের সংস্কৃতির রূপ কিরূপ ছিল তা জানা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের তথ্য সীমিত। তথাপি কম্বোজদের বৃত্তি বা জীবিকা সম্বন্ধে বলা যায় পার্বত্য উপজাতিদের ন্যায় তারা শিকার করতো। এক ধরণের চাষবাসও করতো - সম্ভবত পার্বত্য এলাকায় ঝুম্ চাষে তারা অভ্যস্ত ছিল। যাস্কর

নিরুক্ত থেকে জানা যায় কম্বোজগণ কম্বল (rug) খুব পছন্দ করতো।[৩৬] এর থেকে মনে হয় তারা নিশ্চয়ই শীতপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসী। তাছাড়া তারা ঘোড়ার ব্যবসা করতো।[৩৭] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের দুটি বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্ত চন্দ্রকেতুগড় থেকে সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘোড়া রপ্তানি করা হত। এই ঘোড়ার ব্যবসা খুব লাভজনক ছিল। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী লেখর পাঠোদ্ধারে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিশ্লেষণী সমীক্ষায় এবং অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর প্রত্নসমীক্ষায় (ভল্যুম্ ওয়ান) মনোজ্ঞ আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে ঘোড়া বঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্যতম লাভজনক ব্যবসা ছিল।[৩৮]। এই বিরল যুদ্ধাশ্ব ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে স্থলপথে ব্যবসায়ীরা বঙ্গে আনতো ও সেখান থেকে ঐ বন্দর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি করা হত।

এক্ষেত্রে বলা যায় কম্বোজ সম্প্রদায় যারা উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে বঙ্গে প্রবেশ করেছে তারাও ঘোড়ার ব্যবসা করতো। সুতরাং বঙ্গের উপরিউক্ত বন্দর দিয়ে ঘোড়ার ব্যবসা করা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঘোড়া রপ্তানি করা তাদের পক্ষে অনেক সহজসাধ্য ছিল বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি লক্ষণীয় বিষয় হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথে কোলাঘাট ষ্টেশনের আগে ঘোড়াঘাটা নামে একটি ষ্টেশন আছে। সন্নিকটে রূপনারায়ণ নদ। নামকরণের সঙ্গে লোককথা ও কিংবদন্তি ইতিহাসের তথ্য উদ্ঘাটনের সহায়ক। ঘোড়ার ঘাট বা কেন্দ্র নদীপথে ঘোড়া কেনা-বেচার স্থান বা কেন্দ্র। হয়তো কম্বোজগোষ্ঠীর ঘোড়ার রম্‌রমা ব্যবসা এভাবে চলতো।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কম্বোজ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রভাবিত হয়েছিল ও বঙ্গে তারা শিবের উপাসকও ছিল। এমনকি শিবের মন্দিরও তৈয়ারি করেছিল। বানগড় স্তম্ভলেখতে এর উল্লেখ আছে।[৩৯]

রামায়ণের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কম্বোজ সম্প্রদায় স্বর্ণালঙ্কারে নিজেদের অলংকৃত করতে পছন্দ করতো ও অভ্যস্ত ছিল।[৪০]

আজও তাদের বংশধর বা এখনও যারা মূল কম্বোজগোষ্ঠীর সংগে সংশ্লিষ্ট বলে পরিচিত তারা অর্থাৎ ভুটিয়া, নেপালী, গুর্খা, রাজবংশী, কোচ ইত্যাদি জনেরা উলের, কম্বলের, শীতবস্ত্রের নানা সম্ভার নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে। সৈনিক হিসাবেও তাদের যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

নিবন্ধের পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাঙালি জাতি বহুবিধ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণে গঠিত। তদ্রূপ বহুবিধ সংস্কৃতির আদান প্রদানেরও মিশ্রণে ফলশ্রুতিতেই বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণ। তন্মধ্যে এখানে কেবলমাত্র কম্বোজ উপজাতির মঙ্গোলীয় উপাদানের মিশ্রণের সমীক্ষা করা হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১) বাগচী, প্রবোধচন্দ্র ঃ (অনুবাদক) *প্রি-অ্যারিয়ান অ্যান্ড প্রি দ্রাবিড়িয়ান ইন ইন্ডিয়া* (সিলভ্যান লেভি, প্রিঞ্জলুস্কি ও অন্যান্যরা), পৃঃ ১২৩, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৯)

২) তদেব, পৃঃ ১, ১২১

৩) রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্রঃ *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া,* পৃঃ ৩১১ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০)

৪) রায় নীহাররঞ্জন ঃ *বাঙালীর ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪ (কলিকাতা, ১৯৮০)

৫) *মহাভারত,* ভীষ্মপর্ব ৯, ৬৫-৬৬, রামায়ণ বালকাণ্ড ইত্যাদি; বরাহমিহির, *বৃহৎসংহিতা,* ৪(IV), ৩২; ৫(V), ৩৯; ৭৭-৭৮; ৯(IX), ১৭, ২৯, ৪০; ১৬(XVI), ২, ৩৩ ইত্যাদি; শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ, *মনুসংহিতা,* ১০. ৪৩-৪৮, পৃঃ ২৯৮; সামশাস্ত্রী, আর ঃ *কৌটিল্যস্ অর্থশাস্ত্র,* চ্যাপটার ওয়ান, পৃঃ ৪১২; চ্যাপ্টার ৭(VII), ১, পৃঃ ২৬৫ ইত্যাদি মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী ঃ করপাস অব বেঙ্গল ইন্সক্রিপসন্স, পৃঃ ১১৪-১৩০ (দেবাপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন); পৃঃ ২০৯-২১৮ (মদনপালের মনহলি তাম্রশাসন) [কলকাতা, ১৯৬৭] চন্দ্র, রমাপ্রসাদ, *গৌড়লেখমালা,* পৃঃ ১৯; রাজসাহী, ১৯১২ *এপ্রিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা* ভল্যুম ঃ ১৪ (XIV), পৃঃ ৩২৪ (১ম মহীপালের বানগড় স্তম্ভলেখ); ভল্যুম ২(II), পৃঃ ১০০ এক এফ. (নারায়ণপালের বাদাল স্তম্ভ লেখ); তদেব, ভল্যুম ২২(XXII), ১৫০, ১৫২; ২৪ (XXIV), ৪৩ (নয়পালের ইর্দা তাম্রশাসন); *উড়িষ্যা হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ জার্নাল* (কম্বোজরাজ নয়পালের বালেশ্বর লেখ)

৬) *বৃহৎসংহিতা,* পূর্বোক্ত, ১০ (X), ৫,৭; ১৩ (XIII), ১৪ (XIV), ২১ ইত্যাদি।

৭) রায় হেম ঃ *ডায়নাস্টিক হিস্ট্রি অব নর্দার্ন ইন্ডিয়া,* ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৩০৯; (কলিকাতা, ১৯৩১) *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* (এন. এস), ভল্যুম ৭, পৃঃ ৬১৯; মজুমদার, আর. সি; *হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল,* পৃঃ ১৭৩ (কলিকাতা, ১৯৭১)

৮) *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিয়া* ভল্যুম ১৪, পৃঃ ৩২৪ (১ম মহীপালের বানগড় স্তম্ভ লেখ); রায় হেম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৯; মজুমদার আর. সি., পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩; রায় নীহাররঞ্জন, *বাঙালির ইতিহাস,* প্রথম খন্ড, পৃঃ ৫৪ (কলিকাতা, ১৯৮০)

৯) *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিয়া* ভল্যুম, ১৪, পৃঃ ৩২৪; রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪।

১০) মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০১-০৩, ২০৭, (কলিকাতা, ১৯৬৭) (১ম মহীপালের বানগড় তাম্রশাসন)

১১) তাদব পৃঃ ২০৯-২১৮ (মদনপালের মনহলি তাম্রশাসন)

১২) মজুমদার, আর সি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩, রায় হেম, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৩০৯, চন্দ, আর, পি ঃ *গৌড়রাজমালা,* পৃঃ ৩৭

১৩) মজুমদার, আর. সি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩; *ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলি,* ভল্যুম ১৫ (XV), পৃঃ ৫১১; রায়, হেম, পূর্বোক্ত ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৩০৯

১৪) রায়, হেম পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৯; এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ১২ (XII) পৃঃ ৭৩

১৫) তদেব।

১৬) মজুমদার, আর. সি. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২-৭৩; *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা,* ২১(XXI), পৃঃ ১৭৩; *ইণ্ডিয়ান কালচার,* ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৭১।

১৭) তদেব।

১৮) ভাট ঃ *বাল্মিকী রামায়ণ* বালকান্ড ১, ৫২, ২ (ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, ১৯৬০)

১৯) *হরিবংশ,* ১৪ (XIV), ১, ১৫-১৭; সরকার, দীনেশ চন্দ্র ঃ *ষ্টাডিজ ইন দি সোসাইটি এ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব এ্যানসিয়েন্ট এ্যান্ড মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া,* ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৪৪, ৪৬ (কলিকাতা, ১৯৬৭)

২০) *কবিকঙ্কণ চন্ডী,* ৮৫; সরকার, ডি, সি ঃ *ষ্টাডিজ ইন্ দি সোসাইটি এ্যাণ্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব এ্যানসিয়ান্ট এ্যান্ড মিডাইভাল ইন্ডিয়া,* ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৪৪,৪৬

২১) চ্যাটার্জী, সুনীতি কুমার ঃ *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল,* ১৬ (XVI) পৃঃ ১৯৯; রাভার্টা, এইচ, (অনুবাদক) *তবকৎ-ই-নাসিরি,* ভল্যুম ওয়ান এ্যান্ড টু, (কলিকাতা, ১৯৮০-৮১) রিপ্রিন্ট, চন্দ্র, রমাপ্রসাদ ঃ *ইন্দো এ্যারিয়ান রেসেস,* পৃঃ ৩৮ কলিকাতা, ১৯৬৯)

২২) মিত্র, অশোক ঃ *সেন্সাস,* ১৯৫১, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৫ (গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৫৩), পৃঃ ২২৫; ডাল্টন,. ই, টিঃ *ডেসক্রিপটিভ এথ্নোলজি অব বেঙ্গল;* পৃঃ ৮৯-৯১ (কলিকাতা, ১৯৭২, ১৯৭৩, রিপ্রিন্ট) রিজলী, হাবার্ট, *ট্রাইব্স্ এ্যান্ড কাস্টস্* অব বেঙ্গল, ভল্যুম ওয়ান পৃঃ ৪৯২ (কলিকাতা, ১৮৯১); হ্যাডন, এ. সি. ঃ *রেসেস অব ম্যানকাইণ্ড,* পৃঃ ১১৪ (কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি, ১৯২৯); রিজলী, হাবার্ট ঃ *পিপল্ অব ইণ্ডিয়া,* পৃঃ ৪০১ (কলিকাতা ও সিম্‌লা, ১৯১৫); *সেন্সাস রিপোর্ট অব ইণ্ডিয়া,* ১৮৯১, ভল্যুম তৃতীয়, পৃঃ ২৬২; গেট, বি. এ ঃ *হিস্ট্রি অব আসাম,* পৃঃ ৪৬-৪৭ (কলিকাতা, ১৯২৬)

২৩) রায়, হেম ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৯

২৪) চন্দ, রমাপ্রসাদ ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬

২৫) সরকার, দীনেশচন্দ্র ঃ *ষ্টাডিজ ইন দি জিওগ্রাফি অব এ্যানসিয়ান্ট এ্যাণ্ড মিডাইভ্যাল ইণ্ডিয়া,* পৃঃ ১৫২ (দিল্লী, ১৯৭১) রায় নীহাররঞ্জন ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪

২৬) *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা;* ভল্যুম ১৪, পৃঃ ৩২৯-৩০,

২৬ক) সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫২, রায়, নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪

২৭) রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০

২৮) *মহাভারত,* ৭, ৪৯, ৩৮

২৯) সামশাস্ত্রী, আর (অনুবাদক) *কৌটিল্যাস্ অর্থশাস্ত্র,* বুক ইলেভেন, চ্যাপ্টার ওয়ান, পৃঃ ৪১২; বুক সপ্তম, চ্যাপ্টার ওয়ান পৃঃ ২৬৫ (মাইসোর, ১৯৬৭)

৩০) রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫২; মহাভারত ১, ৬৭, ৩২, ২, ৪, ৫, ১৯, ২২ ইত্যাদি।

৩১) সরকার, ডি. সি ঃ *স্টাডিজ ইন দি সোসাইটি এ্যাণ্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব এ্যানসিয়েন্ট এ্যাণ্ড মিডাইভ্যাল ইণ্ডিয়া,* পৃঃ ৭২; রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৫-২৬ ইত্যাদি

৩২) *জাতক,* ৬, ২০৮, রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ

৩৩) ম্যাকডোনাল্ড, এ. এ. এ্যান্ড কীথ, এ. বি ঃ *বেদিক ইণ্ডেক্স অব নেম্‌স্ এ্যাণ্ড সাব্জেক্টস* ভল্যুম ওয়ান (রিপ্রিন্ট, দিল্লী, ১৯৫৮) পৃঃ ১১৭, ১৩৮; *যাস্কর নিরুক্ত*, ১১.২.

৩৪) রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৯

৩৫) *মনুসংহিতা*, ১০(X), ৪৩-৪৫, শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ, মনুসংহিতা, পৃঃ ২৯৪ (২য় সংস্করণ কলিকাতা)

৩৬) বাগচী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭, ১২৩; ল. বি. সি ঃ *সাম ক্ষত্রিয় ট্রাইবস্ অব এ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া*, পৃঃ ২৩৪-২৩৫

৩৭) *বিষ্ণু পুরাণ*, ৫ (V), ২৯, উইলসন, এইচ, এইচ, *দি বিষ্ণুপুরাণ-এ সিস্টেম অব হিন্দু মিথোলজি এ্যাণ্ড ট্রাডিশন*, বুক ৫, চ্যাপ্টার ২৯, পৃঃ ১২; বুক ৩, পৃঃ ২৯১-৯২; *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* ২ (II), ২৬, ৪৯; ৪ (IV), ১৬; *বায়ু পুরাণ*, ৮৮, ১২২, উইলসন, *বিষ্ণুপুরাণ*, পৃঃ ১৬০; *জার্নাল অব রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি*, ১৯১২, পৃঃ ২৫৬; ল, বি. সি ঃ *সাম ক্ষত্রিয় ট্রাইবস্ অব এ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া*, পৃঃ ২৩০-২৫৬ (কলিকাতা, ১৯২৪); *মহাভারত সভাপর্ব*, চ্যাপ্টার ৫১, ৩; *কর্ণপর্ব, চ্যাপ্টার*, ৩৮, ১৩ ইত্যাদি।

৩৮) মুখার্জী, বি. এন ঃ *ডিসাইফারমেন্ট অব দি খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী স্ক্রিপ্ট*, মান্থলি বুলেটিন অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি ১৮(XVIII), নং ৮, আগস্ট, ১৯৮৯; খরোষ্ঠী এ্যাণ্ড *খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী ইন্সক্রিপসন্‌স্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল*; (ইন্ডিয়ান *মিউজিয়াম বুলেটিন*, ১৯৯০, পৃঃ ২৩, ৬৪-৬৫); নং ১১, পৃঃ ৪৭; নং ৬, পৃঃ ৪৫ ইত্যাদি। চক্রবর্তী, রণবীর ঃ *প্রত্নসমীক্ষা*, ভল্যুম ওয়ান, ১৯৯২, ম্যারিটাইম ট্রেড ইন আর্লি হিস্টোরিক্যাল বেঙ্গল ঃ এ সীল ফ্রম চন্দ্রকেতুগড় পৃঃ ১৫৫-৫৯।

৩৯) *এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা*, ভল্যুম (বানগড় স্তম্ভ লেখ); চন্দ, রমাপ্রসাদ ঃ *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৯১১, ভল্যুম ৭, পৃপৃঃ ৬১৫-২০; রায়, হেমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ৩০৮।

৪০) উইলসন, এইচ এইচ ঃ দি *বিষ্ণুপুরাণ*, পৃঃ ১৬০, কলিকাতা, ১৯৬১

ভ্রম সংশোধন

ইতিহাস অনুসন্ধান ১৫ ঃ

সূত্র নির্দেশ নং ১৯ - ভট্টাশালী , এন, কে ঃ এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ভল্যুম ২৭ (XXVII), পৃঃ ২৪ পৃঃ ১১৪ তে আছে পরবর্তী একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের *লেখতে* মুদ্রিত হয়েছে। *লেখতে* হবে না। গোবিন্দ্রচন্দ্রের লেখ দুটির ভূমিকায় এন, কে, ভট্টাশালী মহাশয় যে বিবৃতি দিয়েছেন সেখানে বলেছেন গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে বঙ্গে প্রচুর বারিপাত হতো। কারণ বলা হয়েছে প্রবল বর্ষণের জন্যই গোবিন্দ্রচন্দ্র রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। নং ২০, তিরুমলই লেখ এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ভল্যুম ৯ (IX), পৃঃ ২২৯ এফ. এফ.

নং ২১, তদেব।

ত্রিপুরার শিল্পকলা ঃ একটি সমীক্ষা

প্রজিত কুমার পালিত

ভারতীয় শিল্পের সূত্রপাত সেই হরপ্পা সংস্কৃতি থেকে। এই শিল্পকলা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিকশিত হয়েছে। শিল্পের এই বিভিন্নতাকে সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করা যায় গন্ধার, সাঁচি, ভারহুত, মথুরাও অমরাবতী প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রে। এই সবশিল্প কেন্দ্রগুলির মতো অত বিরাট ঐতিহ্য ত্রিপুরার হয়তো নেই, কিন্তু যতটুকু আছে তা আজও শিল্প ইতিহাসের পাদপ্রদীপের নিচে ঠিক আসেনি।

ত্রিপুরা ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বকোণে অবস্থিত। এই প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানের কিংবদন্তি গল্পগাথা, সংগীত, শিল্পসংস্কৃতির আলোচনায় মনে হয়— ত্রিপুরগণই এই বিশিষ্ট কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এ ধারার উৎস কোথায়, কবে এর শুরু তার সিদ্ধান্ত আজও হয় নি। প্রাচীন বা মধ্যযুগের কোন লিখিত ইতিহাস না থাকায় ত্রিপুরার শিল্পসংস্কৃতির কোন পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস গড়ে উঠেনি।[১] তবে প্রাচীন শিল্প, সংস্কৃতি ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের বহু প্রামান্য প্রত্ন তথ্য ছড়িয়ে আছে ত্রিপুরায়। কিন্তু জলবায়ুর প্রকোপ আক্রমণকারীর ধ্বংস বিলাস ও প্রাচীন স্মৃতির উদাসীন্যে অনেক শিল্পকলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আইন ও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারাই এদের রক্ষা করা সম্ভব। আবিষ্কৃত কিছু শিলালিপি ও তাম্রশাসন থেকে জানা যায় গুপ্তযুগ থেকে মসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্প সংস্কৃতির সাথে ত্রিপুরার যোগাযোগ ছিল।[২] মহারাজ বৈন্য গুপ্ত, লোকনাথ, শ্রীচন্দ্র, গোবিন্দ চন্দ্রের তাম্রশাসন, দেবখড়্গমহারানি প্রভাবতী দেবীর শিলালিপি এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ্য। তবে এসব দলিলে উল্লিখিত ত্রিপুরার ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে বর্তমান ত্রিপুরার সীমারেখার অনৈক্য বর্তমান। এসমস্ত রাজগণ কি প্রত্যক্ষভাবে ত্রিপুরাতে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন, না ত্রিপুরা এই সকল সামন্ত রাজ্যের অধীন ছিল তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। ত্রিপুর রাজবংশ বিবরণী রাজ মালার মতে মহাভারতের যুধিষ্টিরের সময় থেকেই চন্দ্রবংশের অন্তর্গত মাণিক্য রাজবংশ ত্রিপুরায় অধিষ্টিত ছিল।[৩] এখনও পর্যন্ত এমন কোন প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি যা খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে ত্রিপুরাতে মাণিক্য বংশের ধারাবাহিক আধিপত্য প্রমাণ করে।[৪] প্রাচীন ত্রিপুরার শিল্পকলার ইতিহাস এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলি হল পিলাক, উদয়পুর, অমরপুর এবং উনকোটি। তবে নিয়মিত শিল্পচর্চার অভাবে ভারতের অন্যান্য

শিল্প কেন্দ্রগুলির মত এই অঞ্চলের শিল্প কেন্দ্রগুলি আজও গবেষকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে নি।

পিলাক দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার অবস্থিত। এই অঞ্চলের নানাস্থানে পাওয়া গেছে গুপ্ত পরবর্তী যুগের স্বর্ণ মুদ্রা, ধর্মীয় অনুশাসন সহ পোড়ামাটির শীলমোহর পাথর ও ধাতুর তৈরি বুদ্ধ ও বোধিসত্ব, মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা দেবদেবীর মূর্তি। এছাড়া পাওয়া গেছে পোড়া মাটির অলংকরণ, প্রাচীন মৃৎ পাত্রের অংশ ও প্রচুর পুরাতন ইট।[৫] গঠন শৈলী ও উপকরণ ব্যবহারের রীতি দেখে মনে হয় এসকল বস্তু খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তর্গত। স্তূপাকৃতি ইটের সমাবেশ দেখে মনে হয়, এখানে বৃহৎ কোন স্থাপত্য নিদর্শন ছিল যা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রাপ্ত মূর্তিগুলির বেশ কিছু অংশ ত্রিপুরার সরকারি সংগ্রহ শালায়, কিছু বা বিভিন্ন আশ্রমও দেবালয়ে পূজিত হচ্ছে। আবার ব্যক্তিগত সংগ্রহেও কিছু রয়েছে। প্রাপ্তবস্তু গুলির সাথে বর্তমান বাংলা দেশের ময়নামতী বৌদ্ধ বিহারে পাওয়া শিল্পকলার আশ্চর্য মিল দেখে মনে হয় ত্রিপুরার পিলাক অঞ্চলেও ময়নামতীর ন্যায় এক বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র ছিল।[৬] বালি পাথরে তৈরি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ মূর্তি গুলির বিশালত্বে অনুমান করা যেতে পারে যে, জনপ্রিয়তা এবং আয়তনে পিলাক ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতটে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তীর্ণ প্রভাব লক্ষণীয়। বর্তমান ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চল সেই সময় বৌদ্ধ সমতটেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন অনুযায়ী ত্রিপুরার মাণিক্যরাজারা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। অথচ ত্রিপুরার শিল্পে বৌদ্ধ প্রভাব অনেককেই বিস্মিত করে। শুধু তাই নয়, রাজমালাতে বৌদ্ধদের উল্লেখ তেমন নেই।[৭] অথচ ত্রিপুরায় চাকমা, মগ ও বড়ুয়া গোষ্ঠীভুক্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনজাতি রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন শতাংশ। সুতরাং বলা যায়, শিল্পকে মাধ্যম করে ত্রিপুরার সমাজ বিবর্তনের ধারাকে যেমন ব্যাখ্যা করা হয় নি, তেমনি সমাজ বিবর্তনে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়েও তেমন কোন আলোকপাত হয় নি। পিলাক দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির উপস্থিতিতে মনে হয় বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের প্রভাব এখানে পড়ে ছিল।[৮] এই বিরাট শিল্পভাণ্ডারের পৃষ্টপোষক কারা ছিল তা জানা যায় না। তবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায় রাজপৃষ্টপোষক ছাড়া এই বিশাল শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠা সম্ভব নয়।

পিলাক থেকে কিছু উত্তরে উদয়পুর অঞ্চলে একটু ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। এই অঞ্চলে যে সমস্ত শিল্পকলা পাওয়া গেছে, তা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীই নয়, এই অঞ্চলটি সতী পীঠের এক পীঠ হিসাবে বিখ্যাত।[৯] এখানে কালো কষ্টিপাথরে তৈরি ত্রিপুরা সুন্দরীর সেই বিখ্যাত মূর্তিটি রয়েছে। উচ্চতায় ১ মিটার ৫৭ সেন্টি মিটার এবং প্রস্তে ৬৪ সেন্টিমিটার। দেবী সমপদস্থানক আসনে শবাসনে শায়িত শিবের বক্ষের উপর দণ্ডয়মান।

দেবীর চার হাতে, ডানদিকের উপরের হাতে ববমুদ্রা, নীচের হাতে অভয়মুদ্রা, বাঁদিকে উপরের হাতে খড়্গ এবং নীচের হাতে অসুরমুণ্ড। দেবীর মাথায় জটা মুকুট এবং মুকুটের দুপাশে গুচ্ছ গুচ্ছ তরঙ্গায়িত জটারাশি। ত্রয়োদশ নরমুণ্ড মালায় সজ্জিত দেবীর মুখখানি গোলাকৃতি, নাক ছোট এবং চ্যাপ্টা, চোখদুটি গোলাকার ও ছোট।[১০] তাঁর সুডৌল গঠনে রয়েছে অপূর্বকান্তি। ত্রিপুরাশ্বরী ছাড়াও এখানে বিষ্ণু উমা মহেশ্বর, দুর্গামহিষমর্দিনী প্রভৃতি মূর্তি পাওয়া গেছে। উদয়পুরের কাছে অমরপুরে কালো পাথরের খোদিত বৃহদাকার মাতৃকা-মূর্তি (গেরুর বাহিনী বৈষ্ণবী) গঠনে, বৈচিত্র্যে সত্যই অপরুপ। এছাড়া গোমতী নদী তটে অবস্থিত দেবতা মুড়া পর্বতগাত্রে খোদিত কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির গঠন বৈচিত্রে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বলে মনে হয়।[১১]

উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হল উত্তর ত্রিপুরার ঊনকোটি। এক কম কোটি মূর্তি থাকায় রাজ মালার কিংবদন্তি অনুসারে, কোটিমূর্তি তীর্থ বারাণসীর পরেই ঊনকোটির স্থান। দক্ষিণ ত্রিপুরায় শিল্পকলা যে ধারায় বিকশিত হয়েছিল, সেই ধারাটি এখানে উপেক্ষিত। এই অঞ্চলের শিল্পকলার সাথে কাছাড় সংস্কৃতির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ত্রিপুরী ও কাছাড়ীগণ একই বংশ সম্ভূত বলে অনেকে মনে করেন। ঊনকোটি পর্বত মালার গায়ে খোদিত ৩০/৩৫ ফুট উঁচু মূর্তি গুলি শিল্প তথা ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসুকে চিন্তার উদ্রেক করে। শিলা লিপি বা লেখ না থাকায় এই বিশাল মূর্তিগুলি দেখে ঊনকোটির কাল নির্ণয় করা কঠিন। প্রাকৃতিক কারণে এই বিপুল শিল্পসম্ভার শ্লেট ও বালিপাথরে তৈরি হয়েছে। ভারতীয় মূল শিল্প ধারার সাথে এই শিল্পরীতির মিল খুব কম। বরং নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশের শিল্পরীতির সাথে এর সাদৃশ্য বর্তমান।[১২] ভাস্কর্যের বিষয় বস্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্গত হলেও এর গঠন শৈলী স্থানীয় লোকায়ত শিল্পেরই অনুরূপ। আদিম লোকশিল্প বা or Primitive Art কে অনেকেই কালহীন বলে বর্ণনা করেছেন। তবে ঊনকোটিতে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে, যাদের গঠনরীতি পাল সেনযুগের অন্তর্গত, এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায় পাহাড়ের গায়ে খোদাই মূর্তিগুলি একই সময়ে উৎকীর্ণ। এই বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কে বা কারা এর পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন তা জানা না গেলেও বলা যেতে পারে সেনযুগে বাংলার হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশে এবং সাধারণের মন থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দূর করার জন্য রাজপৃষ্টপোষকতায় অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রচারের জন্য এই পর্বতগাত্রে দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল। সম্ভবত এই কাজে তৎকালীন মূর্তি তত্ত্বের কঠোরতা হ্রাস করে স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের সহায়তা নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া খোদায়ে নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের তৎকালীন তান্ত্রিক বৌদ্ধ শিল্পের প্রভাবও পড়েছিল। মূর্তিগুলি প্রথাসিদ্ধ রীতিতে নির্মিত হলেও আঙ্গিক ও পৌরাণিক বিষয়বস্তু উভয় দিকের বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। একদিকে

আদিম ধারা এবং অন্যদিকে ধ্রুপদী ধারায় এমন মিলন ভারতীয় শিল্পে বড়ো বিরল। পূর্ব ভারতীয় ভাস্কর্য যখন ক্রমেই ত্রৈমাত্রিক হয়ে উঠছে, সেই সময় ঊনকোটির ভাস্কর্যে দ্বিমাত্রিকতার উপস্থিতির তাৎপর্য অপরিসীম।[১৩]

প্রস্তর ভাস্কর্যের মতো ত্রিপুরার ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যও কম আকর্ষণীয় নয়। যে ১৮ টি ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, তারমধ্যে ১৪টিই বৌদ্ধ শিল্প প্রভাবিত। এখানের টেরাকোটা বা পোড়ামাটি শিল্পে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ধরা পড়েছে।[১৪]

ত্রিপুরার এই শিল্প সম্পদ শুধু রাজকীর্তির সন্ধান দেয় না, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একদিকে ত্রিপুরার ধর্মের সমন্বয়, অন্য দিকে জাতি-উপজাতির মিলনের ধারা।

সূত্র নির্দেশ

১) স্বপন সেনগুপ্ত, ত্রিপুরা প্রসঙ্গ, ১৯৭৫, আগরতলা, পাতা-১১।

২) Ramanimohan Sarma, Sources of the Social, Economic and Administrative History of Tripura (Ed. N. R. Roy), Calcutta, ১৯৮২, পাতা - ৪৭৫।

৩) W. W. Hunter, Statistical Account of Bengal, (Delhi Reprint), Vol. VI, পাতা-৪৬৩-৬৪।

৪) K. D. Menon, Tripura Dristrict Gazetteers, Agartala, ১৯৭৫, পাতা- ৭৪-৭৫।

৫) G. Sen Majumdar, Buddhism in Ancient Bengal, Calcutta, ১৯৮৩, পাতা- ১৩৬।

৬) Ratna Das, Art & Architecture of Tripura, Agartala, ১৯৯৭, পাতা- ৪০।

৭) J. Ganchaudhri, Tripura, the Land and its people, পাতা-৬৫।

৮) J.A.F, XVIII, No. ১-৪, Calcutta ১৯৭৬ পাতা-৬১।

৯) Kubjikā Tantra (Paṭala VII) manuscript No - ৩১৭৪ (RASB).

১০) প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য, ত্রিপুরার দেব ও দেবী, আগরতলা, পাতা-৩০।

১১) Ratna Das, প্রাগুক্ত, পাতা-৫৫।

১২) ঐ, পাতা-৫০।

১৩) মহাদেব চক্রবর্তী, ত্রিপুরা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন : সম্ভাবনা ও সমস্যা, জ্ঞান বিচিত্রা, দ্বাদশ সংখ্যা, জুন ১৯৯৬, পাতা-৫।

১৪) ঐ— পাতা-৭।

প্রাচীন ভারতের কৃষিদেবতা

রঞ্জিনি মুখার্জী

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কৃষিকে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের মধ্যে নানা সংস্কার ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। জীবিকার প্রধান তাগিদ ছিল কৃষিকাজ, সে কারণে দেবদেবীর পূজা, অনুষ্ঠান, আচার বিচার ব্রত নিয়ম প্রভৃতির অধিকাংশের উৎস ছিল কৃষি।

প্রাক বৈদিক যুগীয় প্রজনন শক্তি উপাসনার বিভিন্ন নিদর্শন যথা লিঙ্গ, যোনি, মাতৃকা দেবী পূজা, মহেন - জো - দারোতে প্রাপ্ত গর্ভস্থ বৃক্ষ সহ নারীমূর্তি, অরণ্যবাসী উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত সূর্যসংক্রান্ত যাদুবিদ্যা বা বৃক্ষোপাসনা থেকে মনে হয় এইসব কৃষি দেবতারা আদপেই বৈদিক দেবতা ছিলেন না। কৃষিদেবতা সংক্রান্ত ধারণাটি সম্ভবতঃ প্রাক -বৈদিক পর্বে অনার্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এইসব অনার্য দেবতারা ধীরে ধীরে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে স্থান লাভ করেছিলেন ভিন্ন নামে ও রূপে। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে বহু লৌকিক দেবতার মৌলিক রূপ ও আদিনাম পরিবর্তন ঘটেছে এমন কি শাস্ত্রীয় বলে প্রচারিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের একটি সুক্তে ক্ষেত্রপতি নামে এক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা। উক্ত দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত এই সুক্তে বলা হয়েছে - 'আমরা বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির সাথে ক্ষেত্র জয় করব, তিনি আমাদের গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন। হে ক্ষেত্রপতি, ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ধৃততুল্য, মাধুর্যোপেত ও প্রভূত জল দান কর।[১] গুহ্যসূত্রে লিখিত আছে যে লাঙ্গল দিয়ে চাষ আরম্ভ করবার পূর্বে এর প্রত্যেক ঋক্ উচ্চারণ করা কর্তব্য ।[২]

পুরাণ, তন্ত্র এবং কোনো কোনো মঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত ক্ষেত্রপাল একসময় বিশেষ জনপ্রিয় দেবতা হিসেবে কৃষককুলের দ্বারা পূজিত হতেন। যদি ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী ক্ষেত্রপাল দিকরক্ষক দেবতা, অনেকের অনুমান আর্য অনার্য ধর্ম সমন্বয় কালে শস্যদেবতা ক্ষেত্রপাল শাস্ত্রীয় দেবকুলে স্থান পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রামে বাঁশপূজা ও কয়েকটি বৃক্ষদেবতা ও শস্য দেবতার পূজা আজও প্রচলিত আছে যেগুলি অশাস্ত্রীয় দেবতা এবং আর্য পূর্বযুগীয় মনে করা যেতে পারে। সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে ঐ দেবকূলের এই দেবতার নাম ক্ষেত্রপাল হয়েছে।[৩] বৈদিক ক্ষেত্রপতি ও পুরাণ তন্ত্রে বর্ণিত ক্ষেত্রপাল একই দেবতার নামান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। পুরাণ ও তন্ত্রের বর্ণনানুযায়ী বহুক্ষেত্রে ক্ষেত্রপাল ভৈরব বা শিবের আকৃতিভেদ।

লিঙ্গপুরাণ ও স্কন্দপুরাণের বর্ণনানুসারে, এক সময় দেবী কালীর ক্রোধাগ্নিতে ত্রিভবন কাতর হয়ে পড়ে, তখন বিভুরুদ্র জগতের হিত সাধনার্থে বালরূপ ধারণ করেন। তিনি নিজের মুখ থেকে চৌষট্টিজন বালক সৃজণ করেন। বালরূপী মহেশ্বর এই চৌষট্টি জনের পঁচিশজনকে স্বর্গের, পঁচিশজনকে পাতালের আর চতুর্দশ জনকে মর্ত্তলোকের কৃষিভূমিগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন।[৪]

তন্ত্রশাস্ত্রে ক্ষেত্রপালকে ত্রিনয়ন বিশিষ্ট, জটাজুটধারী, সর্প শোভিত হস্তে নরকপাল, ও গদা, রক্তবর্ণ বস্ত্রধারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫] উপরোক্ত বিবরণ থেকে মনে হয় ক্ষেত্রপাল যেন দেবতা শিবের-ই প্রতিরূপ। কৃষির সঙ্গে শিবের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মঙ্গলকাব্য গুলিতে শিব স্বয়ং কৃষিকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যজুর্বেদের [৬] শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রকে ক্ষেত্রপতি বলা হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে[৭] শিবের একটি নাম ক্ষেত্রপাল বা ক্ষেত্রেশ।

বর্তমানে ক্ষেত্রপালের পূজা প্রায়, বিলুপ্ত হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গের দু একটি জেলায় ও চট্টগ্রামে চৈত্রসংক্রান্তির দিন ক্ষেত্রপালের বিশেষ পূজা আজও হয়।[৮] পশ্চিমবঙ্গের কিছুকিছু গ্রামে শিবলিঙ্গকে ক্ষেত্রপাল রূপে পূজা করা হয়ে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে কারিণে পূজা।[৯] সাধারণত সর্পভীতি দুর করার জন্য এই পূজা করা হয়ে থাকে। পুরাণেও সর্পভীতিদূরীকরণের সঙ্গে ক্ষেত্রপাল দেবতার বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লিখিত। পুরাণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিদ্ধেশ্বর তীর্থের পূর্বপ্রান্তে ক্ষেত্রপেশ্বর দেবকে পূর্ণিমার পঞ্চমী তিথিতে দর্শন করলে সর্পভীতি দূর হয়।[১০]

শক্তি উপাসনার সঙ্গে প্রজনন ও উর্বরতার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শবরজাতির মধ্যে দেবীপূজায় পশু ও নরবলি দানের যে প্রথা দেখা যায় তা সম্ভবত ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির কারণে করা হতো।[১১] নারী উর্বরতা শক্তির প্রতীক তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই কৃষি অর্থনীতি ও উৎপাদনে তার ভূমিকা সক্রিয়। এই কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই স্ত্রী দেবতাগণকে শস্যমাতা রূপে অর্চনা করা হয়ে থাকে। সর্বজনীন দেবী দুর্গাও শস্যের দেবী। পুরাণে তাঁর অপর একটি নাম শাকম্ভরী।[১২] কারণ অনাবৃষ্টির কালে তিনি স্বকীয় দেহ থেকে সমুৎপন্ন প্রাণধারক শাক দ্বারা অখিল লোককে পোষণ করেন। শস্যমাতা রূপে দেবী গৌরীর পূজা ভারতীয় নারীকূলের মধ্যে আজও সুপ্রচলিত। রাজস্থানে সধবা নারীরা সৌন্দর্য্য, সৌভাগ্য ও পুত্রসন্তান লাভের উদ্দেশে গৌরীব্রত পালন করেন।[১৩]

গ্রিসের ভিসিটার বা মিশরের আইসিস প্রমুখের মতো পৌরাণিক লক্ষ্মীদেবীও সাধারণত শস্যদেবী রূপে পূজিত এবং কৃষককূল দ্বারা সমাহৃত। রাজস্থানে দীপাবলী উৎসবের সময় কৃষকগর্ণ পীতবণ পক্ক শস্য শোভিত একটি মাপপাত্রকে লক্ষীরূপে পূজা করে

থাকেন।[১৪] বামনপুরাণে [১৫] দেবী লক্ষীকে পীতবসনা ও কনকাঙ্গী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এই পীতবর্ণ পক্ক শস্যের প্রতীক।

পশ্চিমবঙ্গে আশ্বিন অথবা কার্তিকমাসের পূর্ণ শুক্ল পক্ষে কোজাগরী লক্ষীপূজা হয়। কোজাগরী শব্দের অর্থ ' কে জাগে ? সম্ভবত শস্যকর্তনের আগের পর্বে কৃষকদের সারারাত্রিব্যাপী জাগ্রত থেকে ফসল পাহারা দে বার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা থেকে কোজাগরী লক্ষীপূজার উদ্ভব হয়েছিল। এই পূজার দিন সারারাত্রিব্যাপী জাগরণের রীতি আজও প্রচলিত।

মহেন-জো-দারোতে প্রাপ্ত গর্ভস্থ বৃক্ষসহ নারীমূর্তিকে লক্ষী বলে মনে করে লক্ষীর উপাসনাকে কেউ কেউ প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিয়ে যেতে চান ।[১৬] কোজাগরী লক্ষীপূজার রীতিতে অনেকটা আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব আছে। শুয়োরের দাঁত, হলুদ সিঁদুর মাখানো ডাব, পেঁচা ও ধানছাড়া এ কয়টিই অনার্য ও অহিন্দু রীতি থে কে এসেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১৭] অশোকের মতে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের উত্তরপশ্চিমাংশে এবং বিহার প্রদেশের ধলভূম সিংভূমের লৌকিক দেবী টুসুর পূজা শস্যদাত্রী লক্ষীর।[১৮] ধানের খোসা বা তুষ শব্দটি থেকে তুষু বা টুসু শব্দের উদ্ভব। অবশ্য কেউ কেউ একে গঙ্গাদেবীর পূজাও মনে করেন।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের ভাববাদী চিন্তাধারা শস্যমাতাকে শস্যদেবী লক্ষীরূপ পরিণত করেছে এবং লক্ষী থেকে তার পতি বিষ্ণু বা নারায়ণ উপাসনা এসে স্থানলাভ করেছে নবান্ন উৎসব বা শস্যকর্তন পর্বে।

কৃষিকার্যের সাফল্যে সিদ্ধিদাতা গণেশেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। তাঁর একদন্ত ও সূর্পকর্ণ এদুটি বৈশিষ্টই কৃষির সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কারো কারো মতে গণেশের একদন্ত কৃষির অন্যতম হাতিয়ার লাঙলের ফলার প্রতীক।[১৯] অন্যদিকে সূর্প শব্দের অর্থ কুলা, শস্যকর্তনের পরবর্তী পর্য্যায়ে ধান চাল ঝাড়াবাছার জন্য যার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। গণেশের হস্তধৃত হাতিয়ার সমূহ যেমন মুষল, লাঙ্গল, কুঠার কৃষির প্রয়োজনীয় যন্ত্র। দাড়িম্ব ও মোদক উর্বরতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক। গণেশের হস্তীমুখ ও তাঁর বাহন মুষিকের ও বিশেষ তৎপর্য্য আছে, এরা উভয়েই কৃষির শত্রু। সম্ভবত হস্তী ও মুষিকের অত্যাচার থেকে শস্যরক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাবশতঃ এই দেবতার উদ্ভব হয়েছিল।অবার গণেশের হস্তীমুখ ও বাহন মুষিককেঅনেকে অনার্য কৃষ্টির দান বলে মনে করেন।[২০] হয়তো দুর অতীতের কোনো আদিম কৌমের টোটেনের নিদর্শন এগুলি। কোনো কোনো পণ্ডিত গবেষকের মতে রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুর ও বৃষ্টিপাত তথা শস্যের দেবতা। [২১] মিশরের শস্যদেবতা ওসাইরিস ও তাঁর ভগিনী আইসিন দেবীর উপাখ্যান, পূজাপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজার সঙ্গতি আছে।

অনেকসময় মনে করা হয় ধর্মঠাকুর আদিতে ছিলেন অরণ্যবাসী অনার্য দেবতা। পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাদের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের সমাবেস ঘটে। সম্ভবত বর্ষণ ও কৃষির সহায়ক ভূমিকাটি অরণ্যবাসী উপজাতিদের দান।[২২]

কৃষিজীবী সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও উপকারী দেবতা সূর্য। সেইজন্য প্রায় প্রত্যেক আদিম সমাজে যথা ওঁরাও কোল মুন্ডা সাঁওতাল বীরহোর মালপাহাড়িয়া প্রভৃতিদের মধ্যে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত আছে। সূর্যসংক্রান্ত যাদুবিদাগুলি ফসল ফলানোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেইজন্য যখনই অনাবৃষ্টি দেখা দিতো তখনই সমাজে সূর্যদেবতার পূজা করে কিংবা ঐন্দ্রজালিক উপায়ে তুষ্ট করে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়াস দেখা যেতো।

এই সূর্যসংক্রান্ত যাদুবিদ্যাগুলি পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠানে এসে মিশ্রিত হয়েছে বলে কারো কারো অভিমত। অনাবৃষ্টিকালে সূর্যদেবতার প্রতীককে জলে নিমজ্জিত করে বৃষ্টিপাত করার চেষ্টা অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। ঘরভরা পূজা উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বাণেশ্বরের স্নান ধর্মপূজার একটি বিশেষ অঙ্গ।[২৩]

মিত্র সূর্যেরই এক নাম। মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের রমনী কুলের মধ্যে অগ্রহায়ণমাসে যে ইতু পূজার প্রচলন আছে তা বৈদিক দেবতা মিত্রের পূজার নামান্তর বলে সাধারণত মনে করা হয়।[২৪] কর্দমপূর্ণ একটি পাত্রে শস্যচারা রোপণ করে সাধারণতঃ ইতুপূজা হয়। পক্বশস্য প্রাদনের দ্বারা সর্বজনের মিত্রতা অর্জনের জন্য সূর্য সাধারণতঃ মিত্ররূপে পূজিত হতেন।

ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, মিত্র মেঘগর্জনের দ্বারা বর্ষণের সূচনা করে, কৃষকগণকে কৃষিকার্যে প্রবর্তিত বা প্রযত্নবান করেন। মিত্র পৃথিবী ধারণ করেন, বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা অন্ন সম্পাদন করে।[২৫] মিত্র ও ইতুপূজার অভিন্নতা সকলে স্বীকার করেন না। প্রকৃতপক্ষে লৌকিক ইতুপূজা উর্বরতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ ধরণের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান যা সূর্য সংক্রান্ত যাদুবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।[২৬]

লৌকিক সূর্যপূজাকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি ও উর্বরতার সঙ্গে সম্পর্কিত যে সব অনুষ্ঠান পালন করা হয় তার মধ্যে মাঘমাসে মকরসংক্রান্তি, বিহারের ছট্‌পরব, তামিলনাডু ও অন্ধ্রপ্রদেশের পোঙ্গাল অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক দেবতা ইন্দ্রও কৃষির দেবতা। তিনি বর্ষণের দ্বারা ভূমিকে হলকর্ষণের যোগ্য করে তোলেন।[২৭] সীতা বা কর্ষণরেখা ইন্দ্রের পত্নী। ঋগ্বেদেই [২৮] সীতা কৃষির দেবতাতে পরিণত হয়েছেন। অত্যন্ত সঙ্গত কারণে কৃষিদেবী কর্ষণের দেবতা ইন্দ্রের পত্নীরূপে গৃহীত হয়েছেন। ইন্দ্র ও সীতা অবশ্য পরবর্তীকালে রামসীতায় পরিণত হয়েছেন। বর্তমানকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে লৌকিক কৃষিদেবতাদের পূজা প্রচলিত আছে।

সম্ভবত কৃষিনির্ভর দেশ বলেই এদেশের কৃষি দেবতাদের বিশেষ প্রাধান্য আছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ণজিত কার্তিক মাসে কার্তিক,[২৯] ভাদ্রমাসে ভাদু,[৩০] অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রঠাকুর ও ঠাকুরাণী, [৩১] ইক্ষুচাষের দেবতা পণ্ড্রাসুর, [৩২] হিমালয় অঞ্চলের ক্ষেত্রদেবী [৩৩] এবং কুর্গ ও মালাবার অঞ্চলের দেবতা ক্ষেত্রাপ্পার [৩৪] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুর্গ অঞ্চলে ক্ষেত্রপার পূজা উপলক্ষ্যে ধানভর্তি মাটির পাত্র দেবতাকে অর্ঘ হিসেবে প্রদান করার রীতি প্রচলিত আছে।[৩৫]

তবে ভারতীয় মানসিকতার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী অধিকাংশ কৃষিদেবতাদের শিবের সঙ্গে এবং কৃষিদেবীদের দেবী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। অবশ্য, পশ্চিম- বঙ্গের কোনো কোনো বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত অঞ্চলে তিনি বৈষ্ণব দেবতার রূপ পরিগ্রহ করেছেন, যেমন দেবী লক্ষী ও সঙ্কর্ষণ বা বলরাম। বলরামের বিশিষ্ট আয়ুধ কৃষিযন্ত্র লাঙল। তাঁর মুষল ও শস্যপেষণ যন্ত্র হতে পারে।

সূত্র নির্দেশ

১) ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেষ জয়ার্মাস
গামশ্বং পোষয়িত্মা স গো মুলাতীদৃসে
ক্ষেত্রস্য পতে মধুসন্ত সূর্যিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধৃক্ষব ঋগ্বেদ /৪৫৭, ১-২, বঙ্গীয় সংস্করণ রমেশ চন্দ্র দত্ত

২) তদেব, টীকা।

৩) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃ - ২০৮

৪) লিঙ্গপুরাণ, ১০৬ - ১৫ - ২৮, স্কন্দপুরাণ, ৬২ - ১৫- ১৬, বঙ্গীয় সংস্করণ, পঞ্চানন তর্করত্ন, দি সৈবাইট ডেটি ক্ষেত্রপাল, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়াটার্লি খন্ড - ৯, ১৯৩৩, পৃঃ ২৩৮।

৫) বৃহৎ তন্ত্রসার পৃ ২৯০, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, বঙ্গীয় সংস্করণ, রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৬) শুক্ল যুজু ১৬/১৮ সম্পাদনা, দুর্গাদাস লাহিড়ী।

৭) শারদা তিলক ১৮/৪১ সম্পাদনা অর্থার এভলিন.

৮) গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা - পৃ ২০৮।

৯) পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ওমেলা, দ্বিতীয় খন্ড।

১০) স্কন্দপুরাণ (প্রভাসখন্ড, প্রভাস ক্ষেত্র মাহাত্ম্য) ১৮১, ১-৩।

১১) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় পর্ব পৃ ২৫১।

১২) ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাটধারকৈঃ
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহং ভুবি। মার্কন্ডেয় পুরাণ ৯১/৪৩-৪৪, বঙ্গীয় সংস্করণ পঞ্চানন তর্করত্ন

১৩) জে টড্, এ্যানালস এ্যান্ড এ্যান্টিকোয়ারীজ অফ রাজস্থান, পৃ ৪৫৪-৪৫৫

১৪) তদেব পৃ ৪৭৫।

১৫) বামনপুরাণ, ৭৫/২৮ বঙ্গীয় সংস্করণ পঞ্চানন তর্করত্ন।

১৬) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় পর্ব, পৃ ১০২, অ্যান্টিকুইটি অফ দি কনসেপট অফ লক্ষী - বি চ্যাটার্জি।

১৭) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী - পৃ - ২০ - ২১।

১৮) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, তদেব, পৃ ১৫৫।

১৯) এ গেইটি গণেশ, পৃ-৩, বি.এ গুপ্তে, হার্ভেস্ট ফেস্টিভ্যাল ইন হনার অফ গৌরি এ্যান্ড গণেশ, দি ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারী, ১৯০৬ - পৃ-৬৩।

২০) এ গেইটি, গণেশ, পৃ - ১ , হরিদাস মিত্র গণপতি, পৃ -৩১।

২১) অমলেন্দু মিত্র, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর -পৃ-৯৯।

২২) পি কে মহাপাত্র - ফোক, কালট অফ বেঙ্গল পৃ-১২৪-১২৫।

২৩) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পৃ - ৬৫৩।

২৪) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী, প্রথম পর্ব।

২৫) ঋগ্বেদ ৩।৫৯।১, বঙ্গীয় সংস্করণ, রমেশ চন্দ্র দত্ত

২৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য, দি সান এ্যান্ড দি সারপেন্ট লোর - পৃ - ৪২।

২৭) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ - ২৬৪।

২৮) ঋগ্বেদ ৪।৫৭।৬-৭ ।

২৯) আশুতোষ ভট্টাচার্য, আ: ফোকলোর অফ বেঙ্গল, পৃ-৪২।

৩০) তদেব।

৩১) তদেব।

৩২) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা পৃ - ২০৮।

৩৩) ক্রুক, দি পপুলার রিলিজিয়ন এ্যান্ড ফোকলোর অফ নর্থ ইন্ডিয়া - পৃ ৬৫-৬৬।

৩৪) এম এন শ্রীনিবাস, রিলিজিয়ন এ্যান্ড সোসাইটি অ্যামং দি কুর্গস অফ সাউথ ইন্ডিয়া - পৃ- ২১৫।

৩৫) তদেব।

কলিবর্জ্য ঃ প্রাচীন ভারতের একটি কৌতুহলোদ্দীপক তত্ত্ব

দূর্ব্বা আইন (দাস)

'কলিবর্জ্য' বলতে বোঝায় কলিযুগে বর্জনীয় কিছু রীতিনীতিকে। পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র অনুশাসনমূলক রচনায় এই ধরণের রীতি-নীতি লিপিবদ্ধ আছে। ভারতীয় ধারণায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি — এই চারযুগের মধ্যে নিকৃষ্টতম হ'ল কলি এবং কলিযুগে অত্যন্ত সমস্যা-সংকুল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে — এরকম একটি ধারণা করা হয়েছে। অনেকে গুপ্ত/গুপ্তোত্তর যুগ অর্থাৎ পঞ্চম/ষষ্ঠ শতক থেকে ত্রয়োদশ/চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সময়কে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। কলিযুগের ধারণার সঙ্গে কলিবর্জ্যের তত্ত্বটি সম্পর্কিত। বিভিন্ন অনুশাসনমূলক গ্রন্থে(আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, বৌদ্ধায়ণ ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা, পরাশরস্মৃতি ইত্যাদি) কলিবর্জ্যর উল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে আছে *উদ্ধারবিভাগ* (জ্যেষ্ঠপুত্রকে সমগ্র সম্পত্তি বা অধিকাংশ প্রদান), নিয়োগ (দেবর বা ভাসুর কর্তৃক ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন), বিধবাদের পুনর্বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সগোত্র বা সপিন্ড নারীর সঙ্গে বিবাহ, একান্ত প্রয়োজন হলেও হীনকাজে রত ব্যক্তির কাছ থেকে খাদ্যগ্রহণ না করা, সমুদ্রযাত্রা, *সত্র* (এক ধরণের দীর্ঘকালীন যজ্ঞ), গোহত্যা ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ প্রথিতযশা পণ্ডিত পি.ভি. কানে কলিবর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত ৫৫ টি রীতি/ ক্রিয়া-কলাপের উল্লেখ করেছেন।[১]

'কলিবর্জ্য' বিষয়ক আলোচনা কয়েকটি কারণে বিশেষ আকর্ষণীয়। কলিবর্জ্যের ধারণা প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতে চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতার প্রাধান্য ছিল এবং সামাজিক রীতি-নীতি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীলতার প্রাধান্য ছিল এবং সামাজিক রীতি-নীতি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। 'কলিবর্জ্য' বলতে যে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলিকে কলিযুগে বর্জনীয় বলা হয়েছে অর্থাৎ আগে তা প্রচলিত ছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে প্রাচীন ভারতে সমস্ত কিছুই অচল অনড় ছিলো না।

আগেই বলা হয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই দীর্ঘ সময় ধরে তা একেবারে অপরিবর্তিত আকারে ছিল না। কলিবর্জ্যের ধারণার মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছে । এই প্রসঙ্গে 'সমুদ্রযাত্রা'র কথা উল্লেখ করা যায় । বৌধায়ণ ধর্মশাস্ত্র(খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ - দ্বিতীয় শতক)-এ কলিবর্জ্যকে যতটা কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে, পরবর্তীকালীন গ্রন্থ মনুহংহিতায় (খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক - খ্রিঃ দ্বিঃ শতক)

সেই প্রাবল্য অনেক কম। বৌধায়ণ সমুদ্রযাত্রাকে জাতিনাশের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন এবং প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিয়েছেন :—

(পতণীযাতি পতন্মার্হাণি কর্মাণি মহাপাতকেভ্য ইষন্ন্যুনাণি কাণি পুনস্তানি? / সমুদ্রসংযানাম্, ব্রহ্মস্বণ্যাসাপহরণম্ / ভূম্যনৃতম / সর্বপণ্যৈর্ব বহরণম্ / শুদ্রসেবনম্ / শুদ্রাভিজননম্ / তদপত্যত্বংচ / এযামব্যতমতকৃত্বা চতুর্থকালামিতভোজিতসসুৎসসবনানুকল্পম/ স্থানাসনাভ্যাং বিহরন্ত এতে তৃভিবর্ষৌস্তিদপহন্তি পাপম্)।। (প্রশ্ন ২, অধ্যায় ১, কন্ডিকা ২।[২]

কিন্তু মনু বলেছেন, যে ব্রাহ্মণ সমুদ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন তিনি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে পারবেন না :—

(অগরদাহিগরদ ঃ কুন্দসি সোমবিক্রঃয়ি / সমুদ্রযায়ি বন্দি চ তোলকঃকুটকরকঃ)। (৩/১৫৮)[৩]

তবে 'কলিবর্জ্য' বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় যে এইগুলিই যে প্রকৃতই বাস্তবে পালন করা হত তা নয়। কারণ এই গ্রন্থগুলি অনুশাসনমূলক অর্থাৎ 'কি করা উচিত' তই বলে, 'কি করা হত' তা বলে না। বরং বহুক্ষেত্রে দেখা যায় অনুশাসনের সঙ্গে বাস্তবের বড় অমিল। যেমন, সমুদ্রযাত্রাকে যে সময় নিষিদ্ধ বলা হয়েছিলো সেই সময় সমুদ্রযাত্রা যে হত তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় সাহিত্যে ও লেখ থেকে। লোহিতসাগর থেকে প্রাপ্ত খ্রিষ্ট্রীয় দ্বিতীয় শতকের একটি তামিল-ব্রাহ্মী লেখ থেকে চট্টননামক এক ব্যক্তির কথা জানা যায় যিনি ঐ অঞ্চলে বাস করতেন।[৪] ঐ সময়েই আর একটি প্রকৃত-ব্রাহ্মী লেখ পাওয়া গেছে ইজিপ্ট (মিশর) থেকে যেখানে বেশ কিছু ভারতীয় নাম পাওয়া গেছে — বিহ্নদত্ত (সম্ভবত বিষু দত্ত), জালক, নাকদ (সম্ভবত নাকদত্ত)[৫]। আরেকটি গ্রিক লেখ পাওয়া গেছে নীলনদ উপত্যকার ওয়াদিমিয়াহ্ থেকে যেখানে একটি নাম পাওয়া গেছে — সোফন (সম্ভবত সুভানু)[৬]। মালয় উপদ্বীপ থেকে পাওয়া ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি লেখতে মহানাবিক বুদ্ধ গুপ্তের নামোল্লেখ আছে যিনি রক্তমৃত্তিকা (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ) তে বসবাস করতেন[৭]। এই তথ্যগুলি প্রমাণ করে যে ভারতীয়রা সমুদ্রবাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতেন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার এই ব্যাপারটিকেই প্রমাণ করে।

আরোও একটি তথ্য পাওয়া যায় ফ-হিয়েনের বিবরণী থেকে (৩৯৯-৪১৪)। তাম্রলিপ্ত থেকে ফেরার সময়ে তিনি যে জাহাজে শ্রীলঙ্কায় যান সেখানে তার সঙ্গী ছিলেন বেশ কয়েকজন ভারতীয় বণিক।[৮]

এইভাবে বলা যায়, কলিবর্জ্যের ধারণাটি কোন সর্বজনসম্মত তত্ত্ব নয়। এই ধারণার প্রাবল্য বা শিথিলতার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য দেখা যায় হয়তঃ তার কারণ হিসাবে কাজ

করেছিল সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি। আর একথাত স্বতঃসিদ্ধ যে অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি — কোন কিছুই এককভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে না, সমস্ত কিছু মিলেমিশে একে অপরের উপর প্রভাব তৈরি করে এবং সবকিছুর সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক অবস্থা (টোটাল সেট-আপ) তৈরি হয়।

সুতরাং 'কলিবর্জ্য' বিষয়ক পর্যালোচনা শুধুমাত্র ধর্মীয় বা সামাজিক জীবনকে দ্যোতিত করে না , তৎকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকেও তা আভাষিত করে। কলিবর্জ্যের তালিকাভুক্ত ৫৫টি বিষয়কে আলাদা-আলাদাভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এগুলোর কোনটি সামাজিক, কোনটি অর্থনৈতিক, কোনটি ধর্মীয়, কোনটি আইগত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে কলিবর্জ্যের ধারণা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এমন একটি তত্ত্ব বা তথ্য যা সামগ্রিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন পদ্ধতিকে আভাষিত করে।

সূত্র নির্দেশ

১) পি.ভি. কানে, *হিষ্ট্রি অব ধর্মশাস্ত্র*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, তৃতীয় খন্ড, পুনা. ১৯৭৪, পৃঃ৯২৬-৯২৮।

২) ডঃ উমেশ চন্দ্র পান্ডে, *দি বৌধায়ণ ধর্মসূত্র উইথ দি কমেন্টারী বাই গোবিন্দস্বামী*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বারানসী, ১৯৭৪ পৃঃ ৯।

৩) মথুরানাথ তর্করত্ন, *মনুসংহিতা*, কলকাতা, ১৯৩১।

৪) হিমাংশুপ্রভা রায়, 'ট্রেড অ্যান্ড কনট্যাক্টস' ইন রোমিলা থাপার (এড.) *রিসেন্ট পার্সপেক্টিভ অব আর্লি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি*, ১৯৯৫, পৃঃ ১৩২ - ১৪৫।

৫) আর সলোমন, *এপিগ্রাফিক রিমেন্স্ অব ইন্ডিয়ান ট্রেডার্স ইন ইজিপ্ট*, জার্নাল অব্ দি অ্যামেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, ১৯৯১, পৃঃ ৭৩১ - ৭৩৬।

৬) তদেব।

৭) ডি.সি.সবকার, *সিলেক্ট ইনস্‌ক্রিপশনস্*, প্রথম খন্ড, করকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৪৯৭।

৮) এম্, এম্, রেমুসাট্, ক্লাপ্রোথ এন্ড ল্যান্ড্রেসে, *দি পিলগ্রিমেজ অব ফ-হিয়েন*, নিউ দিল্লী, ১৯৯০, পৃঃ ৩৬০ -৩৬১।

প্রাচীন ভারতে ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম—একটি বিশ্লেষণ।

কৃষ্ণেন্দু রায়

সমাজবদ্ধ মানুষের অতীতাশ্রয়ী জীবন চর্যায় পরার্থিতার ভূমিকা স্মরণাতীতকাল থেকেই স্বীকৃত। প্রসঙ্গতঃ দান ও সদয়তার ভূমিকা নিয়ে নানা মুনি নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন— পি.ভি.কানে, কে.ভি.আর আইঙ্গার, আর. সি.হাজরা, মার্সেল মস্, এমিলি দুর্খ্যাঁ প্রমুখদের নাম উল্লেখ্য [১]। ভারতবর্ষেও সুপ্রাচীন কাল থেকে দান ও তার অপরিহার্য অংশদাতা, প্রতিগ্রহিতা, শ্রদ্ধা, দান সামগ্রীর উপযুক্ততা, স্থান ও কাল[২] — নিয়ে নানা আলোচনা পাওয়া যায়। এই দান সংস্কৃতির-ই, যাকে বিশিষ্ট পরিভাষায় 'দেয়ধর্ম' আখ্যায়িত করা যেতে পারে, একটি বিশিষ্ট দিক হল *ইষ্টাপূর্ত্ত*। প্রাচীন ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও *ইষ্টাপুর্ত্ত* কর্মের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই বিষয়টিকে নেড়েচেড়ে দেখাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ইষ্টাপূর্ত্ত শব্দটির দুটি অংশ — *ইষ্ট* ও *পূর্ত্ত*। *ইষ্ট* বলতে মহত্তর মঙ্গল বা সুবিধা সুনিশ্চিতকরণের ইচ্ছায় কোন কিছু ত্যাগ বা যজ্ঞানুষ্ঠান করা বোঝায়। ঋগ্বৈদিক যুগের (আঃ খ্রিঃ পূঃ ১২০০ অব্দ — আঃ খ্রিঃ পূঃ ১০০০ অব্দ) প্রথমদিকে যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ইচ্ছার্থে *ইষ্টি* শব্দের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় [৩]। জানা যায় উক্তযুগের শেষ দিকে *ইষ্টাপূর্ত্ত* ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত ফলের সাথে মিলিত হয়ে স্বর্গলাভের ইচ্ছা মানুষ পোষণ করত (... *সংযমেনে-ষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্*) [৪]।

অথর্ববেদেও (আঃ খ্রিঃ পূঃ ১০০০ অব্দ - আঃ খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দ) ইচ্ছার্থে *ইষ্ট* শব্দের ব্যবহার আছে [৫]। অর্থাৎ ব্যক্তিগত পুণ্যার্জনার্থে বা হিতার্থে অনুষ্টেয় ক্রিয়াকর্মকে *ইষ্ট* পরিভাষায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। লক্ষণীয় ইষ্টসাধনের বিষয়টি ছিল ব্যক্তিগত।

কিন্তু *পূর্ত্ত* বলতে বাপী, কূপ, তড়াগ, পুষ্করিণী খনন, দেবায়তন নির্মাণ, অন্নপ্রদানকে বোঝানো হয়ে থাকে। *পূর্ত্তের* মধ্যে নিহিত পরার্থিতার এই ভাবের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় *কঠোপনিষদে*। সেখানে বলা হয়েছে যে, কোন গৃহস্থের ঘরে যদি কোন ব্রাহ্মণ - অতিথি অনাহারে থাকে, তবে সেই গৃহস্থ কূপ, পুষ্করিণী খনন করে দিলেও সেসবের ফল নষ্ট হয়।[৬] *পূর্ত্ত* শব্দের তাই একটি অর্থ করা হয়েছে কর্তব্য পালন। এই কর্তব্য পালন বাহ্যতঃ বলা যেতে পারে সমাজের মানুষের স্বার্থে করা হত। কাজেই সমাজে বসবাসকারী মানুষের হিতার্থে অনুষ্ঠাতব্য ক্রিয়াকর্মকেই *ইষ্টাপূর্ত্ত* শব্দের সারর্থ করা যেতে পারে।

সদৃশ অর্থ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও (আঃ খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতক) পাওয়া যায়—*ইষ্টাদিভ্যশ্চ*[৭] যার মর্মাথ হল জনহিতকর কর্মানুষ্ঠান।

রামায়ণেও[৮] (আঃ খ্রিঃ পূঃ ২য় শতক - আঃ খ্রিঃ ২য় শতক)কূপ, তড়াগাদি খনন ইত্যাদি জনহিতকর কার্যাবলীকে *ইষ্টাপূর্ত্ত* বলা হয়েছে। সমসাময়িক গ্রন্থ *মনুসংহিতা* থেকেও (আঃ খ্রিঃ পূঃ ২য় শতক - আঃ খ্রিঃ ২য় শতক) জানা যায় যে সদুপায়ে অর্জিত ধনদ্বারা পুষ্করিণী খননাদি জনহিতকর কার্যানুষ্ঠানকে *ইষ্টাপূর্ত্ত* হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং ইষ্টাপূর্ত্তানুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ অক্ষয় ফল লাভ করত (*শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ। শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতের্ধনৈঃ*[৯]। *মার্কণ্ডেয়পুরাণে* (আঃ খ্রিঃ পূঃ ৩য় শতক - আঃ খ্রিঃ ৫য় শতক) বলা হয়েছে যে, গৃহস্থের নিকট থেকে পিতৃগণ বা দেবতাগণ বিমুখ হয়ে ফিরে গেলে, সেই গৃহস্থের *ইষ্টাপূর্ত্ত* উভয় ধর্মই নষ্ট হয় (*যতস্থে বিমুখা যান্তি বিশ্বস্য গৃহমেধিনঃ। তস্মাদিষ্টশ্চ পূর্ত্তশ্চ ধর্ম্মৌ দ্বাবপি নশ্যতঃ*)[১০]।। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মাননীয়/বরণীয় ব্যক্তিদের আপ্যায়ন অনষ্ঠানকেও *ইষ্টাপূর্ত্তের* সমার্থক বিবেচনা করা হয়েছে। *অগ্নিপুরাণেও* (আঃ খ্রিঃ পূঃ নবম শতক) বলা হয়েছে যে, বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবায়তন, অন্নপ্রদান প্রভৃতি *ইষ্টাপূর্ত্তের* অনুষ্ঠানে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয় (.... *দানমিষ্টং তথা পূর্ত্তং ধর্মং কুর্বন্ হি সর্বভাক্। বাপী-কূপ-তড়াগানি দেবায়তনানিচ*[১১]।। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এটি জনহিতকর কার্যানুষ্ঠানকে তরান্বিত/ উৎসাহিত করার উদ্যোগ।

উপরোক্ত আকর গ্রন্থসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোক এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, *ইষ্টাপূর্ত্ত* কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে শুধুমাত্র সমাজস্থ মানুষের উপকার করাই নয়, কূপ, তড়াগাদি খনন এবং বৃক্ষাদি রোপন করে কৃষিজ অর্থনীতিকে অপেক্ষাকৃত মজবুত করে তোলার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল।পান্ডুরাং বিমান কানে দেখিয়েছেন যে, ইষ্ট ও *পূর্ত্ত* সকল দ্বিজাতির নিকট সাধারণ ধর্মাচরণ (*ইষ্টাপূর্ত্তৌ দ্বিজাতীনাং ধর্মঃ সামান্য ইষ্টতে।*), কিন্তু *পূর্ত্ত* কর্মানুষ্ঠানে অধিকার শূদ্রের (*অধিকারী ভবেচ্ছুদ্রো পূর্ত্তে ধর্মে*)[১২]। তবে *পূর্ত্ত* কর্মানুষ্ঠানে বৈশ্য বর্ণের মানুষেরাও অংশ নিয়েছিল। এবার সেদিকে নজর দেওয়া যাক্।

।। ২।।

নিম্নপেশার মানুষেরা যেমন জেলে (*দাসক*) ও মালাকারেরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে গুহাদান করত বলে জানা যায়। অর্থাৎ তাদের পূর্ত্তদান করার মত আর্থিক সামর্থ ছিল। এই আর্থিক সমৃদ্ধি তাদেরকে রাজকীয় মর্যাদাও এনে দিয়েছিল। *চুল্লকসেট্টিজাতকে* (আঃ খ্রিঃ পূঃ ২য় শতক) *রাজকুম্ভকারের*[১৩] উল্লেখ রয়েছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে রাজশিল্পীর [১৪]উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ নিম্নপেশাদারী হয়েও এইসব মানুষেরা সামাজিক মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল; রাজকীয় স্বীকৃতিও পেয়েছিল।

জগয়পেটা স্তম্ভলেখ থেকে জানা যায় যে, কারিগরেরা নিজেদের পেশাঅনুযায়ী *আবেশনিন* বলে পরিচয় দিত এবং এই হিসেবেই বেলাগিরি গ্রামে ভগবান বুদ্ধের

মহাচৈত্যের পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারে পাঁচটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিল (*আয়কখম্ভ*)[১৫]। লক্ষণীয় যে, কারিগরেরা এরূপ পূর্ত্তকর্মের মাধ্যমে শূদ্র হিসেবে নয়, সমাজে সুনির্দিষ্ট পেশাদার হিসেবে পরিচিত হয়েছিল।

জৈন মন্দির (*অর্হতায়তন*) জৈনসাধুদের পূজার্থে মা, মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজন সহ সম্পূর্ণরূপে এক গণিকা পরিবার একটি মন্দির(*দেবিকুল*), একটি শ্রদ্ধানিবেদন কক্ষ (*আয়াগসভা*),একটি বড় জলাশয় (*প্রপা*) নির্মাণ করে দিয়েছিল, অর্হতদের পূজার্থে শিলাপটও দান করেছিল[১৬]। পূর্ত্তদানে বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের মানুষছাড়াও গণিকারা যে অংশগ্রহণ করত, এটি তার একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

এবার বৈশ্যবর্ণের লোকেদের পূর্ত্তদান সংক্রান্ত কর্মানুষ্ঠান বিচার করা যাক্।

অমরাবতী লেখমালা [১৭] থেকে জানা যায় যে, সুগন্ধীদ্রব্যের বণিকেরা (*গন্ধকবণিয়*) বৌদ্ধ *বিহার* নির্মাণ করে দিয়েছিল। এরকম পেশাদার - নির্মিত বৌদ্ধবিহারের খবর পাওয়া যায়। মথুরা লেখমালা থেকে জানা যায় যে, সুবর্ণকারেরা, আবরণ প্রস্তুত কারেরা বৌদ্ধ *বিহার* নির্মাণ করে দিয়েছিল (*সুবর্ণকার - বিহার, প্রাবারিক - বিহার*)[১৮]।

আলোচ্য সময়ে বণিকেরা ব্রাহ্মণ্য সাধুদের জন্য বিশ্রামাগার, আরামকক্ষ,পানীয় জলাশয় নির্মাণ করত বলে জানা যায় (...... *বিশ্রামাগারানাং চ আরামতড়াগোদ - পান - করেণ*)[১৯]।

রাজা সোড়াসের সময়কার(১৫খ্রিঃ) মথুরা লেখমালা থেকে জানা যায় যে, তাঁর কোষাধ্যক্ষ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য একটি *তড়াগ* (উদপান), একটি *আরাম*, একটি স্তম্ভ ও একটি শিলাপট্ট দান করেন[২০]। বৃক্ষরোপনকে শুধুমাত্র জনহিতকর - ই - নয়, আধ্যাত্মিক পুণ্যার্জনের উপায় হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে [২১]।

রাজাধিরাজ দেবের একটি তামিল লেখ থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে তিরুক্কচ্ছুর গ্রামে অবস্থিত মন্দিরে পূজার্চনা ও বাতিদানের ব্যবস্থা উক্ত অঞ্চলের তেল ব্যবসায়ীরা করেছিল। লক্ষণীয় বিষয় হল উক্ত তেল ব্যবসায়ীরা উক্ত কর্তব্য *জাতিধর্ম* হিসেবে পালন করতেন [২২]। অর্থাৎ এই কার্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে তেল ব্যবসায়ীরা নিজেদের পেশা অপেক্ষা জাতিগত ভাবে সমাজে পরিচিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত বেশি আগ্রহী ছিলেন।

॥ ৩ ॥

বলা যেতে পারে, পরিবর্তিত আর্থ - সামাজিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে(আঃ খ্রিঃ পূঃ ১০০০ অব্দ — আঃ খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দ) ব্যক্তিগত পুণ্যার্জন জনিত কর্মানুষ্ঠান বা ইষ্টসাধনের ধারণা ধীরে - ধীরে বহুজনের হিতার্থে পূর্ত্ত কর্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়। এ কথা সর্বজনবিদিত, বর্ণ বিধির কঠোর অনুশাসনে রেখে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের, বিশেষ করে নিম্ন পেশার মানুষদের সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে রেখে ছিলেন।

কিন্তু পরিবর্তিত আর্থিক প্রেক্ষাপটে বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মানুষেরা আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে নানাবিধ পূর্তকর্মের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেছিল। বর্ণ সংক্রান্ত কঠোরবিধিনিষেধ শিথিল হয়েছিল বলা যেতে পারে। বৈশ্য বর্ণের কন্যাকে দুই উচ্চতর বর্ণে বিবাহ দেওয়া যেত [২৩]। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুষ্ঠানেও শূদ্র বর্ণের লোকেদের অংশগ্রহণের সামাজিক অনুমোদন ছিল, *মনুসংহিতায়* এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

।। ৪ ।।

বর্তমান আলোচনায় এভাবে ইতিটানা যেতে পারে। শাস্ত্রীয় বচন অনুসারে পূর্তকর্ম শূদ্রদের পক্ষে প্রশস্থ এবং ইষ্টকর্মে অধিকার কেবলমাত্র দ্বিজাতির। পূর্তকর্মের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নিতেন। পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থানও তাদের অবশ্যই ছিল। পূর্তকর্ম যদি বিশেষত শূদ্রদের আচরণীয় বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকে, তবে এই জনহিতকর কার্যানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ তাবা পেত দ্বিজাতির সেবার অতিরিক্ত কোন বৃত্তির মাধ্যমে। আদি মধ্যকালীন সমাজে কৃষির সম্প্রসারণ সম্ভবত শূদ্রগোষ্ঠীর নিকট উপার্জনের সুবিধা করে দেয়। শাস্ত্রীয় বিচারে নিম্ন মর্যাদার সামাজিক গোষ্ঠীগুলির অন্তর্গত অন্তত কিছু মানুষের হাতে পূর্তকর্মানুষ্ঠান করার মত উপযুক্ত সম্পদ ছিল। অর্থাৎ এই নিম্নতর সামাজিক গোষ্ঠীরগুলির প্রকৃত মর্যাদা ও আনুষ্ঠানিক মর্যাদায় ব্যবধান থাকতে পারে। পূর্তকর্মানুষ্ঠান করে দাতা সম্ভবত তার সামাজিক সম্ভ্রম বৃদ্ধি করতে পারতেন। জাতি বর্ণ ব্যবস্থায় কঠোর অনুশাসনে সমাজ জীবনে গতিশীলতার সুযোগ থাকে না। কিন্তু পূর্তকর্মের গুরুত্ব মেনে নিয়ে শাস্ত্রকারেরা কার্যত পৃষ্ঠপোষকের সামাজিক সম্ভ্রম ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে অনুমোদন করেছেন।

সূত্র নির্দেশ

১) নাথ, বিজয়, দান : *গিফ্ট সিস্টেম ইন এনশেন্ট ইণ্ডিয়া* (আঃ খ্রিঃ পূঃ ৬০০- আঃ ৩০০ অব্দ), নতুন দিল্লী, ১৯৮৭, পৃঃ ১ থেকে।

২) থাপার, রোমিলা, *এনশেন্ট ইণ্ডিয়ান সোস্যাল হিষ্ট্রি*, কোলকাতা,১৯৭৯, পৃঃ ১০৫।

৩) দত্ত, রমেশ চন্দ্র(অনুঃ), *ঋগ্বেদ - সংহিতা*, ২য় খণ্ড, কোলকাতা, পৃঃ ৬৬৮, ১০/১৬৯/২, ১/১৬১/১৪।

৪) ঐ, *তদেব*, ১০/১৪/৮।

৫) গোস্বামী, বি.বি, (অনুঃ ও সম্পাঃ), *অথর্ববেদ*, তৃতীয় মুদ্রণ, কোলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ১১/৫/১৭।

৬) সেন, অতুল চন্দ্র,
তত্ত্বভূষণ সীতানাথ ঘোষ ও
মহেশ চন্দ্র (অনুঃ ও সম্পাঃ), *উপনিষদ্ অখণ্ড* সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কোলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৬৮, ১/১/৮।

৭) বসু, এস্, সি. *অষ্টাধ্যায়ী অব পানিণি*, ২য় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৮৮, পৃঃ ৯২৬।

৮) চক্রবর্তী, ধ্যানেশ নারায়ণ
(সম্পাঃ), *রামায়ণম্* , প্রথম খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৫৪, ১/২১/৮-৯।

৯) তর্করত্ন, পঞ্চানন(সম্পাঃ), *মনুসংহিতা*, কোলকাতা, ১৩৯৭, পৃঃ ১২৪, ৪/২২৬।

১০) তর্করত্ন, পঞ্চানন(সম্পাঃ), *মার্কণ্ডেয় পুরাণম্*, কোলকাতা, ১৩৯০, পৃঃ ৭১-৭২, শ্লোক সংখ্যা ১৫।

১১) ঐ, *মনুসংহিতা*, পৃঃ ১২৪, ৪/২২৭।

১২) কানে, পি.ভি, *হিস্ট্রি অব দ্য ধর্মশাস্ত্র*, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, পুনে, ১৯৪১, পৃঃ ৮৪৫, পাদটিকা নং ১১৯৪।

১৩) কাওয়েল, ই.বি.(সম্পাঃ), *দি জাতক*, প্রথম খণ্ড, নং ৪, পৃঃ ১৪ থেকে।

১৪) বসু, এস, সি, *অষ্টাধ্যায়ী অব পাণিনি*, ৬/২/৬৩।

১৫) লডার্স, এইচ্ 'এ লিষ্ট অব ব্রাহ্মী ইন্‌সক্রিপশন্‌স্, *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা*, খণ্ড ১০, পৃঃ ১৪০।

১৬) ঐ, *তদেব*, নং ১৪২।

১৭) ঐ, *তদেব*, নং ১২৩০।

১৮) শাহ্‌নি, দয়ারাম, 'সেভেন ইন্‌সক্রিপশন্‌স্' ফ্রম মথুরা, *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা*, খণ্ড ১৯, নং ৯, পৃঃ ৬৮,৬৬।

১৯) সরকার, ডি.সি, *সিলেক্ট ইন্‌সক্রিপশনস্*, প্রথম খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ১৬৮, অনুচ্ছেদ নং ২।

২০) ঐ, *তদেব*, পৃঃ ১২১, লাইন নং ২-৩।

২১) ঐ, *তদেব*, পৃঃ ১৬৪-৬৭, তুলনীয় নং ৩২, পৃঃ ১৩১।

২২) মজুমদার, আর. সি, *কর্পরেট লাইফ ইন এনশেন্ট ইণ্ডিয়া*, তৃতীয় সংস্করণ, কোলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ৭৯।

২৩) ভট্টাচার্য, এস, সি, *সাম আসপেক্টস অব ইন্ডিয়ান সোসাইটি*, কোলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৫৩।

২৪) তর্করত্ন, পঞ্চানন(সম্পাঃ), *মনুসংহিতা*, ২/৩০-৩১।

প্রাচীন ভারতে দুর্নীতি

শুভজিৎ দাশগুপ্ত

এ'কালে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে দুর্নীতির প্রশ্নটি এত গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে যে এর উপস্থিতি ও প্রভাব সম্পর্কে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। অবচেতন মনে একে বোধহয় আমরা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে'ই ধরে নিয়েছি। তাই দুর্নীতির পরিভাষা ও দুর্নীতির মাত্রা নির্ধারণ করবার নিরিখ সম্পর্কে আমরা খুব একটা কৌতূহলী নই। অথচ দুর্নীতি বিষয়ক যে কোন তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গেলে দুর্নীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে। সে' জন্য প্রথমেই চাই দুর্নীতির সহজ পরিভাষা।

সাধারণ অর্থে যে কোন নীতি-বিগর্হিত কর্মকে'ই দুর্নীতি বলা হয়। এক্ষেত্রে নীতি শব্দের অর্থ নিছক Policy নয়। নীতি হল ethics, অর্থাৎ এমন এক সদর্থক মূল্যবোধ, একমাত্র বিবেকের কাছেই যা দায়বদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এই বিবেকনির্ভর মূল্যবোধ সমাজকে ধারণ করছে এবং সেই কারণে'ই একে 'ধর্ম' বলা চলে। আর এখানেই অপরাধ (Crime) ও দুর্নীতির (Corruption) মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রভেদ চোখে পড়ে। অপরাধ আইনের শাসনকে লঙ্ঘন করে এবং আইনের সাহায্য নিয়েই আদালত অপরাধীকে দন্ড দেয়। কিন্তু দুর্নীতি সরাসরি আইনের বিরোধীতা করে না। ব্যাধির মত নিঃশব্দে আইনের নজর এড়িয়ে সে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। এই প্রক্রিয়া এত মন্থর গতিতে অগ্রসর হয় যে অনেকসময় বাইরে থেকে একে অনুভব করা যায় না। অপরাধ ও দুর্নীতির এই প্রভেদ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের মানুষ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে অপরাধ 'ধর্মনাশ' করে কিন্তু দুর্নীতির ফলে ধর্মের 'গ্লানি' ঘটে। আয়ুর্বেদগ্রন্থ চরক সংহিতায় 'গ্লানি' শব্দটিকে 'বিকৃতি' অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। ধাতুবৈকল্য অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির বিকার থেকে দেহে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, এ'কথাও সেখানে বলা হয়েছে। অতএব এই মন্তব্যের সূত্র ধরে আমরা দুর্নীতিকে একটি সামাজিক ব্যাধি রূপে চিহ্নিত করতে পারি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন সমাজ নেই যা'কে এই ব্যাধি স্পর্শ করেনি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বেদ-অধ্যয়ণ সম্পন্ন করে উপনিষদের ঋষি তরুণ স্নাতকদের বলেছেন, "যানি অনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতাব্যানি নো ইতরানি," (**কঠোপনিষদ**) — অর্থাৎ নিন্দনীয় নয়, এমন কর্মই শুধু করবে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ম করবে না। অতএব, নিন্দনীয় কর্ম ছিল এবং

তার বিরুদ্ধে ভাবি প্রজন্মকে সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। এই নিন্দনীয় কর্মের মধ্যে কিছু এমন কাজ ছিল, যা দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে।

প্রসঙ্গতঃ, এ'কথা উল্লেখ করা দরকার যে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে একটি বিশেষ শব্দের সাহায্যে অপরাধকে দুর্নীতি থেকে পৃথক করা হয়েছে। সুত্তনিপাতগ্রন্থে (১০৬.২.৭০.,৪১) অপরাধমূলক বৃত্তিগুলিকে বলা হয়েছে "সাহস।" যারা এধরণের কাজ করে জীবন নির্বাহ করতেন, সেই অপরাধজীবী (ভাড়াটে দস্যু, পেশাদার খুনী প্রভৃতি) ব্যক্তিদের বলা হয়েছে "গূঢ়জীবী।" কূটযুদ্ধ ও গুপ্তহত্যায় এঁরা বিশেষ পারদর্শী হতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তস্কর (চোর-ডাকাত), গ্রন্থিছেদক (গাঁটকাটা), গৃহভেদক (সিঁধেলচোর/burglar), অবরোধক (ঠগী বা ঠাঙাড়ে), নৃশংসিন্ (খুনী) প্রভৃতি নানা ধরণের অসামাজিক তত্ত্বের উল্লেখ আছে। টাকা নিয়ে কাজ করবে, এ'রকম "পেশাদার গুন্ডা"র অভাব ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সৈন্যদের জাস্টিন্ "Robbers and brigands of the day" আখ্যা দিয়েছেন। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে এদের আনুগত্য ক্রয় করা হয়েছিল (**"ধাতুবাদোপার্জিতেন দ্রবিণেন চণিপ্রসূ"ঃ, ৮'ম অধ্যায়, ২৫৩-৫৪, পরিশিষ্টপর্বন্**)। অথচ দুর্নীতি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন সঠিক প্রতিশব্দ প্রচীন ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় না। অধার্মিক শব্দটি এক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়। অধার্মিক ব্যক্তি শুধু সমাজের শৃঙ্খলাভঙ্গ করেন না শাশ্বত এক মহাজাগতিক শৃঙ্খলা (**ঋত**) ভঙ্গ করেন। এর জন্য তাঁকে "**পাপের**" ভাগী হতে হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি যা করেন, সেটা পাপ'ও নয়, অপরাধ'ও নয়। হীন স্বার্থান্বেষণ থেকেই তার জন্ম হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি, দুর্নীতির দুটি পরস্পর - সম্পৃক্ত স্তর রয়েছে। স্তরভেদ অনুযায়ী দুর্নীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক (individualistic) অথবা সাংগঠনিক (organized) চরিত্রের হতে পারে।

প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সাংগঠনিক ও মিশ্র, তিন প্রকার দুর্নীতিই ছিল। কথাসরিৎসাগরে(৩৮.৪৭) প্রপঞ্চবুদ্ধি নামক জনৈক ধূর্ত ব্রাহ্মণ স্বয়ং রাজাকেই ঘুষ দিয়েছে। মহাভারতের কালকবৃক্ষীয় উপাখ্যানে (সভাপর্ব, ১২০;৭) জনৈক ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গোপনে বিপুল অর্থ গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণকারী ব্যক্তিদের উপধা (লোভনীয় বস্তুতে স্পৃহা) যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে, অর্থশাস্ত্র রচয়িতা সে'কথা বিলক্ষণ জানতেন। তাই আমলাদের "উপধা-পরীক্ষা"(অর্থশাস্ত্র ৪,৪) করতে বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি এমন অনেক অর্থগৃধ্নু আচার্য(তীর্থীক)'দের কথা বলেছেন(২.২৪১) যিনি লোভনীয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করতেন। এ'ছাড়া ভুয়া ওজন ব্যবহার (**তুলাবিষম্**), ভেজাল মাল সরবরাহ (**পেটকম্**). ক্রেতা-ঠকান (**পিঙ্ক**) প্রভৃতি অবাধে চলত (অথশাস্ত্র ৪,২-৩)। ন্যায়বিচার বিভাগেও এ'সব জঘন্য ক্রিয়াকলাপ চালু ছিল। বিচারকগণ অনেক সময় ধনী ব্যক্তিদের সপক্ষে রায় দিতে গিয়ে বিচার প্রক্রিয়াকেই প্রহসণে পরিণত করতেন। স্মার্তগণ একে "প্রকাশ্য

তস্করতা"(বৃহস্পতি স্মৃতি) আখ্যা দিয়েছেন। মহাভারতের সভাপর্বে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার দ্বারা নিযুক্ত বিচারকগণ যে উৎকোচের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে অবিচার করেন না, এটা বোধহয় আশা করতে পারি?" মনুসংহিতার লেখক তাই বিচারককে সতর্ক করে বলেছেন:—

"ধর্ম এব হন্তো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিত।

তস্মাৎ ধর্মো ন হন্তব্যো মানো ধর্মো হতোহবধোৎ।।"

অর্থাৎ ধর্মকে বধ করলে তা স্বয়ং প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়ায় আবার একে রক্ষা করলেই এ নিজেই রক্ষা করে। অতএব হে বিচারক, কদাচ স্বধর্মকে বিসর্জন দিওনা।

সরাসরি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়, এরকম কিছু দুর্নীতি ছিল, যা আইনের উপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করত। নারদস্মৃতি তে(৪.১১.১)'নিক্ষেপ' বা উপনিধি'র কথা বলা হয়েছে যার সোজা বাংলা মানে হল 'পরের গচ্ছিত সম্পত্তি নির্লজ্জভাবে গ্রাস করা।' পরদূষণ বা পৈশূণ্য (villification) করে অন্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করা ছিল কতিপয় দুষ্টলোকের পূণ্যব্রত৷ মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ১৫.৪) এ'ধরণের লোক'কে নৃশংসবাদিন্ বলা হয়েছে।

সাংগঠনিক স্তরে যে'সব দুর্নীতি প্রচলিত ছিল, সেগুলি ছিল আরো সুক্ষ ও সুদূরপ্রসারী। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র এরকম বহু দুর্নীতিকে অঘোষিত রাষ্ট্রনীতিতে পরিণত করেছে। সেখানে রাজাকে সংঘভেদ (দল - ভাঙ্গানো) গূঢ়পুরুষ অভিনিবেশ (গুপ্তচর লাগানো, প্রয়োজনে এরা রাজদ্রোহী ব্যক্তিকে গোপনে হত্যা করতেন), বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি করতে বলা হয়েছে। অতিরিক্ত করভার চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কোন অমাত্যকে রাক্ষস বা যক্ষ সাজিয়ে প্রজাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করার ব্যবস্থাও সুপারিশ করা হয়েছে।

আবহমানকাল ধরে দুর্নীতি মানুষের ছায়াসঙ্গী। যেহেতু তার উৎপত্তি মানুষের মধ্যেই, তাই বাইরের জগতে তার সমাধানের সূত্র মিলবে না এবং যতদিন ঐ সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে না, ততদিন আদর্শ দুর্নীতি মুক্ত সমাজ আকাশকুসুম কল্পনাতেই থাকবে।

সূত্র নির্দেশ

১) চন্দ্র, ডঃ প্রতাপচন্দ্র, কৌটিল্য অন্ লাভ্ এন্ড্ মরালস্ কলিকাতা, ১৯৯৫।

২) কাংলে, আর.পি., দ্য কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, তিন খন্ড, বম্বে(মুম্বাই),১৯৬০-৬৫।

৩) অবোয়্যার, জে., ডেইলি লাইফ্ ইন্ এনশেন্ট্ ইন্ডিয়া, প্যারী (Paris) ১৯৬৯।

৪) দাস, শুক্লা, ক্রাইম্ এন্ড্ পানিশ্মেন্ট্ ইন্ এন্শেন্ট্ ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৭৭।

৫) ঠাকুর, উপেন্দ্র, করাপশান্ ইন্ এন্শেন্ট্ ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯।

৬) ভট্টাচার্য, এইচ্ এন্., দ্য এথিক্যাল্ ফাউন্ডেশন্ অব্ হিন্দু জুরিস্প্রুডেন্স্, কলিকাতা, ১৯৩২।

প্রাচীন ভারতে 'বিষ্টি' (বেগার শ্রম) আদায়ের প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া

রাজেশ ঘোষ

সাম্প্রতিক কালে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলি বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। ইতিহাস অনুরাগীরাও সাধারণ মানুষের জীবন ধারা, অগ্রাধিকারহীন মানুষের অবস্থা, শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী শোষণ ইত্যাদি বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত জটিল ক্রিয়া—বিক্রিয়া নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহী। ইতিহাস চর্চার এই প্রবনতার প্রেক্ষিতে বেগার শ্রম নির্ভর অর্থনীতির আলোচনা অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক লেখতে এই বেগার শ্রমকে 'বিষ্টি' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থান এবং কালের পরিবর্তনে 'বিষ্টি'র প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এই শোষণমূলক 'বিষ্টি' আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সামন্ত, পদস্থ কর্মচারী(সামরিক/ বেসামরিক). দাসগ্রহী ব্রাহ্মণ্য শ্রেণী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ভূমিকা বিভিন্ন মাত্রায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মৌর্যউত্তর যুগে উত্তর ভারতে অগহার ব্যবস্থা এবং দক্ষিণে দেবদান ও ব্রহ্মদেয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ও বিস্তার 'বিষ্টি'র মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। শূদ্রশ্রেণী সহ ভূমিহীনকৃষক, অগ্রাধিকারহীনশ্রেণী, দাস/দাসী, যুদ্ধবন্দী, কারিগর, শিল্পী ইত্যাদির কাছ থেকে 'বিষ্টি' আদায় করা হত।[১] প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে হরবন্স মুখিয়া ভারতের উর্বর কৃষিমৃত্তিকার প্রাচুর্যগত দৃষ্টি কোণ থেকে ব্যাখ্যা করে দাবি করেছেন যে প্রাচীন ভারতে বেগার শ্রম আদায়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়, তথাপি উপমহাদেশের উর্বর কৃষিমৃত্তিকা অকালেও 'বিষ্টি' আদায় যে অজানা ছিল বলা যায় না।[২]

মৌর্যশাসন কালে আদায়যোগ্য রাজস্বের বিকল্প হিসাবে যেমন 'বিষ্টি' আদায় করা হত তেমনই দাস, যুদ্ধবন্দী ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে বেগার শ্রম আদায় করা হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সহ পরবর্তী কালের স্মৃতিগ্রন্থে (মনু, বিষ্ণু, গৌতম) বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বা জনকল্যাণমূলক কাজে 'বিষ্টি' আদায় করা যেতে পারে।[৩] তবে কৌটিল্য সাবধান করে বলেছেন যে 'বিষ্টি' আদায় যেন সীমালঙ্ঘন না করে বা স্বৈরাচারিতায় পর্যবসিত না হয়।[৪] 'কর' এবং 'প্রতিকর' শব্দের সঙ্গে 'বিষ্টি' শব্দটি ব্যবহার হওয়ায় বোঝা যায় যে 'বিষ্টি' আদায় অন্যান্য 'কর' বা রাজস্ব আদায়ের মত নিয়মিত ছিল। মৌর্যরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রাণাধীন উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে নিয়োজিত কারিগর ও শ্রমিকদের কাছ থেকে 'বিষ্টি' আদায় করা হত, কর্মান্ত 'বিষ্টি'[৫] শব্দটি এ বিষয়ে বিশেষ

উল্লেখযোগ্য, মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থে[৬] উল্লেখ রয়েছে যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহন কালে ছুতোর কারিগরদের কাছ থেকেও 'বিষ্টি' আদায় করা হয়েছিল। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের জমি বা 'সীতা' জমিতে কৃষিকাজ সম্পাদনের জন্য সীতাধ্যক্ষ নামব রাজকর্মচারী দাস, যুদ্ধবন্দী, কর্ষক নিয়োগ করবেন। উৎপাদনের ভাগ পেলেও এদের শ্রমের একটা অংশের মূল্য পেতনা।

অর্থশাস্ত্রে 'বিষ্টিবন্ধক'[৭] নামক রাজকর্মচারীর উল্লেখও পাওয়া যায়, এদের প্রধান কাজ ছিল রাষ্ট্রের স্বার্থে 'বিষ্টি' আদায়কে সুনিশ্চিত করা, 'শূদ্রকর্ষক' শব্দটির মাধ্যমে কর্ষক শ্রেণী/ভূমিহীন কৃষক — বলতে শূদ্রদেরই বোঝানো হয়েছে, অবদমিত, শোষিত, অগ্রাধিকারহীন এই শূদ্রশ্রেণী মৌর্য যুগের 'জনপদনিবেযা' বা নতুন জনপদ সৃষ্টি/পুরোনো জনপদের নবীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম পুর্বশর্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।[৮] বহু আগেই শূদ্র শ্রেণীকে 'যথাকাম উত্থাপ্য' বা 'যথা কাম বধ্য' পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদেরও 'জনপদনিবেশ' বা জনপদসস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। তার ইঙ্গিত পাই অশোকের কলিঙ্গ জয়ের পর বন্দী কলিঙ্গবাসীদের তিনি নতুন জনপদস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন।

অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে জনউন্নয়ণমূলক কাজ ও সামরিক প্রয়োজনে 'বিষ্টি' আদায় করা হত, সামরিক শিবির পরিষ্কার, রাস্তা ঘাট তৈরি, সেতু নির্মাণ ইত্যাদির জন্য 'বিষ্টি' আদায় হত। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় অট্টালিকা নির্মাণ, জলাধার খনন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও 'বিষ্টি' দাবি করা হত।[৯] আপৎকালীন সময় বা সঙ্কট কালে 'বিষ্টি' আদায়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পেত। মৌর্যরাজত্বের শেষদিকে যে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তা সামাল দিতে ' প্রণয়' রাজস্ব ব্যবস্থা জারি করা হয়, মৌর্য অর্থনীতিতে খনি শিল্পের (Mining Industry) কদর ছিল। এই সব ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন আকরাধ্যক্ষ। বিভিন্ন ধরণের খনি বা আকরের মধ্যে সোনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঐক্ষেত্রে 'হিরণবিষ্টি'[১০] শব্দটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোনার খনিতে নিয়োজিত খনিশ্রমিকেদের কাছ থেকে মৌর্য কর্তৃপক্ষ 'বিষ্টি' আদায় করতে পিছ পা হয় নি । অপরাধীদের থেকেও 'বিষ্টি' আদায় করা হত এবং ধনীব্যক্তিরা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিজেদের 'ভৃতক' বা বাসদের বেগার শ্রম প্রদানে পাঠাতেন।

মৌর্যত্তর যুগে পশ্চিম ভারতের শক্‌রাজারা 'বিষ্টি' আদায় সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সাধারণ প্রজাবর্গের ওপর এই 'বিষ্টি' প্রদানের বোঝা চাপানো হত। জুনাগড় লেখতে (১৫০ খ্রিষ্টাব্দ) প্রথম রুদ্রদামন দাবি করেছেন যে তিনি সুদর্শন হ্রদ সংস্কারে প্রজাবর্গের ওপর বাড়তি কর বা 'বিষ্টি' বোঝা চাপান নি। এই দাবি সমাজে 'বিষ্টির' প্রচলনকেই সুনিশ্চিত করে। কুষাণ আমলেও এই 'বিষ্টি' আদায় করার বিষয়টি অজানা ছিল না। কুষাণ প্রশাসনিক স্তর বিণ্যাসের উচ্চকটিতে অবস্থান করছিল অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অভিজাত

শ্রেণী। এদের ভরণপোষণের জন্য সাধারণ প্রজা ও নিম্নশ্রেণীর ওপর শোষণের মাত্রা বেড়েছিল[১১]। শোষণ তথা 'বিষ্টি' আদায়ের বিষয়টিকে বৈধতা দানের জন্য কুষাণ রাজারা নিজেদের দেবতার পুত্র বলে দাবি করে বা 'দেবকুল' প্রতিষ্ঠা করে প্রজাদের শর্তহীন আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করেছিলন।

আগেই বলা হয়েছে যে অগ্রহার ব্যবস্থা বা নিষ্কর জমিদানকে কেন্দ্র করে সামাজিক শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী অধ্যায় এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটায় আঞ্চলিক পর্যায় সামাজিক শোষণ ও 'বিষ্টি' আদায়ের পরিধি ও তীব্রতা — দুই বৃদ্ধি পায়। উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামন্ত শাসকদের উত্থান শ্রম — অর্থনীতির পরিকাঠামো এবং রূপ দুটোই বদলে দিয়েছিল। আদি মধ্যকালীন যুগে উত্তর ভারতে ভূমি ব্যবস্থায় তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় — 'মহীপাল'(রাজা), স্বামী(ভূ-স্বামী), কর্ষক (ভূমিহীন কৃষক)। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এছাড়াও আরো অনেক মধ্যবর্তী স্তর ছিল। ৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সামন্তরাজা দেব খড়গের আসরাফপুর তাম্রপট্টে এই ধরণের মধ্যসত্ত্বভোগীদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অগ্রহার ব্যবস্থা একদিকে যেমন রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল, ঠিক তেমনই গ্রামের জমির ওপর যৌথ মালিকানা ধ্বংস করেছিল। এর ফলে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনই তাদের ওপর বেআইনী শোষণ বেড়েছিল। এই বেআইনী শোষণের একটি রূপহল 'বিষ্টি' আদায়, যা এই সময় পূর্ণতা ও সার্বিকতা লাভ করে।

পৌরাণিক সাহিত্যে সঙ্কটময় কলিযুগের যে সময় কল্পনা করা হয়েছে তা ক্ষমতাহীনদের ওপর বলশালীর শোষণের যুগ। রাজারা বা সামন্তরা কৃষকদের শোষণ করবেন বলে এই সাহিত্যে দাবি করা হয়েছে। বাৎসায়নের কামসূত্র থেকেও জানা যায় যে অভিজাত ব্যক্তিবর্গ গ্রামীণ স্ত্রীলোকদের — গৃহকর্মে বেগার শ্রম দিতে বাধ্য করতো (বিষ্টি কর্ম)।[১২] পদ্মপুরাণে কৃষবলজনাঃ শব্দটি ব্যবহার করে হৃতদরিদ্র কৃষকদের বোঝানো হয়েছে। 'ধনোজ্জিতা' শব্দটিও দরিদ্র কর্ষক শ্রেণীর প্রতিশব্দ, কৃষিক্ষেত্রে ধান গাছ রোপণ ও পাকাধান কাটার সময়ই বেশি মাত্রায় 'বিষ্টি' আদায় করা হত, কারণ এই দুটি কাজে অনেক বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এই পরিস্থিতিতে 'বিষ্টি' বা বেগার শ্রম আদায়ের সুযোগ ও তীব্রতা দুই দ্রুত বেড়ে যায়। ভূস্বামীরা এবং আর্থ - প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী দান গ্রহীতারা অঞ্চল ভিত্তিতে দমনমূলক নীতিকে বৈধনীতির মোড়কে ব্যবহার করতে শুরু করে; ভূমিহীনকৃষক বা কৃষিমজুরদের প্রায়-দাসত্বের পর্যায়ে নামিয়ে এনে আদিমধ্যকালীন ভারতে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৃষিশ্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করেছিল। বৃহন্নারদীয় পুরাণে 'আশ্রিতহালিক' বা 'বদ্ধহল' শব্দ গুলি কৃষিমজুরদের অধীনতার চরিত্রকে অনেকটাই ব্যক্ত করে। তবে, এই অধীনতা (Subjecion) মধ্যযুগীয় পশ্চিম ইউরোপের ভূমিদাস বা সার্ফদের অধীনতার মত তীব্রতা বা ব্যাপকতা লাভ করে নি। সুভাষিত রত্নকোষ

থেকে জানা যায় যে ভূ-স্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সময় কৃষক বা কৃষিমজুররা জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেত।

'বিষ্টি' আদায়ের ক্ষেত্রেই - উচ্চপ্রশাসনিক তরফ্ থেকে সবুজ সংকেত অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছিল। মৈত্রক বংশের রাজাদের জমিদান সংক্রান্ত অনুশাসনগুলিতে - দানগ্রহীতাকে প্রয়োজনে 'বিট্রোলকর' বা 'বিষ্টি' আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ৮০৬/৭ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্রকুট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ নাসিকের অন্তর্গত অম্বক গ্রামটি দান করার সময় দানগ্রহীতাকে অ্যান্য অধিকারের সঙ্গে গ্রামবাসীদের থেকে 'বিষ্টি' আদায়ের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় ধ্রুব একটি গ্রামদান কালে গ্রামবাসীদের থেকে 'বিষ্টি' আদায়ের অধিকারটি দানগ্রহীতাকে দিয়েছিলেন। প্রয়োজনবোধে গ্রামবাসীদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার দানগ্রহীতারা আইনগত ভাবে লাভ করেছিলেন। বণিক সংগঠন/গিল্ড গুলিও অনেক সময় 'বিষ্টি' আদায় করার — অধিকার পেত, ৫৯২ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম ভারত থেকে জারি করা একটি অনুশাসনে একটি বণিক গোষ্ঠীকে কারিগরদের থেকে 'বিষ্টি' আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব কাথিওয়াড় অঞ্চলের প্রতিহার - সামন্তদের 'বিষ্টি' আদায়ের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।

কল্‌হন রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে কাশ্মীরে বেগার শ্রমের প্রচলন সম্পর্কে আমাদের অবগত করেছেন, 'রুঢ় ভারোধি'[১৩] শব্দটি উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে ভরবাহী পশুর বদলে মানুষকে সেই ভারবহনের কাজে ব্যবহার করা হত। রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজেও বেগার শ্রম বা 'বিষ্টি' আদায় করা হত। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে অর্থশাস্ত্রে 'স্কন্ধক' শব্দটি 'রুঢ়ভারোধি' শব্দটির প্রতিশব্দ। সাধারণ কৃষক শ্রেণীর অবচস্থাও আশা ব্যঞ্জক ছিল না। তারাও চরম শোষণের শিকার হয়েছিল। তাদের হাতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য এবং সম্পদের অতিরিক্ত কিছুই থাকতো না। প্রশাসনিক অনুমান ছিল যে এদের হাতে যদি উদ্বৃত্ত শস্য বা সম্পদ সঞ্চিত হয় তাহলে এরা আঞ্চলিক বিদ্রোহ ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারে। এই ধরণের অনুমান ইঙ্গিত দেয় যে বহুবিধ শোষণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের পরিকল্পিত বিদ্রোহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল এবং এই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটি শ্রেণী চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই শ্রেণী চেতনাই কৃষকবর্গের মধ্যে আদর্শগত ঐক্যভাব গড়ে তুলেছিল। মনে রাখা দরকার যে কৃষক সহ অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর বিদ্রোহগুলোকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শর্ত দিয়ে সরাসরি ব্যাখ্যা করা যায় না। আপাতভাবে শোষণের বিরুদ্ধে এই বিদোহকে আকস্মিক মনে হলেও , এর পেছনে পূর্ব প্রস্তুতি, সংগঠন বা রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের নির্দিষ্ট একটা ছক থাকে। এই নির্দিষ্ট ছকটি আবার খুঁজে পাওয়া যায় — শোষিত শ্রেণীর চেতনার মধ্যে। আবার এই চেতনা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অধীনতার অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ ও বঞ্চনা সত্ত্বেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই — প্রভৃতি সক্রিয় অবদান রাখে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে কৃষক-প্রতিবাদের উপাদানগত নজির রয়েছে। 'যসস্তিলক চম্পূ' গ্রন্থে আঞ্চলিক শাসক বর্গের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই প্রতিরোধ অবশ্য স্থায়ি হয় নি এবং প্রতিরোধকারীরা শহিদ হয়েছিলেন। বরেন্দ্রীয় কৈবর্ত্ত বিদ্রোহকে অনেকেই দিব্য-র নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ হিসাবে দেখতে চান। বাংলার পালদের বিরুদ্ধে তারা সাধারণ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিল। এক্ষেত্রে কৈবর্ত্ত শ্রেণীর স্বার্থ চেতনা লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক রামসরণ শর্মা এই কৈবর্ত বিদ্রোহকে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর উত্থান হিসাবে গণ্য করতে চান। হেমচন্দ্রের *দাশ্রয়কাব্যের* ওপর নির্ভর করে রচিত অভয়তিলক গণির টীকা থেকে জানা যায় যে 'কর্ষক শ্রেণী' (ভূমিহীনকৃষক) কাঠের অস্ত্রকে হাতিয়ার করে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এই চেষ্টার মূলে ছিল ভূস্বামীশ্রেণী বিরুদ্ধ চেতনা। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ছিল শ্রেণী বিভক্ত, আর যে কোন শ্রেণী বিভক্ত সমাজে প্রভূত্ব/অধীনতার সম্পর্কটা হল বিরোধিতার সম্পর্ক, ফলত নিপীড়িত মানুষের শ্রেণী চেতনা প্রভূত্বকারীদের চেতনার বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজেও প্রভূত্বকারীরা প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে উচ্চবর্গীয় '*হেজিমনি*'তে পরিণত করার জন্য 'দণ্ডে'র পাশাপাশি যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম, ভক্তিবাদ, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ ইত্যাদি মতাদর্শকে যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তেমনই বিপরীত প্রান্তে শোষিত শ্রেণী আত্মচেতনার মধ্যদিয়ে বিদ্রোহরূপী প্রতিরোধী হাতিয়ার গড়ে তুলেছিল।

শোষিত শ্রম/বেগার শ্রম/'বিষ্টি' সম্পর্কীয় আলোচনার কথান্তে কয়েকটি সূত্রের ওপর আলোকপাত করা যায়, —

১। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কেন্দ্রীয়/আঞ্চলিক কর্তৃত্ব অবৈধ ভাবে 'বিষ্টি' বা বেগার শ্রম নিম্নশ্রেণীর কাছ থেকে আদায় করার জন্য মতাদর্শ বা অনুশাসনগত নির্দেশকে সামাজিক বৈধতা প্রদানে সচেষ্ট হয়েছিল।

২। 'বিষ্টি' আদায়ের মাত্রা এবং প্রকৃতি স্থান, কাল ও ব্যক্তি পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হত।

৩। অগ্রহার ব্যবস্থার প্রসার ও কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অবক্ষয় ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে এই 'বিষ্টি' আদায়ের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল গুপ্তোত্তর যুগে।

৪। এই শোষণের বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী প্রতিবাদের ধ্বণ সামাজিক ধারাবাহিকতা, পরিবর্তনশীলতা, লোকসংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যেই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানগুলি যেহেতু উচ্চবর্গীয়দের সৃষ্টি, সেহেতু আলোচ্য যুগের নিম্নশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলি অনেকটাই অস্পষ্ট ও ক্ষেত্র বিশেষে অনুল্লেখিত রয়ে গেছে।

সূত্র নির্দেশ

১) রোমিলা থাপার, *দ্য পাষ্ট এ্যাণ্ড প্রেজুডিস্* (এন.বি.টি.১৯৭৫) পৃ ঃ ৫২

২) আর.এস.শর্মা, 'হাউ ফিউডাল ওয়াজ্ ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজিম' প্রবন্ধ, হারমান কুলকে সম্পাদিত, *দ্য ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া* - ১০০০-১৭০০ পৃ ঃ ৬৭

৩) গৌতম . V. ৩১; বিষ্ণু ৩২ II মনু VII ১৩৮; *অর্থশাস্ত্র* I ৪. VIII .১

৪) *অর্থশাস্ত্র*, II .১.

৫) *অর্থশাস্ত্র*, II .৬

৬) *মুদ্রারাক্ষস*, II

৭) *অর্থশাস্ত্র*, V. ৩

৮) রণবীর চক্রবর্তী, *ওয়ার ফেয়ার ফর্ ওয়েলথ*, (কলি, ১৯৮৬) পৃঃ ৫৫

৯) অর্থসাস্ত্র X.৪

১০) ঐ, I. ৪, II ৬

১১) বি.এন.মুখার্জী, *রাইজ্ এ্যান্ড ফল্ অফ্ দ্য কুষাণ এমপ্যায়ার*. (কলি, ১৯৮৮)পৃঃ১৩৯

১২) *কামসূত্র*, ৫. ৫.৫/৬

১৩) *রাজতরঙ্গিনী*, II.১৭২-৭৪

সারাংশ

দেবী জগদ্ধাত্রী উদ্ভব ও অস্তিত্ব

সুমিত বিশ্বাস

কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, সময় মতো রাজস্ব না দিতে পারার তাকে বন্দী হতে হোল মুঘলের কাছে, যখন তিনি ছাড়া পেলেন তখন তিনি গঙ্গা বেয়ে ফিরছিলেন তার রাজধানী কৃষ্ণনগরে হঠাৎ গঙ্গায় দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হতে দেখে বুঝলেন যে, বিজয়া দশমী হয়ে গেলো, মনে বড্ড ব্যথা পেলেন রাজা, ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলেন নিজ কক্ষে। মনে একটাই দুঃখ সেবারের মতো, আর দুর্গাপুজো করা তার হোলনা। রাতে স্বপ্ন দিলেন দেবী, চতুর্ভূজা, সিংহরূঢ়া, শঙ্খ, চক্র, ধর্নুবাণ হাতে, করিন্দ্রসুরমর্দিণী সর্পোবীধোরিণী এক অপরূপ দেবী, পণ্ডিতগণের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে তিনি, কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে দেবীর পূজার প্রচলন করলেন, আবার অকালে বোধীতা হলেন দেবী দুর্গা, তাঁর নিজের আদেশানুসারে, তবে কৃষ্ণচন্দ্র কতটা পূজার প্রবক্তা সে নিয়ে দ্বিমত আছে তবে এটুকু বলা যায় যে তিনিই এই দেবীর পূজাকে সর্বাপেক্ষা প্রচার দিয়েছিলেন।

পুরাণে ও বহু পুরানো পাথরের মূর্তি দেখে আমরা যা বুঝতে পারি, চতু র্ভূজা, সিংহারূঢ়া দেবী মূর্তির, ভারতবর্ষে তথা ভারতের বহির্ভূত অনেক দেশে, পূজার প্রচলন ছিলো। বাংলাদেশে (তৎকালীন) অনেক টোরাকোটা মন্দিরগাত্রে এই দেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে, যার সময় কৃষ্ণচন্দ্রের বহু আগে। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবর্তিত এই জগদ্ধাত্রী পুজো আজ কৃষ্ণনগর ছেড়ে চন্দননগর হয়ে কলকাতাতেও হানা দিয়েছে এবং ওই চতুর্ভূজ দেবী, আমাদের দশভূজাকেও তার ঐশর্য্যে ও জাঁকজমকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

রাজগৃহ ঃ গুপ্তোত্তর পর্ব

কাকলী রায়

রাজগৃহ, বর্তমান রাজগীর, ভারতবর্ষের প্রধান প্রত্নস্থল। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন শাস্ত্রগ্রন্থে ও চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনায় রাজগীরের গুরুত্ব নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। আলেকজাণ্ডার কানিংহামের সময় থেকে রাজগীরের প্রত্মতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে প্রাক্-মৌর্য পর্ব থেকে রাজগীরের প্রত্নতত্ত্বের রূপরেখা অংশত জানা গিয়েছে। এই প্রবন্ধে সপ্তম শতকের চৈনিক বিবরণ ও সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও লেখের মাধ্যমে গুপ্তোত্তর পর্বে রাজগীরের ইতিহাসের একটি কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে তাম্রযুগ

চম্পা সেনচৌধুরী, বিমল চৌধুরী

ভারতবর্ষে তাম্রযুগ বর্তমান থাকলেও ব্রোঞ্জযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখানে সেই যুগের অবস্থিতি প্রমাণ করার পক্ষে অপ্রতুল, বলেছিলেন ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ, ১৯০৫ সালে। উত্তর ভারতে প্রাপ্ত হার্পুণ, বর্শার ফলা ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে তার বক্তব্য ছিল, উত্তর ভারতে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের অনুকরণে তৈরি হয়েছে এই তাম্র নির্মিত হাতিয়ার এবং সম্ভবতঃ তা হয়েছিল ২০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। বিথুর ও পেরিয়ার অববাহিকায় প্রাপ্ত আরও কিছু নিদর্শনের ভিত্তিতে তাঁর এই বক্তব্যের সংযোজন প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে।

স্মিথ তাঁর বক্তব্যে প্রথমতঃ দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের মধ্যে একটা পার্থক্য এনেছেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি পার্থক্য এনেছেন ব্রোঞ্জযুগ ও তাম্রযুগের মধ্যেও। কিন্তু পিতল ও ব্রোঞ্জ তামারই মিশ্রধাতু। দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে ১৯০১ সালে রবার্ট ব্রুস ফুটের মন্তব্য : কিছু ব্রোঞ্জ, পিতল ও তাম্র নির্মিত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সেখানে পাওয়া গেলেও, ইউরোপ, মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার মত সেখানে লৌহযুগ-পূর্ব তাম্রযুগ বা ব্রোঞ্জযুগের অবস্থিতি প্রমাণ করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

১৯৯১ সালে প্রখ্যাত ধাতুবিশেষজ্ঞ প্রফেসর এ, কে, বিশ্বাস বলেছেন যে ভারতের তাম্রযুগ বা তামার মিশ্রধাতুর যুগ বিচারের উদ্দেশে কেবলমাত্র কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ধাতু বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, বিষয়টি আরও জটিল।

১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের 'হিস্ট্রি অব্ হিন্দু কেমিস্ট্রি,' কিন্তু ভূতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও জাতিতত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় তাম্রযুগ সম্পর্কে প্রথম গবেষণামূলক বই রসায়নবিদ পঞ্চানন নিয়োগীর 'কপার ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া'।

আজ অবশ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় যে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে না উঠলেও সারা ভারতবর্ষ জুড়েই তামা বা তামার মিশ্রধাতুর প্রচলন ছিল প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে। এ তথ্যও অনস্বীকার্য যে দস্তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের থেকে কয়েক শ' বছর আগেই ঘটেছিল ভারতীয় রসায়নবিদদের এবং এরই ভিত্তিতে পিতল তৈরির ইতিহাস ভারতে ইউরোপে বা অন্যান্য দেশের তুলনায় বহু প্রাচীন ও উন্নত।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পাণ্ডুরাজার খননকার্যের রিপোর্ট অনুসরণ করে বলা যায় যে, পাণ্ডুরাজার ঢিবির খননকার্য পূর্বভারতে এমন একটি তাম্রযুগ সভ্যতার প্রমাণ উদ্‌ঘাটন করেছে যার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় রাজস্থান ও মধ্যভারতের প্রাচীন তাম্রপ্রস্তর (Chalcolithic) যুগের সঙ্গে।

মুম্বই-এর টাটা ইন্‌স্টিটিউট অব্ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চের বিশেষজ্ঞদের মতে পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতা মধ্যভারতীয় সভতার পটভূমিতে গড়ে ওঠে এবং হয়ত প্রাচীন ছোটনাগপুরের সঙ্গে এই অজয় ও ভাগীরথীর অববাহিকার যোগাযোগের পথের সন্ধান মিলতে পারে এই খননকার্যের সূত্রে। কেবল স্থলপথে নয়, জলপথেও এই সভ্যতার যোগাযোগ ছিল সুদূর সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে। হয়ত তারই মধ্যে সুপ্ত আছে আরও অনেক অজানা রহস্য।

পশ্চিম বঙ্গের উপকূল ভাগের প্রত্ন সম্ভার ও তার গুরুত্ব

অরবিন্দ মাইতি

পশ্চিমবঙ্গের উপকূল ভাগ উড়িষ্যা প্রদেশের সীমান্ত থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সীমান্ত বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তারিত। বিক্ষিপ্তভাবে উপরোক্ত স্থানে বিভিন্ন সময়ে বহু প্রত্ন বস্তু আবিস্কৃত হলেও এর ভূমি গঠনের উপর ভৌগোলিক কারণে কিছু অনিশ্চয়তা রয়েছে। সে কারণে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও প্রত্নবিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার এই স্থানের বিশেষ উল্লেখ করেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে ও সেই সঙ্গে উপযুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ফলে উপরোক্ত ধারণা বহুলাংশে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

যার ফলে এ অঞ্চলের অনেক স্থান প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব লাভ করেছে এবং আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু গুলিও ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। উপরোক্ত অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্রপথে সুদুর অতীতে ক্রীট, রোম সুমেরু ও মিশর প্রভৃতিদেশের সঙ্গে যে নিবিড় যোগসূত্র ছিল তা নূতন ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ী রূপটি কী মূর্তি কল্পনায়, শিল্প-সংস্কৃতিচর্চায় অর্থনৈতিক বিকাশ ও বৈদেশিক ব্যণিজ্য সম্প্রসারণ ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে এ স্থানগুলি সমগ্র দেশের একসময় Gate Way হিসাবে কাজ করেছে।

প্রাচীন ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা (খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে ১৮৭ খ্রিঃ পূঃ)

তপন কুমার মণ্ডল

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস অতি প্রাচীন। কিন্তু বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। আমরা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে জানতে পারি যে প্রাচীনকালের বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। কিন্তু ঐ ব্যবস্থা বর্তমানকালের গ্রামীণ উন্নত শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তথাপি বলা যায় যে, প্রাচীন

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সভ্যতার বিবর্তনের চাকায় ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

খ্রিঃ পূঃ ছয়শত বছর আগে থেকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস মোটামুটি ধারাবাহিক ভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ জাতক, নিকায়, জৈন সূত্র ও হিন্দু পুরাণ ইত্যাদি এর উৎস হিসাবে কাজ করেছে। এই যুগে কোন একটি শক্তির একক প্রাধান্য ছিল না। ১৬টি জনপদ ছিল। এদের একত্রে বলা হত 'ষোড়শ মহাজন পদ'। মগধের উত্থানের আগে ষোড়শ জনপদগুলির কোনটিতে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। সম্ভবতঃ এরূপ শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার অধিকার ও স্বাধীনতা গ্রামীণ মানুষের ছিল না।

ষোড়শ মহাজন পদের অন্যতম জনপদ ছিল মগধ। যতদূর জানা যায় মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের পরিকাঠামো কেমন ছিল তা জানা যায় না।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আগে মগধে রাজত্ব করেছেন হর্যংক বংশ, শিশুনাগ বংশ ও নন্দ বংশের বিভিন্ন রাজারা। এই সব রাজবংশের শাসনকালে শাসকগণ 'ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নীতি' তে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কায়েম করেন। এই সকল রাজাদের আদেশ ও নির্দেশই ছিল আইন।

মৌর্য রাজারা স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী হলেও তাঁদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না। মন্ত্রী, অমাত্য ও মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা এবং প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারা রাজাদের ক্ষমতা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের সর্বনিম্নে ছিল 'গ্রাম'। গ্রামে স্বায়ত শাসন প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' স্বায়ত্ত শাসিত গ্রামের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে যাকে 'গ্রাম পঞ্চায়েত' হিসেব উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, মৌর্যযুগের গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তকালের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বর্তমান কালের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উৎস হিসেবে কাজ করে চলেছে।

মহাকাব্যে এবং পুরাণে নিয়োগের পরিকাঠামো প্রাচীন ভারত

চিরকিশোর ভাদুড়ি

নিয়োগ প্রথার উৎপত্তি সুদূর অতীতে। মূলতঃ বংশরক্ষা এরং শাস্ত্রীয় আচার এই দুই প্রক্রিয়া এক মাত্র পুত্র সন্তান দ্বারাই সম্ভব ধরে নিয়ে প্রাচীন ভারতীয়রা নিয়োগের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

গৌতম বশিষ্ট, বৌধায়ন, নারদ এবং মনু নিয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

মনুর মতে কোন ব্যক্তি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর বিধবা স্ত্রী বংশরক্ষার কারণে দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত দেবর অথবা কোন সগোত্র, সপিন্ড বা বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মিলিত হতে পারবেন। মনুর মতে রাজা বেন এই প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার জন্য দায়ি।

কোন কোন পণ্ডিত ঋগবেদের ১০।৪০।২ নং শ্লোকটি বৈদিক ভারতে বিধবা বিবাহ চালু থাকার স্বপক্ষে রায় দিয়েছে বলে মনে করে থাকেন। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ঋগ বেদের ১০।৪০।২ নং শ্লোকটি বৈদিক যুগে নিয়োগ প্রথা চালু থাকার কথা বলেছে। আমরাও মনে করি ঐ ঋগবেদীয় ১০।৪০।২ নং শ্লোকটি বৈদিক ভারতে নিয়োগ চালু থাকার যুক্তিবাহী।

মহাভারতে নিয়োগের অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন দীর্ঘতমা মুনি বঙ্গদেশের রাজা বলির রানি সুদেষ্ণার গর্ভে এই প্রক্রিয়ায় কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। ঋষি পরাশর সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেবকে উৎপাদন করেন। আবার ব্যাসদেব কুরুরাজ বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা পত্নী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁরই দ্বারা অম্বিকার পরিচারিকার গর্ভে উৎপন্ন হন বিদুর। পঞ্চ পাণ্ডব সৃষ্ট হন বিভিন্ন দেবতার দ্বারা পাণ্ডু রাজার দুই পত্নী কুন্তী এবং মাদ্রীর গর্ভে। রাজা সুদাসের পুত্র সৌদাসের রানি দময়ন্তীর গর্ভে ঋষি বশিষ্ট অশ্মককে সৃষ্টি করেন।

অগ্নিপুরাণে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং পঞ্চপাণ্ডবের নিয়োগ অনুসরণে জন্মগ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। গরুড় পুরাণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জাত সন্তানকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণের মতে নিয়োগ অনুসরণ কলিযুগে কার্যকরী নয়। আদি পুরাণ এই নির্দেশিকাকে সমর্থন করেছে।

হোসেনশাহি আমলে চট্টগ্রামে পূর্ত কার্যক্রম ঃ সামাজিক - গুরুত্ব

শামসুল হোসাইন

ভৌগোলিক পূর্ব ভারতের যে সুপ্রাচীন শহরটি সময়ের নানা টানা পোড়েনে ধোপে টিকে আছে নাম তার চট্টগ্রাম। একটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয় এবং বন্দর হিসেবে নগর চট্টগ্রামের গুরুত্ব কেবল বেড়েছে। অ-নাব্যতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার নদীতীরের বিশ্ববিশ্রুত তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ ভিড়তে অসুবিধা দেখা দিলে বিকল্প বন্দর হিসাবে সকলের নজর কাড়ে চট্টগ্রাম। সপ্তম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামে এরকম বন্দর সুবিধা বিদ্যমান থাকার বিষয় ইতিহাস থেকে জানা যায়।[১] এসময় চট্টগ্রাম অঞ্চলে হরিকেল নামের একটি সমৃদ্ধ রাজ্য গড়ে ওঠে এবং বর্তমানের বঙ্গোপসাগরকে অভিহিত করা হতো *হরকন্দ*-এর সমুদ্র নামে।[২] চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে নদী পথে বৃহৎ বঙ্গ এবং আসামের যে কোন প্রান্তে পণ্যদ্রব্য আনা-নেয়া করা ছিল সুবিধাজনক। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দী থেকেই আরব বণিকদের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* এবং সমসাময়িক তাম্রশাসনের সূত্রে জানা যায় যে, তখন উন্নতমানের বিপুল পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হতো বন্দর চট্টগ্রামের পশ্চাদভূমিতে। ধান, আখ, ফলমূল, বনৌষধী, বাঁশ-বেত, জাহাজ নির্মাণে ব্যবহারযোগ্য কাঠ, চন্দন কাঠ, আগর , সমুদ্রজাত লবণ, কাপড় প্রচুর পরিমাণে এই বন্দর দিয়ে রপ্তানি হতো। আরব ভৌগলিক আল-ইদ্রিসির বর্ণনায় চট্টগ্রাম ধন-সম্পদে পূর্ণ একটি বড় শহর যেখানে আকর্ষণীয় মুনাফাতে ব্যবসা করা যায়। নৌ-বাণিজ্যের সুত্রে এ-সময় চট্টগ্রামের যোগাযোগ ছিল দক্ষিণ ভারত, সিংহল, পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সব নৌ বন্দরের সঙ্গে।[৩] চট্টগ্রামের এই নৌ-গুরুত্বের কারণে সন্নিহিত রাজ্যের রাজন্যবর্গের লোলুপ দৃষ্টি ছিল অঞ্চলটির ওপর। বাংলার সুলতান এবং ত্রিপুরা ও আরাকানের অধিপতিদের মধ্যে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের কথা জানা যায়।

ফারসি ঐতিহাসিকদের সূত্র অনুসারে একটি বন্দরে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতো: ১. একটি স্থায়ী বাজার, ২. বাসিন্দারা মূলত অকৃষিজীবী, ৩. ব্যবসাবাণিজ্য এবং হস্তশিল্পের কেন্দ্র, ৪. ব্যবহার্য জলের সহজলভ্যতা, ৫. ছোট বা বড় দুর্গ ও নগর-প্রাকার (চারিদিকে গভীর খাদসহ), ৬. পোতাশ্রয়(যেখানে যাত্রী ও মালামাল উঠা-নামা সহজ) ৭. নদী বা

খালদিয়ে খোলা সমুদ্রে যাওয়ার পথ এবং ৮. মর্যাদানুযায়ী শাসনকেন্দ্র। উপরোল্লিখিত সুবিধাগুলোর সঙ্গে চট্টগ্রামে আরও যুক্ত হয়েছিল বাড়তি কিছু সুযোগ, জল ও স্থলপথে বন্দরের সঙ্গে পশ্চাদভূমির সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা। [৪]

সোনারগাঁয়ের সুলতান ফখর- উদ-দিন মুবারক শাহ ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে কোন সময় চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এই ঘটনার সমসাময়িক পরিব্রাজক ইবন বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরে অনেক জাহাজ দেখতে পান। এই জাহাজগুলো আপদকালে যুদ্ধে এবং শান্তির সময়ে ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করা হতো। সমুদ্র-বন্দর চট্টগ্রাম থেকে নদী-বন্দর সোনারগাঁয়ে জলপথে যাতায়াত সহজ ছিল। ফখব-উদ-দিন এই পথে অপর নদী বন্দর চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথও তৈরি করেন যাতে প্রয়োজনবোধে সমুদ্রপথ পরিহার করেও বন্দর নগরীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই সময়েই চট্টগ্রামে নিশ্চিতভাবে মুসলিম বসতিবিস্তারের বিষয়টি জানা যায় এবং সুলতান এখানে অনেক মসজিদ ও সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। ফখব-উদ-দিনের এই কর্মকান্ডের ফলে চট্টগ্রমের সঙ্গে বৃহৎ বাংলার একটি সুদীর্ঘ সম্পর্কের সূচনা হয়, যা এর আগে হরিকেল নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মূলভূখন্ড ছিল। মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ইলিয়াসশাহি বংশ, রাজা গণেশের বংশ এবং পরবর্তী ইলিয়াস শাসনামলে এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। হাবশী শাসনামলের কোন প্রত্ননিদর্শন চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত না হওয়ায় বা তাদের কোন মুদ্রায় এবং শিলালিপিতে চট্টগ্রামের উল্লেখ না থাকায় এ-সময় বাংলার সঙ্গে চট্টগ্রামের সম্পর্কের হদিস খোঁজা কঠিন হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ হাবসী সুলতানরাও চট্টগ্রাম দখলে রাখতে পেরেছিলেন। বিদ্রোহে হাবশী সুলতান শামস-উদ-দিন মুজাফফর শাহ নিহত হলে আলা-উদ-দিন হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে চট্টগ্রাম তার রাজ্যভুক্ত হয়। [৫]

পুরাকীর্তি দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, হোসেনশাহি সুলতানদের শাসনামলে মধ্যযুগের চট্টগ্রামে স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিরা জনস্বার্থে অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এর মধ্যে সাধারণের কল্যাণে জলাশয়াদি খনন, ভবন নির্মাণ এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক এবং সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে চট্টগ্রামকে হোসেন শাহের শিলালিপিতে 'আরসা' এবং 'থানা' দুই মর্যাদাতেই উল্লেখিত হতে দেখা যায়। [৬]

সুলতান ফখর-উদ-দিন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করে চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করেছিলেন, পুরাকীর্তি নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, হোসেনশাহি আমলে এই রাস্তাটির আশেপাশেই শাসনকেন্দ্র ও জনবসতি বিস্তৃত হয়। আধুনিক মিরশ্বরাই উপজেলার পরাগলপুর এবং সীতাকুন্ড উপজেলার মসজিদ্দায় পরিচিহ্নিত হোসেনশাহি পুরাকীর্তিগুলো এর পাথুরে প্রমাণ হিসেবে টিকে আছে। চট্টগ্রাম জেলার

উত্তর সীমান্ত ফেনী নদীর পাড় থেকে শুরু হয়ে ফখর-ইদ-দিনের রাস্তাটি পরাগলপুর গ্রামের ভেতর দিয়ে বর্তমান ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের প্রায় একই বিন্যাসে দেওয়ানহাটের পোস্তারপাড় হয়ে শহরে প্রবেশ করে, সম্প্রতি পোস্তারপাড়ে আবিষ্কৃত সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শিলালিপি দেখে এ ধারণা করা যায়।[৭] সীতাকুন্ড পর্বতশ্রেণীকে পূর্বে এবং বঙ্গোপসাগরের সৈকতরেখাকে পশ্চিমে রেখে অগ্রসরমান এই প্রাচীন রাস্তাটি চট্টগ্রাম শহরের ভিতর দিয়ে বামে ঘুরে মোগল চকবাজারের অলিখাঁ মসজিদ হয়ে এবার একই সীতাকুন্ড পর্বতশ্রেণীকে পশ্চিমে রেখে হামজারবাগ-চিকনদন্ডী-ফতেয়াবাদ-ফতেহপুর-হাটহাজারী হয়ে রামগড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অনুমান করা যায়। ইংরেজ আমলেই এই রাস্তাকে অভিহিত করা হতো *টিপারা পাস রোড* নামে।[৮] এই রাস্তা সংলগ্ন চিকনদন্ডীর নসরত শাহের মসজিদ, প্রাসাদ ও দিঘি, ফতেহপুরের সুলতান বারবক শাহের আমলের দিঘি ও মসজিদ, হাটহাজারীতে সুলতান ইউসুফ শাহের আমলের দিঘি ও মসজিদ মধ্যযুগের চট্টগ্রামে বসতি বিস্তার সম্পর্কে ধারণা দেয়।

হোসেন শাহের আঠারো পুত্রের মধ্যে নসরত শাহ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। চট্টগ্রামের গুরুত্ব বিবেচনা করে সুলতান তাকেই 'আরসা চাটগাঁও' এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।[৯] এসময় আরাকানের মগ রাজা চট্টগ্রাম দখল করলে নসরত তাদের বিতাড়িত করেন হাটহাজারী উপজেলার চিকনদন্ডী মৌজায় তিনি এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছয় গম্বুজের একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। এই স্থাপত্যটি অলঙ্কৃত ইট দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের ঐতিহাসিক হামিদ-উল্লাহ্ খান দিঘির পাড়ে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও স্বচক্ষে দেখার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।[১০] সম্প্রতি মসজিদটির ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত পাথরে তৈরি স্থাপত্যকাঠামোর অংশবিশেষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে সংরক্ষিত হয়।

হোসেন শাহের শাসনামলে বাংলা সলতনতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের একটি বিস্তীর্ণ অংশ ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য দখল করে নিয়েছিলেন বলে *রাজমালার* সূত্রে জানা যায়। ১৫১৩ ও ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রামও আক্রমণ করেন।[১১] পর্তুগিজ বিবরণ, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের সাক্ষ্য বিশ্লেষণের পর প্রফেসর আবদুল করিম মনে করেন যে ধন্যমাণিক্যের চট্টগ্রাম আক্রমণ বা জয় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ছিল।[১২] প্রকৃতপক্ষে হোসেন শাহ চট্টগ্রামের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান অনুধাবনে সক্ষম হন এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক গুরত্বসম্পন্ন এই 'আরসা' -র সামরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উত্তরে খরস্রোতা ফেনী নদী, দক্ষিণে কর্ণফুলী, পূর্বে দুর্ভেদ্য পার্বত্য অঞ্চল এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর - এই ছিল সুলতানী আমলের 'আরসা চাটগাঁও' - এর সীমানা। উত্তর থেকে এই 'আরসা'-র উপর ত্রিপুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য হোসেন শাহ ফেনী নদী সংলগ্ন এলাকায়

একটি স্থায়ী অগ্রবর্তী সামরিক চৌকি স্থাপন এবং পরাগল খাঁকে তার সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।[১৩] সেনাধ্যক্ষের নামানুসারে এই চৌকি সংলগ্ন এলাকা পরাগলপুর নামে খ্যাত হয়। পরাগল খান এবং তৎপুত্র ছুটি খানের নামবাহী দু'টি বড় দিঘি এবং এসব দিঘির পাড়ে দু'খানা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ হোসেনী পূর্তকর্মের স্বাক্ষ্য বহন করে। ছুটি খাঁর মসজিদের ভগ্ন দেয়ালে পোড়াইটের কারুকাজ স্থাপত্য অলঙ্কারের অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে টিকে আছে। পরাগলপুরের উত্তর সীমানায় ধূম মৌজায় হোসেন শাহের সেনাপতি হৈতন খাঁর নামাঙ্কিত একটি দিঘির-অবশেষ ভরাট অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। পরাগলপুর ও তৎসন্নিহিত এলাকার আরো তিনটি বড় বড় দিঘি পূর্বে বর্ণিত দিঘিগুলোর সমসাময়িক কালে খোদিত মনে হলেও বাবুখাঁর দিঘি, মাছু খাঁর দিঘি বা ছদার মার দিঘি নামকরণ থেকে স্মারক ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা চিহ্নিত করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।[১৪] সামরিক-কৌশলগত স্থানে একাধিক দিঘির সন্নিহিত অবস্থান এই অনুমানকে জোরদার করে।

সুলতানী আমলে চট্টগ্রামের সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ এলাকা ছিল কর্ণফুলী নদীর মোহনা ও বন্দর সংলগ্ন তীর। হোসেন শাহ্ এর প্রতিরক্ষায়ও নজর দিয়েছিলেন বলে তার পোস্তারপাড় শিলালিপির পাঠ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, সেকালের পোস্তারপাড় এলাকা ছিল ফখর-উদ-দিনের রাস্তা ধরে শহরে প্রবেশ দ্বার। তেমনি কর্ণফুলী তীরের মগঘাট থেকে একটি খাল বেয়ে শহরে ঢোকার একটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথও ছিল এই এলাকা সংলগ্ন।[১৫] হোসেন শাহ্ এখানে থানা স্থাপন করে অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ মজলিস খুরশিদকে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। দক্ষিণের আরাকানীদের লোলুপতা থেকে সুলতানী বন্দর চট্টগ্রামকে রক্ষার ক্ষেত্রে এই থানা কৌশলগত অবদান রেখেছিল বলে মনে হয়। হোসেন শা'র পুত্র গিয়াস-উদ-দিন মাহমুদ শাহ পরাগলপুর পোস্তারপাড়ের মাঝামাঝি ফখর-উদ-দিনের সড়ক সংলগ্ন সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা নামক অপর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ ও দিঘি খনন করেন।

উপযুক্ত আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, হোসেন শাহ ও তার বংশের সুলতানেরা বন্দর চট্টগ্রাম এবং এর সন্নিহিত জেলার সামাজিক-সামরিক গুরুত্ব অনুধাবন করে এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষায় যথাযথ মনোযোগ দিয়েছিলেন। কুলগাঁও - পাঁচলাইসের কৌশলগত জলা জায়গাকে সামনে রেখে স্থাপিত হয় চিকনদন্ডী-বড়দিঘি কেন্দ্রিক শাসনকেন্দ্র। এর পশ্চাদ-প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতো পরবর্তী ইলিয়াস শাহি সুলতানদের আমলে প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানপুর - ফতেহপুর চৌকি থেকে। ত্রিপুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পরাগলপুরে এবং আরাকানী অভিযান থেকে সুরক্ষার জন্য পোস্তারপাড়ে স্থাপিত হয় সুযোগ্য সেনাধ্যক্ষের অধীনে সামরিক চৌকিগুলো এবং কুমিরায় বিরামকেন্দ্র। এই সামাজিক-সামরিক ব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে হোসেনশাহি রাজপ্রতিনিধিরা যে অনেক পূর্তকর্ম সম্পাদন করেছিলেন তার কিছু তথ্য আমরা ইতোমধ্যেই জেনে গিয়েছি।।

সূত্র - নির্দেশ

১) এ.এইচ.দানি, "আর্লি মুসলিম কনট্যাক্ট উইথ বেঙ্গল", *প্রসিডিংস অব দ্য অল পাকিস্তান হিস্ট্রি*, কনফারেন্স ফাস্ট সেশন, করাচি ১৯৫১, পৃ. ১৮৪ -২০২।

২) বি.এন.মুখার্জি, "অরিজিনাল টেরিটরি অব হরিকেল", *বাংলাদেশ ললিতকলা*, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, ১৯৭৫, পৃ. ১১৫-১১৯।

৩) বি.এন.মুখার্জি, "কমার্স অ্যান্ড মানি ইন দ্য ওয়েস্টার্ণ অ্যান্ড সেন্ট্রাল সেক্টরস অব ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া (সি.এ.ডি. ৭৫০ - ১২০০)", *ইন্ডিয়ান ম্যুজিয়ম বুলেটিন*, ১৭ খন্ড ১৯৮২, পৃ. ৬৫-৮৩।

৪) এম.পি.সিংহ, *টাউন মার্কেট, মিন্ট অ্যান্ড পোর্ট ইন দ্য মোগল এমপায়ার*, নতুন দিল্লি ১৯৮৫, পৃ. ১-২।

৫) আবদুল করিম *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭, পৃ.১৬৬-৩০০।

৬) আবদুল করিম, *করপাস অব দ্য এ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান ইনসক্রিপসনস অব বেঙ্গল*, ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৩২০-৩২৩।

৭) প্রাগুক্ত , পৃ. ৩২০।

৮) নুর আহমদ(বক্তৃতা) "চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটির ইতিহাসের যৎকিঞ্চিত ", *পূরবী*, ১ম খন্ড, ৮ম সংখ্যা(জৈষ্ঠ্য ১৩৪৪),পৃ. ৩৫৩-৩৫৪।

৯) করিম: *সুলতানী আমল*, পৃ. ৩৪৫।

১০) মৌলভি হামিদুল্লাহ খান, *আহাদিসুল খাওয়ানিন*, কলকাতাঃ ১৮৭১, পৃ. ১৯।

১১) কালীপ্রসন্ন সেন, *শ্রীরাজমালা*, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ, পৃ. ২২-২৪।

১২) করিম, *সুলতানী আমল*, পৃ. ৩২৫।

১৩) দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলকাতা ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৯৪।

১৪) চৌধুরী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম ১২৮২ মাঘ, ১ম খন্ড, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ২৬।

১৫) ক্যাপ্টেন পগসন, *ন্যারেটিভ ডিউরিং আ্যা টার ট চাটিগাঁও ১৮৩১*, শ্রীরামপুর ১৮৩১, পৃ. ৪৭।

প্রাথমিক সূত্রের আলোকে হুসাইনশাহি যুগে বাংলার সংস্কৃতি

এ কে এম শাহনাওয়াজ

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে স্বাধীন সুলতানী শাসনপর্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই যুগপর্বের সাংস্কৃকিত জীবনে হুসাইনশাহি যুগের(১৪৯৩ -১৫৩৮ খ্রিঃ) অবস্থান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সমসাময়িক কালে বাংলায় কোন ইতিহাস গ্রন্থ লিখিত না হওয়ায় এ সময়ের সাংস্কৃতিক জীবনের স্বরুপ উম্মোচন করা কষ্টসাধ্য। তাই প্রাথমিক সূত্র-বিশেষ করে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রের বিশেষ ব্যবহার এবং সমসাময়িক সাহিত্যিক সূত্রের সমন্বয়ে হুসাইনশাহি যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠন করার প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে। হুসাইনশাহি যুগের প্রতিষ্ঠাতা কীর্তিমান সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহসহ এই বংশের মোট চারজন সুলতান রাজত্ব করেন। এঁদের প্রত্যেকে সমান যোগ্যতা প্রদর্শন করতে না পারলেও এই যুগপর্বের স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে ও সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে লক্ষণীয় বিকাশ সাধিত হয়। সুলতানী যুগে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল হুসাইন শাহি পর্বে সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়েছিল। এ সময়ে কেন্দ্রে সুলতান এবং রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁদের অমাত্যরা বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে সমগ্র হুসাইন শাহি যুগের বিশেষ খ্যাতি ছিল। এযুগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাধি ইত্যাদি নির্মিত হয়। স্থাপত্যসমূহের ধ্বংসাবশেষ এবং সমসাময়িক শিলালিপি-ভাষ্যে এর সাক্ষ্য রয়েছে। হুসাইন শাহি যুগে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে সংঘটিত নব্যবৈষ্ণব আন্দোলন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুফিবাদ যে প্রভাব বলয় তৈরি করেছিল সেই প্রেক্ষাপটের মধ্যদিয়েই নব্যবৈষ্ণব আন্দোলনের উদ্ভব। মঙ্গল কাব্যের মতো বৈষ্ণব সাহিত্যও এদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বিকশিত করে। সুলতানী বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত শক্ত ছিল বলেই প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ হিন্দু আমলা আর সমরনায়কদের হাতে ছেড়ে দিতে এ যুগের সুলতানগণ কিছু মাত্র দ্বিধা করেননি চৈতন্যচরিত কাব্যগুলোতে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হুসাইন শাহি যুগের পরিবেশ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলার সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা,

সাহিত্য—এক কথায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজ ও ধর্মাশ্রয়ী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এটি ছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এদেশে ইসলামী সংস্কৃতি প্রবেশের অন্যতম ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যদিয়ে। মধ্যযুগে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম সমাজ সম্প্রসারণের চেষ্টা চললেও বাঙালি সংস্কৃতি অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্নতর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলার মুসলিম শাসনকর্তাগণ ক্রমাগত দিল্লীর মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই স্বাতন্ত্রকেই যেন প্রকাশ করতে চেয়েছেন। দিল্লী থেকে বাংলার ভৌগলিক দূরত্ব, সমৃদ্ধ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, গাঙ্গেয় উপত্যকার সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাঙালির একচেটিয়া আধিপত্য ইত্যাকার কারণ বাঙালিদের পাশাপাশি তুর্কি শাসকদেরও মধ্যেও স্বাধীন থাকার প্রেরণা যুগিয়েছিল। দিল্লীর আক্রমণ—উপর্যুপরি বিদ্রোহ ও পরাজয় বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু সমাজকে সংহত ও আত্মসচেতন করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে চর্তুদশ শতাব্দীর মাঝপর্বে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন সুলতানী যুগের গঠন পর্ব পরিচালিত হয়েছিল ইলিয়াস শাহি শাসন যুগে (১৩৪২-১৪১৫ খ্রিঃ) রাজা গণেশের অভ্যুত্থানের কারণে। অতঃপর বাংলার স্বাধীনতার সাময়িক অবসান ঘটে। হুসাইন শাহি শাসন পর্ব শুরু হওয়ার পূর্বতন প্রায় ছয় বৎসর বাংলার শাসন ক্ষমতা হাবশীদের অধিকারে চলে গিয়েছিল। দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ এই কালপর্বে সুলতানী বাংলার সার্বিক বিকাশ ব্যাহত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে স্থিতিশীল ও মহিমান্বিত করার অভাব পূরণ করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের অন্য সুলতানগণও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। আর এরই প্রতিফলন হিসাবে হুসাইন শাহি যুগে বাংলার সংস্কৃতির সার্বিক বিকাশ সাধিত হয়।

হুসাইন শাহি যুগে বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিভিন্ন দিক থেকে উজ্জ্বল হয়েছিল। এ যুগে বাংলার সীমারেখা বিস্তৃত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার সীমান্ত ছাড়া সর্বত্র স্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। রাজ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রজারঞ্জক। ফলে ধর্ম-নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে মানসিক নৈকট্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ কালপর্বে উচ্চ রাজপদে হিন্দুর অংশগ্রহণের সুযোগ যেমন বেড়েছিল তেমনি ভাবে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সুযোগও হয়েছিল প্রসারিত। হুসাইন শাহি যুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনের ভাব-বন্যা বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের গতি সঞ্চারিত হয়। হুসাইন শাহি যুগের সহযোগী পরিবেশ বাংলার স্থাপত্যকলাকে বিকশিত করে। সুতরাং এ সংক্রান্ত বিষয়ের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের মধ্যদিয়েই সম্ভব হুসাইন শাহি যুগের বাংলার সস্কৃতিকে উপলব্ধি করা।

হুসাইন শাহি যুগের প্রথম পুরুষ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। প্রাথমিক সূত্র মুদ্রা ও শিলালিপিসমূহ থেকে একজন সফল বিজেতা এবং সুলতান হিসাবে তঁকে দেখতে পাই। হুসাইন শাহ ধর্মের ব্যাপারে উদার মত পোষণ করতেন বলে একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রথম দৃষ্টান্তটি দেওয়া যায় মুসলিম সুলতানদের মুদ্রায় উৎকীর্ণ বক্তব্য থেকে। হুসাইন শাহ-পূর্ববর্তী অধিকাংশ সুলতানের মুদ্রার বিপরীত পিঠে খিলাফত বর্ণনাকালে উৎকীর্ণ হয়েছে—

بيمين خليفة الله ناصر امير المومنين
غوث الاسلام والمسلمين خلدت خلافته

(ইয়ামিন খলিফাতুল্লাহ নাসির আমির আল মুমেনিন গাউসুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমিন খুল্লদাত খলিফাতে)

সুলতান সিকান্দর শাহের মুদ্রা থেকে এই উদ্ধৃতি নেওয়া হলেও অন্যান্য অনেক সুলতানের মুদ্রায় প্রায় অভিন্ন লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। লিপি-ভাষ্য অনুযায়ী সুলতানগণ নিজেদের 'ইসলাম ও মুসলমানের সহায়তাকারী' বলে প্রকাশ করেছেন। এই বক্তব্য মুসলমান জনগোষ্ঠী অথবা মুসলিম সমাজের আনুকূল্যে সুলতানদের একদেশদর্শিতার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এই ধারণার এক বিরাট পরিবর্তন আসে হুসাইন শাহ ও তাঁর পরবর্তী সুলতানদের লিপি-ভাষ্যে। তাঁরা লিপিতে এধরণের পক্ষপাতমূলক বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় হুসাইন শাহের রাজ্য পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী নিয়োজিত থাকা। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য একটু ভিন্ন। তাঁর মতে হিন্দু কর্মচারীরা অত্যন্ত দক্ষছিলেন বলেই হুসাইন শাহ তাঁদের উচ্চ পদে বহাল রেখেছিলেন। এতে রাজা হিসাবে তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবের প্রমাণ মেলে না।[২] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মের ব্যাপারে একজন অনুদার শাসক দক্ষ বিধর্মী কর্মচারীদের কতখানি গ্রহণ করবেন? যেহেতু সাধারণ অর্থে হিন্দুরা পরাজিত শক্তি এবং সেই অর্থে মুসলমান শাসকদের শত্রুপক্ষ। একজন রাজা বা শাসকের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব শত্রুপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া নিশ্চয়ই সমীচীন হবে না। অন্তত হুসাইন শাহ যাঁকে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাঁর পক্ষে তো এমন আত্মঘাতী কাজ করা সম্ভব নয়! বাংলার ইলিয়াস শাহি সুলতানদের সময় থেকেই হিন্দুদের রাজ পদে নিযুক্ত করা হতে থাকে। সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহের সময়কালে সেনাপতি এবং রুকন উদ্দিন বারবক শাহের সময়(১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) সুলতানের মন্ত্রী, খাস চিকিৎসক, সীমান্তঅধিকর্তা প্রভৃতি উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিযুক্ত করা হয়। হুসাইন শাহের সময় এই গতিধারা আরও ব্যাপকতা অর্জন করে। রাষ্ট্রের জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে তিনি

হিন্দুদের নিয়োগ করেন। কেশব বসু বা খান বা ছত্রী ছিলেন হুসাইন শাহের প্রসাদ রক্ষী পাইকদের নেতা বা সেনাপতি, রূপ ও সনাতন ছিলেন তাঁর দবীর-ই-খাস অর্থাৎ একান্ত সচিব, হিন্দু ও শত্রু রাজ্য উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলের শাসক ছিলেন রামচন্দ্র খান, গোড়াই মল্লিক ছিলেন অন্যতম সেনাপতিএবং মুকুন্দ রাম ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। এছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিযুক্ত করা হয়।[৩] এইসব নিয়োগ থেকে বোঝা যায় হিন্দুদের প্রতি হুসাইন শাহের পূর্ণ আস্থা ছিল। ধর্মের ব্যপারে উদার ও সমদর্শী না হলে একজন সুলতানের পক্ষে তাঁর জীবন রক্ষার এবং রাজ্যের গোপন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ দেখাশোনার ভার বিধর্মী ব্যক্তিদের উপর সমর্পণ করা সম্ভব হতো না।

উপরের আলোচনা থেকে অমুসলিম প্রজাসাধারণের প্রতি সুলতানদের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তাতে হুসাইন শাহি যুগের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা ও জনমানসের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুরা যাতে নির্বিঘ্নে ধর্মাচারণ করতে পারেন তার জন্যও হুসাইন শাহ উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি কাজী ও কোতোয়ালদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন চৈতন্যদেবের ধর্মকাজে বাধা দানকারীদের যেন প্রাণদণ্ড দেয়া হয়।[৪] ধর্মাচারণের এই স্বাধীনতা সাধারণ হিন্দুরাও ভোগ করতো। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় হুসাইন শাহের সৈন্য বাহিনীর হিন্দু সেনারা গোমতির তীরে পাথরের প্রতিমা পূজা করেছিল।[৫] সমকালীন হিন্দুরা হুসাইন শাহকে একজন মহান সুলতান হিসাবেই মনে করতেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর 'মহাভারতে' হুসাইন শাহকে 'কলিযুগের কৃষ্ণ অবতার' এবং শঙ্কর বিজয় মিত্র তাঁর 'গোধী মঙ্গল' কাব্যে তাঁকে কলি যুগের রাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

সুতরাং এ সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রমাণ করছে যে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের শাসনকাল বিশেষ করে সুলতানী যুগের শেষ পর্বে এসে এদেশের ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সমাজে একটি উদারনৈতিক পরিবেশের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতো বাংলার সাংস্কৃতিক কাঠামোতে ধর্মের অবস্থান অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। অন্যভাবে বলা যায় ধর্ম বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে একটি কাঠামোতে এনে দাঁড় করিয়েছে এবং তাকে নানা বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট করেছে। মধ্যযুগে বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন মুসলমান শাসকগণ। ফলে এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। এর দুটো সাধারণ কারণ লক্ষণীয়, প্রথমত দীর্ঘদিনের হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের প্রভাব এবং এই ধর্মের ক্রমবিস্তার, দ্বিতীয়ত দেশীয় সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রবেশ করা ইসলামি সংস্কৃতির মিশ্রণ, এই দুই মিলে রূপান্তরিত যে বাঙালি সংস্কৃতির রূপরেখা প্রতিষ্ঠা পায় তা একটি নিজস্ব আঙ্গিক নিয়ে উপস্থিত হয়।

সমকালীন মুদ্রা ও শিলালিপি বিশ্লেষণ করে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের কিছুটা ছায়া খুঁজে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে তাতে ইসলাম ও মুসলিম শাসনের সংস্পর্শে

সংস্কৃতির অবস্থান যতটা স্পষ্ট অন্য ধর্মের সংস্পর্শে ততটা নয়। বাংলার মুসলিম শাসন স্বাভাবিক ভাবেই ইসলামি বিশ্বাস ও মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশকে সহায়তা করেছিল। এ যুগের বাংলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের হাতে গড়ে ওঠা দুই সংস্কৃতির মধ্যে যেমন ছিল দ্বন্দ্ব তেমনি পারস্পরিক সহাবস্থান ও ভাবের মিশ্রণের উদাহরণও ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা চলে যে, বাংলার মুসলমান শাসকদের মুদ্রা তৈরিতে মুসলিম রীতির পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল। এখানে বাঙালি সংস্কৃতির বদলে ইসলামি সংস্কৃতির প্রকাশই ঘটেছে পরিপূর্ণভাবে। মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি ছিল প্রধানত আরবি ভাষায়। সাধারণত সংশ্লিষ্ট সুলতানের নাম, টাকশাল ও উৎকীর্ণকাল উল্লেখ ছাড়াও মুসলিম প্রথা অনুযায়ী কলিমা খোদাই ও খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হতো। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাংলার মুসলমান শাসকদের একদেশদর্শিতা বলে ধারণা করা ঠিক হবে না। কারণ বাংলার সুলতানগণ সমকালীন বাংলার প্রচলিত মুদ্রার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলে তাঁদের এই দেশীয় রীতিতে প্রভাবিত হয়ে নিজস্বতা প্রকাশের সুযোগ ছিল না। সেন যুগের কোন মুদ্রা আমাদের হস্তগত হয়নি। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কড়ির ব্যবহারের কথা ইতিহাসে জানা যায়।[৭]

মুসলমান শাসকদেব ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সঙ্গে আবার কখনও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তন সমকালীন বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। মুসলমান সুলতানগণ বিভিন্নভাবে খিলাফতের প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন বা নিজেদের বিশেষিত করেছেন। হুসাইন শাহি সুলতানগণ এ দিক থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। হুসাইন শাহ মুদ্রার একপিঠে কলিমা উৎকীর্ণ করে অপর পিঠে নিজ নামের পূর্বে লিখেছেন[৮] ولد سيد المرسلين (ওলাদ সাইয়েদাল মুরসালিন) অর্থাৎ তিনি নিজেকে নবীর বংশধর বলে দাবি করেছেন। এ ধরণের দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা যায় যে হুসাইন শাহি সুলতানরা কোন না কোন ভাবে স্বীয় ধর্মের প্রতি অনুরক্তি দেখিয়েছেন। এই ধরণের রাজাদর্শ সমকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক কাঠামোকে স্বাভাবিক ভাবেই নাড়া দিয়েছিল। এই যুক্তি ঠিক যে হুসাইন শাহি যুগের সাংস্কৃতিক বিকাশ পূর্ববর্তী মুসলিম শাসন পরিবেশেরই ধারাবাহিকতা। মুসলিম মুদ্রা ও শিলালিপিতে মুসলিম ধর্মাদর্শ প্রাধান্য পেলেও নিজ ধর্মের প্রতিই যে সুলতানগণ রক্ষণশীল ছিলেন তা বলা যাবে না। এদিক থেকে লক্ষণীয় উদাহরণ হচ্ছে বাংলার মুসলিম সুলতানদের কিছু মুদ্রায় প্রাণী-প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ থাকা।[৯] মুসলিম ধর্মাদর্শ প্রাণী-চিত্র অঙ্কন সমর্থন করে না। অথচ যে মুদ্রাতে সুলতানগণ নিজেদের ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী বলেছেন এবং কলিমা উৎকীর্ণ করেছেন সেই একই মুদ্রায় আবার প্রাণী প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন। এদিক থেকে বখতিয়ার খলজি (১২০৪-১২০৬ খ্রিঃ), কুতুবউদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১০ খ্রিঃ) এবং শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের (১২১১-১২৩৬ খ্রিঃ) প্রেরিত

শাসনকর্তা আলীমর্দান খলজির (১২১০-১২১২ খ্রিঃ) স্বর্ণমুদ্রায় অশ্বারোহী মূর্তির নকশা উৎকীর্ণের কথা উল্লেখ করা যায় নাসিরউদ্দিন মাহমুদ (১৪৩৬-১৪৫৯ খ্রিঃ) ও জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহের মুদ্রায় রয়েছে সিংহের প্রতিকৃতি।[১০] এছাড়াও জালালউদ্দিন ফতেহ শাহের (১৪৮১-১৪৮৮ খ্রিঃ) একটি মুদ্রায় সাত রশ্মি সংযুক্ত সূর্যের প্রতীক রয়েছে।[১১] মুদ্রায় এভাবে হিন্দু সংস্কৃতি প্রশ্রয় পাওয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠার ইঙ্গিত প্রকাশ করে। এরই সমর্থন পাওয়া যায় মঙ্গল কাব্যসমূহে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার সুন্দর সম্পর্কের কথা মঙ্গল কাব্যসমূহে চিত্রিত হয়েছে। কবি বিজয়গুপ্ত মুসলিম শাসকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাঁর কাব্যে। তিনি জানাচ্ছেন সুলতান হুসাইন শাহের রাজত্বকালে বাংলার প্রজারা অতি সুখে দিন অতিবাহিত করতো এবং রাজা হুসাইন শাহ ছিলেন রামতুল্য শাসক।[১২]

মুসলিম স্থাপত্যে অনেক সময় হিন্দু মন্দিরের নানা উপাদান ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে। আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের সময় ৯১২ হিজরি অর্থাৎ ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের মাহিসন্তোষে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের গায়ে সংস্থাপিত একটি কালো ব্যাসল্ট পাথরের এক পিঠে মসজিদ নির্মাণের স্মারকলিপি উৎকীর্ণ ছিল, অপর পিঠটি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, এটি ছিল একটি বিষ্ণু মূর্তির স্তম্ভ এবং তার চারপাশে পদ্ম ও অন্যান্য প্রতীক অলঙ্কৃত ছিল।[১৩] পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও পরিবেশ অনেকটাই নিশ্চিত করছে যে সাম্প্রদায়িক হিংসার কারণে মূর্তি বা মন্দির ভাঙ্গা হয়নি, এগুলো পরিত্যক্ত উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে হুসাইন শাহি যুগে হিন্দু-মুসলমানের সহজ সম্পর্কের বিষয়টি স্মরণ করা যেতে পারে যা পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

সুলতানী যুগে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের সময় সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়েছিল। তাঁর সময় অনেক কবি সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর অমাত্যরাও বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[১৪] শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে সমগ্র হুসাইন শাহি যুগেরই বিশেষ খ্যাতি ছিল।[১৫] হুসাইন শাহ সুফি নূর কুতুব আলমের সমাধি এবং সমাধি সংযুক্ত মাদ্রাসা ও চিকিৎসায়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু জমি দান করেছিলেন।[১৬] এই মাদাসার ধ্বংসাবশেষ এখনও গৌড়ের সাগর দিঘির পাড়ে রয়েছে। হুসাইন শাহের সময় শিলালিপির ভাষ্যেও মাদ্রাস তৈরির কথা জানা যায়। ৯০৭ হিজরি অর্থাৎ ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপির[১৭] শুরুতেই 'জ্ঞান অন্বেষণে প্রয়োজনবোধে সুদূর চীনে যাওয়ার' বহুল প্রচারিত হাদিসটি উৎকীর্ণ করে হুসাইন শাহ শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠার মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। মাদ্রাসায় ধর্মের বৈজ্ঞানিক দিক ও বিভিন্ন তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হতো বলে শিলালিপি থেকে জানা যায়। অধুনা প্রত্নতাত্ত্বিক খননে হুসাইন শাহের সময়ের আরেকটি মাদ্রাসার সন্ধান পাওয়া যায়। রাজশাহীর শিবগঞ্জ থানার ঘোষপুরে একটা বড় দিঘির পূর্ব পাড়ে এই মাদ্রাসাটি অবস্থিত

ছিল। এর অবস্থান ছোট সোনা মসজিদ থেকে দুই মাইল দূরে। ৯০৯ হিজরি অর্থাৎ ১৫০৩-০৪খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে স্পষ্টতই মাদ্রাসা নির্মাণের কথা রয়েছে।[১৮]

হুসাইন শাহি যুগের দ্বিতীয় সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের সময়কালে ঢাকার সোনারগাঁওয়ে একটি মসজি নির্মাণের স্মারক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। লিপি উৎকীর্ণকাল ৯২৯ হিজরি অর্থাৎ ১৫২২ খ্রিস্টাব্দ। লিপিভাষ্যে মসজিদের নির্মাতা হিসাবে 'মালিক-উল-উমারা-আল-ওয়াজারার' নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে প্রধান আইনবিদ ও হাদিসের শিক্ষক।[১৯] স্বাভাবিক ভাবে এসময় এধরণের পণ্ডিতদের অনকূল্যে সোনারগাঁও অঞ্চলে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।

হুসাইন শাহি যুগে সুফি সাধকদের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে এ জাতীয় ধারার সামগ্রিক দৃশ্যপট উন্মোচন সম্ভব নয়। একই ভাবে এ যুগে শ্রী চৈতন্যের নেতৃত্বে সংঘটিত নব্য বৈষ্ণব আন্দোলন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবল আলোড়ন তুলে শ্রী চৈতন্যের জীবন ও বাণী বাংলার ধর্ম ও সাহিত্যে তথা সংস্কৃতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে।

হুসাইন শাহি যুগের সংস্কৃতি আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে সুলতান হুসাইন শাহের পুত্র গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের একটি লক্ষণীয় শিলালিপির কথা উল্লেখ করা যায়। দিনাজপুরের ধোরাইলে প্রাপ্ত একটি সেতু নির্মাণের স্মারক ছিল এই শিলালিপিটি। আরবি-ফারসি ভাষায় লিপি উৎকীর্ণের দীর্ঘ দিনের রীতি ভেঙ্গে এই শিলালিপির পুরো লিপিবিন্যাস ঘটানো হয়েছে বাংলা-আশ্রয়ী সংস্কৃত ভাষায়। উৎকীর্ণকাল হিজরির বদলে এদেশীয় রীতি অনুযায়ী শকাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।[২০] দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সুলতানদের লিপি অঙ্কন তাই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বিশেষ যুগপর্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সামগ্রিকতা উপস্থাপন সম্ভব নয়। সেই অর্থে হুসাইন শাহি যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণ চিত্র অঙ্কন বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নয়। প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র-বিশেষ করে সমকালীন মুদ্রা এবং শিলালিপির বক্তব্য ও ইঙ্গিত পরীক্ষা করে আমরা যে ছবির আভাস পেয়েছি তাতে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে হুসাইন শাহি যুগের স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের পথ ধরে সাংস্কৃতিক অঙ্গন চমৎকার ঔজ্জ্বল্যে বিকশিত হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১) Abul Karim : *Catalogue of Coins in the Cabinet of the Chittagong, University Museum*, Chittagong University, 1976, p. 46

২) সুখময় মুখোপাধ্যায়. *বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর(স্বাধীন সুলতানদের আমল)*, কলিকাতা ১৯৮০, পৃ-২৩৪

৩) বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, *শ্রীচৈতন্য ভাগবত*, অন্তখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্য চরিতামৃত(লঘু সংস্করণ), দিল্লী, সাহিত্য আকাদেমী, ১৯৭৭, পৃ-৯৪।

৪) বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১১।

৫) কুমুদ রঞ্জন দাস, হোসেন শাহী সুলতানদের রাজদর্শ, *ইতিহাস অনুসন্ধান*-২, কলিকাতা ১৯৮৭, পৃ-১১৩।

৬) সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৬,২৩৪।

৭) D.C.Sircar, *Coins in the Inscriptions of the Pala and Senas of Eastern India, Journal of the Numismatic Society of India* (JNSI), Vol-XXXVI,1974, pp.71-72S

৮) Nelson Wright, *Catalogue of the Coins in the Indian Museum*, Calcutta 1972, Delhi, p. 172S

৯) Ahmad Hasan Dani , *Did Ghiath-Uddin Iwad Khalji of Bengal Received Investiture from the Khalifah? JNSI, Vol-XVI*, Part-11, 1954, pp. 246-47.

১০) এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ-৪১

১১) ঐ

১২) বিজয় গুপ্ত , *মনসা মঙ্গল*, কলিকাতা, ১৯৪৩

১৩) Shamsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal*, Rajshahi, Varendra Research Museum, 1960, Vol-IV, p.179

১৪) আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ-৪০৭

১৫) S.M.Jaffar, *Education in Muslim India*, 1st ed. Delhi, 1972, pp. 67-68

১৬) G.Stewart, *History of Bengal,* London, 1813, p.113

১৭) Shamsuddin Ahmed, প্রাগুক্ত, p.159

১৮) এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭০

১৯) Shamsuddin Ahmed, প্রাগুক্ত, p.159

২০) এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৬-৭৭

বীরভূমের প্রাচীতম সুফিকেন্দ্র এবং তারপ্রভাব

আভাস সালাম

আমাদের দেশে প্রাচীনকালের লিখিত ইতিহাস নেই বললেই চলে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদি আবিস্কৃত হয়ে চলেছে ফলে আজকের রচিত ইতিহাস ও সংযোজন ও পরিমার্জন প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এছাড়া বর্তমানে স্থানীয় ইতিহাস (Local History) ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমার আলোচনার বিষয় মধ্যযুগের হলেও তা স্থানীয় ইতিহাস চর্চাকে সমৃদ্ধ করবে আশা রাখি।

বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত অদূরবর্তী সিয়ান গ্রামের শাহজাপুরে জালালের মাজার (দরগা) নামে পরিচিত, তার প্রবেশদ্বারে দুটি আরবি লিপি উৎকীর্ণ আছে।

ডঃ জেড. এইচ দেশাই এর পাঠোদ্ধার করেছেন Epigraphica Indica, Arabic & persion Supplement (1975.PP 7-8).তার বঙ্গানুবাদ করলে এইরকম অর্থ দাঁড়ায় —

আল্লার শুভ যিনি করুণাময় এবং দয়াশীল, আরম্ভ করিতেছে ইহাতে এমন সব লোকজন আছেন যাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য আল্লার স্মরণ এবং গুণকীর্তন হইতে বিরত করে না, তাহারা সেখানে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় আল্লার শুভ নাম করেন। দেয় অর্থ নিয়মিত প্রদান করেন এবং পরকালের সেই দিনটিকে ভয় করেন, যেদিন মানুষের হৃদয় ও দৃষ্টি সমুহ পরিবর্তিত হইবে।

হজরৎ মহম্মদ আল্লার প্রেরিত দূত হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে মানুষ সকল উপাসনা গৃহে রত এবং ব্যস্ত থাকেন, তখন আল্লা, তাদের প্রয়োজন সমাধানের জন্য তৎপর উৎসুক হন। এই খানকাহ্‌টি বিনম্র অপরাধী যে সুফিদের স্বার্থ বিধার্থে নিজর শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। ঐ সমস্ত সুফি যাহারা আল্লাকে স্মরণ করিয়া থাকেন।

আলি শের বিনইয়াদ ৬১৮ হিজরি

(১২২১ খ্রিঃ)

এই শিলালিপিটি বিশেষ মূল্যবান। কারণ বাংলার মুসলমান আমলের এটিই প্রথম

শিলালিপি(১২২১ খ্রিঃ) বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের মাত্র ১৭ বছর পরে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল। এছাড়া বীরভূমের অভ্যন্তর প্রদেশে অজয় নদের অনতিদূরে মুসলিম রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল যা প্রায় নতুন খবর বললেই চলে। কিন্তু এটা হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না বরং স্বাভাবিক কারণ সিয়ান নদীয়া ও লখনোরে মাঝখানে অবস্থিত। এই শিলালিপিতে একটি খানকাহ্ বা সুফি দরবেশদের ধর্মশালা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। খানকাহ্ প্রতিষ্ঠায় ক্রান্ত শিলালিপি ভারত উপমহাদেশে খুব কমই আছে। মীনহাজের তবকাৎ - ই-নাসিরীতে বখতিয়ারের খানকাহ্ স্থাপনের উল্লেখ আছে, ইওজশাহের রাজত্বকালেও সেই প্রথা চলছিল তার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া ইওজশাহের পূর্বোক্ত মুদ্রায় (৬১২ হিজরার) যে মুইজদ্দীনের উল্লেখ আছে, তিনি এবং এই শিলালিপিতে উল্লিখিত আলি শের অভিন্ন লোক। ডঃ দেশাই বলেন Ali Shir mentioned in our record (শিলালিপি) on son of Iwad is identical with him (মুইজদ্দীন) and the Iwad of the record is none other than ghiyathud-Din-Iwad.

এই মুইজউদ্দিন বা আলি শের ১২২১ খ্রিঃ এ তাঁর পিতা গিয়াসউদ্দিন ইওজশাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে সিয়ান ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলি শাসন করতেন। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একটা বড় প্রমাণ আছে। ৬২১ হিজরায় উৎকীর্ণ গিয়াসউদ্দিন ইওজশাহের যে মুদ্রাটিতে ডঃ দেশাই আলি শেরের নাম লেখা আছে বলে দেখিয়েছেন, তাতে ইওজ শাহ ও আলি শের দুজনেরই নাম রাজকীয় উপাধী সমেত উল্লিখিত হয়েছে। অতএব পিতার জীবদ্দশাতেই যে আলি শের রাজকীয় উপাধী ব্যবহার করেছিলেন তা প্রমানিত হচ্ছে। ১২২১ খ্রিঃ বীরভূম অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসাবে আলি শেরকে পাচ্ছি, যার কর্মকেন্দ্র ছিল সম্ভবত লখনোরে।

আলি শের নির্মিত এই খানকাহ্ বা মকদুম শাহ জালালের দরগা নামে পরিচিত তা ইসলাম ধর্মপ্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দরগার অভ্যন্তরে মকদুম শাহ জালালের কবর আছে এবং এই দরগার ভিতরের দেওয়ালে তরওয়ালের চিহ্ন আছে যা সাধারণত হাজীরা ব্যবহার করতো। এই হাজীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। সেক্ষেত্রে এরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পিছুপা হত না এবং এইজন্যেই তারা তরওয়ালকে তাদের চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করতো। এই খানকাহ্ যে মকদুম শাহের মাজার নামে পরিচিত তিনি পীরের মর্যাদা পেয়েছেন এবং ইসলাম ধর্মপ্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। অনেকের মতে মকদুম বা মখদুম শাহ্ জালালউদ্দিন তাব্রিজী তবে এই মতের স্বপক্ষে সামান্যতম প্রমাণ নেই। তবে এই তর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা এই মাজারের ইসলাম ধর্মপ্রচারে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাই যে স্থানীয় নিম্ন সম্প্রদায় (হিন্দু) মানুষকে ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে এর বিশেষ ভূমিকা দেখতে পাই। কারণ স্থানীয় জনসাধারণ কেউই মুসলিম ছিল না। কারণ নিম্নসম্প্রদায়ের লোকেদের হিন্দু সমাজে

হীন চক্ষে দেখা হত। এই সকল সম্প্রদায় ইসলামের সামান্যতম নীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্ দ্বারাও আকৃষ্ট হত। খানকাহ্ গুলি মসজিদ ও দরগার সংলগ্ন যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া দাওয়া দুই পাওয়া যেত। এছাড়া পদস্খলিত হিন্দু সধবা ও বিধবা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে বিবির সম্মান পেত। এই অঞ্চলেও এই খানকাহ্ এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিন্তু ঘটেনি তাই মনে হয়। কিন্তু বিতর্ক এক্ষেত্রে খুব একটা না থাকলেও মখদুম শাহ এ এই মাজারের প্রবেশদ্বারে যে আরবি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে তার বিপরীত পৃষ্ঠে বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় শিল্পপ্রশস্তি পালবংশীয় রাজা নয়পাল খোদাই করেন তার সময়ে (১০২৭ - ৪৩ খ্রিঃ) যার ৬৫ টি শ্লোকের মাত্র ৫/৬ টি বেশি অখন্ডিত নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে কোথাও শ্লোক সমূহের ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ অনুমানের সাহায্য নিতে হয়েছে।

প্রশস্তির সূচনায় পালবংশের ধর্মপাল তৎপুত্র দেবপাল, বিগ্রহপাল (দ্বিতীয় বিগ্রহপাল) এবং নয়পালের নাম উদ্ধার করা গিয়েছে। কিন্তু এতে ধর্মপালের পিতা গোপাল এবং নয়পালের পিতা এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালেরও নামোল্লেখ ছিল বলে অনুমান করবার কারণ আছে নয়পালের পরবর্তী কোনও পালরাজার নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রশস্তিতে যাঁর ধর্মকীর্তির বিষয় উল্লেখিত হয়েছে তাঁকে অনেক সময় নরপতিরূপে এবং একবার চক্রবর্তী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজা যে নয়পাল ব্যাতীত অপর কেউ, তার কোনও প্রমাণ প্রশস্তিতে পাওয়া যায় না।

প্রশস্তিতে যে বহুসংখ্যক মন্দির নির্মাণ ও প্রতিমা স্থাপনের উল্লেখ করা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র কতকগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। নবম শ্লোকে পাই উল্লেখ এবং পরবর্তী শ্লোক সমূহে কীর্তিকলাপের বর্ণনা। যে সকল কীর্তি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে সেগুলি হল এই —

১) শিবের মন্দির এবং শৈব সাধুদের বসবাসের জন্য দ্বিতল মঠ, ২) শিলামন্দির সমূহ একাদশ রুদ্রমূর্তি প্রতিষ্ঠা, ৩) জগন্মাতার জন্য স্বর্ণকলশ শোভিত শিলাবলভি নির্মাণ, ৪) পাষাণনির্মিত মন্দির সমূহে নয়টি চন্ডীকামূর্তি স্থাপন, ৫) দেবীকোটে হেতুকেশ শিবের মন্দির নির্মাণ, ৬) ক্ষেত্রেশ্বর শিবের স্বর্ণকলশ শোভিত শিলামন্দির এবং সরোবর, ৭) বরাক্ষেশ্বর নামক শিবের শিলামন্দির এবং মঠ ও সরোবর, ৮) উচ্চদেব - সংজ্ঞক বিষ্ণুমূর্তি, ৯) ঐ মন্দির সংলগ্ন আরোগ্যশালা ও বেদব্যাস, ১০) ঘন্টীশ নামক শিব এবং তার চতুর্দিকে চৌষট্টি মাতৃকামূর্তি স্থাপন, ১১) চম্পানগরীতে বটেশ্বরের শিলামন্দির প্রতিষ্ঠা, ১২) মহেন্দ্রপাল প্রতিষ্ঠিত চর্চা বা জগদম্বার শৈলমন্দির শিলাদ্বারা বলভি ও সোপাননির্মাণ, ১৩) সোমতীর্থের কোনও মন্দিরে কলশ (স্বর্ণকলশ) দান, ১৪) ধর্মারণ্যে মতঙ্গব্যাপী সংস্কার এবং মতেঙ্গশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণ, ১৫) তত্রত্য শিবমন্দিরে শিবের কন্যা শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, ১৬) গঙ্গাসাগরে ত্রিশূল স্থাপন, ১৭) সূর্যমন্দির, ১৮)

বৈদ্যনাথ শিবের স্বর্ণখোল নির্মাণ এবং বৈদ্যনাথ মন্দির শিখরে স্বর্ণকলস স্থাপন,, ১৯) অট্টহাস্যে জগন্মাতার মন্দিরে স্বর্ণকলশ স্থাপন, ২০) গঙ্গাসাগরে রৌপ্যের সদাশিব মূর্তি এবং স্বর্ণের চন্ডিকা ও গণেশমূর্তি এই দুই দেবতার জন্য স্বর্ণপীঠ স্থাপন, ২১) চন্দ্রমূর্তি রৌপ্যের সূর্যমূর্তি এবং নবগ্রহের জন্য স্বর্ণপদ্ম, ২২) শিবের স্বর্ণমূর্তি, ২৩) ব্রাহ্মণদিগকে দান, শৈবসাধুদের জন্য মঠ, ২৪) রাজা, মহিষী প্রভৃতি কর্তৃক মন্দিরাদি নির্মাণ, ২৫) একটি মঠ নির্মাণ করে তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ নামক বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং ২৬) পিঙ্গলার্যনামী জগন্মাতার মন্দিরে বলভি নির্মাণ এবং সরোবর খনন।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে সিয়ান প্রশস্তিতে যে নয়পালের ধর্মকীর্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাঁর ভক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল শিবের প্রতি এবং তার পরেই ছিল জগন্মাতার স্থান। কিন্তু তিনি বিষ্ণু, সূর্য গণেশ, লক্ষী প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তিহীন ছিলেন না।

পালবংশীয় রাজা নয়পালকে বৌদ্ধ মনে করা হত। বানগড় শিলাপ্রশস্তি আবিষ্কারের ফলে দেখা গেছে তিনি শৈবাচার্য সর্বশিবের নিকট শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি শিব এবং শক্তির উপাসক ছিলেন বলা যায়, কিন্তু পৌরাণিক বা স্মার্ত মতাবলম্বী হিন্দুর ন্যায় অন্যান্য দেবদেবীকে তিনি অবজ্ঞা করতেন না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সিয়ান প্রশস্তিতে রাজার কীর্তিকলাপের মধ্যে বৌ দ্ধিবিহার নির্মাণ এবং বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

এরপর পালবংশের পতনের পর দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পালরাজ মদনপালের রাজত্বকালে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন পালদের কাছ থেকে বাংলা অধিকার করে নেয়। শেখ সুভোদিয়া গ্রন্থে বিজয়সেনের রাজ্য প্রাপ্তির কথা লিখিত আছে। সেনরাজ গণ ছিল প্রতাপশালী রাজা তাদের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জনপ্রিয়তা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়।

এর পর লক্ষ্মণসেনের সময় দেখা যায় তিনি ৬০ বছর বয়সে সিংহাসন আরোহন করেন এবং সমগ্র বাংলায় আধিপত্যকে সম্পূর্ণ করে গৌড়েশ্বর উপাধী নেন। ডঃ আব্দুল মোমিন চৌধুরির মতে লক্ষ্মণসেন গৌড় ও বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের গৌড়েশ্বর উপাধী ছিল বাহুল্য। এই সূত্রে বলা যায় আমার আলোচ্য বিষয় যে সিয়ান গ্রামের উল্লেখ আছে তা নদীয়া ও গৌড়ের মাঝখানে। সুতরাং এই অঞ্চল সেনরাজাদের অধিকারে বলে মনে হয়। কিংবদন্তি বলে মখদুম শাহ জালালের যে মাজার বা দরগা আছে সেখানে শৃঙ্গ নামক শৈব মুণির আশ্রম ছিল (সময় জানা যায় না)। এই শৈব সাধকগণের প্রভাব ছিল অসামান্য। কথিত আছে এই শৃঙ্গ মুণির নাম অনুসারে এই গ্রাম সিয়ান (শৃঙ্গান) নামে পরিচিত হয়। কিন্তু যখন তুর্কি আক্রমণ আরম্ভ হয় ত্রয়োদশ শতকে তখন এই মুণি এই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কারণ এই মুণি এই স্থান ত্যাগ করে গ্রামের বাইরে আশ্রয় গ্রহণ করেন যা বর্তমানে মণিতলা (মুণি) নামে পরিচিত।
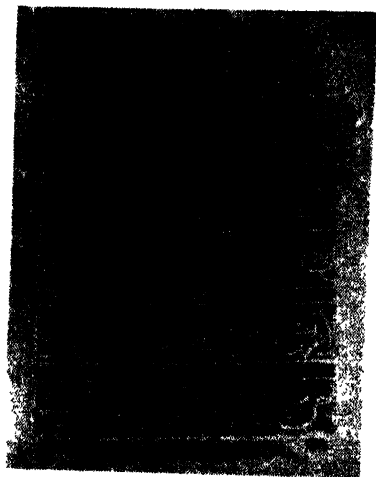
শিয়ানের আলী শের নির্মিত খানকাহ্ এর প্রতিষ্ঠালিপি (ডানভাগ)
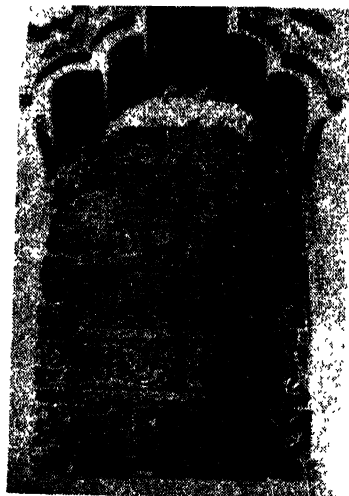
শিয়ানের আলী শের নির্মিত খানকাহ্ এর প্রতিষ্ঠালিপি (বামভাগ)
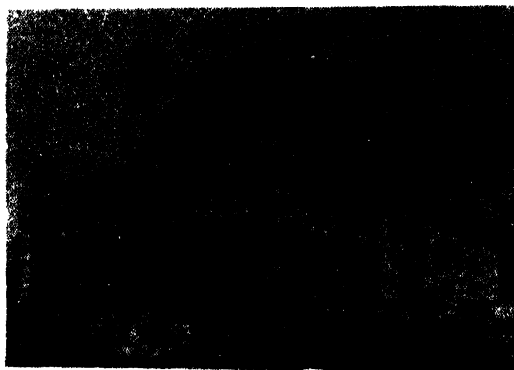
শিয়ানের মকদুমতলার সর্ব্বশেষ সংস্কারপ্রাপ্তরূপ

তবে এই শৃঙ্গ মুণি বিনারক্তপাতে এই স্থান ত্যাগ করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। কারণ এই মকদূম শাহ্ এর দরগার নিকটবর্তী বহু প্রাচীন কবর বর্তমান। বর্তমানে এই জায়গায়টিতে গোরস্থান আছে। এছাড়া যে আলি শের নামক শাসকের পরিচয় পাই তিনি একটি দিঘি খনন করেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন আলি শের দিঘি যা বর্তমানে আরশোলা দিঘি নামে পরিচিত। এই দিঘির কাছেই একটি ঘোড়ার ও এক সৈন্যের কবর আছে। এ থেকে মনে হয় এখানে ছোটখাটো একটি সংঘর্ষ হয়েছিল এবং উক্ত মুসলমান শাসক জয় লাভ করেন এবং যারা প্রাণ হারিয়েছিল তাদের কবর এই দরগা ও আরশোলা দিঘির নিকটবর্তী দেওয়া হয়। অতঃপর আলি শের এই অঞ্চলে ইসলামের জয়যাত্রার জন্য একটি খানকাহ্ নির্মাণ করেন। এই খানকাহ্ এর স্থাপত্য শৈলী অবার দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে। কারণ কোন মসজিদ বা দরগার স্থাপত্য শৈলীতে ফলমূল পাতা ফুল ব্যবহৃত হলেও পক্ষী ও পশুকে শৈলী হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু এখানে যে দরগা নির্মিত তার উপরের গম্বুজটি বাদ দিলে হিন্দু স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। এছাড়া যেদিক দিয়ে এই দরগার জল নিষ্কাশিত হয় সেখানে একটি হাতির মুখ নির্মিত আছে যা মুসলিম স্থাপত্যের কোন প্রমাণ দেয় না বরং প্রমাণ দেয় বৌদ্ধশৈলীকে। এ থেকে মনে হয় এখানে একটি হিন্দু মন্দির জাতীয় কিছু ছিল যা ধ্বংস করে উক্ত খানকাহ্ নির্মিত হয়ে ইসলামের জয়যাত্রার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। এই খানকাহ্ এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন মকদূম শাহ্ নামক পীর। এই পীর জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন এবং স্থানীয় জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে ধর্মান্তকরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল মনে হয়।

সূত্র নির্দেশ

১) সরকার, দীনেশচন্দ্র :- শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদি প্রসঙ্গ
প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী১৯৮২
* ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ 'সিয়ান গ্রামের শিলালেখ' (১০২-১২২ পৃঃ)
*দ্বাদশ প্রসঙ্গ 'নয়পালের রাজত্বকালীন মূর্তিশিবের বানগড় প্রশস্তি'। (৮৫ - ৮৭ পৃঃ)

২) সুর, অতুল :- বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন
দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯৯৪ খ্রিঃ
*বাঙলায় মুসলিম রাজত্ব (১৮২-২০২ পৃঃ

৩) মুখোপাধ্যায় সুখময় :- বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব, (১২০৪-১৩৩৮ খ্রিঃ)
প্রথম প্রকাশ :
জুন ১৯৮৮
*দ্বিতীয় পরিচ্ছদঃ বখতিয়ারের অনুবর্তী শাসকবৃন্দ (৪০ -৪৪ পৃঃ)

বিঃ দ্রঃ তিনটি গ্রন্থেরই প্রকাশক, মুদ্রাকর অভিন্ন।

প্রকাশক :- নেপাল চন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা - ৬।

মুদ্রাকর :- নেপাল চন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ৫৭/এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা - ৬।

৪) Desai. Z.A - Epigriphica Indica
(1975 Arabic and Persian
supplement) (Page - 7-8)
এই গ্রন্থটির সূত্র খণ্ডিত। কেননা এটি পূর্বে লিখিত সুখময় মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাংশে বর্তমান ছিল। মূল গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।

মেদিনীপুরে পোর্তুগিজ বণিক

রাজর্ষি মহাপাত্র

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে যে সব ইওরোপীয় বণিক এসেছিলেন তাদের মধ্যে পোর্তুগিজগণই আসে সর্বপ্রথম। ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে পোর্তুগিজরা প্রথম উড়িষ্যা উপকূলে পিপলীতে বসতি স্থাপন করেছিল। এর কিছুকাল পরেই মেদিনীপুর জেলার হিজলীতে (রূপনারায়ণ ও হুগলী নদীর মোহনার পশ্চিম উপকূলে) এঁদের অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছিল।[১]

১৫৭৫-১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশের পোর্তুগিজদের ব্যবসাবাণিজ্য প্রভূত প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। তবে হিজলী কাঁথি পোর্তুগিজদের সংস্পর্শে থেকেছিল প্রায় একশ সত্তর বছর (১৫১৪-১৬৮৪)। হিজলীর তৎকালে আয়তন ছিল ১০৯৮ বর্গমাইল। অর্থাৎ বর্তমানকালের কাঁথি এবং তমলুক মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চল হিজলীর সীমার (চাকলা হিজলী) মধ্যে ছিল।[২] ম্যানরিকের ভ্রমণকাহিনীতে হিজলীতে পোর্তুগিজদের অবস্থান প্রসঙ্গে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] আনুমানিক ষোড়শ শতকে রচিত মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চন্ডীর আখ্যানের মধ্যেও হিজলী এবং তৎসন্নিহিত পোর্তুগিজ অধ্যুসিত অঞ্চলগুলি ফিরিঙ্গীদেশ নামে পরিচিত ছিল।[৪]

মহিষাদলের রাজারা পোর্তুগিজ গোলন্দাজদের নিয়ে এসেছিলেন গেঁওখালির কাছে মীরপুরে বর্গীর হাঙ্গামার সময়, তাদের দমন করতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তার অনেক আগে থেকে বাংলার ভুইঞারা পোর্তুগিজদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং এদেশে ষোড়শ শতাব্দী থেকে পোর্তুগিজরা নিয়মিত আনাগোনা আরম্ভ করেছেন। বাংলার ভুইঞারা পোর্তুগিজদের সেনাপতির দায়িত্বপূর্ণ কাজে পর্যন্ত নিযুক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তার কারণ যুদ্ধ বিগ্রহে, বিশেষ করে নৌযুদ্ধে, তাদের দক্ষতার কথা তাঁরা জানতেন। মেদিনীপুরেও কিছু জমিদারের গোলন্দাজের কাজ করতো অনেক পোর্তুগিজ।[৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেরদিক পর্যন্ত ইওরোপ থেকে আগত বড় জাহাজগুলো বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত বালেশ্বর বন্দর পর্যন্ত আসত এবং সেখান থেকে ক্ষুদ্রাকৃতির জাহাজ মালপত্র খালাস করে সেগুলোকে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়ে সপ্তগ্রাম, বেতোড়, হুগলী, কলকাতা প্রভৃতি বন্দরে পাঠানো হত।[৬] তাছাড়া নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্য এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা হত। প্রতি বৎসর পোর্তুগিজ জাহাজগুলি সুমাত্রা, মালাক্কা, প্রভৃতি থেকে হিজলীতে এসে চাল, তুলা, মাখন সংগ্রহ করতো। পোর্তুগিজদের কাছে হিজলী ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।[৭]

মুঘল সম্রাট শাহ্জাহানের রাজত্বের প্রথমদিকে পাদরী ম্যানরিক (manrique) মেদিনীপুরে একজন ব্যবসায়ীর সন্ধান পেয়েছিলেন (মোবা টোখান) যিনি ভারতের সঙ্গে বিপুল পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন। উড়িষ্যার নিকট পিপলিতে তিনি একজন শিকদারের অধীন বৃহৎ জাহাজ দেখেছিলেন, যাতে একজন পোর্তুগিজ বণিকের নেতৃত্বে কোচিনে প্রচুর পণ্যসামগ্রী পাঠানো হয়েছিল। পোর্তুগিজরা যেমন এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্যসামগ্রী আহরণ করে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে বিক্রয় করতেন, তেমনি বঙ্গ দেশ থেকে একইভাবে ব্যবসা চালাতেন।[৮]

তমলুকের নিকটে একটি দাসদাসী বিক্রয়ের জন্য বাজার গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত মনে হয় মেদিনীপুর জেলার দীঘা-মেচেদা সড়কপথে হলদি নদীর কূলে নরঘাট বাজারে পোর্তুগিজদের ঐ কেন্দ্র ছিল। ঐ স্থানে পোর্তু গিজরা যে বন্দীদের বিক্রি করত তা শিহাবউদ্দীন তালিশের বিবরণেও (১৬৬৫) আমরা দেখতে পাই। বাংলার সুবাদার সায়েস্তা খাঁন এর আমলে চট্টগ্রাম অধিকার পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল আরাকান জলদসুরা (মগ এবং ফিরিঙ্গী উভয় সম্প্রদায়) জলপথ ধরে বাংলাদেশে উপস্থিত হয়ে লুণ্ঠন কার্য চালিয়ে যেত। তারা হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চনীচ নির্বিশেষে কমবেশি স্ত্রী-পুরুষ যাদেরই আটক করত তাদের হাতের চেটো ছিদ্র করে তার মধ্যে সরু বেত ঢুকিয়ে সকলকে বাঁধত। এই হতভাগ্যদের জাহাজের পাটাতনের নীচে একজনকে আরএকজনের ওপর নিক্ষেপ করে স্তুপাকারে রাখা হত। তাছাড়াও যেসব দাসদের আটক করে রাখা হত তাদেরকে প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যেবেলায় কাঁচা চাল খাদ্য হিসেবে পাটাতনের উপর থেকে নীচে মুরগীকে খাদ্য দেওয়ার মত ছড়িয়ে দেওয়া হত। O' Malley সাহেবও লিখেছেন, "Sometime they brought captives for sale at a high price to Tamluk and the port of Balasore... The Wretches used to bring the prisoners in their ships, anchor at a short distance from the shore of Tamluk or Baleswar, and send a man ashore with the news. The local officers, fearing lest the pirates should commit any depredation or Kidnappoing there, stood on the shore with a number of followers, and sent a man with a sum of money to the pirates. If the terms were satisfactory, the pirates took the money and sent the prisoners with the man, only the Feringhi pirates sold their prisoners"।[৯]

বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পোর্তুগিজদের বহু কুঠি বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক বাণিজ্যিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পোর্তুগিজ রোমান ক্যাথলিক পাদরিরাও প্রচারের উদ্দেশে বঙ্গদেশে আগমন করেন।[১০]

হিজলীর অন্তর্ভুক্ত তমলুকেও যে পোর্তুগিজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল তার বিবরণ বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। ভ্রমণকারী পোর্তুগিজ মিশনের প্রচারক ম্যানরিকের প্রভাবে তমলুকে ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি গির্জা তৈরি হয়েছিল।[১১] ভ্যালেন্টাইন তাঁর স্মৃতি কথায় ১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন হিজলীতে পূর্বেও ওলন্দাজদের একটি উপনিবেশ ছিল; পোর্তুগিজরা ঐ স্থানে তাদের কুঠি ও একটি গির্জা তৈরি করেছিল। কিন্দুয়া (কাঁথি), কেনকা (কর্ণিকা) ভদ্রক প্রভৃতি স্থানগুলিতে চাল এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সস্তা দামে বিক্রি হত। কালক্রমে ওলন্দাজরা ঐ স্থান ছেড়ে চলে গেলেও তখনও তাম্বলি (তমলুক) এবং বানজায় পোর্তুগিজদের গির্জা ছিল এবং দক্ষিণ দেশগুলির সঙ্গে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ সময় উক্ত স্থানগুলি মোমের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল।[১২] ভ্যালেন্টাইনের বিবরণ অনুযায়ী পোর্তুগিজরা অষ্টাদশ শতকে তমলুক ছেড়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে Gamelli Careri-র এর বর্ণনায় ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ভ্যালেন্টাইনের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে এসে তিনি উল্লেখ করেছিলেন পোর্তুগিজরা বেঙ্গলার তাম্বুলিন জয় করেছিল।[১৩] উল্লেখ্য তমলুকের কোন কোন অঞ্চলে পোর্তুগিজরা বসবাস আরম্ভ করেছিল সেই বিষয়ে সঠিক জানার কোন উপায় নেই। তবে গেঁওখালির নিকটে 'মীরপুরে' একটি "ফিরিঙ্গী পাড়া" আছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪]

হিজলীকে পোর্তুগিজরা 'অঞ্জেলিম্' বলতো। এখানে এসে তারা বাণিজ্যভবন ও দুটি গির্জা তৈরি করেছিল। ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে এই দুটি গির্জার এলাকায় তিনশত বয়স্ক খ্রিষ্টান ছিল। হিজলীব বান্জা নামকস্থানে আরও একটি গির্জা ছিল, তার অধীনে স্থানীয় পাঁচশত খ্রিষ্টান অধিবাসী ছিল। এছাড়া, সিকার্ডো উল্লেখ করেছেন এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর না হলেও বাণিজ্যের কারণে অনেক খ্রিষ্টানের যাতায়াত ছিল।[১৫] ম্যানরিক তার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন যে এখান থেকে বণিকেরা চিনি, মোম এবং একপ্রকার তৃণ নির্মিত গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার্য অতি সুন্দর সূক্ষ্মবস্ত্র ও রেশম নিয়ে যেত। ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে একজন জেসুইট্ পাদরি হিজলীতে জনৈক অর্থশালী খ্রিষ্টানের কাছে অর্থভিক্ষা করে একটি গির্জা নির্মাণ করেছিলেন। এই গির্জাতে দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রচুর লোকসমাগম হত।[১৬] ইংরেজ ভ্রমণকারী র‍্যালফ ফীচ ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন, "এই স্বর্গ (ব্যবসায়ের) হিজলীতে প্রতিবৎসর নাগাপত্তন, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থান থেকে রেশমের বস্ত্র, চিনি, লঙ্কা, মাখন এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীতে পূর্ণ করে ফিরে যেত।[১৭]

তবে ম্যানরিকের ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে হিজলীর যে গির্জাগুলির উল্লেখ দেখি অবস্থান কোথায় ছিল তা বর্তমানে সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই কারণ মসনদ-ই-আলার সুবিখ্যাত হিজলী শহরটিও বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত।[১৮] আর কাঁথির মাজনা গ্রামই 'Banja' এই অনুমান করা হয়। বর্তমানে মাজনা গ্রামের মধ্যে খ্রিষ্টান উপনিবেশের কোন চিহ্ন না পাওয়া গেলেও এর কিছুদূরে কাঁথির পশ্চিমাংশে এককালে খ্রিষ্টিয়

ধর্মপ্রচারকদের জন্য বাসগৃহ, উদ্যান, উপাসনাগৃহ (গির্জা) ছিল জানা যায়। ঐ গির্জা ও তার সংলগ্ন জায়গায় বর্তমানে কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের মূলভবনের একাংশ নির্মিত।[১৯]

হিজলীর শিকদার ম্যানরিককে খাদ্যসামগ্রী উপহার দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। পরে মেদিনীপুরের কোতয়াল ও তমলুকের রাজা ম্যানরিক্‌কে আপ্যায়িত করেছিলেন। অবশ্য তমলুকের রাজা তাঁর রাজ্যে খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারে বিরোধিতা করেছিলেন।[২০]

ব্যবসার সূত্রে পোর্তুগিজরা শক্তি সংগ্রহ করে আরাকানি মগদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাগীরথীর মোহনা অঞ্চলে অর্থাৎ হিজলী, কাঁথি, খেজুরী সাগরদ্বীপ এবং সুন্দরবন অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি ও লুঠতরাজ শুরু করে।[২১] ঈশা খাঁ হিজলী ও সুন্দরবন অধিকার করে ভুঁইয়া উপাধি গ্রহণ করেন। স্বাধীন তমলুক রাজ্য হয়ে দাঁড়াল ২৫,৭১,৪৩০ টাকার কর দেওয়া মুঘলদের একটি 'মৌরিসি জমিদারি' মাত্র। তমলুক রাজ্যের বঙ্গোপসাগরের ওপর একাধিপত্য নষ্ট হওয়া মাত্র পোর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। শাহজাদা সুজা পোর্তুগিজদের দমন করে শান্তি ফিরিয়ে এই অঞ্চলে মুঘল প্রতিপত্তির বৃদ্ধি ঘটান।[২২]

তবে শক্তির মত্ততায় পোর্তুগিজরা মুঘল বাহিনীর তোয়াক্কাই করতনা নৌযুদ্ধে ওরা তখন শ্রেষ্টতর হয়ে উঠেছিল। তাই বাসলাভের ব্যবসা ছেড়ে ওরা শুরু করেছিল দাস ব্যবসা। লুণ্ঠনবৃত্তি ও মানুষ ধরে নিয়ে যাওয়ার দৌরাত্মে এক সময় হিজলী অঞ্চল ভয়ে জনশূন্য হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শিহাবউদ্দীন তালিশের বর্ণনা থেকে জানা যায় মেয়েরা দাসী বা উপপত্নী হিসেবে গৃহীতা হত।[২৩]

খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গিরা যেমন লুঠপাট করে বাংলাদেশকে জ্বালিয়েছে, তার একশো বছর আগে মগ-পোর্তুগিজ দস্যুরাও তেমনি পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে সন্ত্রাসের রাজত্ব করে গেছে।[২৪] হিজলীর ফৌজদার সমুদ্র উপকূলে 'সরবোলা' নামে পাহারাদার নিযুক্ত করে ছিলেন। তারা দস্যুদের অত্যাচারে যেসব নৌকোগুলি লুণ্ঠিত হত সেগুলি এবং উৎপীড়িত নরনারীকে সাহায্য করত, নৌকো অথবা জাহাজডুবির মালপত্র সংগ্রহ করে সেগুলি সরকারি দপ্তরে জমা দিত। কোম্পানির কার্যকাল আরম্ভের প্রথমদিকে হিজলী অঞ্চলে 'সরবোলার' অস্তিত্ব ছিল সেই সংবাদ জানা যায়।[২৫] প্রসঙ্গত জলদস্যুদের অত্যাচার কি ভয়াবহরূপ ধারণ করেছিল তার বিবরণ O'Malley সাহেবের বিবরণ থেকে বিশেষভাবে জানা যায়।[২৬] হিজলীর নিকটবর্তী ভাগীরথীর মোহনার নামকরণই হয়ে গেছলো 'Rogue's River' বা দস্যু নদী।[২৭] গ্রান্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণী থেকে জানা যায় দস্যু কবলিত এলাকা তত্ত্বাবধানের জন্য হিজলীতে ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে হিজলীর প্রতিপত্তিশালী পাঠান সামন্ত তাজ-খাঁ মসনদ-ই-আলা (১৬৪৯-৫১) ফৌজদারের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন অনুমান করা হয়। ম্যানরিক হিজলীর উপকূলে মসনদ-ই-আলার ক্ষেপনীযুক্ত নৌবহর লক্ষ্য করেছিলেন। এই

ক্ষেপনীযুক্ত নৌবহর রাজকীয় এলাকার অধীন কোন কোন তরনি হতে পারে।[২৮] শিহাবউদ্দীন তালিশের বর্ণনা থেকে একথা জানা গিয়েছে। তাছাড়াও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারও এই ভয়ঙ্কর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।[২৯]

মুঘল সম্রাট শাহজাহান পোর্তুগিজদের আচরণে বিশেষ ক্রুদ্ধ ছিলেন। তিনি হুগলী ও বাংলাদেশ থেকে পোর্তুগিজদের বিতাড়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। উইলিয়ম হেজেস্ তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন মুঘলরা হিজলী থেকে পোর্তুগিজদের ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বিতাড়িত করেছিল।[৩০] ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে হিজলীতে পোর্তুগিজদের ক্ষমতা স্থাপনের চেষ্টা লক্ষণীয়। ইংরেজ কোম্পানির তদানীন্তন বঙ্গদেশীয় কুঠিসমূহের অধ্যক্ষ ঐ উইলিয়ম হেজেস্কে ঐ সময়ে নিকলো ডি পেভা নামে জনৈক পোর্তুগিজ বণিক হিজলী ও খেজুরী দ্বীপ দুটি অধিকারের জন্য দু-তিনটি রণতরি ও সৈন্য সাহায্য চেয়েছিলেন।[৩১]

বঙ্গদেশে পোর্তুগিজ জনগণের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছিলেন পুরোহিত ও ধর্মপ্রচারক। দেশী ধর্ম ও রীতিনীতির প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিল অপরিসীম। তথাপি পুরোহিত ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে সাধারণ লোকেদের সম্পর্ক ছিল এক৮া সমঝোতামূলক।[৩২]

বঙ্গদেশের পোর্তুগিজ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে ছিল প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উপরন্তু পোর্তুগিজ জলদস্যুদের ভয়াবহ অত্যাচার মুঘল সাম্রাজ্যের শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে ছিল বিঘ্নস্বরূপ। এই সমস্ত ছাড়াও পোর্তুগিজরা দেশীয় রাজাদের সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছিল। যেমন কারভেলো, দানেজ, ফারমান্দোল, পোরিরা পিপলি বন্দরের অধ্যক্ষ এমনকি হিজলীর মসনদ-ই-আলার সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল। তবে ক্রীতদাস ব্যবসা পোর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছিল একটি প্রধান বাণিজ্য।[৩৩]

বঙ্গদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রাধান্য কিছুকাল এদেশীয় বণিকদের হাত থেকে পোর্তুগিজদের হাতে চলে গিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় পরোক্ষভাবে তাতে দেশের উপকার হয়েছিল। পোর্তুগিজদের জাহাজ-আয়তন ও কৃতকৌশল উন্নত ছিল বলে তারা পণ্যসামগ্রী এত দ্রুত দেশের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে পারত যা ভারতীয় জাহাজগুলি পারতনা। পোর্তুগিজদের চেষ্টায় সমগ্র এশিয়ার বাজার বঙ্গদেশের পণ্যের জন্য খুলে যায়। এই উন্মুক্ত পথ দিয়ে ধীর গতিতে বঙ্গদেশে প্রচুর বিদেশী স্বর্ণ আমদানি হত। এর ফলে বহু সুযোগ সন্ধানীর আগমন ঘটেছিল। হুগলী বন্দরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির ভিড় জমেছিল। র‍্যালফ্ ফিচ্ ও মীর্জানাথন বঙ্গ দেশের বিভিন্ন স্থানে এদেশীয় ধনী ব্যবসায়ীদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই আপাত ঐশ্বর্যের মধ্যে অবশ্য একদল দেশী দালাল শ্রেণীও ছিল। পোর্তুগিজরা এদের পণ্যসামগ্রী কেনার জন্য প্রচুর টাকা আগাম দিত। দেশী ও বিদেশী দালাল ও বণিকেরা বিদেশী বাণিজ্যের ফলে খুবই ধনশালী হয়েছিল। তাছাড়া পোর্তুগিজরা বিদেশে বঙ্গদেশের পণ্যসামগ্রীর

চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে বঙ্গদেশের সূতী, রেশম ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের হারকে বাড়াতে সাহায্য করেছিল। এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। তা হল পোর্তুগিজদের আগমনের পূর্বেকার কয়েকটি অখ্যাত অঞ্চল এদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে প্রভূত সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। হিজলী, চট্টগ্রাম, সন্দীপ এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৪] উল্লেখ্য ম্যানরিক, টমাস বাউরী এবং আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন প্রমুখের বিবরণের মাধ্যমে জানা যায় যে ঐ সময়ে বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য খুবই সস্তা ছিল।[৩৫]

গেঁওখালির কাছে মিরপুরে মহিষাদলের জমিদার এককালে মারাঠাদের আক্রমণই থেকে দেশকে রক্ষার জন্য পোর্তুগিজ বাহিনীর কয়েকজনকে নিষ্কর জমিদান করে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তারাই স্থানীয় স্ত্রী লোকদের বিবাহ করে মিরপুরে পাকাপাকিভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। এঁরা সকলে খ্রিষ্টান হলেও কালের ব্যবধানে এঁদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের আচার ব্যবহারে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।[৩৬] মিরপুর গ্রামে দেখা যায় দুই সম্প্রদায়ের জন্য দুটি গির্জা। একটি রোমান ক্যাথলিকদের, আর একটি প্রটেস্ট্যান্টদের। কোথা থেকে এই পোর্তুগিজদের এখানে আনা হয়েছিল, সেকথা আজ মিরপুরবাসীরা কেউ জানেননা। কেউ কেউ বলেন, গোয়া থেকে আনা হয়েছিল। তা নাও হতে পারে। গোয়ানীজ সংস্কৃতির কোন চিহ্ন নেই কোথাও মিরপুরে। গির্জা ও খ্রিষ্টান মধ্যেও যা আছে, তার সবটাই বাঙালি সংস্কৃতি এবং হিন্দু সংস্কৃতি। মিরপুর গ্রামটি দুটি মৌজায় বিভক্ত, বেতকুন্ডু ও শুকলালপুর। ৪৫/৫০ টি খ্রিষ্টান পরিবার এখানে বাস করে।[৩৭]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পোর্তুগিজরা বঙ্গদেশের বাণিজ্যেব ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমুদ্রবাহী আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এই কর্তৃত্ব রাখবার উদ্দেশে ভারতমহাসাগরে আগত অন্যান্য বিদেশী বাণিজ্য তরিগুলির ওপর তারা হামলা চালাতো। তবে জলপথে তারা শক্তিশালী হলেও স্থলে তাদের শক্তি ছিল সীমিত। ফলে সেখানে ভারতীয় ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল।[৩৮]

পোর্তুগিজদের সম্পর্কে আলোচনাকালে তাদের অনেক রকম ত্রুটি সত্ত্বেও কতগুলি কথা বলা সমীচীন পশ্চিমীদের মত ধর্মবিদ্বেষ তাদের ছিলনা। সেজন্য তারা অবলীলাক্রমে বিবাহ করে এদেশে সংসার করতেন। কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তারা এতদঅঞ্চলে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন যেহেতু তারা নিজেরাই নিজের দেশের উন্নত কৃষক ছিলেন।[৩৯] কোন এক সময় পোর্তুগিজরা ব্রাজিল থেকে কাজু বাদামের বীজ এনে গোয়ার উপকূলে চাষ আরম্ভ করেছিল। কালক্রমে হিজলী থেকে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বালুকাভূমিতে এই চাষ বিস্তৃত

হয়েছিল।[৪০] এছাড়াও অনেক ধরণের ফল যেমন আতা পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, সফেদা কামরাঙ্গা, ইত্যাদি এবং ফুলের মধ্যে রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, গাঁদা, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি তারাই আলোচিত অঞ্চলে প্রথম নিয়ে এসেছিল। আর সবজি ও তরিতরকারির মধ্যে কপি, ওলকপি, কড়াইশুঁটি; তাছাড়া খালসা, আয়াপান, জোলাপ প্রভৃতি গাছগাছড়া পোর্তুগিজদেরই আনা। এদেশের ফলের মোরব্বা আচার প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী পোর্তুগিজদের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করেছিল। আবার সাগু, পাঁউরুটি, বিস্কুট, তামাক এরাই আমদানি করেছিল। আলমারি, কেদারা, জানালা প্রভৃতি গৃহসজ্জা, বিস্তি, কুপন প্রভৃতি ক্রিড়া, সূর্তি, নীলাম প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় প্রথা; ক্যানেস্তারা, গাম্‌লা বাল্‌তি, প্রভৃতি গৃহস্থালির জিনিস; সাবান, তোয়ালে, বোতল প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্য; বরগা প্রভৃতি গৃহনির্মাণ উপকরণ মধুর সঙ্গীত যন্ত্র বেহালা পোর্তুগিজদের মাধ্যমেই এই অঞ্চলে এসেছিল।[৪১] এদেশে ফল, ফুল, গাছাগাছড়া, তরিতরকারি প্রভৃতির চাষ থেকে তাদের কৃষি বিজ্ঞানের দিকে অবদান কত গভীর তা স্পষ্ট বোঝা যায়।[৪২]

ইবন-বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তৎকালীন দ্রব্যমূল্যের তালিকা পাওয়া যায় এবং বাংলাদেশে জিনিসপত্রের মূল্য ঐ সময় যে খুব সস্তা ছিল তার সমর্থনও পাওয়া যায়।[৪৩] পোর্তুগিজরা বাংলাদেশ থেকে সস্তায় পণ্যসামগ্রী কিনে বিভিন্ন বন্দরে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করত। কিন্তু তারা বাংলাদেশে অবস্থান কালে বহু প্রকারের খাদ্যদ্রব্য এবং সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য উদ্যোগী হয়েছিল।[৪৪] এছাড়া "In Midnapore sents were manufactured from flowers and sented oils from a kind of grain and they were highly valued because they were used by the people to rub themselves with, after bath."।[৪৫] সুতরাং এই অঞ্চলের ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্য যেমন এশিয়া ও ইওরোপকে নানা উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করত, তেমন ইওরোপীয়রাও বেশ কিছু নতুন জিনিসের আমদানি করেছিল আমাদের এই দেশে বিশেষ করে ভারতের পশ্চিম উপকূল ও বাংলার দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে।[৪৬] এছাড়া পোর্তুগিজ বণিকরা মেদিনীপুরের কার্পাস ও পট্টবস্ত্র, চাল, চিনি, মোম প্রভৃতি দ্রব্য কিনতে তমলুক, হিজলী, রাধানগর, চন্দ্রকোনা প্রভৃতি স্থানে আসতো।[৪৭]

তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলা শব্দ বিন্যাসে পোর্তুগিজতের অবদান প্রচুর। দুটি জাতি একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রণের ফলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে একে অন্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই পোর্তুগিজরাই বাংলাভাষাকে প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিল।[৪৮]

বর্তমান রসুলপুর নদীর মোহনার কাছে প্রাচীন কালের হিজলী তার গৌরব এবং আয়তন হারিয়ে একটি ক্ষুদ্রগ্রাম আর পোর্তুগিজদের সংস্রবের ইতিহাস শুধুমাত্র স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে। মিরপুর ছাড়া সমগ্র চাকলা-হিজলীরই এই একই ছবি থেকে বলা যায়, অত্যাচারী পোর্তুগিজরাও এই মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছুটা উপকার করেছিল নিঃসন্দেহে।

সূত্র নির্দেশ

১) J. J. A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal,* London, 1899, p. 97

২) W. K. Firminger, *Fifth Report,* vol. II, Calcutta 1917, p. 454-56.

৩) Manrique, *Itinarario Orient* (1653): Tr. in English— 'Travels of Fray Sebastiven Manrique, 1629-43 by C. E. Luard assisced by Father H. Hosten (Hakluyt Soceity's Series), 2 Vols. 1927.

৪) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণ চন্ডী,* কলকাতা ১৯৩৭ পৃ. ১৫৯

৫) বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৭৭

৬) প্রতীক মাইতি, *ইতিহাসের আলোকে খেজুরী* (প্রবন্ধ), ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৫, কলিকাতা, ২০০১, পৃ ৪১৬

৭) কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, *দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৫২

৮) তদেব, পৃ. ১৫৩

৯) L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Midnapore, Calcutta, 1995 (1st Reprint). p. 32-33; of also *Aniruddha Ray,* French view of slavery in Medieval India.A (Essay) IHC: Proceedings, 59th Session, 1998, Aligarh, p. 218-226

১০) সেনগুপ্ত, তদেব, পৃ. ১৫১

১১) J. J. H. Campos, Portuguese in Begnal, London, 1899, p. 96

১২) O'Malley, Ibid, p. 32

১৩) Ibid, p. 32

১৪) Ibid, p. 66

১৫) Campos, Ibid, p. 94-95; মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত *হিজলীর মসনদ-ই-আলা* গ্রন্থে অন্তর্গত পাদটীকা, মেদিনীপুর, ১৯৫৮ (*দ্বিতীয় সংস্করণ*), পৃ. ১১৫

১৬) করণ, তদেব, পৃ. ১১৬

১৭) *Horton Ralph Fitch*, London, 1899 p. 114; Campos, Ibid p 95

১৮) *Travels of Fray Sebastian manrique–1624-43*, C.E. Luards (Hakluyt Society's Series, p. 10 - 25); করণ প্রণীত গ্রন্থে অন্তর্গত অনুবাদ পৃ. ১২৭-৩১

১৯) সুনীল কুমার ঘোষ, কাঁথির পুরাবৃত্ত (প্রথমখন্ড), কাঁথি, ১৪০২ (বাংলা) পৃ. ৪৩

২০) সেনগুপ্ত, তদেব, পৃ. ১৫৪

২১) প্রশান্ত প্রামানিক, রোমন্থন, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৯০

২২) মিঠু ঘোষাল, তমলুক ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (নিবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা (সাপ্তাহিক), ৭-১৪ই জুলাই ২০০০ সম্পাদনা, তারাপদ ঘোষ ও অজিত মন্ডল, কলকাতা, পৃ.১৭

২৩) প্রামানিক, তদেব পৃ. ৯০-৯৩

২৪) প্রবোধচন্দ্র বসু, এই আমাদের কাঁথি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২৫

২৫) যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৩৬, পৃ. ১৯৪-১৯৫

২৬) O'Mally, Ibid, p. 223

২৭) প্রবোধচন্দ্র বসু, তদেব

২৮) Census Report of Bengal, 1911, p. 228-229

২৯) Jadunath Sarkar, Studies in Mughal India, Calcutta, 1917

৩০) রমেশচন্দ্র মজুমদার—সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড-মধ্যযুগ), কলকাতা ১৯৮৭ (চতুর্থ সংস্করণ) পৃ. ১৫৬

৩১) Henry Yule (Ed) *The Diary of William Hedges*, Vol. 1, London 1681, p. 172

৩২) সেনগুপ্ত, তদেব; *রাজর্ষি মহাপাত্র, সুলতানি ও মুঘল আমলে তমলুক (প্রবন্ধ)*, ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৩, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২২৮

৩৩) সেনগুপ্ত, তদেব, পৃ. ১৫৩-১৫৪

৩৪) তদেব পৃ. ১৬১-১৬২

৩৫) Campos, p. 117-119

৩৬) O'Malley, Ibid, p. 65-66

৩৭) ঘোষ; তদেব, পৃ. ১৮০

৩৮) সেনগুপ্ত, তদেব, পৃ. ১৫২-১৫৩

৩৯) সেনগুপ্ত, তদেব পৃ. ১৫৪

৪০) Campos, Ibid, p. 254

৪১) করণ, তদেব, পৃ. ১২০

৪২) সেনগুপ্ত, তদেব

৪৩) *Ibn Batutah's Account of Bengal* (Tr.) Harinath De Calcutta, 1978, p. 7

৪৪) J. J. H. Campos, Portuguese in Begnal, London, 1899 p. 118.

৪৫) তদেব, পৃঃ ১১৯

৪৬) প্রামানিক, তদেব, পৃ. ৩৫

৪৭) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদে রজত জয়ন্তী উৎসবের মূল সভাপতির ভাষণ 'মাধুরী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা, মেদিনীপুর ১৩৯৩, পৃ ৪৬

৪৮) সেনগুপ্ত, তদেব পৃ. ১৫৫

ফরাসি দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও মুর্শিদাবাদ দরবার : ১৭৩৮-৩৯

অনিরুদ্ধ রায়

জোসেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লেক্স বাংলায় আসার আগে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসিদের দেওয়ান নিযুক্ত হন ১৭৩০ সাল নাগাদ। দুপ্লেক্স বাংলায় ফরাসিদের প্রধান হয়ে আসেন ১৭৩১ সাল ও তারপর থেকেই ইন্দ্রনারায়ণের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। প্রথম থেকেই দুপ্লেক্সের সঙ্গে জগৎ শেঠ ফতে চাঁদের সঙ্গে বনি-বনা ছিল না। ফরাসিরা বিদেশী মুদ্রা ও রুপোর তাল বাংলাতে আনলে, সেগুলি জগৎ শেঠের কাছে বিক্রী করতে হত তার নির্ধারিত মূল্যে। পন্ডিচেরীতে আর্কট টাকা তৈরি হলে, ফরাসিরা সেই টাকা নিয়ে এসে বাণিজ্য করছিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ দরবার ১৭৩৮ সালের প্রথমদিকে *পরওয়ানার* বলে ঐ মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে দেন। দুপ্লেক্স এর জন্য জগৎ শেঠকেই দায়ি করেন। টাকার টানাটানি হওয়ায়, দুপ্লেক্সের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম হয়। দুপ্লেক্স জগৎ শেঠের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এছাড়া কোম্পানির মাল এর জন্য প্রায় দু লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। অবশ্য এ অবস্থা এই প্রথম নয় এবং অবস্থাকে সামাল দেবার জন্য দুপ্লেক্স সরাসরি মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে বিদেশীমুদ্রা ও রুপোর তাল নিয়ে যাওয়ার অধিকার বা চন্দননগরে মুদ্রা তৈরি করার অধিকার চাইছিলেন।[১] দুপ্লেক্সের ৮ই মে ১৭৩৮ সালের একটা চিঠি থেকে জানা যায় যে জগৎ শেঠ সমস্ত বিদেশী মুদ্রার পরিবর্তন করা নিজের হাতে আনতে সক্ষম হয়েছেন এবং সিক্কা টাকার জন্য শতকরা ১২ ভাগ *বাট্টা* নিচ্ছেন।[২] ফরাসিদের সঙ্গে জগৎশেঠের এই বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি ঘটনার বিবরণ দেখব।

ইন্দ্রনারায়ণ সম্পর্কে অন্যান্য ফরাসিদের বিরূপ মনোভাব থাকলেও, দুপ্লেক্স সবসময়ই ওর পক্ষে ছিলেন। ১৭৩২-৩৩ সালে ইন্দ্রনারায়ণ চন্দননগরের বিভিন্ন মহল ইজারা নিয়েছিলেন যার মূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে।[৩]

ফরাসিদের সঙ্গে বা অন্যান্য ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ দরবারের সম্পর্ক ভালো ছিল না। নানা রকম কারণ দেখিয়ে মুর্শিদাবাদ দরবার ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কাছ থেকে টাকা নিত যার বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ানরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি। ১৮ই এপ্রিল ১৭৩৮ সালে কাশিম বাজারের ফরাসি কুঠিয়াল, বুরাট, একটি চিঠিতে চন্দননগরকে জানান যে নবাবের লোকেরা কি রকম চাপ দিচ্ছে ওর উপর টাকা দেবার জন্য।[৪] এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঘটনাটি দেখব।

চন্দননগরে এক মুসলমান মহিলা ও তার ছেলে শ্রমিকের কাজ করত। একদিন সকালে দরজা না খোলায় প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে দেখে যে এরা মৃত। কোন রকম আঘাতের দাগ দেখা যায় নি। প্রতিবেশীরা কোতোয়ালকে খবর দেয়। কোতোয়াল জমিদারকে জানায় এবং দার দুপ্লেক্সকে জানায়। দুপ্লেক্স মৃতের আত্মীয়দের আসার জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। তিন/চার জন আত্মীয় আসে কিন্তু তারা ফিরে যায় অন্ত্যেষ্টি করার জিনিষপত্র আনার জন্য। পরবর্তী দুদিনের মধ্যে তারা আর আসে না। এর মধ্যে মৃতদেহে পচন ধরেছে। প্রতিবেশীরা ও চৌকিদার দুপ্লেক্সকে অনুরোধ করে অন্ত্যেষ্টির জন্য। আশেপাশের লোকজন খাওয়া দাওয়া করতে পারছিল না। দুপ্লেক্স কোম্পানির খরচে মুসলমান রীতি অনুয়ায়ী অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করেন। মৃতদেহ পরিস্কার করে উপযুক্ত প্রার্থনার সঙ্গে বহু লোকের উপস্থিতিতে সমাধিস্ত করা হয়। এর কিছুক্ষনের মধ্যেই আত্মীয়রা এসে উপস্থিত হয়। দুপ্লেক্সের কাছে তারা মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করলে। তিনি কোন কারণ দেখাতে অসমর্থ হন। আত্মীয়রা তখন হুগলীর ফৌজদার পীরখান ও প্রধান কাজির কাছে অভিযোগ করে। এদের আদেশমত ও এদের উপস্থিতিতে কবর থেকে মৃতদেহ তোলা হয় ও পরীক্ষা করা হয়। মৃত্যুর কোন কারণ নির্ধারণ করা যায় না। এর মধ্যে নবাবের কাছে অভিযোগ পৌছালে। তিনিও মৃতদেহ পরীক্ষা করার আদেশ দিয়েছিলেন। এর পরই নবাব ফরাসি কোম্পানিকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখে মৃত্যুর জন্য দায়ি করেন।

ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য কাশিম বাজার থেকে বুরাট হাজি আহমদের (পরবর্তী নবাব আলীবর্দী খানের ভাই) সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হাজি একটা বড় টাকার অঙ্ক চান। ফরাসিরা টাকা দিতে অস্বীকার করে। তারা স্থির করে যে একেবারে খুব খারাপ অবস্থা না হলে টাকা দেবে না। মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি এবং খুন হলেও কারা এর জন্য দায়ি বা কেন খুন করা হল, তারও কোন সরকারি ব্যাখ্যা ছিল না। ফরাসিরা অবশ্য বলে আসছিল যে মহিলাটি বেশ্যা এবং সেটিই খুনের কারণ।[৫]

হুগলীর ফৌজদারের ভূমিকা পরিষ্কার নয়। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে মনে হয় যে তাঁর প্রথম প্রতিবেদনে তিনি ফরাসিদের দোষারোপ করেন নি এবং ফরাসিদের বিরুদ্ধে কোন কাজও করেন নি। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে যায় যখন দুপ্লেক্স খবর পান যে প্রায় দশ হাজার লোকের এক বিশাল জনতা কাশিম বাজারের কুঠি ঘেরাও করেছে। বোধহয় উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার জন্য, নবাব ফরাসি কুঠিয়াল বুরাটকে দরবারে হাজির করার আদেশ দেন। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করা হবে এরকম আদেশও ছিল। দরবারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে। বুরাট জানান যে তিনি এ সম্পর্কে কিছু জানেন না। কিন্তু তিনি চন্দননগর থেকে খবর আনাতে পারবেন। এর থেকে মনে হয় যে ফৌজদারের প্রাথমিক প্রতিবেদন ফরাসিদের বিরুদ্ধে ছিল না। দরবার বুরাটের বক্তব্য অবিশ্বাস করেনি এবং বুরাটকে কাশিম বাজারে ফিরে যেতে দেওয়া হয়। তিনশ সৈন্য পাঠানো হয় কুঠি রক্ষা করার জন্য। তিনমাস ধরে নানা ধরণের আলোচনা চলতে থাকে। শেষে চন্দননগর দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়। হাজি আহমদ পাঁচ হাজার, হুগলীর ফৌজদার

তিন হাজার ও বাকি দু হাজার অন্যান্য আমলাদের মধ্যে ভাগ করা হবে বলে ঠিক হয়। দুপ্লেক্স মনে করেছেন যে হাজি একাই আট হাজার টাকা রেখে দিয়েছেন।[৬]

ফরাসিরা ভেবেছিল যে ঘটনা মিটে দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন বাদে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণকে হুগলীকে থেকে ধরে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি চন্দননগরে এক মহিলা ও তার ছেলেকে খুন করেছেন। হাজি আহমদ অবশ্য মনে করতেন যে দুপ্লেক্স ঐ খুন করেছেন। দুপ্লেক্স অবশ্য বুরাটকে বলেন যে ইন্দ্রনারায়ণকে ছাড়ানোর জন্য সবরকম চেষ্টা করতে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে হাজি আহমদ এর জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন। কিছুদিন পরে বুরাট দুপ্লেক্সকে জানান যে খোজা কমল একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এ ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন।[৭] কিন্তু এই আলোচনার মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণের ছেলে ও ইন্দ্রনারায়ণের গোমস্তা কালিচরণ অংশগ্রহণ করলে আরো গোলমাল হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ইন্দ্রনারায়ণ যে কোনদিন ছাড়া পাবেন এটা দুপ্লেক্স ভাবতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে বুরাট জগৎ শেঠের সঙ্গেও আলোচনা করতে শুরু করেছেন। এটা খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে টাকা ছাড়া মুক্তি পাবার সম্ভাবনা নেই। ফরাসিদের কাছে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে এটা ইন্দ্রনারায়ণের ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এর জন্য কোম্পানি কোন টাকা খরচ করবে না। বাংলায় তখন টাকার অভাব চলছিল, ফলে ধার পাওয়ারও শক্ত হয়ে পড়ে। দুপ্লেক্স নিজে টাকা জোগাড় করতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি বুরাটকে মাল পাঠাতে রাজি ছিলেন। যার থেকে টাকা পাওয়া যেতে পারে। টাকা দিতে, এমনকি জগৎ শেঠকে, দুপ্লেক্সের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এখন তাঁর হাতে কোন টাকা নেই। দুপ্লেক্স বুরাটকে ইন্দ্রনারায়ণের সততার কথা জানান এবং ইন্দ্রনারায়ণের বন্ধু জগৎ শেঠ যে মুক্তির জন্য কোন চেষ্টা করেছন না, তাতে দুপ্লেক্স আশ্চর্য হচ্ছেন না। ওঁর মতে জগৎ শেঠ ইন্দ্রনারায়ণের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন কারণ ফরাসিরা মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে সরাসরি টাকা করার ব্যবস্থা করছে। যার ফলে জগৎ শেঠের ব্যবসা মার খাবে। এর জন্য জগৎ শেঠ ইন্দ্রনারায়ণকে দায়ি করেছেন। হাজি আহমদও নানা কারণে দুপ্লেক্সের এর উপর চটা। কিছুদিন আগে হাজি ইউরোপিয়ানদের বেশি দামে ঘোড়া বিক্রি করার চেষ্টা করলে, দুপ্লেক্স বাধা দেন। কিন্তু দুপ্লেক্সের মতে ইন্দ্রনারায়ণকে আটক করা মুঘল সম্রাটের *ফারমান*ও নবাবদের *পরওয়ানার* বিরুদ্ধে। এগুলিতে বলা হয়েছে কোম্পানির কোন কর্মচারীকে বিনা প্রমাণে আটক রাখা যাবে না। দুপ্লেক্সকে ধরতে না পেরে এরা দেওয়ানকে ধরেছে।[৮]

নভেম্বর এর মাঝামাঝি পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। ইন্দ্রনারায়ণের গোমস্তা কালিচরণ বুরাটকে অপমান করে। ক্ষুব্ধ বুরাটকে শান্ত করতে দুপ্লেক্স কথা দেন যে কালি চরণকে ফরাসি কুঠি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও বুরাটের উন্নতির দিকে দুপ্লেক্স দৃষ্টি রাখবেন এরকম প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। বুরাটের মতে এই কালিচরণ চেষ্টা করে জগৎ শেঠ-ও ফরাসিদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ করে দিয়েছে।[৯]

শেষ পর্যন্ত বুরাট খোজা কমলকে রাজি করান হাজিকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দেবার জন্য। বুরাট ইন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে এই টাকার রসিদ নেবেন কারণ কোম্পানি কোন টাকা দেবে না। কিন্তু খোজা কমল অবিলম্বে টাকা ফেরৎ দেবার কথা বললে বিষয়টি আবার জটিল হয়ে যায়। দুপ্লেক্স বুরাটকে পনের হাজার টাকা কাশিম বাজার কুঠি থেকে তাঁর নির্দেশে নিতে বলেন এবং বাকি টাকার জন্য তিনি কাশিমবাজারে মাল পাঠাবেন যেগুলি সহজেই ওখানে বিক্রি করা যাবে।[১০]

এর কিছুকাল পরেই ইন্দ্রনারায়ণ মুক্তি পান এবং ৭ই নভেম্বর ১৭৩৮ চন্দননগরে ফিরে আসেন। নবাব ইন্দ্রনারায়ণকে একটি *শেরপা* দেন এবং দুপ্লেক্স ফৌজদারকে জানিয়ে দেন।[১১]

ফরাসি কোম্পানি ইন্দ্রনারায়ণের হাজত বাস ভালো চোখে দেখেনি। চন্দননগরের কিছু কাউন্সিল সদস্য ইন্দ্রনারায়ণকে অত্যধিক গুরুত্ব দেবার জন্য দুপ্লেক্সকে দায়ি করে কোম্পানিতে অভিযোগ করেন। এর ভিত্তিতে কোম্পানি ১৮ই জানুয়ারি ১৭৩৮ সালের চিঠিতে ইন্দ্রনারায়ণের দেওয়ানি পদ খারিজ করে দেয়। ঐ চিঠি পাবার পর ২৩শে নভেম্বর ১৭৩৮ দুপ্লেক্স কোম্পানির এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেন। ওঁর মতে ইন্দ্রনারায়ণ চলে গেলে কোম্পানির বিশেষ ক্ষতি হবে। কোম্পানি অবশ্য ঐ আদেশ কার্যকরি করেনি ও ইন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান পদে বহাল থাকেন।[১২] দুপ্লেক্স বাংলা ছেড়ে ১৭৪১ সালে চলে গেলে পর ইন্দ্রনারায়ণের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ১৭৮৮ সালে ইন্দ্রনারায়ণের ছেলে কৃষ্ণরাম চৌধুরী মিনিষ্টার দ্য লা মেরিনকে একটি চিঠি লেখেন, যার থেকে ইন্দ্রনারায়ণ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরাম লিখেছেন যে ইন্দ্রনারায়ণ ১৭১৬ সালে বাংলাতে ফরাসিদের কাজে যোগদান করেন। এর কোন প্রামাণ্য দলিল নেই এবং বাংলায় তখন ফরাসিদের খুব দুরবস্থা চলছিল। কৃষ্ণরাম আরো বলছেন যে ১৭৩৫ সালে ফরাসি সম্রাট সপ্তদশ লুই পঞ্চদশ ইন্দ্রনারায়ণকে একটি মেডেল পাঠান। ১৭৫৫ সালে ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসি কোম্পানিকে বোরো গ্রাম উপহার দেন যার ফলে নবাব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ইন্দ্রনারায়ণকে ষাট হাজার ফরাসি মুদ্রা দিতে বাধ্য করেন। এর পরেও ফরাসিদের প্রতি আনুগত্য দেখানোর জন্য ইন্দ্রনারায়ণকে একবার আড়াই লাখ ফরাসি মুদ্রা ও আরেকবার এক লাখ বিশ হাজার ফরাসি মুদ্রা নবাবকে দিতে বাধ্য করান। এই কিছু পরেই ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সব দানের কোন দলিল নেই এবং যে ঘটনায় ইন্দ্রনারায়ণ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার কোন উল্লেখ নেই।

এ সবের থেকে ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলির প্রতি মুর্শিদাবাদ দরবারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে ক্রমাগত টাকার জন্য দাবির বিরুদ্ধে দুপ্লেক্স ১৭৩৯ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে গঙ্গায় মুসলমান বণিকদের জাহাজ ও নৌকা জোর করে

দখল করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এটাও পরিষ্কার যে মুর্শিদাবাদ দরবারের মধ্যে একটি চক্র সক্রিয় ছিল প্রধানতঃ ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে যাদের মধ্যে জগৎ শেঠও হাজি আহমদের ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এই ঘটনাটিকে আলদাভাবে একটি ঘটনা বলে দেখা ঠিক হবে না। সমকালীন রাজনীতির ঘটনা-পরম্পরার নিরিখে দেখা প্রয়োজন।

সূত্র নির্দেশ

১) চন্দননগর থেকে কাশিম বাজারে বুরাটকে লেখা দুপ্লেক্সের চিঠি, ২৭ অক্টোবর ১৭৩৮ (*বিবলিওথেক ন্যাশিওনাল*, প্যারিস, ফন্দ ফ্রাঁস্সে ৮৯৮১, ফোলিও ২ (এখন থেকে *বি. এন.*)

২) পন্ডিচেরীতে দুমাসকে লেখা দুপ্লেক্সের চিঠি ৮ মে ১৭৩৮, *বি. এন.*, ১৯৮০, ফোলিও ১২ন।

৩) এ. মার্তিনো, *দুপ্লেক্স ও ল্যন্দ ফ্রান্সেজ*, প্যারিস, ১৯২৯, পৃঃ ১৮০-১৮৫। ইজারার জন্য দ্রষ্টব্য, হরিহর শেঠ, *চন্দননগরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, চন্দননগর, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭-১১ ও ইন্দ্রাণী রায়ের প্রবন্ধ "সাম এ্যাসপেকটস অব ফ্রেঞ্চ প্রেজেন্স ইন বেঙ্গল, ১৭৩১-১৭৪০" (এল, সুব্রামনিয়াম সম্পাদিত, *দ্য ফ্রেঞ্চ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ্যান্ড দ্য ট্রেড অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওসান*, নিউ দিল্লী, ১৯৯৯, পৃঃ ১২১-১৪৩। এছাড়া দ্রষ্টব্য ইন্দ্রাণী রায়ের প্রবন্ধ "চন্দননগরের আদিপর্ব" (*জিজ্ঞাসা*, ১৯৮১, খন্ড তিন, নং ২)।

৪) চন্দননগর থেকে পন্ডিচেরীকে লেখা চিঠি, ২২শে এপ্রিল ১৭৩৮ (*বি.এন*, নুভেল এ্যাকিজিসিঁও ফ্রান্সেজ ৮৯৩৩, পৃঃ ৬৮-৬৯।

৫) ঐ, পৃঃ ৬৯ ৭০।

৬) মার্তিনো, *পুর্বোক্ত*, পৃঃ ১৮২।

৭) ঐ, কাশিমবাজারে বুরাটকে লেখা চিঠি দুপ্লেক্সের, ২৭শে অক্টোবর ১৭৩৮ (*বি.এন, ফন্দ ফ্রাঁস্সে ৮৯৮১, ফোলিও ২- ২খ*)

৮) চন্দননগর থেকে কাশিম বাজারে দুপ্লেক্সের লেখা চিঠি, তেসরা নভেম্বর ১৭৩৮, *ঐ*, ফোলিও ২খ-৪খ।

৯) চন্দননগর থেকে কাশিম বাজারে দুপ্লেক্সের লেখা চিঠি, চোদ্দই নভেম্বর ১৭৩৮, ফোলিও ৬।

১০) ঐ, ফোলিও ৬-৬খ।

১১) চন্দননগর থেকে কাশিম বাজারে দুপ্লেক্সের লেখা চিঠি, ১৮ই নভেম্বর ১৭৩৮, ঐ, ফোলিও ৮খ।

১২) দুপ্লেক্সের চিঠি প্যারিসে ২৫শে নভেম্বর ১৭৩৮ (বি. এন. নুভেল এ্যাকিজিসিঁও ফ্রান্সেজ ৮৯৩৩, ফোলিও ১৬-১৮খ।

১৩) চারুচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ মেডালের বিষয় জানিয়েছেন। ফরাসি পন্ডিচেরীর আনন্দ রঙ্গ পিল্লাই তাঁর ডায়েরির প্রথম খন্ডে ইন্দ্রনারায়ণের ১৭৩৫ সালে মেডাল পাবার কথা লিখেছেন। ১৭৮৮ সালে ফরাসিভাষায় লেখা চিঠি ছাপা হয়েছে *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেসেন্ট* এ (জুলাই -ডিসেম্বর ১৯১০, পৃঃ ১৫৭-১৫৮)

শ্রী শ্রী চৈতন্যদেবের শামা ধর্ম ও শামা সাধনা

সুফল চন্দ্র প্রামাণিক

বিংশ শতাব্দীর শুরুর প্রারম্ভে মানব তত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা শামা শক্তিধিকারী ঔষধ প্রস্তুত কারকগুলিকে একে অপরের পরিপূরক বা বিনিময় যোগ্য ব্যক্তিগত জাদু ধর্মীয় ক্ষমতার মধ্য দিয়ে ব্যবহার করতে চান যা আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল। সভ্যমানবের ধর্মীয় ইতিহাসে এই একই পরিভাষিক শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা বলা যেতে পারে। কেবল মাত্র ব্যবহৃতই হয়নি, শব্দগুলির ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। নিদর্শন স্বরূপ বলা যায় আদিম সমাজে ধর্মের সঙ্গে যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে যা প্রাচীন ভারতীয় ইরানীয়, জার্মনীয় ও বাবিলনীয়দের ভিতর পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে শামা শক্তির জটিলতার ভিতর মতপার্থক্যের অভাব হয় না। যদিও 'শামা' শব্দটিকে জাদুকর, ঔষধ প্রস্তুতকারক কিংবা প্রাচীন কলাকৌশলকারী রূপে ধর্মীয় ইতিহাসে দেখে থাকি যার ব্যবহার ধর্মীয় মানবতত্ত্ব বিদ্‌দের তবুও জটিলতা হতে উদ্ধার পাবার জন্য আমাদের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, এমন পরিভাষাটি মূলত আদিম জাদুবিদ্যা বা আদিম অতীন্দ্রিয়বাদ বিষয়ক। শামনকে ঐন্দ্রিজালিক বা জাদুকর রূপে তখনই ধরা হবে যখন তিনি প্রতিকারে বিশ্বাসী হবেন। যেমন সর্ব চিকিৎসক বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ফকিরের ন্যায়। ইনি নির্দিষ্ট কোন যুগের হবেন এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া তিনি হবেন উদার মানসিকতার অধিকারী ও দার্শনিক বা চিন্তাশীল। এই শামন বা শামা শক্তির অধিকারী ব্যক্তি পুরোহিত কিংবা অতীন্দ্রিয়বাদী মরমী বা কবিও হতে পারেন। সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়া থেকে শামা ধর্মের জটিল ইতিহাস উদ্ভুত হয়েছে। রুশ জাতির কাছ হতে আমরা 'শামা' (Shama) বা 'শামাধর্ম' (Shamanism) শব্দটি পাই। রুশের 'Tungustic Saman' শব্দ হতে 'Shama' শব্দটি এসেছে। অপর দিকে মধ্য ও উত্তর এশিয়ায় শামা (Shama) শব্দের স্বরূপটি এইরূপ ঃ Yakut Ojuna (Oyuna), Mongolan buga, boga (buge, bu) and udagan (ef, also Buruyat udayan, yakut udoyan: 'Shamaness"), Jurkotra Kam (Alatic Kam, gun, Mongolin Kani, etc.) শামা শব্দটিকে 'Tungustic' পরিভাষার মধ্যে একমাত্র পাওয়া যায় তা নয়। 'Pali' পরিভাষার মধ্যে যে 'Shamana' শব্দর নামান্তর সাইবেরিয় ধর্মের উপর ভারতীয় ধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। তুলনামূলকভাবে মধ্য ও উত্তর এশিয়ার ব্যাপকাংশে জাদুধর্মীয় জীবন অপেক্ষা শামাধর্মীয় জীবনের আধিক্য দেখা যায়। পুরোহিতই শামাধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'শামন'

(Shaman) শক্তির অধিকারী ব্যক্তিরা সমাজে বিশেষ শক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রাচীনকালে এই হর্ষোচ্ছাসমূলক বিষয়গুলি খুব সুন্দরভাবে ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় বিবেচিত হয়েছিল। হয়তো এই জটিল বিস্ময়কর ও সর্বশেষ অনিশ্চিত বিষয়ের সর্ব প্রথম সংজ্ঞা হবে (Shamanism=Technique of ecstasy) শামাধর্ম = কলাকৌশলের উল্লাস বা হর্ষোচ্ছাস। মধ্য ও উত্তর এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সম্প্রতি ভ্রমণকারীরা শামাধর্মের প্রমাণ পত্র ও বর্ণনা প্রদান করেছেন। পরবর্তীকালে উত্তর আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, ওসেনিয়া ও বিভিন্ন স্থানে জাদুধর্মীয় বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, এবং আমরা সত্বর লক্ষ্য করব ওই সকল শামা বিষয়গুলি বিভিন্ন কারণে সাইবেরিয়ার শামাধর্মের পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। এবিষয়ের উপর পর্যালোচনা করে এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আমরা 'শামনদের' আদিম সমাজে জাদুকর ও ঔষধ প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে প্রভেদ নির্ণয় করতে অসুবিধা বোধ করি। পৃথিবীর সর্বত্র কমবেশি জাদু ও জাদুকরদের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু শামাধর্ম হল নির্দিষ্ট জাদু বিশারদ, বাসস্থান তাদের সীমাবদ্ধস্থানে। "Mastery over fire", "Magical flight." ইত্যাদি বিষয়গুলি 'শামনদের' মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিষয়গুলি সকল জাদুকরদের মধ্যে পাওয়া যায় না। সকল জাদুকরেরা নির্দিষ্ট উপায়ে শামাশক্তির অধিকারী ব্যক্তিদের বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারে না বা শামাশক্তি অধিকারী হতে পারে না। শামাদের রোগ দূরীভূত বা আরোগ্য ব্যাপারে একই পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক ঔষধ দাতা বা চিকিৎসক হলেন আরোগ্যকারী। কিন্তু 'শামনরা' রোগ নিয়ামক নন (ত্রাণকর্তা হিসাবে পরিচিত) তাদের রোগ নিয়ামক পদ্ধতি চিকিৎসকদের মত নয়। শাসাশক্তির অধিকারীরা বিশেষত আত্মাকে তাঁদের দেহ থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে পারে এতে তাঁরা বিশ্বাসী।

'শামনদের' সঙ্গে যে প্রেত বা ভূতের (Sprits) সম্পর্ক আছে। আদিম ও বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায় প্রেতের উপর মানুষের প্রভাব বিস্তারের ঘটনা। প্রেত সম্পর্কে যে অস্পষ্ট ধারণা আছে এবং যার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও আছে সেই নির্দিষ্ট প্রেতের জন্য এক মৃত ব্যক্তির আত্মা সমান হবে, যাকে 'Nature sprit' বা প্রকৃতি প্রেত অথবা কাল্পনিক প্রেত ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োজন হয়না শামাধর্ম জানার জন্যে। শামাশক্তির অধিকারী (শামন) ব্যক্তি থেকে ভরকারী (Possessed ferson) ব্যক্তির পার্থক্য সহজে দেখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 'শামনরা' নিজস্ব প্রেত (sprit) কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এই অর্থে তিনি মৃত্যের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করতে পারেন। সংবাদ আদান প্রদান করতে পারেন অপদেবতা (Demons) ও 'Natural sprit' এর সঙ্গে। এই সংবাদ আদান প্রদানের সমস্ত তাঁদের জিনিষপত্র ব্যবহার করতে হয় না।

এই কতিপয় প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ইতোমধ্যে ইঙ্গিত দেয় Shamanism কে সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্যে যে ধারা আমরা অনুসরণ করতে চাই যেহেতু এই জাদুকরি ধর্মীয় ঘটনা পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল উত্তর এবং মধ্য এশিয়ায়। আমরা এই অঞ্চলের শামাধর্মকে আদর্শরূপে গ্রহণ করব। মধ্য এশিয়ার শামাধর্মে একটি আকৃতি উপহার দেওয়ার সুযোগ রয়েছে যেখানে উপাদানগুলি স্বাধীনভাবে পৃথিবীর অন্যত্র বিরাজ করে। যেমন আত্মার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কে, রহস্যজনকভাবে ভ্রমণ করার অপূর্ব ক্ষমতা, আকাশে উড্ডয়নের ও পাতালে নামার ক্ষমতা আগুনের উপরে কর্তৃত্ব ইত্যাদি। এই কঠোর অর্থে 'শামানিজম' মধ্য এবং উত্তর এশিয়ার সীমাবদ্ধ নয়। অপর পক্ষে কতকগুলি শামাধর্মীয় উপাদান বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকারে প্রাচীনকালে জাদুবিদ্যা এবং ধর্মেও দেখা যায়। তারা যথেষ্ট কৌতূহল জাগায়—কারণ তারা দেখায় যে আদিম ধর্ম বলতে এখানে জাদুবিদ্যা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এবং আত্মার প্রতি মহাকাব্যিক ধারণার প্রতি ও হর্ষোচ্ছ্বাসের প্রতি বিশ্বাস। সুমেরীয় বা সাইবেরিয় আদর্শ মহাকাব্য এবং ধর্মীয় অনুশাসন "শামনদের" সৃষ্টি নয়; এগুলি শামাধর্মের সমসাময়িক, এই অর্থে এইগুলি সাধারণ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ফল। বিপরীত পক্ষে আমরা প্রায়ই দেখি যে শামা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নিজেকে একটা আদর্শের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে।

কবিতায় প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এখানে শেষ করার সময় আমরা সর্বদা মনে রাখব যে শামাধর্ম নিয়ে আলোচনা করার সময় শামনরা বিশেষ এমনকি ব্যক্তিগত ধর্মীয় উপাদন গুলি মূল্যবান বলে মনে করেন এবং সেই অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনে কোনো রকম আঘাত করে না। শামন তা নতুন সত্যিকারের জীবন আরম্ভ করে বিশেষ পার্থক্যের মধ্য দিয়ে যেখানে আমরা দেখতে পাই একটি আধ্যাত্মিক সংকট যার বিষন্ন মহত্ব এবং সৌন্দর্যের সত্ত্ব আছে।

ভারতের সুপ্রাচীন শামা ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে বেদের যুগে ফিরে যেতে হয়। বেদের বিভিন্ন শ্লোকে শামাধর্মের প্রতিচ্ছবি দেখে থাকি। সামবেদ কাণ্ডে পঞ্চম ষষ্ঠ প্রপাঠকে 'অন্ধহরণাদি কথার' মধ্যে শামাধর্মের চিত্র পাই— এখানে স্বর্গালোক প্রাপ্তির জন্য অগ্নিবরণ করার কথা বলা হয়েছে। অন্বারোচণের অভাবে স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হতে হয়।[১]

তুর্ক মুঘল ধর্মে এক ধরণের বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় যার প্রয়োজনীয়তা শামাধর্মে স্মরণ যোগ্য। এই যে বৃক্ষের, সন্ধান পাওয়া যায় সেই বৃক্ষের সপ্তম অথবা নবম খাজিই জাগতিক বৃক্ষের (Cosmic free) প্রতিচ্ছবি। কাজেই এই বিশ্বাসে উপনীত হতে হয় যে এর অবস্থান পৃথিবীর মধ্যস্থলে হওয়ার দরুন শামনরা এই বৃক্ষে আরোহন করে স্বর্গে গিয়ে 'বাই-উলগানের' (Bai-Ulgam) সম্মুখীন হতে পারেন।

আমরা এই প্রতিচ্ছবি পুনরায় ব্রাহ্মণ আচারে দেখতে পাই। আর এ অনুষ্ঠান ঈশ্বর প্রাপ্তির অনুরূপ। স্বার্থত্যাগের জন্য বলা হয় "স্বর্গে একমাত্র একটি দেব বা দেবী আছেন।[২] স্বার্থত্যাগেই নিরাপদে তরি পারাবার বিষয়।[৩] প্রত্যেকে আত্মত্যাগের স্তরে এই স্বর্গের বন্ধনের কথা আছে। এই আচারগত কৌশলকে বলা হচ্ছে "Durohana"[৪] আচার পদ্ধতি। (এটা খুবই অসাধ্য আরোহন) যে হেতু এটা বিশ্ববৃক্ষে আরোহনের কথা ব্যাখ্যা করে।[৫]

তুর্ক মুঘল যুগে আমরা 'যূপকাষ্ঠের' সন্ধান পাই। এই যূপকাষ্ঠটি প্রস্তুত হয় সেই মহাজাগতিক বৃক্ষের সময়ে। পুরোহিত স্বয়ং কাঠুরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্য হতে একে (মহাজাগতিক) বার করে আনেন।[৬] তারপর এই মহাজাগতিক বৃক্ষটিকে নানান ধরণের সংশোধন করা হয়। এগুলি সবই একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে। অবশেষে ঐ বৃক্ষ দিয়ে যূপকাষ্ঠ তৈরি করা হয়।

মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন যখন হিন্দু সমাজ, সমাজপতিদের কবলে রুদ্ধ, ধর্মের গোড়ামী যখন সমগ্র সমাজকে গ্রাস করছে সেই সময়ে যুগবতার শ্রী শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে আমাদের এই বঙ্গের বুকে। শ্রীচৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী অবশ্য পরে আলোচনা করা হয়েছে - এখন প্রশ্ন শ্রীচৈতন্যদেব শামাসাধক কিনা। শামাধর্মে কি এর বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে— এর নিরিখে শ্রীচৈতন্যদেবকে বিচার করলে অবশ্যই বলতে হয় যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শামাসাধক ছিলেন। প্রাচ্য শামা ধর্মীয়দের মধ্যে যে বিষয়টি আমি খুব কম লক্ষ্য করেছি তা হলো স্বর্গীয় সত্তার অধিকারী যার জন্য তিনি বিভিন্ন আলৌকিক বিষয় তাঁর সমস্ত শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রদর্শন করেছেন তা নিছক জাদুর মধ্যে পড়েনা। মানবতাবাদের শীর্ষে অবস্থান করে তিনি সমাজকে যা দিয়ে গেছেন তা একজন শ্রেষ্ঠ শামা সাধকদের করণ কৌশলের গুণাবলির মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের গুণাবলি লক্ষিত হয় বলে একবাক্যে স্বীকার করতে হয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন একজন শামা সাধক। তাঁর শামা ধর্মীয় বিষয়গুলির কিছু কিছু অংশ আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য দেবের শামাধর্ম ও শামা সাধনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন ঃ

পঞ্চদশ শতকের বাংলায় প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর। বাংলায় সমাজ তখন শত বিচ্ছিন্ন, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ধর্মের অনুশাসনে জীবন কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নিম্নশ্রেণীর মানুষদের যে রূপান্তর ঘটে তাতে মনুষ্যত্বের আদর্শ জয়যুক্ত হলেও সনাতন হিন্দু ধর্মেরই বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা ঘটে। মানবিক সহনশীলতা ঐক্যের যে আদর্শ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তা চৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারেই সুস্পষ্ট হয়। তখন প্রেম ভক্তির আদর্শেই নতুন সমাজ গড়ে উঠতে থাকে।

১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (১৪৮৬) খ্রিষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। তার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। শ্রীচৈতন্যের বাল্যকালের নাম নিমাই। তাঁর গায়ের রং গৌর ছিল বলে বঙ্গে তিনি গৌরাঙ্গ নামেও পরিচিত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর হয় চৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

বাল্যে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়াশুনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করে নিজে টোল খুলে বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিতে থাকেন। তার প্রথম পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্প সংশনে মারা গেলে বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণি গ্রহণ করেন। পিতৃ বিয়োগের পর পিতৃ পিণ্ড প্রদানার্থে গয়া গিয়ে গয়াধামে ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে টোল ছেড়ে কৃষ্ণনাম কীর্তনে মনোনিবেশ করেন। নাম সংকীর্তন প্রচারে কাহার বাধা তিনি মানেন নি। কাজি সাহেব প্রথমে নাম সংকীর্তনে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত কাজি সাহেব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। প্রথম সত্যাগ্রাহী বিপ্লবীব্যাপে শ্রীচৈতন্য দেশবাসীর মন থেকে রাজভয় দূর করলেন। পরে মহাপুরুষের পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন।

এরপর তাঁর গৃহত্যাগের পালা। মাতা ও সহধর্মিনীর অনুমতি নিয়ে নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া এসে চব্বিশ বছর বয়সে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। কেশব ভারতী নবীন সন্ন্যাসীর নাম দিলেন কৃষ্ণ চৈতন্য। সেদিন থেকে তার চৈতন্য নামটিই প্রবর্তিত হল। এই সময় নিত্যানন্দ অদ্বৈতআচার্য এবং আরও অনেক ভক্ত এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তবৎ হয়ে উঠলেন।

বঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে নাম সংকীর্তন প্রচার করে শেষে পুরী গমন করেন। জীবনের শেষ বারোটি বছর কাটে দিব্যোৎম্মাদ প্রভুকে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা গীত গোবিন্দের পদাবলি শুনায়ে। সেই সব শুনতে শুনতে তার বাহ্যজ্ঞান ক্রমে ফিরে আসত। দিব্যোৎম্মাদ অবস্থায় যখন মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন তখনই তিনি সারা ভারতে অবতার রূপে খ্যাতি লাভ করেন। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে (১৫৩৩) খ্রিষ্টাব্দে আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে চৈতন্যদেবের মানুষী লীলার অবসান হয়।

শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডের মধ্যে দেখি বিশম্ভর যখন শ্রীবাসের আলয়ে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে ভক্তবৃন্দ নিয়ে নাম সংকীর্তন করছিলেন তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে অনাদির আদিগোবিন্দ তা প্রকাশ করার জন্য বারবার তিনি স্বয়ং পাষণ্ড দলনের কথা উল্লেখ করেছেন ঈশ্বর বিরোধীদের পাষণ্ড ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের দমন করার জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন। আমি সেই অনাদির আদি গোবিন্দ— আমি সেই ঈশ্বর।

আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ হইল প্রচুর।।

সংহারিনু সব বলি করয়ে হুঙ্কার।

মুঞি সেই মুঞি সেই বলে বারবার।[৭]

কখনো বা বিশ্বম্বর তাঁর স্বীয় সহধর্মিনী লক্ষ্মীদেবীকে মারতে যাচ্ছেন, কখনো বা হাঁসছেন কখনো বা কাঁদছেন আবার কখনো বা মুর্ছা যাচ্ছেন। আবার সময়ে সময়ে গাছের উপরে চাপছেন, দাঁতে দাঁতে আঘাত করছেন। শচীদেবী পুত্রের এই আচরণ দেখে বায়ুরোগ হয়েছে বলে মনে করছেন। পাড়াপড়শিরা "বায়ুজ্ঞান" হতে বিশ্বম্ভরকে মুক্তিঘরে বেঁধে রাখতে বলেছেন, কেউ বা লক্ষ্মী দেবীকে বিশ্বম্বরকে ঔষধ পান করবার জন্য ও বিশ্বম্ভরের মাথায় তেল দেবার জন্য বলছেন। শচীদেবী শ্রীবাস ও অদ্বৈতের নিকটে পুত্রের ব্যাপার জানালে তাঁরা তাদের প্রভু বিশ্বম্ভরকে দেখে তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারলেন— বিশ্বম্ভর আর কেউ নন, স্বয়ং ঈশ্বর— শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বম্ভর তার ভক্তদ্বয়কে দেখে স্বাভাবিকাবস্থায় ফিলে এলেনঃ

হাসি বলে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাল ভাই।

তোমার যে মত ভাই আমি তাহা চাই।।

মহাভক্তি যোগ দেখি তোমার শরীরে।

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমার শরীরে।।

শ্রীবাস বলেন যে তোমার ভক্তি যোগ।

ব্রহ্মা শিব সনকাদি বাঞ্চিয়ে এ রোগ।[৮]

শ্রীচৈতন্য দেবের শামা সাধনার একটি সুন্দর রূপ হলো শ্রী চৈতন্যদেব শ্রীবাসকে স্বয়ং শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী নারায়ণের রূপ ধারণ করে দেখা দেন ও চৈতন্য দেবই যে ব্রজের কানাই তাই বার বার ঘোষণা করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখন্ডে বর্ণিত আছে।

নির্ভয়ে চাহেন চাবিদিকে বিশ্বম্ভর।

গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর।।

গাভী এক যুথ দেখে পুলিনেতে চরে।

হাম্বা রব করি আইসে জল খাই বারে।।

উর্দ্ধ পুচ্ছ করি কেহো চতুর্দিগে চায়।

কেহো যুঝে কেহো সোয়ে কেহো জল খায়।

দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার।

মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বারে বার।[৯]

শ্রীচৈতন্য একদা ভাগীরথী তীরে ভ্রমণ করা কালীন দেখতে পেলেন একদল গাভী

গঙ্গাতীরে হাম্বা হাম্বা শব্দ করে জল পান করার জন্য আসছে। এসে কোন কোন গাভী জল পান করছে কোন কোন গাভী গঙ্গাতীরে শুয়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি বলর্তে শুরু করলেন। 'মুঞি সেই" অর্থাৎ আমি সেই ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ, আমিই সেই ঈশ্বর।

এই ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীচৈতন্য দেব শ্রীবাসের ঘরে এসে শ্রীবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এই সময় শ্রীবাস ঈষ্টদেবতার ধ্যানে ও পূজার্চণায় ব্যস্ত ছিলেন — শ্রীবাসের আলয়ে প্রবেশ করে বিশ্বম্বর যা করেছিলেন তা চৈতন্য ভাগবতে আছেঃ

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেখি—

এই মতে ধাঞা আইলা শ্রীবাসের ঘরে।

কি করিস শ্রীবাসিয়া বোলে অহঙ্কারে।।

নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস সেই ঘরে।

পুনঃপুন নাথি মারে তাহার দুয়ারে।।

কাহারে পূজিশ করিস কাহারে ধেয়ান।

ধ্যানে যারে দেখিস তারে দেখ বিদ্যমান।।

জলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।

হইল সমাধি ভঙ্গ চাহে চারিভিত।

দেখে বিরাসনে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর।

চতুর্ভূজ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধর।।

দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস শরীরে।

স্তব্ধ হৈল শ্রীনিবাস কিছুই না স্ফুরে।।

ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু আরেরে শ্রীবাস।

এতদিন না জানিস আমার প্রকাশ।

আমি সেই (শ্রীকৃষ্ণ) আমি সেই বলতে বলতে শ্রীবাসে আলয়ে লাথি মেরে দরজা খুলে বিশ্বম্ভর প্রবেশ করলেন ও ধ্যানস্থ শ্রীবাসকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী মূর্তিতে দেখা দিলেন।

শ্রী চৈতন্যের শামা সাধনার অন্য একটি রূপ হলো বরাহ রূপ ধারণ করে মুরারি গুপ্তকে দেখা দেওয়া। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডে আছে ঃ

মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচী নন্দন।
সংভ্রমে করিল গুপ্ত চরণা বন্দনা।
শূকর শূকর বলি প্রভু ঘরে যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত এই মত চায়।
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ঠ হইল বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জল ভাজন সুন্দর।।
বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্থানু ভাবে মহাপ্রভু ও লীলা দশণে।।
গর্জ্জে যজ্ঞ বরাহ প্রকাশে খুরচারি।
প্রভু বোলে স্তুতি বলহ মুরারি।
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব দরশনে।
কি বলিব মুরারি না আইসে বদনে।[১০]

শ্রীচৈতন্য মুরারি গুপ্তের ঘরে প্রবেশ করলে মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করলেন। মুরারি গুপ্তের ঘরে প্রবেশ কালীন শ্রীচৈতন্য শূকর শূকর বলে চিৎকার করলে মুরারি গুপ্ত স্তম্ভিত হলেন। এরপরে মুরারি গুপ্তের বিষ্ণুগৃহ অর্থে ইষ্টদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে বরাহ মূর্তি ধারণ করেন ও ঐ বরাহ মূর্তি স্তব্ধ হয়ে দর্শন করেন।

একদা শ্রীবাসের মন্দিরে নিত্যানন্দ যখন ব্যাসদেবের পূজা করে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছিলেন তখন নিত্যানন্দকে ব্যাস পূজা করতে নিষেধ করলেন— নিত্যানন্দকে চৈতন্য ষড়ভূজার মূর্তি দেখালেন। এটি শ্রীচৈতন্যের শাক্ত সাধনার এক অপূর্ব নিদর্শ। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্য খণ্ডে আছেঃ

প্রভুরে ডাকিয়া বোলে শ্রীবাস উদার।
না পূজনে ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার।
শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌর সুন্দর।
ধাইয়া সমুখে প্রভু আইলা সত্বর।।
প্রভু বোলে নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন।।
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিয়া তাঁর মস্তক উপর।।

চাঁচর চিক্‌রে মালা শোভে অতি ভাল
ছয় ভূজ বিশ্বম্ভর হইল তৎকাল।।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শ্রীহল মূষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা নিতাই বিহ্বল।[১১]

শ্রীবাসের আলয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ব্যাসদেবের পূজা করতে নিত্যানন্দ প্রভুকে নিষেধ করেন। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের মাথায় চাঁচর চুলের উপর মালা পরিয়ে দিলেন। এই মালা শ্রীচৈতন্যের মস্তকের শোভা বাড়াল। এই সময় বিশ্বম্ভর ষড়ভূজ মূর্তিধারণ করলেন। তাঁর ছয় হাতে যথাক্রমে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল ও মূষল শোভিতহলো। এই ষড়ভূজমূর্তি দেখে নিত্যানন্দ মূর্ছা গেলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডে দেখি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত মুরারিকে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্তি ধারণ করে দর্শন দেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত অনুযায়ী ঃ
মুরারির আজ্ঞা হৈল মোর রূপ দেখ।
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক।।
দূর্বাদিল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভব।
বিরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্দ্ধর।।
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ গনে।।
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৎ দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর।।
মূর্চ্ছিত হইয়া দৈব মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফান্দে পড়ি জয় প্রায় হৈলা।[১২]

শ্রীচৈতন্য মুরারিকে রূপ দেখার জন্য আদেশ করলে— মুরারি বিশ্বম্ভরের আজ্ঞা পেয়ে দেখলেন বিশ্বম্ভর মহা ধনুর্দ্ধর রামচন্দ্রের মূর্তি ধারণ করে বিরাসনে বসে আছেন। রামচন্দ্রের বাম দিকে সীতাদেবী ও দক্ষিণ দিকে লক্ষণকেও বসে থাকতে দেখলেন। আরও দেখলেন বানরেরা রামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষণের বন্দনা করছেন। এই মূর্তি সকল দেখে মুরারি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

বিশ্বম্ভর অদ্বৈত আচার্যকে অর্জুনের রূপে দেখা দিলে অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্যের নিকট জন্মজন্মান্তরের দাস রূপে জন্ম নিবার কামনার মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্যের শামা সাধনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে।

বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডে আছে ঃ

কার্য্যান্তরে নিজগৃহে ছিল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর।
ভক্ত আর্ত্তি পূর্ণকারী সদানন্দ রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায়।
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি ধরি তার করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন লঞা বিষ্ণু দ্বারে।
হাসিয়া ঠাকুর বোলে শুনহে আচার্য্য।
তোমার ইচ্ছা বলহ কিবা চাহ কার্য্য।
অদ্বৈত বলয়ে তুমি সর্ব্বদেব সার।
তোমারেই চাহো প্রভু কি চাহিব আর।।
হাসি বোলে প্রভু কহিলা সুসত্য।
এই তুমি সর্ব্বদেব বেদান্তর তত্য।
তথাপি হরি ভব দেখিতে কিছু চাই।
প্রভুবোলে কিবা ইচ্ছা বল মোর ধাত্রিও।
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু পূর্ব্ব অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় ধরে।।
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিগে শৈন্য দেখে মহাযুদ্ধ পথ।।
রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর।
চতুর্ভূজ শংখ চক্র গদা পদ্ম ধর।।
অনন্ত ব্রহ্মান্ত রূপ দেখে পুনঃ পুন।
সমুখে দেখেন স্তুতি করয়ে অর্জুন।।
মহা অগ্নি যেন জলে সফল বদন।
পোড়য়ে পাষণ্ড পতঙ্গ দুষ্ট গণ।।
যে পাপিষ্ট পর নিন্দা পরদ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পড়ি ঘরে।।
এই রূপ দেখিতে হেনকার শক্তি পাই।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য গোষাঞিও।১৩

একদা শ্রীচৈতন্য কোন কাজের আছিলায় নিজ বাড়িতে ছিলেন সেই সময় অদ্বৈত আচার্যকে দেখতে পেলেন। শ্রী অদ্বৈত আচার্যকে বিশ্বম্ভর দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলেন শ্রী অদ্বৈত উদ্বিগ্ন চিত্তে গড়াগড়ি যাচ্ছে। শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বৈতের নিকট এসে তার মন বাসনা পূরণ করার জন্য অভয় দিল অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নিকট যাচিঞা করলেন। প্রভু আপনি অর্জ্জুনকে যে রূপ ধারণ করে দেখা দিয়ে ছিলেন সেই রূপে একবার আমায় দর্শন দানে সুখী করুন শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় রূপ পরিবর্তন করে শংখচক্র গদা পদ্ম ধারী বিশ্বরূপী নারায়ণ মূর্তিতে এক রথের উপর বসে আছেন। যোদ্ধা যে মূর্তির মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি নেত্র যুক্ত বন্ধন। যেখানে আছে চন্দ্র সূর্য সাগর পাহাড় পর্বত বন বনানঞ্চল আর বিশ্বরূপ ধারণকারী নারায়ণের বদন হতে আগুন বার হচ্ছে। সেই আগুনে অধার্মিক পাষণ্ডগণ দগ্ধ হচ্ছে। তার সেই বিশ্বরূপ মূর্তির দর্শন করে অর্জুন তাঁর বন্দনা করেছেন।

শ্রীবাসের ঘরছাড়ি যাও কি কারণ।।
হে পুত্রবর তুমি শ্রীনিবাস আচার্য্যের
আলয় ছেড়ে যাচ্ছ কেন?
মৃত পুত্রের মুখ থেকে উত্তর আসে ঃ
শিশু বোলে এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই সব।।
নির্ব্বন্ধ ঘুচিলে আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাম আর নির্ব্বন্ধিত পুরী।
কে কাহার বাপ প্রভু কে কাহার নন্দন
সভে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন।।
যতদিন ভাগ্যছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাম এবে চলিলাম অন্যপুরে।
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার।
এতবলি নিরব হইল শিশু কায়া।
এমত অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গরায়া।।[১৪]

শ্রী নিবাসের মৃত পুত্রের মুখ হতে উত্তর আসে ''যতদিন আমার পরমায়ু ছিল ততদিন আমি সবকিছু উপভোগ করলাম পরমায়ু শেষ হলে আর জীবিত থাকা যায় না। পরমায়ু

শেয়ে আমি পরলোকে যাত্রা করলাম। হে প্রভু এ জগতে কেই কারো সন্তান বা পিতা নন- সবকিছু আপনার ইচ্ছায় হয়। শ্রীবাসের ঘরে যতদিন আমার সময় ছিল ততদিন আমি বসবাস করেছি এখন পরলোকে যাত্রা করছি। আপনাকে শ্রীচৈতন্যদেবকেও আপনার পারিষদবর্গকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। আমার অপরাধ মার্জনা করুন। এই কথা বলে শ্রাবাস নন্দন পুনঃরায় মৃত্যুলোকে গমন করল। এ সকল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঘটে ছিল।

এই অপূর্ব বিশ্বরূপ নারায়ণের মূর্তি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য গৌরাঙ্গের কৃপায় দর্শন করতে পেলেন

শ্রীচৈতন্য দেবের সাধনার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো শ্রীনিবাস আচার্যের মৃত পুত্রের প্রাণদান করা ও শ্রীবাসের মৃতপুত্রের সঙ্গে সংলাপ করা।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে ঃ

একদা শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পারিষদবর্গ নিয়ে শ্রীবাসের গৃহে নাম সংকীর্তন করছিলেন এমন সময় তিনি তাঁর পারিষদ বর্গের নিকট শুনতে পেলেন শ্রীবাসের পুত্র পরলোকে যাত্রা করেছে। শ্রীচৈতন্যদেব নাম সংকীর্তন করতে করতে শ্মশান যাত্রী শ্রীবাস পুত্রের নিকট যান এবং মৃতপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

সৎকার করিতে শিশু জায়েন লইয়া।।
মৃত শিশু প্রতি প্রভু যান।
মহা অগ্নি যেন জলে সকল বদন।
পোড়য়ে পাষণ্ড পতঙ্গর দুষ্ট গণ।।
যে পাপীষ্ঠ পর নিন্দা পর দ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পড়ি মরে।।
এই রূপ দেখিতে অন্যকার শক্তি নাই।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য গোসাঞিং।[১৫]

শ্রীশ্রী চৈতন্য দেবের শামা সাধনা সার্থক। তাঁর অনুগামীদের আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলি। এঁরা অনাড়ম্বর সাত্বিক জীবন যাপন করেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসাই এদের কাজ। সমাজে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মাধ্যমে এঁরা জাতীয় সংহতি রক্ষার দিকে সর্বদা নজর রাখেন যার ফলে সমাজ কল্যাণে এঁদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সহায়কগ্রন্থাবলি ঃ

১) শ্রী বৃন্দাবন দাস — শ্রীশ্রী চৈতন্য ভাগবত, ১২৪৯ বঙ্গাব্দ, ৭ই চৈত্র সংস্করণ।

২) স্বামী সারদানন্দ— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ. কলিকাতা ১৯ বি, ১৯৫৭-৭এ

৩) অধ্যাপক বিজন বিহারী ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

৪) নবসন্ধি বাইবেল প্রকাশনী — অরবিন্দ দে

৫) MIRCEA ELIDE SHAMANISM Translated from the French by Willard R. Trask LONDON

৬) SATAPATH BRAHAMAN. VIII (TRAN. J. EGGELING)

৭) AITAREYA BRAHMAN. (TR. A. B. KEITH).

সূত্র নির্দেশ

১) সুবর্গায় বা এষ লোকায় চীয়তে যদগ্নিস্তং সুবর্গাল্লোকাদ্যজমানো হীয়েতন পৃথিবী মহাক্রমিষং প্রাণো মা মা হাসীদ্দি বম্যাহক্রমিষং—" ৫ম কাণ্ড ঃ ৬ষ্ঠ প্রপাঠক। সামবেদ সংহিতা পৃঃ ৬৩৭। সামবেদ সংহিতা— অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ — পরিতোষ ঠাকুর।

২) Satapatha Brahmana, VIII, 7,4,6 (Tr. J. Eggeling, PP. 145-46)

৩) Aitareya Brahmana, 1,3, 13 (Tr. A. B., Keith)

৪) Satapatha Brahmana, IV, 2, 5, 10 (Tr. J. Eggeling, P. 311) cf. The numerous Texts assembled by Sylvain levi, Ladoctrine du sacrifice dans les Brahmanas PP. 87

৫) On the Symbolism of the Durhana, seecliada, 'Durohana and the waking dream.'

৬) Satapatha Brahmana 111` 6.4.13 etc.

৭) বৃন্দাবন দাস শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড) পৃঃ ১৫, ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র সংস্করণ

৮) বৃন্দাবন দাস শ্রীশ্রী চেতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড) পৃঃ ১৫, ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র সংস্করণ

৯) শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ২২

১০) শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ২২

১১) শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ২২

১২) শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ১৩৭

১৩) শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ১৩৯ (মধ্যখণ্ড)

১৪) শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ১৩৯ (মধ্যখণ্ড)

১৫) শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ১৩৯ (মধ্যখণ্ড)

কলকাতার আদিপর্ব ঃ শেঠ বসাকের কলকাতা

উত্তরা চক্রবর্তী

প্রচলিত রীতিতে কলকাতার পত্তন ১৬৯০ থেকে ধরা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রয়োজনের তাগিদে তৈরি, কুঠি বাড়ি, গুদাম এবং বসতিস্থল থেকে গড়ে ওঠা আদ্যোপান্ত একটি ঔপনিবেশিক শহরের ক্লাসিকাল উদাহরণ কলকাতা তখন একটি বদ্ধমূল ধারণার পিছনে কাজ করেছে বহু ব্যবহৃত একটি সমসাময়িক বিবরণ।

"August 24, 1690, Sunday.— This day at Sankraul ordered Captain Brooke to come up with his vessel to Chuttanuttee, where we arrived about noon; but found the place in a deplorable condition, nothing being left for our present accomodation and the rain falling day and night."[১]

কোম্পানির এজেন্ট হেজেস তাঁর ডায়েরির প্রথম পাতায় যে বিবরণটি লিখলেন, তাই কলকাতার উদ্ভবের সূচনা বলে ধরে নেওয়া হল। হেজেসের বিবরণের শেষ পংক্তিটি কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পংক্তিটি থেকে এই তথ্যটি পরিষ্কার প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এই অঞ্চলটি আগে বসতিপূর্ণ ছিল; ইংরেজদের পরিচিত এবং ইংরেজরা একাধিক বার এই অঞ্চলে যাতায়াত করেছে। "Mellick Burcoordar and the country people at our leaving this place (in October 1688) burning and carrying away what the could. On our arrival here the Governor of Tana sent his servant with a compliment"[২]।

১৬৯৮ সালে সুবে বাংলার তৎকালীন মোগল সুবাদার আজিম উদ্দীনের (পরবর্তী কালে আজিম-উস-শানে) কাছ থেকে ইংরেজরা কলিকাতা, গোবিন্দপুর এবং সূতানটি এই তিনগ্রামের স্বত্ব কিনে নেবার অনুমতি লাভ করে। এই তথ্যটিও বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। লোকবসতি করিয়ে ব্যবসা চালানোর জন্যই এই তালুকদারি কেনার প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজদের। নিতান্ত জনমানবহীন অঞ্চলে ব্যবসা করার অভিপ্রায় তাদের ছিলনা। আবার এও ঠিক যে সেই সময় মোগলদের খবরদারি থেকেও দুরে সরে থাকতে চাইছিল তারা। অর্থাৎ এমন একটি অঞ্চল, যা মোগলদের সরাসরি নজর থেকে দুরে হবে, এবং নদীর ধারে হবে, এবং কেনা, বেচা, মাল আনা নেওয়া, ব্যবসা বাণিজ্যের এই বিভিন্ন স্তরগুলি কার্যকরী করার জন্য, যেখানে বাজার হাট, মানুষ জন, বসতিও থাকবে। সুতানুটিতে

এই উপলক্ষ্যে চার্ণক একাধিক বার আসা যাওয়া করেছেন; কোম্পানির নথি থেকে এই তথ্য জানা যায়। একটি বাজার ঘিরে তিনটি গ্রাম, এই গঞ্জ এলাকাই চার্ণককে আকৃষ্ট করেছিল। এরই সূত্র ধরে কলকাতার প্রাক ঔপনিবেশিক কালপর্বের অনুসন্ধান করা সম্ভব। সূতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা, আজকের কলকাতার এই তিন আদি কেন্দ্রীঅংশের ইতিহাসও অনুধাবন যোগ্য। এই তিনঅংশের সঙ্গে এই অঞ্চলের প্রাচীন কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নগরায়ণের নানাবিধ কারণ এবং সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া থাকে। নাখবির মতে, নদীর মোহানা, নাব্যনদীর দুই তীর, বাজাব গঞ্জ, হাট, গ্রামবসতি এই সব উৎস গুলি থেকেই নগর গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিও সুদীর্ঘ এবং জটিল। বেইলির মতে সৈন্যবাহিনীর ছাউনি, কেল্লার আশেপাশের অঞ্চলে নগর পড়ে উঠতে পারে।[৩] এই দুই সংজ্ঞা মেনে নিয়েই এ কথা বলা যায়, যে নির্জন বসতিহীন অঞ্চলে শহর গড়ে উঠতে পারেনা। অর্থাৎ আগে শহর, পরে জনবসতি এভাবে কৃত্রিম উপায়ে শহর তৈরি হয় না। আগে জনবসতি, পরে শহর এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

কলকাতার গড়ে ওঠার ইতিহাস আলোচনায় নাখবি বা বেইলির দুজনের ব্যাখ্যা যথাযথ ভাবে প্রযোজ্য। বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনা করলেই একথা পরিষ্কার বোঝা যায়। নদীর ওপারে আজকের বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে ষোড়শ শতকে তৈরি মোগলদের তানা নামে একটি দুর্গ হয়েছিল। দুর্গ অঞ্চলের গুরুত্ব অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল যেমন সত্য, তেমনি দুর্গের উপস্থিতি অঞ্চলের প্রাধান্য বাড়িয়েছিল, এও ঠিক। গঙ্গাকে মাঝখানে রেখে এই অঞ্চলে, প্রাচীন কাল থেকেই চাষবাস গড়ে ওঠে। পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত র মতে গাঙ্গেয় অববাহিকার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রাক ঐতিহাসিক পর্বের ধান চাষের প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা একথাই প্রমাণ করেছে।[৪] ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, হরাম, জৈন সূত্র ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপাদান গুলি থেকে সুহ্মদেশের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] কানিংহ্যাম, নন্দলাল দে, রমেশচন্দ্র মজুমদার বা সাম্প্রতিক কালের অমিতাভ ভট্টাচার্যর ব্যাখ্যায় কিছু কিছু অঞ্চল সম্বন্ধে মতের হেরফের থাকলেও, মোটামুটি ভাবে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গই যে সুহ্মদেশ এবিষয়ে এঁরা সকলেই একমত।[৬] হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, এসব অঞ্চল নিয়েই ছিল প্রাচীন *সুহ্মদেশ*। প্রত্নতাত্ত্বিক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী অবশ্য মেদিনীপুরকেও সুহ্মদেশের অন্তর্গত করেছেন।[৭] রঘু বংশের চতুর্থ সর্গে সুহ্মবাসীর বেতসীবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। *পবনদূতমের* কবি ধোয়ীর বর্ণনায় সুহ্ম, গঙ্গারীবি বিধৌত জনাকীর্ণ সমৃদ্ধদেশ। কলকাতার ইতিহাস প্রসঙ্গে ধোয়ীর এই বর্ণনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ যোগ্য যে অজানা গ্রিক নাবিকের *পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সি* বইটিতে এবং টলেমির বর্ণনায় যে গাঙ্গে বন্দরের উল্লেখ আছে, তাও দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গেই অবস্থিত।[৮] 'গাঙ্গে' বেলাকূল, বা নদী বন্দর। অর্থাৎ যেখান থেকে সমুদ্রগামী জাহাজের পণ্যের আমদানি

রপ্তানি হত। লিখিত তথ্যের প্রাচীন কালের বেশ কিছু নিদর্শনস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রত্নস্থল গুলির অন্যতম হল চন্দ্রকেতুগড়। কলকাতা থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে উত্তর চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপা অঞ্চলে চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থান। পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্তর মতে টলেমি এবং পেরিপ্লাসে বর্ণিত 'গাঙ্গে' বন্দর শহরের অবশেষ চিহ্নই চন্দ্রকেতুগড়। চন্দ্রকেতুগড়ে উৎখননের বিভিন্ন স্তরে শুঙ্গ, কুষাণ আমল থেকে শুরু করে গুপ্ত, পাল, সেনযুগ পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের নমুনা পর পর সময়ানুযায়ী পাওয়া গেছে।

উত্তর ভারতের মসৃণ পালিশের কালোমাটির জিনিষ পত্রও এখানে পাওয়া গেছে।[৯] সুতরাং প্রাক মৌর্য আমল থেকে সেন যুগ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন জনবসতি এই অঞ্চলে ছিল একথাই প্রমাণিত হচ্ছে আজকের কলকাতার আশেপাশের অঞ্চলে এবং স্বল্পদূরত্বেই আরও অনেকগুলি প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণার চন্দ্রকেতুগড় হাড়োয়া ছাড়াও, হুগলীর মহানদ এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হরিনারায়ণ পুর, দেউলপোতা, বোড়াল এই পাঁচটি প্রত্নস্থলের অবস্থান কলকাতার ৩২ থেকে ৪০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে। এছাড়াও হাড়োয়া, তমলুক ইত্যাদি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের এই প্রত্নস্থলগুলিও কলকাতা থেকে খুব দূরত্বে নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এই সব অঞ্চলের কিছু কিছুতে তাম্র-প্রস্তর যুগের নমুনাও পাওয়া গেছে।[১০] এই প্রসঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিদ দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর বক্তব্য হল, "there was a major arterial route in West Bengal which linked the entire area from the Barind tract in the North as modern Maldah and West Dinajpur, to the Rupnarayan Delta and coastal Midnapur in the South..... We feel that the major early historic towns and cities of West Bengal were linked in various ways with these arterial lines of communication."[১১]

এই যে জনবসতির চিহ্নগুলি আমরা দেখতে পাই, এগুলি আজকের কলকাতার কাছেই। অনুমান করা যেতে পারে, চারপাশের ছড়ানো বসতি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পর্যায়ে প্রসারিত হয়ে আজকের কলকাতা অঞ্চলে পৌছে গিয়েছিল। প্রতিটি পর্যায়ে পাঁচ কিমি ধরে। উপরন্তু একথা প্রতিষ্ঠিত যে গুপ্ত আমালে উত্তর বঙ্গ থেকে ডায়মন্ডহারবারের খাড়ি পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির বিস্তার ছিল যার উল্লেখ পাওয়া যায়। দিলীপ চক্রবর্তীর উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। "The Bhagirathi of course never witnessed a gap in sequence of historical occupation from the early historical phase on wards"[১২]

খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের 'গাঙ্গে' বন্দরের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, বিতর্ক নেই আজকের কলকাতার সঙ্গে তার নিকটবর্তিতা নিয়ে।

দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে শ্রীমদ ডোম্মনপাল নামে সেন রাজাদের এক সামন্ত

সম্ভবত স্বাধীনভাবেই সুন্দরবন অঞ্চলে শাসন করছিলেন। ভদ্বারহাটক' নামক গঙ্গার পূর্ব পারে একটি জায়গা থেকে তিনি একটি ভূমিদান পত্র প্রকাশ করেন। ডোম্মনপালের (১১৯৬) লেখটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাক্ষসখাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। রাক্ষসখাড়ি গঙ্গাসাগর থেকে মাত্রই বারো মাইল পূর্বদিকে। 'দ্বারহাটক' নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন দ্বার অর্থে সমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত বেরোনোর পথ, এবং 'হাটক' অবশ্যই হাট বা আঞ্চলিক কেনাবেচার জায়গা। দ্বাদশ শতকে সমুদ্রের কাছাকাছি মোহনার মুখে এ ধরণের হাটের এতটাই গুরুত্ব যে এটিকে একটি, স্থানীয় শাসনকেন্দ্র হিসেবে ধরা হচ্ছে।[১৩]

টলেমির বা অজানা গ্রিক নাবিকের সময় থেকে এক হাজার বছর পরেও সমুদ্রের কাছাকাছি একটি ব্যবসাকেন্দ্র এবং স্থানীয় শহরের উল্লেখ পাচ্ছি। একাদশ, দ্বাদশ শতক নাগাদ সেন রাজাদের তাম্রপত্র গুলিতে শাসন স্থলের উল্লেখ পাই। এগুলি চতুরক। সেই তাম্রপত্রে চারটি 'চতুরকের' নাম পাওয়া গিয়েছে। শাসন ব্যবস্থায়ী চতুরক, গ্রামের চাইতে বড় গুরুত্ব পূর্ণ এবং 'মন্ডলের' নীচে চারটি চতুরকই গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত। সম্ভবত চারটি যাতায়াতের পথের মধ্যে অবস্থিত বলেই 'চতুরক' নাম। এই চতুরক গুলির অন্যতম বেতড্ড চতুরক গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাব পশ্চিম পারে. হাওড়ার নীচে অনেক পরের সময়ের বেতোরের সঙ্গে বেতড্ড চতুরককে নির্দিষ্ট করা হয়। লক্ষ্মন সেনের গোবিন্দ পুর তাম্রপত্রে (১১৮১ খ্রি) বেতড্ড চতুরক এবং তার অদূরে 'ধর্মনগর' নামে একটি নগরের নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে। যোড়শ শতাব্দীর সূচনায় বেতড্ড চতুরক বা বেতোরের বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা সকলেরই জানা।[১৪] গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্দেশীয় নদী বাণিজ্যের সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যব যোগসূত্র হিসেবে বেতোর ষোড়শ শতকের পর্তুগিজদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অতএব 'গাঙ্গে' থেকে বেতড্ড, খ্রিষ্টিয় প্রথম শতক থেকে দ্বাদশ, নিরবিচ্ছিন্ন যাতায়াত এবং বসতির অস্তিত্ব দিলীপ চক্রবর্তীর বক্তব্যকেই সমর্থন করছে।

চতুর্দশ শতকের ইবন-ই- বতুতাও ভাগীরথী নদী ধরে নৌকায় দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সময় একই জিনিষ লক্ষ্য করেছেন "নদীর দুধারে ঘন বিন্যস্ত গ্রাম বসতি, মনে হয় আমরা যেন একটি বড় বাজারের মধ্য দিয়েই চলেছি।[১৫]

পর্যাপ্ত লিখিত তথ্যের সঙ্গে, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের যোগাযোগ, দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বিশেষ করে কলকাতার ইতিহাসে অন্য এবং নতুন মাত্রা তৈরি করতে পারে, একথা অনস্বীকার্য। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতকে, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে, কালীঘাটে, মাটির তলা থেকে পাওয়া প্রচুর পরিমাণ, গুপ্ত আমলের স্বর্ণমুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৬] ১৮৫১-৫২ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কল্পলতা' সম্ভবত প্রথম কলকাতার ইতিহাস গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

গোবিন্দপুর ইংরেজদের নতুন দুর্গ নির্মাণের জন্য মাটি খোঁড়ার সময় একটি তাম্রপত্র পাওয়া যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে, রাজা নবকৃষ্ণদেবের অনুরোধে, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ তাম্রপত্রের পাঠোদ্ধার করে জানতে পারেন, ঐ লেখটি রাজা রামচন্দ্রের একটি দান পত্র। রঙ্গলালের এই বিবৃতি কৌতূহল জাগায়। যেহেতু সময়ের হিসেবে তাঁর লেখই প্রাচীনতম, স্মতরাং রঙ্গলালের এই তথ্যের উৎসের কোন উল্লেখ না থাকলেও ঘটনাটি তাঁর থেকে খুব প্রাচীন নয়। এর সবটাই কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় নি। সম্ভবত রঙ্গলাল ষোড়শ শতকের বাকলার রাজা বামচন্দ্র রায়ের কথাই বলেছেন।[১৭] কলকাতার মধ্যেই এই ধরণের আরেকটি প্রাচীন, চতুর্দশ শতকীয় প্রত্ন নমুনার কথা বলেছেন রিচার্ড ইটন। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দের একটি মসজিদ, বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও জীর্ণ অবস্থায় কলকাতার পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ, সুফি শেখ আলাউল আহমদের উদ্দেশে রচিত একটি প্রশস্তি পাওয়া যায়। শামসউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত ইনসক্রিপশনস অফ বেঙ্গল গ্রন্থে লেখটির উল্লেখ করেছেন। জনৈক সাহেব এটি উদ্ধার করেন। তাঁর বিবরণও পাথরটির বিপরীত দিকে খোদাই করা ছিল।[১৮]

এভাবে দেখা যাচ্ছে, যে মূল কলকাতা শহরের মধ্যেই মধ্যযুগীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনার আবিষ্কার, অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রমাণিত করছে। এ প্রসঙ্গে উত্তর কলকাতার বেথুন কলেজের মাঠে হঠাৎ খুঁড়ে পাওয়া পোড়ামাটির অসংখ্য জিনিষ পত্র এবং মূর্তি। পরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে মাঠের অংশ জুড়ে প্রাচীন কোন কাঠামোর দেওয়াল, চুণ সুরকির মেঝে অসংখ্য মধ্যযুগীয় এবং মোগল আমলের ইঁট (২০ সে:মি ১০ সে:মি ৪ সে: মি) পাওয়া যায়। একথা সুবিদিত যে বেথুন কলেজের অঞ্চলটি প্রাচীন সূতানুটির মধ্যস্থল। কলেজের অদূরে শোভাবাজারে মেট্রোরেলের খননের সময় এধরণের পোড়ামাটির মূর্তি এবং অন্যান্য জিনিষ পাওয়া যায়। শোভাবাজার স্টেশনে প্রদর্শিত পোড়ামাটির উপবিষ্ট মূর্তিটির সঙ্গে কলেজে সংরক্ষিত অন্তত দুটি মূর্তির সুস্পষ্ট মিল রয়েছে। এছাড়া একাধিক লম্বা গ্রিক এ্যাম্ফোরার ধরণের ছোট এবং বড় rouletted পাত্র গুলির সঙ্গে চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া এ ধরণের পাত্রর হুবহু মিল পাওয়া যায়। সপ্তগ্রাম থেকে সংগৃহীত মাটির পাত্র গুলির সঙ্গেও বেথুনের মাঠ থেকে পাওয়া মাটির পাত্র গুলির আশ্চর্য মিল আছে।[১৯ক] রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের উৎখননের কাজ শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়নি। বলা যেতে পারে যে এই ধরণের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শহরের কেন্দ্রস্থলে এই প্রথম। কলকাতা শহরের প্রাক-ইতিহাসে প্রাপ্ত নির্দশনগুলি লিখিত তথ্যে পাওয়া উপাদান কে সমর্থন করে, প্রকৃত ইতিহাসকেই প্রতিষ্ঠিত করবে। অষ্টাদশ শতকে গোলাম হোসেন সালিম *রিয়াজ-উস্-সালাতিনের* বাংলা এবং কলকাতার বাড়ি ঘরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন.... in many places they build two storeyed buildings made of lime brick..... they make the floor of lime and bribck[১৯] বেথুন কলেজের

মাটির তলায় পাওয়া কাঠামোটিরও চুণা সুরকির মেঝে ছিল। পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত চন্দ্রকেতুগড়েও এধরণের মসৃন চূণ সুরকির মেঝে আবিষ্কার করেছিলেন। এই প্রথা ষোড়শ সপ্তদশ শতক থেকেই চালু ছিল।[১৯খ]

কলিকাতা নামটি প্রথম পাওয়া গেল বিপ্রদাস পিপলাইর মনসা বিজয় কাব্যে। "পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলকাতা, বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহা রথা।" বিপ্রদাস ১৪৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা করেন। এর পর কলকাতার নাম উল্লেখ হচ্ছে আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরিতে*। আবুল ফজলে লিখেছেন যে বাংলায় উনিশটি সরকার আছে, সপ্তগ্রাম অন্যতম সরকার। এই সরকারের মধ্যে ৫৩টি মহলি, এগুলি বেশির ভাগই নদীর পূর্বদিকে এবং মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ পশ্চিম থেকে শুরু করে মোহানার নিকটে হাথিয়াগড় পর্যন্ত বিস্তৃত। সরকার সপ্তগ্রামের অন্যতম পরগণা কলকাতা যার রাজস্বের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ২৩,৪০৫ টাকা।[২০] যদুনাথ সরকার অবশ্য 'কালকাত্তে' নামটি গ্রহণ করতে পারেন নি। যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক রচনায় কলকাতা সর্বাঙ্গীন ভাবে ইংরেজদের তৈরি। অতএব তাঁর মতে কলকাতার কোন মধ্যযুগীয় অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। একই ভাবে বিপ্রদাস পিপলাই বা পরবর্তী কালে মুকুন্দরায়ের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কলকাতা নাম উল্লেখ পন্ডিতদের কাছে গ্রাহ্য হয়নি। যে কারণে যদুনাথ সরকার ভাবলেন, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরির অনুলিখনে লিপিকার ভুল পাঠ করেছেন।[২১] এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুধাবন যোগ্য। তাঁর মতে বাদুড্যা হল উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট থানার বাদুড়িয়া। কলকাতার অতি সন্নিকটে কবি নিশ্চয়ই কলিকাতা গ্রাম জানতেন। মনসাবিজয়ের তিনটি পুঁথিই বাদুড্যার কাছাকাছিই পাওয়া গেছে। দূর অঞ্চল থেকে পাওয়া গেলে পুঁথির ভাষায় অর্বাচীন যুগের ছাপ থাকতে পারত। তাঁর মতে, "কিন্তু কলিকাতার উল্লেখ আছে বলিয়াই, কেবল এই অংশটুকুকে গায়েনের প্রক্ষেপ বলিতে হইবে কেন? এই অংশের ভাষা গ্রন্থের অন্যান্য অংশ অপেক্ষাতো আধুনিক নহে। সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া শুধু কলিকাতার উল্লেখযুক্ত অংশকে গায়েনের প্রক্ষেপ বলিয়া সমস্যাকে সরল করিয়া ফেলা যায়না"।[২২] সপ্তদশ শতকের আরও বেশ কয়েক জন কবি 'কলিকাতার' নাম উল্লেখ করেছেন। নারদ পুরাণের লেখক কৃষ্ণদাস (১৩৯২-৯৩) অথবা কালিকা মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাস (১৬৭৬-৭৭) এবং ভাষা ভাগবতের সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ (১৬৯৪), সকলেই "সরকার সপ্তগ্রামের পরগনণা কলিকাতা" (কালিকামঙ্গল), "কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ" (সনাতন ঘোষাল) এবং "সাকিম কলিকাতা বহু বাজারেতে ধাম" কলকাতা সম্বন্ধে এধরণের উক্তি করেছেন। শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার বহু বাজার অঞ্চল, সেখানকার প্রাচীন সুবর্ণ বণিক সমাজ, অথবা কলকাতা আদি বাসিন্দাদের অন্যতম ঘোষাল পরিবারের উল্লেখ এঁদের কাব্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। মনে করা যেতে পারে ভাগীরথীর পূর্বপারে একটি গ্রাম ক্রমশ জনবসতিতে বেড়ে উঠছে এমন ভাবে, যে সমসাময়িক মানুষদের কাছে, তার গুরুত্ব, আর অজানা থাকছেনা।[২৩]

সপ্তদশ শতকের শুরুতে কলকাতা একটি পরিচিত অঞ্চল। শিখগুরু নানক ১৫০৬ খ্রিষ্টাব্দে বড়বাজার অঞ্চলে বসবাস করেন এবং ১৬৬৬ সালে গুরু তেগবাহাদুর বড় বাজারের ঐ জায়গাটিতে একটি গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করেন এমন তথ্য পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা নানক জীবনী গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। যদিও এ তথ্য কথাটা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলা মুশকিল।[২৪]

উনিশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজ লেখকদের মধ্যে কলকাতার ইতিহাস রচনার প্রবণতা দেখা গেল। ১৮৯৫ সালে সি. আর. উইলসন, তিন খন্ডে বাংলায় ইংরেজদের আদি কাহিনী লিখলেন। হান্টার লিখলেন তিন খন্ডে ভারতের ইতিহাস। তার পর বিংশ শতব্দীর গোড়াতেই শুধুমাত্র কলকাতার ইতিহাস লিখলেন ক্যাথলিন ব্লিচেনডেন (১৯০৫) এবং এইচ ই. এ কটন লিখলেন কলকাতার পুরানো ও নতুন ইতিহাস (১৯০৯) সি. আর. উইলসন এবং হান্টার এবং তাঁদের অনুসরণ করে কটন সূতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতা এই তিন গ্রাম থেকে ইংরেজদের শহর কলকাতার উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাস লিখতে গিয়ে মধ্য যুগীয় মঙ্গলকাব্য বিপ্রদাসেব '*মনসাবিজয়*' এবং মুকুন্দরামের *চন্ডীমঙ্গল* কাব্যের বর্ণিত সওদাগরদের সপ্তগ্রাম পেরিয়ে, আদিগঙ্গা ধরে, কলকাতা পার হয়ে, বেতোর এবং বেতোর থেকে বাহির সমুদ্রে পৌছিল, ইত্যাদি এই কাহিনীর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক সময়ের ঐতিহাসিকরা কিন্তু কলকাতা প্রতিষ্ঠার একছত্র গৌরব দাবি করলেন না। বরঞ্চ উইলসন বললেন কলকাতা শহর গড়ে ওঠার পেছনে তিনটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কাজ করেছিল। এই প্রক্রিয়ার মাত্র তৃতীয় পর্বেই ইংরেজদের ভূমিকা, এ কথা তিনি স্পষ্ট করে বললেন। "The site of Calcutta was chosen by charnock not out of a mere whim but after careful consideration and Charnock chose, not only deliberately but also wisely. Caclutta was fit place for the English purposes from two distinct points of view. Not only was it strategically safe, but it was also an excellent commercial Center"[২৫]

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি, পর্তুগিজ বণিকরা এখনকার গার্ডেনরিচের উল্টোদিকে বেতোরে তাদের বড় জাহাজ গুলি নোঙর করত। সেখান থেকে নৌকায় সপ্তগ্রাম আসা যাওয়া হত। বেতোরে একটি অস্থায়ী হাট গড়ে ওঠে। একাদশ দ্বাদশ শতকের বেতড্ড চতুরকের জায়গাতেই এই বেতোরের হাট তৈরি হয়েছিল। একই সময় চারটি বসাক এবং একটি শেঠ এই পাঁচটি পরিবার বেতোড়ের উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব পারে আরও খানিক উত্তরে গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি তৈরি করল। ক্রমশঃ গোবিন্দপুর থেকে আরো কিছুটা উত্তরে শেঠ, বসাকদেরই তৎপরতায় সূতার শুঁটির কারবারি হাট, অতএব সূতানুটি হাট তৈরি হল। হাট ঘিরেই একটি নতুন বসতিগ্রাম তৈরি হল। ষোড়শ শতকের মধ্য ভাগেই গোবিন্দপুর এবং সূতানুটি গ্রাম তৈরি হয়ে গেছে। এই দুই গ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চলই

হল ডিহি কলকাতা। সূতানুটি হাট গ্রামের প্রথম বিদেশী লেনদেন ব্যবসায়ী পর্তুগিজরা। এই পর্যন্ত এই তথ্য সুবিদিত। উইলসন এই পর্বটিকে গুরুত্ব দিয়ে বলছেন, পর্তুগিজদের বেতোরকে জাহাজ ঘাঁটি করা, এবং শেঠ বসাকদের গোবিন্দপুর গ্রামে এসে বসতি করা, এই দুই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, কলকাতার গড়ে ওঠার প্রথম দুই পর্ব। তাঁর মতে এই দুই পর্বের গুরুত্ব অপারসীম। উইলসনের মতে ১৬৯০তে জোব চার্ণকের কলকাতায় কুঠি বাড়ি স্থাপনের সিদ্ধান্ত, কলকাতার গড়ে ওঠার ইতিহাসে তৃতীয় পর্ব মাত্র।[২৬] প্রথম দুই পর্ব, তৃতীয় পর্বের সূচনা করে দিয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। বেতোরে পর্তুগিজ বাণিজ্যই এই অঞ্চলের উপযোগিতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। চিৎপুর, শালকিয়া, বরানগর ইত্যাদি নিকট অঞ্চলগুলি ক্রমশ সরগরম জনবসতিতে ভরে উঠছিল। চন্ডীমঙ্গলের বর্ণনা নিছক কবি কল্পনা নয়। "কলিকাতা", কুচিনানে হাট বাজার এবং গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাট তৈরি হচ্ছে। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি গোবিন্দপুর গ্রাম বাজাব কলকাতা এবং সূতানুটি হাট নিয়ে শেঠ বসাকদের আধিপত্য। বিদেশী সমস্ত বাণিজ্যই তাদের হাতে। কলকাতার গুরুত্ব বুঝেই আবুল ফজল পরগণার জমার হিসেব দিয়েছেন *আইন-ই-আকবরিতে*। অন্যদিকে গঙ্গার ঠিক অপরপারে পিরপুরে, মোগলদের দুর্গ তানাও তৈরি হল। উইলসন বলছেন প্রকারান্তরে শেঠ, বসাকরাই কলকাতা, আদি বাসিন্দা, প্রতিষ্ঠাতা, শহর গড়ে তোলার কৃতিত্ব তাদেরই। সপ্তগ্রামের বাণিজ্যক গুরুত্ব যখন হ্রাস পাচ্ছে পর্তুগিজ বাণিজ্যের অবনতি ঘটছে, শেঠ বসাকরাই তখন ইংরেজদের উৎসাহিত করল, এখানে আসার জন্য। "Whether the Bengali merchants ever invited the English to come and settle near them, we cannot say; but the advantages of doing so must have been manifest. It is there fore not surprising that charnock when forced to leave Hughli, should have turned almost instinctively to sutanuti as the place for destined fortified settlement of the English"[২৭] চার্ণকই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা এই বদ্ধমূল ধারণা খণ্ডন করে উইলসন আরও বললেন "The Capital of British India did not as some seem to think spring up like Jonah's gourd in a single night. Calcutta, or at any rate that portion of the Hughli where Calcutta now stands, has a history and the city is the growth of many centuries"[২৮] চার্ণক নন, শেঠ বসাকরাই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা, এই প্রসঙ্গের আলোচনার সূত্রপাত একশো বছর আগেই উইলসনই করে গিয়েছিলেন। কলকাতার প্রসঙ্গে শেঠ বসাক পরিবারের ইতিহাস অবধারিত এবং অনিবার্য।

"কলত্রীশ গোত্রীয় যাদব চন্দ্র বসাক মহাশয় খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতার সন্নিকটবর্তী গোবিন্দপুরে বাস করিতে আসেন। এই সময় শেঠ বংশীয় মুকুন্দরাম শেঠ ও গোবিন্দপুর গ্রামবাসী হন। বসাক বা বসুকদের আদি বাসস্থান সপ্তগ্রাম।

সপ্তগ্রামের একটি পুষ্করিণী তাঁহাদের নামানুসারে বসকা দীঘি বলিয়া বিখ্যাত। সপ্তগ্রাম বাসকালে বসাকদিগের বস্‌ক উপাধি ছিল। কলিকাতা আসিবার পর তাহা বসাকে পরিবর্তিত হয়।" শেঠ বসাকদের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে এই কথা লিখেছেন হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।[২৯] 'কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস', গ্রন্থের লেখক নগেন্দ্রনাথ শেঠের মতে "আকবরের রাজত্ব কালে উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ 'বুসাখ' উপাধি লাভ করিতেন। বুসাখ ফারসি শব্দ বু অর্থে সৌরভ, সাখ অর্থে শাখা। প্রাচীন বুসাখ উপাধি মধ্যযুগে (?) বসাখ, বর্তমানে বসাক নামে বিদিত'।[৩১] হরিসাধনের মতে, *কবিকঙ্কন চণ্ডীতে* উল্লিখিত "বেতাই-চন্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে, ধনন্তগ্রাম সাধু এড়াইল বামে"— এই ধনন্তগ্রামই গোবিন্দপুর। শ্রীমন্ত সওদাগর আদি গঙ্গায় প্রবেশের মুখে ধনন্তগ্রাম খানি বামদিকে দেখিয়াছিলেন।"[৩২] ধনীদের গ্রাম এই অর্থে ধনন্তগ্রাম বা গোবিন্দপুরে বসাক এবং শেঠরা মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল লেখার আগেই বসবাস শুরু করেন। তাঁদের পরেই কালীঘাটের হালদার পরিবারের পূর্বপুরুষ এবং কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষ গোবিন্দপুরে বসবাস শুরু করে। উইলসনের সঙ্গে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ও একমত, "শেঠ বসাক রা যদি সপ্তগ্রাম হইতে সূতানুটি আসিয়া বসবাস না করিতেন, তাহা হইলে এই কলিকাতাকে আজ আমরা প্রাসাদ নগরী রূপে দেখিতে পাইতাম না"। হরিসাধন মনে করেন, "হাট, বাজার এগুলি শেঠ বসাকরাই স্থাপন করিয়াছিলেন, সূতানুটি হাট খোলা, খোলা হাট হইতেই এই নামের উৎপত্তি।"[৩৩]

কবি রঙ্গলাল বলেন শেঠ বসাকদের পূর্বনিবাস ছিল ঢাকায়[৩৪]। সেখান থেকে তাঁরা সপ্তগ্রামে বসতি করেন। পরে সরস্বতী নদীর খাতে জলধারা ক্রমশ কমতে থাকলে, বিদেশী ব্যবসায়ী জাহাজ আসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম দেশে তারা ভাগীরথীর পূর্ব পারে এসে বসবাস শুরু করেন। উদ্দেশ এই যে পর্তুগিজ বণিকরা ভাগীরথীর জলপথ ব্যবহার করবে। তাঁর মতে 'ইওরোপীয়রা সেই নদী হইয়া আগমন পূর্বক বাণিজ্য ব্যবসা করিবেন, সুতরাং যত অগ্রসর হইয়া থাকা হয়, ততই উভয় পক্ষের মঙ্গল।"[৩৫] প্রসঙ্গত, রঙ্গলাল তাঁর কলকাতার ইতিহাস লেখেন ১৮৫১-৫২ খ্রিষ্টাব্দে, উইলসন এবং হরিসাধনের (১৯১৫) সময়ের অনেক আগে। শেঠ বসাকদের গোবিন্দপুরে চলে আসার সঙ্গে পর্তুগিজ বাণিজ্য ও পরে ইংরেজদের ব্যবসার যোগাযোগের তত্ত্বটি তাঁর সময় থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

গৌরদাস বসাকের লেখা থেকে শেঠ এবং চার বসাক পরিবারে আদি পুরুষদের নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন যথাক্রমে মুকুন্দরাম শেঠ, কালিদাস বসাক, শিবদাস বসাক, বরপতি বসাক, বাসুদেব বসাক। তাঁর মতে তাঁর সময় থেকে (১৮৯১) ৪২৫ বছর আগে এই পাঁচ তন্তুবণিক পরিবার কলকাতা আসে; পর্তুগিজ বাণিজ্য জাহাজগুলি শেঠ বসাকদেব দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সূতানুটিতে বাণিজ্য শুরু করে, গৌরদাস এমন কথাই বলেন। উপরন্তু তাঁর মতে গোবিন্দপুর সেই সময় সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল, ভবিষ্যপুরাণে গোবিন্দপুর প্রান্তেচ কালী সুরধনী তটে, এই শ্লোকটি তার প্রমাণ।[৩৬]

কলকাতা অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রমাণের আরেকটি নিদর্শন উপস্থাপন করেছিলেন, রঙ্গ লাল। কনৌজের দেবীবর ঘটক বঙ্গীয় কুলীনদের 'মেলবন্ধন' করেন ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে। কুলীনদের অন্যতম পশুপতি ঘোষাল বা পশো ঘোষাল সেই সময় থেকেই কলকাতা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কলকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের অন্যতম ছিলেন ঠাকুর ও হালদার পরিবার। ঠাকুর পরিবারের সমৃদ্ধির সূচনা করেন নীলমণি ঠাকুর। তাঁর পিতামহ পঞ্চানন ঠাকুর যশোহর ছেড়ে গোবিন্দপুরে চলে আসেন ষোড়শ শতকের শেষের দিকে। বেহালা বরিশার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদার পরিবারের আদি পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত এবং কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ বাংলা বিজয়ে আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে সাহায্য করার দরুন, মানসিংহের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত হন। তাঁরা দুজনেই 'মজুমদার' উপাধি পেয়েছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত, অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে 'কলিকাতা' এবং হাথিয়াগড় (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) লাভ করেন। লক্ষ্মীকান্তর কাছারিবাড়ি ছিল লালদিঘীর কাছে। অনেক পরে তাঁদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দিকে চলে যাওয়া কলকাতার উপনিবেশিক পর্বে একটি বিশেষ অধ্যায় তৈরি করে। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কালীঘাট অঞ্চল এবং মন্দির যশোরের রাজ পরিবারের জমিদারিভুক্ত ছিল। রাজা বসন্তরায় পর্ণকুটিরের মন্দির ভেঙ্গে পাকা মন্দির তৈরি করেন। পরে এই মন্দির সাবর্ণ চৌধুরীদের অধিকারে আসে। ডিহি কলকাতা ও সূতানুটি নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদারের পারিবারিক দখলে চলে যায়। কালীঘাটের সেবায়েৎ হালদার বংশের প্রথম পুরুষ ভবানীদাস ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি প্রথমে গোবিন্দপুরেই বসবাস শুরু করেছিলেন। (*কালীক্ষেত্র দীপিকা*)। তাঁর পরিবারের মানুষ বলেই কালীঘাট এবং গোবিন্দপুর জনপূর্ণ করে তোলেন। হরিসাধনের মতে, এই ভবানী দাসের নাম অনুযায়ী কালীঘাট এবং গোবিন্দপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম হয়েছিল ভবানীপুর।[৩৯]

ঊনবিংশ শতকের বেশ কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির পূর্বপুরুষ বহু আগেই কলকাতার বাসিন্দা হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের পিতাসহ রামকমল সেনের জন্ম সম্ভবত কলকাতার সূচনা কালে। প্যারীচাঁদ মিত্র রামকমলের জীবনী লিখতে গিয়ে বলেছেন, সেই সময় কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন পরিবার ছিল শেঠ ও বসাকরা। ভোলানাথ চন্দ্রর পূর্বপুরুষ বিশ্বনাথ ও রাধানাথ কলকাতায় আসেন সপ্তদশ শতকে। ভোলানাথ চন্দ্রর পিতামহ আহিরিটোলায় যে বাড়িটি কেনেন, তা আগে হালদার বংশীয় ব্রাহ্মণদের ছিল। ১৮১৫ সালে বাড়িটির জীর্ণদশা। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন মাতুলালয়ে। যেখানে রাইটার্স বিল্ডিং সেখানেই তাঁর প্রমাতামহ গোপীনাথ ঠাকুরের "প্রশস্ত অট্রালিকা ছিল।"[৪০] ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকে (১৮৭৬) লোকনাথ ঘোষ তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পরিবার বর্গের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংকলন করেছিলেন। এই সব পরিবার গুলির অনেকেরই প্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষ ইংরেজ আগমনের অনেক আগে থেকেই

গোবিন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। শুরার রাজ পরিবারের রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিবারের সূচনা সম্ভবত দশম শতাব্দী থেকেই। ১৮৭৮ খিষ্টাব্দের তেসরা ডিসেম্বর তারিখের *ইন্ডিয়ান মিরর* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তথ্য অনুযায়ী মিত্র পরিবারের আদিপুরুষ কালিদাস মিত্রের অধস্তন চতুর্দশতম পুরুষ সত্যভাম মিত্র চব্বিশ পরগণার বরিশাতে বাস করতেন। আরেকটি শাখা কোন্নগর থেকে গোবিন্দপুরে বসতি করে। সম্ভবত দুর্গ নির্মাণের সময়েই তাঁরা কলকাতা ছেড়ে উপকণ্ঠে শুরায় চলে গিয়েছিলেন। এছাড়াও হাটখোলার দত্ত পরিবার, বা কুমারটুলির মিত্র পরিবারের আদি ইতিহাসও সুপ্রাচীন। লোকনাথ ঘোষের মতে কুমারটুলির মিত্র পরিবার ১৬৮৬-৮৭ নাগাদ গোবিন্দপুরে তাদের নতুন বাসস্থান তৈরি করেছিল। দেওয়ান হরি ঘোষের আদিপুরুষ মনোহর ঘোষ টোডরমলের অধীনে বাংলা সুবার জমি জরিপ করার জন্য 'মুহররার' নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং প্রচুর সম্পত্তিও তৈরি করেন। কিন্তু মানসিংহ ও আফগানদের সংঘাতের সময় বৃহৎ অংশ হারিয়ে চিৎপুরে এসে নতুন করে বসবাস শুরু করেন।[৪১]

এ সমস্ত বৃত্তান্তগুলি এই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত করে, যে শেঠ, বসাকদের অনুসরন করে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি আরও বহু পরিবার কলকাতা গোবিন্দপুরে বসতি তৈরি করেছিল। সূতানুটিকে গোবিন্দপুরের বিস্তৃতি বলেই মনে করা যেতে পারে।

গৌরদাস বসাক এবং উইলসন মনে করেছিলেন, কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা শেঠ বসাকরাই, এবং আকবরের অনেক আগে থেকেই কলকাতা গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এই প্রসঙ্গে *ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়রের* লেখক ওয়াল্টার হ্যামিলটনের (১৮২৮) মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। "The ancient family of the seats who were at that time merchants of great note and were instrumental in bringing Calcutta into the form of a town"[৪২]

সপ্তদশ শতকের শেষে, কলকাতা বা গোবিন্দপুরকে ছাপিয়ে সূতানুটি প্রাধান্য পেতে শুরু করল। ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ভ্যালেন্টাইনের তৈরি ম্যাপে গোবিন্দপুরকে গর্ভনাপুর এবং সূতানুটিকে চিত্তানুটি বলে চিহ্নিত করা আছে। ভ্যান ডার ব্রুকের মানচিত্রে (১৬০০) কিন্তু কলকাতাই আছে। সূতানুটি নেই। ১৬৭৫ সালের একটি পুরোনো সামুদ্রিক চার্টে গোবিন্দপুর ও সূতানুটিই দেখানো আছে।[৪৩] সূতানুটি হাট এবং সূতানুটি গ্রামের এই নামডাক, শেঠ বসাকদের দৌলতেই। তাদেরই জন্য সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই সূতানুটি ব্যস্ত হাট বাজার হয়ে উঠল।

পর্তুগিজ বাণিজ্যই শেঠ বসাকদের ষোড়শশতকে এই অঞ্চলে টেনে এনেছিল বলে উইলসন মনে করেছিলেন। অন্যদিকে গৌরদাস বসাক, পর্তুগিজ বাণিজ্যের সঙ্গে শেঠ বসাকদের যুক্ত করেও, মনে করেছেন, গোবিন্দপুরে তাদের আগমন ঘটেছিল, অনেক আগেই, পঞ্চদশ শতকে। এই প্রসঙ্গে অনিরুদ্ধ রায়ের সরস্বতী নদী ও সপ্তগ্রাম সম্পর্কিত

তথ্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনিরুদ্ধ রায় মনে করেন সরস্বতী নদীর খাতে ক্রমশঃ পলিমাটি জমার ফলে হুগলী নদীই শেষ পর্যন্ত প্রধান জলপথ হয়ে দাঁড়ালেও সরস্বতীর পলিজমার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘকালের, সম্ভবত একশো বছরেরও বেশি। পর্তুগিজরা যখন বেতোরে জাহাজ ঘাটা তৈরি করছে, তখনও সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধ শহর। সপ্তগ্রামের সত্যিকারের অবনতির অনেক আগেই হুগলীর জলপথের প্রাধান্য ধরেই সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির সময়েই শেঠ বসাকরা, হুগলী নদীর পূর্ব পারে এসে বসতি শুরু করেছিল। যে কারণে পিপলাই, বা জয়ানন্দের লেখা পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকের কাব্যে আমরা ভাগীরথী বা আদিগঙ্গার জলপথেরই উল্লেখ পাই। অধ্যাপক রায়ের এই তত্ত্ব, গৌরদাস বসাকের একশো বছর আগের তথ্যটিই সমর্থন করছে। অর্থাৎ ষোড়শ শতকে নয়, পঞ্চদশ শতকেই শেঠ বসাকরা এখানে আসতে শুরু করে।

দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার জনবসতির নিরবিচ্ছিন্নতা, নদীপথের বাণিজ্য ও বাহির সমুদ্রের বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা, এই দুই অবধারিত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে কোন এক সময় কলকাতা, গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রমশ একটি শহরে রূপান্তবিত হচ্ছিল। এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা দ্রুততর করেছিল শেঠ ও বসাক নামক ব্যবসায়ীরা। প্রথমে পর্তুগিজ ও পরে ইংরেজ বণিকদের একদা এ রাই পরিচালিত করত। এই ব্যবস্থা সম্ভবত বজায় ছিল, সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। অষ্টাদশ শতকে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকলেও শেঠ বসাকদের হাতে কর্তৃত্বের রাশ আর রইলনা। বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনার অস্থির অভিঘাতে, শেঠ, বসাক, ঘোষাল ইত্যাদি ব্যবসায়ী পরিবারগুলি পিছিয়ে গেল। তাদের হটিয়ে ইংরেজরা ক্রমশ এই অঞ্চলে প্রধান হয়ে উঠল। ইংরেজ নির্ভর একটি নতুন বণিক গোষ্ঠীর উত্থান এবং ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে শহরের চরিত্রও বদলাতে শুরু করল। শেঠ বসাকদের গোবিন্দপুর, কলকাতা এবং সূতানুটি হাট আর রইলনা।

সূত্র নির্দেশ

১) C.R. Wilson, *Early Annals of the English in Bengal*, Vol. 1, Asiatic Soceity, পৃঃ ১২৪ উইলসন হেজেসের ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

২) তদেব, পৃঃ ১২৪

৩) C.A. Bayly, *Rulers, Townsmen and Bazars*, C.U.P, পৃঃ ৫৫-৫৬ S. Sreemani, *Anatomy of a Town* : Calcutta, পৃঃ ৪-৫

৪) Richard M. Eaton. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, OUP, পৃঃ ৫, উদ্ধৃত করেছেন Presh, Ch. Dasgupta, T*he Excavation at Pandu Rajar Dhivi,* Calcutta, 1961.

৫) Radha Kamal Mookerjee, *The Changing Face of Bengal*: *A Study*

in Riverine Economy: D.R. Bhandarkar comm. পৃঃ ৩৪১-৬৪ Volume Comm C. R. Wilson *Antiquity of the Lower Ganges and its courses*, পৃঃ ১২৮

৬) Cunningham, *Ancient Geography of India* (1884) কলকাতা 1924; *History of Bengal*, Vol 1. 1971 পৃঃ 32, 293-294. Amitava Bhattacharya, *Historical Geography of Ancient and Eary Medieval Bengal*, 1997 পৃঃ ৪৫-৫১

৭) Dilip Kr. Chakraborty. *Archaeology of Eastern India*, নিউ দিল্লী পৃঃ ২০৬

৮) Ramesh Ch Majumdar, *Histry of Bengal* Vol. 1 উল্লিখিত।

৯) Richard Eaton, *The Rise of Islam*, p-9 Clarence Maloney, *Bangaladesh and Its People in Pre-history* (Journal of the Institute of Bangaladesh) 2 (1977), 17.

১০) B. D. Chattopadhyay, *Urbarn Centers in Early Begnal*, *Pratna Samiksha*, Vol 2 and 3, 1993-94 p-169-187 (Journal of the Directorate of Archaeology and Museum.); D. K. Chakraborty, *Archaeology of Eastern India*, Sima Roy Chowdhury, *Earaly Historical and Terracotta from Chandraketugarh* কলকাতা, Vol. 4 & 5, 1993, 96 p-88, Uttara Chakraborty & Swati Biswas, *Archaeology of Calcutta : Evidence from Bethune College, Pura Hatva· Bulletin of the Indian Archaelogycal Soceity* নিউ দিল্লী Number 29, 1998-99 পৃঃ ৮৭

১১) D. K. Chakraborty উল্লিখিত পৃঃ ২০৭

১২) তবেদ, পৃঃ ২০৭ U. Chakraboty. S. Biswas উল্লিখিত, পৃঃ ৮৭।

১৩) (১৪) Ranabir Chakraborty, Between Villages and cities; linkages of trade in India (c. 600-1300 A.D.) *Essays in Honour of Dietmar Rothesmund* Georg Berkemer, Tilman Frasch and Jürgen Lütt (editors) New Delhi 2001 পৃঃ ১০৯-১১০

১৫) A. Tchitcharov, *India Changing Economic Structure in the Sixteenth to Eighteenth Century*, পৃঃ ১০৪

১৬) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, কোলকাতা, প্রথম খন্ড, পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ৪৯

১৭) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *কলিকাতা কল্পলতা, রঙ্গলাল রচনাবলী* ঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত হরিবন্ধু মুখুটি। দত্তচৌধুরী এ্যান্ডসন্স. পৃঃ ৪৮

১৮) Richard Eaton, উল্লিখিত, পৃঃ ৮৬

১৯ক) ও খ) P.C Dasgupta "A Concise Report of Archaeological Digging" *bulletin of the Directorate of Archaeology, West Bengal* No. 2, Ghulam Hussain Salim, Rujarus Salaten (অনুবাদ Abdus Samad নিউ দিল্লী, পৃঃ ২০; U. Chakraborty S. Biswas, উল্লেখিত পৃঃ ৮৭-৮৮, ক, তদেব

২০) Gourdas Basak, "Kalighat and Calcutta", *The Calcutta Review,* Vol.92, No. 184, April 1891, (প্রকাশনা Calcutta keepsake, ed. Aloke Roy) কলকাতা, পৃঃ ৭-৩৫

২১) Blochman's original text vol. I p- ৪০৮ . "In the latter are given two other readings of Kolkata as kalna" গৌরদাস বসাক উল্লিখিত পৃঃ ১১

২২) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* দ্বিতীয় খন্ড কোলকাতা, ১৯৬৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১০৫-১১৪

২৩) সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,* পৃঃ১ ৩৪০-৩৪১

২৪) তদেব

২৫) C. R. Wilson, *Early Annals of the English in Bengal,* Vol. 1 পৃঃ ১২৭

২৬) তদেব পৃঃ ১২৮

২৭) তদেব পৃঃ ১৩৭

২৮) তদেব ১২৭

২৯) হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, *কলিকাতা সেকালের ও একালের* (১৯১৫) পুনর্মুদ্রন, ১৯৯১ কলকাতা পৃঃ ১৮৪

৩০) (৩১) (৩২) হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, উল্লিখিত, পৃঃ ১৮৪-১৮৫।

৩৩) হরিসাধন মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৮৮

৩৪) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ কলিকাতা কল্পলতা, পৃঃ ৪-৫

৩৫) তদেব পৃঃ ৫

৩৬) Gourdas Basak, উল্লিখিত, পৃঃ ২০

৩৭) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা কল্পলতা, পৃঃ ৬

৩৮) *সংসদ বাংলা চরিতাভিধান,* প্রথম খন্ড ঃ সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ২৭২, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫০

৩৯) হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ঃ কলিকাতা সেকালের ও একালের, পৃঃ ৭৭

৪০) চরিতাভিধান পৃঃ ৪১ মন্মথনাথ ঘোষ-দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮১

৪১) মন্মথনাথ ঘোষ ঃ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮১

৪১)(ক) লোকনাথ ঘোষ, *The Native aristocracy and Gentry*; মূললেখার বাংলা অনুবাদ শুদ্ধোধন সেন— কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত সুবর্ণরেখা ঃ মহাত্মা গান্ধী রোড, ১৯৮৩

৪২) Walter Hamilton : East India Gazetteer, Vol. 1, First published 1828, Reprint 1993. Low price publication, পৃঃ ৩১৬

৪৩) Gourdas Basak, Kalight and Calcutta, পৃঃ ১৫

৪৪) Anirudha Roy, Morphology of Medieval Saptagram or Satgaon; Journal of Bengal Art, Vol 4, 1999, p-২১৭-২৩৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কল্পলতার সন্ধান দিয়েছেন অধ্যাপিকা শ্যামলী শুর। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সারাংশ

খড়্গদহ ঃ ইতিবৃত্ত

এলাশ্রী

শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি যেখানে নবদ্বীপ, নিত্যানন্দের কর্মভূমি সেখানে গড়ে ওঠে খড়দহে। বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের কাছে চৈতন্যধাম নবদ্বীপের পরেই শ্রীপাট খড়দহের মাহাত্ম্য আজও বিদ্যমান। উত্তর চব্বিশ পরগণার খড়দহ থেকেই একদা সমগ্র বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল বৈষ্ণব-বীজমন্ত্র। নিত্যানন্দ পত্নী মা জাহ্নবা এই মাটিতে বসেই নেতৃত্ব দিয়েছেন সমগ্র বৈষ্ণব মন্ডলীকে। সেই খড়দহের উৎপত্তি কবে অথবা তার নামের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল?

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থের ১ম খন্ডে সমতট ভূখন্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। খড়গবংশের একটি শাখা সমতটের এই সব অঞ্চল একসময় শাসন করত। তাদের নামানুসারেই গঙ্গাতীরবর্তী এই অঞ্চল খড়গদহ নামে পরিচিত হতে পারে। ঐতিহাসিক সুকুমার সেনের মতে, সংস্কৃত 'দা' বা 'দাব' শব্দ থেকে 'খড়দা' নামের সৃষ্টি হতে পারে। একসময় এই অঞ্চলে উলুখড়ের অরণ্যবেষ্টিত জলাভূমি আবাদ করে বসতি গড়ে ওঠা থেকেও 'খড়দা' নামের উৎপত্তি হতে পারে। কিংবদন্তিও প্রচলিত আছে এই নামকে কেন্দ্র করে।

খড়দহের ভৌগোলিক বর্ণনা আছে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে 'আগে পণ্যহাটি আর আকনা মহেশ, পূণ্যভূমি সপ্তগ্রাম ধন্য রাঢ়দেশ। আগড়পাড়া, কুমারহট্ট চৌহাটা, খড়দা কোটাশ অম্বুলি পাথরঘাটা।'

এই অঞ্চলের তৎকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে--

'পুরন্দর পন্ডিতের পরম উন্মাদ, বৃক্ষের উপরে চঢ়ি করেন সিংহনাদ।।

বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্য দাসের শরীরে, ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে।।

মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতুহলে।।'

ভক্তিরসের প্রাবল্য সত্বেও প্রাকৃতিক প্রতিচ্ছবিটি সুস্পষ্ট।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গের সামন্ত রাজা আদিশূর কান্বকুব্জ থেকে পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে এনে তাদের বসবাসের জন্য ভূমি দান করেন। এঁরা হলেন (১) শান্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ চতুর্বেদী, (২) ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, (৩) বাৎস গোত্রীয় ভৃগুর দ্বিতীয় পুত্র শুক্রের প্রপৌত্র হরিবংশজাত ছান্দুড়, (৪) কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ

এবং (৫) সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেও বঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণীর বাস দেখা যায়। তাই শূদ্র রাজ্যে আর্যদের আসতে হলে প্রায়শ্চিত্ত্যের বিধান মনুসংহিতায় পাওয়া যায়।

সমতটের খড়গদহও এর ব্যতিক্রম ছিল না। হাড়ি, ডোম, বাগদি, জেলে অধ্যুষিত এই অঞ্চল শ্রীহর্ষের বংশজ ২৩তম অধস্তন পুরুষ কামদেব প্রথম ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করেন। ক্ষিতীশ পুত্র ভট্টনারায়ণের বংশের ২৪তম অধস্তন পুরুষ শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্যদ নিত্যানন্দের খড়দহে আগমন ঘটে ধর্মপ্রচার হেতু স্থিতি স্থাপনের উদ্দেশে। মহাপ্রভুর অন্তিম নীলাচল যাত্রার প্রাক্কালে নিত্যানন্দের প্রতি প্রত্যাদেশ ছিল ঃ গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবেশ করে নিত্যানন্দ গৃহীদের মধ্যে এই বৈষ্ণবধর্মের সম্প্রসারণ ঘটাবেন। নিত্যানন্দ তাঁর কর্মস্থান হিসাবে গঙ্গাতীরস্থিত খড়দহ গ্রামকেই উপযুক্ত মনে করলেন। 'চৈতন্য ভাগবতে' পাওয়া যায় ঃ—

'তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে, পুরন্দর পন্ডিতের দেবালয় স্থানে।

খড়দহ গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়, যত নৃত্য করিলেন— কথন না যায়।'

পার্শ্ববর্তী গ্রাম পণ্যহট্টে চৈতন্য— পার্ষদ রাঘব পন্ডিতের ভিটেয় চৈতন্যসঙ্গি রূপে আসার সময় নিত্যানন্দ খড়দহ গ্রামটি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই এই স্থানকেই তিনি বেছে নিলেন নিজের কর্মভূমি হিসাবে। নিত্যানন্দের বসত-বাড়ি 'কুঞ্জবাটি' শ্যামসুন্দরের মন্দির ইত্যাদি প্রাচীন দেবদেউলে ভরা খড়দহ সুপ্রাচীন ইতিহাস নিয়ে নানা আকরে সমৃদ্ধ হয়ে আজও আকর্ষণ করে থাকে ইতিহাস পিপাসু মননশীল মানসিকতাকে। মগদস্যুর অত্যাচার, সতীদাহ, অন্তর্জলি যাত্রা, স্বাধীনতা বিপ্লবীদের আস্তানা, বৈষ্ণবধর্মের সাথে তন্ত্র সাধনার গূঢ়তত্ত্বও— খড়দহের গ্রাম জীবনকে কিভাবে আন্দোলিত ও কর্মমুখর করে তুলেছিল, বিশ্ববরেণ্য বিশ্বকবির কিছুটা কাল খড়দহের মাটিতে অবস্থানের ফলে খড়দহ কিভাবে আলোকিত হয়েছিল তারই বর্ণাঢ্য বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে এই ইতিবৃত্ত রচনায়।

খাজুরাহ ভাস্কর্য (৯৫০-১১৫০) - এ পারিপার্শ্বিকতা ঃ-

শম্পা ঘোষ

মধ্যযুগের 'খাজুরাহ' ভাস্কর্য-এ শিল্পীদের স্বাধীন এবং খোলাখুলি প্রতিস্থাপন (কল্পনার) সত্যই আশ্চর্যজনক। বিভিন্ন সম্ভব এবং অসম্ভব 'বন্ধ' (শারীরিক মিলনের বা যৌনতার) মন্দিরের গায়ে যেভাবে বিনা বাধায় উপস্থাপিত হয়েছে, তার পিছনে সমকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবন এবং ধর্মের অনুমোদন থাকাটা খুব স্বাভাবিক। মধ্যযুগের সমাজ খন্ড খন্ড ভাবে বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মান কমে যায়। অভিজাত

এবং রাজ-রাজারা নারী ও মদ্য সঙ্গে তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। রাজপ্রসাদ সংলগ্ন বাড়িগুলিতে বারাঙ্গনারা থাকতেন। এমনকি মন্দিরে নর্তকীদের একটা দল থাকত যারা দেবতার সামনে নাচ-গান পরিদর্শন করতো। সবচেয়ে বড় কথা হল-মধ্যযুগে মন্দিরগুলি কেবলমাত্র পূজার্চনার জায়গা ছিল না, মন্দিরের বড় মন্ডপগুলি নাচ-গান-নাটকের স্থান, ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনা কেন্দ্র এবং গ্রামের সংগঠনগুলোর আলোচনাকেন্দ্র হিসাবেও কাজ করত। তান্ত্রিক ধর্ম শারীরিক বা যৌনতাকে তাদের পবিত্র ধর্মের অঙ্গ হিসাবে দেখত এবং তারা সব ভারতীয় ধর্মকে কম বেশি প্রভাবিত করত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এমনকি জৈনধর্মকেও তারা প্রভাবিত করেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন ধর্ম এটাকে অনুমোদন করত। আর কামশাস্ত্র শিল্পীদের প্রভাবিত করেছিল। এই ভাস্কর্য সেই সময়ের জীবনের প্রতিফলন ছিল। আসলে শিল্পীরা যা দেখত তাই তাদের শিল্পে প্রয়োগ করত। ভাস্করদের শিল্প এবং জীবনের শিল্প একই মৌল চাহিদা থেকে উঠে একইভাবে এগিয়ে গিয়েছিল এবং তার পরিণতিই 'খাজুরাহ'।

'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' বন্ধুত্বের জাগরণে-ঊনিশ শতক

মন্দার মুখোপাধ্যায়

প্রতিটি সমাজেরই প্রধান ভিত হল সম্পর্ক। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, বস্তুতে বস্তুতে সম্পর্ক এবং মানুষে ও বস্তুতে সম্পর্ক। এর আপাত মোড়কটি খুলে নিলে দেখা যাবে কি ব্যাপ্তি এবং জটিলতা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ছোট্ট শব্দ-সম্পর্ক। প্রধান-অপ্রধান, বৈষম্য-সাম্য, প্রচলিত-অপ্রচলিত, নতুন-পুরোনো— এরকম আরো বিভিন্নতা বা বিভেদ মুখ নিয়ে এ থেকেই ক্রমে গড়ে উঠেছে গোষ্ঠীবাদ এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এরকম গোষ্ঠী বিভাজনের ধারণা। যার ফলে একই সমাজ দেহে ফুটে উঠছে চাপ, আধিপ ত্য, উদ্বৃত্ততা এবং ক্রমবর্দ্ধিত বিভাজনের কায়েমি স্বীকৃতি। কখনো তা সময় ভিত্তিক, কখনো তা শ্রম ভিত্তিক, কখনো উপার্জ্জন ভিত্তিক, আবার কখনো বা শারীরিক কিংবা পরিবার তান্ত্রিক। অনেক সময়ই তাই প্রয়োজন হয়েছে সম্পর্কের সংস্কার এবং পুনর্নির্মাণের; এক রৈখিক সম্পর্ক থেকে বহুরৈখিকতায় যাওয়ার তাগিদে।

ভারতবর্ষীয় সমাজে এর সঙ্গে যুক্ত হল এক নতুন বিভাজন অর্থাৎ পাশ্চাত্য না প্রাচ্য; ভারতবর্ষীয় না ইয়োরোপীয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসন এবং এযাবৎ চলে আসা, সয়ে যাওয়া বিভাজন গুলিতে একটা নতুন ভাবনার বাতাস এসে লাগল। তথাকথিত বিভাজন রেখা ওলোট পালট করে দেখা গেল, প্রাচ্য পাশ্চাত্য মিলিয়ে যে তাগিদটি ফুটে উঠছে, তা হল উদারপন্থী যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের মধ্যে দিয়ে মানুষের মুক্তি ঘোষণা। ফলত, খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর, ইয়োরোপীয় শিক্ষা, সরকারি-চাকুরি, ইংরেজ সংসর্গ সব মিলিয়ে ভারতের মানুষের মধ্যে একটা উন্মুখতা তৈরি করছে। পুরোনো ধাঁচের জীবনে পরিবারই ছিল প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু নতুন ধাঁচেতো ক্রমে আঁকড়ে ধরল, সরাসরি ব্যক্তির উপার্জনকেই, প্রধান বিন্দু হিসেবে। পরিবার ভিত্তিক জনজীবনে মানুষ যখন উদ্বৃত্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেনি তখন কার আড্ডা ও বন্ধুত্ব কেমন ছিল তার একটি সপ্রাণ ছবি পাওয়া যায়। ''তখনকার সামাজিক হৃদ্যতার ভাব আরো অনাবিল ছিল ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, ভদ্রসমাজের গণ্ডীও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ছিল.. .। সন্ধ্যায় আমাদের বৈঠকখানায় তাসের ও গান বাজনার মজলিস বসিত।....... যখন বর্ষায় গঙ্গায় ঢল নামিত তখন বাবা ও বন্ধুবান্ধবে মিলিয়ে খুব সমারোহ সহকারে জলে বেড়াইতে যাইতেন মনে আছে, সঙ্গে অন্য সাজ সরঞ্জামের মধ্যে বন্দুকও থাকিত।..... অবসর কালে বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া মাছ ধরা ও একটা প্রধান

সখের মধ্যে ছিল।... আপ্ত বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ধুম ছিল, এক বাড়ি না এক বাড়িতে প্রায়ই খাওয়া দাওয়া হইত।"[১]

এই বর্ণনা পড়ে মনে হয়না এটাও সেই সমাজেরই ছবি যখন উনিশ শতক তোলপাড় হয়ে চলেছে নেতৃত্বস্থানীয় দের নানা ভাবনায়। এই যে মজলিশী বন্ধুত্ব, মাছধরা, তাস খেলা, নিমন্ত্রণ রক্ষা, তাকিয়া ফরাশে বৈঠকখানার গান এ সবের আওতার একটু বাইরে এসে গড়ে উঠছিল বন্ধুত্বের জাগরণে পুনর্বাসিনের কথা। যেখানে মানুষ তার মেধা ও স্বকীয়তার জোরে পরিবার বিছিন্ন হয়েও গড়ে তুলতে চাইছে এক অন্য সমাজ। আমোদ প্রমোদের উর্দ্ধে এক সম-মনন ধর্মিতার সমাজ, অন্যতর মূল্যবোধের গোড়ার পত্তনে। ফলে প্রয়োজন হল এক নতুন নাম নতুন ব্যাখ্যার যা ব্যাখ্যা দেবে এই নব্য উদ্ভূত গোষ্ঠীর বন্ধন ও অস্তিত্বকে।

রামমোহনের সময় থেকে ভারতবর্ষীয় সমাজের যে গতি সূচিত হতে লাগল, নানারকম ব্যাখ্যায় তাকে আমরা বুঝতে চেয়েছি। কখনো সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে, কখনো বা আলোক প্রাপ্ত সংস্কৃতির চাহিদায়। কিন্তু একটা কথা সমস্ত পরিস্থিতিতেই প্রকাশ হয় যে সমমনস্ক মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার একটা নব্যতর আয়োজন এ সময় থেকেই বিশেষ ভাবে শুরু হয়। নব্যতর, কারণ - আমাদের সমাজধর্মে চাটুকারিতা ছিল, প্রভুত্ব ছিল, স্তাবকতা ছিল, বিরোধ ছিল, সালিশি নিষ্পত্তি ছিল, ভক্ত ছিল অনুগামী ছিল। কিন্তু বিপরীত ধর্মিতার দু'প্রান্তে থেকেও বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে সমাজকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এমনটা ছিলনা। ক্রমে যখন আমরা জন্মান্তরবাদ, দৈব নির্দেশ, কর্মফল স্বর্গ-নরক, আত্মা, আদেশ, বাধ্যবাধকতা, অনুশাসনকে যুক্তি বুদ্ধির আলোতে যাচিয়ে নিতে শিখলাম তখনই মনের একটা উন্মেষ ঘটল। বঙ্গজ সংস্কৃতির গোড়ায় ছিল ধর্মীয় বোধ, সামাজিক অনুশাসন, নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির আচার বিচার, পঞ্জিকা মেনে চলা আর আদিরস চর্চিত সহবাস। সেই আলোতেই তখন সৃষ্টি হত সাহিত্য যা মূলত পাঠ্যপুস্তক, ধর্মীয় পুস্তক, নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি, পাঁচালি, এরোটিকা ইত্যাদি। গীতি কবিতা গল্প উপন্যাসও ছিল, তবে সে সবই সেই আহার নিদ্রা মৈথুনের সনাতন উপসর্গগুলি মেনেই।

কিন্তু খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তর, ইংরেজি শিক্ষা, নিরপেক্ষ আইনের সাহচর্য, সংবাদপত্র এবং ছাপাখানা মানুষকে করে তুলল সংস্কারমুখী। ফলে উনিশশতকে নানা বিপরীতধর্মিতার মধ্যেও দিতে থাকল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অথচ অন্য অনুভবের মানুষ। বিদ্যাবত্তার এমন একটা জোয়ার এল যে, নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের আর্থকাঠামোর মধ্যে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হল শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের স্থান। সেই শিক্ষা চেতনা কে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হল এমন এক মানুষ গঠনের যাকে বলা যায় বোধের জাগরণ, যুক্তিবাদী ইন্দ্রিয় ময়তার জাগরণ। একই সঙ্গে তা আবার ব্যক্তি ও সমাজের জাগরণ, যে নেতৃত্বের ভিত্তি চেষ্টা, নিষ্ঠা, ইচ্ছা ও পরিশ্রম।

তাই উনবিংশ শতাব্দীর এই মননশীলতার জোয়ারে ভাবনা-সচেতন ব্যক্তিরা সামাজিক উদ্বৃত্ততায় মূল স্রোত থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, একে একে পুনর্বাসিত হতে লাগলেন বন্ধুত্বের নিবিড় শুশ্রূষায়। এর সূচনা হয়েছিল রামমোহন দ্বারকানাথে। পরবর্তী কালে মনান্তরে তা যদি একেবারেই নিষ্প্রাণ হয়ে যেত, তাহলে রামমোহনের মৃত্যুর বহুবছর পরে ব্রিস্টলে গিয়ে সেই সমাধির ওপর একটি সৌধচিহ্নে ঘোষণা করতেন না কেন দ্বারকানাথই রামমোহনের এই সৌধ নির্মাণে।

বন্ধুত্বের এই পুনর্নির্মাণের সরাসরি সামাজিক নেতৃত্ব ভাবনায় প্রবেশ করবার আগে, একবার দেখে নেওয়া যায় মেয়েমহলে এই শব্দটির ব্যবহার কেমন ছিল। আত্মকথা, স্মৃতিকথা, সেকেলে কথা, পুরাতন প্রসঙ্গ এসব নাড়ানাড়িতে দেখা যায় সখিত্ব বা 'সই' ছিল অন্দরমহলের তৃতীয় জানলা। বাল্যসঙ্গিনী, তীর্থে গিয়ে পরিচয়, একই গুরুর দীক্ষিত, একই রুচির সঙ্গি একই কাজের (যেমন পান সাজা, বড়ি দেওয়া, চুল বাঁধা) সঙ্গি একই দুঃখের (যেমন বাল্য বৈধব্য, সন্তান শোক) ভাগী- এই সব সূত্রে রেওয়াজ ছিল সই পাতানোর বৈষম্য মূলক পারিবারিক অবস্থান, আর্থিক সঙ্গ।ত, বর্ণবিভেদ সব কিছুকে অতিক্রম করে আনায়াসে চলত এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের পর্ব। কতরকম যুক্তিতে ও অযুক্তিতেই না তাঁরা ব্যাখ্যা দিতেন 'সই' করবার কারণগুলির। সই বা বন্ধুত্ব শব্দটির ব্যাপ্তি তাই অন্দর মহলে নিয়ে আসত অনেকখানি আলো-বাতাস। দুধমা, নাপতিনী, গৃহপরিচারিকা ধাইমা-সকলের সঙ্গেই সই পাতানো চলতো। এই সম্পর্কে তাই উচ্চনীচ, অর্থবান বা অর্থহীনের বিচার ছিল অপ্রত্যক্ষ এবং গৌণ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, সেকালের মহিলা-সমাজে আর একটা প্রথা ছিল সম্বন্ধ পাতানো। 'সই' (সখি), 'মিত্তিন' (মিত্রানী), মকর, 'গঙ্গাজল', 'মহাপ্রসাদ' 'সাগর', 'গোলাপ জল', 'গোলাপ', 'বেয়ান', 'মনের কথা' প্রভৃতি যাহা হউক একটা সম্পর্ক পাতাইয়া সেকালের মহিলারা পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতেন। এই সকল পাতানো সম্বন্ধের মধ্যে কোন কোনটির প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মভাবের উপর ছিল। পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনে গিয়া মহিলারা পরস্পরের মুখে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ দিয়া মহাপ্রসাদ সম্বন্ধ পাতাইয়া আসিতেন। অনেক সময় কোন মহিলা পুরী হইতে মহা প্রসাদ আনিয়া নিজ পল্লীবাসিনীর মুখে সে মহাপ্রসাদ দিয়া 'মহাপ্রসাদ' সম্বন্ধ পাতাইতেন। উত্তরায়ণে গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে 'সাগর' পাতাইয়া আসিতেন। মকর-সংক্রান্তির দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পরের মধ্যে মকর পাতানো হইত। 'বেয়ান' সম্বন্ধটা সাধারণত বাল্যকালে পুতুল খেলার সময় পাতানো হইত।....

...... এই সকল প্রীতির সম্বন্ধ অনেক সময় দুই তিন পুরুষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিত। পুত্রকন্যারা মাতার 'সই' বা 'বেয়ান' কে 'সই-মা' বা 'বেয়ান-মা' বলিয়া সম্বোধন করিত। 'সই-মা'র মত সেকালে 'সই' ঠাকুর-মা', সই-দিদিমা, 'মকর ঠাকুমা' পর্যন্ত সম্বোধন আমরা শুনিয়াছি।

...... সেকালের মহিলা সমাজে এই কৃত্রিম সম্বন্ধ পাতাইবার ইচ্ছা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা অশিক্ষিতা ও কুসংস্করমণ্ডিতা হইলেও পরকে আপন করিতে, নিঃসংপৃক্ত পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে কি রূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।"[২]

পরবর্তীকালে এই দেশজ আচার ও ভাবনাকেই পরিশিলীত হতে দেখি, স্বর্ণকুমারী দেবীর মননে ও সাংগঠনিকতায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "মেয়েদের মধ্যে আত্মসচেতনতা যে ধীরে ধীরে কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সখি সমিতির প্রতিষ্ঠা থেকে'। মেয়েদের স্বার্থরক্ষায় ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমিতির 'প্রধান উদ্দেশ্য' ছিল 'অসহায় বঙ্গবিধবা ও অনাথ বঙ্গকন্যাগণকে সাহায্য করা।"[৩]

স্বর্ণকুমারীর আজীবন বন্ধু কবি গিরীন্দ্র মোহিনী লিখছেন, "আমাদের মহিলা সমাজে নূতন সৃষ্টি এই 'সখি-সমিতির' প্রস্তাব ভারতীতে বাহির হয়। সেই আহ্বান-সূত্রে আমাদের প্রথম পরিচয়....... এই সখি সমিতি তিনি কিরূপ উৎসাহ পরিশ্রম ও যত্নে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মহিলামাত্রেই অবগত আছেন। সর্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রচার কল্পেই এই মিলন-সমিতির সৃষ্টি। অসূর্যম্পশ্যা অবরুদ্ধা হিন্দু মহিলাদেব মধ্যে ইহা এক বিশুদ্ধ 'নরোজার' দৃশ্য উদঘাটিত করিয়াছিল। এইরূপ নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ তাঁহারা আর কখনো ইতিপূর্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 'রমনীতে বেচে রমনীতে কেনে লেগেছে রমনী রূপের হাটে'।"[৪]

সখি সমিতিকে ভিত্তি করে আধুনিক সম্পর্ক নির্মাণের এক অভিনব উদ্যোগ দেখা যায় মহিলা লেখিকাদের মধ্যেও। তা হল নিজেদের লেখা বই পরস্পরকে উৎসর্গ করা বা উপহার দেওয়া যা আমরা মধুসূদন দীনবন্ধু এঁদের সময়ে দেখেছি। গিরীন্দ্র মোহিনীর কাব্যগ্রন্থ 'শিখা' উপহারে পেয়ে, স্বর্ণকুমারী তাঁকে প্রত্যুপহারে দেন তাঁর 'স্নেহলতা' উপন্যাসটি।

স্বর্ণকুমারীর বন্ধুবাৎসল্য সম্পর্কে তাঁর বড় মেয়ে হিরন্ময়ী লিখছেন, 'মাতৃদেবীর একজন প্রধান সহায় বন্ধু ছিলেন কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তী। তিনি প্রায়ই কাসিয়া বাগানে আসিতেন এবং মাতার রচনা শুনিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেন।

...... কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মাতার আর একজন অকৃত্রিম সাহিত্য-বন্ধু ছিলেন। প্রচার পত্র বাহির হইবার পর হইতে লেখকসূত্রে ইহার সহিত আমাদের পরিচয় আরম্ভ হইয়া ক্রমশ উভয় পরিবারের মধ্যে একটি আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

...... মার ধাতটাই স্নেহ প্রবণ, সেজন্য তাঁহার জীবনে বন্ধুতার কখনো অভাব হয় নাই। মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী, সরোজকুমারী, নিস্তারিনীদেবী এবং সুলেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরানি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার বন্ধু।"[৫]

সই পাতানোর পথ ধরে 'সখি সমিতি'তে এই যে উত্তরণ বা উত্তরণ কামী বদল, তা হয়তো মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্তদের মধ্যেই ঘটেছিল। তবু বলতে হয় যে এই সূত্র ধরে সাহিত্য ও দেশোদ্ধারের চিহ্নে নারী পুরুষের সম মনস্ক তার আদান প্রদান ও ঘটতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গের স্বীকৃতি পাই সরলা দেবীর লেখায়, "ওই সময়ে নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে তাঁদের দলে টানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন আমি যদি হিন্দুনারীর প্রতিভূরূপে বিলাতে গিয়া লেক্‌চার দিই, অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। আমি সে কথা বুঝিলাম না, ভারতীয় সেবা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলাম না।" মেয়ে-পুরুষের প্রকাশ্যে সহযোগিতা, সম মনস্কতার ভিত্তিতে এরও সূত্রপাত হল।[৬]

এবার ১৮৮৬র 'সখি সমিতি'র সময় কাল থেকে একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়ায় যখন ভারতীয় সংস্কৃতির নেতৃত্বে রামমোহন দ্বারকানাথ ডিরোজিও রাধাকান্ত দেব। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'ই (১৮১৫) বলতে গেলে বন্ধু সভা সংগঠনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগ। এরপর ক্রমে এসেছে, ডিরোজিওর আকাডেমিক এসোসিয়শন (১৮২৭), রাধাকান্ত দেবের ধর্মমহাসভা (১৮৩০), আর এ্যাঙ্গলো হিন্দু এসোসিয়েশন (১৮৩০)। আত্মীয় সভার নির্মাণে গোড়ার দিকে রামমোহনের সহযোগী ছিলেন দ্বারকানাথ রাধাকান্ত— প্রায় সকলেই। কিন্তু তাঁদের চিন্তা ভাবনার বিভাজন সূত্রগুলিকে কোনো সমন্বয়ী রেখা দিয়েই আগলানো গেল না। ফলে খ্রিষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম এবং পাশ্চাত্যবাদ একদিকে এবং এর অন্যদিকে প্রাচ্য ও তার হিন্দুধর্ম-এরকম দুটি পৃথক গোষ্ঠীর জন্ম নিতে লাগল।

এর কিছু পরে লাগল রিজন বা যুক্তিবাদের ছোঁওয়া এবং একই সঙ্গে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার বড় দাবি। এই সময়ের নির্মাণে বেশ কিছু কাল অপেক্ষা করে আমরা পেলাম আরো কিছু নিবিড় বন্ধুত্বের পুনর্নির্মাণ, যেমন ঈশ্বর মদনমোহন, মদুসূদন রাজনারায়ণ, ঈশ্বর-অক্ষয় মধুসূদন ভূদেব এবং মধুসূদন -ঈশ্বর। অর্থাৎ সমধর্মা বা বিপরীতধর্মা বন্ধুত্বের নিরিখে ব্যক্তির সম-উচ্ছাস। এক অনন্যমাত্রায় যোগ্যতর মনন ও ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। তবে সব বন্ধুত্বগুলিই যে একই বিপন্নতা বা সক্ষমতার নির্ভরে গড়ে উঠেছে এমন নয়। তবু ইতিহাস অনুসন্ধানে এর একটি ধারাবাহিক এবং কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তার প্রধান লক্ষণ এই যে, উনিশ শতকের ত্রিশ চল্লিশের দশকে যখন পাশ্চাত্য মুখীনতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে সে সময় বাঙালি সংস্কৃতিতে সরাসরি প্রয়োগে আসছে 'বন্ধু' শব্দটির ব্যবহার, দ্বারকানাথ রামমোহনের যে প্রবাদ প্রতিম বন্ধুত্ব ভেঙে গেল তার একটি সহজ শরীর জেগে উঠতে লাগল 'বন্ধুবর্গ সমবায়', 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' এই গোষ্ঠী গঠনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের লেখায় আছে, "প্রথমতঃ ১৬ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, 'বন্ধুবর্গ সমবায়' নামক সভা হইতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হয়।'[৭]

পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতেও পাওয়া যায় এই কিশোরী চাঁদ ও তাঁর উদ্যোগে সংগঠিত, সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতির কথা। এ প্রসঙ্গে জানা যায়, "কিশোরী চাঁদ মিত্র ১৮৫৪ সনের মাঝামাঝি কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং কাশীপুরে বাস করিতে থাকেন। ঐ সনের ১৫ই ডিসেম্বর স্বীয় কাশীপুরস্থ ভবনে কলিকাতার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগে সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমাবধি ইহার সভাপতি পদে বৃত ছিলেন; সম্পাদক ছিলেন— কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয় কুমার দত্ত। প্রথম দিনের অধিবেশনেই কয়েকটি প্রস্তাবের আকারে সমিতির উদ্দেশ্য নির্নীত হইল। স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন এবং বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন করা সুহৃদ সমিতির প্রধান কর্তব্য মধ্যে গণ্য হয়।.... সভায় সভ্যগণের মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, চন্দ্র শেখর দেব, দিগম্বর মিত্র, গৌরদাস বসাক, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। হিন্দু বিধবা আইন প্রনয়ণ কালে সমিতির সহায়তা বিশেষ লক্ষণীয়।"[৮] নগেন্দ্রনাথ সোমের[৯] লেখা থেকে আরো যা জানা যায়, ধর্মান্তরিত মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলে কিশোরী চাঁদ মিত্রের তত্ত্বাবধানেই পুলিস কোর্টে দোভাষীর কাজ পান।

বন্দনা সেন গুপ্ত[১০] তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী উন্নয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে এই 'সুহৃদ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এই সমিতির মধ্যে দিয়ে যে সব সমস্যা এবং সেগুলির নিষ্পত্তিতে যে সমমনস্কতার প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকেই ধরা যেতে পারে উনিশ শতকের চিন্তা ও চেতনার আকর হিসেবে। ধরা যাক প্যারীচাঁদ সরকারের সুরাপান নিবারনী সমিতির[১১] উদ্যোগ বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের[১২] তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ঘিরে অক্ষয় দত্ত ও ঈশ্বর চন্দ্রের সঙ্গে মতৈক্য এবং মতানৈক্য, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের[১৩] সঙ্গে মিলিত হয়ে সমউদ্যমে ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহনের শিশুপাঠ্য বই লেখা এবং সংস্কৃত যন্ত্র স্থাপনের সাফল্য এবং সর্বোপরি মধুসূদন ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুত্বের[১৪] রসায়নে বাংলা নাট্য সাহিত্যের নতুন দিগন্তের উন্মোচন— এ সবই সম্ভব হয়েছিল সমাজ উন্নয়ন ও নিজেদের আত্মপ্রকাশের তাগিদে। পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে পুনর্বাসনের আকাঙ্খায়। তা না হলে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিতকার তাঁর বন্ধুদের বলতেন না, যে এঁরা তাঁর সুহৃদ ও সহায়'[১৫] অগ্রণী ডিরোজিয়ান, রামগোপাল ঘোষ, চিকিৎসক দুর্গাচরণ, আইন ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ, নাট্যকার দীন বন্ধু, সাহিত্যপ্রতিভা ও বহুভাষাবিদ মাইকেল, ব্রাহ্মধর্মের প্রধান পৃষ্ঠ পোষক রাজনারায়ণ বসু এবং স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানী অক্ষয় কুমার দত্তের সঙ্গে এই বিচিত্রধর্মা বন্ধুত্ব সম্ভব হয়েছিল কারণ তাঁরা সকলেই স্বপ্নে, পরিচর্চায় শ্রমে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় মগ্ন ছিলেন। বিশেষত অক্ষয় দত্তের ব্যক্তিত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর চরিতকার লিখছেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ আর

না হলেও তিনি বন্ধু বান্ধুবদের সহায়তায় স্বেচ্ছায় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনো চালিয়ে যায়।"[১৬]

উনিশ শতকের এই বন্ধুত্বের জাগরণ এবং ব্যক্তির পুনর্বাসনের ফলশ্রুতি আমরা যে 'সখি সমিতি'র সংগঠন বা নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সংস্কারেই দেখতে পেয়েছি তা নয়, পেয়েছি বিপরীত ধর্মিতায় রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ চন্দ্র বসুর বন্ধুত্বের ধারাবাহিকতাতেও। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, "বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব একসময়ে যথেষ্ট গভীর ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে, অনন্ত প্রথম জীবনে, বন্ধুর অভাব হয়নি। কিন্তু জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো একজন মনীষীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে এই কারণে যে, দুজনের কর্মক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র।"[১৭]

আরও আশ্চর্য এই যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলে জগদীশচন্দ্র যে চিঠিটি লিখলেন, তাতে সম্বোধনে রবীন্দ্রনাথকে 'বন্ধু'[১৮] শব্দটিও লক্ষণীয়। এই 'বন্ধু' শব্দটি সম্বোধনে বসাবার চর্চা তাঁরা পরস্পরের অধিকারে নয়, অর্জনে পেয়েছিলেন।

তাই বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে শুধু সমপ্রাণতা নয় শুধু সখ্যতা নয় যেন ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল মন্ত্রটিই সেদিন কথা বলে উঠেছিল। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এখন এই যে সরাসরি কথোপকথনের সুযোগ ঘটেছে এটির অনেকাংশেই সেই সম্ভব হয়েছিল উনিশ শতকের বন্ধুত্বের জাগরণে অর্থাৎ বিপরীত ধর্মিতার সহাবস্থান ও সাংগঠনিক স্বচ্ছতা নির্মাণে।

সূত্র নির্দেশ

১) মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী: ১৩৪৮: পিতৃতর্পণ: রয়েড আর্ট প্রিন্টার্স: কলকাতা, পৃ. ১১৬-১১৭

২) চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ: ১৪০৪ 'স্মৃতিতে সেকাল, আমাদের লোক আমাদের কথা' ঐতিহাসিক অরুণ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) কলকাতা, বিশেষ রচনা পৃ. ১৯০-১৯২

৩) চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ (সম্পাদিত) ১৯৮৫ : উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্র মহিলা, স্ত্রী, কলকাতা, উপসংহার পৃ: ২২৬

৪) দাসী, গিরীন্দ্র মোহিনী : ১৪০৪ 'মিলন কথা' সেকেলে কথা, শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা, অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) নয়া উদ্যোগ কলকাতা, পৃ: ৭৩

৫) দেবী, হিরন্ময়ী : ১৪০৪ 'কৈফিয়ৎ'— ঐ পৃ: ১৩৯

৬) দেবী, সরলা চৌধুরাণী : ঐ পৃ: ১৫৪

৭) বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র ১৯২৮ সংবৎ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতাবিষয়ক প্রস্তাব— বিজ্ঞাপন।

৮) ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ১৯৬২ : মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী: সতীশ কুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত) বিশ্বভারতী কলকাতা, পরিশিষ্ট

৯) সোম, নগেন্দ্রনাথ ১৩৬১ (২য় সং) মধুস্মৃতি, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কলকাতা, পৃ: ৮২ ৮৩

১০) সেনগুপ্ত, বন্দনা : ১৯৯৯ উনবিংশ শতাব্দীর নারী উন্নয়নে প্রয়াস' স্পন্দিত অন্তর্লোক আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স : কলকাতা পৃ: ৩৫

১১) বাগচী, মণি · ১৯৫৭. বিদ্যাসাগর প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলকাতা, অধ্যায় একুশ পৃ: ২৯৭

১২) দত্ত, ভবতোষ · ১৪০৩ (কার্তিক পৌষ, নবপর্যায় ৬) 'বাঙালির মানব ধর্ম, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্র নাথ, বিদ্যাসাগর' বিশ্বভারতী পত্রিকা, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদিত) কলকাতা পৃ ২৮

১৩) সেন, প্রবোধচন্দ্র ১৪০১ : 'শিশুবোধক, শিশুশিল্প ও বর্ণপরিচয়' উল্লিখিত বিদ্যাসাগর সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা পৃ: ৩০৯

১৪) মুখোপাধ্যায় মন্দার : ২০০০ 'বন্ধুত্বের জাগরণে — ঈশ্বরচন্দ্র ও মাইকেল' সমতট, অর্ঘ্য কুসুম দত্ত (সম্পাদিত) পৃ: ৫৬-৭২

১৫) বাগচী, মণি ঐ . অধ্যায় পঁচিশ, পৃ: ৩৬২

১৬) বিশ্বাস, অন্নপূর্ণা · ১৯৯৮ অক্ষয় কুমার দত্ত : সমাজ বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তা : র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ: ১৫

ঐ : পুস্তক সমালোচনা, মুখোপাধ্যায়, মন্দার চতুরঙ্গ ১৪০৫ মাঘ চৈত্র পৃ: ৩১১-৩১৪

১৭) চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর . ২০০০, 'কবি ও বিজ্ঞানী' রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা চতুর্থ অধ্যায় পৃ: ১১৯

১৮) ঐ পৃ· ১২৮

সেকালের পুরুষ অভিনেত্রী

নির্মল বন্দোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, "স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোক দিয়াই অভিনয় করাইতে এরূপ অভ্যস্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ যখন একথা বলেছিলেন তার তিন দশক পূর্বে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক আগে থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে নারীর ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতারা অভিনয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর ১৮৭৩ খ্রিঃ ১৬ আগষ্ট 'বেঙ্গল থিয়েটারের' উদ্বোধনের পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরামর্শে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বেঙ্গল থিয়েটারেই সর্বপ্রথম বারাঙ্গনাদের মধ্য থেকে অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়। প্রথম যে চারজন বারাঙ্গনাকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের নাম— শ্যামা, গোলাপ, এলোকেশী ও জগত্তারিণী। উদ্বোধন রজনীতে এলোকেশী ও জগত্তারিণী যতাক্রমে দেবযাণী ও দেবিকা চরিত্রে (মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে) মঞ্চাবতরণ করেন। বাকি স্ত্রী চরিত্রগুলি পুরুষেই অভিনয় করেন।

"অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদামরচিত কবরী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল, সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষ হইতে স্তনযুগল খসিল— তাহা বস্ত্রনির্মিত।"— বঙ্কিমচন্দ্রের এই শক্তিই প্রমাণ করে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বঙ্গবালাদের আবির্ভাবের পূর্বে স্ত্রী চরিত্রে পুরুষদেরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। যে সকল রমণীয় পুরুষ রমণী চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন তাঁদের অসুবিধার মধ্যে একটিই মাত্র বাধা ছিল, সখ করে গোঁফ-দাড়ি রাখার সুযোগ তাঁদের ছিল না। যে সব বিখ্যাত অভিনেতা প্রথম জীবনে স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে প্রায় প্রত্যেকেই খুব বড় বড় গোঁফ, কেউ কেউ বা দাড়িও রেখেছিলেন। তাঁরা যে সত্যিই স্ত্রীলোক নন, গোঁফ রচনার পেছনে সেকথাই কি প্রমাণ করার ব্যাকুলতা ছিল?

সেদিনের যাত্রায় পুরুষ অভিনেত্রীরা :

যাত্রা পালার প্রথম পুরুষ অভিনেত্রী হলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি নবদ্বীপে তাঁর অনুগামী চন্দ্রশেখরের বাড়িতে প্রথম 'রুক্মিনী হরণ' পালায় 'রুক্মিনী' চরিত্রে অভিনয় করেন। এ ছাড়া তিনি অন্য নারী চরিত্রেও অভিনয় করেছিলেন বলে বৈষ্ণব জীবনীকারদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি। কিন্তু পুরুষ হয়েও শ্রীচৈতন্যের স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের পেছনে কোন পেশাদারি বা সামাজিক কারণ ছিল না। ছিল তাঁর নিজের জীবনদর্শন প্রচারের তাড়না।

চৈতন্য পরবর্তীকাল থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত বাঙালির যাত্রা পালায় যে অসংখ্য পুরুষ অভিনেতা নারী চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন, তার পেছনে ছিল সামাজিক কারণ। একটা সময়ে তথাকথিত ভদ্রলোকের সমাজে যাত্রা-থিয়েটারের শিল্পীরা ছিলেন অচ্ছুত। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ী আমাদের তৎকালীন বাঙালি সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করে গেছেন। সুতরাং যে সময় পুরুষ শিল্পীরাই সমাজে ধিকৃত, সেই সময় যাত্রা থিয়েটারের দলে দলে মেয়েরা আসবে, একথা ভাবাটাই হবে অনৈতিহাসিক। তবু কেউ কেউ এসেছিলেন, যেমন নটী বিনোদিনী। কিন্তু এঁরা এসেছিলেন বারাঙ্গনা সমাজ থেকে। যে সমাজ সাধারণ ঘর-গেরস্তের সমাজ জীবন থেকে আলাদা ছিল। এই কারণে সেই সময়ে এই সব সামাজিক ও সংস্কারগত পশ্চাদপদতার জন্যে নারী চরিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে নারী-অভিনেত্রী সংগ্রহ করা ছিল দুষ্কর। যদিও বাঁধা মঞ্চে থিয়েটারে দু একজন নারীর মুখ দেখা যেত, ভ্রাম্যমাণ যাত্রা দলে এর কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

পুরুষ অভিনেত্রীরা ঃ

সেদিনের যাত্রাপালার প্রতিটি দলে নারী চরিত্রে বহু 'পুরুষ অভিনেত্রী'দের দেখা যেত। উনিশ শতকে এই সকল 'পুরুষ অভিনেত্রীরা' সাজসজ্জায় স্বাভাবিকত্ব আনার জন্য এমনকি নাক-কান বিঁধিয়ে নাকছাবি এবং কানের দুলও পরতেন। বিংশ শতকে এসে এই রেওয়াজ উঠে যায়। সেদিনের 'পুরুষ অভিনেত্রীদের' মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— বিনোদরানি (বিনোদ চক্রবর্তী), রাখালরানি (রাখাল দাস), ছবিরানি (শ্যামাপদ রায়), বাবলিরানি (প্রকৃতি ভট্টাচার্য), চপলরানি (চপল ভাদুড়ী), পুতুলরানি (শম্ভু নায়েক), শতদল রানি (সুনীল রায়), হরিরানি (হরি গোপাল দাস), নির্মল রানি (নির্মল ভট্টাচার্য) প্রমুখ।

বাংলা থিয়েটারের কয়েকটি ঘটনা ঃ

সেকালে বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন শরৎচন্দ ঘোষ (১৮৩৪-১৮৮০)। ১৮৫৭ সালে নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ে শকুন্তলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শরৎ ঘোষ। তখন তাঁর বয়স ছিল অল্প। মুখমন্ডলে গোঁফের বাহার ছিল না। (পরবর্তী কালে রেখেছিলেন)। অভিনয় দেখে ইংরেজি পত্রিকা হিন্দু পেট্রিয়ট লিখেছিল, "যে তরুণটি শকুন্তলার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁর অঙ্গভঙ্গি ও চলাফেরা সত্যিই রানির মত এবং যে ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন তা চরিত্রটির উপযুক্ত হয়েছিল।" সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা লিখেছিল, "সম্রান্ত ভদ্র কুলোদ্ভব বালকগণ নটনটীরূপ ধারণপূর্বক নাটকের বিচিত্র রচনানুক্রমে বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া আপনাপন বক্তৃতা ও শরীরের ভঙ্গি অতি উত্তমরূপে প্রকাশ করাতে দর্শক মাত্রেই পরম পুলকিত হইয়া সাধুবাদ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শকুন্তলা লাবণ্যজ্যোতি। শরৎ ন্দ্রের জ্যোতির প্রায় প্রকাশ হইবার রঙ্গস্থল উজ্জ্বল

হইয়াছিল এবং তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে মধুবর্ষণ হইয়াছে, তিনি সভাস্থ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।'' ধনকুবের আশুতোষ দেবের বাড়ির বিরাট নাটমন্দিরে এই নাটক চারশো দর্শকের সামনে অভিনীত হয়। আশুতোষ দৌহিত্র শরৎচন্দ্র সে যুগের টাকায় কুড়িহাজার সোনার গহনা গায়ে পরে মঞ্চে নেমেছিলেন। শকুন্তলার দুই সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা হয়েছিলেন অবিনাশ ঘোষ ও ভুবনমোহন ঘোষ।

১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটক প্রযোজনায় নটীর ভূমিকায় রূপদান করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। নায়কের তিন স্ত্রী ভূমিকায় নেমেছিলেন মণিলাল মুখার্জী, বিনোদ গাঙ্গুলি ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতি কথায় জানিয়েছেন, ''মার কাছেই সব বর্ণনা শুনেছি থিয়েটারের। তিনি বলতেন, সে যে কী সুন্দর নট-নটী হয়েছিল, নট-নটী দেখলেই লোকেরা চিত্তির হয়ে যেত, কে বলবে যে নটী মেয়ে নয়। নটী আসল মুক্তোর মালা হীরের গয়না পরেছিলেন। সেই নট-নটী আবার তামাসা করে বাগানময় ঘুরে বেড়ালেন। পাশের বাড়ি চাটুজেমশায় ছিলেন বেজায় গোঁড়া, তিনি তো রেগে অস্থির। বলেন, এ কী ব্যাপার, মেয়ে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তো মান থাকে না, বলো গিয়ে ও বাড়িতে। তাঁকে যতো বোঝানো হয় যে ও বাড়ির জ্যোতিদাদা মেয়ে সেজেছে, তিনি বলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি মেয়েরা ঘুরে বেড়াছে বাগানে। জ্যোতিকাকা ছিলেন পরম সুন্দর পুরুষ। নটী সাজবেন, সকাল থেকে বাড়ির মেয়েরা বিনুনি করেছে, চুল আঁচড়ে দিচ্ছে গোলাপ তেল দিয়ে, বাড়ির পিসিমারাই সাজিয়ে দিয়েছিলেন ভিতর থেকে।'' 'নবনাটকের' পূর্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একবার মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এই অভিনয়েতও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেবার তিনি কৃষ্ণকুমারীর মা সেজে মঞ্চে নেমেছিলেন।

সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (১৮৫০-১৯০৮) ও মহেন্দ্রলাল বসু (১৮৫৩-১৯০১)। এঁরা দুজনেই অনেকটা এক রকম দেখতে ছিলেন। আমরা একালের ছবিতে দেখি দুজনেরই বিশাল গোঁপ , দুজনেরই স্বাস্থ্য ভাল এবং দুজনেই ঠিক মাথার মাঝখানে সিঁথি করতেন। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশানাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয়। অর্ধেন্দুশেখর এই নাটকে চারটি ভূমিকায় অভিনয় করেন, তার মধ্যে একটি ছিল সাবিত্রীর ভূমিকা। মহেন্দ্রলাল বসু হয়েছিলেন পদী ময়রানি। এই নাটকে স্ত্রী চরিত্রে আর যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন অমৃতলাল বসু (সৈরিন্ধ্রী), ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলি (সরলা), তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (রেবতী)। সৈরিন্ধ্রীর অভিনয় অমৃতবাজার পত্রিকার ভালো লাগে নি, কিন্তু এডুকেশন গেজেট লিখেছিল, ''পঞ্চম অঙ্গে সৈরিন্ধ্রীর বিলাপ লহরী এত স্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে তৎশ্রবনে এমত শ্রোতা ছিল না এক বিন্দু অশ্রুপাত করেন নাই। সৈরিন্ধ্রীর বাক্যাদি ঠিক স্ত্রীলোকের

ন্যায় বোধ হয়।'' সৈরিন্ধী চরিত্রাভিনেতা অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন, ''আমি তো সৈরিন্ধীর ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। প্রথমে নিজে নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। একদিন অর্ধেন্দুবাবু বলিলেন, 'তোমার পার্টটা কেমন হল দেখি? তিনি আমার পরীক্ষা লইয়া বলিলেন, ''না, হয় নি।' এই বলিয়া সৈরিন্ধীর প্রথম দৃশ্যে চুলের দাড়ি বিনানের সময় কথার ভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন।''

১৮৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ন্যাশানাল থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলি (১৮৫৬ ?)। এই ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলি সম্পর্কে অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন, ''অভিনেত্রীযুগ প্রবর্তনের পূর্বে বঙ্গের প্রকাশ্য নাট্যশালার আদি নায়িকা (হিরোইন) এই ক্ষেত্ু একদিন সহস্র সহস্র দর্শককে মোহিত করেছিল। পরলোকগত বা জীবিত বহু রূপবতী অভিনেত্রীকে আমি দেখেছি, এক একজনের অভিনয়-কলার ভাব ও ভাষা অক্ষরে অক্ষরে আমার স্মৃতি ও প্রাণে মুদ্রিত আছে, কিন্তু তবু বলছি যে, কৃষ্ণকুমারী, নবীন-তপস্বিনী, কপালকুন্ডলা এবং আরও দু একটা স্ত্রীচরিত্রে আজ পর্যন্ত কোনো রঙ্গমঞ্চ চঞ্চবাই অভিনয়ের কথা কি বলছি - সেই অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালককে রঙ্গরূপের ছটাতেও পরাজিত করতে পারে নি।''

অভিনেত্রীর আগমন ঃ

গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার দল একবার কলকাতা থেকে বহরমপুরে গিয়েছিল নাটক করতে। ১৮৭৪-এর জুনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা' অভিনীত হল, জুলাইয়ের গোড়ায় 'সাধারণী' পত্রিকায় এক পত্রলেখকের একটি দীর্ঘ চিঠি ছাপা হল। স্ত্রীবেশী পুরুষদের অভিনয়ে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে পত্রলেখক এই পত্র লেখেন। আর মতিবিবির গোঁফের চিহ্ন তাঁকে সবচেয়ে বেশি পীড়িত করেছিল। মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা কাউকেই লেখক সহ্য করতে পারেন নি। এতকাল গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার পুরুষদের দিয়ে স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করাচ্ছিলেন, এবার তাঁরা কলকাতায় ফিরে স্ত্রী চরিত্রের জন্য যথার্থ স্ত্রীলোকের প্রয়োজন অনুভব করলেন। সংগ্রহ হল পাঁচ জন অভিনেত্রী— কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, হরিদাসী, রাজকুমারী ও যদুমণি। এই অভিনেত্রীদের আগমণের পেছনে কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করা যায়-- (১) শুধু যে সাধারণ দর্শকই মহিলা চরিত্রে পুরুষ অভিনেতা পছন্দ করছে না তা নয়, যাঁরা এতদিন মেয়ে সেজে খুব সুখ্যাতি অর্জন করে এসেছিলেন তাঁরাও আর মহিলার ভূমিকায় নামতে আগ্রহ বোধ করেন নি। (২) তাঁদের তো বয়স ও হচ্ছিল, গ্রীন রূমে বসে বসে স্ত্রীলোক সাজতে আর তাঁদের ইচ্ছে করছিল না। (৩) মোটামুটি অভিনয় করতে পারে এমন কিছু সুন্দরপানা ছোকরা সংগ্রহের চেষ্টা হল স্ত্রীচরিত্রে জন্য। কিন্তু এসব ছেলে-ছোকরাদের দায়িত্ব বোধের এত অভাব যে তাদের উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট

দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নাটক নামানো সম্ভব ছিল না। অতএব বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সে যুগে ধীরে ধীরে কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণীদের আবির্ভাব ঘটলো।

'ভারত সংস্কারক' পত্রিকা বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' দেখে লিখেছিল। ''আজিকালি কলিকাতায় বড় নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। একদল সাতুবাবুর বাড়ির সম্মুখে একটি নাট্যশালা নির্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবার তথার মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রণীত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে দুইজন বেশ্যাও ছিল। এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্র সন্তানেরা আপনাদিগকের মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্চনীয়।'' সংস্কারদের দিক থেকেই যতই বিরোধিতা এবং বাধা আসুক না কেন, শেষ পর্যন্ত রূপ মঞ্চের মহিলা মহল থেকে পুরুষদের সরে আসতেই হয়। স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনেতার হাত থেকে অভিনেত্রীদের হাতে ধীরে ধীরে চলে আসে অভ্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই।

সূত্র নির্দেশ

গ্রন্থ

১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় — 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'।

২) অজিত কুমার ঘোষ — 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'।

৩) ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য — নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার'।

৪) অজিত কুমার ঘোষ — 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস'।

৫) বিপিন বিহারী গুপ্ত — 'পুরাতন প্রসঙ্গ'।

প্রবন্ধ

১) প্রভাত কুমার দাস — 'যাত্রা গানের রানীরা' যুগান্তর, ২৯ আগাষ্ট, ১৯৭৬

২) মধু গোস্বামী — সেদিনের যাত্রার পুরুষ অভিনেত্রীরা', গণশক্তি ১১মে, ১৯৮৮।

বাংলার রেনেসাঁসে মুসলিম সমাজের ভূমিকা

সুনীতি ভূষণ কানুনগো

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সমাজের ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসে মুসলিম সমাজের কোন সক্রিয় বা প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। এমন কি মুসলিম লেখকেরাও মুসলিম সমাজের সাথে রেনেসাঁসের সংশ্লিষ্টতার উল্লেখ করেননি। কিন্তু এরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস আন্দোলন থেকে মুসলিম সমাজ কখনই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম সমাজ পাশ্চাত্যবিরোধী হয়ে পড়ে। ক্রমবর্দ্ধমান ইংরেজ আধিপত্যকে মুসলিম সমাজ বিদ্বেষের চোখেই দেখতো যে মনোভাব ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই উভয় আন্দোলনের সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সবোর্চ্চ সীমায় পৌঁছে সিপাহী বিদ্রোহের সময়। সিপাহী বিদ্রোহ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিতে দারুণ আঘাত হেনেছিল। এই বিদ্রোহ দমন করতেও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সৌভাগ্যের বিষয়, সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৮৫৯ সালে ভারতীয় উপমহাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনে আনয়ন করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র প্রথমার্ধে এই ব্রিটিশবিরোধী সংঘাত যে রেনেসাঁসের অনুকূল হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়াও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ক্রমবিস্তার মুসলিম সমাজকে রেনেসাঁস আন্দোলনে অংশ গ্রহণে বিলম্বিত করেছিল। এর মধ্যে দুটি বিষয়, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের প্রচার কার্য এবং ইয়ং বেঙ্গল সমাজের কার্যকলাপ মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি বিরূপভাবাপন্ন করে তুলেছিল। এই পাশ্চাত্যবিমুখতা মুসলিম সমাজকে কিছুটা পশ্চাদমুখী করেছিল। যে সময়ে হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে আধুনিক যুগে প্রবেশ করবার পথ প্রশস্ত করছিল, পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করে সম্পন্ন সমাজ গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠছিল, সে সময়ে পাশ্চাত্য বিমুখতা মুসলিম সমাজের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিম সমাজের এই

অনগ্রসরতা সামগ্রিকভাবে বাঙালি সমাজে এক প্রকারের সামাজিক বৈষম্যের (Social inequality) সৃষ্টি করে এবং রেনেসাঁসের ভাবধারা গ্রহণে মুসলিম সমাজের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

এরূপ অবস্থায় বাংলাদেশে আরম্ভ হয়েছিল বাংলার ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনা রেনেসাঁস আন্দোলন। এই ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রধানত ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এবং তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত প্রগতিশীল হিন্দু সমাজ সেবকেরা এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির অনুরাগী ইউরোপীয় পন্ডিত সমাজ। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজের পক্ষে তাৎক্ষণিক ভাবে বঙ্গীয় রেনেসাঁসে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি।

ব্যাপক অর্থে রেনেসাঁসের সংজ্ঞা দেওয়া হয় "the great literary and cultural development in Bengal in the nineteenth century". 'রেনেসাঁস বা নবজন্ম শব্দটি খ্রিষ্টান ধর্মীয় শব্দ, মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে যা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু রেনেসাঁসের অর্থ যদি নবজাগরণ মনে করা হয়, তবে মুসলিম সমাজের পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে কোন বাধা থাকবার কথা নয়. এবং বাস্তবিক পক্ষে তা'ই হয়েছিল। বর্তমান আলোচনায় আমরা এ বিষয়টিই পরীক্ষা করে দেখবো।

রেনেসাঁস এমন একটি ঘটনা যা একটি নির্দিষ্ট তারিখ থেকে আরম্ভ হয়েছিল এরূপ বলা যায় না। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধই বাংলার রেনেসাঁসের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এ সময়ের কিছু পূর্ব থেকেই রেনেসাঁসের ভাবধারা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে এবং এ সময়ের পরেও রেনেসাঁসের ভাবধারা নিঃশেষিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, খিলাফত আন্দোলন পর্যন্ত চলেছিল রেনেসাঁসে মুসলিম সমাজের সক্রিয় ভূমিকা।

কলিকাতাতেই মুসলিম নব জাগরণের সূচনা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে, কলিকাতা মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। প্রধান মুসলিম সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহ কলিকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধান সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহ কলিকাতা থেকেই প্রকাশিত হোতো। নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের কলিকাতাতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এ ভাবে কলিকাতাই মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশের উৎসস্থল হয়ে উঠে এবং এর সাথে রেনেসাঁসের দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠে। কালক্রমে কলিকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁস আন্দোলন সমগ্র বাংলায় বিস্তার লাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মুসলিম সমাজের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে দুটি ধারা দেখা যায়। প্রথমত, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার ও সমাজের উন্নয়ন। দ্বিতীয়ত, সরাসরি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ আয়ত্ত

করে মুসলিম সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়াস চালানো। একটি কৌতুহলের বিষয় হোলো এই উভয় প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতমুখী মনে হলেও বাস্তবক্ষেত্রে রেনেসাঁসের যুগে এই দুই প্রকারের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয় নি, বরং একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। এর কারণ পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য ছিল এক, আর সে লক্ষ্যটি ছিল জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন।

মুসলিম সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমান শাসনামল থেকেই প্রচলিত ছিল। সনাতন বিষয় ছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষার ইউনানি বা প্রাচীন গ্রিক বিদ্যাও পাঠ্যসূচির অন্তর্গত ছিল। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভিত্তিক হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন দেখা যায়। দুইটি বিখ্যাত মাদ্রাসা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একটি হোলো হুগলী মাদ্রাসা যেটি মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হুগলী মাদ্রাসায় এ্যাংলো -এরাবিক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রধানত ইউরোপীয়দের ফারসি ভাষায় সুশিক্ষিত করবার জন্য এই মাদ্রাসায় দেশীয় পণ্ডিত ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কালক্রমে কলিকাতা মাদ্রাসা ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠে। ১৮৬০ এর দশকে সমগ্র প্রদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন আরও যুগোপযোগী হয়ে উঠে।

ভিন্নধর্মী মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল দেওবন্দ মাদ্রাসায়। আনুমানিক ১৮৬৭ সালে দেওবন্দে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে দেওবন্দ মাদ্রাসাই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ করে। এই জনপ্রিয়তার কারণ মাদ্রাসার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই ভূমিকায় কালক্রমে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা গড়ে তোলে। দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষকেরা ছিলেন নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান এই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সমগ্র বাংলায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেওবন্দের আদর্শও প্রচার করতে থাকেন। এই মাদ্রাসায় পাঠদানের কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ছিল না; পাঠদানে শিক্ষকদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ছাত্রদেরও পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল পাঠগ্রহণে। ভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব, জীবন চরিত ইত্যাদি বিষয়ে চর্চার ফলে সামাজিক উন্নয়নে দেওবন্দ মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ একটি সুশিক্ষিত ও সমাজ সচেতন আলেম সমাজের জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে দেওবন্দ মাদ্রাসার সুশিক্ষিত আলেম সমাজই বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মাদ্রাসায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজ দ্বারা পরিচালিত আঞ্জুমানে ওলামা সমাজ সংস্কার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় মধ্যে কয়েকজনের উল্লেখ করা যেতে পারে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। মুসলিম রাজনীতিতেও তিনি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ মণিরুজ্জমান এছলামাবাদী একজন খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চট্টগ্রাম তিনি একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও উদ্যোগ করেছিলেন। মোহাম্মদ কাজেম আলি আরবি ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। এ উদ্দেশে তিনি ১৮৮০ এর দশকে একটি উচ্চ ইংরেজ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলবি ওবায়েদুল্লাহ উনিশ শতকের একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং হুগলী মাদ্রাসাব এ্যাংলো-এরাবিক বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনে ইংরেজ সরকার উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এর শাসনামলে ফারসি ভাষায় স্থলে ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকেই ইংরেজি ভাষাকে সরকারি কাজে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করার জন্য পর পর কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ১৮৫৪ সালে উড সাহেবের **ডেসপ্যাচে** ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে ইংরেজি ভাষায় মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুপারিশ করা হয়। এই **ডেসপ্যাচে** কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সরকারকে সচেষ্ট হতে বলা হয়। সরকার এই নীতি ঘোষণা করলেন যে, যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে না সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকারি মঞ্জুরী পাবে না।

মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রসারের জন্য স্যার রিভার্স টমসন ১৮৮০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে একটি কমিটি[১] গঠন করেন। কমিটির সদস্যারা হলেন জি, সি, পল, ব্যারিস্টার আমির আলি, নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর, নবাব মির মহম্মদ আলি এবং ফিলিপ নোলেন। সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ছয় মাসের মধ্যে কমিটি সরকারের নিকট এ বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করবে। এ থেকে বোঝা যায় সরকার মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রসারে কিরূপ আগ্রহী ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে মুসলিম শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও অগ্রসর হন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বহু স্থানে ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে।

রেনেসাঁসের যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুসারী মনীষীর ভাবাদর্শ ও কার্যকলাপ মুসলিম সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনের উপযোগিতা উপলব্ধি করলেন নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর সি আই ই (১৮২৮-১৮৯৩)। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ শেষে এই মাদ্রাসাতেই তিনি এ্যাংলো-এরাবিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬২ সালে তিনিই মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রথম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত

হন। ১৮৬৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠা করলেন মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি নামে একটি বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই লিটারেরি সোসাইটি একটি মর্যাদাপূর্ণ সংগঠনে পরিণত হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠা করলেন অল ইন্ডিয়া মুহাম্মেডন এডুকেশন কনফারেন্স। এই সংগঠনটির কার্যকলাপ পরবর্তীকালে আলিগড় আন্দোলনের রূপ লাভ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনের আন্দোলনে গেলেন সৈয়দ আমির আলি মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন। অপরদিকে আলেম সমাজও শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আঞ্জুমানে ওলেমার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি'। বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবি ফারসি ভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ছিল এই শিক্ষা সমিতির। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির ফলে মুসলিম ছাত্ররা ক্রমবর্দ্ধমান হারে জেলা সদরে ও কলিকাতায় অবস্থিত কলেজ সমূহে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ইংরেজি শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান সমূহে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার গ্রহণের ফলে মুসলিম সমাজে একটি সুশিক্ষিত, সমাজ সচেতন গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে। রেনেসাঁস যুগে যাঁরা ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হয়ে সমাজ সংস্কারের সাথে যুক্ত হন তাঁদের মধ্যে নবাব আবদুল জব্বার খান বাহাদুর সি আই ই অন্যতম। ১৮৩৭ সালে বর্ধমানে তাঁর জন্ম হয়। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৬ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৮৪ সালে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। এইসব পন্ডিতদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন স্যার সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮)। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এম, এ ও পরের বছর বি, এল, পাশ করে সরকাবি বৃত্তি নিয়ে ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য বিলাত যান। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাব-এট-ল পাশ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইনের অধ্যাপকের দায়িত্বে ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯০ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি নিযুক্ত হন। একিনুদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি, এ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এল, পাশ করেন। মৌলবি আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩) ১৮৮৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অনার্স সহ বি এ পাশ করে কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। নবাব আবদুল লতিফের পুত্র আবদুল আলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করে ১৯০৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি *বেঙ্গল এন্ড প্রেজেন্ট* এর সম্পাদক ছিলেন। স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২) প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন শেষে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ তে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯০ সালে তিনি ইংল্যান্ডে থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ

করেন। ১৯০৭ সালে ঠাকুর ল লেকচারার হিসাবে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা পরে *প্রিন্সপল্স্ অব মোহাম্মেডান জুরিসপ্রুডেন্স একর্ডিং টু দি সুন্নি অব ল* নামে প্রকাশিত হয়। খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ (১৮৭৪-১৯৬৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবিতে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই মুসলিমদের মধ্যে প্রথম আই ই এস ছিলেন। প্রতিভাবান ব্যারিস্টার আবদুল রসুল বাংলার রাজনীতিতে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। খান বাহাদুর আবদুল আজিজ (১৮৬৭-১৯২৬) ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ছিলেন পেশায় তিনি বিভাগীয় স্কুল ইনসপেক্টর ছিলেন। মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬) বি এ পাশ করার পর তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। মাদ্রাসাতেই হোক আর পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই হোক শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে একটি শিক্ষিত, মার্জিত রুচি সম্পন্ন সমাজ গঠন করে। এই শিক্ষিত সমাজ থেকেই আইনজ্ঞ, শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের উদ্ভব হয়। এঁরাই রেনেসাঁসকে এগিয়ে নিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

মুসমিল রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ (টাঙ্গাইল) এর অন্তর্গত দেলদুয়ারের দুই জমিদার বিশিষ্ট কবি মির মোশার্‌রফ হোসেন এবং আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। করটিয়ার (টাঙ্গাইল) জমিদার ওয়াজেদ আলি খান পন্নি (১৮৬৯-১৯৩৬) শিক্ষানুরাগী ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশে তিনি করটিয়া সাদাত কলেজ, হাফিজ মুহম্মদ আলি হাইস্কুল এবং রোকেয়া হাই মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরোপকারের জন্য তিনি দ্বিতীয় মহসীন নামে খ্যাত ছিলেন। নবাব স্যার খাজা আসানুল্লাহ বাহাদুর কে সি আই ই (১৮৪৬-১৯০১) সমাজ কর্ম ও দানশীলতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল স্থাপনের জন্য তিনি দুই লক্ষ টাকা এবং ঢাকায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা শুরু করার জন্য চার লক্ষ টাকা দান করেন। ধনবাড়ির (ময়মনসিং) জমিদার নওয়ার আলি চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) এবং সংস্কৃতির পৃষ্টপোষক ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র সাময়িকী প্রকাশনার পৃষ্টপোষকতা করেছিলেন।

স্যার উইলিয়ম জোন্স আরবি, ফারসি ও উর্দুভাষায় দক্ষ ছিলেন। প্রাচ্যের জ্ঞান ভান্ডার পাশ্চাত্যের পন্ডিতদের নিকট উন্মোচিত করতে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন এশিয়াটিক সোসাইটি এবং এর মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ করলেন 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' শীর্ষক একটি সাময়িকী। ইসলামি দর্শন, ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করে যাঁরা রেনেসাঁসের সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের উল্লেখ করা যেতে পারে। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ভি এ স্মিথ রচনা করলেন 'আকবর দি গ্রেট'। ডব্লিউ হান্টার রচনা করলেন 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স্'। ইসলামের উপর খ্যাতনামা পন্ডিত স্যার ই ডেনিলসন (১৮৭১-১৯৪০)

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শিক্ষা লাভের পর স্ট্রাসবার্গ এবং প্যারিসে প্রাচ্যভাষা বিশেষ করে ফারসি ভাষা অধ্যয়ন করেন। এরপর ছয় বৎসর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। ১৯০১ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ ফারসি ভাষায় অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। মন্টগোমেরি ওয়াট প্রণীত 'দি ম্যাজেস্টি দেট ওয়াস ইসলাম' এবং রেনল্ড নিকলসন প্রণীত 'দি মিস্টিক্স্ অব ইসলাম' ইসলামি দর্শনের উপর দুইটি মূল্যবান গ্রন্থ। উপমহাদেশের মুসলমান শাসনের ইতিহাস পুনরুদ্ধারে যে দু'জন পন্ডিতের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় তাঁরা হলেন স্যার হেনরি মায়ার্স এলিয়ট (১৮০৮-১৮৫৩) এবং জন ডাউসন (১৮২০-১৮৮১)। তাঁরাই প্রথম অক্লান্ত পরিশ্রম করে মধ্যযুগের ফারসি ভাষায় রচিত উৎস গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করে আটখন্ডে এ গুলির অনুবাদ করেন। অপর একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক যিনি মোগল আমলের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি হলেন উইলিয়াম আরভিন। তাঁর প্রণীত দুই খন্ডে বিভক্ত 'লেটার মুঘলস্' ১৯২১-২২ সালে প্রকাশিত হয়।

সৈয়দ আমির আলি এবং অধ্যাপক সালাহুদ্দিন খোদা বখ্শ্ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাস চর্চায় ব্রতী হন। মৌলবি আবদুল করিম 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' রচনা করেন ১৮৯৮ সালে। উদারপন্থী হিন্দু শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক ইসলাম ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব, সমাজ ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্য বিষয়ক জ্ঞান লাভের প্রবল আগ্রহ রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ধর্মের অনুশীলনের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় পথিকৃৎ ছিলেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করে। পাটনায় তিনি আরবি ভাষা শিক্ষা করেন। মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তুহফাৎ উল মুবাহ হিদ্দিন' প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোলো ইসলাম ধর্মের অনুশীলন। সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী গিরিশ চন্দ্র সেন ও কেশব চন্দ্র সেনের নির্দেশে বাংলা ভাষায় প্রথম কোরাণ শরীফ অনুবাদ করেন। তিনি সবশুদ্ধ চল্লিশ খানির ও বেশি ইসলামি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ অথবা ইসলাম ভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইসলাম চর্চায় পান্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন অমৃত লাল শীল। তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দুতে সুপন্ডিত ছিলেন এবং হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। আরবি ফারসি ভাষায় সুপন্ডিত রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭) 'রিয়াজ উস সলাতিনের' বঙ্গানুবাদ করেন। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের প্রতিভার ফসল পাঁচখন্ডে বিভক্ত 'হিস্টরি অব আওরঙ্গজেব' এবং চারখন্ডে বিভক্ত 'ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার' এখনও অদ্বিতীয় গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত।

রেনেসাঁসের যুগে ইসলামে ক্লাসিক্যাল লার্নিং বলতে প্রধানত আরবি ও ফারসি ভাষায় উচ্চমানের পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনাই বোঝায়। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষিত মুসলমান পন্ডিতবর্গ ফারসি ভাষায় কাব্য রচনায় পারদর্শিতা প্রদর্শন

করেছেন। অজস্র ফারসি কাব্য রচিত হয়েছে এ যুগে। কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর, মৌলানা আকরম আলি, মৌলানা আবদুল আওয়াল, আবদুল হাকাম মুহম্মদ ইসমাইল ইছাপুরী, মৌলানা আবুল ফতেহ আহসানুল্লাহ, মৌলানা ফয়েজুল কবির শব্‌ক্‌, জমিরুদ্দিন চাটগামী, মৌলবি দলিলুর রহমান, মৌলবি মযহারুল হক মযহার, মৌলবি আবদুল করিম অন্যতম।

রেনেসাঁসের যুগে যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম সমাজ তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করেছিলেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা থেকে জন্মলাভ করে ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাবাদর্শ। অন্ততপক্ষে দুজন মহাপন্ডিত মুসলিমের ভাবাদর্শ রেনেসাঁস যুগের মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। এঁরা হলেন আল বেরুনী এবং আবুল ফজল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে বিভিন্ন অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজে যে দ্রুত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার ফলে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কঠোরতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। এর ফলে মুসলিম সমাজের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। সঙ্গীত ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এর মধ্যে লোক সঙ্গীত ধর্ম নিরপেক্ষতাকে জোরদার করে তুলেছিল। লোক সঙ্গীতের মধ্যে বাউল গানেই ধর্ম নিরপেক্ষতা স্পষ্টরূপ লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাউল গীতিকারদের মধ্যে লালন ফকির (১৭৭২-১৮৮৮) এবং ফকির পাঞ্জ শাহ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

রেনেসাঁসের যুগে আন্ত সাম্প্রদায়িক বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। এই পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রথম আলোচনা করেছেন পাশ্চাত্য পন্ডিতবর্গ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'মিউচুয়াল ইনফ্লুয়েন্স অব মুহাম্মডান্স এন্ড *হিন্দুস ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা টি, ডব্লিউ টমাস এবং 'হিন্দু - মুহাম্মডান* ফিস্টস' শীর্ষক গ্রন্থ রচয়িতা ডেনিসন রস। পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন তারাচাঁদ এবং কালিকা রঞ্জন কানুনগো। কালিকা রঞ্জন কানুনগো প্রণীত 'ইসলাম-এন্ড ইট্‌স্ ইমপেক্ট অন ইন্ডিয়া' গ্রন্থটিতে এই ভাবাদর্শের চরমোৎকর্ষতা লাভ করেছে। রেনেসাঁসের যুগে মুসলিম সমাজ কখনও হিন্দু ও ইউরোপীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেনি। মুসলিম সংগঠন সমূহের সম্মেলনে হিন্দু ও ইউরোপীয়দেরও নিয়মিত আমন্ত্রণ জানানো হোতো এবং আমন্ত্রিতরাও উৎসাহের সাথে সম্মেলনে যোগদান করতেন।

কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিম সমাজের সাহিত্য সেবার[২] প্রকাশ ঘটেছে। এ যুগে মুসলিম সাহিত্যসেবীদের বিপুল সংখ্যক রচনা বাংলা ভাষার সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। রেনেসাঁস যুগের মুসলিম সাহিত্যসেবীদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হোলো বিশুদ্ধ বাংলায় দীর্ঘ বাক্যে গদ্যরচনা এবং ওজস্বিনী ভাষায় কাব্যরচনা। মুসলিম সাহিত্যসেবীদের মধ্যে অনেকেই গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতে রচনা

করেছেন। প্রধানত জীবনীমূলক রচনা মুসলিম সাহিত্যিকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মৌলানা আকরম খাঁ প্রণীত 'মোস্তফা চরিত' শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অনুবাদ সাহিত্যের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন মুহম্মদ নঈমুদ্দিন (১৮৩১-১৯০৮)। তিনি 'কোরান শরীফ', 'ফতুয়া-ই আলমগিরি' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। প্রবন্ধ ও আলোচনা সাহিত্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন শেখ আবদুর রহিম, মৌলানা মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মৌলানা আকরম খাঁ, কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ প্রভৃতি সাহিত্যসেবীরা। আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজ উন্নয়ন, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি। উনিশ শতকের একজন খ্যাতনামা প্রহসন রচয়িতা ছিলেন আজিম উদ্দিন মুনশী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যসেবী ছিলেন মির মোশার্‌রফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)। তাঁর রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিক ছিলেন কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২)। 'মহাশ্মশান' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কবি আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ীর (১৮৪৫-১৯১০) শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হোলো 'উদাসী'। কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩০) এর রচনাশৈলী ছিল সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। বিশুদ্ধ বাংলায় তিনি কাব্য রচনা করতেন। তিনি 'মোসলেম ভারত' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। আর্জমন্দ আলি চৌধুরী (১৮৭০-১৯১৪) একাধারে কবি, উপন্যাসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর রচিত 'প্রেমদর্পণ' বাঙালি মুসলমান লিখিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস। সৈয়দ এমদাদ আলি (১৮৭৬-১৯৫৬) ছিলেন একজন স্বভাব কবি। বাংলার কাব্যজগতে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি নিজে যেমন ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী তেমনি তাঁর ভাষারীতিও ছিল উদ্দীপনাময়ী। সৈয়দ এমদাদ আলি (১৮৮২-১৯৩৬) ছন্দোবদ্ধ ও ওজস্বিনী ভাষায় কাব্য রচনা করতেন।

মুসলিম সাহিত্যিকদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সংগঠন ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি। একটি কৌতুহলের বিষয় হোলো এই সংগঠনটি পরিচালনা করতেন আঞ্জুমানে ওলেমা। তদানীন্তন কালের খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন। সমিতির মুখপত্র ছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'। অপর দুটি সাহিত্য সংগঠন হোলো দি মুহম্মডান সোসাইটি ফর ভার্নাকুলার লিটারেচার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি। এই সংগঠন সমূহ উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন সাহিত্যের পুনরুদ্ধার এবং এর অনুশীলন রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মৌলবি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। তিনি সহস্রাধিক প্রাচীন পুঁথি পুনরুদ্ধার করেন। তিনি প্রতিটি পুঁথির উপর টীকা

রচনা করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনা 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। প্রাচীন পুঁথির আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্য বিশারদ পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বেশ কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি তিনি নিজেই সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।

রেনেসাঁসের যুগে বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। মুসলিম সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রথম সংবাদ পত্র 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালে। ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হয় 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় 'আহমদী'। 'হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। 'সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে এবং 'মিহির' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। পরবর্তীকালে মিহির ও সুধাকর একত্রীভুত হয়ে যায়। মুনশী আবদুর রহিম' মিহির ও সুধাকর' এবং 'মুসলিম হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ 'ইসলাম প্রচারক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা কলিকাতায় তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা রিয়াজুল ইসলাম প্রেস থেকে ১৮৯৬ সালে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা সাময়িকী সমূহে রাজনীতি, ইসলামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, সমাজ উন্নয়ন মূলক রচনাবলি প্রকাশিত হোতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতে মুসলিম ওস্তাদদের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ (১৮২২-১৮৮৭) ইংরেজ সরকারের নির্দেশে কলিকাতার মেটিয়াবুরুজে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। আজীবন তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলিকাতায় তাঁর অবস্থানের ফলে উচ্চাঙ্গ ও মার্গ সঙ্গীতের অনুশীলন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রেনেসাঁস যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ (১৮৬২-১৯৭২)। তিনি সঙ্গীতে স্বকীয় ঘরানা সৃষ্টি করে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁ। তিনি আযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ এর দরবারে সঙ্গীত অনুশীলন করতেন। সরোদ এবং সেতারের বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন আসাদুল্লাহ খাঁ কৌকব (১৮৬৫-১৯১৫)।

মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য বর্ধমানের নবাব আবদুল জব্বার খান বাহাদুর সি আই ই স্মরণীয় হয়ে আছেন। সম্ভবত বেগম রোকেয়া প্রথম মুসলিম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বেগম রোকেয়া নিজেও একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন। মুসলিম নারীজাগরণে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রেনেসাঁস ছিল সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম। শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী মুসলিম সমাজ সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। প্রচলিত সামাজিক অনাচার ও শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে যিনি তীব্র কষাঘাত করেছেন তিনি হলেন মৌলানা মণিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। এব্যাপারে তাঁর সমযোগীতা অভাব ছিলনা।

রেনেসাঁসের প্রভাবে মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে

থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্যান ইসলামিক আন্দোলন মুসলিম সমাজে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই আন্দোলনের পরিণতি হিসাবে মুসলিম সমাজে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। মুসলিম রেনেসাঁসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে আলেম সমাজ। এই সমাজ স্বধর্মনিষ্ঠ হলেও ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁদের মধ্যে ছিল না। ধর্মীয় জীবনে নিষ্ঠাবান এবং ধর্মপ্রচারে উৎসাহী হলেও রাজনৈতিক ব্যাপারে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতারই পক্ষপাতী ছিলেন। সমকালীন হিন্দু সমাজের নিকট থেকেও আলেম সমাজ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। মুসলিম সমাজের রেনেসাঁস শেষ পর্যন্ত পৃথক জাতিসত্তার ধারণা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়ে এক বাঙালি সমাজের অভ্যুদয় ঘটায়। এক বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় একীভূত হয়ে এক ভাষা ভিত্তিক এক বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সূত্র নির্দেশ

১) *সঞ্জীবনী*, ২৮ শে অগ্রহায়ন, ১২৯২

২) বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আনিসুজ্জমান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৭৫৭-১৯১৮), মুক্তধারা, ১৯৮৩, ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩

উনিশ শতকে বাংলাদেশে চর্মশিল্পের বিকাশ

শ্রীপর্ণা বাগচী

উনিশ শতকেব প্রথমার্দ্ধে বাংলাদেশে দেশীয় চর্ম শিল্পের প্রকৃতি ছিল পরিপূর্ণ অর্থেই প্রাচীন, অদক্ষ, শ্রমনির্ভর, ব্যয়বহুল এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি বা কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিহীন।

এই শিল্পের অর্থনৈতিক বিভাজনটি ছিল ত্রিমাত্রিক - ১) মৃত পশুর চামড়া রপ্তানি ২) এই চামড়ার বিশুষ্ককরণ ও বিজারণ এবং ৩) চর্মজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন।

চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা চামড়া পাওয়া যেত সাধারণের বাসযোগ্য এলাকা থেকে দূরে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেই সময়ে এই শিল্পের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই চামড়ার কারিগরদের বাস ছিল এবং তারা নিজেরাই চামড়া তৈরির কাজ করত।[১]

একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত পশুর দেহ থেকে ধারালো ছুরির সাহায্যে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হত। ছাগল বা ভেড়ার ক্ষেত্রে সমস্ত চামড়াটাই টেনে একেবারে বার করে নেওয়া হত। তারপর সূর্যালোকে এবং লবণ, চুন বা গাছের ছাল প্রভৃতি দ্রবণের সাহায্যে জারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই চামড়া শুষ্ক ও ছত্রাকশূন্য করা হত। এর ফলে চামড়া অনেক সময় এত শক্ত হয়ে কুঁচকে যেত যে পরে তা ভিজিয়ে নরম করা কষ্টকর হত। বরং এর চেয়ে উন্নত পদ্ধতি ছিল বাতাসে চামড়ার বিশুষ্ককরণ। অর্থাৎ একটি ফ্রেমের মধ্যে চামড়াটি টেনে বেঁধে রেখে ছায়ায় রাখা হত। তবে রৌদ্রে শুকানোর পদ্ধতিটি ছিল বহুল প্রচলিত।

অনেকক্ষেত্রে লবণমুক্ত করার জন্য সংগৃহীত কাঁচা চামড়া প্রথমে জলে ও চুনের দ্রবণে রাখা হত। তারপর বাবুল জাতীয় গাছের ছালের মধ্যে ওই চামড়া জড়িয়ে উদ্ভিদজাত দ্রবণে ভেজানো হত। কখনও আবার দ্রবণে পূর্ণ ব্যাগ বা থলির মধ্যে কাঁচা চামড়া রেখে সেলাই করে দেওয়া হত। এইভাবে যত বেশি ভেজানো হত তত ভালো চামড়া তৈরি হত। সম্পূর্ণ পরিষ্কার, তৈলাক্ত, নরম ও ব্যবহারযোগ্য চামড়া তৈরির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে সাধারণত তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সময় লাগত। সময়ের তারতম্য নির্ভর করত উপাদনের উপর, চামড়া শুকানোর সময় এবং ব্যাগ বা থলি ব্যবহারের নির্দিষ্ট

প্রক্রিয়ার উপর।[২] এর পর চামড়ার উপর রঙ করা হত। এই কাজ সম্পন্ন হত গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সাধারণের বাসস্থান থেকে দূরে, পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজন।[৩]

গ্রামাঞ্চলে চামড়া তৈরির কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল চামার শ্রেণীর। লোকালয় থেকে দূরে তাদের কুঁড়ে ঘরগুলি ছিল প্রায় বৃত্তাকারে অবস্থিত। এর মাঝখানে কূপ বা চৌবাচ্চা জাতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি থাকত।[৪] জুতো, চামড়ার বালতি বা ভিস্তি জাতীয় জিনিস তৈরি করে তারা বিক্রি করত। কখনও কখনও চামড়ার জিনিস তৈরির পরিবর্তে গ্রামের শ্মশানভূমি থেকে পশুর মৃতদেহ সংগ্রহ করার জন্য তারা জমিদারদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হত।[৫]

চামড়ার কাজ ছাড়াও চামাররা কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করত। অনেক সময় তারা মোটা কাপড় বোনার কাজ বা ঝাড়ুদারের কাজও করত। কখনও বা তারা গ্রামের অন্যান্য কাজে অনিয়মিতভাবে নিযুক্ত হত এবং এরজন্য ১/৩ ভাগ শস্য পেত। বাস্তবিক অর্থে গ্রামীণ জনসমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ার সত্ত্বেও চামার শ্রেণীর অধিকাংশ ছিল অদক্ষ শ্রমিক, নিম্নমানের জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।[৬]

বাংলার গ্রামীণ জীবনে চর্মশিল্পের ক্ষেত্রেও জাতি ও বর্ণ প্রথার প্রচলন ছিল। সাধারণভাবে গরুর চামড়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে হিন্দুদের যেমন অনীহা ছিল, শূকর শাবক প্রতিপালনে মুসলমান সম্প্রদায়ও ছিল সমানভাবে অনিচ্ছুক।[৭] অবশ্য চামড়া তৈরির নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে তারা এক সঙ্গে সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করত এবং কূপগুলি যৌথভাবে ব্যবহার করত।

গ্রামের বিভিন্ন উৎসবে নিম্ন বর্গীয়দের অনেকে বাদ্যকারের ভূমিকা পালন করত। ঢাক, ঢোল জাতীয় বাদ্য যন্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে চামড়া প্রক্রিয়াকরণে প্রযুক্তিগত যোগসূত্রটি এর থেকে অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্ভবত চামড়া তৈরির কাজে যারা নিযুক্ত ছিল তারাই বাদ্য যন্ত্র তৈরি করত এবং নিজেরাই বাদ্যকারের ভূমিকা পালন করত। এই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই চর্ম প্রস্তুতকারিদের উপজাতি উৎসবের ধারণাটি প্রতিফলিত হয়।

বাংলাদেশে চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাজনের অবস্থাটি ছিল খুবই প্রাথমিক স্তরে। গ্রামীণ জীবনে চাহিদা আছে এমন প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন সস্তা জুতো, জলসেচের প্রয়োজনীয় উপকরণ, তৈরি করত চামার সম্প্রদায়। নিম্নমানের চামড়ার ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণের স্বাভাবিক ত্রুটি প্রভৃতি কারণে অবশ্য তাদের উৎপন্ন দ্রব্য ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে কিছুটা দক্ষতা সম্পন্ন হওয়ায় গ্রামীণ মুচি সম্প্রদায় শহরাঞ্চলের চাহিদা অনুযায়ী চামড়ার তৈরি জিনিস বানাত।[৮] উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ ও দ্রুত বিস্তারের ফলে শহরকেন্দ্রিক ব্যবসা'র সঙ্গে তারা যুক্ত হয়েছিল।[৯] গ্রামজীবনেও তারা সামাজিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাইরের প্রতিযোগিতার অভিঘাতে, যার সূচনা হয়েছিল ১৮৩০ এর দশক থেকে, ধীরে ধীরে বাংলার দেশীয় চর্মশিল্পের চিরাচরিত রূপটি ভেঙে পড়তে থাকে এবং তা নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।[১০] রেলপথের সম্প্রসারণের ফলে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের সঙ্গে চামড়া উৎপাদনের প্রধান অঞ্চলগুলির সংযোগসাধন এই শিল্পের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনের সূচনা করে। রেল স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে চামড়া মজুত রাখার ব্যবস্থা শুরু হলে বন্দর এলাকার বণিকদের প্রতিনিধিরা এগুলি ব্যবসার কাজে লাগাতে থাকে।

এই সময় কলকাতায় অনেকগুলি বড় ও সংগঠিত চামড়ার কারখানা (ট্যানারি) গড়ে ওঠে এবং সেগুলি উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করে বেশি পরিমাণ চামড়া উৎপাদন করতে থাকে। এই কারখানাগুলির সঙ্গে রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিযোগিতা ক্রমশই তীব্র হয় এবং গ্রামাঞ্চল থেকে কাঁচা চামড়া অপেক্ষাকৃত বেশি দামে শহরে আনা শুরু হয়। ইংরাজ রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত মানের কাঁচা চামড়া সংগ্রহের জন্য তাদের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের অর্থ সাহায্য করতে থাকে। এর ফলে পরবর্তী কয়েক বছরে মোট রপ্তানি বাণিজ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রস্তুত তৈরি চামড়ার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে।[১১]

কলকাতায় চামড়ার ব্যবসায়ে আড়তদারদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব এই শহরকে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত করে। উত্তর ও পশ্চিমবাংলার লবণাক্ত চামড়া ছাড়াও ঢাকা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম এবং সংযুক্ত প্রদেশ থেকে প্রেরিত চামড়া কলকাতা বন্দরের মাধ্যমেই রপ্তানি করা হত। এই রপ্তানি বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল সমগ্র ভাবতের ৭২ শতাংশ।[১২]

চামড়া ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত আড়তদাররা ব্যাপারীদের অগ্রিম দিত। অনেক সময় এই অর্থের জন্য সুদ দিতে হত না। এমনকি চামড়ায় মজুত করার ব্যবস্থার জন্যও অর্থ নেওয়া হত না। এ জন্য আড়তদাররা বিশেষ ছাড় পেত।[১৩] চামড়ার দাম নির্ধারণে ব্যাপারীদের বিশেষ প্রভাব ছিল। জাহাজের ক্রেতারা আড়তদারদের মজুত ভান্ডারে এসে চামড়া বাছাই করার পর গুণমান অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে রাখত। এই কাজে তাহাদের সাহায্য করত মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিকেরা। এজন্য জাহাজী ক্রেতাদের কাছ থেকে তারা প্রতিমাসে ৫০ টাকা করে পেত।

চর্মশিল্পের এই নগরকেন্দ্রিক বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তারের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে চর্ম প্রক্রিয়াকরণের কাজটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে পরিবর্তিত সময়ের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে ব্যর্থ হয়। কাঁচা চামড়া সংগ্রহের কাজটি গ্রামীণ চামার সম্প্রদায়ের কাছে দুরূহ হয়ে ওঠে এবং গ্রামাঞ্চলে চামড়া প্রক্রিয়াকরণের কাজ অত্যন্ত সীমিত হয়। ফলে চামার সম্প্রদায় মজুরির পরিবর্তে সাধারণ শ্রমিক হিসাবে জমিতে কাজ নিতে বাধ্য

হয়।[১৪] এই সময় চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের মানসিকতার ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। তারা আরও পরিচ্ছন্ন ও লাভজনক কাজ করতে আগ্রহী হয় যদিও সেই সময় এই সুযোগ ছিল খুবই সীমিত।[১৫]

গ্রামের মুচি সম্প্রদায়ের উপর এই পরিবর্তনের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কাজের জন্য তাদের কলকাতায় তৈরি চামড়ার উপর নির্ভর করতে হত। অন্যথায় স্থানীয় অঞ্চলে তৈরি নিম্নমানের চামড়া দিয়ে তারা বাদ্যযন্ত্র তৈরি করত। আসলে উৎত্তরোত্তর প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবার ফলে বাজারে তাদের তৈরি জুতোর চাহিদা প্রায় একেবারেই ছিল না। অন্যদিকে শহরাঞ্চলের মুচি সম্প্রদায় শুধুমাত্র চামড়ার কাজের উপর নির্ভর না করে বাদ্যকর ও সহিসের বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও গ্রাম বাংলায় মুচি সম্প্রদায়ের তুলনায় চামারদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। এই সময় তাদের জীবিকা অর্জনের উপায়গুলি অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছিল। মুচিরা তখনও পশুচামড়ার রাশি, ভিস্তি ও ঘোড়ার লাগাম জাতীয় জিনিসগুলি কম খরচে তৈরি করত এবং এগুলি তখনও বাইরের প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এরপর অবশ্য কৃষিকার্যে হালকা লোহার বালতির ব্যবহার প্রচলিত হলে চামড়ার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

প্রধানত নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ, চামড়ার মত অপরিচ্ছন্ন জিনিষের ভবিষ্যত নিহিত ছিল প্রকৃত সমবায় চেতনা গড়ে ওঠার উপর। এই সময় ঢাকায় দুটি সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য ছিল পাইকারিহারে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিক্রয়কারি সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় করা। অন্য একটি সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে কলকাতার মেছুয়া বাজার স্ট্রীটে।[১৬] কিন্তু আত্মনির্ভরতা, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির অভাবে এবং দ্রব্য পছন্দের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা না থাকায় এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। চামড়া প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে দেশীয় মূলধন এবং শিল্পগঠনে সহযোগিতার অভাব অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে ওঠে।

উত্তরোত্তর প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবার ফলে রপ্তানির পরিমাণও ব্যাপকহারে বেড়ে যায় এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁচা চামড়া দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় বাংলায় গ্রামীণ অঞ্চলে চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা ঋণলাভের জন্য মহাজনদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। এই শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে কোন ধারণা, যোগ্যতা বা কৃৎ কৌশল না থাকলেও মহাজনরা ঋণ দেবার পরিবর্তে চর্মজাত দ্রব্য বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

এইভাবে বাংলাদেশে পশু চামড়ার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাজার গড়ে ওঠে। শহরের চামড়ার কারখানাগুলি আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গ্রামাঞ্চলে তাদের শাখা প্রশাখা বিস্তারে উদ্যোগী হয়। ব্যবহার যোগ্য চামড়া সংগ্রহ এবং কাঁচা

চামড়ার নিম্নমানের প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণের সম্ভাবনা যথাসম্ভব দূর করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে চামড়ার কাজে চিরাচরিতভাবে যুক্ত চামার শ্রেণীর সংখ্যা ও অনুপাত বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। পশুদেহ চর্মশূন্য করার কাজটি আব বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত থাকে না।

অন্যদিকে নগদ অর্থভিত্তিক অর্থনীতি প্রচলনের ফলে গ্রামাঞ্চলে চিরাচরিত বিনিময় প্রথার পরিবর্তে চর্মজাত দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ প্রবল হয়ে ওঠে।[১৭] উৎপন্ন দ্রব্য অর্থমূল্যে নির্ধার্য হওয়ায় গ্রামীণ চর্ম সংস্কারকারিদের পৃষ্ঠপোষকরা তা আগের মত হস্তান্তর করতে রাজি হল না।[১৮] ফলে বিংশ শতকের সূচনায় গ্রামের চামার সম্প্রদায় শহরাভিমুখী হয়। সেখানে রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের নিজস্ব ঠিকাদারদের উপপ্রতিনিধি হিসাবে অথবা শহরে চামড়ার কারখানাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে তারা বাধ্য হয়।

সূত্র নির্দেশ

১) তীর্থঙ্কর রায়, "*ফরেন ট্রেড অ্যান্ড দ্য আর্টিজন্স ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া: এ স্টাডি অফ লেদার।*" প্রবন্ধ, *দি ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিউ* ৩১, ৪ (১৯৯৪) পৃ. ৪৬২

২) তদেব, পৃ. ৪৬৮

৩) তদেব, পৃ. ৪৬৩

৪) জি. ডবল্যু ব্রিগস, *দি চামারস্*, ক্যালকাটা, ১৯২০, পৃ. ৫৬

৫) ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অবস্থাটা ছিল আলাদা। মাদ্রাজের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের বিভিন্ন জেলায় চামড়ার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত উপপ্রতিনিধিদের সঙ্গে চর্মশিল্পীদের তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। বোম্বাইতে তৈরি চামড়া কেনার বিষয়ে চর্ম ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল।

৬) জি. ডবল্যু বিগ্রস, পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ৫৬ ও ৫৮

৭) বেঙ্গল সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯২১, ভল্যুম ১, স্ট্যাটিসটিকস অন কাস্ট, পৃ. ৩৮৩

৮) সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে মুচিরা চামারদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে ছিল যেহেতু মুচিদের মৃতপশুর কাঁচামাংস স্পর্শ করতে হত না।

৯) তীর্থঙ্কর রায়, পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ৪৬৬

১০) ১৮৩০ এর দশক থেকে ইউরোপে ভারতীয় চামড়া রপ্তানির সূচনা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরোনো ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটতে থাকে। অবশ্য ১৮৭০ এর আগে পুরোমাত্রায় বাণিজ্য শুরু হয়নি। এই সময় থেকেই ইংল্যান্ডে ব্রাজিলের পরিবর্তে বাংলাদেশের চামড়া সরবরাহ প্রাধান্যলাভ করে। এইচ. টি. কোলব্রুক, *রিমার্কস অন দ্য হাজব্যানড্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল কমার্স অফ বেঙ্গল*, ক্যালকাটা, ১৮০৪, পৃ. ১১৫

১১) রিপোর্ট অফ দ্য ট্যারিফ কমিশন, অ্যাপেনডিক্স ডি, পৃ. ৩৫৪

১২) বি. আর. রাউ. *দি ইকনমিক্স অফ লেদার ইন্ডাসট্রি*, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৫, পৃ. ১২

১৩) তদেব, পৃ. ১৪

১৪) ভাগলপুর জেলায় চামারদের ৬৬ শতাংশ জমিতে এবং ২০ শতাংশ সাধারণ শ্রমিক হিসাবে কাজ নিতে বাধ্য হয়। মাত্র ৭ শতাংশ চামড়ায় কাজে থেকে যায়। তদেব, পৃ. ১০

১৫) চামড়া শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য তাদের কাছে তিনটি পথ খোলা ছিল- কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ীদের অধীনস্থ ঠিকাদারদের কর্মচারী অথবা চামড়ার কারখানায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করা এবং চামড়ার পাইকারি ব্যবসা অবলম্বন, তীর্থঙ্কর রায়, পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ৪৭৩

১৬) বি. আর. রাউ, পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ১২

১৭) জি. ডবল্যু. ব্রিগ্‌স পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ৫৪

১৮) তীর্থঙ্কর রায়, পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ৪৭২

এক্সচেঞ্জ এবং বাজার ঃ একটি তুলনামূলক অনুসন্ধান

প্রবাল বাগচী

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে সরকারি কর্তৃত্বের বাইরে সামান্য কিছু কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারটি প্রধানত ম্যানেজিং এজেন্সি দ্বারা লালিত হত। এই শতাব্দীতে অর্থনৈতিক পরিচালন-ব্যবস্থায় এজেন্সিগুলির গুরুত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে এক বিশিষ্ট ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা মনে হয়েছে। অপরিচিত, অজানা দেশে লোভের জন্য যে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ ব্রিটিশরা করেছিল, তার সম্পূর্ণ ঠিকাদারির দায়িত্ব বর্তেছিল এই 'মার্চেন্ট এ্যাডভেঞ্চার'-দের উপর।[১] এমনকি, আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের লেখায় পূর্ব ভারতে প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ ও পরিচালনের জন্য ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির প্রতি ঈষৎ প্রশংসার ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অনিশ্চিতকর ব্যবসায়িক উদ্যোগে এরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এমত ধারণাও তৈরি হয়েছে অনেকেরই মনে। অবশ্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও ঔপনিবেশিক সরকারের সমর্থন এই ঝুঁকির পরিমাণকে অনেক সময়ই লাঘব করেছিল তাও স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ পুঁজির ঝুঁকি, পরিচালন দক্ষতা ও ভবিষ্যৎকে যাচাই করে নেবার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সির ন্যায় প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এই মহলে কোনো সন্দেহ নেই। মারিয়া মিশ্র মনে করেন যে ঔপনিবেশিক পর্বে জাতিগর্ব ও দম্ভ এই এজেন্সি গুলির মধ্যে যতটা ভয়াবহভাবে সক্রিয় ছিল। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক সত্তার সাথে তা তুলনীয় নয়।[২] তদুপরি এজেন্সিগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে তীব্র ক্ষমতা ও প্রভাবিত করার যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল, তা অন্য কোনো ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা কার্টেলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ শেয়ার বেচা-কেনার ক্ষেত্রে এদের অসহনীয় উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও দেশীয় শেয়ার দালালদের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া টানটান উত্তেজনা ও সংঘাতের জন্ম দিয়েছিল।

অশোক দেশাই ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে এক্সচেঞ্জও বাজারের মধ্যে পার্থক্য রেখা টেনেছেন। প্রথম ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ক্রমস্তর লক্ষণীয় এবং এ-ক্ষেত্রে বিশেষত কলকাতায়, বিদেশী ব্রোকাররা লন্ডন ও অন্যান্য ছোট ছোট ব্রিটিশ শেয়ার মার্কেটের প্রচলিত লেন-দেন সংক্রান্ত ব্যবস্থাকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরাও নতুন ব্যবস্থার জন্ম দেবার থেকে সনাতন আদলকে নিজেদের মত গ্রহণ করাতেই সায় দিয়েছিলেন। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে যে চিত্রটি পাই তাতে দেশজ

স্বার্থের সাথে ইউরোপীয়দের সংঘাত ও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা এক্সচেঞ্জের চরিত্রের বদলে বাজারি অবিন্যস্ত ব্যবস্থাকেই মনে করিয়ে দেয়। এই পর্বে মূলধনী বাজার গড়ে ওঠার পশ্চাতে যাদের উদ্যম উল্লেখনীয়। তাদের অধিকাংশই ছিলেন স্কট ও ব্রিটিশ। অথচ শতাব্দী পরিবর্তনের আগেই মারোয়াড়ি-ক্ষত্রী সম্প্রদায় বাজারের অনেক ব্যবস্থাকেই নিজেদের সুবিধামত নতুন আদল দিতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী দালালিদের মধ্যে দূরত্ব ও সংঘাত যে মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তা ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষে কাম্য ছিল না। যদিও প্রশাসন সহজে এই বাজারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চায়নি। তথাপি উত্তেজনা প্রশমনে ও ফাটকার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ হেতু রাজন্যবর্গ আপোষপন্থার দিকেই ঝুঁকেছিলেন। যে জগৎটি সম্পূর্ণ ভাবে শ্বেতাঙ্গ প্রভাবাধীন ম্যানেজিং এজেন্সির কব্জায় ছিল। তাই ক্রমশঃ রূপ বদল করতে করতে দেশীয় বাজারের চেহারাটি ধারণ করেছিল। ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির ক্ষমতার প্রতি একচেটিয়া মনোভাব অনেকক্ষেত্রেই দেশীয় দালালদের ভিন্ন পথ 'কার্ব মার্কেটের দিকে ঠেলে দিয়েছিল সন্দেহ নাই। আইনব্যবস্থার দুর্বলতা, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য রক্ষণমূলক ব্যবস্থার অভাব, তীব্র ঝুঁকি ও সর্বোপরি সরকারি ঔদাসীন্য ম্যানেজিং এজেন্সি ও দেশীয় দালাল উভয়দেরই সুবিধা দিয়েছিল।

ম্যানেজিং এজেন্সির কর্ণধারেরা বে-সরকারি রাজনৈতিক মতামত ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। সবচেয়ে বড় কথা সাংবিধানিক স্তরে ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্বের মধ্যে এরাই ছিল নিয়ন্ত্রক। বিপরীতে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সরকারি বা বেসরকারি স্তরে এই রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী ছিল না। এদের ক্ষুদ্র অথচ সংগঠিত প্রতিরোধের শক্তি ছিল দুজায়গায়। প্রথমত এরা শুধুমাত্র শেয়ার নিয়ে ব্যস্ত থাকত না। অন্যান্য পাইকারি ব্যবসা থেকেও তারা পুঁজি সংগ্রহ করত। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ব্যবসায়ীব শৃঙ্খলের জন্যই উত্তর ভারতের বিভিন্ন গদিগুলির সাথে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ফলে প্রয়োজনমত টাকার যোগানের অভাব হত না। তথাপি কৃষিপণ্য গুদামজাত করার সময়ে টাকার টান পড়লে চড়া সুদে ঋণ নিতেই হত; বিশেষত প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলি থেকে সহজে ঋণ মেলার সুযোগ ছিল কম। এই অস্থিরতা ও ব্যবসায়িক ঐতিহ্যের জন্যই মারোওয়াড়ি ও ক্ষত্রীদের কাছে তীব্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।[৩] বিপরীত দিক থেকে অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে ফাটকা ছাড়া এদের অন্যকোন পথও খোলা ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শেয়ারের জগৎটিকে ম্যানেজিং এজেন্সি যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করত, তাতে শুধুমাত্র শেয়ার দালালিকে জীবিকা করার মত সাহস কোন ভারতীয়দের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন ব্যবসায়ীক উদ্যোগের ফাঁকে শেয়ারের ফাটকা হয়ে উঠেছিল, স্বল্প-কালীন অমসৃণ ঝুঁকি মাত্র। তবে এটাও মনে রাখা দরকার। প্রতিকূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে দেশীয় শেয়ারব্রোকাররা যে ভাবে নিত্য নতুন বিপণনীয়

কৃৎকৌশল তৈরি করেছিলেন, তা অবশ্যই গভীর অনুসন্ধানের দাবি রাখে। ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনগত সনাতনপন্থাকে আঁকড়ে রাখার জন্যই পরবর্তী সময়ে গভীর বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।[৪] পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মত পরিচালনগত মানসিকতার পরিচয় তারা দিতে পারেননি। ঔপনিবেশিক কাঠামোর সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টাও রক্ষা তাদের নিরন্তর করতে হত, যে দায় দেশীয় বণিকসম্প্রদায়কে নিতে হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই, ভারতীয় বণিকসমাজের সাথে ম্যানেজিং এজেন্সি সিষ্টেমের যে অনতিক্রম্য দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে অন্যান্য ইউরোপীয় ও মার্কিনি কর্পোরেশনগুলির সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনে ও দায়বদ্ধ হতে দেশীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অসুবিধা হয়নি।

সূত্র নির্দেশ

১) এইচ. প্রোক্টার, রিপোর্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ১৯১৩, এ্যাপেনডিকস্ ভলুম চতুর্থ, পৃঃ ২২১

২) মারিয়া মিশ্র, বিজনেস, বেস এ্যান্ড পলিটিকস ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৯৯৯, পৃঃ ৪৫-৪৭

৩) ইতিহাস অনুসন্ধান ১৫, ২০০১, পৃঃ ৩৬৫-৩৬৬

৪) এস. চ্যাপম্যান, মার্চেন্ট এন্টার প্রাইজ ব্রিটেন ফ্রম দ্য ইন্ডাসট্রিয়াল রেভোলিউশ্যন টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান, ১৯৯২

ডাকিনী ও মায়াবিদ্যা

শিবাজী কয়াল

এই পঞ্চ মহাদেশের সমাজ বিদ্যায় আজও ডাকিনী ও মায়াবিদ্যা এবং ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রচলন রয়েছে। আমরা নিজেরাও এই সকল ধারণা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারিনি। ডাইনি শিকারের সংবাদ বা বিবরণের কথা প্রায়শই দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ছোটনাগপুর ও অন্যান্য আদিবাসী সমাজে ডান-ডাইনি-ভূতে ধরা নজর লাগা এ সকল বিশ্বাসের প্রচলন বেশি মাত্রায় আছে। প্রাচীন সংস্কার এক দূরন্ত ব্যাধি। অবশ্য যদিও তা আদিবাসী সমাজ তন্ত্র-মন্ত্র অলৌকিকতা থেকে মুক্ত নয়- এই - সমাজের এই সকল ডাকিনী ইত্যাদি ধারণা কম।

ডাইনি প্রথার অর্থ নিরূপণ

ডাইনি সম্বন্ধে একটি ধারণা করতে হলে Philips Mayer এর বক্তব্য স্মরণ করা উচিত। তিনি মনে করেন যে কোন কোন সমাজে "নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে মন্দশক্তির অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয় যদিও তা কেবল অভিজ্ঞতা বলে জ্ঞাত এবং যদিও তা বৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করা যায় না যে সেই সকল ব্যক্তি হচ্ছে মন্দ শক্তির অধিকারী।"[১] ডাইনি তাহলে একজন পুরুষ বা নারী যার মধ্যে মন্দশক্তি অবস্থান করে যার সাহায্যে সে অপর ব্যক্তির ক্ষতি করে।

কাজেই ডাইনি প্রথার কথা কোন কোন সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় আমরা এই ব্যবস্থায় কিছু সাধারণ বৈশিষ্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। এক, সাধারণতঃ ডাইনিরা হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক নারী, তারা বন্ধা এবং যুবতি এবং কখন কারা খুবই বয়স্ক এবং মৃত্যুর শেষ পর্যায় উপনীত, বিকলাঙ্গ স্ত্রী বা বিধবা। দুই, তাদের দৈহিক কিছু চিহ্ন থাকে, যেমন লাল চোখ। তিন, তারা সমাজে অসুখ, মৃত্যু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা বা সংক্রামক মহামারি (Plague) সৃষ্টি করে। কি শক্তির বলে তারা এরূপ করে তার কারণ বলা কঠিন। চার. তারা নিজের প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, বিদেশীর নয়। পাঁচ, তারা গোপনে এবং, রাত্রে কাজ করে। সর্বশেষ তারা মানুষ অথচ তাদের মধ্যে অমানবিক ক্ষমতা আছে এবং তারা বিবস অবস্থায় প্রায়শই চলাফেরা করে।

উনবিংশ শতাব্দীর ছোটনাগপুরে ডাইনিপ্রথা

পিছন দিকে তাকালে ছোটনাগপুরে আমরা দেখি ডাইনিরা কল্পনা জগতে নয়, বাস্তব জগতে চলা ফেরা করছে। ডাইনিদের কুনজর যা অশুভ দৃষ্টির যে বিরাট প্রভাব আছে তা মুন্ডারা খুবই বিশ্বাস করত।[২] ওরাওনরা (Oruon) অনুরূপ ধারণায় বিশ্বাসী। তারা খুবই ডাইনি (Witches) এবং বিসাহস (Wizards) দের বিশ্বাস করে যাদের কুনজর ও মন্দভাষণ হচ্ছে দেহিকরণের লক্ষণ (Human embadime) এবং যার সাহায্যে বা কোন অনুগত ভূতের বা ডাইনকুরি ভূতের সাহায্যে তারা তাদের শত্রুদের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু অপর কোন ডাইনের নয়।[৩] কোন বংশ বা পরিবারজনের বা সে পরিবারের গোরুদের বার বার অসুস্থতায় পড়ছে দেখে ডাইনি সন্ধানির বা শোখার বা ভগত বা Matis বা Deonras এর খোঁজ করা হয়। শেখা মন্ত্র পাঠ করে এবং নিজের দেহ দোলায় এবং যখন তার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় তখন সে বলে যে সে ক্ষতিকারক ডাইনিকে দেখেছে যে অপর একজন প্রেতের সাহাযে এই চরম দুর্দশার সৃষ্টি করেছে। মুন্ডারা এবং ওরাওনগণ এইরূপ ধারণায় বিশ্বাস করতো। ১৮৫৯ সালের Judicial Returns থেকে জানা যায় যে এই সালে ৫৯ ডাইনিকে হত্যা করা হয়েছিল এবং এই হত্যার সঙ্গে ২১৮ ব্যক্তি জড়িত ছিল। অবশ্য অনুমান করা হয় যে এ ব্যাপারে ৫০ জনকে হত্যা করা হয় ১৮৫৭ এবং ১৮৫৮ সালে সরকারি ক্ষমতা সাময়িকভাবে প্রত্যাহৃত হয়েছিল।" সরকারি ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পরেও প্রায় প্রতিটি মুন্ডা গ্রাম গোপনে ডাকিনী বিদ্যার চর্চা করতো।[৫]

ডাইনি প্রথার ব্যাখ্যা

Witchery বা ডাকিনী-বিদ্যার সঠিক বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকরা করেননি। কাজেই মুন্ডা এবং ওরাওনরা ডাকিনী-বিদ্যার অনুশীলন কেন করতো এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন ডাইনি প্রথা হচ্ছে এমনই একটি ঘটনা যার গভীর বা পরোক্ষ ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। Evans Pritchard এই ভাবে Azande ডাইনি প্রথার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৬] কিন্তু প্রতিটি সমাজে কোন ঘটনা স্বাভাবিক এবং কোন ঘটনা অস্বাভাবিক তা যথাযথ ভাবে নির্দিষ্ট করা কঠিন। সিংভুমে ১৮৫৭-৫৮ তে কোলরা যখন মনে করলো তাদের স্বাধীন অধিকার আছে কোন কিছু করতে, Tirkicolehin এবং তাঁর কন্যা Mussamut Boodhi কে কলঙ্কিত করেছিল Sagur নামক এক ব্যক্তি যে Tirki এবং Mussamut হচ্ছে ডাইনি এবং তাঁর পুত্র Moodho এবং Kandeyর কন্যার মৃত্যুর কারণ। দুই জনেই মনে করলো এই মৃত্যু অস্বাভাবিক এবং তারা ডাইনির সন্ধানে রোজার সাহায্য নিল। তার সন্ধান পেলে পর Tirki কে কুঠার এবং তলোয়ার এবং Boodhi কে একটা বিরাট পাথর দিয়ে মারে।[৭] যারা মুন্ডা

এবং ওরাওন নয় তারা Sagur এর পুত্র এবং Kandey-র কন্যার মৃত্যুর ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিত।

ডাইনি প্রথার বিশ্লেষণে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রবণতা সাহায্য করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডাইনি প্রথাকে। ব্যক্তির অস্বাভাবিক অসুখে তুমি হয়তো মনে করবো, অসুখ প্রকৃতই অস্বাভাবিক, কিন্তু আমি কিছু অস্বাভাবিক দেখবো যায় না। মুনগির জেলার ১৮৮৭ সালের Police Report-এ একজন নারীর? মনে করেন এই নারী ডাইনি এবং সে তাকে বশ করেছে এবং সে শীঘ্র কলকাতায় পালায়। কলকাতা থেকে ফিরে এসে সে এই নারীকে ছুরি দিয়ে হত্যা করে।[৪] এই নারীর হত্যা শ্যালকের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জন্মায়।

ডাইনি রোজা (Witch Doctor)

এরা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুন্ডা যারা কোন এক সময়ে হিন্দু ছিল। এঁদের কাজ হচ্ছে ডাইনি কে, তা নির্ধারণ করা এবং ডাইনির সমাজবিরোধী কাজের প্রতিরোধ করা। এঁদেরকে Sokha বা Sadan ও বলা হত এবং তাঁরা মনে করে তাঁরা এই শক্তি বা ক্ষমতা লাভ করেছে Singbongaর অনুগ্রহে নয়, বরঞ্চ মহাদেও এবং Ganga Maiর কাছ থেকে। তিনি মুন্ডারি ভাষা ব্যবহার করতেননা তাঁর কার্যকলাপে। তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির বলে ডাইনি কে, তা স্থির করতেন। সরকারি দলিলে Sokha কে Angur বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ডাইনি সন্ধানের যজ্ঞের কর্মকর্তা।[৯] এই কারণে তাঁকে সকলে সম্মান করতো।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে Sokhaর সঙ্গে পরামর্শ করলে তিনি ১ টাকা বা ১ টাকা চার আনা পেলে খুশি হতেন এবং ডাইনির সন্ধান দিলে দশ থেকে পনেরো টাকা ছিল তাঁর পারিশ্রমিক । এখন তার পারিশ্রমিক বেশি।[১০]

Sokha বা Bhagat ছাড়াও আমরা Deonras বা Matis দের কথা শুনতে পাই। তারা ছিল একটু নিম্ন শ্রেণীর। রোজাকে দিয়ে ডাইনি প্রকৃত অপরাধী কিনা সে কাজ শুরু হয়। Sokha তার প্রথা অনুসারে কাজ করে। এই প্রথার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রেত (offended sprit) সন্ধান দিলে পর তাকে যজ্ঞের মাধ্যমে খুশি করা হলে পঞ্চায়েত ডাইনির জরিমানা স্থির করে। ডাইনি যদি অস্বীকার করে যে সে এই কাজ করেনি তাকে বার বার আঘাত করা হয়, তার জমি কেড়ে নেওয়া হয় এবং কখনও তাকে হত্যা করা হয়। ১৮৫৭ সালে সিংভূমে Sorbeal একটি শিশুর মৃত্যুর হলে Sokhaর সাহায্য নেওয়া হয়। Sokha ঘোষণা করে যে Tirki হচ্ছে ডাইনি এবং তাঁর মৃত্যু স্থির হলো। Bootey তাঁকে কুঠার দিয়ে শেষ করে দিল এবং Tirki কন্যাকে পাথর দিয়ে।

ডাইনি প্রথা এগুলি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট। অন্ততঃ উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ ছিল।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দুটি উপসংহারে আমরা আসতে পারি। এক, ডাইনি প্রথার মূল মুন্ডা এবং ওরাওন সমাজে প্রবেশ করেছে। দুই, উনবিংশ শতাব্দী থেকে তাদের এই প্রথায় বিশ্বাস। ফলে এই প্রথা প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছে।

সূত্র নির্দেশ

1) Mayer, Philip, witches in witches and sorcery, ed. Max Marwick, P55, Sueffolk, 1982.
2) Roy, Sarat Chandra, The Mundas and their country, p. 278, Bombay, 1912.
3) Roy, Sarat Chandra, Or on Religion and customs p. 188 Calcutta, 1972.
4) Letter of A. Money, Officiating Secretary, Government of Bengal to the Commissioner of Chotanagpur, 24th August, 1860.
5) Sachchidananda, The Changing Munda, p. 279, New Delhi, 1979.
6) Pritchard, E.E. Witchcraft. oracles and Magic Among the Azande, Uarendon press, 1937.
7) Letter of Dalton, Commissioner of Chotanagpur to W. S seton karr, Officiating Secretary, Government of Bengal, 7th December, 1860.
8) Report on the police of the Lower provinces of Bengal presidency for the year 1887.
9) Reply of commissioner Dalton to A. R. Young, secretary, Government of Bengal, June, 1860.
10) Hoffman, John, Encyclopaedia Mundarica, vol. XIII, Patna, 1941.
11) Letter of Commissioner Dalton to W.S. Seton karr, officiating Secretary, Government of Bengal, 7th December, 1860.

দৈনিক "কলকাত্তা সমাচার" (১৯১৪-২৫) এবং পণ্ডিত ঝাবরমল্ল শর্মা

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় হিন্দি দৈনিক পত্রিকার প্রকৃত পরম্পরা শুরু হয় হিন্দি বঙ্গবাসী (১৮৯০ সালে সাপ্তাহিক এবং পরবর্তী কালে দৈনিক), 'ভারতমিত্র' (১৮৯৭) এবং 'কলকাত্তা সমাচার' (১৯১৪) - এই তিনটি পত্রিকা থেকে।

১৯১৩ সালে মারবাড়ি রিলিফ সোসাইটির কয়েকজন সভ্য সনাতনধর্ম রক্ষা এবং ব্যবসায়ীদের হিতার্থে যে হিন্দি দৈনিক প্রকাশের কথা ভাবেন তার নাম 'কলকাত্তা সমাচার', এবিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতা প্রবাসী মারবাড়ি ব্যবসায়ীদের প্রথম সংস্থা মারবাড়ি অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বাবু রঙ্গলাল পোদ্দার। এরই ফলশ্রুতি কলকাত্তা সমাচার লিমিটেড কোম্পানি, যার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন বিশিষ্ট মারবাড়িরা।

কিন্তু এই পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই এর প্রাণপুরুষ ছিলেন ঝাবরমল্ল শর্মা। প্রথম দিকে সম্পাদকের নাম ছাপা না হওয়ায় প্রকৃত সম্পাদক কে ছিলেন এ বিষয়ে কিছুটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে ডঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্র লিখেছেন যে, ঝাবরমল্ল ছিলেন পত্রিকার মুদ্রাকর, প্রথম সম্পাদক ছিলেন অমৃতলাল চক্রবর্তী।[১] শ্যামসুন্দর শর্মার মতে প্রথম থেকেই ঝাবরমল্ল শর্মা সম্পাদক। শ্যামসুন্দর ঝাবরমল্লর একটি রচনা[২] থেকে এই তথ্যটি পেয়েছেন।

'কলকাত্তা সমাচার' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ভারতমিত্র সম্পাদক অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ী 'কলকাত্তা সমাচার'কে আঘাত করে লিখতেন। এমনকি পরবর্তীকালেও তিনি এর গুরুত্ব স্বীকার করতে চাননি।[৩] তার মূল্যায়ন যে সঠিক নয় তা 'কলকাত্তা সমাচার' এর ফাইল দেখলেই বোঝা যায়। 'কলকাত্তা সমাচার' 'বুঢ়ে ভারতমিত্র কা প্রলাপ' কলম লিখে অম্বিকাপ্রসাদের সমালোচনার জবাব দিত। পন্ডিত গোবর্ধনলাল গোস্বামী 'কলকাত্তা সমাচার' এ 'মনসুখা কে মনসুবে' কলম লিখতেন 'প্রেম' ছদ্মনামে- 'ভারতমিত্র' তে জগন্নসাপ্রসাদ চতুর্বেদী এর সমালোচনায় ব্যঙ্গ কলম 'বিচার বৈচিত্র্য' লিখতেন।

১৯১৪ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে ১৯২৫ এর ৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত 'কলকাত্তা সমাচার' এর জীবনকাল। আন্তর্জাতিক স্তরে এই সময়ের প্রধান ঘটনা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ; জাতীয় স্তরে ছিল ১৯১৯ সালের রাওলাট সত্যাগ্রহ ও ১৯২১ সালের অসহযোগ

আন্দোলন। এই সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও অব্যাহত ছিল। এইসব খবর এবং এসম্পর্কে মন্তব্য 'কলকাত্তা সমাচার' এ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল।

'কলকাত্তা সমাচার' এর প্রথম সম্পাদকীয় লিখেছিলেন পন্ডিত রাধাকৃষ্ণ মিশ্র। 'হমারা উদ্দেশ্য' নামক এই সম্পাদকীয়তে লেখক বলেন, এই পত্রের প্রথম উদ্দেশ্য মাতৃভাষা হিন্দির উন্নতি করা, বাণিজ্যের আলোচনা এবং বিশ্বের তাজা খবর পরিবেশন। এই পত্র নিরপেক্ষভাবে সমস্ত পক্ষের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করবে— অপ্রিয় অসত্যভাষণে কখনো পরাঙ্মুখ হবেনা। এই পত্রিকা ছিল সনাতনধর্মের সমর্থক; স্বদেশী ও স্বরাজ্যের স্বপক্ষে এখানে লেখা হত।

পিতামহ ও পিতার মত ঝাবরমল্ল কলকাতায় এসেছিলেন আয়ুর্বেদ চর্চা করার উদ্দেশে। সেজন্যই ১৯০২ সাল নাগাদ তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিরাজ গণনাথ সেনের কাছে তিন বছর আয়ুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকালীন কলকাতার উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দি সাংবাদিক দুর্গাপ্রসাদ মিশ্রর সংস্পর্শে এসে তিনি সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কলকাতার কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে জাতীয়বাদী ভাবনা প্রচার করতে থাকেন। ডঃ মুরারিলাল গোয়েল লিখেছেন, ১৯১১ সালে প্রয়াগে পন্ডিত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্রর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে ঝাবরমল্ল বহু বিশিষ্ট হিন্দি চিন্তাবিদের সম্পর্শে এসে হিন্দি সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেন, যার ফলশ্রুতি 'কলকাত্তা সমাচার' এর সম্পাদনাভার গ্রহণ।[৪]

কলকাত্তা সমাচার ব্রিটিশ বিরোধী এবং জাতীয়তাবাদী ভূমিকা পালন করলেও সমকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' ও 'বিশ্বামিত্র' হিন্দি দৈনিক দুটির ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকা ছিল অনেক তীব্র। এ দুটি পত্রিকা ছিল অসাম্প্রদায়িক। অন্যদিকে 'হিন্দি বঙ্গবাসী' জাতীয়তাবাদী পত্রিকা হলেও ছিল সনাতনধর্মী ও রক্ষণশীল। মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল দৈনিক ভারতমিত্র। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, 'কলকাত্তা সমাচার' এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছিল সম্পাদক ঝাবরমল্ল শর্মার ঋজু ব্যক্তিত্ব, প্রখর আত্মসম্মানবোধ ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেম। হিন্দু সনাতনধর্মী হওয়া, স্বত্ত্বেও পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ কখনো তার রচনায় দেখা যায়নি, হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকাশে আনন্দিত হয়েছেন, সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তার লেখনী ছিল সরব, নারী নির্যাতনকারীদের ভর্ৎসনায় মুখর হয়েছিল 'কলকাত্তা সমাচার' এর পৃষ্ঠা।

'কলকাত্তা সমাচার' প্রকাশের সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের তাজা খবর জানার জন্য কলকাতার ব্যবসায়ীরা আগ্রহী ছিল। মুলচন্দ্র অগ্রবাল লিখেছেন, 'বিশ্বামিত্র' (১৯১৭) র মত নতুন দৈনিকের উন্নতির এও এক কারণ।[৫] সুতরাং 'কলকাত্তা সমাচার' এর উন্নতির পিছনেও এই কারণ সক্রিয় ছিল মনে করা যায়। ঐ সময় দিনে দু তিনটি

সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ করত 'কলকাত্তা সমাচার'।[৬] যুদ্ধের সময় ছাপার কাগজের দাম বাড়ে। তাও ঘাটতি উঠিয়েও 'কলকাত্তা সমাচার' পাঠকদের চাহিদা পূরণ করত।[৭] অবশ্য মুলচন্দ্র ঐ সময় 'কলকাত্তা সমাচার' ও 'ভারতমিত্র' - দুই-এরই ঘাটতিতে চলার কথা লিখেছেন।[৮] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ রাওলাট আইন এবং পাঞ্জাব হত্যাকান্ডের ঘটনা সংবাদপত্রের বিক্রি প্রচুর বাড়িয়ে দেয়।

'কলকাত্তা সমাচার' এর প্রথম অঙ্ক অর্থাৎ ১৯১৪ সালের ১৪ই আগষ্টের প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে এবং চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম দেড় কলম জুড়ে "ইউরোপকে মহাভারতকা পুরা বিবরণ" অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা আছে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় রয়েছে "লড়াইকে তাজেদার সমাচার"। 'কলকাত্তা সমাচার' যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের বিজয়কামনা করেছে,[৯] এবং কলকাতার বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারের বিজয়কামনায় আয়োজিত প্রার্থনাসভার বিবরণ প্রকাশ করেছে।[১০]

'কলকাত্তা সমাচার' এ যুদ্ধের সময় যেসব ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়ায়নি তাদের স্বাগত জানানো হচ্ছে।[১১] মানুষকে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মিথ্যা গুজবে কান না দিতে বারবার সতর্ক করে দিয়েছে 'কলকাত্তা সমাচার'।[১২]

বাজার দখলকে এই যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছে 'কলকাত্তা সমাচার'।[১৩] ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 'কলকাত্তা সমাচার' উপদেশ দিচ্ছে তারা যেন টাকাকে গিনিসোনায় পরিণত না করে সস্তায় পাট কিনে যুদ্ধশেষে সুয়েজের পথে রপ্তানি করার ব্যবস্থা করে, যেহেতু অর্থাভাবের কারণে যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হবে।[১৪]

যে 'কলকাত্তা সমাচার' যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষকে সমর্থনের জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে এবং বলছে, "ব্রিটিশ রাজ্যে আমাদের সর্ববিধ উন্নতি হয়েছে," "আমাদের অভাব-অভিযোগ ইউরোপে পূর্ণশান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা উচিত",[১৫] সেই "কলকাত্তা সমাচার" এই 'কোমাগাতামারু' জাহাজের ঘটনা নিয়ে আলোচনায় ক্ষীণভাবে হলেও সরকারের কাজের সমালোচনা দেখা যায়।[১৬] ১৯১৪ সালেই 'কলকাত্তা সমাচার'-এ লেখা হয়েছিল, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত হওয়া ভারতবাসীর কর্তব্য।[১৭]

সাধারণভাবে 'কলকাত্তা সমাচার' কংগ্রেস সমর্থক হলেও রাজনৈতিক উগ্রপন্থার প্রতি বিরূপ ছিলনা, তার প্রমাণ অরবিন্দ ঘোষের বক্তব্য প্রকাশ।[১৮] এছাড়াও, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশও এর প্রমাণ।

১৯২০ সালে ঝাবরমল্লর নির্ভীক প্রয়াস ছিল "ভারতীয় দেশভক্তদের কারাবাসের কাহিনী" রাজস্থান পুস্তক এজেন্সি থেকে প্রকাশ করা বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, এর জন্য তিনি সরকারের কোপভাজন হন।[১৯] ঐ বছরই তিলকের মৃত্যু হলে ঝাবরমল্ল 'তিলকগাথা" কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন।[২০]

১৯১৫ সালে গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। গান্ধীকে ভারতে কিভাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল 'কলকাত্তা সমাচার' তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে।[২১]

ঝাবরমল্ল শর্মা গান্ধীর অনুরাগী হলেও অরবিন্দ ও তিলকের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অরবিন্দের সংসর্গেই তিনি বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। 'কলকাত্তা সমাচার' এ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের, পিস্তল পাওয়ার ও গ্রেপ্তারির সংবাদগুলি খুবই প্রকাশিত।[২২]

হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার[২৩] সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য যখন আলিপুর জেলে বন্দী ছিলেন সেসময় তার বাড়ির লোকেরাও তাকে বংশের কলঙ্ক বলতেন, ঝাবরমল্ল ঐ সময় প্রতিদিন জেলে তার জন্য খাদ্য নিয়ে যেতেন।[২৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই সরকার ভারতরক্ষা আইন পাশ করে। এই আইনবলে সরকার বাংলার প্রায় ৮০০ ব্যক্তিকে অস্বাস্থ্যকর গন্ডগ্রামে অন্তরীণ করে রাখে।[২৫] 'কলকাত্তা সমাচার'এ ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারির প্রচুর সংবাদ প্রকাশিত হত।[২৬]

কলকাতার অনেক পুলিশ অফিসারকে বিপ্লবীরা হত্যা করার হুমকিসহ চিঠি পাঠানোর এবং বিদ্যুৎস্তম্ভে হুমকির নোটিস লাগানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ 'কলকাত্তা সমাচার' দিয়েছে।[২৭] বিশালমোটা অক্ষরে শিরোনাম দিয়ে এই সংবাদ প্রকাশ করার অর্থ জনমতকে বিপ্লবীদের প্রতি আকৃষ্ট করা।

যুদ্ধের পরে ভারতীয়রা স্বায়ত্তশাসন লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্রিটিশ পক্ষকে সাহায্য করেছিল। সে আকাক্ষা তো পূর্ণ হলই না, উপরন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে যুদ্ধকালীন সংকটের দোহাই দিয়ে ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ রাওলাটআইন পাশ হল। সমগ্র ভারতে এই আইনের বিরূদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনের পরে এত ব্যাপক আন্দোলন হয়নি।[২৮] 'কলকাত্তা সমাচার' থেকে জানা যায়, ঐসময় কলকাতার হিন্দিভাষী সমাজ এবং মুসলিমরাও কি ব্যাপকাকারে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।[২৯]

ঐ সময় 'কলকাত্তা সমাচার' এর সম্পাদকীয়তে সত্যাগ্রহ নিয়ে আলোচনা রয়েছে।[৩০] রাওলাট সত্যাগ্রহ কলকাতায় হিংস্ররূপ ধারণ করেছিল।[৩১] রাওলাট আইনের বিরূদ্ধে কলকাতায় যে গণ আন্দোলন হয়েছিল এবং পুলিশের গুলিচালনায় কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল তার প্রতিবাদে 'কলকাত্তা সমাচার' এর মত 'ভারতমিত্র'ও সোচ্চার হয়েছিল।[৩২]

শান্তিনিকেতন থেকে ১২ই এপ্রিল, ১৯১৯ এ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে যে চিঠি পাঠান তার হিন্দি অনুবাদ 'ভারতমিত্র'-র মতই 'কলকাত্তা সমাচার' অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছিল।[৩৩] ঐ চিঠিতে তিনি আত্মিক শক্তি দিয়ে পশুশক্তিকে পরাজিত করতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠির শিরোনাম হিসাবে 'কলকাত্তা সমাচার' বেছে নিয়েছিল তার চিঠির দুটি বাক্য যা থেকে পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়- "যারা কাউকে হত্যা করেনি তাদের উপর গোলাবর্ষণ করতে লজ্জা হয়না," এবং "স্বাধীনতা ভিক্ষা করে পাওয়ার বস্তু নয়" (বড় অক্ষরে লেখা)।

রাওলাট আইনের বিরূদ্ধে অন্য সংবাদপত্র কি লিখেছে তাও উদ্ধৃত করা হত এবং পাঞ্জাবের সংবাদ বিস্তৃতভাবে ছাপা হত। এছাড়া, পাঞ্জাব বিষয়ে 'কলকাতা সমাচার' এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, যদি গান্ধীকে পাঞ্জাবে যেতে বাধা না দেওয়া হয় তাহলে পাঞ্জাবের সব হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে যাবে। তবে আত্মিক শক্তির মূল্য বোঝা মাইকেল ও' ডায়ারের পক্ষে সম্ভব নয়।[৩৪]

'অমৃতবাজার পত্রিকার ১০ই ও ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ এর রচনার জন্য ৫০০০ টাকার জামিন বাজেয়াপ্ত করার সংবাদ বড় অক্ষরে প্রকাশ করেছে 'কলকাত্তা সমাচার'[৩৫] আবার 'বেঙ্গলি', 'লীভার' প্রভৃতি গরমদলীয় পত্রের মোসাহেবি করাকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে, এবং 'অমৃতবাজার' এর স্পষ্ট বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়েছে।[৩৬]

রাওলাট আইনের প্রতিবাদে মারবাড়িয়া অংশ নিলে বাংলার ছোটলাট লর্ড রোনাল্ডসে যখন এই ধমকি দেন যে "মারবাড়িরা যেন মনে রাখে যে, তারা যেখান থেকে এসেছে তাদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে," তখন তার উত্তরে ঝাবরমল্ল 'কলকাত্তা সমাচার' এ 'গবর্ণর কা গুস্‌সা' সম্পাদকীয় লিখলেন।[৩৭] এর জন্য সরকার 'কলকাত্তা সমাচার' এর নিকট থেকে ২০০০ টাকা জামিন চাইলে 'কলকাত্তা সমাচার' এর কর্তৃপক্ষ কিছুদিনের জন্য কাগজ বন্ধ করে দেন। ঐ সময় পত্র বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ঝাবরমল্ল শর্মা যেন প্রিয়পুত্রের মৃত্যুশোক অনুভব করেছিলেন।[৩৮]

১৯১৩ সালের Criminal Low Amendment Act এবং ১৯১৪ সালের Defence of India দ্বারা ১৯১০ সালের আইনকে কঠোরতর করা হয়েছিল। ১৯১৭ এর ৫ই মার্চ মি. হর্নিম্যানের নেতৃত্বে লর্ড চেমসফোর্ডের কাছে প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের এক ডেপুটেশন যায়, উদ্দেশ্য ছিল তাকে প্রেস অ্যাক্টের কঠোর প্রকৃতি উপলব্ধি করানো। কিন্তু চেমসফোর্ড এতে প্রভাবিত হননি।[৩৯] এই ডেপুটেশনের স্মরণে ১৯২১ এর ৫ই মার্চের 'কলকাত্তা সমাচার' এ এই আইনের বিরূদ্ধে সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলা হয়েছে।

অসহযোগ আন্দোলন বাংলায় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল 'কলকাত্তা সমাচার' থেকে জানা যাচ্ছে। ১৯২৪ এর ২০শে জুলাই বাংলার কট্টর অসহযোগী দল বাংলায় বিশুদ্ধ অসহযোগের কার্যক্রম পূর্ণ করার কাজ করবে। এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।[৪০]

বড়বাজার জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ অধিবেশন হবে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে, মেয়েদেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। গান্ধীর আদেশ অনুযায়ী চরকা ও খাদির প্রচলনের জন্য অগ্রবাল মহাসভায় আলোচনাসভা আয়োজিত হয়েছে।[৪১] বড়বাজার কুমা'রসভা পুস্তকালয়ে "ভারতের বর্তমান অবস্থায় চরকা উপযুক্ত নাকি মিলবস্ত্র"- এই মর্মে একটি আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়।[৪২]

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হত। আন্দোলনের কর্ণর স্বামী বিশ্বানন্দকে প্রশংসা করা হয়েছে আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য।[৪৩] এই সত্যাগ্রহ নিয়ে নানারকম গোলমাল এবং মতবিরোধ চলছিল।[৪৪] দেশবন্ধু সম্বন্ধে যেসব অমূলক গুজব রটানো হচ্ছে (অর্থলোভ ইত্যাদি) তা না শোনার জন্য 'কলকাত্তা সমাচার' আবেদন জানিয়েছে।[৪৫]

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক চা বাগানের কুলিদের উপর অবিচারের বিরূদ্ধে 'কলকাত্তা সমাচার' কুলিদের সমর্থন করেছিল।[৪৬] অক্টোবর ১৯২৩ এবং জানুয়ারি ১৯২৪ এ বাংলা সরকার ভারত থেকে বিদেশে প্রেরিত কুলিদের কলকাতার ডিপোগুলি নিরীক্ষণ করা এবং সেবিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য দুটি কমিটি নিযুক্ত করেছিল। রামদেওজী চোখানি দুটি কমিটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। কারণ, তিনি দেশের বাইরে যাওয়া ভাইদের অসুবিধা দূর করতে পারবেন এই আশায় নিযুক্তি স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ কাজ করতে পারেননি, সেজন্য ইস্তফা দিয়েছেন। তার মতে, ভারতীয়দের বিদেশে পাঠানো দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।[৪৭]

হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিষয়ে 'কলকাত্তা সমাচার' সম্পূর্ণ না হলেও মোটামুটি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে ১৯২৪ এর সেপ্টেম্বরে যে দাঙ্গা হয়েছিল তা বহুদিন পর্যন্ত ভারতের সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের পথে বাধাস্বরূপ হয়েছিল।[৪৮]

'কলকাত্তা সমাচার' কোহাটের দাঙ্গার বর্ণনা প্রসঙ্গে 'মিলাপ' পত্রিকার বর্ণনা তুলে দিয়েছে— "কোহাটকে বাহাদুর হিন্দু - আগ না লাগতী তো ডাকু পরাস্ত হোতে— মন্দিরকী রক্ষামে ৫০০ কো মারকর ৫০ মরে — পুলিশ অউর পলটনিয়োঁপর হিন্দুয়োঁকো লুঠনেকা অভিযোগ-কোহাট না বসেগা-না খানেকো অন্ন অউর না ঘর বনানেকো রূপেয়া।" পরিশেষে এক সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বেদনা প্রকাশ করা হয়েছে, যা ধর্মীয় গোড়ামির পরিচয় বহন করেনা।[৪৯]

"পুলিশ অউর দাঙ্গে" শীর্ষক একটি কার্টুনে দাঙ্গা শুরু হলে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নরত পুলিশ এবং দাঙ্গা শেষ হলে দাঙ্গাকারীদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণে রত পুলিশকে চিত্রিত করা হয়েছে।[৫০]

কলকাতার রক্ষণশীল সংস্থা অগ্রবাল সভা ও কালীঘাটের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সম্মিলনী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বিলেত ফেরত হিন্দুরা প্রায়শ্চিত্ত করলেও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেনা।[৫১] 'কলকাত্তা সমাচার' এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, যার মর্মার্থ হল একমাত্র অধিকতর অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া বিদেশযাত্রার আর কোনও প্রয়োজন নেই।[৫২] 'কলকাত্তা সমাচার' বিদেশযাত্রার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও বক্তব্য রাখেনি।

সাধারণভাবে সামাজিক বিষয়ে 'কলকাত্তা সমাচার' তথা ঝাবরমল্ল শর্মার দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল ছিল বলেই মনে হয়; এমনকি আর্যসমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলনের বিরূদ্ধেও এখানে বক্তব্য রাখা হয়েছে।[৫৩] একই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'কলকাত্তা সমাচার' লালা লাজপত রাই-এর লেখা বই "পতিতৌ কী শুদ্ধি সনাতন হ্যায়"-এর বিরোধিতা করেছে।[৫৪] লালাজীর মতে, জাতিভেদই ভারতের অবনতির কারণ। 'কলকাত্তা সমাচার' জাতিভেদের সমর্থক, এবং বলছে, জাতিভেদ প্রথা হিসাবে ক্ষতিকারক নয়, এই প্রথার অপপ্রয়োগই নীচ জাতির প্রতি উচ্চজাতির অত্যাচারের কারণ। জাতিভেদের বিরোধী ব্রাহ্মসমাজকে সমালোচনা করে পত্রিকাটি বলছে, ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদকে উচ্ছেদ করতে পারলেও তার চাইতেও নিকৃষ্ট অর্থকৌলীন্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

নারীদের বিষয়ে 'কলকাত্তা সমাচার' এ প্রকাশিত একটি চিঠির বক্তব্য থেকে এবং এর শিরোনাম চয়ন করা থেকে বোঝা যায় পত্রিকাটির রক্ষণশীল মনোভাব।[৫৫] পত্রলেখক দারুকার মতে, নারী শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীন থাকবে। এ থেকে বিচ্যুত হলেই তাদের বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে।

মদ্যপানের কুফল সর্ম্পকে সমাজকে সচেতন করার জন্য 'কলকাত্তা সমাচার' কার্টুন প্রকাশ করেছিল। বাংলা পত্রিকা 'নায়ক' থেকে কার্টুনটি নেওয়া হয়েছিল।[৫৬] সুরার বোতলটিকে আঁকা হয়েছে একজন কুরূপ ব্রিটিশ রূপে, ঐ ব্যক্তি আস্ফালন করছে এবং গান্ধী ভর্ৎসনা করছেন—

সুরা— মুঝে কৌন হ্যায় বুরী বতাতা মেরী রক্ষক হ্যায় সরকার।

বাবুবিবি রাজা রানী সবহী হ্যায় মেরে দিলদার ।

মহাত্মা গান্ধী — চুপহো জ্যা রাঁঢ় দৌড় জা অবতু কিয়া কাম সব বন্টাতার।

ধন অউর ধর্ম হড়প কর জলা ধিক ধিক হ্যায় তুঝকো সৌবার।

১৯২১ এ অসহযোগের প্রভাবে সুরাপান বন্ধ করার আন্দোলন বিষয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'সাম্যবাদী' পত্রিকাতেও লেখা হচ্ছিল।[৫৭]

নারী নির্যাতনের বিরূদ্ধে 'কলকাত্তা সমাচার' ছিল সোচ্চার। এই পত্রিকার ১৯২৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল— "মুসলমান গুন্ডোঁকা জুলুল; হিন্দুদেবীকী হৃদয়বেধক কহানী ঃ মৈমনসিংহমেঁ বলাৎকারকে সৈকড়োঁ মামলে ঃ হিন্দুয়োঁ কায়রতা ছোড়ো"। ঐ তারিখেই আরেকটি সংবাদ ছিল— "গোরে ম্যানেজারকী শয়তানী। হিন্দুস্থানী দেবীকা সতীত্বহরণ ঃ বদমাশকা কুল ১ বর্ষকা কারাবাস! ভারত সরকার ক্যা চুপ রহেগী?" মালয়ে কর্মরত দক্ষিণ ভারতীয় নারী শ্রমিকের উপর শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার কর্তৃক অত্যাচারের ঘটনা, তৎসহ ম্যানেজারের শাস্তির ঘটনাটি উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছিল।

'কলকাত্তা সমাচার' হিন্দি ভাষার উন্নতি করার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, কলানাথ শাস্ত্রীর মতে, 'কলকাত্তা সমাচার' এর সম্পাদক ঝাবরমল্ল শর্মার একটি বিশেষ কৃতিত্ব হল ব্যাকরণশুদ্ধ অথচ সহজ হিন্দিতে নিজের বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।[৫৮] 'কলকাত্তা সমাচার' থেকে জানা যায়, পঞ্চম হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে নোট এবং মুদ্রায় নাগরী অক্ষর চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল— প্রস্থাবকর্তা ছিলেন পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন।[৫৯] পাঞ্জাব ও প্রয়াগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইউনিভার্সিটিজ কমিশনের সম্মতিপ্রদান স্বত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত বহু কলেজ হিন্দিতে পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কোনও নিয়ম প্রণয়ণ করেনি— সম্মেলন এবিষয়ে প্রচন্ড ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে।[৬০]

১৯২৫ সালের শুরুতে যেন হঠাৎ কলকাতা থেকে 'কলকাত্তা সমাচার' এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেল। ৬ই জানুয়ারি ১৯২৫ এর সংখ্যায় 'কলকাত্তা সমাচার'-এর ম্যানেজারের একটি বিশেষ নিবেদন ছিল, যাতে বলা হয়েছিল, এই সংখ্যাটি 'কলকাত্তা সমাচার' এর অন্তিম সংখ্যা। এখন এর কার্যালয় দিল্লীতে যাচ্ছে। সেখান থেকে আগামী 'মাঘ শুক্লা বসন্ত পঞ্চমীতে 'কলকাত্তা সমাচার' হিন্দু সংখ্যার' নামে প্রকাশিত হবে।

'কলকাত্তা সমাচার' এই স্থান পরিবর্তন এবং 'হিন্দুসংসার' নামকরণ মনে হয় অধিকতর রক্ষণশীলতার দিকে পদক্ষেপ। অন্তিম সংখ্যাতে 'কলকত্তেসে বিদায়' শীর্ষক রচনায় ঝাবরমল্ল বলেছেন, 'সমাচার' নিজের হিন্দুত্বকে রক্ষা করে স্বরাজ্যলাভের প্রয়াসী ছিল। হিন্দুত্ব হারিয়ে, বর্ণব্যবস্থা ভেঙে আচারধর্মকে নষ্ট করে ইউরোপের বাঁচে দেশকে গড়তে চায়না 'কলকাত্তা সমাচার'। পত্রিকার স্থানান্তরগমন প্রসঙ্গে ঐ সংখ্যাতেই ঝাবরমল্ল লিখেছেন কর্তব্যের অনুরোধে পত্রিকাটিকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে হচ্ছে। এই কর্তব্য নিশ্চিতভাবেই সনাতনধর্মের প্রচার।

'কলকাত্তা সমাচার' তথা 'হিন্দু সংসার' এর স্বত্বাধিকারী কুমার গণেশসিংহ ভদৌরিয়া 'সমাচার' এর অন্তিম সংখ্যায় লিখেছেন, এখন থেকে 'কলকাত্তা সমাচার' দিল্লী থেকে 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান'-এর সেবা করতে চায়। স্থান পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে তার বক্তব্য অন্য সম্প্রদায়ের ভায়েরা নিজেদের ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শসমূহের রক্ষণ ও প্রচারের উদ্যোগ দিল্লী থেকেই করেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে দিল্লীতে সনাতনধর্মী হিন্দুদের সমর্থনের কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। এক সরস্বতীর বরপুত্র তাকে বলেছেন, বর্তমান জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য হিন্দুদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবনাকে রক্ষা ও প্রচারের জন্য দিল্লীতে প্রভাবশালী কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন আছে।

মুরারিলাল গোয়েল বলেছেন. সনাতনধর্মের বিশিষ্টনেতা ও ভারতধর্ম মহামন্ডলের[৬১] প্রতিষ্ঠাতা ব্যাখ্যান বাচস্পতি পন্ডিত দীনদয়ালু শর্মার পরামর্শে 'কলকাত্তা সমাচার' দিল্লীতে চলে যায়।[৬২] উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভাদৌরিয়া কথিত সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন দীনদয়ালু শর্মা।

কিন্তু অন্তিম সংখ্যায় গণেশসিংহ উদৌরিয়ার একটি উক্তি থেকে মনে হচ্ছে, ধর্মীয় আদর্শই পত্রিকাটির স্থানান্তর গমনের একমাত্র কারণ ছিলনা। 'কলকাত্তা সমাচার' লোকসানে চলছিল। ভদৌরিয়ার কথায় 'কলকাত্তা সমাচার' শত শত টাকা মাসিক ক্ষতি সহ্য করেও শুধুমাত্র আদর্শ প্রচারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই চালানো হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ হয়ত আশা করেছিলেন নতুন নামে এবং নবকলেবরে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হলে পত্রিকাটির অবস্থার উন্নতি হবে।

সূত্র নির্দেশ

১) কৃষ্ণবিহারী মিশ্র : হিন্দি পত্রকারিতা : রাজস্থানী আয়োজন কী কৃতী ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪৭, দিল্লী ১৯৯৯।

২) ঝাবরমল্ল শর্মা দ্বারকাপ্রসাদ চতুর্বেদীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ যে লেখাটি লিখেছেন তাতে নিজেকে প্রথম থেকেই 'কলকাত্তা সমাচার' এর সম্পাদক বলেছেন : শ্যামসুন্দর শর্মা : "হিন্দি প্রকাশন কা ইতিহাস : বঙ্গীয় খণ্ড' পৃষ্ঠা ৬৬, বারাণসী, ১৯৯৮।

৩) সুনীল তেওয়ারী : 'কলকাত্তা সমাচার' (প্রবন্ধ): ঝাবরমল্ল শর্মা সংগ্রহালয় শোধ সংস্থান এর শুভারম্ভ উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকা, জয়পুর ২০০০।

৪) মুরারিলাল গোয়েল 'শাপিত' : 'রাজস্থান কী বিভূতি পদ্মভূষণ পন্ডিত ঝাবরমল্ল শর্মা', পৃষ্ঠা ২১, দিল্লী, ১৯৯৯।

৫) মুলচন্দ্র অগ্রবাল : 'পত্রকার কী আত্মকথা', পৃষ্ঠা ৪৩, কলকাত্তা, ১৯৪৪।

৬) সুনীল তেওয়ারী, পূর্বোক্ত

৭) সুনীল তেওয়ারী, পূর্বোক্ত

৮) মুলচন্দ্র অগ্রবাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮

৯) "কলকাত্তা সমাচার", ২ জানুয়ারি, ১৯১৫

১০) "কলকাত্তা সমাচার" ২৮ আগস্ট, ১৯১৪, ২রা জানুয়ারি ১৯১৫, ৫ জানুয়ারি, ১৯১৫, তারিখে মারবাড়ি অ্যাসোসিয়েশান, কালীঘাট, সংস্কৃত কলেজ, মারবাড়ি চেম্বার, মেছুয়ার শিখসঙ্গত, বিশ্বকোষ অফিস, তুলাপট্টীর জৈনসমাজ, আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাকালী পাঠশালা, তনুসখরায় খেমকা ফ্রি স্কুল, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা, কলকাতা ব্রাহ্মণসভা কর্তৃক প্রার্থনাসভা আয়োজনের সংবাদ রয়েছে। খড়দহ, বর্মা এবং ঢাকাতেও অনুরূপ সভার সংবাদ রয়েছে (২৬শে আগস্ট, ১৯১৪)

১১) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৪ই আগস্ট, ১৯১৪

১২) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৪ এবং ২০শে আগস্ট ১৯১৪

১৩) 'কলকাত্তা সমাচার' ২০শে আগস্ট, ১৯১৪

১৪) 'কলকাত্তা সমাচার' পূর্বোক্ত

১৫) 'কলকাত্তা সমাচার' ২৬শে আগস্ট, ১৯১৪

১৬) 'কলকাত্তা সমাচার', সম্পাদকীয়, ১৭ই জানুয়ারি, ১৯১৫

১৭) 'কলকাত্তা সমাচার', ৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৪

১৮) 'কলকাত্তা সমাচার' ২২শে জানুয়ারি, ১৯১৫, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে বিচার, মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রের পন্ডিচেরীর সংবাদদাতা অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেস সম্বন্ধে তার চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে ছিলেন, 'কলকাত্তা সমাচার' ঐ বক্তব্যতুলে দিয়েছে

১৯) শ্যামসুন্দর শর্মা ঃ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৯৬

২০) শ্যামসুন্দর শর্মা ঃ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪

২১) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৭ই জানুয়ারি, ১৯১৫- বোম্বাইতে ১২ই জানুয়ারির গান্ধী স্বাগত সভায় সভাপতি ছিলেন- ফিরোজশাহ মেহতা, বার্তা পাঠান দাদাভাই নৌরজী। তিলক বলেন, পুণা এবং দক্ষিণ ভারতের পক্ষ থেকে এই মহান দেশভক্তের সম্মানে যোগ দিতে আমার এখানে আগমণ। এরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যায়ের জন্য যে মহান দুঃখবরণ করেছেন তা থেকে জগৎ বুঝছে যে, আত্মিক বল এবং প্রকৃত জয়ের জন্য যত কষ্টই সহ্য করতে হোক পরিশেষে জয়লাভ হবেই।

২২) 'বনারস ষড়যন্ত্র' 'কলকাত্তা সমাচার', ৯ই ডিসেম্বর, ১৯১৪, গিরফতার কর লিয়া গয়া' 'কলকাত্তা সমাচার', ৫ই জানুয়ারি, ১৯১৫, কলুটোলা স্ট্রীটের বাড়িতে রোজা কোম্পানির পিস্তল পাওয়ার ঘটনা, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা, 'কলকাত্তা সমাচার' ১৯শে জানুয়ারি, ১৯১৫, বড়বাজার পুলিশ কর্তৃক সিন্দুক ভাঙার প্রচেষ্টারত সুশীলচন্দ্র বোসকে গ্রেপ্তার, 'কলকাত্তা সমাচার' ২২শে জানুয়ারি, ১৯১৫।

২৩) জাতিতে মারবাড়ি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বংশে জন্মলাভ করেও দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট ছিলেন।

২৪) মুরারিলাল গোয়েল 'শাপিত' ঃ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১

২৫) রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলা দেশের ইতিহাস আধুনিক যুগ (মুক্তি সংগ্রাম) চতুর্থ খন্ড (১৯০৫-৪৭), কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃষ্ঠা ১৬৮।

২৬) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৪ই অক্টোবর; ১৯১৫, ১লা আগস্ট, ১৯২৪

২৭) 'কলকাত্তা সমাচার' ৩০শে জুলাই, ১৯২৪ - "বঙ্গালকা ক্রান্তিকারী দল হত্যাকান্ডকী ধমকী পুলিশ অফসরোঁকে নাম খুলী চিঁঠী"

২৮) রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৮

২৯) 'কলকাত্তা সমাচার'- ৮ই এপ্রিল, ১৯১৯- "রৌলট বিলপর শোক। কলকত্তেমে সত্যাগ্রহকা দিন, হিন্দু মুসলমানোঁকা অনুপম প্রেম, ময়দানমে জনতাকা সাগর, চৌবীশ ঘন্টে নিরাহার, সর্বব্যাপী হরতাল- "গত রবিবার সত্যাগ্রহের দিন ছিল, সকালে হ্যারিসন রোড, তুলা পট্টী, প্রভৃতি থেকে ছোটবড় মিছিল বেরিয়েছে, হিন্দু মুসলমান একত্রে 'গান্ধীজিকী জয়', 'বন্দেমাতরম,' 'তিলক মহারাজকী জয়' প্রভৃতি ধ্বনিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ করছে। মুসলমানদের মুখ থেকে 'গঙ্গামাতাকী জয়", "কালীমাতাকী জয়" প্রভৃতি শব্দ হিন্দুদের প্রতি তাদের প্রেমেরই পরিচায়ক। প্রকৃত পক্ষে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৃদ্ধ, কি যুবক -

সকলে রাওলাট বিল পাশ হওয়ায় শোক প্রকাশ করছে। জানা যাচ্ছে যে, কলকাতার সব দোকান বন্ধ, ট্রামে যাত্রী নেই, কখনো কেউ ভুল করে ট্রামে উঠলে স্বেচ্ছাসেবকরা বিনয়ের সঙ্গে তাদের নেমে আসতে অনুরোধ করলে তারা নেমে আসছে। হিন্দু ও মুসলিমদের হোটেলগুলিতে চুল্লী জ্বলেনি। সত্যাগ্রহের এই মহৎ কার্য দেখিয়ে দিয়েছে ভারতীয় জনতা ঘুমিয়ে নেই, নিজের হিতাহিত তারা ভালই বোঝে। সকাল ৬টা নাগাদ স্থানীয় হিন্দি নাট্যপরিষদের উৎসাহী সদস্যরা 'বন্দেমাতারম' ধ্বনির সঙ্গে লোয়ার চিতপুর রোডে সমবেত হয়ে মেছুয়াবাজারের মুসলমান ভাইদের কাছে উর্দু হ্যান্ডবিল বিলি করে। মুসলমানরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। "হিন্দসে কিঁউ মুসলমানোঁকী আশনা না রহেগী", "ভাইসে ভাই কবতক কিঁউকর জুদা রহেগা" ইত্যাদি গান তারা গাইছিল। বড় মসজিদের কাছে পৌঁছতে মিছিলের লোকসংখ্যা প্রায় ১০,০০০ এ পৌঁছায়। এতে যুক্ত প্রদেশের মারবাড়ি, গুজরাতি, মারাঠি, বাঙালি, পাঞ্জাবি, বিহারী, উড়িয়া, মাদ্রাজি সব প্রদেশের লোক ছিল। বিকেলে ময়দানে জনসমুদ্র, স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার সভাও এই বিরাট সভার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু মুসলমানের মিলন এই সত্যাগ্রহ সভার অভূত পূর্ব বিষয় মারবাড়িদের উৎসাহও উল্লেখযোগ্য, কারণ এযাবৎ দেশের কাজে মারবাড়িদের বিশেষ অংশ নিতে দেখা যায়নি।

৩০) 'কলকাত্তা সমাচার' ১১ই এপ্রিল, ১৯১৯- "প্রেস অ্যাকট ভঙ্গ করার মাধ্যমে সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছে ..... ভারতে যেভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে... তা ঘোর অন্যায়।" "গান্ধীজি বলেছেন, বিদেশী বস্তু বয়কট করা হবেনা, স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করলে বিদেশী বস্তু আপনিই বয়কট হবে।"

৩১) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ - গতকাল শনিবার জাকারিয়া মসজিদে নামাজের জন্য বহুসংখ্যক মুসলমান একত্রিত হয়েছে, অনেক হিন্দুও তাদের সঙ্গে সেখানে জমায়েত হয়েছে, হাওড়া পুলের উপর একটি এবং চিৎপুর ও হ্যারিসন রোডের চৌরাস্তায় একটি কামান বসানো হয়েছে, বিকেল ৪টেয় গুলি চালানো হয়; ৭জনের মৃত্যু এবং ১৩ জন আহত হয়েছে। বাংলার ছোটলাট রোনাল্ডশে কলকাতার অবস্থা নিয়ে পরামর্শ করার জন্য ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও অন্য নেতাদের সঙ্গে কাল সাক্ষাৎ করেছেন।

৩২) 'ভারতমিত্র' ১৫ই এপ্রিল ১৯১৯, আরো দ্রষ্টব্য সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ "ভারতমিত্র- কলকাতার এক অবলুপ্ত হিন্দি পত্রিকা"- পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।

৩৩) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৫ই এপ্রিল ১৯১৯

৩৪) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৯শে এপ্রিল, ১৯১৯

৩৫) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৭ই এপ্রিল, ১৯১৯

৩৬) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৯শে এপ্রিল ১৯১৯

৩৭) 'কলকাত্তা সমাচার' বৈশাখ কৃষ্ণ ১, সম্বত ১৯৭৬

৩৮) 'কলকাত্তা সমাচার' - ৬ জানুয়ারি ১৯২৫- "কলকত্তেসে বিদা" - সম্পাদকীয়

৩৯) R.C.S. Sarkar, The Press in India, Delhi, ১৯৮৪, p. ২৬

৪০) 'কলকাত্তা সমাচার' ২৬শে জুলাই, ১৯২৪

৪১) 'কলকাত্তা সমাচার' ২৭শে জুলাই, ১৯২৪

৪২) 'কলকাত্তা সমাচার' ৩রা আগষ্ট, ১৯২৪

৪৩) 'কলকাত্তা সমাচার' ৩০শে জুলাই, ১৯২৪

৪৪) 'কলকাত্তা সমাচার' ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ - তারকেশ্বরকা সমঝোতা - আখির ভেদ ক্যা হ্যায়? মহন্তকে চেলা ক্যা মহন্ত বনেগা?

৪৫) 'কলকাত্তা সমাচার' ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪

৪৬) 'কলকাত্তা সমাচার' ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪

চায় বাগিচোঁমেঁ অত্যাচার : কুলিয়োঁকো বহকাকর লায়াগয়া, সৈকড়োঁ কুলি কাম ছোড় রহে হ্যাঁয়, মর জায়েঙ্গে পর বাগিচোঁকো না লৌটেঙ্গে, হাজারোঁ মীল ঘর লৌটনেকে লিয়ে পয়দল যাত্রা কই আদমী রাস্তেমে হী মর গয়ে।

৪৭) 'কলকাত্তা সমাচার' ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

৪৮) শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দাঙ্গা কা ইতিহাস', পৃষ্ঠা ৪৬, বারাণসী, ২০০০

৪৯) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

৫০) 'কলকাত্তা সমাচার' ২৬শে অক্টোবর ১৯২৪

৫১) 'কলকাত্তা সমাচার' ২০শে আগষ্ট, ১৯১৪

৫২) 'কলকাত্তা সমাচার' ১৭ই আগস্ট ১৯১৪

৫৩) 'কলকাত্তা সমাচার' ৫ই ডিসেম্বর ১৯১৪

৫৪) 'কলকাত্তা সমাচার' ২৭শে আগস্ট, ১৯১৪

৫৫) 'কলকাত্তা সমাচার' ২৪শে আগস্ট, ১৯১৪ - ভগবতী প্রসাদ দারুকার লেখা চিঠি- "স্ত্রিয়োঁমে স্বতন্ত্রতা"

৫৬) 'কলকাত্তা সমাচার' ৪ঠা মার্চ ১৯২১ - কার্টুনের শিরোনাম "গান্ধী সুরা সংবাদ"

৫৭) 'সাম্যবাদী' ১৮ই জানুয়ারি ১৯২১ - "শরাব পীনা বন্ধ : নীচ জাতিয়োঁমে জাগৃতি"

৫৮) কৃষ্ণবিহারী মিশ্র ও রামব্যাসপাণ্ডে সম্পাদিতঃ "হিন্দি সাহিত্যঃ বঙ্গীয় ভূমিকা" কলকাতা ১৯৮৩, কলানাথ শাস্ত্রীর লেখা প্রবন্ধ "হিন্দি বাঙ্ময়কো ঝাবরমল্ল শর্মাকা অবদান"।

৫৯) 'কলকাত্তা সমাচার' ৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৪

৬০) ঐ

৬১) ১৮৮৭ সালে পন্ডিত দীনদয়ালু শর্মা হরিদ্বারে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, প্রতিষ্ঠানটি ছিল গোঁড়া হিন্দু সনাতন ধর্মীয়দের দ্বারা পরিচালিত। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিল হিন্দু রাজা, ভূস্বামী, সমাজপতি, পুরোহিত এবং শাস্ত্রজ্ঞরা।

৬২) মুরারিলাল গোয়েল 'শাপিত', পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২২

কলকাতা পুরসভা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি (১৯৩১-'৩৯)

প্রগতি চট্টোপাধ্যায়

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে কলকাতার পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার করেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। শহরের আইনশৃঙ্খলার তদারকির জন্যে কয়েকজন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করা হয়। তাদের বলা হোত 'Justice of the peace'। ১৮৫৩ সালে একটি আইনবলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার 'Justice of the peace'-দের নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশন গঠিত হয়। তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বলবৎ করার দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের ওপর দেওয়া হয়। পুর-প্রশাসনের শীর্ষে তিনি অবস্থান করতেন। পুর-প্রশাসন ক্রমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেবার জন্য আন্দোলন দানা বাঁধে। ১৮৭৬ সালে কলকাতা পুর-আইন বা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট কলকাতার করদাতাদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের অধিকার দান করে (২ঃ১ অনুপাতে)। স্থির হয়, ৭২ জন নিয়ে গঠিত পুরসভার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ (১/৪) নির্বাচিত হবেন করদাতা নাগরিকদের দ্বারা। কার্জনের স্বৈবতান্ত্রিক শাসনকালে ১৮৯৯ সালের কলকাতা পুরআইন ('Calcutta Municipal Act)-এর মাধ্যমে পুর-কাউন্সিল (Municipal Council) ও সাধারণসভায় করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ভেতরে - বাইরে এবং ওই বছরে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে (১৮৯৯) প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৮৯৯-এর সংশোধনী আইনের ব্যর্থতা পুর-সংশোধনী আইনে নতুন ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক করেছিলেন। এইসময় পৃথক নির্বাচনী প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। যুক্তি ছিল, পৃথক নির্বাচনী প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত অপর কোন বিকল্প ব্যবস্থাই যথেষ্ট বা উপযুক্ত পরিমাণ মুসলিম প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষিত করতে পারবে না। ১৯১৯-এর মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন-জনিত পরিস্থিতিতে এই বিল সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালের সংশোধিত পুর-আইন দ্বারা ১৮৯৯-এর স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাতিল করে পুর-প্রশাসনকে আবার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র দান করা হয়। ১৯২৩ সালে কর্পোরেশনের সদস্যসংখ্যা ৫০ থেকে ৯০-তে পরিণত হয়। ওয়ার্ড স্তর থেকে নির্বাচিত হবেন ৬৩ জন, মুসলমানদের জন্য ১৫টি আসন চিহ্নিত হয়। প্রথম তিনটি পুর-নির্বাচনে এগুলি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত হবার পরে হিন্দু-মুসলমান—

উভয়েই এইসব আসনে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারতেন। পুরসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত মেয়র-হাউসের স্পীকারের দায়িত্ব পালন করতেন। চিফ্-এক্সিকিউটিভ অফিসার-ও সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। পুরসভার প্রথম অধিবেশনে পুর-প্রতিনিধিদের ভোটে পাঁচজন অল্ডারম্যান (Alderman)-কে নির্বাচিত করা হয়। ভারতে ইংরাজ শাসনের শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল।[১]

জাতীয় আন্দোলনে কলকাতা পুরসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল জয়যুক্ত হয়। মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে চিত্তরঞ্জন তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বলেন, তিনি দরিদ্র নারায়ণের আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করবেন। মেয়রের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরে চিত্তরঞ্জন শহরের প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসা ও জল সরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেন। প্রথামিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯২৩-এ যেখানে ছিল ১৯, ১৯২৭ সালে সেখানে বেড়ে দাড়াঁয় ১৫০। খাঁটি দুধ সরবরাহের জন্য কো-অপারেটিভ দুগ্ধ সমিতি স্থাপিত হয়। কর্পোরেশনের অধিকাংশ কন্ট্রাক্ট ভারতীয়দের দেওয়া হতে থাকে। ফলে ইংরাজ বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। শ্বেতাঙ্গসেবিকাদের সংগঠন ক্যালকাটা হসপিটাল নার্সদের সংগঠন (Calcutta Hospital Nurses' Association) -এর আর্থিক বরাদ্দ সংকুচিত করে ভারতীয় সেবিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য অর্থদানের উদ্যোগ ১৯২৫ সালে কর্পোরেশনে গ্রহণ করে। অবশ্য ইওরোপীয়দের প্রতিবাদে পরের বছর-ই এই উদ্যোগ পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে কংগ্রেস মনোনীত করলে ইওরোপীয়রা প্রবল প্রতিবাদ জানায়। কলকাতায় তাঁর নিজস্ব আবাসন না থাকায় তারা তাঁকে কলকাতা শহরের যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। চট্টগ্রামের মানুষ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কলকাতার ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। পেশায় যতীন্দ্রমোহন ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। যতীন্দ্রমোহনের অপর অসুবিধা ছিল কংগ্রেসের প্রভাবশালী একটি গোষ্ঠীর বিরোধিতা। শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ, তুলসী গোস্বামী-সেকালেই 'বিগ্‌ফাইভ' নামে পরিচিত ছিলেন। এরা সেনগুপ্তের বিরোধিতা করেন। জেলায় সমর্থনের ভিত্তিতে বীরেন শাসমল বাংলার কংগ্রেস ও কলকাতা পুরসভার দখল নেবার জন্য একই সময়ে উদ্যোগী হন। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতিক্রম করা সম্ভব হলেও সুভাষচন্দ্র বোস ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অনুগামীদের মধ্যে রেষারেষি থেকেই গেল।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতা কর্পোরেশনে মুসলমান সদস্যদের ভূমিকা সতর্কভাবে অনুধাবন করা উচিত। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলায় তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন স্বরাজ দলের নেতা

চিত্তরঞ্জন দাস 'Bengal Pact' (১৯২৩) -এর মাধ্যমে। বাঙালি মুসলমান নেতাদের একাংশ প্যাক্টের বিরোধিতা করে। অধ্যাপক চন্ডীপ্রসাদ সরকার এই পর্বে মুসলিম রাজনীতি বিশ্লেষণ করেছেন।[২] চিত্তরঞ্জন দাস জীবিত থাকাকালেই বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলমান প্রতিনিধিদের সাথে জোট পাকিয়ে কিছু ব্রিটিশ সিভিলিয়নের প্ররোচনায় পুরসভার সদস্য হোসেন কাউন্সিলে প্রস্তাব করেন, সরকারি চাকরিতে যতদিন পর্যন্ত না শতকরা ৫৫ ভাগ পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন তাদের শতকরা ৮০ ভাগ নিয়োগ করা হোক। স্বরাজ্য দল এতে কাউন্সিলের ভেতরে ও বাইরে বেশ অসুবিধেয় পড়েন। চিত্তরঞ্জন দাস ওই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা মুলতুবী রাখেন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বরাজ্য দলের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব বাঙালি মুসলমানদের হতাশ করে।

ত্রিশের দশকে মুসলিমদের আচরণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ উগ্রতর হতে থাকে। ১৯২৫-এর কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগ দেবার পরিবর্তে মুসলমানরা জেলা মুসলিম সম্মেলনের সদস্য হয়। ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে আবদুর-রহিমের বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক চেতনা নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। তিনি স্পষ্টতই বলেন, হিন্দু আগ্রাসী কর্মকান্ডের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন; কাজেই মুসলমানদের উচিত এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা।[৩] ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানরা বেশি যোগ দেয়নি। ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ঘোষণা মারফৎ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। তপসিলী হিন্দুদের জন্যও স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হয়। প্রতিবাদে পুনা জেলে গান্ধীজি আমরণ অনশনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। দলিত সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে আম্বেদকার তাঁর সঙ্গে আপোষ করেন। উভয়ের মধ্যে পুনাচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নির্বাচক মন্ডলীতে তপসিলী সম্প্রদায়ের পৃথকীকরণ এর দ্বারা রোধ হোল বটে, তার পরিবর্তে নতুন যে আসন বন্টন হোল তাতে বাংলায় তারা আরও ২০টি আসন বেশি লাভ করে। বাঙালি জাতির পক্ষ থেকেএর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করা হয়েছিল কংগ্রেস তাতে কর্ণপাত করেনি।

১৯৩৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ও তাঁর অনুগামীদের সমর্থনে ফজলুল হক্ নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্র বোস এবং কলকাতায় ইওরোপীয় পুর-প্রতিনিধিরা তাঁর বিরোধিতা করেন। তাদের মিলিত উদ্যোগে নলিনীরঞ্জন সরকার মেয়র পদে সমান্তরাল কার্যভার গ্রহণ করেন। পুরসভাকে কেন্দ্র করে বাংলায় কংগ্রেসের প্রধান দুই গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্বে পুর-প্রশাসনে অচলাবস্থাসৃষ্টি হয়, পুরসভার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ফজলুল হক্ ও ১৫ জন মুসলমান কাউন্সিলার পদত্যাগ করেন।

১৯৩৭ এর আইনসভা নির্বাচনে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-প্রজা-পার্টি সর্বাধিক আসনে জয়যুক্ত হয়। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরে দেখা গেল কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার হতে অসম্মত হওয়ায় মুসলিম লীগের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত তিনি সরকার গঠন করেন। কলকাতা পুরসভার সাংগঠনিক পরিবর্তন চেয়ে ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ্ ১৯৩৯ এর ২৭-শে ফেব্রুয়ারি আইন সভায় একটি বিল উত্থাপন করেন।[৪] বম্বে প্রেসিডেন্সী বরো মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ও ডিস্ট্রিক্ট লোকাল বোর্ড অ্যাক্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন— মুসলমানদের জন্য সেখানে স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদিও ইচ্ছা করলে মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে যৌথ নির্বাচক-মন্ডলীও স্থাপন করতে পারেন। নির্বাচক মন্ডলী গঠনের দায়িত্ব হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ইচ্ছার ওপর-এভাবেই-ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন। তাঁর মতে, যৌথ নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু স্বার্থের প্রতি ফলন ঘটাছেন বলে তিনি বোঝাতে চাইছিলেন। প্রস্তাবিত সংস্কারে পুরসভার সদস্যসংখ্যা ৭৭ থেকে বাড়িয়ে ৮৪ করা হোত এই অনুপাতেঃ

সাধারণ আসন	—	৪৬
মুসলিম আসন	—	২২
অ্যাংলো - ইন্ডিয়ান	—	২
শ্রমিক	—	২
বিশেষ নির্বাচকমন্ডলী		
বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স	—	৬
ক্যালকাটা ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন	—	৪
ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার	—	২
		৮৪

প্রস্তাবিত এই বিলে হিন্দুদের (কলকাতার অধিবাসীদের আনুমানিক ৯ শতাংশ) জন্য ৭ টি আসন বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ৪৬ টি সাধারণ আসনের মধ্যে থেকেই এগুলি বরাদ্দ করার চিন্তা করা হয়। মাদ্রাজ ও বম্বে পুরসভার শ্রমিকদের জন্য তখন বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল। কলকাতা পুরসভার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

আইনসভায় বিরোধী দলনেতা শরৎচন্দ্র বসু এই বিলকে 'জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ও

গণতন্ত্র বিরোধী' - আখ্যা দেন। যৌথ নির্বাচকমন্ডলী থাকাকালেও বহু বিশিষ্ট মুসলিম রাজনীতিবিদ্; যেমন- ফজলুল হক স্বয়ং, শামসুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ হাসিম এবং মোমিন প্রমুখ নির্বাচিত হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শহরের সাধারণ চাহিদার ক্ষেত্রে জল সরবরাহ, নিকাশী ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন বা সাধারণভাবে নগর পরিকল্পনা-র দিকই হোক-কোন পার্থক্য দেখা যায় না। পুরসভায় অধীনস্থ চাকরির গড় হিসাব শরৎচন্দ্র বসুর মতে ছিল এরকম-১৯২৩ সালের আগে ইওরোপীয়দের প্রভাবাধীন থাকার সময় ৮ শতাংশ।

১৯২৩-এর আইন বলবৎ হবার পরে ১৬ শতাংশ।

[এই সময় পুরসভায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলী ছিল]

১৯৩৩ ও পরবর্তী [যৌথ নির্বাচকমন্ডলী থাকা কালে] ২৪ শতাংশ।

বিল উত্থাপিত হবার সামান্য কিছুকাল আগে কলকাতা পুরসভায় মুসলমানদের নিয়োগের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল এক-চতুর্থাংশের অধিক। ১৯২৩-এর আগে মুসলমান দাতব্য সংস্থা ও হাসপাতালগুলির প্রতি সরকারি অনুদানের নজির প্রায় না থাকলেও পরে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পুরসভা পরিচালিত বিদ্যালয় ও ছাত্র স্যংখ্যার আনুপাতিক হার ছিল নিম্নরূপঃ-

বছর	বিদ্যলয় সংখ্যা (হিন্দু ছাত্র-প্রধান)	বিদ্যালয় সংখ্যা (মুসলমান ছাত্র প্রধান)
১৯৩৬-৩৭	১৬৯	৬১

শরৎচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে আরও বলেন কলকাতা পুরসভা সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা ঠিক তখনই নিয়েছিল যখন হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ নির্বাচকমন্ডলী সদস্য নির্বাচন করত। হিন্দুরা কেবল শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নয়, কলকাতা পুরসভায় মোট আদায়ীকৃত করের অন্ততঃ ৮০ শতাংশ তারাই বহন করে। মুসলমান সম্প্রদায় দেয় মাত্র ৫.০১ শতাংশ। বাকি ১২.৪ শতাংশ যোগায় পুরসভার অধীনস্থ ইওরোপীয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও ইহুদি সম্প্রদায় (কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এবং পোর্ট কমিশনারদের বরাদ্দ বাদে)।

বিলে প্রস্তাবিত সদস্য মনোনয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও শরৎচন্দ্র বসু তাঁর আপত্তি জানান। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ঘোষণানুসারে আসনসংখ্যা বন্টনের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের প্রতিবাদে সামিল হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যা এই বিলের আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছিল। জাতীয় স্তরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে বিরোধ চলেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে

শরৎচন্দ্র বসু মন্তব্য করেন, "There is not much doubt that the legislative chapter of the Calcutta Municipal (Amendment) Bill will close with a verdict in favour of the Muslim Leaguers. But the *legislative* is neither the people nor the country." তা সত্ত্বেও তিনি আশা করেন, "In this movement there will be Muslims as well as Hindus. But if resistance is to be crowned with suceess all lovers at democracy and nationalism must be prepared for the utmost suffering and sacrifices. If we are ready for them victory would not be long in coming."।[৫]

বিল বিষয়ক বিতর্কে শরৎচন্দ্র বসুকে প্রবলভাবে সমর্থন করেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'Will it not rip open schemes for mutual distrust and bitterness.' জাতির ভিত্তিতে সংখ্যানুপাতিক আসন বন্টনের নীতি গৃহীত হলে হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হবে না কেন? ('Will you not apply the same principle to them (the Hindus) as well? Why should they be relegated to the position of a minority in the corporation of this city') এমন প্রশ্ন তিনি স্বাভাবিকভাবেই করেছিলেন বঙ্গীয় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "My last appeal to Government is thus: realise that there are dark and ominous horizon at this province. The choice between peace and conflict is to be made by the Government with a full sense of responsibility. It you fight we also fight for our lives, our right and our liberties. But even at this late hour let me say that we do want to live together as friends - Hindus and Muslims and Christians."।[৬]

আসনসংখ্যা নির্দ্ধারণে পুরসভায় ইওরোপীয়দের গুরুত্ব যাতে যথেষ্টই থাকে প্রস্তাবিত বিলে সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। বিলের এই দিকটি সুভাষচন্দ্র বোসের দৃষ্টি এড়ায়নি। "ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় স্বনামে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে (৩০শে মার্চ ১৯৪০) তিনি বলেন, নতুন কলকাতা পুর-আইন অনুসারে যে সাম্প্রতিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা কলকাতার পক্ষে একটি নতুন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যদি কলকাতা পুরসভার হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতীয় সদস্য ঐক্যবদ্ধ না হয় তবে কলকাতা পুরসভা ব্রিটিশের নিকট হস্তান্তরিত হবে। ('The corporation will pass into the hands of Britishers')।[৭]

১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ পুরসভার সদস্যরা সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে একযোগে

ধিক্কারসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে এবার ২-রা এপ্রিল নজিরবিহীন জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়।[৮] দুই সপ্তাহের ব্যবধানে এই রাজ্যে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে একটি ধর্মঘট অত্যন্ত সফল হয়।[৯] বিলের বিরোধিতায় কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভার মনোভাব ছিল একই রকমের কঠোর এবং আপোষহীন। কৃষক-প্রজা-পার্টির সদস্য সৈয়দ নৌশের আলি বলেন, বিল প্রবর্তিত হলে সম্প্রদায় ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে সাম্রাজ্যবাদীরাই লাভবান হবে। আবু হুসেন সরকার নামে কৃষক প্রজা পার্টির অপর এক সদস্য বলেন, মুসলিম স্বার্থ রক্ষার নামে অবাঙালি মুসলমান এবং ইওরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এ রাজ্যের মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী চক্রান্তের সূচনা হয়েছে।[১০] তপসিলী এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদসদের মধ্যেও কেউ কেউ বিলের বিরোধিতা করেন। কলকাতার মেয়র এ.কে. এম. জ্যাকায়িয়া বলেন, এই বিল হল এক বিষভান্ড ("A Poisoned Potion ")।[১১]

প্রতিবাদের ঝড় অগ্রাহ্য করে ১১-ই মে ১৯৩৯ সালে বাংলা সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কলকাতা পুরসভার সংশোধনী বিল পাশ করে। মূল বিলের একটিমাত্র ধারা কেবল সংশোধিত হয় - মনোনীত সদস্যদের আসনসংখ্যা প্রাথমিক প্রস্তাবের তুলনায় ৪ কম করা হয়। ৩রা আগস্ট, ১৯৩৯-থেকে বিলটি আইনের মর্যাদালাভ করে।[১২] প্রায়একই সময়ে দেশে ৮০ জন রাজনৈতিক বন্দী অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় সাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র সরে যায়। একমাত্র কবিরাজ সত্যব্রত সেন ব্যতীত কলকাতা পুরসভার আর কোন সদস্য বিল পাশ হবার পরে পদত্যাগ করেননি।[১৩]

সূত্র নির্দেশ

১) কেশব চৌধুরী, "ক্যালকাটা ঃ স্টোরি অফ্ ইটস্ গভর্ণমেন্ট" (কলকাতা)।

২) চন্ডীপ্রসাদ সরকার, "বেঙ্গলী মুসলিম'স ঃ এ স্টাডি ইন্ দেয়ার পলিটিসাইজেশন (১৯১২-১৯২৯)" (দিল্লী/কলকাতা ১৯৯১)।

৩) "রিপোর্ট অন্ দি ওয়ার্কিং অফ্ দি রিফর্মড কনস্টিটিউশন ইন্ বেঙ্গল ১৯২১-২৭" (কলকাতা ১৯২৮), ১০৪।

৪) বিল সংক্রান্ত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর কার্যবিবরণী ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে পুনর্মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা ২৬-২৮।

৫) শরৎচন্দ্র বসুর প্রবন্ধ "Prepare for the Utmost Suffering and Sacrifices" - ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বিল সংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ ৭-৮।

৬) ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস, খন্ড- ৫৪, সংখ্যা ৫-৮, ১০ই মে ১৯৩৯, পৃঃ ৪২০।

৭) নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো প্রকাশিত (১৯৬২) সুভাষচন্দ্র বসুর "ক্রসরোড্‌স্" গ্রন্থভুক্ত, পৃঃ ২৭৬।

৮) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, খন্ড-২৯, সংখ্যা-১৯, ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯, পৃঃ ৭৩৪-৭৬৬, ৭৭০।

৯) ঐ, খন্ড-২৯, সংখ্যা-২১, ২২শে এপ্রিল ১৯৩৯, পৃঃ ৮৪৫

১০) বেঙ্গল লেডিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস, খন্ড-৫৪, সংখ্যা-৭, পৃঃ ২৯-৩০।

১১) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, খন্ড-২৯, সংখ্যা-১১,
১১-ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, পৃঃ-৪৫২

১২) ঐ, বিশেষ সংখ্যা-১লা জুলাই ১৯৩৯।

১৩) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, খন্ড-৩০, সংখ্যা-১৩, ১৯শে আগস্ট ১৯৩৯, পৃঃ ৪৩০।

দ্রষ্টব্য

১) আরবান রুটস অফ্ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্ — রজত রায়।

২) স্ট্রাগল অ্যান্ড স্ট্রাইফ ইন্ আরবান বেঙ্গল (১৯৩৭-৪৭) — ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩) ব্রাদার্স অ্যাগেইন্‌স্ট দি রাজ— লিওনার্ড গর্ডন।

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার ভারত-ভুক্তি প্রসংগ ঃ ১৯৪৭

মহাদেব চক্রবর্তী

ব্রিটিশ যুগে দুই ভারতের অস্তিত্ব ছিল ঃ একটি ব্রিটিশ শাসিত ভারত এবং অন্যটি রাজন্য শাসিত ভারত বা ভারতীয়দের ভারত। ১৯২৯-এর 'ইন্ডিয়ান স্টেটস্ কমিটি' এই দুই ভারতের কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করে পরবর্তী সময়ে ভারতে যে কি রকম জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে সেই সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছে তাদের রিপোর্টে।[১] ব্রিটিশ শাসকরা কোন সময়েই চাননি রাজন্য শাসিত ভারত ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হোক এবং এই উদ্দেশ্যটি মাথায় রেখেই তাঁরা একটার পর একটা ষড়যন্ত্রের জাল তৈরি করেছেন। ১৯২৯-এর 'বাটলার কমিটির রিপোর্ট এর ব্যতিক্রম নয়। সেই সময় অখন্ডিত ভারতে ছোট বড় মোট ৫৬৩ টি রাজন্য শাসিত রাজ্য ছিল।[২] এই উপমহাদেশের ৫ ভাগের ২ ভাগ অঞ্চলই ছিল রাজন্য শাসিত। এর মধ্যে যেমন হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, কাশ্মীর, বরোদা, কানিয়াওয়ার, ইন্দোর প্রভৃতি বড় বড় রাজ্য ছিল, তেমনি আবার রাজাকোট, পাতিয়ালা, কুচবিহার বা ত্রিপুরার মত ছোট ছোট রাজ্যও ছিল। কৌশলগত কারণেই ব্রিটিশ শাসকরা এই সব রাজন্য শাসিত অঞ্চলের উপর তাদের প্রত্যক্ষ প্রভুত্ব কায়েম করেননি, যদিও পরোক্ষভাবে এইসব রাজা মহারাজারা ব্রিটিশ নির্দেশে প্রভাবান্বিত ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল ঢেউয়ে যাতে সমগ্র ভারতবর্ষ একই সাথে ভেসে না যায় — সেটিই ছিল ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্য। জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই রাজন্য শাসিত ভারতে তেমন লক্ষ্য করা যায়নি, যেমননি ব্রিটিশ ভারতে হয়েছিল।

দীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছরের 'মাণিক্য' শাসনাধীন ত্রিপুরায় অনেক উপজাতিবিদ্রোহ হয়েছে ঠিক, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তেমন বড় মাপের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ত্রিপুরায় ঘটেনি। অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের পরোক্ষ প্রভাব - সেটি 'বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী' আন্দোলন থেকে শুরু করে 'স্বদেশী', 'বয়কট' বা বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন আন্দোলনের বার্তা কিভাবে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছিল সেটি বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা রাখে। অবিভক্ত বঙ্গদেশ যখন জাতীয় আন্দোলনের ঢেউয়ে উত্তাল, তখন সীমান্তবর্তী রাজন্য-শাসিত ত্রিপুরা এর থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পারে না। বাংলার 'অনুশীলন'ও 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর বিপ্লবীরা কিভাবে ব্রিটিশ শাসকদের রক্ত-চক্ষু ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়ানোর জন্য রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতেন

সেটি আগরতলা মহাকরণে সংরক্ষিত রাজ-আমলের পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকেই উপলব্ধি করা যায়। ত্রিপুরার মহারাজারা যে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে কিছু জানতেন, এইসব রিপোর্ট থেকেই তা আন্দাজ করা যায়।[৩] ত্রিপুরায় আশ্রিত এইসব ব্রিটিশ-বিরোধী দেশপ্রেমিকরা মাঝে মাঝে 'মাণিক্য' রাজাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন পেতেন, আবার বিরোধিতারও মুখোমুখি হতেন। আসলে, পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরায় সংগ্রামী ও প্রতিবাদী আন্দোলনের ধারার বীজ এইসব বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাজকর্মের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এঁরাই 'ছাত্র সংঘ', 'ভ্রাতৃ সংঘ' ইত্যাদি নানা নামে নিজেদের কাজকর্ম চালাতেন এবং এঁদেরই একটা অংশ পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[৪] যাই হোক্, স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউয়ে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল সেটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, বরং ১৯৪৭ সালের দু-একটি রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চল বলতে বিরাট আসাম এবং দুটি রাজন্য শাসিত রাজ্য অর্থাৎ মণিপুর ও ত্রিপুরাকেই বোঝাত। ব্রিটিশ শাসকরা এই অঞ্চলের উপর নজরদারি রাখার জন্য শুধু 'রেসিডেন্স্ট' বা 'পলিটিক্যাল এজেন্ট' ইত্যাদি নিয়োগ করেই কর্তব্য শেষ করেননি। 'বহির্ভূত এলাকা', 'আংশিক বহির্ভূত এলাকা', 'সীমান্ত এলাকা', 'নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি' বা 'নেফা' ইত্যাদি ধারণাও একদিন চালু করেছিলেন। আসলে, সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চেতনা ও উত্তেজনা থেকে দূরে রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য এবং সেই ব্যাপারে বেশ কিছুটা সফলও হয়েছিল। ভারত থেকে বিদায়ের আগে ব্রিটিশ শাসকরা উত্তর-পূর্ব ভারতকে নিজস্ব শাসনাধীন রাখার জন্য নানারকম নীল-নক্‌শা এঁকে ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রথমে আসামের তৎকালীন গভর্নর স্যার রবার্ট রীড এবং পরে ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্র সচিব এল.এস. অ্যামেরি এবং আইন বিশেষজ্ঞ রেজিন্যাল্ড কুপল্যান্ড তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৭)-এর আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পশ্চিম ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়ানমার)-কে নিয়ে একটা 'ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনি' তৈরির ছক্ এঁকে ফেলেছিলেন। অবশ্য ১৯৪৭-এর মার্চ মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে আসার পর নানা কারণে 'ক্রাউন কলোনি'র প্রস্তাবটি ভেস্তে যায় এবং ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-ভাগ-এর ব্যাপারটিই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। বড়লাট ওয়াভেল পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যগুলো বা রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকদের অনুসৃত নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে চার্চিলের স্থলে ১৯৪৫-এর জুলাইয়ে এট্‌লি'র নেতৃত্বে লেবার পার্টি বিটেনে ক্ষমতাসীন হল। ব্রিটেনে এই পরিবর্তনের জন্যই ভারতে স্বাধীনতার প্রশ্নটি ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং অনিবার্য মনে করেই জাতীয় নেতারা দেশভাগ বা 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' মেনে নিয়েছিলেন। রাজন্য শাসিত

রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েও স্বাধীনতার প্রাক্কালে একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব রাজ্যগুলি কি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হবে নাকি ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দেবে? ভারতের শেষ ব্রিটিশ বড়লাট মাউন্টব্যাটেন অবশ্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ দিয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের তরফে দেশীয় রাজন্য বর্গের সাথে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্বরাষ্ট্র সদস্য সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে। ১৯৪৭-এর ৫ জুলাই সর্দার প্যাটেল দেশীয় রাজন্য বর্গকে আশ্বাস দিয়ে যেসব রাজা মহারাজা তখনো তাঁদের প্রতিনিধি 'কনস্টিটিউন্ট এ্যাসেম্বলী' বা সাংবিধানিক পরিষদে পাঠাননি তাঁদের শেষ আবেদন করেন। অবশ্য প্যাটেলের শেষ আবেদনের আগেই (১৯৪৭-এর ২৮ এপ্রিল) ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য তাঁর মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞ গিরিজা শংকর গুহকে ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে সাংবিধানিক পরিষদে মনোনীত করেছিলেন। গিরিজা শংকর গুহ অবশ্য পরবর্তী সময়ে মণিপুর ও ছোট ছোট খাসি রাজ্য গুলিরও প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতের সংবিধান সভায় যোগদানের মাধ্যমে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার ভারত-ভুক্তির প্রশ্নটি এমনিতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ভারত স্বাধীন হওয়ার তিনমাস আগে (১৯৪৭-এর ১৭মে) মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের মৃত্যু হয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে রাজপ্রাসাদে কলহ, দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র ভারতের প্রায় প্রতিটি দেশীয় রাজ্যেরই অঙ্গের ভূষণ; স্বাভাবিক ভাবে ত্রিপুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। শেষ পর্যন্ত বীরবিক্রমের নাবালক পুত্র কিরীটবিক্রম উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তিনি নাবালক থাকায় শাসন কার্যের জন্য রাজমাতা কাঞ্চণপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে একটি 'রিজেন্সী কাউন্সিল' বা রাজ-প্রতিনিধি শাসন, পরিষদ গঠিত হয় এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ('লালুকর্তা') এই কাউন্সিলের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ত্রিপুরা ভারতের অঙ্গরাজ্য এটি মেনে নিয়েই ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রায় ২ মাস আগেই (১৯৪৭-এর ২২ জুন) মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর কে চিঠিতে[৫] সর্দার প্যাটেল-কে ত্রিপুরা থেকে বহির্গমনের পথ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য অনুরাধ করছেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার এক মাস আগে (১৯৪৭-এর ১৪ জুলাই) প্যাটেলের কাছে এক টেলিগ্রামে[৬] ব্রজেন্দ্রকিশোর আবেদন করছেন যে, যেহেতু ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেছে এরই জন্য বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, লুসাই ও খাসি পাহাড়, নোয়াখালি, টিপারা (অর্থাৎ কুমিল্লা) এবং শ্রীহট্ট জেলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে ত্রিপুরার সাথে যুক্ত করে রাজনৈতিক, রণকৌশলগত ও অর্থনৈতিক যুক্তিতেএকটি নিবিড় এলাকা তৈরি করা দরকার। এইসব চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম দুর্গাদাস সম্পাদিত 'সর্দার প্যাটেল'স করেস্পন্ডেসেস্'-এর পঞ্চম খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে; কিন্তু এটি ঘটনা যে, রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার মানুষ ১৯৪৭-এর আগে চাক্‌লা-রোশনাবাদের অভ্যন্তরের 'আসাম-বেঙ্গল রেল' লাইনের মাধ্যমে যাতায়াত

করতে পারতেন। ত্রিপুরার মহারাজারা ছিলেন চাক্‌লা-রোশনাবাদের (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত নোয়াখালি, কুমিল্লা, শ্রীহট্টের একাংশ) জমিদার। একই ব্যক্তির এমন দুই রকমের পদমর্যাদা মাঝে মাঝে নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি করলেও, রাজ-আমলে দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া ত্রিপুরার মহকুমা শহরগুলি 'আসাম-রেল' লাইনের পাশেই তৈরি হয়েছিল, যদিও ত্রিপুরার অভ্যন্তরে রেল লাইন ছিল না। ত্রিপুরা রাজের প্রজা এবং চাক্‌লা জমিদারির প্রজাদের মধ্যে নানা কারণে একটা ঐক্য-সূত্রও স্থাপিত হয়েছিল।

হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর বা জুনাগড়ের মত কিছু দেশীয় রাজ্য ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল রাজন্য-শাসিত রাজ্যই ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের আগেই 'Instrument of Accession' বা ভারত-ভুক্তির চুক্তিতে সই দেয়। নানা কারণে এটি একটি গুরুত্ব পূর্ণ দলিল[৭] এবং সকল দেশীয় রাজন্য বর্গের জন্য মোটামুটি প্রায় একই রকম বিধি ও ঘোষণা এই চুক্তির বয়ানে রাখা হয়েছিল, রাজা-মহরাজারা শুধু শূন্য স্থানে নিজের নাম ও রাজ্যের নাম উল্লেখ করে এবং যথাস্থানে সই দিয়ে বড়লাটের কাছে জমা দিতেন। যেহেতু ভারতের সংবিধান তখনো চালু হয়নি, এরই জন্য ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী ঘোষণা-পত্রটি তৈরি হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজমাতা কাঞ্চণপ্রভা দেবী ভারত স্বাধীন হওয়ার দু'দিন আগে (১৩ আগস্ট, ১৯৪৭) এই ঘোষণা -পত্রে সই দেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার এক সপ্তাহ আগে 'রিজেন্সী কাউন্সিল'-এর সভানেত্রী কাঞ্চণপ্রভা দেবী ত্রিপুরার জনগণের উদ্দেশে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেটিও নানা কারণে এখানে উল্লেখযোগ্য :

"আগামী ১৫ই আগস্ট (২৯শে শ্রাবণ) শুক্রবার ভারত রাষ্ট্রের শাসনভার ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক দেশবাসীর হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং তৎসহ উক্ত দিনে দেশীয় রাজ্য পরিচালিত ভারত সম্রাটের সার্বভৌম বিশেষ ক্ষমতার প্রত্যাহৃত হইবে।

"সমগ্র ভারত এই অশ্রুতপূর্ব হস্তান্তর উৎসবটিকে চিরস্মরণীয় করিতে প্রস্তুত হইতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও এই উৎসবকে স্থানীয় বাধানিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অধিবাসীগণ কর্তৃক স্মরণীয় করিয়া অভিনন্দিত করা বাঞ্চনীয়।

"ত্রিপুরা রাজ্য ইতঃপূর্বেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান করিয়াছে। অতএব, এই উৎসব উপলক্ষ্যে ত্রিপুর জাতীয় পতাকাসহ সর্বজাতি প্রতীক যুক্তরাষ্ট্রের চক্রসম্বলিত ত্রিবর্ণ পতাকার প্রতি উপযুক্ত প্রদত্ত হয় ইহা ত্রিপুর রাষ্ট্রের অভিমত।

"উক্ত উৎসব উপলক্ষ্যে এ রাজ্য ও জমিদারির অফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি আগামী ২৯শে ও ৩০শে শ্রাবণ, দুই দিবস বন্ধ থাকিবে। ইতি - সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২২শে শ্রাবণ।"[৮]

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রিজেন্ট মহারানি কাঞ্চণপ্রভা দেবীর বাণী[৯] কম আকর্ষণীয় নয়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, বাংলা ছিল রাজন্য শাসিত

ত্রিপুরার রাজভাষা এবং ত্রিপুরা গেজেট সহ বিভিন্ন দলিল-পত্র বাংলা ভাষায় লেখা হত, যদিও বাইরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম বা বিভিন্ন চুক্তির ভাষা ছিল ইংরেজি।

কী কারণে ব্রজেন্দ কিশোর দেববর্মার পরিবর্তে 'রাজ্যরত্ন' সত্যব্রত মুখার্জীকে দেওয়ান হিসাবে মহারানি কাঞ্চণপ্রভা দেবী নিযুক্ত করেছিলেন সেটি বোঝা কঠিন, তবে রাজ-দরবারে সিংহাসন নিয়ে কলহ একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু যাঁকে কাঞ্চণপ্রভা দেবী 'রাজ্যরত্ন' সত্যব্রত মুখার্জীর সাথে পরিষদে বা 'কাউন্সিল অব রিজেন্সি'তে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সেই দুর্জয় কিশোর দেববর্মার কিন্তু সিংহাসনের উপর বেশি নজর ছিল। মহারানি কাঞ্চণপ্রভা দেবী ১৯৪৭-এর ১৩ই আগস্ট Instrument of Accession-এ সই দিলেও ১৯৪৯-এর ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি Tripura Marger Agreement-এ[১০] সম্মতি দেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরার ভারত-ভুক্তি হয় ১৯৪৯-এর ১৫ই অক্টোবর। কিন্তু কেন আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরার ভারত-ভুক্তির জন্য দু'বছর অপেক্ষা করতে হল? এই প্রশ্নের উত্তর সর্দার প্যাটেল সেই সময় যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।[১১] শত শত বছরের প্রচলিত রাজতন্ত্রকে এক কলমের খোঁচায় যবনিকা টানতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল চান নি; কারণ ত্রিপুরা প্রথম থেকেই বিরাট ভারতেরই অঙ্গ হয়ে থাকতে চেয়েছিল, হায়দ্রাবাদ বা অন্য দু-একটা রাজন্য-শাসিত রাজ্যের মত অনিচ্ছুক ছিল না। সুতরাং বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের মৃত্যুতে শোকাহত ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের ইচ্ছা বা অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করতে প্যাটেল চান নি। কিন্তু এই সুযোগে সত্যব্রত মুখার্জী, দুর্জয় কিশোর দেববর্মা এবং 'আঞ্জুমান ইসলামিয়া'র নেতা আব্দুল বারিক (যিনি 'গেদু মিঞা' নামে পরিচিত) - এই তিনজনে কাঞ্চণপ্রভা দেবীকে অন্ধকারে রেখে ত্রিপুরাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার চক্রান্ত সেদিন প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন! স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন গোপন দলিল থেকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে একদিকে ত্রিপুরার ভারতে অন্তর্ভুক্তি এবং অন্যদিকে তথাকথিত 'রাজ্যরত্ন' সত্যব্রত মুখার্জীর পদত্যাগের দাবিতে সেদিন প্রজামন্ডল আন্দোলন ত্রিপুরায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের 'বাণী'তে ব্যাপক শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৪৭-এর ১১ই নভেম্বর 'অল ইন্ডিয়া স্টেটস্ পিউপিলস্ কনফারেন্স' বা প্রজামন্ডলের সহ-সভাপতি পট্টভি সীতারামাইয়া এক বিরাট চিঠিতে[১২] দেওয়ান সত্যব্রত মুখার্জীকে ত্রিপুরা রাজ্যে তথাকথিত শাসন সংস্কারেব নামে যেসব প্রহসন হচ্ছে এবং মধ্যযুগীয় অন্ধকারে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা ডুবে আছে সেগুলি উল্লেখ করে অবিলম্বে শাসন-ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের দাবি তোলেন। ১৯৪৭-এর ২৯শে অক্টোবর সর্দার প্যাটেলের কাছে এক চিঠিতে[১৩] তৎকালীন 'বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এস.এম. ঘোষ অবিলম্বে তথাকথিত 'রাজ্যরত্ন' সত্যব্রত মুখার্জীকে পদচ্যুত করার দাবি করেন, কারণ ত্রিপুরাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার সমস্ত অপচেষ্টার নাটের গুরু তিনিই।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগের 'ন্যাশনাল' গার্ড ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য কেমন ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিল সেটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের ৩রা নভেম্বর, ১৯৪৭ এর রিপোর্ট থেকেই আন্দাজ করা যায় ঃ

"... That the Muslim League National Guards in East Bengal are carrying an open propaganda that Tripura State belongs to East Pakistan and that preparations are being made to invade Tripura. Several pamphlets inciting Muslims to conquer Tripura and annex it to East Bengal are in circulation in Eastern Pakistan."[১৪]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান-এর কাছে ৪ নভেম্বর, ১৯৪৭-এ এই ব্যাপারে যে দীর্ঘ টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন সেটিও একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। নেহেরুর ভাষায় ঃ

"... Tripura acceded to the Indian Dominon before 15 August. Any activities in Pakistan territory intended to support the forcible annexation of Tripura into Eastern Pakistan are clearly an hostile act against the Dominon of India. I request that you will discourage such activities and see that no act of aggression is committed on Tripura.[১৫]

একদিকে দেশভাগজনিত কারণে পূর্ববঙ্গের অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের ত্রিপুরায় প্রবেশ এবং এরই বিপরীতে 'বঙ্গাল-খেদা' আন্দোলন এবং কিছু উপজাতি কে উগ্রপন্থী করার অভিপ্রায়ে 'স্যাংক্রাক' বাহিনীর সৃষ্টি - এক কথায়, বিরাট সামাজিক উত্তেজনা; অন্যদিকে ভিতর ও বাইরের শক্তির মিলিত উদ্যোগে ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার অপচেষ্টা, রাজপ্রাসাদে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র আবার একই সাথে দায়িত্বশীল সরকারের দাবি সহ সমস্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তাল গণ-আন্দোলন - এই ছিল ১৯৪৭-এ রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার পরিস্থিতি। যাই হোক ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে সত্যব্রত মুখার্জীকে ২৭ নভেম্বর, ১৯৪৭-এ দেওয়ান পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। রিজেন্ট কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে শাসনকার্যে সহায়তার জন্য 'দেওয়ান' হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে একে একে কিছুদিনের জন্য আই.সি.এস. ভুক্ত অবনীভূষণ চ্যাটার্জী, বিজয় কৃষ্ণ আচার্য এবং রণজিৎ কুমার রায় ত্রিপুরায় আসেন। রণজিৎ কুমার রায় ছিলেন ত্রিপুরার শেষ 'দেওয়ান' এবং ১৯৪৯-এর ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তি বিধিবদ্ধ হয়ে যাবার পর তিনিই হলেন ত্রিপুরার প্রথম চিফ-কমিশনার। দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হল। যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে ত্রিপুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রেলের যে সুযোগ আগে ছিল, প্রথম তার থেকে বঞ্চিত হল ত্রিপুরা, এরপর বঞ্চনা নেমে এল অন্যান্য ক্ষেত্রেও। অথচ যে ঐতিহাসিক

প্রতিশ্রুতি ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সময় তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দিয়েছিলেন সেটি এই রকম ঃ

"To the people of Tripura, I can only say this: Though far away from the capital city of the country, they will always claim our attention and we shall do our best to ensure that its link and connections are strengthened and it comes nearer to us. They will not stand alone to battle with the manifold problems that confront them. They will have the resources and the assistance of the centre on which they can count."[১৬]

স্বাধীনতার অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত। স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে ঃ এই ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি কতটুকু কার্যকরী হয়েছে? দীর্ঘ দিনের অবহেলা কি আজকের ত্রিপুরার অনেক জটিল সমস্যার মূল কারণ নয়?

সূত্র নির্দেশ

১) ১৯২৯-এর 'ইন্ডিয়ান স্টেটস্ কমিটি' বা বাটলার কমিটির রিপোর্ট।

২) পূর্বোক্ত।

৩) সেক্রেটারিয়েট রেকর্ড রুম, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ রিপোর্ট। বি-২৫, ১৯৪০ ইং।

৪) পূর্বোক্ত।

৫) দুর্গাদাস সম্পাদিত, 'সর্দার প্যাটেল'স্ করেস্‌পনডেন্সেস্ (১৯৪৫-৫০)', পঞ্চম খন্ড।

৬) পূর্বোক্ত।

৭) ভি. গ্রোভার, রঞ্জনা অরোরা সম্পাদিত, 'ডেভলপমেন্ট অব পলিটিকস্ এ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডমঃ নিউ কনস্টিটিউশন এ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম) ১৯৪৭-১৯৫২', তৃতীয় খন্ড, দিল্লী, ১৯৯৪, পৃঃ ৫৫-৫৭

৮) 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন', শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, পৃ. ৩১৪

৯) 'ত্রিপুরা গেজেট', ষটচত্বারিংশ ভাগ, অষ্টম সংখ্যা, শ্রাবণ ২য় পক্ষ, ১৩৫৭ ত্রিপুরা।

১০) 'হোয়াইট পেপার অন ইন্ডিয়ান স্টেটস্', ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ১৯৫০, এপেন্‌ডিক্স ৩১, পৃ. ২২৯-৩১

১১) দুর্গাদাস সম্পাদিত, পূর্বোক্ত।

১২) সেক্রেটারিয়েট রেকর্ড রুম, পূর্বোক্ত, বি ৬১/এস-৬/১৯৪৭

১৩) দুর্গাদাস সম্পাদিত, পূর্বোক্ত।

১৪) ঐ।

১৫) ঐ।

১৬) ঐ।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বাঙালি উদ্বাস্তু ঃ মনুষ্যেতর জীবনের অভিযান

বিমান সমাদ্দার

১৯৪৭-র দেশভাগের পর বাংলার একাংশ পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে বাঙালি হিন্দুর একাংশ প্রাণ ও সম্মানহানির ভয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এ 'উদ্বাসন' ১৯৪৬-৫৫ পর্বে পূর্ণবেগে চলেছিলো। বাংলার এই নতুন জনগোষ্ঠীর আগমন ''দুটি নতুন শব্দ' বাংলা শব্দ ভান্ডারে যুক্ত করে ঃ 'উদ্বাস্তু' ও 'বাস্তুহারা'।[১]

উদ্বাস্তু আগমনের পরিসংখ্যানকে আলোচনা না করে আমি গুরুত্ব দিয়েছি পশ্চিমবঙ্গের উপর উদ্বাস্তু আগমনের অভিঘাতের উপর এ আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের জীবন ও মনন।

উদ্বাস্তুদের জীবন ও পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অবস্থার উপর এই ক্যাম্পজীবন ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছিল। উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেই দক্ষ কৃষক, শিল্পী ইত্যাদি জীবিকাধারী ছিল। পুনর্বাসন না পাওয়ার ফলে তাদের প্রকৌশল ও উদ্যম নষ্ট হতে থাকে। এ কারণে পরবর্তী প্রজন্ম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বিশেষত ঃ ক্যাম্পজীবন উদ্বাস্তুদের মানসিক ভারসাম্যের উপর এক বড় আঘাত হানে। অনেক ক্যাম্পের নিসেন হাটে জীবন্ত মানুষের সঙ্গে দিনের পর দিন মৃতদেহ গাদা করে রাখার ফলে ক্যাম্পবাসীদের মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর ভেদাভেদ অনেক কমে গিয়েছিলো।[২]

আবার নিয়মিত 'ডোল' প্রদান করবার ফলে উদ্বাস্তুরা আর্থিকভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলো। কুপার্স ক্যাম্পের শিক্ষক (প্রাক্তন) সত্যব্রত লাহিড়ী নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ও ডোল প্রদানকে 'সর্বনাশা' ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] আবার সরকার ও ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে উপার্জনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ফলে সরকার 'প্রি-অডিট' ব্যবস্থা চালু করলে উদ্বাস্তুদের ডোল প্রদানে যখন বিলম্ব হয়। তখন তাদের অবস্থা হয় ভয়াবহ।[৪] প্রকৃতপক্ষে ক্যাম্পজীবনের অসহ্য অবস্থা ও ক্যাম্প পরিচালকের হৃদয়হীনতার ফলে উদ্বাস্তুদের নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বিনষ্ট হয়। স্থানাভাবে উদ্বাস্তুরা অনেকসময় বাধ্য হয়েছিলো প্রকাশে যৌনক্রিয়া করত, ধীরে ধীরে নির্বিচার যৌনতাও হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। এভাবে শুরু হয় তাদের নৈতিক ও মানসিক বিকৃতি। এর সঙ্গে হিংস্র পশুর আক্রমণ, আন্দোলন দমন ও জবরদখল উচ্ছেদে পুলিশী অত্যাচার উদ্বাস্তুদের মানসিকতাকে আহত করে - যার প্রতিফলন ঘটে রাজনৈতিক

ক্যাম্পজীবনের ভয়াবহ পরিস্থিতি ও পুনর্বাসনে গাফিলতির ফলে উদ্বাস্তুদের চিন্তন জগতে এক শূন্যতা দেখা দেয়। জীবনের স্থিরতা যে মানুষগুলিকে গঠনমূলক কাজে প্রেরণা দিতো, তারাই ক্যাম্পজীবনে জীবনের ৫-১০ বছর নষ্ট করে। ফলে বৃথা যায় তাদের প্রকৌশল ও উৎপাদনী শক্তি। এ ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারলে লাভবান হতো পশ্চিমবঙ্গ।

সাধারণ বাস্তুহারাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতা তথা মুসলিম বিদ্বেষ যে আকার ধারণ করে, তা থেকে অনেক গুণ বেশি আকারে তা ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের কাছে মুসলিম বিরোধী চেতনার জন্ম দিয়েছিলো - জন্ম নিয়েছিলো এক প্রচন্ড ঘৃণা। বিশেষতঃ শিয়ালদহ (দক্ষিণ) স্টেশনে বসবাসকারী উদ্বাস্তুরা এক পত্রিকা সাংবাদিকের সামনেই বজবজ থেকে আগত এক মুসলিমকে দেয়ালে ঠুকে ঠুকে হত্যা করেছিলো।[৫] অনুরূপ ভাবে এক উদ্বাস্তু ক্যাম্পের জনগণ পার্শ্ববর্তী মুসলিম গ্রাম যেমন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তেমনি এক ইওরোপীয় সাহেবের গাড়ির মুসলিম চালক ও বাধা প্রদানকারী মালিককেও খুন করে।[৬] এগুলি কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয় তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। যদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন প্রদান করতেন, তবে হয়তো এধরণের সাম্প্রদায়িকতা থাকতো না। কিন্তু তাদের ব্যর্থতাই কি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বর্তমান সাম্প্রদায়িক দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য দায়ি নয়?

ক্যাম্পজীনকে ডঃ মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে এক অন্য আঙ্গিকে বিশ্লেষণী করেছেন। তিনি বলেন, নিজ বাসস্থান থেকে উৎখাত উদ্বাস্তুরা ক্যাম্পজীবনে স্বীকৃতি বা সুস্থজীবন কোনটাই পায়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'বাঙাল' বলে অবহেলা। কিন্তু উদ্বাস্তুদের পরবর্তী প্রজন্ম নিজ অস্তিত্ব নির্মাণে সচেষ্ট সে অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে রাজি নয়।[৭]

আব্দুর রউফ উদ্বাস্তুদের 'ছিন্নমূল হওয়ায় তীব্র বেদনা', 'ফেলে আসা স্বর্গসম স্বদেশের জন্য আকুলতা' ও 'নতুন করে স্বর্গভূমি ফিরে পাওয়ার দুর্বার আকাঙ্খার তাড়নায়' উদ্বাস্তুদের জীবনে নানা অস্বাভাবিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষত ঃ একদিকে যেমন তারা পশ্চিমবঙ্গের কাজের মানুষ হতে পারেনি, তেমনি তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো 'সর্বহারা শ্রেণীর কতগুলি বিশেষ লক্ষণ।' প্রচলিত আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ তাদের কাছে হয়ে পড়েছিলো অর্থহীন, তেমনি সমাজবিরোধী কাজও তারা স্বাভাবিক পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলো। পরবর্তীকালে ''ভাসাভাসা মার্কসবাদী চিন্তা' তাদের মধ্যে প্রবেশ করলেও সে 'চেতনায় অদ্ভুত এক ধরণের রিফিউজিকরণ ঘটে যায়'। আর বর্তমানে নীতি মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে 'গোটা সমাজব্যবস্থারই রিফিউজিকরণ ঘটে গেছে,'[৮]

যাইহোক ভয়াবহ উদ্বাসন উদ্বাস্তুদের একটি প্রজন্মকে পঙ্গু করে দেওয়া ছাড়াও এক প্রচন্ড প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছিল, যার ফল ভোগ করতে হয়েছিলো আদি পশ্চিমবঙ্গ বাসীকেও। আবার জীবিকায় সন্ধানে ব্যস্ত থাকায় উদ্বাস্তু ও আদি অধিবাসী অনেকেরই

যে বৌদ্বিক চর্চা ব্যহত হয়েছে। কেন্দ্রসাহায্য বর্জিত পশ্চিমবঙ্গ এখনও এ সকল ঘটনার সম্বিলিত অভিযাত কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

সূত্র নির্দেশ

১) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় — 'দেশভাগ দেশত্যাগ', অনুষ্টুপ। জানুয়ারি ১৯৯৪, কলকাতা

২) প্রফুল্ল চক্রবর্তী — প্রান্তিক মানব ঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, কলকাতা (পৃষ্ঠা ৮৩)

৩) সাক্ষাৎকার --- শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ী (কুপার্স ক্যাম্পের পূর্বতন শিক্ষক), বয়স ৬৫, সোদপুর ২৪ পরগণা (উঃ) - ২৩/১/০১

৪) হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় — 'উদ্বাস্তু' - সাহিত্য সংসদ-প্রথম প্রকাশ-আগস্ট ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৩২০-২৫

৫) প্রফুল্ল চক্রবর্তী — প্রান্তিক মানব

৬) হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় --- উদ্বাস্তু, পৃষ্ঠা ৭০

৭) সাক্ষাৎকার --- শ্রীমতি মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় - ২৪/১/০১ শান্তিনিকেতন।

৮) আব্দুর রউক --- প্রবন্ধ উদ্বাস্তু সমস্যার খতিয়ান, গ্রন্থ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর।
সম্পাদনা — শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১৫ই আগস্ট ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২৬-৩৭

ভারত সরকারের নতুন অর্থনৈতিক নীতি ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

মল্লিকা ব্যানার্জী

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নতুন নয়। অষ্টদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ হওয়ার ফলে ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উত্থান ও পতন তখন থেকেই ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে এবং নানা রকম নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে যারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখন মনে করা হয় যে তারা সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। অধ্যাপক প্রণববর্দ্ধন দেখিয়েছেন কি ভাবে বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ নীতির জন্যে ভারতের অর্থনৈতিক "দান-খয়রাতি ও ভরতুকি" এক বিশাল অংশ অধিকার করে থাকে বিংশ শতব্দীর ষাটের দশকে কারিগরী ও প্রয়োগবিদ্যার ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল ভারত তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি[২] ফলে ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট বক্তৃতার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষণা করলেন যে বর্তমানে ভারতে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা যাচ্ছে তার তুলনীয় কোন কিছুই স্বাধীনতা উত্তর ভারতে ঘটে নি "(We have not experienced any thing similar in the history of indipenmdent India)[৩]

বিদেশী মুদ্রা ও আমদানি শিথিল নীতি ১৯৮৫ সালে গ্রহণ করার ফলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপক ঘাটতি দেখা যায় দ্বিতীয়ত, উপকুলীয় যুদ্ধের (Gulf war) ফলে পেট্রোপণ্যের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে ফলস্বরূপ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা নিষ্ক্রমন হতে দেখা যায়। তৃতীয়ত, আরবদেশগুলি থেকে ভারতে বিদেশী মুদ্রার রপ্তানি প্রায় বন্ধের মুখে এসে পড়ে।[৪] অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা হয়ে পড়লে অনাবাসী ভারতীয়রা ভারতীয় ব্যাংক সমূহ থেকে তাদের সঞ্চিত টাকা তুলে নিতে শুরু করেন ফলে ১৯৯১ সালের মে-জুন মাসে অবস্থা এরকম দাঁড়ায় যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমদানি দ্রব্যগুলি বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে।[৫] ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় আমেবিকান ডলারের হিসাবে ৭০ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ভারতের G.D.Pর এক চতুর্থাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির ফলে এই প্রথম ভারতের পক্ষে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।[৬] বৈদেশিক ঋণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

একই বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার ১৯৮১ সালে শতকরা ৮ ভাগ থেকে ১৯৯১ সালে শতকরা ১৪ ভাগে এসে পৌঁছায়।

সমূহ এই বিপদকে এড়াবার জন্যে ভারতের পক্ষে তখন I.M.F. বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার কাছে বিশাল পরিমাণ দেনা করা ছাড়া উপায় ছিল না। তখন অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন (Structural change) ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, I.M.F. ভারতকে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে টাকা ধার দেয়। এই শর্তগুলিকে অর্থনীতির ভাষায় Stabilization and structural Adjustment বলা হয়।[৭]

S.A.P. ব্যবস্থার দুটি দিক আছে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে (এক) টাকার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করার কথা বলা হয়। যার ফলে আমদানি কৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানি কৃত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাবে। (দুই) মুদ্রাস্ফীতি-রোধের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়। (তিন) কর হ্রাসের দ্বারা বেসরকারি ও সরকারি ব্যয় ঘাটতি হ্রাসের কথা বলা হয়। দূরপ্রসারী ব্যবস্থা হিসাবে S.A.P. অর্থনীতিকে বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত অর্থনীতিতে (Free market) পরিণত করতে চায়। মুক্ত অর্থনীতির ব্যবস্থায় মধ্যে কতকগুলি বিষয়কে সুপারিশ করা হয় যেমন ঃ— (এক) উৎপাদন ও বিপনন ব্যবস্থায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস (দুই) বেসরকারি উৎপাদন ব্যবস্থাকে (দেশী ও বিদেশী) অর্থনীতির সর্বত্র প্রসারিত হতে দেওয়া (তিন) নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বিদেশী দ্রব্য ও সেবার (Service) আমদানি (চার) রপ্তানি বৃদ্ধির সমস্ত রকম সুযোগ বৃদ্ধি (পাঁচ) সমস্ত রকম ভরতুকি (Subsidy) প্রথমে হ্রাস এবং পরে বন্ধ করে দেওয়া (ছয়) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহনের মত সামাজিক সেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নেতিবাচক ভূমিকা। সমস্ত ব্যবস্থা গুলিকে একত্রে Liberalization, Privatization, Globalisation (উদারীকরণ, বেসরকারি করণ ও বিশ্বায়ন) বা LPG নামে বিখ্যাত হয়ে আছে[৯]

বিশ্বায়নের কার্যসূচির সঙ্গে কিভাবে আমরা শিক্ষাকে যুক্ত করব? ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদ মূলধন, শক্তি (energy), ও মানব সম্পদের উপর নির্ভর করে।[১০] সাম্প্রতিক কালে মনে করা হয় যে মানুষের জীবন যাত্রায় গুণগত মান উন্নত করার পটভূমিতে উন্নয়নের বিচাব করা উচিত। জীবন মাত্রার গুণগত মান বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা আবাসন ইত্যাদি[১১] অর্থনৈতিক উন্নয়ন আধুনিকতাকে বহন করে নিয়ে আসে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিকতার অন্যতম অর্থ আরও বেশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা এবং সামগ্রিক ভাবে অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তোলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে পুরাতন ও প্রথাগত বিদ্যাগুলিকে ভাল করে আয়ত্ত করা ছাড়াও নতুন উদ্ভাবিত বিদ্যাকে মানব কল্যাণের

কাজে লাগান যাবে। নতুন উদ্ভাবিত বিদ্যাগুলির মধ্যে আমরা IT (Information Technology) সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে জোর দিতে পারি কথা কমপিউটার শিক্ষা, যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সব রকমের আধুনিক জ্ঞান ও পরিবেষা বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারীং ইত্যাদি, নতুন অধীত বিদ্যাগুলি বিশেষ করে কম্যুনিকেশন টেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এইসব বিষয়ের জ্ঞানকে এখন দেশের সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়।[১২] প্রধান প্রধান OECD দেশগুলির অর্ধেকেরও বেশি GDP তথা ও জ্ঞান নির্ভর অর্থাৎ নতুন কারিগরী ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর নির্ভরশীল।[১৩] জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা নয়, শুধুমাত্র অনুকরণের দ্বারাই দেশের প্রগতি কিয়দংশে করা সম্ভব। (Gross Domestic Product) এখন Software Programming-এ ভারতের অগ্রগতি এর একটা দৃষ্টান্ত।

জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও অক্ষর পরিচয়হীন কমপিউটারের সাধারণ কৌশলের সঙ্গে অপরিচিত মানুষের পক্ষে এর সুযোগ নেওয়া সম্ভব হবে না। ১৯৯৫ সালে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৪০ ভাগ বয়স্ক লোক অশিক্ষিত ও অক্ষরপরিচয় হীন। ২৪ টি দেশের শতকরা ৮০ ভাগ শিশুর বিদ্যালয়ের খাতায় নাম নেই (Enrolment)[১৫]। সুতরাং আধুনিকতম জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে প্রসারিত করতে হলে দুটি নীতি প্রথমে গ্রহণ করতে হবে। (এক) শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি। (দুই) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ।[১৬]

কয়েকটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বোধ হয় আমাদের বক্তব্যকে তুলে ধরা যাবে। ১৯৫০ সালেও ঘানা ও কোরিয়ার প্রজাতন্ত্রের মাথাপিছু আয় প্রায় একরকম ছিল কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে কোরিয়ার মাথা পিছু আর প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পায়। এটা সম্ভব হয়েছে কোরীয় জনগণের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন ও ব্যবহারের সাফল্যের উপর। ১৯৮৫ সালেই দক্ষিণ কোরিয়ার শতকরা ৮৫ ভাগ ছেলে মেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং পরবর্তী কালে এই শিক্ষার্থীদের বিশাল একটি অংশ কারিগরী বিদ্যায় নিয়োজিত; হিসাবটা হচ্ছে প্রতি দশ হাজারে ১৯৩১ জন[১৭] আবার চীনের ক্ষেত্রেও এই একই চিত্র দেখা যাবে। চৈনিক ও ভারতীয় সহযোগিতায় লেখা Socity and development in Chaina and India বারংবার চীনের অভূতপূর্ব উন্নতির জন্যে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে শিক্ষাকে দায়ি করা হচ্ছে[১৮] চৈনিক পন্ডিত zon ping একে "বিপ্লব" বলে মনে করেন।[১৯] ১৯৯৫ সালে চীনে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠান সম্ভব হয়েছে, প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে চীনে প্রতি হাজারে ২৩টি সংবাদপত্র, ১৬১ টি রেডিও সেট, ২৫২টি টি.ভি সেট ইত্যাদি। শতকরা ৩ জনের আছে ব্যক্তিগত কমপিউটার, ১৯৯৫ সালে প্রতি লক্ষে ৫৩৭ জন বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনীয়ার।[২০] কোন রকম পরিসংখ্যান না দেখেই বলা যায় যে চীনে ১৯৪৯ সালে চিত্রটা এরকম ছিল না।

ভারতের অবস্থা আর একটি বিপরীত এবং অতটা উৎসাহব্যাঞ্জক নয় ব্রিটিশ শাসনের প্রথম অর্ধশতকে উন্নয়নের হার প্রায় শূন্য।[২১] শিল্প ও কৃষির গঠনগত ত্রুটির (Structural Distortion)[২২] জন্যে বিশেষ কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হওয়ার ফলে ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একজন অংশীদার। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাক্ষরতার হার বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম[২৩] এই অবস্থায় অনেকটা উন্নতি ঘটানো গেছে। গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায় ২৫ ভাগে নিয়ে আসা গেছে। উত্তর ভারতের হিন্দি স্ত্রী লোকদের নিরক্ষরতার হার এখনও বেশি। মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতা নিয়ে নানা রকম আলোচনা করা যায় কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে একটি আলোচনাই প্রাসঙ্গিক হবে তা হল জনগণের একটি বিরাট অংশকে শ্রমজীবী জনতার সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি ফলে তাদের শ্রমজনিতকাজ অদৃশ্য থেকে গেছে। আবার চীনের বিশাল উন্নতির মূলে আছে (ক) মেয়েদের মধ্যে সার্বিক সাক্ষরতা (খ) শিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত মুক্তির চীনের মেয়েদের শ্রমজীবী জনতার একটি অংশতে পরিণত করেছে[২৫]। সুতারাং বিশ্বায়নের অর্থনীতির পরিপেক্ষিতে ভারতকে এখনই প্রায় ৩৩ কোটি শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে (দুই) এই শিক্ষার্থীরা যাতে এদের পড়া নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে পারে তা নিশ্চিন্ত করা (তিন) প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি ঘটাতে হবে[২৬]।

কারিগরী শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যার দিকে থেকে ব্যাপারটিকে আরও গভীর ভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত ও কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ শ্রমজীবী জনতার অব্যাহত যোগান। এই অবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ভারত সরকার ১৯৫০ সাল থেকে কারিগরী ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বন্ধে সঠিক নীতি নির্দ্ধারণে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। ১৯৫০ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ভারত সরকার শিল্পনীতিতে চারবার ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন, প্রথম পর্যায়ে ভারত সরকার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক শিল্প গুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে রেখে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনকে বেসরকারি শিল্পের অধীনে রাখা ওপর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিদেশী কারিগরী কৌশল ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা। ১৯৮৫-৯০ সালের মধ্যে ভারত সরকার ৫,২০৩ টি বিদেশী কোম্পানির সাথে চুক্তি অনুমোদন করেছেন এবং বিদেশী কোম্পানি গুলি ভারতে এখন একটি আলাদা শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠেছে।[২৭]

যদিও ভারতে ১৯৫০-১৯৮০ সালের মধ্যে শিল্পের আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী বহু "Standered Tech" এবং "High Tech" শিল্প গড়ে উঠেছে কিন্তু এই শিল্পগুলি নির্ভর করছে আমদানিকৃত কৃৎ কৌশলের উপর। প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের দিক থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়াররা বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র ও মৌলিকত্ব

দেখাতে পারেন নি।[২৮] ১৯৮১ সালের এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে ভারি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলির শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কৃষির উপর নির্ভরশীলতা এখনও অনেক বেশি[২৯]। তৃতীয়তঃ ভারতের প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো একটি সুবৃহৎ কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ শ্রমবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম নয়, চতুর্থত উন্নয়নের স্বার্থে জরুরি ছিল সকলের জন্যে সার্বিক মাধ্যমিক শিক্ষা। পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলি সবাই এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে এই লক্ষ্যের অর্ধেক সীমাও অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে সরকারি অর্থ উচ্চ শিক্ষার জন্যে প্রচুর পরিমাণে খরচ করা হয়েছে, ফলে শিক্ষার একটি "ওলটানো পিরামিড"[৩০] (Inverted Educational Pyramid) গড়ে উঠেছে, যা কোনো মতেই আকাঙ্খিত নয়। কার্য কারিতার দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানই উপযুক্ত মানের নয়। Far Eastern Economic Review (১৯৯২) ভারতের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ভারতের বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের এই সব বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত গবেষক ও বিজ্ঞানীরা কোনো ব্যাপক ও বিশাল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন নি।৩১

ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষার সামনে নানা রকম সমস্যা আছে। মোটামুটিভাবে তাদের দুভাগে ভাগ করা যায়। (ক) বিবেচনাহীন পরিকল্পনা এবং তার ফলে উন্নয়নের হার হ্রাস (খ) ১৯৯১ সালে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার ফলে দেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং তদ্‌জনিত সমস্যা।

প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে স্বাধীনতা উত্তর কালে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিস্ফোরণ ঘটে গেছে এরকম দাবি করা যেতে পারে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় সমস্ত দেশে ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭০০টি স্নাতক স্তরের কলেজ ছিল এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল প্রায় ১.০৬ লক্ষ। ১৯৯০ এর দশকে এসে সেই সংখ্যা গিয়ে দাড়ায় ১৭১টি বিশ্ববিদ্যালয় ৭০০টির বেশি স্নাতক স্তরের কলেজ, ২৬.৩১ লক্ষ শিক্ষক। শিক্ষিক এবং প্রায় ৪৪.২৫ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী কিন্তু এই বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা অন্তে চাকুরি প্রাপ্তির কোন সুযোগ নেই[৩২] দ্বিতীয়ত বৃদ্ধি সত্ত্বেও সমগ্র দেশের ১৮ থেকে ২৩ বছরের জনসংখ্যার মোট ছয় শতাংশ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে এবং তৃতীয়ত উচ্চ শিক্ষার বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ শিক্ষার জন্য সামগ্রিক ব্যয় বরাদ্দ অত্যন্ত কম।[৩৩] ১৯৯৭-৯৮ সালে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) শতকরা ৩.৬/ ভাগ শিক্ষার পিছনে ব্যয় করা হয়। (ক) ১৯৯২ সালে UNICEF এর প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয় যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে শিক্ষিত করতে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার দ্বারা ৬০ থেকে ৭০টি প্রাথমিক স্তরের ছেলে/মেয়ে শিক্ষা দান করা সম্ভব। দেশের অর্ধেকের বেশি ছেলে মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে না, অথচ

দেশের অর্থনীতির সমস্ত স্নাতক ও স্নাতক উত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের চাকুরি দেবার ক্ষমতা নেই। প্রাথমিক স্তরের অগণিত ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্যে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের অর্থ সংস্থান করা উচিত।[৩৪]

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৮৬ সালে ভারত সরকার নতুন শিক্ষা নীতি গ্রহণ করেছেন, এর পর অর্থনৈতিক জগতে বিশাল সব পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে এই নতুন অর্থনীতির মূল কথা হল বিশ্বায়ন উদারীকরণ ও বেসরকারি করণ, বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্রব্য ও সেবা ইত্যাদি বস্তুর স্বাভাবিক বাণিজ্যিক বিনিময় ঘটবে। শিক্ষার জগতে জ্ঞানের বিনিময় এবং উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদের পাড়ি দেওয়া ছিল এক স্বাভাবিক ঘটনা।[৩৫] অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মনে করেন বিশ্বায়ন এই স্বাভাবিক ঘটনাকে অস্বাভাবিক করে তুলতে পারে। Saftware Development বা বহু জাগতিক সংস্থাগুলি এখন থেকে বেশি সংখ্যায় ভারতে তাদের বিপনন সংস্থা এবং MNC ইত্যাদি জন্যে অফিস খুলবে। শিক্ষিত ভারতীয়রা ভারতীয় মুদ্রায় আশাতীত কিন্তু আমেরিকান ডলারের পরিপেক্ষিতে কম মুদ্রায় বেতন পাবে। বড় কথা তারা ভারতে বাস বিদেশী সংস্থা বিদেশী রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং প্রয়োজনে দৃঢ় করবে। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বায়ন উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে High Tech সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যা। ম্যানেজারিয়াল পাঠক্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং কলা বিদ্যার বিষয়গুলির বর্তমান কাঠামোকে পরিবর্তন করে তাকে যুগোপযোগী না করলে তাদের চাহিদা হ্রাস পাবে।

তৃতীয়তঃ বিশ্বায়ন শিক্ষাকে প্রতিযোগিতা মূলক করে তুলতে পারে। বিশ্বায়নের ফলে ভারতীয় শিল্পগুলির মধ্যে মান বজায় রাখার সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই সচেতনতা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির কাছ থেকে আশাকরতে পারি।

চতুর্থতঃ IT বা Information Technologyর বিস্তারের ফলে জ্ঞানের বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীভূত করা যাবে না; গতানুগতিক পাঠক্রমও পাঠপদ্ধতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বাধ্যতামুলক ভাবে গবেষণা ভিত্তিক হতে হবে বিশ্বায়ন জ্ঞানের পৌনপুনিকতাকে (Information Technology) রোধ করবে গবেষকরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একই বিষয়ের উপর গবেষণার খোঁজ রাখতে পারবে।

বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে প্রাথমিকও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের উপর চাপ থাকার ফলে সরকার উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব পূর্বের ন্যায় গ্রহণ করতে পারবেন না। শিক্ষার উন্নয়নের দায়িত্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে বহন করতে হবে এবং বিভিন্ন সময়ে বেসরকারি সংস্থায় কাছে বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থী হতে হবে কিন্তু সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে বেসরকারি করণের নামে যেন ধর্মান্ধতা ভারতীয় মূল্যবোধ বিরোধী শিক্ষাদর্শ যেন প্রবেশ না করে এবং অর্থ নয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন শিক্ষার্থীর মেধাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদারীকরণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে শিল্পের উদারীকরণের মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পূর্বের মত অনমনীয় নীতি আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে পারবেন না, ভর্তি/পরীক্ষা/পাঠক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদার ও নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুন বিষয় (যেমন Advertising) গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে পড়ার সুযোগ ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে করে দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক স্তরের ফলে কলেজগুলিকে আরও বেশি শিক্ষাগত স্বাধীনতা দিতে পারেন, এই প্রশ্ন শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বশাসন বা autonomy প্রশ্নটি নিয়ে আসে, কিন্তু autonomy স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় তা উদারীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

মার্কেন্টালিজম্ বা বেনেবাদী অর্থনীতিতে মূল্যবান ধাতুকে সম্পদ বলে গণ্য করা হত, বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ধাতব মুদ্রার সংগ্রহ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য অব্যাহত রাখার জন্য উপনিবেশ বিস্তারের উপর জোর দেওয়া হত। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব ধারণা অবাস্তব ও মূল্যহীন। এখন জ্ঞানকেই সম্পদ বলে মনে করা হয়। কারণ প্রতিটি অর্থনৈতিক কাজকর্ম জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যথায় উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব বাজারি অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক, উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় করা হচ্ছে, আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর অধিকার নতুন এক বৈষম্যের সৃষ্টি করছে। সেই বৈষম্য যারা জানে এবং যারা জানে না, নতুন জ্ঞানের বলীয়ান দেশগুলি যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাবকে সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমের উপর অধিকারের ফলে শক্তিশালী দেশগুলি সারা পৃথিবীর সংস্কৃতি ও জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, এই পরিস্থিতিতে বিশ্বায়ন ভারতের জন্য কোন নৈরাজ্য নিয়ে আসে কিনা অথবা একবিংশ শতাব্দীতে ভারত পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলির মত হয় কি না, তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

সূত্র নির্দেশ

1) প্রণব বর্দ্ধন
2) বিমল জালান।
3) The Indian Economy, ed. (Bimal Jalan)
4) Vaidyanathan
5) Bimal Jalan. ed.
6) M. R. Bhagavan
7) M. R. Bhagavan
8) Vaidyanathan
9) নন্দিতা বসাক
10) NSOU (নেতাজী)

11) নেতাজী
12) Human Development Report
13) Human Development Report
14) M. R. Bhagavan
15) World Development Report.
16) World Development Report
17) M. R. Bhagavan
18) Society & Development in China as reviewed by Arun Ghosh.
19) ঐ
20) World Development Report
21) Bipan Chandra (Indian Eco.) Bimal Jalan, ed.
22) Dandekar & Rath
23) Pravin Vigaria
24) Pravin Vigaria
25) India China development
26) India Development Report
27) M. R. Bhagavan
28) ঐ
29) C. H. Hanumantha Rao
30) M. R. Bhagavan
31) ঐ
32) D. N. Ghosh (Future of India, edn.)
33) Om Prakagh (New Education policy & Higher Education in India)
34) J. C. Aggarwal
Educational Reformg in India in the 21st century
35) Omprakash

স্বাধীনতা উত্তরযুগে একটি ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত উন্নয়ন প্রসঙ্গ শ্রী শিক্ষায়তন

খালেদা গণি

আজকের দিনে 'মাড়োয়ারি' শব্দটা শুনলেই আমাদের মনে একটা নির্দিষ্ট ছবি ভেসে ওঠে। 'তারা রাজস্থানের এক ব্যবসায়ী জাতি — এই ধারণাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে বালাচাঁদ মোদীর মতে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দু সনাতন ধর্ম বা অহিংস জৈনধর্মাবলম্বী ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস বা আস্থা মাড়োয়ারি জাতির মধ্যে এনেছে একতা---অচ্ছেদ্য বন্ধনে তারা আজ আবদ্ধ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা স্বীকৃতি লাভ করে বাংলায় মোগল শাসনের আগে থেকেই। আকবরের শাসন কালে তারা রাজা মান সিংহের সহযোগিতার প্রচাব কর্ম শুরু করে। আঠারোশো শতাব্দীর শুরুতেই তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দখল করে।

প্রথম থেকেই মাড়োয়ারিদের মধ্যে দেখা যায় স্বজাতি-প্রেম, দৃঢ়তা, সঙ্ঘবদ্ধতা ও একাত্মতা গোড়া হিন্দু পরিবারের মত মাড়োয়ারি পরিবারও সুবৃহৎ কারণ। একটাই তারা মহিলাবর্গ ও শিশুগণকে নিরাপত্তার কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে।

কোলকাতার মাড়োয়ারি সমাজ 'তিনটি ধাপে' ক্রমোন্নতির পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল। ঐতিহ্যগত বা পরম্পরাগত পথ অতিক্রম করে তারা আধুনিক চিন্তাধারা সমন্বিত সমিতিতে পদার্পণ করে। তাদের প্রথম প্রয়াস, পুরাতন জাতি প্রথাগত পঞ্চায়েত গঠন — দ্বিতীয় প্রয়াস একটি পৃথক সামাজিক শ্রেণী গঠন করা যা সমিতির উন্নয়নের কাজে থাকবে লিপ্ত। সর্বশেষে কিছু আধুনিক সংস্থা গঠন যা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা বা ভাবধারা অন্যান্য দলের মধ্যে প্রতিফলিত করবে সমক্ষতার সঙ্গে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মুষ্টিমেয় মাড়োযারি সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শিল্পজগতে পদার্পণ করেন যেমন- তুলো, সিমেন্ট বা চিনি কল এ। কিছু কিছু মাড়োয়ারি শিল্পপতিদের উদ্ধত আচরণ আপন কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস তাদের শত্রু সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। তাদের ব্যবসায়ী রীতি-নীতি, ধ্যানধারণা বিশ্বাস, তাদের সাফল্য. অনেকেরই রাগের ও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

নতুন শতাব্দীর সুচনাতেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বজাতির প্রতি এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি মুখ্য অংশ গ্রহণ করতে পারে না। কোলকাতার বিশিষ্ট উচ্চবংশীয়

লোকেদের পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা ও ভাবভঙ্গীর ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মাড়োয়ারি সমাজ অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয় মহিলা শিক্ষা বা মহিলা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাদের উদার মনোভাব প্রকাশ পেত না। সামাজিক অগ্রগতি বা উন্নয়নের জন্য কিছু যুবক একটি নতুন ধরণের অনিয়মিত সংস্থা গড়ে তুলতে, উদ্যোগী হয়। যারা এই সংস্থার সৃষ্টিকর্তা বা উদ্যোক্তা তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কী করে সামাজিক মানসিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়কে উন্নতির সোপানে উন্নীত করা যায়। তাদের যথাযথ মৌলিক অধিকার, মানসিক বিকাশ বা উদ্দেশ্য সাধন চিন্তাও এই সংস্থার কর্তব্য।

এহেন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যিনি সদর্পে এগিয়ে আসেন তিনিই পরম পূজনীয় শ্রী সীতারাম সাক্সেরিয়া। তিনি কিন্তু মন্ত্রীজি নামেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে মাড়োয়ারি মহিলা সমাজকে আলোর দিকে পথ নির্দেশ করলেন তিনি। তিনি তাঁর স্বপ্ন সার্থক করতে বদ্ধ পরিকর। অক্লান্ত পরিশ্রম উপেক্ষা করে অগাধ বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নামলেন 'মহিলা-শিক্ষা-বিস্তারে'। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তারই বন্ধু শ্রী ভাগীরথ কানোড়িয়া। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন মেয়েদের জন্য 'মাড়োয়ারি বিদ্যালয়। সীতারামজির জন্মস্থান যদিও রাজস্থান কিন্তু এই সমাজ সেবক ও সমাজ সংস্কারকের কর্মস্থল কিন্তু এই বাংলা। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন ও ১৯১৭ সালে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের সদস্য হন। গান্ধীজি, লোকমান্য তিলক ও যমুনালাল বাজাজের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের আদর্শ ও ভাবধারা গ্রহণ করেন সীতারাম সাক্সেরিয়া।

'মন্ত্রীজি' বিশ্বাস করতেন যে মনুষ্যজাতির বিকাশ ও উন্নতি তখনই সম্ভব যখন মানবজাতি ঐতিহ্যবাহী পারম্পরিক ভাবধারা হৃদয়মনে গ্রথিত করবে ও সেখানে মুখ্যভূমিকায় থাকবে মহিলা উন্নত সামাজিক ধারা বজায় রাখতে মহিলাদের মানসিক বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হতে হবে। সেই জন্য বলা হয় — 'একটি শিশু পুত্রকে শিক্ষা দান করা মানেই ব্যক্তি বিশেষকে শিক্ষাদান করা; কিন্তু একটি শিশুকন্যাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করার অর্থই সম্পূর্ণ পরিবারবর্গেই শিক্ষার বিস্তার।

শ্রী সীতারাম সাক্সেরিয়া মাড়োয়ারি মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুন্নত সামাজিক অবস্থা দেখে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ স্থির করেন যে সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে নানা বাধা তিনি অচিরেই দূর করবেন। মাড়োয়ারিদের মধ্যে রক্ষণশীলতার মনোভাব, অনেকটাই মুসলমান সমাজের মতই। সীতারামজি সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধাচারণ করেন। মাড়োয়ারি গৃহকোণে 'পর্দা' ব্যবস্থা বা রীতি তথা বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেন মন্ত্রীজি। ফলে তিনি বন্ধুমহলে ও পরিবারের বহু বিবাহ উৎসবে যোগদানে বঞ্চিত হন। তিনি কিন্তু এতে দমলেন না, নতুন উৎসাহে উদ্দীপনায় তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। মহিলাদের বিকাশ-ক্ষেত্রে যা কিছু বাধা সৃষ্টি করেছিল তা তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় তিনি জানিয়ে দিলেন।

সেই থেকেই তিনি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন মাড়োয়ারি 'শিশু কন্যার' প্রতি। তখনকার দিনে মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রচলন ছিল না বলেই আর্থিক সংগতি থাকলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে পড়াশুনা ছিল স্বপ্নেরও অতীত। সামান্য অক্ষর পরিচিতি বা ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয়ই ছিল তাদের শিক্ষার পরিধি।

বলা যেতে পারে এই সব নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি 'মাড়োয়ারি বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে এটি স্থাপিত হয়েছে। সীতারামজি বিশিষ্ট শিল্পপতিদের সাহায্য গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, পন্ডিত ছোটেলাল মিশ্র, গঙ্গাপ্রসাদ বটিকা, ভাগীরথ কানোড়িয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। শুরু থেকেই সীতারামজি এই বিদ্যালয়টির সাথে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে তিনি নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। জলন্ধর, পুনা, প্রয়াগের বিভিন্ন মহিলা বিদ্যালয়ের আদর্শ ও ভাবধারা গ্রহণ করে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতি করতে চেষ্টা করেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একটি 'আদর্শ প্রতিষ্ঠান' গড়ে তুলতে সফল হন।

মাড়োয়ারি মেয়েদের ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষা'র বিষয়টি তিনিই প্রথম প্রচলন করতে চেষ্টা করেন। সংস্থার সদস্যদের কাছে তাঁর বক্তব্যটি পেশ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি গৃহীত হয় না এবং ঠিক হয় যে ছাত্রীদের অভিভাবকদের অনুমতি তথা স্বাক্ষরের জন্য তাদের কাছে সেটি প্রেরণ করা হবে। সীতারামজি ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের ইংরেজি শিক্ষাব অনুমতি চান কিন্তু সংস্থার সদস্যরা চায় যে ইংরেজি বিষয়টি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত হোক। পন্ডিত হীরালাল শাস্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ে মন্ত্রীজিকে প্রভূত সাহায্য করেন। শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন রাজস্থানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কোলকাতা ছিল তাঁর বাসস্থান।

মাড়োয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রীজি কিন্তু খুশি হতে পারছিলেন না। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে উন্মুক্ত প্রান্তর থাকবে - থাকবে অভিনব আধুনিক সাজসরঞ্জাম যা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাবে। তিনি কোলকাতার 'লরেটো হাউসের' সমান একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতেও পারেননি যে তাঁর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। শ্রী শিক্ষায়তন সৃষ্টির বীজ এভাবেই বপন করা হয়। প্রয়োজন ছিল একটি 'আদর্শ' স্থানের।

মন্ত্রীজির ইচ্ছাপূরণ হয় তখনই যখন তাঁর চোখ পড়ল কলকাতার লর্ড সিনহা রোডের উপর। এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন স্যার আগা খান। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল উপযুক্ত অর্থের অভাবে। এহেন অবস্থায় মাড়োয়ারি সমাজ বা সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৫২-১৯৫৩ সালে ভাগীরথ কানোড়িয়া ও অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে সীতারামজি সকাল ৭টা থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য পদব্রজে যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কুড়ি থেকে পঁচিশ লাখ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। বন্ধু পরিচিত ও শুভাকাঙ্খীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ একদিন ১১নং লর্ড সিনহার

বাড়িটি কেনা হল। ১৯৫৪ সালের ৩রা জানুয়ারি শ্রী শিক্ষায়তনের নামকরণ হয় ও উদ্বোধন করেছিলেন বাংলার রাজ্যপাল শ্রী এইচ. সি. মুখার্জি। শ্রদ্ধেয় মুখার্জি মহাশয় মন্ত্রীজিকে সমর্থন করেন কারণ 'তিনি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, এবং তিনি ছিলেন নানা সৎ গুণে বিভূষিত।' (মন্ত্রীজির ডায়েরি থেকে ১৯৫৩)

স্যার আগা খানের পুরানো বসতবাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়। পরিবর্তে চারিটি অট্টালিকা নির্মিত হয়। শ্রী শিক্ষায়তনে আছে— (১) প্রাথমিক বিভাগ, (২) কলেজ (৩) মাধ্যমিক বিভাগ (৪) মেয়েদের জন্য সাঁতারের সুবন্দোবস্ত। বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীযুক্ত মিহির সেন সাঁতারের জায়গাটি উদ্বোধন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে বি. এড বিভাগও আছে। শুধু তাই নয় এছাড়া এখানে আছে একটা সুবৃহৎ কক্ষ এবং দুটি ছাত্রীবাস একটি স্কুলের ও একটি কলেজের ছাত্রীদের জন্য। প্রথমে ছাত্রীসংখ্যা ছিল আড়াই হাজারের মত। চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ১১৩ ছিল ১৯৭৪ সালে অবধি। এক লক্ষ টাকা ছিল প্রতিষ্ঠানের বাজেট। সাঁতার শিক্ষাদানের জন্য দুজন শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হয়। সাঁতারের ছাত্রীসংখ্যা ছিল দশ হাজারের মত। স্কুল কর্তৃপক্ষ আটটি বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসব সুবিধা থাকার জন্য প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই কোলকাতার একটি নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হয়। 'শ্রী শিক্ষায়তন' সীতারাম সাক্সেরিয়ার স্বপ্নের সার্থক ফল। মন্ত্রীজির কথায় বলি 'দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে মাড়োয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে যা কিছুর অভাব ছিল — শ্রী শিক্ষায়তনের সৃষ্টি তা দূর করে দিল — আমার স্বপ্ন সার্থক রূপ পেল।' (১৯৫৩ - মন্ত্রীজির ডায়েরি থেকে) আমি সত্যিই আনন্দিত কিন্তু এখনও আমার করার আছে অনেক কিছু ......

সীতারামজি যদিও শিক্ষাবিদ ছিলেন না তথাপি তিনি যেভাবে মাড়োয়ারি বালিকদের শিক্ষাদানে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তিনিই প্রথম মাড়োয়ারি কন্যাসন্তানদের শিক্ষিত কবার পথপ্রদর্শক। সীতারামজি তাঁর বন্ধু ভাগীরথ কানোড়িয়ার সাথে একযোগে অর্থ সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে হিন্দি ভবন স্থাপন করেন। মন্ত্রীজি শ্রীমতী বীণাদাসকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। শ্রীমতী দাস ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সময় বাংলার গভর্নর জেনারেল স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে বীণা দাস হত্যা করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। সেই সময় তিনি মাড়োয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্ত্রীজিকে স্নেহের চোখে দেখতেন। শ্রীমতী দাসের ঘটনা শুনে গুরুদেব বলেছিলেন মাড়োয়ারি সম্প্রদায় শুধু ধনী সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত নয়, তারা মানসিক ভাবে উদার, হৃদয়ও যেন সদগুণের আকর।"

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রী শিক্ষায়তন আজ সর্বভারতীয় সম্প্রদায়ের কাছে তার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। মুষ্টিমেয় আড়াই হাজার ছাত্রী সংখ্যা ছিল যে প্রতিষ্ঠানটির

আজ শুধু প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা দু হাজারেরও বেশি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাশের হার শতকরা একশ ভাগই। পঁচাত্তর শতাংশ ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ১৯৫৫ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন এম. এম ভট্টাচার্য। ডক্টর কুসুম খেমানী শ্রীমতী মুশীলা সিংহী প্রমুখ ছাত্রীরা আজ সমাজের বিশিষ্ট স্থানাধিকারী ও সমাজ সেবিকা। ড. কুসুম খেমানী হিন্দী অভিধান 'সচিত্র হিন্দী বালকোষ' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই আজ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক বিভাগের সভাপতির পদে নিযুক্ত শ্রীমতী আইসার 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর্ রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশানাল ইকনোমিক রিফর্মসের ছিলেন অধিকর্তা ও মুখ্য সচিব। বিচারপতি আলুওয়ালিয়া এই প্রতিষ্ঠানেই পড়াশুনা করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মাধ্যম ছিল হিন্দী অধুনা ইংরেজিই শিক্ষার মাধ্যম।

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আজ আমরা সংকীর্ণতামুক্ত জাতিপ্রথা সাম্প্রদায়িকতা, পরস্পরে হানাহানি আজ আমাদের হৃদয়মনকে কলুষিত করতে পারে না। মহিলা শিক্ষা বা মেয়েদের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আজ সর্বাধিক উন্নতি করেছে মহিলারা আজ আর পিছিয়ে পড়ে নেই পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে তারা জীবনের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। ক্রমাগত তারা উন্নতির উচ্চশিখরে উন্নীত হয়ে চলেছে। শ্রী শিক্ষায়তন যেন সাফল্যের চাবিকাঠি তারই যাদুস্পর্শে আমরা সবাই অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে চলেছি। আলো দাও অন্ধকার দূর করো এই মন্ত্রই জীবনের পাথেয় করে আমরা এগিয়ে যাব ভবিষ্যত উন্নতির পথে।

সূত্র নির্দেশ

১) সীতারাম সাক্সেরিয়ার ডায়েরি (১৯৫৩-১৯৫৪)

২) পদ্মভূষণ শ্রী সীতারাম সাক্সেরিয়া 'অভিনন্দন গ্রন্থ' (ভারত স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ) ভওয়রমল সিংহী

৩) এক কর্মকর্তার ডায়েরি (ভাগ - ১ম, ২য়) ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন।

৪) 'মেরা বাবুজী সীতারাম সাক্সেরিয়া'— লেখিকা পান্নাদেবী পোদ্দার (কন্যা)

৫) ভারতীয় ভাষা পরিষদ পত্রিকা সীতারাম সাক্সেরিয়ার জন্মশতাব্দী বিশেষক

৬) সীতারাম সাক্সেরিয়ার জন্মশতাব্দীতে প্রকাশিত পত্র-বাঙ্‌ময়

৭) সীতারাম সাক্সেরিয়া জন্ম শতাব্দী - গ্রন্থ,
ভূমিকা - শ্রী রামকৃষ্ণ বাজাজ
সম্পাদক - ডঃ রমেশ ভরদ্বাজ

বর্তমান ভারতবর্ষে বিদেশীদের দ্বারা দত্তক গ্রহণ একটি জাতীয় সমস্যা

নিবেদিতা চক্রবর্তী

"পুত্রদান" কথাটি ভারতীয় শাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। পুত্রদান মানেই দত্তক গ্রহণ করা। দত্তক গ্রহণ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত এবং তা ধর্মীয় রীতিনীতি ও শাস্ত্র সম্মত ভাবেই গ্রহণ করতে হোত সন্তানহীন স্বামী-স্ত্রীদের।

দত্তক নেওয়ার মূল কারণ ছিল নিঃসন্তান দম্পতির ধর্মীয় পুত্রলাভ এবং তাদের মৃত্যান্তে ধর্মীয় ক্রিয়াদি ধর্মপুত্র দ্বারা সম্পাদনা করান এবলং নিঃসন্তান দম্পত্তির ত্যক্ত সম্পতির উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

ভারতের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস থেকে জানা যাবে যে প্রত্যেক যুগেই বিশেষভাবে হিন্দু রাজা ও জমিদাররা যাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন তাঁরা তাঁদের রাজা বা জমিদারির উত্তরসূরি নির্বাচন ও তাঁদের মৃত্যু অন্তে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পুত্রদ্বারা সম্পাদনের কারণে দত্তক নিতেন। তবে প্রাচীনকালে "পুত্রদান" (দত্তক) সংক্রান্ত কোন লিখিত আইন ছিল না এবং কেবলমাত্র হিন্দু পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন ধরণের পূজা পার্বণের মাধ্যমে "পুত্রদান" পদ্ধতি চালু ছিল। যে নিঃসন্তান দম্পতি পুত্র গ্রহণ করেন তাঁদের দত্তক পিতা ও মাতা বলা হয় এবং যে পুত্রকে দত্তক নেওয়া হয় তার পরিচয় হয় দত্তক পুত্র। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শাস্ত্রে "পুত্রদান" কথাটি বিশেষভাবে প্রচলিত এবং তা শাস্ত্র সম্মত।

কিন্তু "কন্যাদান" কথাটি বলতে আমরা দত্তক কন্যাকে বোঝাই না কারণ শাস্ত্রে কন্যাদান মানে বিবাহ যোগ্যা কন্যাকে পাত্রস্থ করা। সুতরাং 'কন্যাদান' এই কথাটিকে বিশেষভাবে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, প্রকৃত অর্থে প্রাচীন কালে বা বেশ কিছু বছর আগেই দত্তক কথাটির মানেই ছিল নিঃসন্তান দম্পতির দ্বারা পুত্রসন্তান গ্রহণ।

প্রকৃত পক্ষে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে হিন্দু ব্যতীত আর কোন ধর্মের ব্যক্তি দত্তক নিতেন না বা দত্তক নেওয়ার প্রচলন ছিল না। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে 'Hindu Adoption Maintenance Act (1956)' প্রচলিত হয় এবং ঐ আইনের বিধান মতে দত্তক গ্রহণ আইনসিদ্ধ হয়। কিন্তু ঐ আইন ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোন আইন দত্তক গ্রহণকে আইনসম্মতভাবে গ্রহণ করে না। অর্থাৎ Hindu Adoption Maintenance ছাড়া আর কোন আইন ভারতবর্ষে কোন দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনসম্মত ও আইনগ্রাহ্য নয়। তবে ঐ আইন কেবলমাত্র হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দম্পতিদের

ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। তথাকথিত বিদেশী বা বিদেশিনী দ্বারা ভারতীয় শিশু দত্তক গ্রহণ কোন বিদেশীয় বা ভারতীয় আইন দ্বারা আইনসিদ্ধ নয়।

হিন্দু আইনে দত্তক গ্রহণ আইনসিদ্ধ হলেও মুসলমান ও পারসি আইনে দত্তক গ্রহণের কোন নিয়ম নেই বা আইনসিদ্ধ নয়।

প্রাচীনকালে গ্রিস ও রোমে দত্তক গ্রহণ আইনসিদ্ধ ছিল এবং কিছু আধুনিক দেশও দত্তক গ্রহণ আইনসিদ্ধ ও আইন গ্রাহ্য করেছে।

ইউনাইটেড কিংডমে ১৯৫৮ সালে দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত সব আইনকে একত্রিত করে 'Adoption Act 1958' চালু হয় কিন্তু ঐ আইনে ইউনাইটেড কিংডম ছাড়া অন্য দেশের আইন মোতাবেক দত্তক গ্রহণ ইউনাইটেড কিংডমে কতখানি গ্রহণযোগ্য বা অনুমোদনযোগ্য সে সম্পর্কে কোন বিধি না থাকায় গত ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৫ সালে হেগে অনুষ্ঠিত দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত এক অধিবেশনে যুক্তরাজ্যের রাজ্যগুলি একটি সনদ স্বাক্ষর করেন এবং সেই মর্মে যুক্তরাজ্যের ১৯৫৮ সালের আইন পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হয় এবং দত্তক গ্রহণ আইন, ১৯৬৮ চালু হয়। ঐ দত্তক গ্রহণ আইনে বিদেশীয় আইনের ধারামতে গ্রহণ করা দত্তক পুত্র/কন্যাদের আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার একটি ধারা সংযোজিত হয় (৫ নং ধারা) এবং তেমনি ৬ নং ধারায় দত্তক গ্রহণ বাতিল করারও বিধান লিপিবদ্ধ হয়।

যুক্তরাজ্যে প্রচলিত ১৯৫৮ সালের আইন এবং পরিবর্তিত ১৯৬৮ সালের আইনেও দত্তক পুত্র/কন্যাদের সরকারি খাতায় নথিভুক্ত করবার বিশেষ পদ্ধতি আছে এবং তাতে আদালতের আদেশ নং এবং কত তারিখে দত্তক নেওয়া হয়েছে এবং দত্তক পিতামাতা বা পিতা বা মাতার নাম ইত্যাদি নথিভুক্ত করতে হয়।

ইংল্যান্ডে 'দত্তক গ্রহণ' পদ্ধতি সম্পূর্ণ আদালতের আদেশমতে আইনসিদ্ধ হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দত্তক পুত্র/কন্যা গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন ভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু কোন কোন সরকারি সংস্থা বা Local Autharity (সরকারের অনুমোদিত সংস্থা) এ ব্যাপারে দত্তক গ্রহণেচ্ছুক পিতামাতাদের সাহায্য করতে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু অপর কোন সংস্থা বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন ভাবেই দত্তক গ্রহণেচ্ছুক পিতামাতাদের সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান আইনে উপরোক্ত ধরণের কোন ধারা নেই।

বিগত কিছু বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে ভারতে পরিত্যক্ত শিশু যারা বিভিন্ন স্থানে বা রক্ষণাগারে আছে সেইসব শিশুদের দত্তক হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা বিদেশীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের ব্যক্তিরা (যারা নিঃসন্তান দম্পতি) সাধারণতঃ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পুত্র/কন্যাদেরই দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু

পরিত্যক্ত শিশুদের সাধারণতঃ দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন না। কিন্তু বিদেশীরা ভারতের পরিত্যক্ত শিশুদেরকেই দত্তক হিসাবে গ্রহণ করছেন এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। বিদেশী ও বিদেশিনীদের এ ব্যাপারে কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা সাহায্য করে তাদের পছন্দমতো পুত্র/কন্যা ভারত থেকে পেতে। কিন্তু নানান সময়ে নানারকমের অভিযোগ নানান বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে হওয়ায় সরকারি নানা অনুসন্ধানে দেখা যায় যে দত্তক গ্রহণের নামে বিদেশীরা তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের দৈনন্দিন সংসারের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করাছেন এবং শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশের কোন সুযোগই দিচ্ছেন না। এইসব তথাকথিত পিতা ও মাতা বা পিতা বা মাতা। এই সমস্যা শেষপর্যন্ত কিছু কিছু N.G.O সংস্থা Public Interest Litigation সুপ্রিম কোর্টে আনয়ন করেন যার ফলে সুপ্রিম কোর্ট বহুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার আদেশ দেন এবং যথাযথ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বলেন যাতে আন্তর্দেশীয় দত্তক গ্রহণ কোন আইনসিদ্ধ পথে অনুশাসিত হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা সকলের জানা প্রয়োজন যে বিদেশী ও বিদেশীনীরা সাধারণতঃ বা আইনগতভাবে ভারতের কোন ধরণের শিশুকেই দত্তক গ্রহণ করতে পারেন না কারণ ভারতে কোন আন্তর্দেশীয় দত্তক গ্রহণ আইন প্রচলিত নেই। বিদেশী বা বিদেশিনীরা যেসব ভারতীয় শিশুদের দত্তক গ্রহণ করেন বলে আমরা জানি প্রকৃতপক্ষে দত্তক গ্রহণ নয় পরিবর্তে তাঁরা ঐসব শিশুদের অভিভাবক নিযুক্ত হন Guardians & words Act (১৮৯০)-এর বিধান মতে। তদ্বারা দরখাস্তকারী বিদেশী বা বিদেশিনী কোন ভাবেই ঐ শিশুর দত্তক পিতা বা মাতা আইনতঃ হতে পারেন না বা ঐ শিশু কোন ভাবেই ঐ বিদেশী ও বির্দেশিনীদের দত্তক পুত্র বা দত্তক কন্যার পরিচয়ে আইন-গতভাবে সমাজে, আদালতে বা কোথাও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না এবং তারা ঐ বিদেশী বা বিদেশিনীর মৃত্যান্তে তাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

প্রকৃতপক্ষে আইনের ফাঁকে ও যথাযথ আইন ভারতবর্ষে প্রচলিত না থাকায় ভারতের পরিত্যক্ত শিশুদের নিয়ে এক অসামাজিক ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং ঐসব সংস্থা বিদেশী বা বিদেশিনীদের কাছ থেকে প্রচুর টাকার বিনিময়ে পরিত্যক্ত শিশুদের হস্তান্তর করে কেবলমাত্র ঐ বিদেশী বা বিদেশিনীকে ঐ শিশুর অভিভাবক নিযুক্তকরণ প্রক্রিয়া আদালতে থেকে সমাপ্ত করে।

কিছু বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের প্রতিলিপি পাওয়ার পর এবং বেশ কিছু তথ্যানুসন্ধানে জানতে পারে যে বিদেশে নিয়ে যাওয়া শিশুদের ঐ তথাকথিত বিদেশী ও বিদেশিনীরা তাঁদের দৈনন্দিন পারিবারিক কাজের জন্যই নিযুক্ত করে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে একটি যথাযথ আইন প্রণয়নের জন্য Law Commission of India কে একটি খসড়া বিল প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব দেন।

কিছুদিন আগে Law Commission of India তাদের খসড়া আইন — Inter Country Adoption এর ওপর দাখিল করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত তা পার্লামেন্টে বিল হিসাবে প্রতিস্থাপন করেন নি। কিন্তু ঐ খসড়া আইনে নানাভাবে এই অসহায় ও পরিত্যক্ত শিশুদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এবং দত্তক পুত্র ও কন্যারা যাতে বিদেশী পিতা ও মাতার ঘরে আইনী স্বীকৃতি পায় এবং তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য যাবতীয় আইনী ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে। Central Adoption Resource Agency নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ার প্রস্তাব ঐ বিলে আছে এবং সেই সংস্থাই দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং বিভিন্ন দেশের দত্তক গ্রহণকারী পিতামাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে এবং দত্তকপুত্র/কন্যাদের মানসিক ও সামাজিক কীরকমের বিকাশ ঘটছে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। তাছাড়াও ঐ সংস্থার মাধ্যমেই বিদেশীরা দত্তক গ্রহণের জন্য পুত্র/কন্যাদের খোঁজ খবর পাবেন এবং প্রকৃতপক্ষে CARA একটি যোগাযোগকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

ঐ Inter Country Adoption Act - এর খসড়া যদি আইনে পরিণত হয় তাহলে বহুদিনের এই সমস্যার সমাধান হবে এবং বিদেশী ও বিদেশিনী যাঁরা ভারতের অসহায় ও পরিত্যক্ত শিশুদের তাঁদের দেশে নিয়ে যান তাদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়ে, কিন্তু দত্তক পুত্র বা কন্যা হিসাবে নয় সে সমস্যারও সমাধান হবে এবং ঐসব শিশুদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে।

সূত্র নির্দেশ

1) Mulla's Hindu Law, edited by Justice Desai.
2) Mulla's Mohammedan Law, edited by Justice M. Hidyiatullah
3) Guardians & Wards Act (AIR Manual)
4) Halsbury's Statute of England (Vol. 17)
5) 153rd Report of Law commission of India on Inter-country Adopation

বর্তমান ভারতের অর্থনীতি ও রাধাকমল

অশ্রুরঞ্জন পান্ডা

বর্তমান ভারতের অর্থনীতি বলতে ১৯৯০ এর দশকে নরসিংহ সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং এর নয়া অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা বোঝান হয়েছে। এই নয়া অর্থনীতির প্রেক্ষাপট হল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সংগে সংগে গোটা বিশ্বজুড়ে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়নের, ঢেউ পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলি সহ উন্নতিশীল দেশগুলিতেও এর প্রভাব পড়ে। মনমোহন সিং এই পরিবর্তনের পথেই পা বাড়ান। পরে দেবগৌড়া, গুজরাল সরকার এবং বি.জে.পি প্রধান জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারও এই নীতিকে বর্তমানে সম্প্রসারিত করছে। গ্যাট, বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্বব্যাংক, জি-৭ এর প্রভাবও এই মুক্ত অর্থনীতি গ্রহণের পিছনে রয়েছে।

এই উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে আবার একটি শক্তিশালী মত ভারতে সোচ্চার যাঁরা মনে করেন যে পুঁজিবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এই ছিদ্র দিয়েই অনুপ্রবেশ করবে এবং ভারতের অর্থনীতিকে বেহাল করে তুলবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অর্থনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্মুখীন। ভারতে যে মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ ও পরবর্তী কালে নীতিতে সরকারি উদ্যোগের যে প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপের সুযোগ দিল তার পরিবর্তন কেন প্রয়োজন হল তাও পর্যালোচনা করা জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৯-১৯৬৮) ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজনীতির উপর বক্তব্য আলোচনা করব এবং তা কতটা এই সংকট উত্তরণে সহায়ক তা বিশ্লেষণ করব।

রাধাকমল বিশ শতকের প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুদশকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো —

ক) রাধাকমল ভারতের উন্নতি বলতে সেই সামগ্রিক উন্নয়নের কথাই বলেছেন যেখানে পিছিয়ে পড়া জনগণ ন্যূনতম ভদ্র জীবনযাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সব শ্রেণীরই উন্নতি বাস্তবায়িত হবে।

খ) যেহেতু ভারত কৃষিপ্রধান দেশ তাই স্বাভাবিকভাবেই কৃষির উন্নতি আগে প্রয়োজন। কৃষির সংগে জড়িত সমস্যাগুলির অন্যতম হলো চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের

অভাব, জমির খন্ডীকরণ, চাষবাস করার উপযুক্ত কৃষি শ্রমিকের অভাব, বৈজ্ঞানিকভাবে চাষ করার অজ্ঞতা।

এই সব সমস্যা সমাধানে রাধাকমল গ্রামাঞ্চলে সমবায় ভিত্তিক চাষের কথা বলেছেন; আবার যেখানে জনসংখ্যার হার বেশি সেখানে নিবিড় চাষ প্রকল্প গ্রহণ, একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন প্রয়োজন। শুধু বর্গারেকর্ড করলেই বর্গাদারদের উন্নতি হবে না। সমবায়ের মাধ্যমে চাষ করলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অর্থসহায়তা করা হবে। কৃষকদের কাজে নিযুক্ত করার মাধ্যমে তাদেরও আর্থিক সুরাহা হবে এবং একই সংগে লভ্যাংশ থেকে ব্যক্তিমালিককে অংশ দেওয়া হবে। এই সমবায়ের অধীনে চাষ হবে সামগ্রিক; অর্থাৎ উৎপাদনের সংগে সংগে উৎপাদিত ফসল ঝাড়াই, পেষাই, গুদাম জাত করা ও বাজারে বিক্রির ব্যবস্থাও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি পঞ্চায়েতের সংগে একত্রে করবে।

এই প্রসঙ্গে রাধাকমল অনুপস্থিত জমির মালিকদের জমির প্রতি অনাগ্রহের উল্লেখ করে দেন আবার ভাড়াটে মজুর বা শ্রমিক দিয়ে চাষ করালে তাদেরও চাষের প্রতি আগ্রহ থাকে না। এইসব ক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষাবাদ করলে ঐ জমির কেমন যথোপযুক্ত ব্যবহার হবে তেমনি জমির অনুপস্থিত মালিকরাও উপকৃত হবে।

গ) ভারতের আত্মা গ্রামগুলিকে সমবায় চাষের মাধ্যমে স্থিতিশীল ও সফল ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের উন্নয়নে নজর দিতে হবে। প্রসঙ্গত চাষের সংগে যুক্ত পরিবারগুলিও অবসর সময়ে এবং যখন চাষের কাজ থাকে না তখন এই কুটির শিল্পের সংগে যুক্ত হয়।

এই ক্ষুদ্র শিল্পের সংগে সংগে বৃহৎ ভারিশিল্পের প্রয়োগ দ্রুত উন্নতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাই ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্প একে অপরের পরিপূরক। স্বাভাবিক ভাবেই ভারি শিল্পগুলি মূলত সরকারেব মালিকানাতেই থাকবে এবং ক্ষুদ্র শিল্পে বেসরকারি, ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগ থাকবে।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাধাকমল ব্যক্তিমালিকানায় যে লোভ বা মুনাফার সম্ভাবনা থাকে সে সম্পর্কে সচেতন দিলেন। তাই সরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যবর্তী স্তরে ও সহযোগী হিসাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানের গঠন, মালিকানা ও কাজের ভার দিয়েছেন যাতে ব্যক্তিমালিকানার দোষত্রুটী ও সরকারি মালিকানার আধিপত্যবাদী আচরণ দূর করা যায়।

ঘ) ভারতের শিল্পজগতে যে সমস্ত অশান্তির কারণগুলি রয়েছে তার অন্যতম হল শ্রমিকদের অসন্তোষ। শ্রমিকদেব বেতনে বৈষম্য, অন্যায়ভাবে ছাঁটাই, বোনাস নিয়ে বিরোধ, শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, চিকিৎসার যথাযথ সুযোগের একান্ত অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি শ্রমিকদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। এর সংগে চা বাগিচা ও অন্যান্য শিল্পে শিশু শ্রমিক ও নারীদের নিয়োগ জনিত সমস্যা, আড়কাঠিদের ভূমিকা ও রাধাকমল

বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবিগুলির যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য এবং এখনও তা প্রাসঙ্গিক।

ঙ) রাধাকমল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান খাদ্য উৎপাদনের উপর আগে জোর দিয়েছেন। যখন এই প্রধান খাদ্য, ধান গম প্রভৃতি যথোপযুক্তভাবে উৎপাদিত হবে তখনই কেবল ব্যবসাভিত্তিক ভাবে কৃষিতে উৎপাদন করা যাবে।

এই চাষ আবাদের ক্ষেত্রে রাধাকমল ব্যাপক হারে রাসায়নিক সার-ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন, বাস্তত পক্ষে দেশজ সারের ব্যবহার জমির উর্বরাশক্তিকে দীর্ঘায়িত করে। দেশজ সারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে বিদেশ থেকে সার আমদানির পরিমাণও হ্রাস করা যায়।

খাদ্যাভাসের পরিবর্তনের দিকটিও খাদ্যোৎপাদনের সংগে সংশ্লিষ্ট। সয়াবীন প্রভৃতি শস্যর উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি সেই সব শাকসজ্জীর উৎপাদন বাড়াতে হবে যা প্রোটিন সমৃদ্ধ। এই ভাবে প্রাণীজ প্রোটিনের বিকল্প উদ্ভিজ প্রোটীন মানুষের প্রয়োজন মেটাবে।

চ) রাধাকমলের চিন্তাভাবনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় ঘটেছে এবং মিশ্র কল্যাণ মূলক অর্থনীতির তিনি পৃষ্টপোষক ছিলেন। পশ্চিমী শিল্পনীতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী 'লেসে ফেয়ার' নীতির মুনাফালোভী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা যেমন রাধাকমল করেছেন তেমনি রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদের ব্যক্তিগত শিল্পের উপর আধা-সামাজিক আধিপত্য ও তিনি বরদাস্ত করেন নি। ব্যক্তিমালিকানা, সমবায় মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার সুষম অবস্থান কাম্য এবং সামগ্রিকভাবে কল্যাণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক স্বার্থে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার।

প্রসঙ্গত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ১৯৮২-র সংবিধানে ১৮নং অনুচ্ছেদে বিদেশী পুঁজিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এই বিদেশী পুঁজি সরকারি ও বেসরকারি উভয়েই হতে পারে। তবে এই বিদেশী বিনিয়োগ চীনের সংগে যৌথভাবে হবে এবং চীনের স্বার্থ যেমন, সংরক্ষিত হবে তেমনি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ন্যায্য স্বার্থ ও অধিকার চীন সরকার সুরক্ষিত করবে। চীন বিশশতকের আশির দশকেই এই বিশ্বায়নের যে চিন্তাভাবনা করেছিল তাই পরবর্তীকালে নব্বইয়ের দশকে প্রাধান্য পায়। চীন কিন্তু সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে।

তাই চীনের উদাহরণ ভারতের বাস্তব সম্মত ভাবে গ্রহণ করা উচিত। লাগাম ছাড়া বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ও বিদেশী দ্রব্যের ভারতে ঢোকার সুযোগ ভারতীয় শিল্পকে অবশ্যই আঘাত করবে। তাই এক্ষেত্রে সরকারকে সতর্ক হতে হবে। একই সংগে দেশের শিল্পগোষ্ঠীকে ন্যায্য লাভে জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে মাথায় রেখে ব্যবসা পরিচালনার

ভ গ্রহণ করতে হবে। সংগে সংগে শ্রমিক আন্দোলনকে বাস্তব সম্মত ভিত্তির উপর পরিচালিত করার যৌক্তিকতা দরকার। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি যেমন সমর্থনযোগ্য, তেমনি হঠকারী জঙ্গী আন্দোলন বর্জনীয়। এক কথায় সরকার, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী, সমবায় প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষ সবাইকেই জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশপ্রেমীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় প্রাক স্বাধীনতা যুগে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের যে আন্দোলন ঘটেছিল হয়ত নতুন ভাবে তা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। কোনভাবেই দেশের চূড়ান্ত সার্বভৌম স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ভারতকে নয়াউপনিবেশবাদের শিকার হতে দেওয়া যাবে না।

সূত্র নির্দেশ

১) B. Ramwesh Babu, (ed) – Globalization & the South Asian State (New Delhi - South Asian Publication. 1998) Article by Rakhari Chatterjee "Globalization, culture & Nation State"

২) Ian Clark – Globalization & Interational Relations Thory, OUP 1999

৩) রাধাকমল মুখার্জী –

ক) The Foundains of Indian Economics (1916) London Longman Green & Co.

খ) Principles of Comparative Economics (1921, 1923 Vol I & II) 1923, London P S. king

গ) Rural Economy of India (1926) London Longman Green & Co.

ঘ) Land Problems of India (1933) London Longman Green

ঙ) Indian Working class (1st ed. 1945, 1951 Bombay, Hind Kitabs)

চ) দারিদ্রের ক্রন্দন (১৯১২) Calcutta Industrial Syndicate

ছ) Food Planning for Four hundred Millions (1938) London, Macmillan

৪) Constitution of the people's Republic of China 1982 Foreign Language Press Beiging

বাংলার বিজ্ঞান আন্দোলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীবৃন্দ

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

এই গবেষণা বাংলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধানের একটা অংশ। এই খণ্ডের আলোচনা শুরু করার আগে প্রথমে এই শিরোনামটা বিশ্লেষণ করে আলোচনার পরিধিটা স্পষ্ট করা বিধেয়।

'বাংলা' বলতে ১৯৪৭ পরবর্তী ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য 'পশ্চিমবঙ্গ-কে' বোঝানো হচ্ছে। তবে যেখানে স্বাধীনতার আগের কথা এসেছে সেখানে ব্যাপকভাবে অবিভক্ত বাংলাকে বোঝানো হয়েছে।

'বিজ্ঞান আন্দোলন' বলতে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান গবেষণাকে আদৌ বোঝানো হচ্ছে না। 'বিজ্ঞান আন্দোলন' এখানে তিনটি ধারা নির্দেশ করছে ঃ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ এবং জন-কল্যাণমুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি গ্রহণ ও তার প্রয়োগ। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের মাধ্যম হল দেশীয় ভাষায় সহজ করে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, অতিসরলীকৃত না করে বিজ্ঞানের নির্যাসটুকু পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারেন বিজ্ঞানীরা। এরাজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় নিবন্ধ রচনা বা পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্য, সাধারণ মানুষকে শুধুমাত্র তথ্যসমৃদ্ধ করা নয়, বিজ্ঞানের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করানোও, তবে শুধু বিজ্ঞানের তথ্য আর তত্ত্ব জানানোর মাধ্যমে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে না। সমাজে প্রচলিত নানান অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞানকে দূর করতে গেলে প্রয়োজন অলৌকিকতা-অতিলৌকিকতার প্রতি মানুষের অন্ধ বিশ্বাস দূর করা। আর তার জন্য দরকার ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানদর্শনের প্রসার ঘটানো। এক কথায়, বিজ্ঞান আন্দোলনের এই ধারার মধ্যে পড়ে জীবনযাত্রায় ও আচরণে বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটানোর কাজ। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের পাশাপাশি মননে স্থাপন করার কাজটাও করতে হয়। আর সেজন্য জোর দিতে হয় জনকল্যাণমুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি গ্রহণ ও তার প্রয়োগের ওপর। নিজের জীবনযাত্রা সহজ করার কাজে বিজ্ঞানকে ব্যবহৃত হতে না দেখলে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন না। তাই জন প্রযুক্তির বিকাশে সচেষ্ট বিজ্ঞান আন্দোলন। রাষ্ট্র যাতে বিজ্ঞান নীতি গ্রহণ ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের দিকে নজর দেয়, সে ব্যাপারে চাপ সৃষ্টিতে প্রয়াসী বিজ্ঞান আন্দোলন।

এই ত্রিধারার বিজ্ঞান আন্দোলনে সামিল বিভিন্ন ব্যক্তি, পত্র-পত্রিকা এবং সংগঠন। এখানে আমাদের আলোচ্য ঃ বিজ্ঞান আন্দোলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের ভূমিকা। এই আলোচনা সীমাবদ্ধ প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে; স্বভাববিজ্ঞানীদের (গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র প্রমুখ) এই আলোচনায় আনা হচ্ছে না। বিশ শতকে বাংলার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, তাঁদের প্রতিভা এবং মৌলিক গবেষণা দ্বারা, জগৎ সভায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বিশ্ববিজ্ঞান আঙিনায় তাঁরা স্মরণীয়। কিন্তু এই নিবন্ধের আলোকপাত একটু ভিন্ন ক্ষেত্রে, নিজেদের গবেষণার অঙ্গনের বাইরে এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা কিভাবে বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তুলে ধরাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এখানে বিজ্ঞান আন্দোলনে বাংলার চারজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর—জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), মেঘনাদ সাহা (১৮৮৩-১৯৫৬) এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)-র ভূমিকা আলোচিত হচ্ছে।

সর্বদেশের সর্বকালের বৈজ্ঞানিকই তাঁদের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেন সাংকেতিক ভাষায় যা জটিল সুত্র এবং ফর্মূলার বাঁধনে আবদ্ধ। এই জটিল ভাষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সংযোগ নেই। তবে বৈজ্ঞানিকেরা যখন সাংকেতিকতা পরিহার করে জনসাধারণের উপযোগী সরল ও সরস ভাষায় বিজ্ঞানের কথা বাণীবদ্ধ করেন, তখন তা হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য। সাধারণ বিজ্ঞানসাহিত্যের সঙ্গে এর তফাৎ আছে। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্যে লেখকের যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজস্ব গবেষণা ও অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় সাধারণ বিজ্ঞানসাহিত্যে তার অভাব।[১]

এই বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্যে প্রথম উল্লেখ্য নাম জগদীশ চন্দ্র বসুর (১৮৫৮-১৯৩৭)। তিনি বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের সার্থক রূপকার। আর তাঁর বিজ্ঞানসাহিত্যের অপূর্ব নিদর্শন অব্যক্ত (১৯২১)। এই গ্রন্থ মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। তিনি যে, বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য লঘু করেন নি তার প্রমাণ হল তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধকেও তিনি বাংলায়, সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। ১৯১৬ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে পঠিত তাঁর গবেষণা নিবন্ধকে অনুবাদ করে তিনি 'অদৃশ্য আলোক' শিরোনামায় 'অব্যক্ত'-এ ঠাঁই দেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর সুগভীর অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্র গুলোর নাম বাংলায় দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান মানসিকতা বিকাশেও যে জগদীশচন্দ্র প্রয়াসী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর লেখা থেকে— "মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে। তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহির্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে।"[২] বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের কথা ভেবেছেন জগদীশচন্দ্র। পর্যটন মেলার মাধ্যমে

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্র যোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া, কৃষিপ্রদর্শনীর কথা বলেছেন তিনি। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রর দৃষ্টান্ত হিসেবে জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' বিশেষ মর্যাদা দাবি করে।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) ও বাংলায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন, রচনার ধর্ম অনুযায়ী তাঁর সমগ্র বিজ্ঞান-সাহিত্যকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে — সাধারণ বিজ্ঞান সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য।[৩] তাঁর তেইশটি বইয়ের মধ্যে অধিকাংশতেই গতানুগতিক ভাবে বিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে। তবে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞানীর রচনার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাঁর সরল প্রাণীবিজ্ঞান, খাদ্যবিজ্ঞান, রাসায়নিক পরিভাষা প্রভৃতি বই। তদ্‌কালীন বিখ্যাত সাময়িকপত্র প্রবাসী, বসুমতী, বঙ্গ বাণী, ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে তাঁর সাঁইত্রিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখার মধ্যে বারবার এসেছে বিজ্ঞানকে সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহারের কথা।

প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণা ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে History of Hindu Chemistry (দুটি খন্ডে, প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯০২ এবং ১৯০৯) গ্রন্থে যেখানে তিনি প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তখনকার মাথার কাজ এবং হাতের কাজের দুস্তর ব্যবধান থাকার কথা তুলে ধরেছেন। দেশের বিকাশের পথে তিনি একে বাধা বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি জোর দিয়েছেন হাতের কাজের বা শ্রমশক্তির ওপর।

বিজ্ঞানশিক্ষাকে প্রায়োগিক প্রযুক্তির রূপ দেওয়ার কথা বারবার ভেবেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। আর সেজন্যই তিনি প্রাচীনযুগে হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চার পথে জাতিভেদের বাধার কথা উল্লেখ করেছেন। দেখিয়েছেন, কিভাবে ব্রাহ্মণদের মৃতদেহে স্পর্শ না করার সংস্কার এবং কামারশালার ধোঁয়া থেকে দূরে থাকার কারণে শল্যচিকিৎসা এবং কারিগরি বিদ্যার চর্চায় অবক্ষয় দেখা দেয়। তাই তিনি আধুনিক ভারতে, ঔপনিবেশিক যুগে বারবার বিজ্ঞানকে সমাজমুখী করার ওপর জোর দেন। ১৮৯০-র দশকে কলকাতায় যখন ভেজাল সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছিল তখন প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের প্রায়োগিক চর্চার মাধ্যমে তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন। বাজারে বিক্রিত তেল ও দুধের নমুনা সংগ্রহ করে তার মধ্যেকার ভেজাল নিরূপন করেন তিনি। সমাজমুখী এই অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করেন তাঁর 'Adulteration of Edible Fats and Oils' শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে।[৪] পরে রাসায়নিক শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রেও এদেশে অগ্রদূত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতে আমদানি নির্ভর ওষুধ শিল্পর মোকাবিলায় ১৮৯২ সালে তিনি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' এর পত্তন করেন। জনপ্রযুক্তি বিকাশের মাধ্যমে ছোট শিল্প গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিয়ে গেছেন এই বিজ্ঞানী। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের

প্রয়োগ যে অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে সে ব্যাপারে দেশবাসীকে সচেতন করেন প্রফুল্লচন্দ্র।

বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা, বিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশ, জনপ্রযুক্তির বিস্তারের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উন্নতির কথা বলেন। তাঁর এই আশাবাদী ভাবনা ঘোষিত হয় বিভিন্ন সম্মেলনে— ১৯১৪য় চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে, ১৯১৬য় যশোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনে (এই সমাবেশে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাব করেন), ১৯১৭য় কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির ৩১ তম সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে, ১৯২০ তে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির ভাষণে। গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের শ্রীবৃদ্ধির কথা বলেন প্রফুল্লচন্দ্র ১৯২৬ রুরাল ও য়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সোসাল সার্ভিস সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে। তিনি বিভিন্ন স্বদেশী মেলাতেও ভাষণ দেন— ১৯৩০এ মাদ্রাজে, ১৯৩১এ পুণায়। ১৯৩১এ উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গে বন্যাত্রাণে তিনি বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত। এক কথায়, বিজ্ঞানকে পরীক্ষাগারে আটকে রাখেন নি তিনি। মানুষের জন্য কাজ করার যে লক্ষ্যে বিজ্ঞান আন্দোলন কাজ করে সেই একই আদর্শ বিজ্ঞানী প্রফুল্ল রায়ের কাজেরও চালিকাশক্তি। তিনি মনে করতেন, আগের জ্ঞান আর 'পুরাকালে সব ছিল'-র বড়াই নিয়ে দেশ এগোতে পারে না। বিজ্ঞান সাধনায় নিজেদের মিলিত শক্তি নিয়োগ করতে না পারলে দেশ ও জাতির উন্নতির আশা নেই। এই ভাবনা তাঁর বিজ্ঞানমানসেরই পরিচায়ক।

বিজ্ঞান আন্দোলনের সব ধারারই সার্থক প্রতিনিধি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা (১৮৮৩-১৯৫৬)। তাঁর বৈজ্ঞানিক লেখালেখির (গবেষণা নিবন্ধ) পাশাপাশি তিনি বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনা করেছেন। এর বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিজ্ঞানীদের জীবনী, বিজ্ঞানের প্রয়োগ (চিকিৎসার পদার্থবিজ্ঞান) প্রভৃতি। এগুলি বের হয়েছে প্রবাসী, ভাবতবর্ষ, বসুমতী, নব্য ভারত, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগবাণী প্রভৃতি সেই সময়কার বিখ্যাত সাময়িকপত্রে। ছোটোদের মধ্যে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতেও মেঘনাদ সাহা প্রয়াসী হয়েছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর অনুরোধে ১৯৩০ থেকে ৪০এর মধ্যে এলাহাবাদের শিশু ভারতী পত্রিকায় তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভৌগোলিক আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ে ছোটদের জন্য লেখেন।[৫]

বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশে মেঘনাদ সাহার ভূমিকার কথা বলতে গেলে 'আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দু ধর্ম' নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনিলবরণ রায়ের বিতর্কর কথা আলোচনা করতে হয়। এই বিতর্কের সূচনা ঘটে ১৯৩৮ সালে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে 'একটি নূতন জীবন দর্শন'এর কথা বলেন, তাঁর এই ভাষণের বিরোধিতা করেন অনিলবরণ রায়, এভাবে বিতর্ক এগিয়ে চলে একের পর এক লেখা আর পাল্টা লেখার মধ্যে দিয়ে।[৬] এই

বিতর্কে মেঘনাদ সাহা প্রথাগত সামাজিক ক্রমোচ্চশীলতায় শ্রমজীবী শ্রেণীর নিম্ন সামাজিক মর্যাদা এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সমালোচনা করেন। তিনি লেখেন ঃ "শিল্পী, কারিগর ও স্থপতির স্থান এই সমাজের অতি নিম্নস্তরে এবং হিন্দু সমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোন যোগাযোগ নাই। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ শিল্পে ও দ্রব্যোৎপাদনে একই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং তজ্জন্য বহুবার যান্ত্রিক বিজ্ঞানে বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে।[৭]" এই বিতর্ক চলাকালীন তিনি সেই স্মরণীয় '*সবই ব্যাদে আছে*' শিরোনামায় প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি স্পষ্টই লেখেন যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও আধুনিক বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে— এমন দৃষ্টান্ত পান নি। সবই বেদে থাকার অযৌক্তিক দাবিকে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা খন্ডন করেন।[৮] এভাবেই বিজ্ঞানের মেজাজকে তুলে ধরেন মেঘনাদ সাহা।

বিজ্ঞানকে তিনি বিভিন্নভাবে মানবকল্যাণের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তিনি ভারতের বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধারণা দেন। বিজ্ঞানের সামাজিক ব্যবহারের যে কথাকে তিনি কাজে রূপ দিয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল মানবতাবাদী দেশপ্রেম। ঔপনিবেশিক শক্তি শাসনাধীন দেশের ভাবি স্বাধীনতার পর পুনর্গঠনের জন্য মেঘনাদ সাহা জোর দিয়েছিলেন বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার ওপর। ১৯৩৮এ কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু যে জাতীয় পুনর্গঠনের কথা বলেছিলেন সেই একই ভাবনা ছিল মেঘনাদ সাহার। অথচ যখন স্বাধীন ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গড়া হল সেখানে ঠাঁই হল না মেঘনাদ সাহার।

ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকা 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার'-এ (যে সংগঠন এবং পত্রিকার পত্তনের পেছনে মেঘনাদ সাহার ভূমিকাই সর্বাধিক) প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞানের মাধ্যমে জনকল্যাণের ওপর জোর দেন। পরে দেখেন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অংশ নিতে হলে আইনসভায় যেতে হবে। কাজের কাজ করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৫২য় প্রথম লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। ১৯৫৬তে তাঁর মৃত্যুর আগে অবধি তিনি ছিলেন একজন মুখর সংসদ। লোকসভায় ১৯৫৪র ১০ মে তিনি পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধে সংসদীয় বিতর্কের সূচনা করেন।[৯] তিনি ১৯৪৮এ প্রতিষ্ঠিত আণবিক শক্তি কমিশনের দীর্ঘসূত্র এবং গোপন কর্মধারার সমালোচনা করে এই কমিশনকে আরও বিস্তৃতভাবে পুনর্গঠনের পক্ষে মত দেন।[১০] তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পারমাণবিক গবেষণা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে এই ধরণের উদ্যোগ সফল হতে পারে না।

নদী পরিকল্পনা নিয়েও মেঘনাদ সাহা ভাবিত ছিলেন। এই ভাবনার মূলে ছিল তাঁর বন্যাত্রাণে (উত্তরবঙ্গে ১৯২১ সালে) কাজের অভিজ্ঞতা। নদী পরিকল্পনার নানান দিক,

সেচ, শক্তি, মাটি সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার'-এ সুচিন্তিত আলোচনা করেন। লোকসভায় দামোদর নদের বহুমুখী পরিকল্পনায় অযৌক্তিক ব্যয়ের তিনি সমালোচনা করেন। বিরোধিতা করেন এই বিশ্বের তথাকথিত 'বৃহত্তম বাঁধ' নির্মাণের প্রয়াসের। আজ সারা বিশ্বে যখন ছোট বাঁধের পক্ষে মত প্রকাশ করা হচ্ছে সেখানে মেঘনাদ সাহার এই ভাবনা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। উন্নয়ন ও পরিবেশের এই দ্বন্দ্বে তিনি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সমাধানের পথ খুঁজেছেন।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। ভারতীয় বর্ষপঞ্জীর সংস্কারও করেছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে। মেঘনাদ সাহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন মানুষ নিজেই তার ভাগ্য গড়ে নেয়। তাঁর মতে, মানব সভ্যতার এই অগ্রগতির প্রধান হাতিয়ার হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্ক এই বিজ্ঞানীর আর একটি বড় অবদান হল বিজ্ঞানকর্মীদের সংগঠিত করা। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ১৭২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন -এর ২২০ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৪৫ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানকর্মীরা লেলিনগ্রাদে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে রাশিয়া, বিটেন ও ফ্রান্সের বিজ্ঞানকর্মীরা বিজ্ঞানকর্মীদের একটি বিশ্ব সংগঠন গড়ে তোলার প্রশ্নে একমত হন। ১৯৪৬ সালের জুন-জুলাই মাসে ব্রিটেনে এই উপলক্ষে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিজ্ঞানকর্মীদের সংস্থাগুলি প্রতিনিধি পাঠায় এবং যে দেশগুলিতে বিজ্ঞানকর্মীদের নিজস্ব কোন সংগঠন ছিল না। সেই দেশগুলি থেকে বিজ্ঞানীরা দর্শক প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। এই দেশগুলিব মধ্যে ছিল ভারত, ইতালি, নরওয়ে, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং প্রজাতন্ত্রী স্পেন। ভারত থেকে দর্শক প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। গড়ে ওঠে 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স'; এই সংগঠনের লক্ষ্য ও গঠনতন্ত্র নিরূপনের প্রশ্নে মুখ্য ভূমিকা নেন জন ডেসমন্ড বার্নাল। আন্তর্জাতিক এই ঘটনার রেশ এসে পৌঁছয় ভারতে। দেশে ফিরে এসে মেঘনাদ সাহা 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকার লেখেন ঃ 'ভারতের বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে আমি আবেদন করছি এই ধরণের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য, কেননা এই সংগঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞানবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেই বিজ্ঞানকর্মীরা নিজেদের উপযুক্ত সম্মান লাভে সমর্থ হবেন এবং দেশের অগ্রগতির স্বার্থে নিজেদের যুক্ত করতে পারবেন।[১১] এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের ৭ জানুয়ারি গড়ে ওঠে ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীদের সংগঠনঃ 'অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স (ইন্ডিয়া)'।[১২]

বাংলার আর এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আর একটি বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে তোলার পুরোধা

ছিলেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান সচেতন এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করার উদ্দেশে ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।[১৩] স্বাধীনতার আগেই সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই ধরণের একটি সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'মাসের মধ্যেই ১৮ অক্টোবর ১৯৪৭এ সত্যেন্দ্রনাথ একটি সভা আহ্বান করেন।[১৪] এখনেই 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম সভাপতি হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আমৃত্যু তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রকাশিত হয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা (২৫ জানুয়ারি ১৯৪৮)। অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন বিজ্ঞান সংগঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তেমনই পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে প্রয়াসী হন, তিনি নিজেও বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখি করেন, এর বিষয়ের মধ্যে ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাস, বিজ্ঞানীদের জীবনী, বিজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতি। তাঁর লেখার সংকলন 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন' নামে প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে।[১৫] এই রচনা গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ দেশজ ভাষায় শুধু বিজ্ঞানের তথ্য আর তত্ত্ব জানাতে প্রয়াসী নন, একই সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারেও ব্রতী। বিজ্ঞান পরিষদের মাধ্যমে এজন্য তিনি পত্রিকায় লেখা বের করেছেন, বই প্রকাশ করেছেন, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র আয়োজন করেছেন। তাঁর উদ্যোগে গড়ে উঠেছে পরিষদের নিজস্ব ভবন (১৯৬৯)। আসলে তিনি মনে করতেন সমাজের উন্নয়নে বিজ্ঞানীদেরও দায়িত্ব আছে। ১৯৬৪ সালে 'বৈজ্ঞানিকের সাফাই'[১৬] শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন যার মধ্যে রয়েছে মারণাস্ত্র তৈরি না করা, মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা। তাঁর মতে, প্রত্যেক প্রকৃত বিজ্ঞানী মানব-সমৃদ্ধির সৌধ রচনার স্বপ্ন দেখে।

সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন সেই স্বপ্নদ্রষ্টা বিজ্ঞানী যাঁর প্রতিটা কাজই ছিল সেই স্বপ্ন সাকারের লক্ষ্যে নিয়োজিত। 'মানুষের জন্যই বিজ্ঞান' -- এই মূলমন্ত্র বিজ্ঞান আন্দোলনের চালিকা শক্তি। সেই একই কথাকে পাথেয় করে মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন বাংলার এই চার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান তাঁদের কাছে নিখাদ জ্ঞানচর্চা ছিল না, ছিল মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের উপায়। এককথায়, বিজ্ঞান আন্দোলনে এদের অংশ গ্রহণের কারণ মানুষের জন্য কিছু করা। এদের রচিত ভিত্তির উপরই পরবর্তী কালে সমৃদ্ধ হয়েছে এরাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলন। শুধু বিজ্ঞানী নন, সেখানে সামিল হয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ।

সূত্র নির্দেশ

১) বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, কলকাতা. ১৯৮০. পৃ-৩৬২

২) পূর্বোল্লেখিত, পৃ- ৩৬৭

৩) পূর্বোল্লেখিত, পৃ- ৩৭৮

৪) Determination at adulteration of food stuff; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 59, No. 63, 1894.

৫) শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কিশোর রচনা সংকলন, কলকাতা, ১৯৮৫, ভূমিকা

৬) শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, মেঘনাদ রচনা সংকলন, কলকাতা, ১৮৮৭ শকাব্দ, 'আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম' শিরোনামে সংকলিত অংশ, পৃ- ১১৩-১৮১

৭) মেঘনাদ সাহা, 'একটি নূতন জীবন দর্শন', 'ভারতবর্ষ', ২৬ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ (ইং - ১৯৩৯), পৃ- ৯৩৭, পরে উপরোক্ত বইতে সংকলিত, পৃ- ১১৪

৮) 'সবই ব্যাদে আছে', 'ভারতবর্ষ', ২৭ বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৬ (ইং ১৯৪০), পৃ-৪০৭ পরে উপরোক্ত বইতে সংকলিত, পৃ- ১৬০-১৬৯

৯) লোকসভা বিতর্ক, পঞ্চম খন্ড, পৃ- ৭০০৭ (১০ মে ১৯৫৪)

১০) চ্যাটার্জি, শান্তিময় অ্যান্ড এণাক্ষী, 'মেঘনাদ সাহা সায়েন্টিষ্ট উইথ এ ভিশন', নিউ দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ- ৭৮

১১) A plea for an Association of scientific workers, 'Science and Culture', Vol. XII No. 4, Oct. 1946, p-157

১২) Saha, Meghnad, Association of Scientific workers (India), 'Science and Culture', Vol. XII, No. 7, January 1947, p-326

১৩) পরিষদের প্রথম গঠনতন্ত্র, অনুষঙ্গ স্মারক পত্র সহ বিধি ও নিয়মাবলী (সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট XXI, ১৮৬০ অনুসারে রেজিস্টার্ড নম্বর ১৮ ৩০০/৫০০ তারিখ ১৪ ০৯-১৯৪৯), 'আদর্শ ও উদ্দেশ্য'

১৪) জয়ন্ত বসু, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পঞ্চাশ বছর পরিক্রমা, কলকাতা, ২০০০, পৃ- ২১-২৮ (প্রতিষ্ঠাপর্ব)

১৫) সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন, কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ

১৬) পূর্বোল্লেখিত, পৃ- ৪৪-৪৯

চৌগাছার মন্দির ঃ প্রাথমিক অনুসন্ধান ও আলোচনা

আতিয়ার রহমান

ভূমিকা ঃ পুরাকীর্তির ক্ষেত্রে চৌগাছা থানা খুব সমৃদ্ধ নয়। চৌগাছার প্রত্ন-স্থাপত্যের প্রধান অঙ্গ মন্দির। বাংলার মন্দির স্থাপত্যের নানা শৈলীর প্রতিনিধিত্বকারী ইমারত হিসেবে এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এর কোন কোনটির শিল্পমান যথেষ্ট উন্নত। আমাদের স্থাপত্যকলা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণ ও পুনর্গঠনে এসব মন্দিরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, অযত্ন-অবহেলায় ও পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকে এই মূল্যবান ইমারতরাজী দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখনই এদের একটি স্থাপত্যিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। এই উদ্দেশে চৌগাছার সমগ্র অঞ্চল অনুসন্ধান ও প্রতিটি মন্দিরস্থল সরেজমিনে জরিপ করে[১] তার ভিত্তিতে রচিত বর্ণনা আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। একই সাথে সমকালীন যুগের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

চৌগাছার পরিচিতি ঃ বর্তমান যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা একটি সীমান্তবর্তী থানা শহর[২] এবং জেলা সদর থেকে ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে কবি মাইকেল মধসূদন দত্তের কাব্য প্রসিদ্ধ কপোতাক্ষ নদের পূর্বতীরে অবস্থিত[৩]। এগারটি ইউনিয়নভুক্ত ১৬৫ থানা গ্রাম নিয়ে গঠিত চৌগাছা থানার আয়তন ১৬৯ বর্গমাইল (২৭০.৮৮বর্গকিলোমিটার)।[৪] থানাটি যশোর সদরসহ কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর ও ঝিকরগাছা থানা এবং ভারতের চব্বিশ পরগণা জেলার দ্বারা বেষ্টিত।[৫] চৌগাছা পূর্ব ছিল নদীয়া জেলাধীন যশোর মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম।[৬] 'উইল এন্ড কোম্পানি' চৌগাছায় একটি চিনি শোধনাগার স্থাপন করেছিলেন যা পরবর্তীতে কোটচাঁদপুরের 'মেসার্স নিউ হাউস'র নিকট বিক্রি করা হয়।[৭] বাকসওয়ার্থ সাহেব এখানে একটি বিশাল নীল কারখানা স্থাপন করেছিলেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৮] রেনেল সাহেব তার মানচিত্রে চৌগাচাকে একটি প্রসিদ্ধ স্থানরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৯] বাংলার নীল বিদ্রোহ[১০] ও বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চৌগাচার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম।[১১]

চৌগাচা থানার মন্দিরসমূহকে গঠনগত দিক থেকে প্রধানত নিম্নরূপ পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়, যথা ঃ-

১) রত্ন মন্দির - ক) একরত্ন এবং

খ) পঞ্চরত্ন,

২) বাংলা মন্দির,

৩) গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টভূজাকাব মন্দির,

৪) সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দির এবং

৫) অন্যান্য মন্দির।

১। রত্ন মন্দির ঃ যে সকল মন্দিরের ছাদ রত্ন বা শিখর স্থাপন করে নির্মিত হয় সেগুলোকে রত্ন বা শিখর মন্দির বলে ।[১২] চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের দেয়ালের উপর থেকে শিখরের চারটি পাশ ক্রমহ্রস্বমানভাবে উপরে উঠে প্রায় সংলগ্ন হয়ে পিরামিড আকার লাভ করে। অতঃপর সংযোগস্থলটি একটি গোলাকার পাথর বা ইটের খণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করে তদুপরি একটি কলস বিশিষ্ট শীর্ষদন্ড স্থাপন করে ইমারতের সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়। ছাদের উপরে একটি রত্ন/শিখর নির্মিত হলে তাকে বলে একরত্ন[১৩] মন্দির।

ক) একরত্ন মন্দির

কাদবিলার একরত্ন মন্দির ঃ কাদবিলার মৈত্র বংশীয় জমিদারদের কারুকার্যময় বিশাল অট্টালিকার অর্ধেকটা এখনও বিদ্যমান। বাড়িটির দক্ষিণ এবং পশ্চিম পাশে জরাজীর্ণ দু'টি মন্দির আছে। আলোচনার সুবিধার্থে এদেরকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হল:—

লিপি উৎকীর্ণ একরত্ন মন্দির (১৮৩৫) ঃ বর্গাকার নকশায় নির্মিত মন্দিরের আয়তন ১০x১০ ফুট এবং উচ্চতা ছাদসহ২৫ ফুট দেওয়ালের উচ্চতা ১৩ ফুট এবং রত্নটি ১২ ফুট। পূর্ব দেওয়ালে ৬ ফুট উঁচু ও ৩ ফুট চওড়া খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার আছে। দ্বিবলয়ে নির্মিত খিলানের সম্মুখেরটি বহু খাঁজ বিশিষ্ট যা মুসলিম স্থাপত্য রীতির প্রভাব এবং পরেরটি অর্ধবৃত্তাকৃতির। দ্বিবলয়ে নির্মিত খিলানের প্রয়োগ দেখা যায় দিল্লীস্থিত ইলতুৎমিশের সমাধি ইত্যাদি প্রাথমিক স্থাপত্যে।[১৫] প্রবেশদ্বারের দু'দিকে দু'টি অলংকৃত সরু পোস্তার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। খিলান দ্বারটি একটি প্রশস্ত ফ্রেমে বেষ্টিত (প্লেট - ১. চিত্র - ১) মন্দিরের ছাদ অভ্যন্তর থেকে অর্ধবৃত্তাকৃতির গম্বুজ দ্বারা ঢাকা। গম্বুজটি পেন্দেনতিফ রীতিতে তৈরি ও চারটি বৃহদাকার খিলানের উপর স্থাপিত। বাইরের দিকে থেকে গম্বুজের উপরে একটি সুউচ্চ পিরামিডাকৃতির শিখর নির্মিত। এর শিরোভাগে সংযুক্ত এক সময়ের সুদৃশ্য কলস-মোটিফ শীর্ষদন্ডটি বহু আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। মন্দিরাভ্যন্তরের উত্তর-পশ্চিম দেয়ালে একটি করে কুলুঙ্গি আছে। খিলানশীর্ষের উভয় পাশে দু'টি প্রস্ফুটিত গোলাপ নকশা বিদ্যমান। খিলানপথ বরাবর দেয়ালের শীর্ষভাগে উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একটি পোড়ামাটির ফলক অদ্যাবধি সংস্থাপিত আছে। লিপি ফলকে মন্দির নির্মাণের তারিখ বাংলা ১২৩৫ সাল (১৮৩৫ খ্রিঃ) উল্লেখ রয়েছে (প্লেট - ১, চিত্র-২)। সমগ্র চৌগাছা থানার তারিখযুক্ত মন্দিরের এটাই একমাত্র উদাহরণ। এজন্য

মন্দিরটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। চৌগাছা থানায় নির্মিত অপরাপর মন্দিরগুলোর একটা আনুমানিক সময় কাল নির্ণয়ে উৎকীর্ণ তারিখটি সহায়ক হতে পারে। মন্দিরটিতে উল্লেখযোগ্য কোন অলংকরণ নেই।

লিপিবিহীন একরত্ন মন্দির ঃ কাদবিলা গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রাস্তার উত্তর পাশে ও মৈত্র বাড়ীর পশ্চিমে একটি বন-বাঁদাড়ের মধ্যে এই মন্দিরটি অবস্থিত। পূর্বোক্ত মন্দিরের ন্যায় এটা একই উচ্চতা ও বর্গাকার ভূমি নকশায় পিরামিডাকৃতিতে নির্মিত। মন্দিরটি আয়তনে প্রথমটি অপেক্ষা বড় এবং এর বাহ্যিক পরিমিতি ১২x১২ ফুট। দক্ষিণ পাশে দ্বিবলয়ে নির্মিত খিলান দরজা আছে। সম্মুখভাগের খিলানটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট এবং পরেরটি কৌণিক যা উপমহাদেশের ইসলামি স্থাপত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

অলংকরণ ঃ ইমারতটি চৌগাছা অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অলংকরণ বিশিষ্ট মন্দির। বেশির ভাগ অলংকরণই পলেস্তারা নির্মিত এবং এর অধিকাংশই দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথ বেষ্টন করে একটি প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে বিদ্যমান। এর শীর্ষে একটি মোটা দড়ি নকশার নিম্নে তিন সারিতে বিন্যাসিত লতা-পাতা ও ফুলের নকসা আছে। খিলানের উভয় পাশে আছে দু'সারিতে সজ্জিত প্যাঁচানো লতার নকশা। খিলান শীর্ষে ও তার দু'পাশে আছে একটি করে ফুটন্ত গোলাপের নকশা। মন্দিররে কোণা চারটিও অলংকৃত। চারপাশের কার্ণিশের নিম্নভাগ একসারি পাখির নকশা দ্বারা সজ্জিত। এর উভয় দিকে আছে সারিবদ্ধ ফুলের কুঁড়ি নকশা এবং নিম্নে একসারি সর্পফণা ও এক সারি ফুটন্ত গোলাপ নকশার সজ্জা। একই সর্পফণা নকশা জমিদার বাড়ির দ্বিতলার কার্ণিশের নিচেও উপস্থাপিত হয়েছে।

নির্মাণ তারিখ ঃ মন্দির গাত্রে এক সময়ে একটি লিপি ফলক ছিল । অনেক দিন আগে মৈত্র পরিবারের নিকট থেকেই এটি হারিয়ে গেছে বলে জানা যায়। কিন্তু তারা এর নির্মাণ তারিখটি বলতে পারেন না। তবে পূর্বোক্ত মন্দিরের নির্মাণ তারিখ, মন্দির ও জমিদার বাড়ির সর্পফণা অলংকরণের সাদৃশ্য এবং মন্দিরের ধ্বংসাবস্থা দেখে বলা যায়, আলোচ্য মন্দিরটি আরো পরে নির্মিত। অনুমান করা যায়, ১৮৩০ সালের পরে এবং ১৮৫০ সালের পূর্বে ইমারতটি নির্মিত। মন্দিরটির ভীত এবং ছাদ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অতি সত্বর ইমারতটি সংস্কারের ব্যবস্থা করলে এই মূল্যবান প্রত্ন-সম্পদটি আরও দীর্ঘকাল টিকে থাকত ও চৌগাছাবাসীর প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারত।

যাত্রাপুর একরত্ন মন্দির ঃ চৌগাছা থানায় অবস্থিত মন্দির স্থাপত্যের আর একটি বিদ্যমান উদাহরণ যাত্রাপুর গ্রামের সরকার বাড়ির মন্দির। ভগ্নদশাগ্রস্থ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় দন্ডায়মান এই ইমারতটি গাছপালার আক্রমণে দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে (প্লেট -১, চিত্র - ৩)। বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় অচিরেই ধ্বসে পড়বে। যাত্রাপুর

গ্রামটি হাকিমপুর বাজারের প্রায় দেড় মাইল পূর্বে বারবাজার-হাকিমপুর সড়কের দক্ষিণে ও মরজাত বাওড়ের উত্তরে অবস্থিত। চৌগাছার বিখ্যাত জমিদার বি.সরকার এখানকারই বাসিন্দা। তাঁর নির্মিত জমিদার বাড়ির একটি অংশ আজও বিদ্যমান। বাড়ি সংলগ্ন পুকুরের পূর্ব পাড়ে আলোচ্য মন্দিরের অবস্থান। পোড়ান ইট এবং চুন-শুরকি উপাদান দ্বারা নির্মিত ইমারতটি প্রাকার ঘেরা ও এর ইটগুলো মোটা। ইমারতের সঠিক নির্মাণকাল জানা যায় না। তবে শান বাঁধানো পুকুরের ঘাটে বাংলা ১৩৩৮ সাল (১৯৩১ খ্রিঃ) ও বি. সরকার এ্যান্ড সন্স উৎকীর্ণ লিপি এবং অট্টালিকার উপরতলার ইটের সাথে মন্দিরের ইটের সাদৃশ্য ও নীচতলার ইটের সাথে বৈসাদৃশ্য দৃষ্টে ধারণা করা যায়, উক্ত সালেই বি.সরকারের পুত্রদের দ্বারা মন্দিরটি নির্মিত।

স্বরূপপুর মঞ্চস্থিত একরত্ন মন্দির ঃ মফস্বল থেকে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে চৌগাছা-কোটচাঁদপুর সড়কের উপর স্বরূপপুর গ্রাম। এখানে প্রাচীন ও জীর্ণ-শীর্ণ একটি মন্দির আছে (প্লেট - ১, চিত্র - ৪)। গ্রামের পশ্চিমে কপোতাক্ষ নদের উত্তর তীরে একটি মাঠের মধ্যে অবস্থিত মন্দিরটি শতাব্দীকাল আগে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান বলে জানা যায়। তখন সমগ্র মাঠটি ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল। পোড়ান ইট ও চুন-শুরকি দ্বারা নির্মিত বর্গাকার মন্দিরটি একই আকৃতির একটি মঞ্চের উপরে স্থাপিত। পূর্ব দেয়ালের মধ্যভাগে ত্রিখাঁজ খিলান বিশিষ্ট মন্দিরের একমাত্র দরজাটির উভয় পাশে একটি করে অলংকৃত পোস্তা সংযোজিত। প্রবেশ দ্বারটি ১$^{১}/_{২}$ ফুট চওড়া ও ৬ ইঞ্চি পুরু একটি খিলানাকৃতির ফ্রেম দ্বারা বেষ্টিত। মেঝেটি এখনো বেশ ভাল আছে। অভ্যন্তর দেয়ালে চারটি অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানযুক্ত কুলুঙ্গি আছে। এদের দু'টি পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে স্থাপিত। মন্দিরের ছাদটি অর্ধগম্বুজ আকৃতির। পেন্দেনতিফ (pendentive) পদ্ধতিতে নির্মিত গম্বুজটি চারটি বৃহৎ অর্ধবৃত্তাকৃতি কৌণিক খিলানের উপর স্থাপিত। দেয়ালের চার কোণে পেন্দেনতিফ সংযুক্ত চারটি মোচাকৃতির (conical) নক্সা আছে। বাইরের দিক থেকে সমগ্র গম্বুজটি একটি সুউচ্চ পিরামিডাকৃতির রত্ন দ্বারা আচ্ছাদিত। রত্ন শীর্ষে এক সময়ে কলস মোটিফ ফিনিয়াল শোভা পেত বলে মনে হয়, কিন্তু বর্তমানে শীর্ষদেশটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। মন্দির গাত্রের কোথাও কোন উৎকীর্ণ লিপি নেই, কোন জনশ্রুতিও পাওয়া যায় না। ফলে এর নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে কাদবিলা গ্রামের মৈত্র বাড়ির মন্দিরে উৎকীর্ণ তারিখ (১২৩৫ বঙ্গাব্দ) এবং উভয়ের বর্তমান অবস্থা ও নির্মাণ উপাদান দেখে মনে হয় আলোচ্য মন্দিরটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে কিংবা আরও আগে নির্মিত।

খ) পঞ্চরত্ন মন্দির ঃ

চুটারহুদা পঞ্চরত্ন মন্দির ঃ শুকপুকুরিয়া ইউনিয়নের পুড়াপাড়া মৌজার অন্তর্গত চুটারহুদা গ্রামে একটি ধ্বংসোন্মুখ পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে

একটি বৃহদাকার পুকুর ও পুড়াপাড়া মাকাপুর কাঁচা সড়কের দক্ষিণ পাশে মন্দিরটি অবস্থিত। চৌগাছা সদর থেকে আনুমানিক ছয় মাইল পশ্চিমে এবং বিখ্যাত কাঠগড়া নীলকুঠি ও পুড়াপাড়া বাজারের এক কিলোমিটার দক্ষিণে গ্রামের অবস্থান। চুটারহুদার এই মন্দিরের স্থাপত্যিক ও আলংকারিক সৌন্দর্য আজও পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে (প্লেট - ২, চিত্র - ৫)।

চুটারহুদা গ্রামের ধনী জোতদার পাঁচু ঘোষ[১৮] মন্দির নির্মাণ করে এখানে রাধা-বল্লভের একটি যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এজন্য গ্রামের হিন্দুরা এটাকে বাধ-বল্লভ মন্দির বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু অত্রাঞ্চলের জনসাধারণের কাছে এটা পাঁচু ঘোষের মন্দির ও অবস্থানগত কারণে চুটারহুদার মন্দির এই উভয় নামেই পরিচিত। বর্তমানে অবশ্য গ্রামের নামানুসারেই মন্দিরটি সর্বাধিক পরিচিত।

ভূমিনকশা ও গঠন ঃ মন্দিরটি বর্গাকার ভূমি নকশায় নির্মিত এবং এর প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২০ ফুট। পাকা ইট, চুন-শুরকি ও পলেস্তারা উপাদানে তৈরি মন্দিরটি গর্ভগৃহ এবং বারান্দা— এই দুটি অংশে বিভক্ত এবং উভয়াংশই আয়তাকার পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ গর্ভগৃহের অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ১৩ x ৮ ফুট এবং বাহ্যিক পরিমিতি ২০x১১ ফুট ৪ ইঞ্চি। গর্ভগৃহের সম্মুখে (দক্ষিণ) অবস্থিত বারান্দার অয়তন ২০ ফুট x ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি প্রশস্ত। মন্দির দেয়ালের প্রশস্ততা ১ ফুট ৮ ইঞ্চি। গর্ভগৃহের দক্ষিণ দেয়ালের মধ্যভাগে নির্মিত একটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান দরজা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। ক্ষুদ্রাকার এই প্রবেশদ্বারটি ৫ ফুট উঁচু ও ২ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে আরও একটি দরজা ছিল বলে জানা যায় যা অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরাংশ সাদামাটা একটি কুঠরী। সরু বারান্দাটি পাঁচটি ত্রিখাঁজযুক্ত খিলানপথ দ্বারা উন্মুক্ত। খিলানগুলোর তিনটি দক্ষিণদিকে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে একটি করে সন্নিবেশিত। খিলানগুলো আবার বৃহদাকার কৌণিক খিলানাকৃতির ফ্রেমে আবদ্ধ (প্লেট - ২, চিত্র - ৫)। ত্রিখাঁজ খিলান বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্যের অধিকাংশ ইমারতে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে ব্যবহৃত।[১৯] মুসলিম স্থাপত্যে বিকশিত এই বৈশিষ্ট্য আঠার-উনিশ শতকে হিন্দু স্থাপত্যে অনুকৃত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।[২০] পূর্ব এবং পশ্চিম বাহুর খিলানপথের উভয় পাশে একটি করে সরু কৌণিকদণ্ড (nook shoft) সংযুক্ত। গর্ভগৃহের সম্মুখে বারান্দা নির্মাণ মন্দির স্থাপত্যের একটি সাধারণ রীতি।[২১] বারান্দার দক্ষিণ দিকে স্থাপিত স্তম্ভগুলো তিনটি করে অংশে বিভক্ত - মধ্যভাগ সামান্য প্রক্ষিপ্তাকারে গোলায়িত (round) এবং পার্শ্বদ্বয় চ্যাপ্টা। মন্দিরের কোণগুলোতে যুগল পাড় দ্বারা বহুধাবিভক্ত সরু কৌণিকদণ্ড সংযুক্ত যা বাংলার চালাঘরের কোণের বাঁশের খুঁটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

সমগ্র মন্দিরটি একই ছাদে আবৃত। ভিতরের দিকে ছাদটি half barrel voult কিংবা নৌকার ছই আকারে নির্মিত, কিন্তু উপরিভাগ ক্রমাবনত সমতল ছাদে আচ্ছাদিত।

ছাদের চতুর্দিকের কার্নিশ ধনুকের ন্যায় বাঁকানো। এই ক্রমাবনত ছাদ, ছাদের বাঁকানো কিনারা, বাঁশের খুঁটি সদৃশ কৌণিক দণ্ডসহ ইমারতের বাহ্যিক অবয়ব বাংলাদেশের চারচালা রীতির কুঁড়েঘরের প্রতিফলন বলে কলা ঐতিহাসিকগণের ধারণা।[২২] মন্দির স্থাপত্যে চারচালা রীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে মুঘল যুগে, কেননা প্রাক-মুসলিম হিন্দু ইমারতে এই রীতির কোন চিত্রকলা কিংবা ভাস্কর্যের বিদ্যমান উদাহরণ দেখা যায় না।[২৩] আলোচ্য পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট চারচালা মন্দিটি চৌগাছা থানার উক্ত রীতির একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী ইমারত। তবে বৃহত্তর যশোর জেলায় এই রীতির মন্দিরের উদাহরণ আজও বিদ্যমান। পার্শ্ববর্তী কালীগঞ্জ (আধুনিক ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত) থানার নলডাঙ্গায় অবস্থিত পঞ্চরত্ন মন্দির (সপ্তদশ শতক)[২৪] এবং মাগুরা জেলার কানাইনগরের পঞ্চরত্ন মন্দির (১৭৩০ খ্রিঃ)[২৫] দুটি অনুরূপ চারচালা বিশিষ্ট। আলোচ্য মন্দিরটি উনিশ শতকে নির্মিত হওয়ায় উক্ত মন্দিরদ্বয়কে এর পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ছাদের উপরে পাঁচটি সুদৃশ্য রত্ন নির্মিত হওয়ায় মন্দিরটি পঞ্চরত্নের মর্যাদা লাভ করেছে।[২৬] গুপ্তযুগে বাংলায় রত্ন মন্দির নির্মাণের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। বরকার রত্নমন্দিরকেএই রীতির প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়।[২৭] পনের শতকের পরে বাংলায় উক্ত প্রাচীন রীতির সরলীকরণ ও পরিবর্তন হয়ে একটি আঞ্চলিক রীতিতে পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।[২৮] মন্দিরের রত্নগুলো চারটি ইমারতের কোণে এবং একটি এর কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত। শেষোক্তটি সর্বাপেক্ষা বড় এবং অন্য চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও আকার - আকৃতিতে একই রকম। রত্নগুলোর নিভাগ বর্গাকার ও খিলানপথ দ্বারা উন্মুক্ত। কেন্দ্রীয় রত্নের খিলানগুলো বারান্দার খিলানের ন্যায় ত্রিখাঁজযুক্ত হলেও অন্য চারিটিতে আছে অর্ধবৃত্তাকার খিলান। রত্নসমূহের উর্ধ্বাংশ কৌণিক ও পিরামিড আকারে তৈরি। পিরামিড শীর্ষ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ও কলসদণ্ডে শোভিত। কলসগুলো নিম্ন থেকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকারে সন্নিবেশিত হয়ে শীর্ষদেশ একটি বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়েছে (প্লেট -২, চিত্র - ৫) শীর্ষদণ্ডের কলসগুলো পিতলে তৈরি। এজন্য যথাযত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় সবগুলো কলসই চুরি হয়ে গেছে।

অলংকরণঃ মন্দিরের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের সমগ্র দেয়ালগাত্র ও রত্নসমূহ পলেস্তারা আচ্ছাদনে ঢাকা। উত্তর দেয়ালের বহির্গাত্রে তিনটি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে স্বল্প গভীর ত্রিখাঁজ খিলানের • কশা ব্যতীত সমগ্র দেয়ালই নিরাভরণ। বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে পলেস্তারা কার্যের সূত্রপাত ঘটে মুঘল যুগে এবং তখন থেকে অদ্যাবধি পলেস্তারা শৈলীর ব্যাপক ব্যবহার অব্যাহত আছে ।[৩০] গর্ভগৃহের অভ্যন্তরের অলংকরণহীনতার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। গর্ভগৃহটি জানালাবিহীন এবং এর দক্ষিণ পাশের একমাত্র দরজাটি ক্ষুদ্রাকৃতিতে নির্মিত হওয়ায় এর অভ্যন্তরভাগ অনেকটা অন্ধকাররাচ্ছন্ন। এই অলংকরণ বিবর্জিত প্রায়ান্ধকার অভ্যন্তরভাগ বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।[৩১]

মন্দিরটির অলংকরণ সজ্জার প্রায় সর্বাংশই এর শীর্ষদেশে উপস্থাপিত এবং এর প্রধান উপাদান ভাস্কর্যচিত্র। সম্ভবত চুনের সাথে শুরকি বা বালি জমিয়ে এসব ভাস্কর্যগুলো তৈরি হয়েছে।[৩২] পশু-পাখি, জীবজন্তু ও দেব-দেবীর ভাস্কর্য চিত্রগুলো নানা ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত। এগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে দৃষ্টি কাড়ে দক্ষিণ পাশের রত্নদ্বয়ের পাদদেশে নির্মিত দুটি বীর্যবান সিংহমূর্তি (প্লেট - ২, চিত্র - ৬)। মুখো-মুখি স্থাপিত ও গ্রীবা বাঁকিয়ে দন্ডায়মান তেজোদীপ্ত সিংহদুটিকে নির্মাতার আর্থ-সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রতন লাল চক্রবর্তী লিখেছেন, ''সুশোভিত মন্দির নির্মাণ বিত্তশালী শ্রেণীর দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা আদায়ের উচ্চকাংখা ও ধন সম্পদ সংগ্রহের দৃশ্যমান ফলাফল।''[৩৩] উক্ত রত্নদ্বয়ের দক্ষিণ বাহুর খিলান শীর্ষ একজোড়া করে ময়ূর নকশা এবং খিলান ফ্রেমের পার্শ্ব ও শীর্ষ লতাপুষ্পে অলংকৃত। মুখোমুখি উপস্থাপিত দুটি ময়ূরের মধ্যভাগে একটি করে ফুটন্ত ফুলের নকশা আছে। একইভাবে কেন্দ্রীয় রত্নটির দক্ষিণ বাহুর খিলান শীর্ষে উপস্থাপিত হয়েছে দুটি পূর্ণাঙ্গ ও বিবসনা নারীমূর্তি (প্লেট -২, চিত্র - ৭)। কনুই এর উপর ভর করে হতের তালুতে মাথা রেখে শায়িত নারী মূর্তি ও খিলান ফ্রেমের উপরিভাগ ও পার্শ্বদেশ প্যাঁচানো লতা-পাতা, পুষ্পে সুশোভিত। শিখর গাত্রের অলংকরণ হিসেবে এদের প্রতি বাহুর ত্রিখাঁজ খিলানযুক্ত চৈত্য গবাক্ষ মন্দির স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[৩৪] খিলানগুলোর উভয় পাশের সরু ও খর্বাকৃতির কৌণিক দণ্ডগুলো ও রত্নসমূহের সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়ক হয়েছে। রত্নশীর্ষের কলসদন্ডসমূহ এক একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মধ্যে থেকে উত্থিত। পদ্মগুলোর নিম্নভাগ মোটা দড়ি নকশায় শোভিত।

মন্দিরের সম্মুখ প্রাসাদের কার্ণিশের নিম্নভাগ সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত নয়টি দেবমূর্তি ও লতা নকশায় অলংকৃত। মন্দিরে উপস্থাপিত ভাস্কর্য চিত্রগুলো বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের অলংকরণে ব্যবহৃত ভাস্কর্যকলার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। এতদসত্বেও মন্দিরের সুউচ্চ রত্নগুলোই এর প্রধান আলংকারিক গুরুত্বের অধিকারী।

পরবর্তী সংস্কার ও বর্তমান অবস্থা ঃ অনেক আগে থেকেই ইমারতটি জীর্ণদশায় পতিত হয়েছে। দেয়ালের পলেস্তারা প্রায় সমগ্র খসে পড়ে গেছে। সিমেন্ট-বালি দ্বারা অতি আনাড়ি হাতে নতুন করে প্লাষ্টার করা হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু লোনা ধরার কারণে নতুন প্লাষ্টারও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না , ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চলেছে অবিরাম ধারায়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ও অযত্ন-অবহেলায় থাকার কারণে ছাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে গাছপালা। লোনা ধরে ও গাছপালার আক্রমণে ছাদটি দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা এই মূল্যবান স্থাপত্য কর্মটিকে এখনও অনেকদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

পঞ্চরত্ন ভোগ মন্দির এবং পঞ্চরত্ন দোল মন্দির ঃ উপরোক্ত মন্দিরের পূর্ব এবং পশ্চিম পাশে কয়েক গজ দূরে মূল মন্দিরের অনুকরণে আরও দুটি ক্ষুদ্রাকৃতির উমারত নির্মিত হয়েছিল। এদের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান (প্লেট - ২, চিত্র - ৫) এই ক্ষুদ্রাকৃতির ইমারতদ্বয়ের একটি ভোগ মন্দির এবং অপরটি দোল মন্দির নামে অভিহিত। বর্গাকার ভূমি নকশায় নির্মিত মন্দির দুটির পরিমিতি ছিল ৯ x ৯ ফুট। এদেরও উপরিভাগ পাঁচটি সুদৃশ্য রত্ন দ্বারা শোভিত ছিল। রত্নগুলোর শীর্ষদেশ মূল মন্দিরের ন্যায় কলসযুক্ত দন্ড দ্বারা পরিশোভিত। রত্নগুলোর কোন কোনটি এখনও ভগ্নাবস্থায় টিকে আছে। মন্দির দুটি পলেস্তারা আস্তরণে ঢাকা ছিল। প্রধান মন্দিরের ন্যায় এই মন্দির দুটিও অলংকরণবিহীন। তবে উপরিভাগে মনোরম রত্নসমূহের কারণে এককালে এদের স্থাপত্যিক সৌকর্য যে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত তা জোর দিয়ে বলা যায়। দুটি ইমারতেরই একটি করে মন্দিরমুখী দরজা ছিল।

নাট মন্দির ঃ পঞ্চরত্ন মন্দির থেকে ১০ ফুট দক্ষিণে একটি নাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে (প্লেট - ২, চিত্র - ৫)। আয়তকার নকশায় নির্মিত মন্দিরের আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৫১ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ৩১ ফুট। পাকা ইট ও চুন-শুরকি উপাদানে নির্মিত দেয়াল ১ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রশস্ত। চারদিকের দেয়াল বৃহদাকার অর্ধ গোলায়িত খিলান দ্বারা উন্মুক্ত। সবমোট ১৬টি খিলানের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি করে এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে পাঁচটি করে বিন্যাসিত। বর্তমানে উত্তর পাশের ৩টি এবং পূর্ব পাশের দুটি খিলান ছাড়া সবগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দেয়ালের বহির্গাত্রে দুটি খিলান অন্তর এবং জোড়া করে অর্ধগোলায়িত স্তম্ভ সংযুক্ত। প্রতিটি স্তম্ভমূল গোলাকার পাড় (band) দ্বারা অলংকৃত। উপরিভাগ চুন-শুরকি, টালি এবং লোহা ও কাঠের কড়ি-বরগার সাহায্যে সমতল ছাদে আচ্ছাদিত ছিল। প্রতি বছর পূজা উপলক্ষ্যে এখানে যাত্রা, থিয়েটার, নাচ-গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। সমগ্র মন্দির এলাকা দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখরিত হত — আজ সবই অতীত। মন্দিরে পূজা দেওয়া এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের মানুষের বড় অভাব।
নির্মাণ তারিখ ঃ মন্দিরগাত্রে কোন প্রতিষ্ঠা ফলক না থাকায় এবং অন্য কোন লিখিত সাক্ষ্যের অভাবে এর সঠিক নির্মাণ তারিখ নির্ধারণ করা যায় না। অবশ্য এর নির্মাতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। নির্মাতা পাঁচু ঘোষ এর নাম এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায় যে, ইমারতটি প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিল।

২। বাংলা মন্দির

চৌগাছার চারচালা শিব মন্দির ঃ চৌগাছা থানায় বাংলা মন্দিরের সংখ্যা বিরল। থানা সদরের আলোচ্য চারচালা মন্দিরটি এখানকার বাংলা রীতির মন্দিরের একমাত্র বিদ্যমান উদাহরণ। কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে চৌগাছা-ঝিকরগাছা সড়ক ও চৌগাছা

ইউনিয়ন পরিষদ ভবন থেকে আনুমানিক ১০-১৫ গজ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি বাংলার কুড়ে ঘরের ন্যায় চারচালা বিশিষ্ট (প্লেট - ২, চিত্র - ৮)। এটা 'বাংলা রীতি' নামেও অভিহিত।[৩৫] সমগ্র চৌগাছা থানায় নির্মিত চারচালা রীতির মন্দির স্থাপত্যের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী ইমারত হিসেবে মন্দিরটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হলেও বাংলার মন্দির স্থাপত্যে চারচালা রীতি খুবই পরিচিত ও আদর্শ রূপ হিসেবে গৃহীত।[৩৬] মুসলিম স্থাপত্যেও চারচালা ছাদ বহুল ব্যবহৃত। বাগেরহাট জেলার ষাট গম্বুজ মসজিদ (১৪৫৯ খ্রিঃ), চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার দরসবাড়ি মসজিদ (১৪৭৯ খ্রিঃ) ও ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) ইত্যাদি চারচালা ছাদ বিশিষ্ট স্থাপত্য ইমারতের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।[৩৭] উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এসব ইমারতের শুধু কেন্দ্রীয় নেভ্-টি (nave) একসারি চারচালা ছাদে আবৃত। একটি অনুচ্চ ভিতের উপরে সামান্য আয়তকার ভূমি নকশায় নির্মিত মন্দিরের বাহ্যিক পরিমাপ ৮ x ৭ফুট এবং দেয়ালের উচ্চতা ৮$^{১}/_{২}$ ফুট। দক্ষিণ পাশের দেয়ালে একটি অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে এবং অন্য তিন দিকে ইটের ঝরোকা নির্মিত আনুমানিক ২ ফুট উচু একটি বেদীর উপরে কষ্টিপাথরে তৈরি একটি শিব মূর্তি স্থাপিত ছিল। কয়েক বছর আগে পুরাকীর্তি হরণকারীরা মূর্তিটি চুরি করে নিয়ে গেছে বলে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। ইমারতের ছাদটি বাংলার চারচালা খড়ের ঘরের মত চারটি দেয়ালের উপর ত্রিভুজাকৃতির ন্যায় চারটি চাল উপরে একটি বিন্দুতে সংযুক্ত করে নির্মিত।[৩৮] ছাদটি অভ্যন্তর দিকে সিমেন্ট-বালি-খোয়া, লোহার পাত এবং উপর থেকে চুন-শুরকি দ্বারা দ্বিস্তরে তৈরি। ছাদের উপরে কলসযুক্ত একটি শীর্ষদন্ড আছে। কার্ণিশের নিম্নে চারদিকে বেষ্টন করে একটি সাদামাটা ব্যান্ড ছাড়া ইমারতের কোথাও কোন অলংকরণ নেই। মন্দিরটি বর্তমান অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। এর নির্মাণ উপাদান ইট-সিমেন্ট-বালু-খোয়া এবং চুন-শুরকি লোহার পাত।

মন্দিরটি কে কখন নির্মাণ করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এর বর্তমান অবস্থা ও নির্মাণ উপাদান দেখে বুঝা যায় এটা আধুনিক কালের তৈরি। জনৈক প্রবীণ ব্যক্তির অভিমত হল, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এম.বি. সরকার নামক চৌগাছার একজন জমিদার মন্দিরটি তৈরি করেন। আধুনিক কালে নির্মিত হলেও চৌগাছা থানার মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে মন্দিরটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। কেননা এই অঞ্চলে চারচালা আকৃতির এটাই একমাত্র বিদ্যমান নিদর্শন।

৩। গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টভূজাকার মন্দির

নারায়ণপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বুন্দলিতলা গ্রামে এই মন্দিরটি অবস্থিত। চৌগাছা থেকে আনুমানিক চার মাইল উত্তর পশ্চিমে চৌগাছা-মহেশপুর সড়কের চার-পাঁচশ মিটার দক্ষিণে কপোতাক্ষের একটি মরা খাতের পশ্চিম তীরে এবং সুফি আজিজ বক্সের রওজা

শরীফের একশ মিটার পূর্বে একটি জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান (প্লেট - ৩, চিত্র - ৯)।

ভূমিনকশা ও গঠন ঃ ক্ষুদ্রাকৃতির এই ইমারতটি ইট, চুন-শুরকি ও পোড়া মাটির ফলক দ্বারা অষ্টভূজ আকৃতিতে নির্মিত। এর অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ৮১/২ ফুট। ২ ফুট প্রশস্ত দেয়ালের প্রতিটি কোণ একটি করে সরু ও খর্বাকৃতির অলংকৃত পোস্তা দ্বারা সুদৃঢ়কৃত। উপরিভাগ একটি অর্ধবৃত্তাকৃতির গম্বুজ ছাদে আবৃত। সরাসরি দেয়াল থেকে উত্থিত আটটি খিলানের উপরে গম্বুজটি ন্যস্ত ছিল। ১৯৯৭-৯৮ সালে গম্বুজটি ধ্বসে পড়ে গেছে বলে জানা যায়। ইমারতের দেয়ালও কোন কোন দিক থেকে ভেঙ্গে পড়েছে। পূর্ব দেয়ালে আয়তকার ফ্রেম বেষ্টিত একটি প্রবেশপথ আছে। প্রবেশপথের উভয় পাশে একটি করে অলংকৃত পোস্তা সংযুক্ত। অভ্যন্তরভাগে পশ্চিম দেয়ালে একটি কুলুঙ্গি আছে। এক সময়ে ইমারতগাত্র পলেস্তারা আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

অলংকরণ ঃ মন্দির দেয়ালের প্রতি বাহু পাঁচ সারি প্যানেলে বিভক্ত। নিম্ন থেকে দ্বিতীয় সারির প্যানেলটি প্রস্ফুটিত পুষ্প বিশিষ্ট পোড়া মাটির ফলকে অলংকৃত। পুষ্পগুলো একই ধরণের এবং আমাদেব দেশীয় ধুতরা ফুলের মত (প্লেট - ৩, চিত্র - ১০)। এর উপরিভাগের দুসারি প্যানেল বর্গাকার এবং এদের অভ্যন্তর অলংকরণ বিবর্জিত। নিম্ন ও উপরিভাগেব দু'সারি প্যানেল আয়তকার এবং এদের অভ্যন্তরও অলংকরণ বিহীন। চৌগাছা থানার গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টভূজাকার মন্দিরের এটাই একমাত্র বিদ্যমান উদাহরণ। এক্ষেত্রে ইমারতটি যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী। বাংলাদেশেও এরূপ মন্দিরের সংখ্যা খুব কম। মাগুরার মুহম্মদপুরের একটি অষ্টভূজাকার মন্দির আছে কিন্তু সেটি দ্বিতল বিশিষ্ট।

৪। সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দির

দেবালয়ের রাধা-বল্লভ মন্দির ঃ স্বরূপদহ ইউনিয়নের দেবালয় গ্রামে আর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে (প্লেট - ৩ চিত্র - ১১)। চৌগাছা হতে আনুমানিক পাঁচ মাইল পশ্চিমে খড়িঞ্চা বাজার ও চৌগাছা-পুড়াপাড়া সড়কের এক মাইল দক্ষিণে প্রাক্তন ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের নিকটে ও খড়িঞ্চা বাওড়ের উত্তর তীরে একটি কাঁচা রাস্তার দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের নাম রাধা-বল্লভ। হিন্দু ধর্মের বহুলালোচিত দেব-দেবী রাধা-বল্লভ (রাধা-কৃষ্ণ) এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। ইমারতটি খুবই প্রাচীন ও সম্পূর্ণ ভগ্নদশাগ্রস্থ। এর কেন্দ্রীয় কক্ষটির চার পাশের দেয়ালই কেবল জরাজীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। লিখিত তথ্যের অভাবে মন্দিরের নির্মাতা ও নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন জনশ্রুতি নেই। দেবালয় গ্রামের শতবর্ষের সাক্ষী বলরাম বাবুর সাক্ষাতকারের মাধ্যমে ইমারতটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। আশি বছর পূর্বে মন্দিরটিকে তিনি পূর্ণ অবয়বে দেখেছিলেন বলে প্রবন্ধকারকে

অবহিত করেন। বর্তমান ধ্বংসাবস্থা দৃষ্টে ও চুটারহুদার রাধা-বল্লভ মন্দিরের সাথে তুলনা করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মন্দিরটি নির্মিত বলে অনুমান করা যেতে পারে। নির্মাতা সম্পর্কে বলরাম বাবুর ভাষ্যে জানা যায়, এটি দেবালয় গ্রামেরই মিত্তির বংশের জনৈক ধনবান হিন্দুর কীর্তি।

ভূমি নকশা ঃ মন্দিরটি পোড়ানো ইট, চুন-শুরকি ও পলেস্তারা উপাদান দ্বারা আয়তাকার নকশায় নির্মিত। এর বাহ্যিক পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ৩০ ১/২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫ ফুট। সমগ্র মন্দিরটি তিনটি কক্ষ ও একটি বারান্দা সমবায়ে গঠিত। কক্ষগুলো পূর্ব পশ্চিমে বিন্যাসিত। পার্শ্ববর্তী কক্ষ দুটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেন্দ্রীয় কক্ষটি সর্ববৃহৎ এবং এর চারদিকের দেয়াল জরাজীর্ণ অবস্থায় এখনও অবস্থায় এখনও টিকে আছে। এর উপরে টিনের ছাউনি দিয়ে গ্রামের হিন্দুরা কোন রকমে তাদের পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে। কক্ষটির অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ১০ ১/২ x ১১ ১/১ পার্শ্ববর্তী কক্ষদ্বয়ের আকৃতি একই রকম। এদের প্রতিটির অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ১০ ১/২ x ৭। প্রতিটি কক্ষের দক্ষিণ পাশে একটি করে প্রবেশদ্বার আছে। প্রধান কক্ষটি অপেক্ষাকৃত বড় ও ৭ ফুট প্রশস্ত। পাশের দুটির প্রশস্ততা ১ ফুট ২ ইঞ্চি করে। প্রবেশ পথগুলো আয়তকার ফ্রেম দ্বারা বেষ্টিত এবং এদের উভয় পাশের দেয়ালে সরু পোস্তা সংযোজিত। কেন্দ্রীয় কক্ষের দক্ষিণ দ্বারটি ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটি করে খিলান পথ নির্মাণ করে পার্শ্ববর্তী কক্ষে গমনাগমনের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। এই খিলান পথের উভয় পাশে দুটি করে মোট চারটি কুলঙ্গি আছে। অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানগুলোতে ইসলামি স্থাপত্য রীতির অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়।

মন্দিরের সম্মুখভাবে ১৫ ফুট প্রশস্ত একটি বারান্দা আছে। এর পূর্ব ও পশ্চিম পাশে দুটি করে অর্ধবৃত্তাকৃতির উন্মুক্ত খিলানপথ নির্মিত হয়েছে। বারান্দার দক্ষিণ পাশটি সম্পূর্ণ ধ্বংপ্রাপ্ত। তবে এদিকে পাঁচটি খিলানপথ ছিল বলে অনুমিত হয়। এগুলোর মধ্যে তিনটি মন্দিরের প্রবেশ পথ ও দুটি প্রধান কক্ষের খিলান নকশা বরাবর নির্মিত ছিল। মন্দিরটি সমতল ছাদে আবৃত ছিল বলে লোকে মুখে জানা যায়। অনেক আগেই সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।

সাজ সজ্জার দিক হতে মন্দিরটিকে নিরাভরণ বলা চলে অলংকরণ বলতে দক্ষিণ পাশের দরজাগুলোর উভয় পাশের গোলায়িত সরু পোস্তা বা Nook shaft উল্লেখযোগ্য। অন্যত্র কোন অলংকরণ ছিল কিনা অনুমান কবা কঠিন। তবে দেয়ালগাত্র পলেস্তারায় ঢাকা।

মন্দিরেব কেন্দ্রীয় কক্ষে কৃষ্ণ পাথরের তৈরি রাধা-বল্লভের যুগল মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই মূর্তিটি বহু আগেই চুরি হয়ে গেছে বলে জ্ঞাত হওয়া যায়। সরকারি অনুদানে মন্দিরেব বারান্দাটিতে টিনের ছাউনি দিয়ে কোনরকমে পূজা পার্বণ চলে।

৫) অন্যান্য মন্দির ঃ

এর মধ্যে কাকুড়িয়ার কালী মন্দিরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এই মন্দিরটির গঠন বৈশিষ্ট্য খনন ব্যতিরেকে জানা সম্ভব নয়। এছাড়া বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন গ্রামে কতিপয় মন্দির নির্মিত হয়েছে। স্থাপত্যিক ক্ষেত্রে এসব মন্দিরের গুরুত্ব না থাকায় সেগুলোর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হয়।

কাকুড়িয়ার কালী মন্দির ঃ স্বরূপদহ ইউনিয়নের কাকুড়িয়া গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান (প্লেট - ৩, চিত্র - ১২)। হিজলী বিওপী হতে আনুমানিক এক মাইল পশ্চিমে এবং কাকুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দু'শো গজ দক্ষিণে একটি জলাভূমির উত্তর-পূর্ব কোণে মন্দিরস্থলের অবস্থান। বহু বছর ধরে এই স্থানটি ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল। বর্তমান জঙ্গল পরিস্কার করে ফেলাতে একটি মাটির ঢিবি দূর থেকে দেখা যায়। স্থানটি কালীবাড়ি ও কালীতলা নামে সুপরিচিত। এখানে স্থাপিত কালী দেবীর মূর্তি হতেই স্থানটির অনুরূপ নামকরণ। বছর চারেক আগে মূর্তিটি চুরি হয়ে যায়। সম্পূর্ণ কৃষ্ণ পাথরে নির্মিত এ মূর্তিটি ছিল আনুমানিক ৩ ফুট দীর্ঘ এবং ১ ১/২ ফুট প্রশস্ত।[৩৯] এই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এখনো কালী বাড়িতে এসে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। কালীতলার ঢিবিটি পাকা ইট ও চুন-শুরকিতে পরিপূর্ণ। এর পশ্চিম পাশের দেয়ালের ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি পিলারের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। হিন্দুরা ঢিবির দক্ষিণ পাশ থেকে পরিস্কার করে পূজা-পার্বণ সম্পন্ন করে থাকে। সাম্প্রতিককাল অবধি এখানে কালী দেবীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বিশ্বাস। ইমারতটির কালী মন্দির নামকরণ বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি।

ঢিবিটি জরিপ করে অনুমান করা যায় যে, ইমারতটি বর্গাকার নকশায় তৈরি এবং এর আয়তন ১৯.৬ X ১৯.৬ ফুট। ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও এর উপবিভাগের জঙ্গলাদি দেখে মনে হয় এটি চৌগাছা থানার প্রাচীনতম একমাত্র কালী মন্দির। এক সময়ে কালী বাড়ির গাছের ডালে অনেক ইষ্টক খন্ড ঝুলে থাকতে দেখা যেত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা (হিন্দু-মুসলিম) সন্তান লাভ কিংবা রোগমুক্তির আশায় এভাবে কালীদেবীর সাহায্য কামনা করত। সম্প্রতি অবশ্য তাদের এ ধারণার অবসান ঘটেছে।

উপসংহার ঃ প্রত্ন-স্থাপত্যিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে চৌগাছা থানার উপরোক্ত মন্দিরসমূহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু যুগ যুগ ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকে দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই মূল্যবান ইমারতরাজী। অদ্যাবধি এতদসংক্রান্ত কোন অনুসন্ধান ও আলোচনা না হওয়ায় এগুলো সাধারণ পাঠক, গবেষক ও সুধী মহলের অগোচরেই আছে। সুতরাং প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। ইতিহাস অনুরাগী ও গবেষকদের অভিজ্ঞতা লাভেও প্রবন্ধটি সহায়ক হবে বলে মনে করি।

চিত্র - ১

সাধারণ দৃশ্য, লিপি উৎকীর্ণ একরত্ন মন্দির, কাদবিলা

চিত্র - ৩

সাধারণ দৃশ্য, সরকার বাড়ির একরত্ন মন্দির, যাত্রাপুর

চিত্র - ২

পোড়া মাটির ফলকে উৎকীর্ণ লিপির দৃশ্য, একরত্ন মন্দির, কাদবিল

চিত্র - ৪
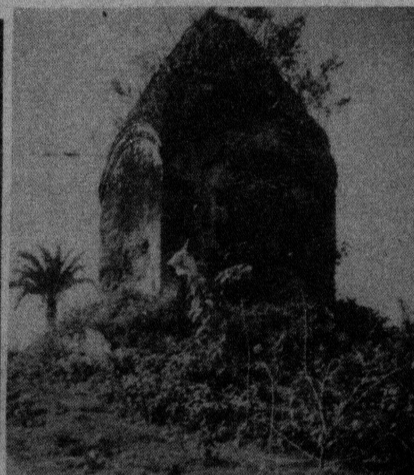
সাধারণ দৃশ্য, মঞ্চস্থিত একরত্ন মন্দির, স্বরূপপুর

চিত্র - ৫
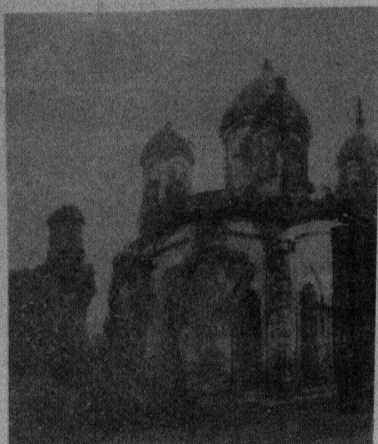
সাধারণ দৃশ্য, পঞ্চরত্ন মন্দির, চুটারহুদা
(সম্মুখে নাট মন্দির এবং পাশে দোল মন্দির)

চিত্র - ৬

পঞ্চরত্ন মন্দিরের ভাস্কর্য অলংকরণ

চিত্র - ৭

পঞ্চরত্ন মন্দিরের ভাস্কর্য অলংকরণ

চিত্র - ৮
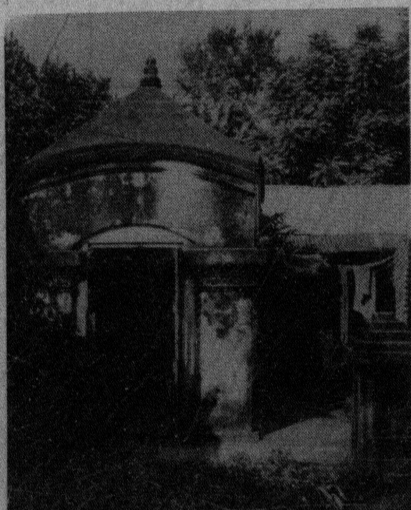
সাধারণ দৃশ্য, চারচালা শিব মন্দির,
চৌগাছা

চিত্র - ৯
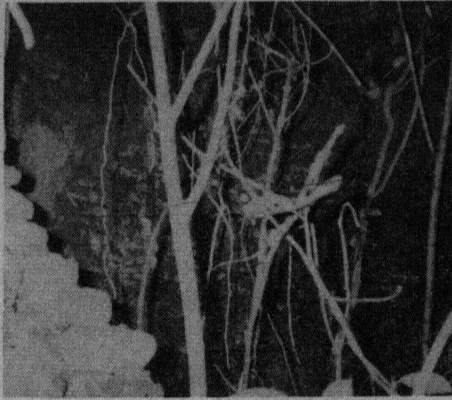
গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টভূজাকার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বুন্দলিতলা

চিত্র - ১১

সাধারণ দৃশ্য, দেবালয়ের রাধাবল্লভ মন্দির

চিত্র - ১০

পোড়া মাটির ফলকের অলংকরণ, গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টভূজাকার মন্দির, বুন্দলিতলা

চিত্র - ১২

কালী মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের দৃশ্য, কাকুড়িয়া

সূত্র নির্দেশ

১) প্রবন্ধকার নিজেই উক্ত অনুসন্ধান ও জরিপ কার্য পরিচালনা করেন। একাজে কখনও কখনও তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

২) W. W Hunter, *Statistical Account of Bengal, Vol II, Districts of Nodia and Jessore*, Indian Reprint (Delhi : 1973), p. 200.

৩) *J. Westland, A Report on the District of Jessore Its Antiquities, Its History and Its Commerce* (Calcutta : 2nd edi., 1874), p. 197.

৪) শামসুল হক মিয়া (সম্পা) *বিজয় দিবস স্মরণে* (চৌগাছাঃ ১৯৮৯), পৃ. ১।

৫) তদেব।

৬) L S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers Jessore* (Calcutta : ১৯৭২), p. 144; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, (কলকাতা ঃ নতুন সং, ১৯৯৩), পৃ. ২৫৬।

৭) J. Westland, op. cit p. 197

৮) L S S. O'Malley, op. cit., p 145

৯) Ibid . p. 144

১০) সুপ্রকাশ রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২৫৬ ৫৭ ও ৩৯০ ৯১; মেসবাহুল হক, *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ*, (ঢাকা ঃ ৩য় সং, ১৯৮৭), পৃ. ১২।

১১) বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার ঃ বৃহত্তর যশোর (ঢাকা ঃ ১৯৯৮), *পূর্বোক্ত*, পৃ ৭২০ ২১।

১২) রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ* (কলিকাতা ঃ ৭ম সং, ১৯৯২), পৃ ২৬৮।

১৩) সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, "লোক স্থাপত্য ঃ বিশ্লেষণ ও প্রভাব" *বাংলাদেশের লোক শিল্প*, (সম্পা.,) সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (ঢাকা ঃ ২য় সং, ১৯৯৫), পৃঃ ১২৬।

১৪) রমেশচন্দ্র মজুমদার, (সম্পা.,) *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, (কলকাতা ঃ ৪র্থ সং, ১৯৮৭) পৃ. ৪৪৭-৪৮।

১৫) David MacCutchion, "Hindu-Muslim Artistic Continuties in Bengal" *Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol XIII*, No. 3 (Dhaka : December, 1968), p. 237.

১৬) Percy Brown, *Indian Architecture Islamic Period*, (Bombay : 7th Reprint, 1981), plate no. VIII, XI. fig-1 : David McCutchion, op. cit., p. 237.

১৭) মোশাররফ হোসেন, "ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অলংকরণ ঃ উৎস ও ক্রমবিকাশ" *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা ঃ ১৯৯১), পৃ. ২৪৭।

১৮) প্রকৃত নাম শ্রী পঞ্চানন ঘোষ।

১৯) Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca : 1961), p. 15.

২০) তবে মুসলিম স্থাপত্যে বিকশিত ত্রিখাঁজ খিলান মূলত : বৌদ্ধ স্থাপত্যের উপাদান। ইন্দো-

মুসলিম স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এ. বি এম হোসেন বৌদ্ধ স্থাপত্যের কুলঙ্গিকে ত্রিখাঁজ খিলানের উৎসরূপে নির্দেশ করেছেন। বৌদ্ধ কুলঙ্গিও ত্রিখাঁজ বিশিষ্ট। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন, মোশাররফ হোসেন, *পূর্বোক্ত*.। পৃ ৬৫-৭২ ও ৭৭।

২১) রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ মধ্যযুগ*, পৃ. ৪৪৮।

২২) J. Ferguson, *A History of Indian and Eastern Architecture, Vol II* (London : 1910), pp. 99 & 253-54; David McCutchion, *Late Mediaeval Temples of Bengal : Origins and classification* (Calcutta 1972), pp. 12-14.

২৩) Ahmad Hasan Dani, op. cit., pp. 13-14, f. n. No. 4.

২৪) সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২২, আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া লিখেছেন, নলডাঙ্গার পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে নির্মিত, দেখুন, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা ঃ ১৯৮৪), পৃ. ৩৩৩।

২৫) J. Westland, op. cit., pp. 34-36.

২৬) রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ মধ্যযুগ*, পৃ. ৪৪৭-৪৮।

২৭) S. K. Sarashati, *Architecture of Bengal; Ancient Phase, Book I* (Calcutta : 1976), pp. 54-55

২৮) হিতেশরঞ্জণ সান্যাল. "বাঙ্গালী ধর্মীয় স্থাপত্যচর্চা", ইতিহাস *পরিষৎ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ* দ্বিতীয় সংখ্যা (ঢাকা ঃ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৪

২৯) ১৯৯৮ সালে রত্নশীর্ষে একটি কলসদন্ড পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিল, এ সময়ে প্রবন্ধকার সরেজমিনে ইমারতটি পর্যবেক্ষণ করেন।

৩০) Ahmad Hasan Dan, op. cit., p. 11.

৩১) মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস* ও *ঐতিহাসিক* (ঢাকা ঃ ১৯৯৩), পৃ. ১০

৩২) রামরঞ্জণ দাস, *পশ্চিম বঙ্গের পুরাকীর্তি* (কলিকাতা ঃ ১৯৮০), পৃ. ১১।

৩৩) রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের মন্দির* (ঢাকা ঃ ১৯৭৫), পৃ. ৩০-৩১।

৩৪) রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ*, পৃ. ২৬৯।

৩৫) Ahmad Hasan Dani, op. cit., pp 12-14.

৩৬) সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১২০।

৩৭) Ahmad Hasan Dani, op. cit. pp. 14, 108-110, 146; Farial Imamudidin, "Distingushing Features of Mosque Architecture of Pre-Mughal Period of Bengal and their influence on Subsequent Architectural Development," *Journal of Asiatic Society of Bangladesh, Hum Vol. 43, No. 1.* (Dhaka : June, 1998), pp. 86-88.

৩৮) সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১২০।

৩৯) প্রবন্ধকার আশৈশব মূর্তিটির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কীর্তন শুনতে এবং পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বহুবার এ কালীতলায় তাঁর আগমন ঘটেছে।

বিহু ঃ দেউরী জনজাতি

জেলি বাগচী

'বিহু' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে নানা ধরণের মত রয়েছে --- কেউ বলেছেন 'বৈশাখ' শব্দ থেকে, কেউ বলেছেন 'বিসুব' থেকে, কেউ বলেছেন সংস্কৃত 'বিযুভত্ অর্থাৎ মহাবিযুব' থেকে বিহু শব্দটির উৎপত্তি।

বিহু শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম প্রদেশটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সারা বছরে আসামে এই বিহু তিনবার ঘুরে ফিরে, প্রকৃতির তিন ধরণের বৈচিত্রময় রূপের হাত ধরে, তিনটি নাম নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয় রঙ্গালী বা বহাগ বিহু, ভোগালী বিহু এবং কঙ্গালী বিহু।

আসামের বিভিন্ন জনজাতিদের মধ্যেও 'বিহু' উৎসব পালিত হতে দেখা যায়। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এই উৎসব হোলি বা বসন্ত উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। আসামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মণিপুরে বিহুর আগেই শুরু হয় হোলি উৎসব। বসন্তবন্দনার মধ্যেই মণিপুরে বৈশাখবরণ অনুষ্ঠিত হয়। আসামে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি প্রদেশ ত্রিপুরা --- সেখানকার উপজাতিদের ৭ই বৈশাখ 'গড়িয়া পূজার' মধ্য দিয়ে পালিত হয় বৈশাখের 'বর্ষবরণ'। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতালদের কাছে 'মাঘাসিম' উৎসব -- মাঘের প্রথম দিন হলো নববর্ষের আগমনি — এদের নববর্ষ ঐদিন।

পাঞ্জাবে বৈশাখের বর্ষবরণ উৎসবের নাম 'বৈশাখী' উৎসব। এই উৎসবের সাথে এই জাতির জীবনের মূল প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে --- শিখ সম্প্রদায়ের জন্মের ইতিহাস। এই দিনটি এদের কাছে নবান্ন উৎসবও বটে। সন্ধ্যায় শুরু হয় নাচ গানের উৎসব চলে রাত্রিব্যাপী পাঞ্জাবিদের অতিপ্রিয় 'ভাংরা' নাচ।

আসামের বিহু হচ্ছে ইহজাগতিক। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ আসামের বিহু জাতীয় উৎসবে উন্নীত হয়েছে। বিহু নানা ধরণের। ভোগালি বিহু ঃ- আসামে বীজ বপনের সাথে যেমন বহাগ বিহু যুগ্মভাবে আত্মপ্রকাশ করে তেমনি ফসল ওঠার সময়ের 'মাঘবিহু' বা ভোগালি বিহু' ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই সময় হচ্ছে বিশ্রাম ও পিঠেপুলি খাওয়ার উৎসব।

কঙ্গালি বিহু হচ্ছে — যখন ধরিত্রী হয়ে ওঠে কঠিন, শস্য শূন্য মাঠ, চাষির শস্য ভাণ্ডার থাকে শূন্য। কঙ্গাল এই শব্দটির সাথে কঙ্গালী বিহু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে

বলে মনে করা হয়। এই ভাবে দেখা যায় আসামের তিনটি বিহুই প্রকৃতির সাথে, ফসল উৎপাদনের অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বহাগ বিহু — নাচ গানের বিহু বলতে বহাগ বিহুকেই মনে করা হয়। চৈত্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তি দিন থেকে বৈশাখ মাসের প্রথম ৬ দিন হচ্ছে বাস্তবিক অর্থে সঠিক বহাগ বিহু পালনের সময়। এই সময় বিহু পাগল মানুষেরা নাচে গানে, নানা ধরণের আনন্দ উৎসবের মেলায় সামাজিক শুভেচ্ছা আদান প্রদানে আত্মহারা। নাচ গানই হচ্ছে বহাগ বিহুর মূল আকর্ষণ। কারণ এই নাচ গানকেই ঘিরে চলে বিহুর যাবতীয় উৎসব। গরু বিহু ঃ— চৈত্র মাসের শেষ দিন হচ্ছে চৈত্র সংক্রান্তি, এই দিনটি 'গরু বিহু' বলে চিহ্নিত। ধারে কাছের নদীতে বা জলাশয়ে গরুকে স্নান করিয়ে আনা হয়। গরুকে লাউ-কুমড়ো খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে— চলে গান।

'লাউ খা বেগুন খা

বছর বছর বৃদ্ধি পা'।

সেদিন গরুর গলায় পরানো হয় নতুন দড়ি। ক্ষেত কর্ষণের জন্য রাখা লাঙ্গলকে সেদিন বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। গোয়ালঘরকে অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন বিশেষভাবে পরিপাটি করে রাখা হয়, দেওয়া হয় ধূপধুনো।

১লা বৈশাখ শুরু হয় 'মানুষ বিহু' — শুরু হয় বিহু পাগল মানুষের , যুবক যুবতিদের নাচ গানের উৎসব। সেই সাথে বিহু নাচ গানের প্রতিযোগিতা, চলে 'বিহু কুঁয়ারী নির্বাচন। আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিহুর নাচ ও গানে কোথাও যুবক-যবতীরা একত্রিত ভাবে আবার কোথাও পৃথকভাবে বিহু নাচে যুবতিদের সাজসজ্জা খুব উজ্জ্বল ও বর্ণময়। যুবকদের সাজসজ্জা হচ্ছে মালকোচা দিয়ে ধুতি, গায়ে ফতুয়া অথবা খালি গা, এবং মাথা নতুন গামছা দিয়ে ফেট্টি বাধা। যুবতিরা পরে বর্ণময় মেখলা ও চাদর, মাথায় থাকে কপোও ফুল। বিহু গানের বিষয় বস্তুতে প্রেম ও প্রকৃতি, সমাজ ও অর্থনীতি স্থান পায়। গানের স্তবক চার পংক্তিযুক্ত। বিহু বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে বাঁশী, খোল বা ঢোল, পেপা, গগনা শিঙ্গা ইত্যাদি।

আসামে দেউরীরা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জনজাতি। এই জনজাতিটি আসামের ১০২ এবং অরুণাচলের ৭টি গ্রামে ছড়িয়ে। দেউরী জনজাতির কোন লিখিত ইতিহাস নেই যার মধ্যে দিয়ে এই জনজাতি সম্পর্কে জানা যায়। এদের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে মূলত এদের কাছে গিয়ে নানা ধরণের অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

দেউরীরা নিজেদের পুরোহিত শ্রেণীর অংশ বলে মনে করে। অন্যান্য জনজাতিদের তুলনায় এরা অনেক বেশি সংস্কারাচ্ছন্ন। এরা বিহুর সময় এদের উপাসনা মন্দির 'মিরিকু' তে অন্য কোন জাতির মানুষজনকে অবাধ প্রবেশের অনুমতি দেয় না। বিহু পালনের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানগুলি নিজেরা খুব নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে পালন করে।

অসমীয়া বিহুর পরে দেউরীদের বিহু শুরু হয়। বুধ ও বৃহস্পতিবার দেউরীদের কাছে খুব পুণ্য দিন। এদের বিহু শুরু ১লা বৈশাখের পর প্রথম বুধবার। কিন্তু দেউরীরা নিজেদের ইচ্ছে মতো বিহু শুরু করতে পারে না। এরা এদের আদি পূর্বপুরুষ 'কুন্দিমামা'র কাছ থেকে অনুমতি আদায় করার পর বিহু শুরু হয়। 'কুন্দিমামা' অর্থ হলো - কুন্দি হচ্ছে পুরুষ এবং মামা হচ্ছে প্রকৃতি। অনেক সময় এদের গিরা বা গিরাসি ও বলা হয়—গিরা-বুড়া পুরুষ এবং গিরাসি—বুড়া প্রকৃতি। দেউরীরা নিরাকার। কিন্তু এদের প্রার্থনা করার মন্দির যাকে মিরিকু বলা হয় সেখানে এদের আদি পূর্ব পুরুষ কুন্দিমামার প্রতীক হিসাবে মাটির বেদী রয়েছে। বিহুর দিনে মন্দিরে পূজা দেবার সময় মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সাদা পোষাকে খালি পা-এ মন্দিরে যাবে। মহিলাদের পোষাকের তিনটি ভাগ থাকে — মেখলা (নিচের) অংশকে 'গোমে', মধ্যবর্তী অংশ অর্থাৎ চাদরকে বলে 'পুমে', এবং মাথার ওপরে যে গামছার অংশ দিয়ে জড়ানো থাকে তাকে বলে 'বোমে'। পুরুষেরা সাধারণতঃ ধুতি ও শার্ট পরে। পূজার উপকরণ হিসাবে হাতের ডালিতে থাকে ১/২ কেজি চাল, টাকা পয়সা, আস্তো কাঁচা সুপুরী ও পান। যাদের নতুন বিয়ে হয়েছে তাদের নিজের হাতে তাঁতে বোনা গামছা পূজার ডালিতে দিতে দেখা যায়। এই সব উপকরণ দিয়ে মন্দিরে উপাসনা করে 'কুন্দিমামার' অনুমতি নেবার পর মন্দিরের বাইরে মুরগি বলি দেওয়া হয় এবং তখনই বিহু পালনের অনুমতি পর্ব সম্পন্ন হয়। বেশির ভাগ জনজাতিদের মধ্যে শুভ অনুষ্ঠানের আগে মুরগি বলি দেবার রীতি আছে। যাই হোক, পূজার ডালি নিয়ে ঘরে ফেরার পর চলে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ঘরে তৈরি পানীয় 'সুজে' দিয়ে করা হয় আপ্যায়ণ।

দিনের বেলায় বয়স্কা মহিলারা নাচ গান করে থাকে। এই দলে মহিলারা গায়িকা হিসাবে থাকে এবং বাজনদার হয় পুরুষ। অংশ গ্রহণকারী মহিলাদের সংখ্যা ৭/৮ জন হতে দেখা যায়। মূল গায়িকা একজন থাকে, অন্যরা দোহা দেয়। মূল গায়িকা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তিত হতেও দেখা যায়। গোধূলি থেকে শুরু হয় বর্ণময় পোষাকে সজ্জিতা যুবক-যুবতিদের বিহু, সেখানে বয়স্কদের প্রবেশ নিষেধ। বাড়ির সীমানার বাইরে কাছের কোন অঙ্গনে বনাঞ্চলে জলে সারারাত ধরে নাচ গান। এই একটি দিনই দেউরী সমাজের যুবক-যুরতিরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। এই মেলামেশার মধ্য দিয়ে অনেক সময় এরা উভয়ই নিজেদের জীবন সাথীকে খুঁজে নেয়। সারা রাতের নাচ গানের পর এরা গ্রামের পাশে 'সিবনসিরি' নদীতে স্নান করে নাচ গান করতে করতে বাডি ফেরে। ফেরার পথে অনেক সময় আমাদের হোলি উৎসবের মতো এদের মাটি জল, কাদা দিয়ে খেলতে দেখা যায়। দেউরী সমাজে অবাঞ্ছিত' সন্তান বলে কিছু নেই। গারো জনজাতিদের মধ্যেও এই দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই অবাধ মেলামেশা সম্পর্কে দেউরী সমাজে আলোচনা চললেও এই প্রথাকে তারা ত্যাগ করতে পারেনি। বিশেষ করে যুবক-যুবতিরা সমাজে দীর্ঘদিনের এই অর্জিত অধিকারকে কেড়ে নেবার বিরোধী।

৭ দিন ধরে বিহু পালনের পর্বে এরা নিজেদের মধ্যে নির্বাচিত স্ব-শাসিত পরিচালনা কমিটি তৈরি করে। এই কমিটিই নাচনী, গায়ক(হুচরী গানের) নির্বাচন করে এবং ঝগড়া বিবাদ মেটাবার জন্য পুলিশি ব্যবস্থা তৈরি করে। বিহু গীতের দুটো ভাগ আছে ১) বনগীত বা প্রেম সংগীত ২) হুচরী অর্থাৎ ভাবমূলক। হুচরী গীতে আবার দুটি ভাগ আছে ক) টকামারী খ) হাতসাফারী। হুচরী গীতে টকামারীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্ন আসামের কোথাও কোথাও যেমন গোয়ালপাড়াতে হুচরী গীতের প্রচলন আছে বলে জানা যায়।

বিহুতে টকামারী হুচরী নাচগান বাধ্যতামূলক। তবে যদি কোন বছর ফসল উৎপাদন ভালো না হয় সেই বছর হুচরী গীত গাওয়া হয় না। কারণ হিসাবে মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বল, অসহায় অবস্থাকে দেখানো হয়েছে।

টকামারী হচ্ছে শুধু পুরুষদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান। টকামারী হুচরী গীত বিহু শুরু হওয়ার আগে ১২ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। এই বাড়ির প্রাঙ্গনে চৌকো করে চার কোনায় চারটি বাঁশ পুততে হয়। টকামারী হুচরী দল প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে যায় এবং বাঁশের গায়ে হাতে ধরা ছোট লাঠি দিয়ে ঠক করে আঘাত করে নাচ গান করে এবং পরে মাগন (চাল, টাকা পয়সা) নেয়। কোন ঘরে নতুন বিবাহিতা মহিলা থাকলে ঘরের তাঁতে বোনা গামছাও এই দলকে দিতে দেখা যায়। এই দলে ৭/৮ জন করে পুরুষ নাচনী সেজে নাচে - যাদের 'বসোয়াল' বলা হয়। এরা মেয়েদের মত প্রসাধন করে। ৫ জন মত গায়ক থাকে তাদের 'পালি' বলে এবং বাদ্যকারদের বলে 'বায়ন'। প্রত্যেক বাড়িতে এরা প্রায় ৪০/৪৫ মিনিট ধরে নাচ গান করে । ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ার জন্য 'সুজে' দিয়ে তাদের আপ্যায়ণ করা হয়। গ্রামের প্রত্যেকটি গৃহস্থের বাড়িতে টকামারী হুচরী দলকে ক্ষমতা অনুযায়ী আপ্যায়ণ করতেই হয়। টকামারী হুচরী নাচগানে সংগৃহীত অর্থ কোন সংস্কার মূলক কাজে অথবা গ্রামে সমবেত ভোজে ব্যবহার করা হয়। পূর্বে টকামারী হুচরী গীত শুরু হতো মাঘ মাস থেকে চলতো বৈশাখ পর্যন্ত। এতদিন ধরে চলার ফলে কাজকর্ম, পড়াশুনো ইত্যাদির অসুবিধে হচ্ছিল। তার ছাত্র সমাজ ও সারা আসাম দেউরী সম্মিলনী ঠিক করে - যেভাবেই হোক ১২ দিনের মধ্যে টকামারী বিহু গীত সম্পন্ন করতেই হবে। ১২ দিন পর হুচরী গীত আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র মূল পুরোহিতের। মূল পুরোহিতের কাছ থেকে অনুমতি পাবার পর এদের মধ্যে মুরগি যুদ্ধ হয়। যার মুরগি হেরে যাবে সেটা তার পক্ষে মঙ্গলের ইঙ্গিত। এরপর মৃত মুরগি গুলো নিয়ে গ্রামে সমবেত ভোজ হয়। টকামারী হুচরী দল লাঠিগুলো নিয়ে নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে নিজেদের মধ্যে ধুপখেলা খেলতে খেলতে গ্রামের প্রান্তে পশ্চিম দিকের কোন অশ্বত্থ গাছের নিচে ফেলে দিয়ে পেছন ফিরে পা - দিয়ে মাটি আঁচড়ে ফেলে পুনরায় নাচ গান করতে করতে হুচরী গীতে সমাপ্তি ঘোষণা করে বাড়ি ফেরে।

দেউরীদের বিহু বনগীত মূলত ২/৩/৪ লাইনের তবে ব্যতিক্রমও আছে। গানের বিষয়বস্তু হচ্ছে তাদের প্রেম, দুঃখ, যন্ত্রণা, আকাঙ্খা, অতীতের কথা, দৈনন্দিন জীবনের কথা। বয়স্করা যখন নাচ গান করেছেন তখন তাদের নাচের ভঙ্গি ছিল দৃপ্ত। মনে হয় সুদুর সদিয়া থেকে এরা বিভিন্ন জনজাতিদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করে হেরে গিয়ে সেখান থেকে বিতারিত হয়ে আসার প্রতিচ্ছবি এদের নাচের দৃপ্ত ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়। গান ও নাচের ছন্দ ৩/৩, ৪/৪, ৬/৮ ধরা থাকে। নাচে হাতের মুদ্রা থাকে - ক) দুটো হাতের পাতা উল্টো করে কোমরের পেছন দিকে থাকে খ) দুটো হাতই মাথার ওপরের দিকে তুলে কব্জি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙ্গুল গুলো দিয়ে ফুল ফোটাবার ভঙ্গি করা হয় জোড়া পা মাটিতে ঘষে ঘষে কখন বৃত্তাকারে আবার কখন বা সোজা লাইন তৈরি করে নাচা হয়।

দেউরীদের বিহুর মূল বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে ঢোল, পেপা, গগনা, তার সানাই (কখনও কখনও দেখা যায়)। এদের প্রিয় যন্ত্র হচ্ছে পেপা। পূর্বে পেপার মত একটি যন্ত্রের ব্যবহার ছিল যাকে ওরা 'লাউবাহি' বলতো।

দেউরীদের নিজস্ব কোন লিপি নেই। এরা অসমিয়া ভাষাতেই গান গুলো করেছে, যা বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:—

১) আমবা সদিয়া থেকে এসেছি। আমরা বিহুর নাচ গান সদিয়া থেকেই শিখে এসেছি।

২) দেউরী জাতি জনসংখ্যায় এত কম যে তাকে 'সাগেরী' গাছের পাতার মধ্যে ধরে রাখা যায়।

৩) আরব (আরাকান) -দের শিকার করা হাতি খেয়ে ফেলার জন্য ওদেব সাথে আমাদের বিবোধ হলো। আমরা ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু 'কুন্দিমামা' ছাড়া আমাদের কেউ ক্ষমা করে না। আরবরা আমাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়ায় আমাদের সদিয়া থেকে পালিয়ে আসতে হলো।

৪) আমরা বনের বিভিন্ন ফল খেতাম। আমরা গাছের বাকল পরতাম (চালতা গাছ)। আমরা আরবদের সাথে যুদ্ধে হেরে গেলাম। তাই আমাদের গ্রাম, আমাদের চেনা প্রিয় কিছুকে বিদায় জানিয়ে পালিয়ে আসতে হলো।

৫) পালিয়ে আসার সময় আমরা নদী পার হব কেমন করে? মাঝি কোথায়? তাই মাঝির মেয়েকে আটকে রাখলাম। নদী পার করে দেবার শর্তে মাঝির মেয়েকে আমরা মুক্তি দিলাম।

৬) ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর।।

আমাদের দা-টা খুবই সুন্দর ও চক্চকে ছিল। অন্যদের ভয়ে আমাদের দা-টা আমরা

লুকিয়ে রেখে অন্যদের দা ব্যবহার করে জঙ্গল পরিষ্কার করতে লাগলাম। পরে নিজেদের দা-টা ব্যবহার করতে গিয়ে দেখলাম নিজের দা-টা মরচে ধরে গেছে।

৭) প্রেম সংগীত — ভোরের পাখীর মত আমি তোমার জন্য গান গাইব।।

বিহু গীতের প্রতি একটা ইঙ্গিত ছিল যে এটা অশ্লীল। তবে এদের কাছ থেকে জানা গেল যে বর্তমানে বিহুগীত অনেক মার্জিত হয়েছে। এদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, সদিয়া থেকে দেউরী ভাষায় প্রকৃত বিহু গীত এরা নিয়ে আসতে পারেনি। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে নানা ঝড় ঝাপটা ও যুদ্ধ বিগ্রহ। এদের কখন জলপথে নৌকা বা কলার ভুর ইত্যাদির মাধ্যমে, কখন বা স্থল পথে হেঁটে পালিয়ে আসতে হয়েছে— ফলে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রাখতে বা সাথে করে নিয়ে আসতে পারেনি। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে থাকার ফলে, সেখান থেকে আবার পালিয়ে আসার ফলে অন্যান্য জনজাতির যেমন অহোম, ঠুটিয়া, কদরী ইত্যাদিদের সংস্কৃতির সাথে মিশ্রিত হয়ে এক নূতন সংস্কৃতির জন্ম তারা দিয়েছে।

পরিশেষে একটি কথাই বলবো যে, দেউরীদের সম্পর্কে আমি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি ব্যক্তিগত ভাবে এদের মধ্যে গিয়ে, এদের বিহু অনুষ্ঠানে দর্শক হিসাবে থেকে। যেহেতু মুখের কথার ওপর নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ করেছি পরবর্তীকালে কখন হয়তো কিছু তথ্যের ব্যতিক্রম দেখা দিলেও দিতে পারে, তাই আগে থেকেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

সূত্র নির্দেশ

১) হেমাঙ্গ বিশ্বাস - লোকসঙ্গীত সমীক্ষ ঃ বাংলা ও আসাম।

২) Prophulla datta Goswami - Bihu Songs of Assam.

৩) বর্তমান পত্রিকা — ক্রোড়পত্র (নববর্ষ) ১৯৯৩।

৪) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার :-

ক) শ্রী বিপুল চন্দ্র দেউরী (গৌহাটি) উপদেষ্টা - সারা আসাম ট্রাইবাল সংঘ।

খ) শ্রী পাওয়াল চন্দ্র দেউরী (নারায়ণপুর, বড়-দেউরী গাঁও — লখিমপুর, আসাম) সাধারণ সম্পাদক - সারা অসাম দেউরী সম্মিলন।

গ) শ্রী ফিজো দেউরী — শিক্ষক বড় দেউরী গাঁও।

ঘ) শ্রীযুক্ত দিঘরী দেউরী - শিল্পীভাতা প্রাপ্তা — আসাম সরকার।।

সারাংশ

প্রদর্শনী এবং মেলা

প্রার্থিতা বিশ্বাস

প্রদর্শনী এবং মেলার ইতিহাস

প্রদর্শনীর উন্নয়ন আরম্ভ হয় ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের সময়। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে দ্রুত গতিতে শিল্পের উন্নতি হয়। ধীরে ধীরে পশ্চিমের সরকার সতর্ক হচ্ছিল নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করা বাইরের বিভিন্ন দেশে। এইজন্য বহু সরকার আন্তর্জাতিক মানে প্রদর্শনী আয়োজন করা শুরু করে। ১৮৫১ সালে 'The Great Exhibition of London' বলে একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়, যেখানে ২৫টি বিভিন্ন দেশ যোগদান করে।

সর্বপ্রথমবার একই জায়গায় বিভিন্ন দেশের বেছে নেওয়া উৎপাদিত দ্রব্য প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনীর সফলতায় উৎসাহিত হয়ে অনেক দেশ এজাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

আধুনিক যুগে, প্রত্যেক বছর আন্তর্জাতিক মানে অন্ত ২০০০-টি প্রদর্শনী এবং মেলার আয়োজন করা হয়। কৃষিবিদ্যা থেকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা এসবই প্রদর্শনী এবং মেলায় নির্দিষ্ট ভাবে দেখানো হয়।

দৈনিক এবং আধুনিক জীবনে প্রদর্শনীর পরিবর্তন

আধুনিক এবং দৈনিক জীবনে প্রদর্শনী একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক এবং সামাজিক যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে। সম্পর্ক বা (Relationship) আধুনিক যুগের মূলমন্ত্র। তাই প্রদর্শনী একটি মাধ্যম যা মানুষের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসারিত করে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী এবং মেলা

বইমেলা — কলকাতা

শিল্পমেলা — দিল্লী

সোনা প্রদর্শনী — চেন্নাই

রাসায়নিক মেলা — মুম্বাই

প্রযুক্তিবিদ্যা প্রদর্শনী — জার্মানি

শিল্প প্রদর্শনী — ইংল্যান্ড

ইত্যাদি।

কলকাতার বুকে প্রদর্শনী এবং মেলা

কলকাতার বিভিন্ন সরকারি সংস্থা প্রদর্শনী এবং মেলার উন্নয়নের দিকে নজর রেখে নানারকম প্রদর্শনী আয়োজন করছে। যার মধ্যে প্রথমেই 'Bengal National Chamber of Commerce & Industry'-র নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'Indian Trade Promation Organization ' এবং Confedaration of Indian Industry-র নামও উল্লেখযোগ্য।

যে সব প্রদর্শনী/ মেলা এখনও হয়নি

এখনও পর্যন্ত কোন বড় মাপের কৃষিশিল্প আমাদের দেশে হয়নি।

'এলমহার্স্ট ও গ্রামোন্নয়ন — একটি সমীক্ষা'

প্রিয়ম মুখোপাধ্যায়

১৯৮০ সালে জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গেলেন শিলাইদহে। হিসাব নিকাশে অপটু রবীন্দ্রনাথের উপর এসে পড়ল এক গুরু দায়িত্ব। জমিদারির পাশাপাশি সেখানে তাঁর পরিচয় ঘটল গ্রামের মানুষের সাথে। তাদের দুঃখ দৈন্য তাঁকে তাদের জন্য কিছু করতে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তীকালে বিরাট এক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন মনের মধ্যে রয়ে গেল সেই মাটির সুর।

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি গ্রামের মানুষের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। এই কাজে তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট নামক এক ব্রিটিশ যুবক। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কে উৎসাহী এই ব্রিটিশ যুবকটি শান্তিনিকেতনে এসে গ্রামের মানুষের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ এর ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশাল কর্মকান্ডে রবীন্দ্রনাথকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন এলমহার্স্টেরই সঙ্গিনী ডরোথী হুইটনী স্ট্রেইট।

এলমহার্স্ট গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন — প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সম্প্রসারণ। যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই কাজ শুরু হয়। কৃতির উন্নতি, পশুপালন, কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থের উন্নতি ম্যালিরিয়া দূরীকরণ, ব্রতী বালকদল সংগঠন— ইত্যাদির মাধ্যমে এলমহার্স্টের নেতৃত্বে শ্রীনিকেতন গড়ে উঠতে শুরু করে। আসলে রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের নেতৃত্ব চেয়েছিলেন গ্রামের মানুষের কাছে — তা তিনি পেয়েছিলেন এই ব্রিটিশ যুবকটির কাছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে এলমহার্স্ট ডেভনশায়ারে 'ডাটিংটনহল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯২৫ সালে এলমহার্স্ট শ্রীনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর সাথে শ্রীনিকেতনের যোগ ছিল আমৃত্যু।

বাঙালির ক্রিড়াচর্চা — সামাজিক প্রেক্ষাপট

সোমা বসু

ভারতবর্ষের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বরাবরই হাত ও মাথার কাজের দ্বন্দ্ব। বর্ণভিত্তিক ভারতীয় জনজীবন এইভাবেই কাটিয়েছে দিনের পর দিন। উচ্চ শ্রেণীর পরিচয় নির্ধারিত হয়েছে তার মাথার কাজে। তাই, বাঙালিদের মাথার কাজের চর্চা যত হয়েছে, হাতের কাজের চর্চা তত হয় নি। এই নিবন্ধে সেই অনালোচিত হাতের কাজের চর্চা অর্থাৎ ক্রিড়াক্ষেত্রের একটি বিশেষ দিক অনুশীলনের ইতিহাস সন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বাঙালির এই প্রেক্ষাপট বদলেছে উনিশ শতকে। সাংগঠনিক ভাবে শরীর চর্চার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে। তাগিদটা ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য তৈরি হওয়া। তার জন্য একদিকে যেমন রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ ও তার প্রয়োগ করা, তেমনই প্রয়োজন শরীরকে ঠিক করা।

এর ফলেই শরীরচর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃই চিত্রটা বদলে যেতে শুরু করে গুরুসদয় দত্তের নেতৃত্বে ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে গুপ্ত সমিতি। যেমন- অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতি। গুপ্ত সমিতি আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির, বিশেষতঃ যুবকদের মধ্যে গড়ে ওঠে শরীর চর্চা। গুপ্ত সমিতি এবং শরীরচর্চা একে অপরের পরিপূরক। গুপ্তসমিতি বিভিন্ন ভাবে খেলাধু'লোর আয়োজনও ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। এরা সাহায্য করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে।

ক্রিকেট ও ফুটবল এসেছে ঔপনিবেশিক শক্তির হাত ধরে। শাসক শ্রেণীর পৃষ্টপোষকতায় এই দুটি খেলা বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয় হলেও, এরই পাশাপাশি ছিল বাংলার নিজস্ব কিছু খেলার চর্চা। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে যাদের প্রসার ছিল ভালমতোই। এরকমই এক অপ্রতিষ্ঠিত খেলা --- কাবাডি। এই গবেষণানিবন্ধে বাংলায় কাবাডি চর্চার ইতিহাস অনুসন্ধানের তথ্যনিষ্ঠ প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন কাবাডি সংগঠনের ক্ষেত্র সমীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য সংগ্রহ করার সময় জোর দেওয়া হয়েছে খেলায় যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক পটভূমির ওপর -যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে শারীরবৃত্তীয় নানান ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রক্ষিতে। এক কথায়, এই নিবন্ধ সমাজবিজ্ঞান তথা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে শারীরবিদ্যাকে ব্যবহার করার এক নতুন প্রয়াস।

আধুনিক বাংলার চিকিৎসা জগতে হাতুড়ে বদ্যির স্থান

সুব্রত পাহাড়ী

জ্ঞান বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য সাধারণত দুটি উপায় অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। এগুলি হল তত্ত্বগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষা। দুটি পদ্ধতিরই কোন একটি বাদ দিলে যে কোন ধরণের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এধরণের অসম্পূর্ণ শিক্ষা যে কোন সমাজের পক্ষে বিশেষ ভাবে ক্ষতিকর। বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞানগুলির যে শাখায় এ ধরণের অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির প্রাধান্যে খুব বেশি তাহল চিকিৎসা বিজ্ঞান। কারণ কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই মানুষ তার সহজাত বুদ্ধির বলে এবং কিছুটা জীবজন্তুর অনুকরণে এ বিষয়ে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। আর তা দিয়েই কিছু কিছু মানুষ চিকিৎসক সেজে বসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরা হাতুড়ে, কোয়াক, হামার স্মিথ, বুজর্গ ও খার্তুমিন্ নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে এদের বলা হয় হাতুড়ে। কুবৈদ্য, গোবৈদ্য, ভিষকপাশ, ভিষকছদ্মচরা ও কোয়াক প্রভৃতি। বহুপ্রাচীন কাল থেকেই এরা কবিরাজ ও বৈদ্যদের পাশাপাশি চিকিৎসা করে আসছে। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র গুলি এবং শাসক কুল এদের বিষয়ে নানান সতর্ক বাণী উচ্চারণ করলেও জনসাধারণকে এদের থেকে বিছিন্ন করা যায়নি। তার কারণ — (১) চিরকালই এদেশের শিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম, (২) শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত চিকিৎসকেরা দরিদ্রও অশিক্ষিতের চিকিৎসায় পরাম্মুখ, (৩) চড়া ফি দিয়ে দরিদ্র রোগীরা লাইসেন্সধারী ডাক্তারদের নাগাল পেতে ব্যর্থ, (৪) কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাতুড়েদের সাফল্য ও সহমর্মিতা এবং আধুনিক চিকিৎসার অপ্রতুলতা। ফলে অপচিকিৎসক হলেও নিরুপায় লোকেরা সেই হাতুড়েদের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য বর্তমানের গবেষণায় একথা প্রমাণিত যে পরিপূর্ণশিক্ষার অধিকারী না হলেও এই সমস্ত অর্ধ-শিক্ষিত হাতুড়েরা তাদের প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারাই বহুকাল ধরে গ্রাম বাংলার প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে এবং বিপদে আপদে সব সময় রোগীর পাশে থেকেছে। এরাই প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা পরিস্থিতির সামাল দেয়, আবার মুমূর্ষু রোগীকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এরাই নিয়ে যায়। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। যাহোক বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন লাইসেন্সধারী ডাক্তারেরা গ্রামেগঞ্জে যেতে চাইছে না, সরকারের পক্ষে আধুনিক চিকিৎসা দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নিত্য নতুন রোগ ব্যাধি মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে এবং সর্বোপরি ওষুধের উপনিবেশবাদ সমাজটাকে কুরে কুরে যাচ্ছে। তখন এদের শিক্ষা, উদ্যোগও চিকিৎসা বিদ্যাকে উপেক্ষা না করে যদি সরকারি ভাবে ট্রেনিং দিয়ে এদের অভিজ্ঞ করে তোলা যায়, তাহলে বর্তমানের চিকিৎসক সংকট অনেকটাই দূর হবে। এছাড়া এদের অনুসৃত চিকিৎসা

পদ্ধতির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করলে প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

১৯২৬ খ্রিঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অভিভাষণ ও তার পরিণাম

বিমল কুমার শীট

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নাম বাংলার রাজনীতিতে বিশেষ উল্লেখ্য। বিরোধী আন্দোলনে তিনি সফল হয়েছিলেন। এর পর বাংলার রাজনীতিতে তার প্রভাব এবং গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ১৯২৬ খ্রিঃ কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মেলনে বীরেন্দ্রনাথ সভাপতি পদ লাভ করেন। কিন্তু তাঁর অভিভাষণ নিয়ে জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে বীরেন্দ্রনাথের বিরোধ বাধে। তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পঞ্চপ্রধান (শরৎ চন্দ্র বসু, তুলসী চরন গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র চন্দ্র, বিধান চন্দ্র রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকার) এবং তাদের সমর্থক জাতীয় বিপ্লবীরা বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর সময়ে মফস্বলের যে সমস্ত নেতা বাংলার রাজনীতিতে প্রাধান্য পেয়ে ছিলেন দাশের মৃত্যুর (১৯২৫) পর তারা রাজনীতিতে প্রাধান্য হারাতে থাকে। বাংলার তৃণমূল স্তরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্য নীচ থেকে নীচতর হতে থাকে। শহরের নেতারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এর ফলে প্রভাবিত হয় বাংলার আর্থ রাজনৈতিক অবস্থা।

ভারত বিভাজনের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী ঃ নোয়াখালি ১৯৪৬-১৯৪৭

বিশ্বরূপ ঘোষ

ভারত বিভাজনের প্রাক্কালে সমগ্র দেশ, বিশেষ করে পূর্ব ভারত, যখন সাম্প্রদায়িক অস্থিরতায় বিপর্যস্ত, তখন মহাত্মা গান্ধী সেনানীরূপে শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী প্রচার করে চলেছিলেন। তিনি ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীয় স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। পূর্বভারতের নোয়াখালি-কুমিল্লা ও বিহারের হানাহানি বন্ধ করতে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পমুক্ত করতে তিনি অশেষ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করেছেন। ভারতবর্ষের বহু মাত্রিক ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনি স্বাধীন ভারত গঠনের কথা বলেছিলেন। তিনি ব্যক্তিজীবনে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর হিন্দু সত্তার সঙ্গে তাঁর ভারতীয়ত্বের কোনো বিরোধ ছিল না। তিনি নিজেকে হিন্দু বলে ঘোষণা করলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর কাছে সকল ধর্মই ছিল সমান।

'ধর্ম' তাঁর কাছে ছিল নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উৎস স্বরূপ। এক তমসাছন্ন পরিবেশে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য যে প্রয়াস করেছিলেন, তার গুরুত্ব বর্তমান ভারতবর্ষেও হারিয়ে যায়নি। সাম্প্রতিক কালে রাজনীতিতে ধর্মের বহুল ব্যবহার এবং সাম্প্রদায়িকতা বাদের অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাভাবনা ও পূর্ববঙ্গ/বিহারে তাঁর কর্মপদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানেও হারিয়ে যায়নি।

কলকাতায় মাড়োয়ারি বণিকদের উত্থানে আইনী সহায়তা (১৮২৫-১৯২৫)

অনিরুদ্ধ দাস

চিরকালই দেশীয় বণিকরা বাণিজ্য করে দেশে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতারও পায় তারা। ব্যতিক্রম ঘটেছিল এদেশে একাদশ শতাব্দীতে তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে। একাদশ শতাব্দীতে রাজা বল্লাল সেন দেশীয় বণিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে সুযোগ করে দিয়েছিলেন মাড়োয়ারি গুজরাটি প্রভৃতি বণিকদেরকে। উনবিংশ শতকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত বণিকেরা দেশীয় বণিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে সুযোগ দিয়েছিলেন ঐ মাড়োয়ারি গুজরাটিদেরই। গোটা শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর পৃষ্টপোষকতা পাওয়া পর মাড়োয়ারি গুজারাটিরা পেয়েছিল আইনী সহায়তা। যার পরিণতিতে হাতছাড়া হয়েছিল দেশীয় বণিকদের এদেশের কেন্দ্রীয় বাজার বড়বাজার।

একাদশ শতকে রাজা বল্লাল সেন সমাজ সংস্কারে মন দিয়েছিলেন, রাজাকে ধার দিতেন দেশীয় সুবর্ণবণিক বল্লভানন্দ আঢ্য। বল্লাল সেন প্রায়ই ধার নিতেন ঐ সুবর্ণবণিক মহাজনের কাছে। অবশেষে উদন্তপুরীর যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে বল্লাল সেন বল্লভানন্দের কাছ থেকে দেড় কোটি বিনষ্ক কর্জ চাইলে বল্লভানন্দ রাজাকে হরিকেনির জামিদারি বন্ধক রাখতে বলায় বল্লভানন্দর উপর প্রতিশোধ নিতে বল্লালসেন সুবর্ণবণিকদের পতিত বলে ঘোষণা করে জল অচল শ্রেণীতে পরিণত করলেন। ফলত সুবর্ণবণিকদের স্থান দখল করেছিল রাজস্থানি ও গুজরাট কুসিদজীবীদের দল। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদেরকে ধার দিতেন এদেশীয় বণিকরা। ১৮২৫-২৬ সাল নাগাদ এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের বনিবনা বন্ধ হতে থাকে। দেশীয় বণিকরা ধার দেওয়া বন্ধ করলে ১৮২৮-১৮৩৬ সাল, এই আট বছরে সর্বশেষ ৩২.০৯ কোটি টাকা লোকসান দিয়ে মিচেল, পামার প্রভৃতি ৯ টি কোম্পানি উঠে যায়। তৎকালীন এদেশের শাসককুল এরপর ব্যবসায়ে বাঙালিদের প্রতি বিরূপ হলে বাঙালি বণিকরা

সমস্ত পুঁজি বাড়ির কাজে বিনিয়োগ করে, বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যবসায় নামে। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দেশীয় বণিক মতিলাল লালের ছিল বারোশ বিঘা জমির ওপর ২৩৫টি পাকা বাড়ি। কলকাতায় এখন পাকা বাড়ির সংখ্যা পৌনে চারশো। শুধু মতিলাল শীলই নন দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক, মদন মোহন দত্ত, নরসিংহ দত্ত, সাগর লাল দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ লাহা এঁরা বাড়ি তৈরি করে ভাড়া দেওয়া বা ব্যবসা করার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। কিন্তু এই ব্যবসাও তাদের কাল হল। ১৮৮৪ খ্রি. তৈরি হল প্রেশিসেন টেনেন্সি এ্যক্ট।

দেশীয় বণিকেরা ইউরোপীয় শাসককুলের কুনজরে পড়লে তাদের জায়গা দখল করে রাজস্থানি ও গুজরাটি বণিকেরা। ভাগীরথীর দুই তীরের চটকলগুলিও চলে যায় মাড়োয়ারিদের হাতে। কলকাতা, বিশেষ করে বড়বাজারে বাঙালি ব্যবসায়ীদের বাড়ি ভাড়া নিয়ে তারা ব্যবসা করতে করতে পেয়ে যায় ভাড়াটিয়া আইনের সহায়তা। কোন ক্রমেই ভাড়ার ভাড়াটিয়াদের তুলতে না পেরে বাধ্য হয়েই সস্তায় বাড়িগুলি বিক্রি করে দেন ঐ বাঙালি বণিকেরা। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা শিকড় গেড়ে বসে কলকাতায়।

বীরভূমের প্রত্নানুসন্ধান ও তার সম্ভাবনা

অর্ণব মজুমদার

পূর্বভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তভূমি জেলা - বীরভূম নামের ভৌগলিক এলাকাটির প্রত্ন ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন। ২৩°৩৩ থেকে ২৪°৩৫ অক্ষাংশে এবং ৮৭°১০ থেকে ৮৮°০২ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত ৪৫৬২.১৪ বর্গ কি: মি:। এই ভূমি বলয়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রত্নানুসন্ধান ও তার সম্ভাবনার কথা বলতে গেলে প্রাগৈতিহাসিক রাঢ়ভূমির কথা অনিবার্য ভাবে এসে যায়। কেন না, রাঢ় বঙ্গের কোটি কোটি বছরের উচ্চভূমি, তথা আদিম পৃথিবীর প্রথম যুগে জলমুক্ত সদ্য সূর্যস্নাত শুষ্ক মৃত্তিকায় স্বাভাবিক নিয়মে যে জীবন স্পন্দিত হয়েছিল একদা, সেই আদিম আশ্রয়স্থলকে অবলম্বন করে পরবর্তী কালে পরম্পরাগত ভাবে আদিপ্রস্তর যুগের গোষ্ঠী জীবনে অভ্যস্ত নৃ-সমাজ নব্যপ্রস্তর যুগের পথবেয়ে হাজার হাজার বছরের কৃৎ কুশলতায় গড়ে তুলেছিল তাম্রপ্রস্তর যুগীয় উচ্চমানের সভ্যতা। যে সভ্যতা ছিল বাস্তু ও আগুনের বিজ্ঞানভিত্তি ব্যবহার ও প্রয়োগের প্রথম অভিযোজনা।

গত শতকে জেলা বীরভূমের চিহ্নিত প্রত্নপীঠগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন কিছু প্রত্নবস্তু, যার দ্বারা শংসিত হয় এই ভূবলয়ের সভ্যপথিক আদিম জন গোষ্ঠীর জীবন যাত্রা প্রণালীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসংবাদ। কিন্তু একজন প্রত্নক্ষেত্র সন্ধানী হিসাবে আমার ধারণা যে, এখনকার বহু সম্ভাবনাপূর্ণ নিম্ন উদ্ধৃত প্রত্নস্থল সমূহ উৎখনিত হলে আদিম নৃগোষ্ঠীর আচার, আচরণ ও ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি সহ তাদের বিস্তৃত পরিচয় তথা তাদের জীবন যাত্রার ধারাবাহিক ইতিহাস উঠে আসবে অন্ধকার মাটির গর্ভ থেকে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত মোট ৭৬টি "তাম্রপ্রস্তর" যুগীয় প্রত্নক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে বা আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে শুধু বীরভূম জেলার মধ্যেই ৩৭টি। এ থেকে এখানকার আদিম সভ্যতার গুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে সম্ভাবনাময় অনুৎখনিত কয়েকটি পীঠের উৎখনন অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে মুরারই থানা এলাকার প্রাচীন বালানগর তথা অধুনা "বারাগ্রাম" ও পাহিকোট তথা অধুনা "পাইকর" গ্রামের চিহ্নিত পীঠগুলি এবং ইলামবাজার থানার "মন্দিরা" ও সাতের দশকে মৎকর্তৃক আবিষ্কৃত "ঘুড়িষা" নামক গ্রামের কয়েকটি প্রত্নস্থল। এছাড়া মহম্মদবাজার থানার "মহাবীর পাহাড়ী", বোলপুর থানার "সুপুর", ময়ূরেশ্বর থানার "কোটাসুর" ও "একচক্রা" এবং "বীরচন্দ্রপুর" ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে এ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলের কথা বলি, যার কথা পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলনে (২৫/০১/২০০০) আমি সর্বপ্রথম উল্লেখ করি সুধীজন সমক্ষে। তার নাম "রাঢ়কেন্দ্র"।

সাঁইথিয়ার তিন কি: মি: উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদীর সন্নিকটস্থ এই গ্রামটির নাম "রাঢ়কেন্দ্র"। এই প্রত্নস্থলটিও সুপ্রাচীন।

যতদূর জানা যায় - প্রত্নানুসন্ধানের কাজ বিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে শুরু হলেও প্রত্নপীঠ উৎখননের কাজ শুরু হয়েছে অনেক পরে। এজেলায় বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে প্রত্নস্থল খননের কাজ প্রথম আরম্ভ হয় নানুরে। চন্ডীদাসের ভিটি নামে খ্যাত বিশাল আকারের সুউচ্চ প্রত্নস্তুপটির উপরের একটি অংশ উৎখনিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব পুরাতত্ত্ব বিভাগদ্বারা। চারের দশকে উৎখনিত এই নানুর ঢিবির প্রধান উদ্যোগী ও সরেজমিন পরিচালক ছিলেন বাংলাব সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কুঞ্জবিহারী গোস্বামী মহাশয়। এই আংশিক নমুনা খনন দ্বারা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসামগ্রী উদ্বারিত হয়। এই একই প্রত্নস্থলটি কুড়ি শতকের ছয়ের দশকে পুনরায় উৎখনিত হয় "ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা,—পূর্বচক্র" দ্বারা। এবার উৎখনন করা হয় ঢিবির পশ্চিম প্রান্তেব কিনারায়। এই উৎখননে ঢিবির তিনটি স্তরে আবিষ্কৃত হয় বহু মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী। লোহিত, ধূসর ও কৃষ্ণলোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশগুলি স্থানটির সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। ভারতীয় পুরাকীর্তি বিভাগ, পূর্বাঞ্চল সর্বেক্ষণ শাখা - জেলা বীরভূমে একাধিকবার প্রত্নস্থল খনন করেছেন। এঁদের প্রথম বারের অভিযান ছিল মহিষডাল মৌজায়। শান্তিনিকেতন থেকে চার কি: মি: উত্তরে শালনদীর কিনারায় দু'টি পীঠের উৎখনন সহ অনুসন্ধানপর্ব পরিচালিত হয় প্রায় একমাস ধরে।

এই উৎখনন থেকে প্রচুরপ্রত্নবস্তু ও মূল্যবান প্রত্নরত্ন সমূহ আবিষ্কৃত হয়। যেমন কৃষ্ণলোহিত এবং ধূসর বর্ণের মৃন্ময় পাত্রের অংশ বিশেষ। কয়েকটি লাল বর্ণের মৃৎপাত্রের গায়ে কালো রঙের রেখাচিত্র সমন্বিত ভগ্নপাত্র। কিছু ছোট বড় ও মাঝারি আকারের প্রস্তরায়ুধ। একটি তাম্র কুঠার। কিছু পরিমাপ খন্ড (বাটখারা)। অস্থি নির্মিত দ্রব্যাদি। অলংকরণ লাঞ্ছিত চিরুনি, চুড়ি ও পাথরের বর্ণাঢ্য পুঁতি এবং একটি অবিকল গড়নের ৫ ইঞ্চি সাইজের পোড়ামাটির লিঙ্গ। এগুলি পাওয়া যায় ১ম পীঠের তৃতীয় বা নীচের স্তর থেকে। দ্বিতীয় স্তর থেকে পাওয়া যায় - লৌহনির্মিত তীর, বর্শা ফলক, খনিত্র (শাবল) এবং কীলক ইত্যাদি প্রত্নদ্রব্য সমূহ। এছাড়া পাওয়া যায় পোড়া মাটির একটি শীলমোহর, যার মুদ্রাঙ্কের উপর রয়েছে নতুন ধরণের সাংকেতিক চিহ্ন। এই স্তর থেকে কিছু প্রাচীন পোড়া মাটির বাসন পত্রের টুকরো ও পোড়া মাটির হাতি এবং ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধও পাওয়া যায়। এই মহিষডাল গ্রামের প্রত্নানুসন্ধান ও উৎখনন থেকে একটি বিশিষ্ট পাওয়া হচ্ছে পোড়া চালের স্তুপ। এটি পাওয়া যায় রেল লাইনের পশ্চিমদিকের দু'টি খনিত প্রত্নপীঠের প্রায় ৮ ফুট নীচে। অনুমিত হয় এই স্থানে ছিল প্রায় সওয়া বা সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার কোন প্রাচীন কোমবদ্ধ সামাজিক জনবসতির সঞ্চিত খাদ্য ভান্ডার। হয়তো শত্রু গোষ্ঠীর হঠাৎ আক্রমণে আগুন লেগে সব পুড়ে যায়। তদবধি মাটি চাপা পড়ে অতীত ইতিহাসের এক মূল্যবান সূত্র হিসাবে অবিকল ভাবে সাজানো রয়েছে মাটির তলায়। এ, ঘোষ সম্পাদিত ১৯৬৩-৬৪ সালের ভারতীয় পুরাকীর্তির "রিভিউ" থেকে জানা যায় - কার্বণ-১৪ পদ্ধতি সাহায্যে এখানকার ধ্বংসপ্রাপ্ত

নগরীর বয়স নির্ণীত হয়েছে - খ্রি: পূ: ১৩৮০ বৎসর। ১৯৬৭ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা কর্তৃক সিউড়ি থানার হারাইপুর ও সলখানা মৌজায় কয়েকটি প্রত্নস্থল উৎখনিত হয়। এখান থেকে পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যপথিক ভূমিপুত্রদের ব্যবহৃত মাটির বাসন পত্রের কিছু টুকরো (ধূসর ও "লাল কালো" বর্ণের) এবং উত্তর দক্ষিণে শায়িত ১০টি শিশুর কঙ্কাল।

১৯৮৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস বিভাগ সিউড়ি থানার বক্রেশ্বর নদের ধারে অবস্থিত হাট্ইকার গ্রামের পূর্ব প্রান্তে কয়েকটি প্রত্নপীঠ উৎখনন করেন। শিক্ষামূলক এই উৎখনন পর্ব পরিচালনা করেন অধ্যাপক এন্. সি. ঘোষ। এখানে সামান্য মাটির স্তর সরাতেই আবিষ্কৃত হয় একটি আদিম নগরের ধ্বংসাবশেষ। যে নগর ছিল কৃষক প্রধান। আবিষ্কৃত হয় ছিটে বেড়ারগায়ে ধান বা তুঁষের ছাপ (যে পরম্পরা আজও চলছে) পশু অস্থি, পাথরের নোড়া ইত্যাদি। মূল পীঠের প্রায় ৩০০ মিটার পশ্চিমে একটি ছোট্ট পীঠ থেকে আবিষ্কৃত হয় বড়সড় এক খন্ড ফাল জাতীয় লৌহাস্ত্র। যেটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই লোহা ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। এই উৎখনন থেকে জানা যায় যে, তিন হাজার বছর আগেকার এই সাধারণ জনবসতির মানুষেরা কৃষিকর্মনিপুন ছিলেন।

বীরভূম জেলায় প্রত্নস্থল উৎখননের পাশাপাশি (আগে পরে) দীর্ঘ শতাধিক বছর ধরে প্রত্নপ্রেমিক লেখক, গবেষক ও সাংস্কৃতিক বদান্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা আঞ্চলিক প্রত্নানুসন্ধান পর্ব চলেছে কিছু কিছু। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে এই বিশিষ্ট কাজে অগ্রণী ছিলেন হেতমপুরের কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, সিউড়ির শিব রতন মিত্র এবং লাভপুরের রায় বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা। এঁদের এই কাজে উৎসাহদাতা ছিলেন স্বনামধন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অনিল বরণ রায় এবং নগেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখেরা। এঁদের যৌথ উদ্যোগে ও উৎসাহে গঠিত হয় (১৯১০) "বীরভূম সাহিত্য পরিষদ" এবং চার বছর পরে ১৯১৪ সালে নগেন্দ্র নাথ বসুর সভাপতিত্বে জন্ম নেয় বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি'। এই অনুসন্ধান সমিতির প্রাণপুরুষ কুমার মহিমানিরঞ্জনের ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁর নবগঠিত প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সদস্য হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন সেকালের কয়েকজন উৎসাহী ইতিহাস প্রেমিক। যাঁরা ছিলেন একাধারে আবিষ্কারক গবেষক, সংগ্রাহক ও প্রাবন্ধিক। এঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম ছিলেন নিখিল রঞ্জন রায় (মুর্শিদাবাদ কাহিনী) হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন (বীরভূম বিবরণ) এবং গৌরী হর মিত্র (বীরভূমের ইতিহাস) প্রমুখেরা। এই প্রসঙ্গে ব্রতচারী খ্যাত গুরুসদয় দত্তের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৩০ সাল থেকে জেলা শাসক থাকা কালীন বেশ কিছু প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ করেন।

স্বাধীনোত্তর কালে উৎসাহী মানুষ তথা কুশলী গবেষকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ধরণের অনুসন্ধান ভিত্তিক প্রত্নানুসন্ধানের কাজ হয়েছে অতি সামান্যই। শিয়ানের দ্বিখন্ডিত (রাজা নয়পালের) শিলালিপি আবিষ্কার, নব্য প্রস্তর যুগের কয়েকটি হাত কুঠার সংগ্রহ এবং (১৯৭৫ সালে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর - পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে এক যৌথ অভিযানে প্রাপ্ত) একটি ক্ষুদ্রাস্ত্র ও একটি আদি প্রস্তর যুগের বৃহদাকার কুঠার সংগ্রহীত হলেও সম্ভাবনার

দিক থেকে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই। তবে যা পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে খ্রি: পূ: ২০০০ বছর থেকে খ্রি: পূ: ১৫০০ শত বছর সময়ের মধ্যে রাঢ় ভূমির এই বীরভূম অঞ্চলে একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সভ্যপথিক নৃ-সমাজের বসবাস ছিল। যাঁরা আগুনের ব্যবহার জানতেন। শিকার ও পশুপালন এবং চাষবাস জানতেন। পাথর ও পোড়ামাটির পাত্রে অলংকরণ পদ্ধতি পর্যন্ত জানা ছিল তাঁদের। এখান থেকে অনিবার্য ভাবে একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়, - তা' হচ্ছে - এঁরা কারা? এঁরা নিশ্চয়ই আর্য ছিলেন না। কেন না ৩ হাজার বছর পূর্বে সপ্তসিন্ধু এলাকা পার হয়ে পূর্ব ভারতের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্যজাতির সে অনুগমন ঘটেনি, - তা' ইতিহাস স্বীকৃত। তা হলে এই আদিম জাতি বা আদিবাসীদের পরিচয় কি? এঁদের গণ ও গোত্র সমন্বিত বংশধারার পরম্পরাকে আজ চিহ্নিত করা যাচ্ছে না কেন? এই জনগোষ্ঠীর পরিচয় কি আজও মিসিং লিঙ্কের অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকবে? এর সদুত্তর দেবার উপযুক্ত সময় আজও আসেনি। কারণ, যে হেতু অনুসন্ধান পর্বের মূল অধ্যায় উৎখনন পর্যায়টি এখন সম্পূর্ণ হয়নি।

বীরভূম জেলায় এ পর্যন্ত চিহ্নিত বা তালিকাভুক্ত ৩৭টি সম্ভাবনাময় প্রত্নস্থলের মধ্যে এ যাবত মাত্র ৫ টি উৎখনিত হওয়ায়, বেশির ভাগ অংশই অনুসন্ধানের বাইরে থেকে গেছে। কাজেই আংশিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কোন বিষয়ের নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত কখনও উচিত নয়। বিশেষতঃ প্রত্নতত্ত্বের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে। অতএব সমগ্র রাঢ়ভূমিসহ এ জেলার প্রত্নভিত্তিক অনুসন্ধান পর্ব সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে — সম্ভাবনাময় আরও কয়েকটি প্রত্নস্থল উৎখনন, ইতিহাসের প্রয়োজনে খুবই জরুরি।

সূত্র-নির্দেশ

বীরভূম বিবরণ ঃ হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বীরভূমের ইতিহাস ঃ গৌরীহর মিত্র

বীরভূমের পুরাকীর্তি ঃ দেবকুমার চক্রবর্তী

উনিশ শতকে বীরভূমের হিন্দু গ্রাম-সমাজ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ

সুমিত ভট্টাচার্য

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বীরভূম জেলার হিন্দু গ্রাম - সমাজেও সামাজিক এবং নৈতিক শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জাত পঞ্চায়েত। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তিকারী 'মধ্যস্থ' নামক পৃথক আর একটি সংস্থার অস্তিত্ব এক্ষেত্রে বীরভূম জেলাকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে।[১] গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হত গ্রামের পাঁচ বা ততোধিক সদস্য, এমনকি কখনও কখনও গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সমন্বয়ে। জাতপাত নয়, বয়স এবং প্রজ্ঞাই ছিল এই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানটির সদস্য মনোনীত হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি। পক্ষান্তরে জাত পঞ্চায়েতগুলি সংশ্লিষ্ট গ্রাম এবং ক্ষেত্রবিশেষে পার্শ্ববর্তী এক বা একাধিক গ্রামে বসবাসকারী অভিন্ন জাতভুক্ত সমস্ত পুরুষ সদস্যকে নিয়ে গঠিত হত।[২] প্রতি গ্রামে একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত থাকলেও জাত পঞ্চায়েতের সংখ্যা নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দাদের জাত সংখ্যার উপর। গ্রামের যিনি সর্বাপেক্ষা প্রবীণ, প্রাজ্ঞ এবং সকলের কাছে সম্মানীয় ব্যক্তি তাঁকেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে[৩] আর জাত প্রধানকে রাখা হত জাত পঞ্চায়েতের শীর্ষে।[৪] জাতপাত সংশ্লিষ্ট প্রথা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিবাদ ব্যতিরেকে সমাজ শৃঙ্খলার পক্ষে হানিকর অন্যান্য বিবিধ বিচ্যুতি, যথা - ধর্মীয় বিধিনিয়ম ভঙ্গ, অত্যাচার এবং ব্যাভিচার ইত্যাদির বিচার করত গ্রাম পঞ্চায়েত। জাত পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বের চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত ছিল জাতপাত সংক্রান্ত সনাতন বিধিনিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধসমূহ।[৫] জাত-বিধিনিয়ম ভঙ্গের দায়ে জাত পঞ্চায়েতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে, এমনকি যৌনাচার সংক্রান্ত শৃঙ্খলাভঙ্গের অপ্রমাণিত অভিযোগের ক্ষেত্রেও[৫ক] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। আর এই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেন ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিত,[৬] যিনি 'সাসানি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত'[৬ক] 'ব্যবস্থাপক ভট্টাচার্য'[৬খ] ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় সম্বোধিত হতেন, প্রায়শ্চিত্তের বিধান যাঞ্ছাকারী ব্যক্তির হুকিকত পত্রে। আবার সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধে শাস্ত্রব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে 'মধ্যস্থ' সংস্থাটি ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিতেরই শলা গ্রহণ করত।[৭]

যখন গ্রাম-সমাজে মুদ্রা অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি, বিনিময়ই ছিল বেচাকেনার মাধ্যম, আর যখন জমিতে ছিল না রায়তের মালিকানা স্বত্ব, পরিবর্তে ছিল জমির উপর রায়তের দখলি স্বত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জাত পঞ্চায়েতের পক্ষে সে সময় গ্রামবাসীদের উপর তাদের সালিশি সিদ্ধান্ত আরোপ করা আদৌ কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু আঠারো শতকের মধ্যভাগ

কিংবা তার কিছু পূর্ব থেকে বীরভূমের গ্রাম-সমাজে মুদ্রা অর্থনীতির অনুপ্রবেশ,[৮] ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমবৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলির এই জেলা থেকে মুদ্রার বিনিময়ে রপ্তানি দ্রব্য ক্রয়ের সূচনা হয়।[৯] সেই সঙ্গে আঠারো শতকের শেষ দশকে ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে গ্রাম-সমাজগুলিতে ভূম্যধিকারীদের উদ্ভব,[১০] আর এইসব পরিবর্তনের অনুসঙ্গ হিসাবে গ্রামজীবনে মহাজনশ্রেণী ও দাদনী ব্যবসায়ীদের[১০ক] প্রবেশ ঘটে। এছাড়া পরবর্তীকালে বিচারবিভাগীয় পরিবর্তন এবং নূতন আইন আদালতের[১০খ] প্রতিষ্ঠার ফলে বীরভূম জেলার সনাতন গ্রাম সম্প্রদায়ে ভাঙন দেখা দেয় এবং গ্রাম-সমাজে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার অবসান হলে গ্রাম-সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃত্বও শিথিল হতে থাকে।

গ্রাম-সম্প্রদায়, গ্রাম-সমাজের স্বয়ং সম্পূর্ণতা এবং অবগুণ্ঠনের যুগে জাত-প্রথা লঙ্ঘন এবং সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ নিষ্পত্তির উদ্দেশে একটি নির্দিষ্ট দিনে এক বা একাধিক গ্রামের সংশ্লিষ্ট জাতভুক্ত অধিকাংশ সাবালক পুরুষকে জাত পঞ্চায়েতের সভায় হাজির করানো সম্ভবপর হলেও গ্রাম-সমাজের ভাঙনের যুগে তা আর সহজসাধ্য ছিল না। এছাড়া পঞ্চায়েত আহ্বানের ব্যয়ভার অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই বহন করতে হত।[১১] ফলে আলোচ্য জেলাটির গ্রাম-সমাজে পরিবর্তনের যুগে যখন জাত পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব শিথিল হতে শুরু করেছিল তখন জাত-প্রথা লঙ্ঘনের দায়ে সমাজের চোখে দোষী হিসাবে পরিগণ্য উচ্চ ও মধ্যবর্তী অর্থাৎ জল আচরণীয় নমশূদ্র জাতভুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের দোষমুক্ত করতে কদাচিৎই জাত পঞ্চায়েতের শরণ নিত। ক্রমশ: জেলার বিভিন্নস্থানে উচ্চ ও মধ্যবর্তী জাতগুলির মধ্যে জাত-বিধিনিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ নিষ্পত্তির উদ্দেশে জাত পঞ্চায়েত আহ্বানের প্রথা পরিত্যক্ত হতে থাকে। আর এই প্রবণতার সূচনা হয়েছিল খুব সম্ভবত: আঠারো শতকের শেষপ্রান্ত থেকে।[১২] সমাজশাসক হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বও উপেক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল।

উচ্চ ও মধ্যবর্তী জাতগুলির মধ্যে জাত পঞ্চায়েতের সভা আহ্বানের প্রথা বীরভূম জেলার বহুস্থানে পরিত্যক্ত হলেও জাতবিধি লঙ্ঘনকারী কোন ব্যক্তির পক্ষেই কিন্তু সমাজের ভ্রূকুটি আর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গ্রাম-সমাজে নির্বিঘ্নে বসবাস করা সম্ভবপর ছিল না। জেলার গ্রাম-সমাজ এবং গ্রাম-সম্প্রদায়ে পরিবর্তন এলেও ধর্মীয় ও সমাজশৃঙ্খল ভঙ্গকামী এবং জাত-প্রথা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পূর্বের মতই কঠোর। জাত ও ধর্ম সংক্রান্ত বিধিনিয়ম ভঙ্গ করলে অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে তার জাত সদস্যরা সমস্ত রকম সামাজিক আদান প্রদান বন্ধ করত।[১৩] এমনকি গ্রামস্থ অন্যান্য জাতভুক্ত লোকেরাও তার সংস্পর্শ পরিহার করে চলত।[১৪] অবৈধ যৌন সংসর্গঘটিত অপরাধ এমনকি তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁদের নিকট আত্মীয়ের দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকত না। সমাজ তাঁদের পতিত করত।

উচ্চ ও মধ্যবর্তী জাতগুলির জাত পঞ্চায়েতগুলি ইতোমধ্যেই হয় অস্তিত্বহীন নয়ত অকার্যকরী হয়ে পড়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতও বহুলাংশেই ছিল কর্তৃত্বহীন। গ্রাম পঞ্চায়েত

এবং জাত পঞ্চায়েতের শরণ নিয়ে তাই সামাজিক ব্রাত্যদশার কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না। বিকল্প পথের সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিতের কাছে শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের বিধান গ্রহণ এবং তার যথাবিহিত সম্পাদনের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর বিশ থেকে ত্রিশের দশকে রাইতাড়ার কৃষ্ণকান্ত মোদক,[১৫] নানুরের রামমোহন ঘোষ,[১৬] সেহানার নফর দে মোদক[১৭] কিংবা উজ্জ্বল মেড়ে[১৮] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের অথবা তাঁদের নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের জনরব ওঠার কারণে সমাজ কর্তৃক পতিত তথা সামাজিক বর্জনের মুখোমুখি হয়ে ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিতের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র যাঞ্চা করেছিলেন।

বীরভূমের গ্রাম-সমাজে উচ্চ এবং মধ্যবর্তী জাতগুলির জাত পঞ্চায়েত সমূহের অস্তিত্ব লোপ কিংবা তাদের অকার্যকরতার সুযোগে এইভাবেই উচ্চ ও মধ্যবর্তী সমস্ত জাতের উপর ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিত তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রামজীবনে সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার রক্ষক হিসাবে ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিতের ভূমিকা পূর্বেও ছিল। কিন্তু তখন তাঁর এই ভূমিকা কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের বিধানদানের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যেত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিন্তু সামাজিকভাবে ব্রাত্য উচ্চ ও মধ্যবর্তী জাতভুক্ত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিতের কাছ থেকে সরাসরি প্রায়শ্চিত্তের বিধান গ্রহণ করতে থাকেন।[১৯] আর এইভাবেই বীরভূমের গ্রাম-সমাজে সমাজশাসক হিসাবে ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিতের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

গ্রাম জীবনে সামাজিক এবং নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সনাতন সংস্থা দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জাত পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব ক্ষুন্ন হওয়ার পিছনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত জেলার নূতন জমিদারশ্রেণীর ভূমিকাও নেহাৎ কম ছিল না। বস্তুত: তাঁরা তাঁদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে সনাতন সংস্থা দু'টির ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যথা-বাস্তুজমি, পুকুর ও গাছের উপর মালিকানা স্বত্ত্ব অর্জন এবং চড়া সুদে গ্রামবাসীদের ঋণ প্রদানের মধ্যে দিয়ে জেলার আবাসিক জমিদারশ্রেণী তাঁদের নিজ নিজ গ্রাম এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁদের প্রভাবের বৃত্তাঞ্চল গড়ে তুলতে এবং সেই বৃত্তাঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।[২০]

হিন্দু গ্রাম-সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী সনাতন সংস্থা দু'টির কর্তৃত্বের ক্ষেত্র অধিকার করা গ্রামজীবনে আর্বিভূত এই 'নূতন আগন্তুকদের' পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল আরও একটি কারণে। ধোবা, নাপিত এবং পুরোহিত - এই সমাজসেবকদের উপর জমিদারদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায় এদের সহযোগিতায় তাঁদের পক্ষে সামাজিক ও নৈতিক শৃংখলা-ভঙ্গকারী যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সালিশি সিদ্ধান্ত কিংবা সামাজিক ব্রাত্যকরণের আদেশ কার্যকর করা সহজসাধ্য হত।[২১] হিন্দু পরিবারে কোন শিশুর জন্মগ্রহণ কিংবা পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুর ফলে সঞ্জাত অশৌচ থেকে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে শুদ্ধ করতে পারত একমাত্র ধোবা এবং নাপিত।[২২] উপনয়ন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধের মত ধর্মীয় - সামাজিক অনুষ্ঠানে নাপিতের অংশগ্রহণ ছিল অত্যাবশ্যক। অন্যদিকে উপনয়ন, বিবাহ,, শ্রাদ্ধ এবং পূজাঅর্চনার মত সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াদি পুরোহিত

ব্যতিরেকে সম্ভবপর ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষ আবার সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক শৃংখলাভঙ্গ কারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে জমিদারদের নির্দেশ কার্যকর করতে তাঁদের বরকন্দাজদের বাহুবলও যথেষ্ট সহায়ক হত।[২৩]

তবে নূতন উদ্ভূত জমিদারশ্রেণীর পক্ষে গ্রামজীবন নিয়ন্ত্রণকারী সনাতন সংস্থা দু'টির কর্তৃত্ব রাতারাতি খর্ব করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভবপর হয়নি তা সুরুল - জমিদারি নথিপত্র[২৩ক] থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। সুরুল - জমিদারি নথির সাক্ষ্য অনুযায়ী সুরুল - জমিদারেরা তাঁদের উদ্ভবের সাত দশক পরে তাঁদের প্রভাবএলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নানা বিবাদেই শুরু নয়, জনৈক গৃহবধূর নৈতিক পদস্খলন[২৪] কিংবা বিধবার পুনর্বিবাহের[২৫] মত সামাজিক ও নৈতিক বিচ্যুতি সংক্রান্ত ঘটনাবলির বিচারকের ভূমিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। শেষোক্ত ঘটনা দু'টি একান্তভাবেই ছিল উচ্চ জাতগুলির সামাজিক বিধান এবং ঐতিহ্যের উল্লঙ্ঘনের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট। এতাবৎকাল এই ধরণের সামাজিক ও নৈতিক বিচ্যুতির বিচার গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জাত পঞ্চায়েতের সভাতেই হয়ে আসে।

অবশ্য শুধু জমিদাররাই নয়, গ্রাম-সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী সনাতন সংস্থা দু'টির অবক্ষয়ের কালে কোথাও কোথাও আবার মন্ডল অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানেরা সমাজশাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আদিতে মন্ডলদের কাজ ছিল গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মত শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন, আর সেই সঙ্গে গ্রাম্য বিবাদে মধ্যস্থের ভূমিকাতেও তাঁদের দেখা যেত।[২৬] সুদীর্ঘকাল ধরে গ্রামজীবনে মন্ডলদের এই যে বিশিষ্ট স্থান ও ভূমিকা ছিল তারই ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জাত পঞ্চায়েতের অবক্ষয়ের কালে তাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা মন্ডলদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছিল।

তবে জমিদার এবং মন্ডলদের প্রভাব - ক্ষেত্রের পরিধি দূর বিস্তৃত ছিল না। তাঁদের প্রভাব-বৃত্তাঞ্চলের বাইরে বীরভূমের গ্রামজীবনে সমাজ শৃঙ্খলার ধারাকে পরিণত হয়েছিল ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিতদের বিধান, ক্বচিৎ, কদাচিৎ উপরোক্ত ভূমিকায় দেখা যেত গ্রাম পঞ্চায়েত আর জাত পঞ্চায়েতকে - অবশ্যই পূর্বের গ্রাম-সম্প্রদায়ের যুগের সেই সবল প্রতিষ্ঠান হিসাবে নয়, ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠান হিসাবে সনাতন সংস্থা দু'টি গ্রামজীবনে তাদের অস্তিত্বের জানান দিত। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশের প্রথম দিকের দু'টি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে। প্রথমটিতে জাত পঞ্চায়েত কর্তৃক পালুড়িয়ার বেণীমাধব মন্ডল জনৈক মুচি জাতভুক্ত মহিলার কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণের অপরাধে জাতচ্যুত হয়েছিলেন।[২৭] দ্বিতীয়টিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচারে সমাজচ্যুত ঐ বেণীমাধবের কাছ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে পালুড়িয়া এবং মল্লিকপুরের বন্দোপাধ্যায় এবং চট্টোপাধ্যায় পদবিধারী চার ব্রাহ্মণ আহার্য সামগ্রী গ্রহণ করায় সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উপরোক্ত গ্রাম দু'টির ব্রাহ্মণেরা তৎক্ষণাৎ অস্থায়ী জাত পঞ্চায়েত গঠন করে দোষীদের বিচারের আয়োজন শুরু করেছিলেন[২৮] সর্বক্ষেত্রেই শাস্ত্রবিধানের প্রয়োজন পড়লে ডাক পড়ত কিন্তু ব্রাহ্মণ সভাপন্ডিতেরই।

জেলার জাতপিরামিডে অবস্থানকারী উচ্চ ও মধ্য স্তরভুক্ত জাতগুলির উপর তাদের জাত পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই ক্রমশ শিথিল হয়ে এলেও জাত পিরামিডের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থানকারী জাতগুলির উপর তাদের নিজ নিজ জাতপঞ্চায়েতগুলি কর্তৃত্ব সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতেই সম্পূর্ণভাবে অটুট ছিল।[২৯] গ্রামজীবনে মুদ্রা অর্থনীতি, মহাজন, দাদনী ব্যবসায়ী কিংবা জমিদারদের আবির্ভাব মূলতঃ উচ্চ ও মধ্য স্তরভুক্ত জাতগুলির প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। গ্রামজীবনের উপরোক্ত পরিবর্তন সর্বনিম্ন স্তরের জাতগুলির প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করতে পারেনি শেষোক্ত জাতগুলির জাতগত হীনতা, অস্পৃশ্য দশা এবং অতলস্পর্শী দারিদ্র্যের কারণে। তাই দেখা যায় আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই জেলার উচ্চ ও মধ্যবর্তী জাতগুলির মধ্যে জাতবিধান লঙ্ঘনের বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশে জাত পঞ্চায়েতের সভা আহ্বানের প্রথা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হতে শুরু করলেও জাত পিরামিডের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থানকারী জাতগুলি তাদের নিজ নিজ জাত পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবেই মেনে চলেছে। বিবাহবিচ্ছেদ এবং সাঙা অর্থাৎ পুনর্বিবাহ থেকে শুরু করে অন্ত্যজ জাতগুলির ব্যক্তি জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নানা দিক পরিচালিত হয়েছে তাদের নিজ নিজ জাত পঞ্চায়েতের অঙ্গুলিহেলনে। ম্লেচ্ছ ইংরেজদের অধীনে কর্মগ্রহণের বিরুদ্ধেও কাহার নামক পাল্কীবাহক নিম্নশূদ্র জাতটির পঞ্চায়েত তার জাত সদস্যদের উপর নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত আরোপ করেছিল।[৩০]

জেলার হিন্দু গ্রাম-সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী বৃহত্তর সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বের অবক্ষয় এবং বৈষয়িক বিরোধ নিষ্পত্তিকারী 'মধ্যস্থ' নামক দীর্ঘপ্রাচীন সংস্থাটির অস্তিত্বলোপের পিছনে এতক্ষণ আলোচিত বিবিধ উপাদান ছাড়াও ব্রিটিশ - প্রতিষ্ঠিত আদালতেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। নব প্রতিষ্ঠিত জেলা আদালত এতাবৎকাল 'মধ্যস্থ' এবং গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা মীমাংসিত যথাক্রমে সম্পত্তি সংক্রান্ত এবং অযাজকীয় বিবিধ বিরোধের মামলা গ্রহণ করতে থাকায় উপরোক্ত সনাতন সংস্থা দু'টির কর্তৃত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়। ঔপনিবেশিক আদালত জেলার এই প্রাচীন সংস্থা দু'টির সামনেই শুধু অস্তিত্বের সংকট খাড়া করেনি, সমাজশাসক হিসাবে জমিদারদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিটাকেও স্বল্প হলেও কিছুটা আঘাত অবশ্যই দিয়েছিল। তবে ঔপনিবেশিক বিচারালয়ে বিচার ছিল অত্যন্ত জটিল, সময়ও ব্যয়সাপেক্ষ এবং ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। উচ্চ জাতভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ছিলেন বিত্তবান ও শিক্ষিত সেইরকম মুষ্টিমেয় কয়েক জনের পক্ষেই মাত্র এই আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়া সম্ভবপর ছিল। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক বামাচরণ ব্যানার্জীর কাছ থেকে খোরপোশ আদায়ের উদ্দেশে তাঁর স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবীর জেলা আদালতে বিচার প্রার্থী হওয়ার মত ঘটনার ক্বচিৎ দৃষ্টান্ত মিলনেও বিবাদ নিষ্পত্তির প্রয়োজনে দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর অধিকাংশ গ্রামবাসীর কাছে প্রথম এবং শেষ ভরসাস্থল ছিল সেই জাত পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েত, জমিদার কিংবা মণ্ডলদের সালিশি তার ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিতের শাস্ত্রীয় বিধান। যেখানে যে প্রতিষ্ঠানটি গ্রামজীবনে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখত জেলার গ্রামীণ মানুষ সেই প্রতিষ্ঠানের কাছেই বিচার চাইতে বাধ্য ছিল। সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রায়শ্চিত্ত না করার মত বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা উনিশ শতকের মধ্যভাগ

থেকে জেলার গ্রামজীবনে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটতে শুরু করে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অরণ্যবহ্নি'র একটি চরিত্র ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে এরকম নিদর্শন পাওয়া যায়। ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের বিধবা কন্যা স্বইচ্ছায় গৃহত্যাগিনী হলে সমাজশাসনকে উপেক্ষা করে তিনি বলতে পেরেছিলেন—''আমাকে পতিত করে কে রে — কোন্ শালা— তার ঘাড়ে ক'টা মাথা। আর করলি করলি — আমার বয়েই গেল।''[৩২] উনিশ শতকে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। অধিকাংশ মানুষই সামাজিক ব্রাত্যকরণকে ভয় করে চলতেন, মেনে চলতেন সমাজনিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃত্বকে। এই জাতচ্যুতির ভয়েই সিউড়ি জেলা বন্দী মধ্যবর্তী জাতের কিছু অপরাধী জেলে নাপিতের কাজ করতে আপত্তি জানিয়েছিলেন।[৩৩] ভিন্ন একটি ক্ষেত্রে জেলবন্দী বিভিন্ন জাতভুক্ত মানুষ পূর্বে অন্য বন্দী কর্তৃক ব্যবহৃত মাটির পাত্রে জল গ্রহণে সম্মত হন নি। মারপিটের অভিযোগে বন্দী উচ্চজাতের কিছু মানুষ জেলা বিচারকের কাছে আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন যে বন্দী থাকার কারণে ধর্মীয় কিছু রীতি পালন না করতে পারায় মুক্তিলাভের পর জাত ফিরে পেতে তাঁদের কঠিন মূল্য দিতে হতে পারে।[৩৪] গ্রামীণ মানুষের এই মানসিকতার কারণেই সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলারক্ষাকারী বীরভূম জেলার প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উনিশ শতকের উপান্তেও টিকে ছিল, যদিও এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসে এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছু নূতন সংস্থা পুরাতন সংস্থার স্থান গ্রহণ করে।

সূত্র নির্দেশ

১) মুর্শিদাবাদ বিভাগের ভ্রাম্যমাণ প্রাদেশিক আদালতের নিবন্ধক হেনরী মুরের উদ্দেশে লেখা বীরভূমের জেলাশাসক ডি. মরিসনের চিঠি, (এরপর থেকে হেনরী মুরের উদ্দেশে ডি. মরিসনের চিঠি - - এইভাবে উল্লিখিত), ২৫ জুন, ১৮১৬, জেলা নথিশালা, সিউড়ি, বীরভূম।

২) বি. এন. গাঙ্গুলি সম্পাদিত রিডিং ইন ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি, (বম্বে, ১৯৬৪), গ্রন্থে বি. এস. ভাটিয়ার প্রবন্ধ, ডিসইন্টিগ্রেশন অব্ ভিলেজ কমিউনিটিজ্ ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ৯৪, এবং গাই এস, মেটব্যাকস্ ফ্রাঙ্কেকায়েস ক্রৌজেট সম্পাদিত স্টাডিজ্ ইন দ্য কালচারাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, (আগ্রা, ১৯৬৫), গ্রন্থে এন. ডি. সোভানির প্রবন্ধ 'ব্রিটিশ ইমপ্যাক্ট্ অন ইন্ডিয়া' পৃঃ ২৯৭।

৩) বি. এন. গাঙ্গুলি, সম্পাদিত, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে বি. এন. ভাটিয়ার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ, পৃঃ ৯৪।

৪) এস. সি. দুবে - - ইন্ডিয়ান ভিলেজ, (লন্ডন, ১৯৫৫), পৃঃ ৫৫।

৫) ঐ

৫ক) পঞ্চানন মন্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ১৯৫৩)গ্রন্থে সভাপন্ডিতের উদ্দেশে: কৃষ্ণকান্ত মোদকের হকিকত পত্র, ১২৩০ সন, পৃঃ ১৭৫।

৬) হেনরী মুরের উদ্দেশে ডি. মরিসনের চিঠি, পঞ্চানন মন্ডল, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ (বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন, ১৯৬৮), পৃঃ ২৭০, এবং গৌরীহর মিত্র. বীরভূমের ইতিহাস, প্রথম খন্ড সিউড়ি, ১৩৪৩ সাল, পৃঃ ১৩৮।

৬ক) হেনরী মুরের উদ্দেশে ডি. মরিসনের চিঠি।

৬খ) পঞ্চানন মন্ডল, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড. পূর্বার্ধ, পৃঃ ২৭০।

৭) হেনরী মুরের উদ্দেশে ডি. মরিসনের চিঠি।

৮) রঞ্জন কুমার গুপ্ত, দ্য ইকনমিক লাইফ অব আ বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট, বীরভূম, (বর্ধমান ইউনিভারসিটি. ১৯৮৪), পৃ: ১৪৯।

৯) ঐ।

১০) ঐ, পৃ: ৭৩-৭৫।

১০ক) ঐ, পৃ: ১৫৭-৫৮।

১০খ) দুর্গাদাস মজুমদার, ওয়েস্টবেঙ্গল ডিসট্রিকট্ গেজেটিয়ারস্: বীরভূম (ডিসেম্বর ১৯৭৫)পৃ:৩৫২-৫৩)।

১১) হেনরী মুরের উদ্দেশে ডি. মরিসনের চিঠি।

১২) ঐ।

১৩) ঐ।

১৪) ঐ, পঞ্চানন মন্ডল, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, দ্বিতীয়খন্ড, চিঠি সংখ্যা ২২৭, পৃ: ১৬৮।

১৫) উপরোক্ত গ্রন্থে সভাপন্ডিত ঠাকুরের উদ্দেশে কৃষ্ণকান্ত মোদকের হকিকত পত্র, ১২৩০ সন (১৮২৩ খ্রি:), পৃ ১৭৫।

১৬) ঐ গ্রন্থে জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকারের উদ্দেশে রামমোহন ঘোষের হকিকত পত্র, ৩০ চৈত্র ১২৪৫ সন (১৮৩৯ খ্রি:) পৃ: ১৬৭।

১৭) ঐ গ্রন্থে সভাপন্ডিত ঠাকুরের উদ্দেশে নফর দে মোদকের পত্র, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ২১৩১ সন (১৮২৪ খ্রি:) পৃ: ১৭৬।

১৮) ঐ গ্রন্থে জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকারের উদ্দেশে উজ্জ্বল মেড়ের হকিকত পত্র, ৫ ফাল্গুন ১২৩৬ সন (১৮৩০ খ্রি:) পৃ: ১৭৭।

১৯) পঞ্চানন মন্ডল, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খন্ড, চিঠিসংখ্যা ২২৫, ২২৬, ২৪১, ২৪৩।

২০) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথিবিভাগে রক্ষিত সুরুল জমিদারি নথির সাক্ষ্য এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

২১) সেন্সাস অব ইন্ডিয়া, ১৯১১, ৫ম খন্ড, ১ম অংশ, পৃ : ৪৮৮।

২২) ঐ, পৃ: ৪৬১।

২৩) ঐ, পৃ: ৪৮৮।

২৩ক) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথিবিভাগে রক্ষিত।

২৪) মোহিনী মোহন সরকারের উদ্দেশে লিখিত চিঠি (ছেঁড়া), ১২৯৩ সন (১৮৮৬ খ্রি:), সুরুল জমিদারি নথি, পুঁথিবিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

২৫) মোহিনী মোহন সরকারের উদ্দেশে হরিশ্চন্দ্র সরকারের চিঠি, ২৭ ফাল্গুন, ১২৯২ সন (১৮৮৬ খ্রি:) সুরুল জমিদারি নথি, পুঁথিবিভাগ বিশ্বভারতী।

২৬) এল. এস. এস. ও' মালি - - বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ারস্ (কলকাতা,১৯১০), পৃ: ৩৯।

২৭) পঞ্চানন মন্ডলের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) - এ ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা প্রমুখের উদ্দেশে বেণীমাধব ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের হকিকত পত্র, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ সন (১৮৭৮ খ্রি:), পৃ: ১৭৮।

২৮) ঐ, পৃঃ ১৭৮-৭৯।

২৯) তারাশংকর রচনাবলির সপ্তম খন্ডে (কলকাতা, চৈত্র ১৩৮৯), সংকলিত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, পৃঃ ২৫১, এ. মিত্র -- সেন্সাস ১৯৫১, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, দ্য ট্রাইবস্ অ্যান্ড কাষ্টস্ অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল, পৃঃ ৭০-৭৫।

৩০) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোল্লিখিত উপন্যাস, পৃঃ ২৫১।

৩১) বীরভূমের দায়রা বিচারকের উদ্দেশে বীরভূমের স্থানাপন্ন জেলাশাসকের চিঠি, ২৩ আগষ্ট ১৯৫৮। জেলা নথিশালা, সিউড়ি, বীরভূম।

৩২) তারাশংকর রচনাবলির অষ্টাদশ খণ্ডে (কলকাতা, ভাদ্র ১৩৮৭) সংকলিত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অরণ্যবহ্নি', পৃঃ ৩৮৯।

৩৩) কার্যবিবরণী বিচারবিভাগ (কারাগার শাখা), নং ৪, আগষ্ট, ১৮৬১, রাজ্য লেখ্যাগার, কলকাতা।

৩৪) বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের উদ্দেশে আর. জে উইংগরামের চিঠি, ১৯ এপ্রিল, ১৮৫৬, জেলা নথিশালা, সিউড়ি বীরভূম।

৩৫) বীরভূমের স্থানাপন্ন জেলাশাসকের উদ্দেশে বীরভূমের দায়রা বিচারকের চিঠি, ১ অক্টোবর ১৮৫৬, জেলা নথিশালা, নথিশালা, সিউড়ি, বীরভূম।

আধুনিক আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় বীরভূম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতক

মানস কুমার সাঁতরা

প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন, অঞ্চল মানে বাঙলা, রাজপুতানা বা মহারাষ্ট্রের মত প্রদেশ নয়। অঞ্চল বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে বর্তমান ভারতের বা ব্রিটিশ শাসিত ভারতের কোনো একটি জেলা। আমাদের দেশে জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত সম্ভবত উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে। সে সময় ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলায় সাধারণত দুই ধরণের ইতিহাসচর্চা লক্ষণীয়। এক, ষ্টুয়ার্ট বা মার্শম্যানের মত লেখককৃত প্রচলিত কিছু পাঠ্যবই; দুই, শোর বা গ্রান্টের মত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের প্রশাসনিক গবেষণাধর্মী কাজ, এমনকি জেমস্ মিলের মতো ঐতিহাসিকের ভারতইতিহাসচর্চা - যার মূল উদ্দেশ — 'the history of India must be studied so (that) Englishmen might govern it.'[১] পাঠ্যপুস্তকের কথা বাদ দিয়ে বলা যায় গবেষণার 'থিম' একই এবং তাহলো, হয় কোম্পানির গভর্নরদের 'গৌরবমন্ডিত' জীবনী, নাহয়, পূর্ব ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। উইলকিন্স বা কোলব্রুক সাহেবের মতো স্বল্প কয়েকজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ব্যতিক্রমী চেষ্টায় রত ছিলেন।

উক্ত সাধারণ পটভূমিতে কোম্পানির একজন তরুণ কর্মচারী এদেশের গ্রামীণ মানুষের ইতিহাস লেখার উদ্দেশে বেছে নিলেন জেলা ভিত্তিক অঞ্চল বীরভূমকে। তিনি হলেন উইলিয়াম উইলসন হান্টার। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ 'Every county, almost every parish, in England, has its annals; but in India vast provinces, greater in extent than the British islands, have no individual history whatever. Districts that have furnished the sites of famous battles, or lain upon the routes of imperial progress, appear, indeed, for a moment in the general records of the country; but before the eye has become familiar with their uncouth names, the narrative passes on, and they are forgotten.... in India, one rural generation dreams out its existence after another and all are forgotten'[২] এখন প্রশ্ন, কেন বীরভূম জেলাকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন? বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসাবে ১৮৬২ খ্রি: তিনি ভারতে আসেন। কলকাতায় কিছুদিন রাখার পর তাঁকে বীরভূমের সহকারী-ম্যাজিষ্ট্রেট করে সিউড়িতে পাঠানো হয়। তখন বীরভূম 'remote district' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। বীরভূমের কালেক্টরের অধীনে তিনি জেলা-কোষাগারের খাজাঞ্চিখানায় দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত হন। জেলা খাজাঞ্চিখানায় তিনি একটি প্রাচীন আলমারির সন্ধান

পান যার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালের একেবারে আদিপর্বের নথিপত্র সংরক্ষিত ছিল। এ যাবত অব্যবহৃত ঐসব নথিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে জেলার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ শুরু করেন ব্রিটিশ শাসনকালের আদিপর্বে (১৭৬৫ খ্রি:-১৭৯০ খ্রি:) বীরভূমের ইতিহাসচর্চা।

পূর্বেই বলা হয়েছে সে সময় ইতিহাসচর্চার বিষয় ছিল সাধারণত ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের জীবনী অথবা শাসনপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। অথচ হান্টারের লক্ষ্য অভিনব। তারও কৈফিয়ৎ তিনি দিয়েছেন ঃ 'Eloquent and elaborate narratives have indeed been written of the British ascendency in the East; but such narratives are records of the English Government, or biographies of the English Governors of India, not histories of the Indian people. The silent millions who bear our yoke have found no annalist.'[৩] প্রচলিত বিষয়ের পরিবর্তে তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এ দেশের গ্রামীণ মানুষের ইতিহাস— 'the bygone joys and sorrows of the district in general, its memorable vicissitudes, its remarkable men, the decline of old forms of industry and the rise of new, - in a word, all the weightier matters of rural history.'[৪]

রাঢ়-বাঙলার অন্তর্গত বীরভূমের গ্রামীণ ইতিহাস রচনার কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে তিনিই প্রথম ব্যবহার করলেন আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু মূল্যবান সব উপাদান। বীরভূম জেলা কালেক্টরিতে 'তাচ্ছিল্যভরে' রক্ষিত ইংরেজি, ফারসি ও বাঙলা ভাষায় লেখা সরকারি নথিপত্র, বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়ার জেলা-আদালতগুলির পুরোনো কাগজপত্র এবং বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের পুরোনো জমিদারবংশ দুটির পারিবারিক মহাফেজখানার দলিল ছাড়াও তিনি সংগ্রহ করলেন স্থানীয় লোকাচারগুলি, স্থানীয় পন্ডিতদের সাহায্যে পার্বত্য উপজাতিভুক্ত মানুষের ভাষা আয়ত্ত করলেন এবং তাদের অভ্যাসগুলি অনুসন্ধান করলেন। এর ফলে হান্টারের গবেষণার ফসল, **The Annals of Rural Bengal** প্রকাশিত হলো ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে। স্যার সেসিল বিডন (প্রাক্তন লেফঃ গর্ভনর, বাংলা) কে গ্রন্থটি উৎসর্গ করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বললেন 'These pages...have little to say touching the governing race. My business is with the people.'[৫] বইটির নতুন 'থিম' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার লিখলেন : 'It is a mighty undertaking to write the history of a people rather than their rulers. It is so... even in England.... A Work this kind will be of great advantage to the political economist and the Statesman.'[৬] গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমসাময়িককালের ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় সেটি প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে। কিন্তু বইটির প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজকর্ম সেরে হান্টার ডিসেম্বর মাসে (১৮৬৮ খ্রি:) যখন কলকাতায় ফিরে আসেন এবং বাংলার সরকারের তদানীন্তন প্রধান সচিবের সঙ্গে দেখা করেন তখন তাঁর কাজের তীব্র নিন্দা করে হান্টারকে পদমর্যাদা ও বেতন - উভয় দিক থেকেই নিম্নতর পর্যায়ের একটি আধিকারিকের পদে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি রক্ষা পান। অবশ্য বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (১৮৬১ খ্রি:) প্রথম স্থানাধিকারি এই স্কটিশ সিভিলিয়ান

তাঁর সমস্ত চাকরি জীবনে কোনোদিন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সচিবের পদে উন্নীত হন নি। গ্রাম বাঙলার ইতিবৃত্তকার হিসেবেই তিনি থেকে গেছিলেন।[৭] তবে তাঁর **Annals** বিষয় এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে এদেশের ইতিহাস রচনার ইতিহাসে একটি অতি প্রশংসনীয় কর্ম হিসাবে আজও সমানভাবে আদৃত হয়ে আছে। তার প্রমাণ, কেবলমাত্র সমকালে বইটি সাত-আটবার পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল, শুধু তাই নয়, বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধেও বাংলা ভাষায় অনুবাদ সহ বইটি একাধিকবার পুনঃপ্রকাশিত হয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, এদেশে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটালেন হান্টার যে গবেষণাকর্মটির দ্বারা তা কালের সীমা অবশ্যই অতিক্রম করেছে।

উনিশ শতকের একেবারে শেষে আরেকজন সরকারি প্রশাসক বীরভূমের ইতিহাসচর্চায় এগিয়ে আসেন। তিনি হলেন ই. জি. ড্রেক-ব্রকম্যান। ১৮৯৫-৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বীরভূম জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদে আসীন ছিলেন। এই সময় জেলা মহাফেজখানার নথিপত্রের উপর নির্ভর করে তিনি লিখেছিলেন Notes on The Early Administration of the District of Birbhum। মাত্র তেত্রিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে গয়া থেকে প্রকাশিত হয়। মনে হয় হান্টার সাহেবের সাফল্য তাঁকে উৎসাহিত করেছিলো, যদিও তিনি তা উল্লেখ করেন নি। তবে হান্টারের মতো ইতিহাস সচেতনতা তাঁর ছিল না। ইতিহাস অনুরাগ থেকে নয়, সম্ভবত প্রশাসনিক উদ্দেশেই তাঁর এই কর্মপ্রচেষ্টা। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের বীরভূম জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে Notes লেখাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। কারণ, উল্লিখিত সময়ে এই জেলার রাজস্ব-পরিচালন ব্যবস্থা, অপরাধ ও পুলিশি ব্যবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অতি সংক্ষিপ্ত যে বিবরণ তিনি লিখেছিলেন তাকে তখনকার দৃষ্টিভঙ্গিতেও ইতিহাসের পর্যায়ে ফেলা কঠিন। জেলার শিক্ষা-ব্যবস্থা, সতীপ্রথা ও মন্দির সম্পর্কেও যৎকিঞ্চিৎ তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন সত্য, কিন্তু তা কোনমতেই 'Notes'-র পর্যায়কে ছাপিয়ে যেতে পারেনি।[৮] বলা বাহুল্য, প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি ইতিহাসচর্চা করেন নি। ব্রকম্যান সাহেবের এই কর্মটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন আধুনিক লেখক লিখেছেন : 'The treatise, very short and scrappy, describes in bare outline the district administration from 1785 to 1830'।[৯] আসলে ব্রকম্যানের এই কাজটি হাতের কাছে পাওয়া কিছু তথ্যের একটা সংকলন ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে সেসময় এর একটা তাৎক্ষণিক মূল্য সম্ভবত ছিল।

এরপর বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে সরকারি প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার রচনার কাজ শুরু হয়। সেই সাধারণ প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে ও'মালির সম্পাদনায় **District Gazettear of Birbhum** প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে। গেজেটিয়ার ইতিহাস নয়। কিন্তু জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহ ভৌগলিক পরিমণ্ডল, লোকসংখ্যার হিসেব, বিভিন্ন জনপদের পরিচয় ইত্যাদি বহু মূল্যবান আঞ্চলিক তথ্যের সন্ধান এগুলি দিয়েছিলো, আজও দেয়।[১০] জেলার ইতিহাসচর্চায় ও'মালির গেজেটিয়ারকে সম্পূরক অবদান হিসেবে চিহ্নিত

করা যেতে পারে। আধুনিক ইতিহাস গবেষণায় উপাদান হিসেবে এর মূল্য তো অবিসম্বাদিত। প্রায়ই একই ধরণের কথা বলা যায় জেলার Settlement Report গুলিকে। বীরভূম জেলার তদানীন্তন Settlement Officer বি. বি. মুখার্জী - *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Birbhum 1924-32*-র সঙ্কলন করতে গিয়ে জেলার মহাফেজখানের নথিপত্রের কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। বীরভূমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও তাতে তুলে ধরার কিছু প্রচেষ্টা আছে।[১১] তবে আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষীণ। আধুনিক রচনার উপাদান হিসেবেই তার সার্থকতা।

বাঙলায় এদেশীয় লেখকদের মধ্যে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার তাগিদে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। এ হয়তো উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রভাব। বহুখ্যাত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্বদেশের' ইতিহাসচর্চার জন্য স্বদেশী লেখকদের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার ফলে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সেই উদ্দীপনা আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও কাজে লেগেছিলো। *সিরাজদ্দৌলা* গ্রন্থের লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা *ঐতিহাসিক চিত্র* প্রকাশনার (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৯ খ্রিঃ) যে সব উদ্দেশের কথা বলা হয়েছিলো তার মধ্যে আঞ্চলিক ইতিহাস উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা, তার ইঙ্গিত ছিল। পত্রিকাটির প্রস্তাবনায় লেখা হয়েছিল : '...বাঙালি রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশ করাই (এই প্রস্তাবিত পত্রের)...(অন্যতম উদ্দেশ)'।[১২] সে সময় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে *মুর্শিদাবাদ কাহিনীর* লেখক নিখিলনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'নিখিলবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলা-নিবাসী লেখকগণ তাঁহাদের স্থানীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্রাবলী সংকলন করিতে থাকেন তাহা হইলে বাঙলাদেশের সহিত বঙ্গ বাসীর সুদূরব্যাপী পরিচয় সাধন হইতে পারে।'[১৩]

বিশ শতকের শুরু থেকেই বাঙলায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার একটা তরঙ্গ যেন প্রবাহিত হতে থাকে। রজনীকান্ত চক্রবর্তী লিখেছিলেন *গৌড়ের ইতিহাস*। দুই খণ্ডের এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো রমাপ্রসাদ চন্দ্রের গৌড়রাজমালা। এরপর সতীশ চন্দ্র মিত্র আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় একটি স্থায়ী অবদান রাখলেন। তাঁর লেখা সুখ্যাত গ্রন্থ *যশোর-খুলনার ইতিহাস*-র প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খন্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার এই ঢেউ বীরভূমের গায়েও লাগে। এই জেলার কীর্ণাহার থেকে প্রকাশিত *সৎসঙ্গ* এবং মলুটি থেকে প্রকাশিত *ধরণী* নামক মাসিক পত্রিকায় 'বিক্ষিপ্তভাবে' হলেও বীরভূম ইতিহাস নিয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (১৮৯৮-৯৯ খ্রি:) *বীরভূম* নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পর শিবরতন মিত্র *বীরভূমের ইতিবৃত্ত* নাম দিয়ে জেলার 'ধারাবাহিক' ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা করেছিলেন।[১৪] অবশ্য তাঁর এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। চার-পাঁচটি প্রবন্ধ মাত্র তিনি লিখেছিলেন। এই প্রচেষ্টা সার্থক করেছিলেন তাঁর পুত্র গৌরীহর মিত্র। তাঁর কথা পরে আলোচিত হবে।

বীরভূমের হেতমপুরের জমিদার 'মহারাজকুমার' মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় এগিয়ে আসেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৮-০৯ খ্রি:) প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা গ্রন্থ *বীরভূমের রাজবংশ*। এটি প্রধানত মুঘল-নবাবি আমলে বীরভূম জেলার রাজধানী রাজনগরের পাঠান ফৌজদারবংশের কাহিনী নিয়ে লেখা একটি পুস্তিকা।[১৫] মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী এরপর ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির সম্পাদক হয়েছিলেন তিনি নিজেই। সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। আর সভাপতি ও সহ-সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছিলো যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথ বসু ও নিখিলনাথ রায়কে।[১৬] 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' কর্তৃক জেলার ইতিহাস উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা শুরু হয় তার ফল প্রকাশিত হয় তিন খণ্ডে সমাপ্ত *বীরভূম বিবরণ* গ্রন্থে। প্রধানত বীরভূমের বিভিন্ন 'প্রসিদ্ধ' স্থানের প্রবাদমূলক বিবরণ ও পরিচয় সম্বলিত এই গ্রন্থকে কোনমতেই আধুনিক ইতিহাসচর্চার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের প্রকাশকালে (১৩২৬ বঙ্গাব্দে) তার ভূমিকায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছিলো : 'বলিয়া রাখা ভাল ইহা ইতিহাস নহে। বীরভূমের কিছু পল্লী ও তীর্থক্ষেত্রের কাহিনী মাত্র।'[১৭] দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতেও একই কথার পুনরুক্তি করা হয়েছিলো।[১৮] তবে যত্নসহকারে পড়াশোনা করলে এই গ্রন্থে আধুনিক ইতিহাসচর্চার অনেক উপাদান পাওয়া যাবে, তাতে সন্দেহ নাই।

আধুনিক আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে হান্টার সাহেবের পর গৌরীহর মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। হান্টারের পর তিনিই প্রথম আধুনিক গবেষণাপদ্ধতি অনেকটা অনুসরণ করে বীরভূমের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। মাতৃভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় তাঁর মোটামুটি এক সফল প্রচেষ্টার ফসল দুই খণ্ডের *বীরভূমের ইতিহাস* নামক গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় ঃ 'দ্বাদশবর্ষব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কঠোর পরিশ্রমের ফলে আজ আমরা বীরভূমের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠকগণকে উপহার দিতে পারিয়া ধন্য হইলাম।'[১৯] প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ ঘটে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে।[২০] তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশের কথা ঘোষিত হলেও তা আর বাস্তবায়িত হয় নি। প্রথম খণ্ডে তিনি এই জেলার ভৌগলিক অবস্থান, নামরহস্য থেকে শুরু করে ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জগতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে জেলায় পাশ্চাত্ত্য বণিকদের আগমন থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তার পরিণাম পর্যন্ত এবং শেষে ১৮৫৫-১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখেছেন। নতুন সহস্রাব্দের গোড়ায় আমরা গৌরীহর মিত্রের ইতিহাসচর্চার অনেক দুর্বলতা খুঁজে বের করতে পারি। আধুনিক পেশাদারি ইতিহাসকারের নিপুণতা নি:সন্দেহে তাঁর ছিল না। সঠিক অর্থে পেশাদারি ঐতিহাসিকও তিনি ছিলেন না। কিন্তু 'the first attempt at a systematic reconstruction of the History of Birbhum' হিসেবে গ্রন্থটির মূল্য অনস্বীকার্য।

স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বীরভূম জেলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা শুরু করেন। ঐ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব আধিকারিক (পূর্ত বিভাগের সহায়তায়)

রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুধীর রঞ্জন দাস, সুধাকর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিকবৃন্দের সহায়তায় এ কাজ সম্পন্ন করেন। এর ফলে প্রকাশিত হয় বীরভূম জেলার *পুরাকীর্তি* নামক গ্রন্থ (১৯৭২ খ্রি:)।[২১] সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চার সঙ্গে এর সম্পর্ক ক্ষীণ। কিন্তু এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে গ্রন্থটির সম্পর্ক অবশ্যই আছে। বীরভূমের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে এরপর অনেকেই ইতিহাসচর্চা করেছেন। এস. কে. মাইতি লিখেছেন Religious and Cultural Heritage of Birbhum।[২২] গ্রন্থটি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ আচার্য শান্তিদেব ঘোষও বীরভূমের সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন (১৩৭২ বঙ্গাব্দ, *দেশ* পত্রিকা)। তবে এ বিষয়ে কলকাতার বি. এম. একাডেমির ইতিহাস বিভাগের তদানীন্তন প্রধান অধ্যাপক সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থটির নাম Temples of Birbhum। প্রকৃত পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আধুনিক ইতিহাসচর্চা পদ্ধতি অবলম্বন করে উল্লিখিত গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন। এই কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে তিনি প্রধানত তিন ধরণের উপাদানের উপর নির্ভর করেছেন - এক, মন্দির ও প্রতিমা; দুই, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য এবং তিন, যাদুঘর ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের লিপি, মুদ্রা পাথর, ধাতু, টেরাকোটার কাজ ইত্যাদি। জেলার বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মীয়, স্থানগুলিতে সরেজমিনে নিরীক্ষণের উপরও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।[২৩] এই গ্রন্থে সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের বৃহত্তর সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে বীরভূম জেলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস রচনা করেছেন (এস. কে. মাইতি এবং সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও) এ জেলার স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছেন শিল্পী মুকুল দে। তাঁর লেখা বই - *Birbhum Terracottas*। বীরভূমের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় আরও কোন কোন লেখকের উৎসাহের কথা লক্ষণীয়। যেমন দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন *বীরভূমের যমপট ও পটুয়া* (কলকাতা, ১৯৭২ খ্রি:)। আবার অতি সম্প্রতিকালে একেবারে অপেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কেউ কেউ এ জেলার খ্যাত-অখ্যাত স্থানের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানের 'ক্ষুদ্র' প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। যেমন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন *গ্রাম-মুলুকের ইতিকথা* (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) এবং বোলপুর দর্পন (১৯১১ খ্রি:)।

স্বাধীনোত্তরকালে পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে আমাদের দেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চার এক নতুন প্রবাহ শুরু হয়। নামজাদা মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম হয় নিজেরা সম্পন্ন করেন অথবা তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা এ ব্যাপারে নতুন এই ধারাকে পুষ্ট করেন। এ প্রসঙ্গে অন্তত কয়েকজন ইতিহাসবিদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁরা হলেন সুশোভন সরকার, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ইরফান হাবিব, কে. এম. আশরফ, অশীন দাশগুপ্ত এবং বিনয়ভূষণ চৌধুরী। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই নতুন ধারার প্রভাব লক্ষণীয়।

ষাটের দশকে বীরভূম জেলার সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক রঞ্জন কুমার গুপ্ত। একাজে লিপ্ত হওয়ার

ক্ষেত্রে তিনি যে আচার্য নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের দ্বারা অনুপ্রানিত একথা নিজেই স্বীকার করেছেন। বারো বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করার পর ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা নিবন্ধ জমা দেন ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর বিষয় : The Economic Life of a Bengal District : Birbhum, 1770-1857। বলা বাহুল্য ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য নিবন্ধটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিবেচিত হয় এবং কিছু পরিমার্জন-পরিবর্ধন সহ এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বীরভূমের আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করার ঘটনা এই প্রথম। অর্থাৎ যথার্থ পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ জেলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে রঞ্জন গুপ্তের নাম স্মরণীয়।

জেলা পর্যায়ের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন : '....its importance lies mainly in its contribution to our understanding of the history of the wider region of which the particular locality forms a part'।[২৪] সম্ভবত তিনি বলতে চেয়েছেন, বাঙলার ইতিহাস নিখুঁতভাবে বুঝতে গেলে জেলা-ভিত্তিক আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা আবশ্যিক। বীরভূমের মতো কৃষি-প্রধান অঞ্চলের আঞ্চলিক বিভিন্নতা মনে হয় আরও বেশি, বাঙলার সাধারণ ইতিহাসচর্চায় যা সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। যাইহোক, তিনি শুরু করেছেন, ১৭৭০-র মন্বন্তর থেকে, শেষ করেছেন ১৮৫৭-এ, অর্থাৎ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত। এখানে কিছুটা বিভ্রান্তি ঘটেছে। ১৮৫৭ বছরটি সাধারণভাবে ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে যতটা বৈশিষ্ট্য মূলক বীরভূম জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসে তা নয় বলেই রঞ্জন গুপ্তই আবার বলেছেন - 'My study indeed concludes in 1856...'।[২৫] বস্তুতপক্ষে, ১৮৫৫-৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ এই অঞ্চলের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভারতের সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়েই মনে হয় তাঁর এই বিভ্রান্তি। তবে সর্বাধুনিক গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে জেলা কালেক্টারী মহাফেজখানা ও জেলা আদালতের নথিপত্র সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উপাদানের ভিত্তিতে প্রায় একশ বছরের জেলার কৃষি-ব্যবস্থা, শিল্প, বাণিজ্য ও শহরায়ণের যে ইতিহাস তিনি লিখেছেন তা নিঃসন্দেহে ইদানীংকালের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাঙলার সাধারণ ইতিহাস বা আধুনিক ভারত ইতিহাসজ্ঞানের ভান্ডার তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে, বিনা দ্বিধায় একথা বলা যেতে পারে।

আশির দশকে বীরভূম জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও গবেষকদের উৎসাহ লক্ষণীয়। ঐ বিভাগের প্রাক্তন প্রধানও জহরলাল নেহেরু অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান প্রবন্ধকার সহ তাঁদের শিষ্যেরা বীরভূমের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক ও পর্ব নিয়ে পরপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্মে রত হন বিগত শতকের আশির দশক থেকে। বর্তমানে বোলপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মানস কুমার সাঁতরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালের আদিপর্বে বীরভূম জেলার ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থার ইতিহাস নিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করেন ১৯৭৯-৮০ খ্রিষ্টাব্দে। দশ বছরের

বেশি সময়কাল ধরে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করার পর বিশ্বভারতী থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর গবেষণানিবন্ধটি কিছু স্বাভাবিক পরিমার্জন ও পরিবর্ধন সহ ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি হলো, *Land Revenue Administration In Bengal Under Early British Rule* (A case Study of Birbhum District, 1765-1820)। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সময় থেকে ১৮২০-তে জেলা কালেক্টরশীপ্ চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করা পর্যন্ত বীরভূমের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থার নিখুঁত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে।

আদিপর্বের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাঙলা থেকে যতদূর সম্ভব বেশি রাজস্ব আদায় করা। সেকাজ এ জেলায় সমাধা করতে গিয়ে যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁরা চালিয়েছিলেন এবং তার ফলে জেলার কৃষি-সমাজে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রত্যাঘাতও ঘটেছিলো এবং তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন - জেলার কৃষি কাঠামোয় তার পরিণাম এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়। পুরোনো জমিদারবংশ (রাজবংশ)-র পতন ও উনিশ শতকের নতুন জমিদার শ্রেণীর উত্থান, জমির ভোগদখলের শর্তাবলীর ইতিহাস সহ একেবারে গ্রামস্তর পর্যন্ত যে শাসন-কাঠামো গড়ে উঠেছিলো তার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে উল্লিখিত গ্রন্থে। বাঙলার ইতিহাসের সাধারণ প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক পার্থক্যগুলিকে বিস্তার করা হয়েচে। লেখকের দাবি, বিষয়বস্তু এবং বিশ্লেষণ উভয় দিক থেকেই এটি 'in-depth study' এবং তা করা হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে।[২৬]

বীরভূমের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় বিশ্বভারতীর ইতিহাস বিভাগের আরও দু'জন গবেষকের নাম উল্লেখযোগ্য। একজন সুমিত ভট্টাচার্য-বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও অন্যজন অমিয় ঘোষ - বর্তমানে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। সুমিত ভট্টাচার্যের বিষয়, *Birbhum in the Nineteenth Century : A Social Study*[২৭] আর অমিয় ঘোষের বিষয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরভূম : ১৯৯১-১৯৪৭।[২৮] সরকারি মহাফেজখানার তথ্য ছাড়াও, সুমিত ভট্টাচার্য স্থানীয় পুরোনো জমিদার, পত্তনিদারদের পারিবারিক মহাফেজখানার নথিপত্রগুলি যত্ন-সহকারে ব্যবহার করেছেন। তিনি হিন্দু, মুসলমান ও বিভিন্ন উপজাতিভুক্ত মানুষের সামাজিক স্তরবিন্যাস, হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মর্যদানুযায়ী অবস্থানগত ক্রমবিন্যাস, মুসলমান সমাজের কৃত্রিম বর্ণ-বিন্যাস এবং সাঁওতাল সমাজের গোষ্ঠীতন্ত্র সম্পর্কে বিশদভাবে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসূত নতুন জমিদারশ্রেণী গ্রামীণ সমাজের উপর কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিলেন যে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। এলাকার মানুষের আচার-আচরণ, প্রথা, খাদ্যাভ্যাস, বিবাহ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য হাজির করেছেন।

এদিকে অমিয় ঘোষের ক্ষেত্র, রাজনৈতিক ইতিহাস ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বীরভূম জেলার আঞ্চলিক অবদান। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন তাঁর গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য হলো, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরভূমের সাধারণ মানুষের অবদানের ইতিহাস উদ্ধার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

পর থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত বীরভূমের গান্ধীবাদী আন্দোলন, বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছেন। অমিয় ঘোষ* ও সুমিত ভট্টাচার্যের গবেষণানিবন্ধ দু'টি প্রকাশিত হলে বীরভূম জেলার ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে। সবশেষে বলা যেতে পারে, হান্টার থেকে শুরু করে সুমিত ভট্টাচার্য ও অমিয় ঘোষ পর্যন্ত - দেড়শ' বছরের কাছাকাছি সময়কালে বীরভূমের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ভারতের আধুনিক ইতিহাসচর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার এই সার্থক প্রয়াসগুলি নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারত ইতিহাস জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রামীণ ইতিহাস রচনার যে স্বপ্ন স্কটিশ সাহেব হান্টার দেখেছিলেন প্রায় দেড়শ' বছর পূর্বে, সে স্বপ্ন আজ সার্থক - হতে চলেছে।

সূত্র নির্দেশ

১) জে. ডব্লিউ. থমসন, *এ হিস্ট্রি অব্ হিস্টোরিক্যাল রাইটিং , খন্ড দুই : দ্য এইটিন্থ এ্যান্ড নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি* (উইথ কোলাবোরেশান অব্ বি. জে. হাস্) তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৪, নিউ ইয়র্ক, পৃ: ২৯৩।

২) ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, *দ্য এ্যানালস্ অব্ রুর‍্যাল বেঙ্গল*, উইথ্ এ্যাজেন্ডা, গভ: অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল রিপ্রিন্ট্,কলকাতা ১৯৯৬, পৃ: ২-৩।

৩) হান্টার, *ঐ* পৃ: ৪।

৪) ঐ, পৃ: ২-৩।

৫) হান্টার, ঐ, 'ডেডিকেশান্', পৃ: xvii

৬) আর. কে. বিশ্বাস, 'স্যার ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার : দ্য এ্যানালিস্ট অব্ দ্য সাইলেন্ট মিলিয়ন্স্ - হান্টার, ঐ, পৃ: viii।

৭) ঐ, পৃ: ix-xi।

৮) ই জি. ড্রেক-ব্রুকম্যান, *নোটস্ অন্ দ্যা আরলি এডমিনিস্ট্রেশান্ অব্ দ্য ডিষ্ট্রিক্ট্ অব্ বীরভূম*, গয়া, ১৮৯৮।

৯) আর. কে. গুপ্ত, *দ্য ইকনমিক্ লাইফ্ অব্ এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট্ : বীরভূম ১৭৭০-১৮৫৭*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ: viii।

১০) *বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট্ গেজেটিয়ার্স : বীরভূম*, বাই এল. এস. এস ও'মালি, কলকাতা, ১৯১০।

১১) *ফাইনাল রিপোর্ট অন্ দ্য সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট্ অপারেশান ইন্ দ্য ডিষ্ট্রিক্ট্ অব্ বীরভূম ১৯২৪-৩২*, বাই বি. বি. মুখার্জী, কলকাতা ১৯৩৭।

১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ইতিহাস* (প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ: ১৩৫।

১৩) ঐ, পৃ: ১৫৭-১৫৮।

১৪) গৌরীহর মিত্র, *বীরভূমের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, সিউড়ি, ১৩৪৩, 'নিবেদন', পৃ: ৯।

১৫) মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *বীরভূমের রাজবংশ*, হেতমপুর, ১৩১৬।

১৬) মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *বীরভূম বিবরণ*, প্রথম খন্ড, হেতমপুর, ১৩২৩, 'ভূমিকা', পৃ:(১)।

১৭) ঐ, 'প্রকাশকের নিবেদন', - পৃ: (১)।

১৮) ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, হেতমপুর, ১৩২৬, 'প্রকাশকের নিবেদন', পৃ, (১)।

১৯) গৌরীহর মিত্র, ঐ, প্রথম খন্ড, 'নিবেদন' - পৃ: ৯।

২০) ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, সিউড়ি ১৩৪৫।

২১) দেবকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি*, প: ব: সরকার, কলকাতা ১৩৭৯।

২২) এম. কে. মাইতি, *রিলিজিয়াস্‌, এ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ অব্‌ বীরভূম*, কলকাতা, ১৯৮৩।

২৩) এস. বন্দ্যোপাধ্যায়, *টেম্পলস্‌ অব্‌ বীরভূম*, দিল্লী, ১৯৮৪।

২৪) আর. কে. গুপ্ত, ঐ, পৃ: vii।

২৫) ঐ, পৃ: x।

২৬) এম. কে. সাঁতরা, *ল্যান্ড রেভেনিউ এ্যাডমিনিস্ট্রেশান ইন্‌ বেঙ্গল আন্ডার আরলি ব্রিটিশ রুল (এ কেস ষ্টাডি অব্‌ বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট, ১৭৬৫-১৮২০)*, দিল্লী, ১৯৯৪, 'প্রিফেস্‌', পৃ: ১।

২৭) এস. ভট্টাচার্য, *বীরভূম ইন্‌ দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি : এ সোশ্যাল ষ্টাডি*, অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. থিসিস, বিশ্বভারতী, ১৯৯৪।

২৮) অ. ঘোষ, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরভূম : ১৯১৯-১৯৪৭*, অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. থিসিস, বিশ্বভারতী, ১৯৮৯।

* অমিয় ঘোষের গবেষণানিবন্ধটি মাত্র কিছুদিন পূর্বে গ্রন্থাকারে, প্রকাশিত হয়েছে বলে শুনেছি। ছাপার অক্ষরেতা দেখার পূর্বেই প্রবন্ধটি পঠিত ও রচিত হয়ে গেছে।

নগরায়ণ ও সাঁইথিয়া - একটি সমীক্ষা

সুপর্ণা গুঁই

আধুনিকতা ও নগরায়ণকে সমার্থক বলে ধরা হয়ে থাকে, যদিও একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগরের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পরিকাঠামো ও গঠনগত শৈলীতে প্রাচীন বা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক নগরের পার্থক্য অবশ্যই আছে। হরপ্পা সভ্যতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে নাগরিক সভ্যতা হিসাবে। আবার পরবর্তী কালে তক্ষশীলা অথবা কৌশাম্বী যখন নগর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তখন তার পরিকাঠামোয় এসেছে পরিবর্তন। আদি মধ্যযুগের নগরগুলি গড়ে ওঠার পশ্চাতে বিদ্যামান ছিল "An extension of that of the countryside."[১] অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের সম্প্রসারণ। সুলতানি এবং পরবর্তীকালে মুঘল যুগের শহরের অর্থনীতি থেকেই যে নগরের উৎপত্তি হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, আর শহরের অর্থনীতি বলতে বোঝায় ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ছাড়া যে কারণটিকে নগরায়ণের উত্থানের জন্য দায়ি করা হয় তা হ'ল ধর্মীয় কার্যকলাপ। অধ্যাপিকা চম্পকলক্ষীর এই সংজ্ঞা আধুনিক নগরায়ণের পক্ষেও অনেকাংশে দায়ি বলে মনে করা যায়।

প্রথমেই একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো, আর তা হল নগর ও শহরের পার্থক্য। সিটি বা নগর এবং টাউন বা শহর এক জিনিষ নয়। সাঁইথিয়ার নগরায়ণ বলতে বোঝান হয়েছে একটি শহরে পরিণত হওয়ার কথা; প্রাক্ ঔপনিবেশিক বসতির অস্তিত্ব, ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে বসতি বিন্যাসের নতুন চেহারা, কাজকর্মের নিরীখে বিভিন্ন বৃত্তির সূচনা এই সবই হল ঔপনিবেশিক শহরের বৈশিষ্ট। প্রাক ঔপনিবেশিক সময় থেকে সাঁইথিয়া যখন শহরে পরিণত হল তখন তার সমস্ত বৈশিষ্টগুলিই বিদ্যমান। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে শহরের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা মোটামুটি এই রকম। যে কোন পৌরসভা সম্পৃক্ত জায়গা যেখানে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম নয়, উপরোক্ত এও বলা হয়েছে As far as possible to treat as towns in places which are of a more or less urban charecter.[২] জনসংখ্যার নিরীখে না হলেও ১৮৫৯ সালের পর থেকে সাঁইথিয়া যে চরিত্রগত দিক থেকে শহরে পরিণত হচ্ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অথচ বীরভূমের উপর লিখিত দুটি প্রধান আকর গ্রন্থে সাঁইথিয়ার অনুল্লেখ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গৌরীহর মিত্রের বীরভূমের ইতিহাস প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, আর বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি থেকে বীরভূম বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল বাংলার ১৩২৩ অর্থাৎ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে। এই বইএ নন্দীগ্রামের কথা বলতে গিয়ে বিবরণীকার তৃতীয় খন্ডে সাঁইথিয়ার বিষয়ে লেখার

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু প্রকাশিত তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে সাঁইথিয়ার কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত নানুর বক্রেশ্বর বা তারাপীঠের মত সাঁইথিয়ার অতীত ধর্মীয় খ্যাতি না থাকায় এবং প্রথাগত কোন রাজবংশের অনুপস্থিতির ফলে সাঁইথিয়া এই সব বিবরণীকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কাজেই তথ্য সূত্রের জন্য অনেকাংশই নির্ভর করতে হয়েছে মৌখিক ইতিহাসের উপর।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাঁইথিয়া শহরটি নগরায়ণের পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছিল এই ধর্মীয় কারণকেই সম্বল করে। ১৯০১ খ্রিঃ ও'ম্যালী যখন বীরভূম জেলার গেজেটিয়ার লিখছেন তখন সাঁইথিয়া সম্পর্কে তাঁর যে বিবরণ তাতে তাঁকে একটি সম্প্রসারিত গ্রাম হিসাবেই উল্লেখ করা হয়। সিউড়ী সদর শহর থেকে এগারো মাইল দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে এই গঞ্জটির জনসংখ্যা তখন মাত্র দু হাজার ছয়শো বাইশ। এই জনসংখ্যাকে কখনোই একটি নগরের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কিন্তু তখনই সাঁইথিয়াকে কেন্দ্র করে যে পরিকাঠামোটি তৈরি হয়েছিল তাতে একটি নগর হিসাবে গড়ে ওঠার সব শর্তকেই পূরণ করেছিল। ইতিমধ্যেই সাঁইথিয়া তখন জংশন স্টেশনে রূপায়িত। এটি একদিকে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের পথকে প্রশস্ত করেছিল, অন্যদিকে কয়লাখনি সমৃদ্ধ অন্ডাল অঞ্চলকে যুক্ত করেছিল। উপরন্তু পাকা সড়ক পথে সদর শহর সিউড়ীর সাথেও এটি যুক্ত ছিল। ১৯০১ সালেই এখানেই একটি ডাক ও তারঘর এবং পরিদর্শক বাঙলো বিদ্যমান ছিল।

এই আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠার আগে থেকেই অবশ্য সাঁইথিয়া গ্রাম থেকে গঞ্জে পরিণত হয়েছিল। তীর্থময় বীরভূমে সাঁইথিয়া একটি পীঠস্থান হিসাবে বহুকাল থেকেই পরিচিত। প্রাচীনতম শিব মন্দিরটি নন্দিকেশ্বর নামে পরিচিত। কথিত আছে যে এখানে সতীর গলার হাড় পড়ার ফলে বাহান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ হিসাবে স্বীকৃত। প্রতি বৈশাখ এবং পৌষ মাসের পূর্ণিমায় এখানে পুজো ও প্রসাদ বিতরণ হয় এবং পৌষ সংক্রান্তির শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় ব্রহ্মদৈত্যের মেলা। এর পাশাপাশি বিখ্যাত ছিল সাঁইথিয়ার শনিবারের গরুর হাট। দূর দুরান্ত এমন কি কাঁদি, মুর্শিদাবাদ থেকেও পাইকাররা এখানে গরু কেনা বেচা করতে আসতেন। বর্তমানে এটি স্থানান্তর হতে হতে নদীর ওপারে চলে গেছে বোলপুর রাজগ্রাম রাস্তার ধারে ব্যানার্জীদের আমবাগানে। এই পীঠস্থান উপলক্ষে যে বিপুল জনসমাগম হত সেটি সম্ভবত প্রাথমিক ভাবে সাঁইথিয়াকে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। মেলাকে কেন্দ্র করে যে জনসমাগম এবং সেই উপলক্ষে যে ব্যবসা বাণিজ্য যেটি স্থায়ীভাবে অনুষ্ঠিত না হলেও সাঁইথিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে প্রথম এই ভাবেই অগ্রসর হয়েছিল। ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্ম সম্প্রদায় জৈনরা দাবি করেন যে জৈন শাস্ত্রে উল্লিখিত "সিবইথিয়া" নগরী পরবর্তী কালে সাঁইথিয়া হয়। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে আরও জোরালো করার জন্য নিকটবর্তী মহম্মদবাজার ব্লকে খড়িয়ার ডাঙা নামক একটি ছোট পাহাড়কে মহাবীরের সাধন ক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে এখানে জৈন সম্প্রদায়ের একটি মন্দির ও ধর্মশালা নির্মিত আছে। এই বক্তব্যের পক্ষে তথ্য হিসাবে আরও বলা যায় বীরভূমে মহাবীর ধর্ম

প্রচারে জন্য এসেছিলেন এবং 'জৈন আচারঙ্গ সূত্র' অনুসারে তিনি অনেক জায়গায় স্থানীয় লোকদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিলেন।

উপরোক্ত পরিকাঠামোর সঙ্গে যখন রেল ও সড়ক পথের সংযোগ স্থাপিত হল তখন সাঁইথিয়ার একটি শহর হিসাবে গড়ে উঠবার পক্ষে আর কোন বাধা রইল না। একথা ঠিক যে জেলা হিসাবে বীরভূমের নগরায়ণের শর্তগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা থেকে অনুপস্থিত ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে বীরভূম রাজ পরিবার রাজস্বের দেনার দায়ে তীব্র আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল।৩

ঔপনিবেশিক শাসনে সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়ই যে মূলনীতি ছিল অথবা দ্বিতীয়বার বলার কোন প্রয়োজন নেই। রাজস্ব নীতি বা অন্যভাবে বলতে গেলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতিতে নগরায়ণের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ একেবারেই অসম্ভব ছিল। এই জেলার রাজস্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করে জনৈক আধুনিক গবেষক দেখিয়েছেন যে সামগ্রিকভাবে বীরভূমের জমিদারি সংকটের জন্য মূলত দায়ি ছিল ইংরেজ প্রবর্তিত রাজস্বনীতি, জমিদারি পরিচালনার অব্যবস্থার তত্ত্বকে বীরভূমের পরিপ্রেক্ষিতে অন্ততপক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

এই প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সাঁইথিয়া যে একটি নগর হিসাবে গড়ে উঠল তার মূল কারণ ছিল একদিকে মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনসমাগম, অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহিরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আগমন। আনুমানিক ১৮২৩ থেকে ৩৩শের মধ্যে গুনুটিয়ার রেশম কুঠির দেওয়ান রাম ঘোষ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে সাঁইথিয়ার লাট ক্রয় করেন। তখন এর নাম ছিল 'সাইত মহাল'।[৪] দাতা হিসাবে রাম ঘোষের সুনাম থাকায় তিনি এখানে অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। ১৮৫৯ খ্রি: রেললাইন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নদী তীরের এই গঞ্জ ধীরে ধীরে শহরে রূপান্তরিত হতে থাকে। আগমন ঘটে প্রভাবশালী গন্ধবণিক এবং মারোয়ারি জৈন সম্প্রদায়ের। ধীরে ধীরে তৈরি হয় চাল কল ও তেলের মিল। চালকলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাঙালি রামচরণ দত্তের বংশধর। এর পর মারোয়ারিরাও এই ব্যবসায় নিযুক্ত হন। এই চাল কল এবং তেলের মিলকে কেন্দ্র করেই বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদিবাসী শ্রমিকদের আগমন ঘটে।[৫] স্বভাবতই বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই জনসংখ্যার একটি চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বীরভূমের অন্যান্য অঞ্চল যখন শুধুমাত্র বাঙালি ও আদিবাসী অধ্যুসিত জায়গা হিসাবে গড়ে উঠেছিল সাঁইথিয়ায় সেখানে একটি মিশ্র জনসংখ্যার উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে একদিকে যেমন আছেন বহিরাগত মারোয়ারি সম্প্রদায় অন্যদিকে তেমনি আছেন বিহার থেকে আগত সিং বাহ্মণরা। রাজস্থান থেকে এসে মোহন ঠাকুরের পূর্ব পুরুষেরা তৈরি করেছিলেন মিষ্টির দোকান। তাছাড়া আছেন স্থানীয় সদগোপ সম্প্রদায় এবং ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে বসবাসকারী বাউরি, হাড়ি, বাগদি, মুচি ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। সাঁইথিয়ার আদি অধিবাসী ছিলেন সাহা ও শুঁড়ি সম্প্রদায়। পুরোন সাঁইথিয়ার পাড়াগুলির নাম থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা সাহাপাড়া, ছত্রিপাড়া ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মিশ্র

জনসংখ্যার কাছে তাদের আধিপত্য বিলীন হয়ে যায়। নগরায়ণের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট সাঁইথিয়ায় অবশ্যই বিদ্যমান। এই অঞ্চলের আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট হল যে এখানকার কোন বৃহৎ ভূস্বামী তাদের মূলধনকে ব্যবসার কাজে নিযুক্ত করেননি। বংশ পরম্পরায় মারোয়ারি এবং গন্ধগণিক সম্প্রদায়ই একচেটিয়া কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে।

ধর্মীয় অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য জমিদার, ভূস্বামী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রজাদের হিতার্থে তৈরি করেছিলেন - টোল, স্কুল, কলেজ, স্থাপন করেছিলেন মন্দির, মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন রাস্তাঘাট খনন করেছিলেন, জলাশয় এবং পত্তন ঘটিয়েছিলেন বাজার হাটের। পরোক্ষভাবে এগুলি যে নগরায়ণের পথ প্রশস্ত করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সূত্র নির্দেশ

১) ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় - আরবান সেন্টারস্ ইন আর্লি মিডাইভাল ইন্ডিয়া এ্যান ওভারভিউ। সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং রোমিলা থাপার সম্পাদিত সিচুয়েটিং ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

২) সেন্সাস অব ইন্ডিয়া - ভলিউম ওয়ান, পার্ট ওয়ান, পৃ. ৬৩।

৩) এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত গবেষণা গ্রন্থগুলি থেকে -

ক) ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার - দ্য এ্যানালস্ অব রুরাল বেঙ্গল, লন্ডন, ১৮৯৭।

খ) রঞ্জন গুপ্ত - দ্য ইকনমিক লাইফ অব এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট, বীরভূম ১৭৭০ - ১৮৫৭, বর্ধমান ১৯৮৪।

গ) মানস কুমার সাঁতরা - ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যাডমিনিসট্রেশন ইন বেঙ্গল আন্ডার আর্লি ব্রিটিশ রুল, দিল্লী ১৯৯৪।

৪) রাম ঘোষের বংশধর অরুণ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার - ১১ই ডিসেম্বর ২০০০।

৫) সেন্সাস অব ইন্ডিয়া ১৯৩১।

"দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বীরভূমের কৃষক আন্দোলনের চরিত্র"

পার্থ শঙ্খ মজুমদার

৪৫৬২.১৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বীরভূম জেলা প্রায় সর্বাংশে কৃষি নির্ভর। ১৯০১-র জনগণনানুসারে জেলার ৬৯% মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু ভৌগলিক ও উর্বরতাজনিত কারণে জেলার সর্বত্র সমানভাবে কৃষিকাজ হত না। ১৯২১ খ্রিঃ জেলায় এক ফসলি অসেচ জমি ছিল ৪৮২১০০ একর, দো-ফসলি অসেচ জমি ১৫০০০ একর এবং এক ফসলি সেচ এলাকা ২৭১১০০ একর। মৃত্তিকা ও জলসেচ জনিত সমস্যার কারণে আমন বা শীতকালীন ধান ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শস্য (সামগ্রিক কৃষির ৭৭%)। কৃষি সমাজের মধ্যে ছিল একাধিক স্তর এবং নানা ধরণের অতিরিক্ত কর ও কঠোর ঋণদান ব্যবস্থা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর প্রায় একই সময়ে বীরভূমে কৃষকদের দুই ধরণের আন্দোলন দেখা দেয়। একটি জমি জরিপ কাজে বাধাদান এবং অন্যটি ইউনিয়ন বোর্ডের ধার্য কর না দেওয়া।

জমি জরিপ কাজে বাধাদান আন্দোলন সংগঠনের প্রধান কৃতিত্ব রামপুরহাট নিবাসী কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়র। অনাবৃষ্টির কারণে বিগত কয়েক বছর কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ না হবার প্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক অভিখাত কৃষক সমাজের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলন সাধারণ মানুষের জাগরণও ঘটিয়েছিল। এই সময়ে শুরু হয় জমি জরিপের কাজ, যা কৃষি সমাজে ফসল নষ্টের আতংক সৃষ্টি করেছিল। কারণ তখনও মাঠে ফসল ছিল। জিতেন্দ্রলাল কৃষি সমাজের এই বিক্ষোভকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস করেছিলেন। ফলে কৃষকরা জমি জরিপ কাজে বাধা দিতে অগ্রসর হয়েছিল। আর এই বাধা সর্বাংশে অহিংসও ছিল না। কাকুরিয়া গ্রামে জরিপকারিদের পাথর ও ইট ছুঁড়ে বাধাদান করা হয়। সাঁইথিয়া থানার কয়েকটি গ্রামে জরিপকারিরা প্রহৃতও হয়। তবে যেহেতু এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা ছিল জিতেন্দ্রলালের সে কারণে নভেম্বর ১৯২১ খ্রি: তিনি গ্রেপ্তার হবার পর জমি জরিপ কাজে বাধাদান প্রতিবাদের অবসান হয়।

তুলনায় বড়মাত্রায় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল নবগঠিত ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক আরোপিত 'চৌকিদারি ট্যাক্স' নিয়ে। প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের উপর ভিত্তি করে এই কর ধার্যের নীতি গৃহীত হলেও সঙ্গতিপূর্ণ অপেক্ষা প্রান্তিক চাষিদের উপর ধার্য করের পরিমাণ ছিল তুলনায়

বেশি। বিপর্যস্ত কৃষি অর্থনীতির কারণে কৃষকদের কাছে এই নতুন কর মারাত্মক হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল আর তার ফলে প্রায় সমগ্র জেলা জুড়ে কৃষকরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই কর তুলে দেবার আবেদন করার মধ্য দিয়ে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'চৌকিদারি ট্যাক্স' বিরোধী আন্দোলনের শুরু হলেও খুব দ্রুত তা সহিংস ও জঙ্গি প্রতিবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। চৌকিদারি ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত মানুষদের সংখ্যা এবং তাদের প্রতিবাদের রূপ সম্বন্ধে ১৯২১ খ্রিঃ মে মাসে বীরভূম বাণী পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল- ''শত সহস্র বক্তৃতাতেও যে বীরভূমের ঘুমঘোর এতদিন কাটে নাই, স্বায়ত্তশাসন মতে প্রবর্তিত এক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রচলনেই সেই বীরভূম আজ জাগিয়া উঠিয়াছে।'' কৃষকদের উগ্রমূর্তির ভয়ে তিলপাড়া, বালিজুড়ি, মাঠপলশা, দমদমা প্রভৃতি ইউনিয়নের সদস্যারা পদত্যাগ করেছিল। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার মাধ্যমে সরকার কৃষক প্রতিরোধ ভাঙ্গার প্রয়াস করলেও শেষ পর্যন্ত ১৯২২-র ১৫ জানুয়ারি ইউনিয়ন বোর্ডগুলির প্রেসিডেন্টরা পৃথক ভাবে চৌকিদারি ট্যাক্স ধার্য না করার প্রস্তাব নিয়েছিল। মে ১৯২২ অবধি এই ট্যাক্স না দেবার ঘটনা ঘটেছিল।

অসহযোগ আন্দোলন ও কংগ্রেসের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এমনকি উদারপন্থী কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্রলালও এই অন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনকে যুক্ত করতে নিষেধ করেছিলেন। অর্থাৎ কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন বা নেতৃত্ব ছাড়াই এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে উঠেছিল। আর তা গড়ে ওঠার একটাই কারণ ছিল - সে মুহূর্তে কৃষকরা ট্যাক্স দিতে অক্ষম ছিল, তাই তারা চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে চায় নি।

এরপর থেকেই রাজনীতির সঙ্গে কৃষকদের সংযুক্ত করার ক্ষীণ প্রয়াস শুরু হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রিঃ লাঙলহাটা ও কীর্ণাহারে দুটি কৃষক সম্মেলনের কথা জানা যায়। এই সভাদুটিতে উপস্থিত ছিলেন হেমন্ত সরকার, সামসুদ্দিন প্রমুখ বহিরাগত নেতা। এই সময়ে জেলাতে রায়ত সভাও গঠিত হয়েছিল। এর পরেই প্রজা সম্মিলনী নামে একটি রাজনৈতিক সংঘ বীরভূমে গড়ে উঠেছিল যা সম্পূর্ণভাবে কৃষক স্বার্থে গড়ে না উঠলেও বিশ্বাস করতো - 'ভূমি-রাজস্বের নায্যকর ও গভর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট সেস ব্যতীত অন্য কোন কর আদায় দিতে প্রজা বাধ্য নহে।' জিতেন্দ্রলাল প্রমুখ জমিদাররা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সংগঠনের কাজ গোমস্তার অত্যাচারের প্রতিবিধান, জমিতে জল নিকাশের ব্যবস্থা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সংগঠনগত ভাবে প্রজা সম্মিলনী ১৯২৮-র প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের প্রতিবাদ করলেও ভাগচাষিদের স্বত্ব-অধিকার দেবার একটি সংশোধনীর বিরোধিতা করেছিলেন জিতেন্দ্রলাল।

আইন-অমান্য আন্দোলন কালে জুন১৯৩০ থেকে স্বল্পকালের জন্য কর বয়কটের একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। দুবরাজপুর থানার কর বন্ধকে কেন্দ্র করে কৃষকদের সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের সংঘর্ষও হয়েছিল। তবে কর বন্ধের ঘটনাগুলি জেলার নানা অংশে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটেছিল এবং এক্ষেত্রে কংগ্রেস সংগঠনের কোন বড় কৃতিত্বও ছিল না। ১৯২৯-র শেষ ভাগ থেকে দেখা দেওয়া অর্থনৈতিক মন্দা কৃষিজদ্রব্যের দাম অনেকাংশে কমিয়ে দেওয়ায় বৃদ্ধি

পেয়েছিল রাজস্ব, খাজনা ও সুদের বোঝা। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে কংগ্রেস কর্মীদের বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় নি। নিজেদের অবস্থাগত কারণেই কৃষকেরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। আর সম্ভবতঃ সেই কারণেই কর বন্ধ আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস ছিল না।

আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রত্যাহার, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার ও গঠন মূলক কাজে কংগ্রেসের আত্মনিয়োগের ফলে ১৯৩৩-৩৬ সময়কালে জেলায় কোন রাজনৈতিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ১৯৩৭ খ্রিঃ থেকে।

১৯৩৬ খ্রি:, সর্বভারতীয় কৃষক সভা গঠিত হবার পর ২৭-২৮ মার্চ ১৯৩৭ পাত্রসায়রে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন। এই সম্মেলনে খয়রাসোলের নজরবন্দী বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তের আগ্রহে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় ভূদেব দাস ও অর্জুন মন্ডল। এই বছরেই খয়রাসোলে গোবিন্দ মিত্রকে সম্পাদক করে গঠন করা হয়েছিল একটি কৃষক সমিতি। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মতো দ্রুত এই সমিতি ইউনিয়নগুলিতে কৃষক সমিতি গঠন করেছিল।

১৯৩৭-৩৮ সময়ে বারটি ইউনিয়নে সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৫৯। এর মধ্যে বিভিন্ন জাতির সদস্য ছিল নিম্নরূপ - ব্রাহ্মণ-৫৬, সদগোপ-২৮০, সাঁওতাল সহ নিচুজাতি ভুক্ত - ২৬৮। উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে সংগঠনে মূলতঃ প্রান্তিক চাষি ও খেত মজুরদের সংখ্যাধিক্য ছিল। এর কারণ তাদের অবস্থা তখন খুব খারাপ ছিল। ফলে কৃষি ভিত্তিক কর্মসূচি নিয়ে কৃষক সংগঠনের কর্মীরা এগিয়ে আসায় স্বাভাবিক ভাবেই ছোট চাষি ও খেত মজুররা তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

১৯৩৮-র মার্চ মাসের পর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বীরভূমের কৃষক সমিতির দুটি পৃথক জেলা কমিটি গড়ে ওঠে। এই দুই কমিটিতেই অনেক কংগ্রেসি নেতাদের দেখা যায়। এরা মার্চ ১৯৩৮ বিভিন্ন কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে কারাগারে প্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার আলোকে কৃষক সংগঠনগুলিতে যুক্ত হয়েছিল। তবে সম্ভবত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির নির্দেশে বীরভূমের দুটি কমিটি একত্রিত ভাবে ইউনিয়নগুলিতে কৃষক সমিতি গড়ে তুলেছিল। ১৯৩৮-র এপ্রিল মাসেই সিউড়ি মহকুমা এবং জেলা কৃষক সম্মেলন সংগঠিত হয়েছিল। এই দুই সম্মেলনে তুলে ধরা হয়েছিল জমিদারি ব্যবস্থার অবসান, পতিত কৃষিজমির খাজনা মকুব, শুখার সময়ে খাজনা মকুব, চলতি বছরে ৫০% খাজনা হ্রাস প্রভৃতি দাবি।

এই সময় থেকেই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের একটি কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বোলপুরের কাছে অবস্থিত 'আমার কুটীর' প্রতিষ্ঠান। ১৯২৬ খ্রি: প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা ১৯৩৮ খ্রিঃ বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা আমার কুটিরকে কেন্দ্র করে কৃষকদের সংগঠিত করতে প্রয়াসী হয়। এখানে সৌমেন্দ্রনাথের কমিউনিষ্ট লিগ এবং সি. পি. আই দলের অনুগামীরা একই সঙ্গে বাস করত, অবশ্য লিগপন্থীদের সংখ্যা তুলনায় বেশি ছিল।

এই সংখ্যাধিক্যের কারণে লিগপন্থীদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছিল তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে কৃষকদের সংগঠিত করা। তাদের লক্ষ্য ছিল কৃষকসভা গঠন ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের শ্রেণী সংগ্রামের জন্য সচেতন করে তুলে সামরিক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তোলা এবং সময়মতো বিপ্লব সংগঠন করা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কৃষক সভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে উনিশটি নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিল।

কৃষকদের সংগঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে লিগপন্থীরা স্থানীয় ক্ষোভ নিয়ে সংগ্রামী কৃষক আন্দোলন পরিচালিত করেছিল। দর্পশীলা, শ্রীচন্দ্রপুর, জিনাইপুর, রূপপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত। যেহেতু লিগ সদস্যরা বেশিরভাগ ছিলেন প্রাক্তন বিপ্লবী, সে কারণে কৃষকদের বিবিধ সমস্যার প্রশ্নে সহজেই তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে আক্রমণমুখী অবস্থান নিত।

অন্যদিকে সি. পি. আই দলের সঙ্গে যুক্ত নেতারা অতটা জঙ্গি ছিলনা। সেকারণে কীর্ণাহারের জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও ডাঃ রাধানাথ চট্টরাজ প্রমুখ নেতারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বৈধ ও অহিংস প্রতিকারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে বলেছিল। সম্ভবতঃ এরা বেশিরভাগ কংগ্রেস থেকে এসেছিল বলে তাদের মধ্যে জঙ্গিত্ব কম ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বড়ো ধরণের পরিবর্তন ঘটে। সি. পি. আই পন্থীরা যুদ্ধবিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সৌমেন্দ্রনাথ পন্থীরাও যুদ্ধের সুযোগে কৃষক শ্রমিকদের নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সামরিক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে গণবাহিনী গঠনে অগ্রসর হয় তারা। এই মত পার্থক্যের কারণে উভয় দলের অনুগামীদের মধ্যে ফাটলের সূত্রপাত ঘটে। সৌমেন্দ্রপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির চিন্তাভাবনার পার্থক্য থাকায় আমার কুটিরের সর্বাধিনায়ক সুবেন মুখার্জী কালিপদ বশিষ্ট প্রমুখ সি. পি. আই পন্থীদের সৌমেন্দ্রপন্থীদের কার্যকলাপ অনুসরণের নির্দেশ দিলে সি. পি. আই পৃথক অস্তিত্ব রক্ষায় যত্নবান হয়। ফলে বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর দুটি দলের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই শুরু হয়। আর এই দুই দলের রাজনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা গঠিত হয় দুই দলের কৃষক সংগঠনের চরিত্র।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে সর্বভারতীয় ধারানুযায়ী ১৯৩৭-র আগে কৃষক স্বার্থে তাদের সংগঠিত করার কোন প্রয়াস হয় নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার আন্দোলনের কর্মসূচিতে কৃষকদের দাবি অন্তর্ভুক্ত করলেও এক্ষেত্রে বীরভূমের নেতাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়। সেকারণে অসহযোগ আন্দোলন কালে বীরভূমে দুটি কৃষক বিক্ষোভ দেখা গেলেও কোনটির সঙ্গেই সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল না। জমি জরিপের বিরোধিতার ক্ষেত্রে জিতেন্দ্রলাল যুক্ত থাকলেও এই অবস্থান তিনি কৃষক স্বার্থে গ্রহণ করেন নি - করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতার জন্য। অন্যদিকে ইউনিয়ন বোর্ড ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তিনি

চৌকিদারি কর বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে ও কংগ্রেসকে যুক্ত করেন নি। কিন্তু এই ইউনিয়ন বোর্ডের করের বিরুদ্ধেই কংগ্রেস নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহাকুমায় অসহযোগ আন্দোলন কালে বড় ধরণের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

১৯২২-৩২ সময়কালে কৃষি ক্ষেত্রে কোনো আন্দোলন দেখা যায় নি। প্রজা সম্মিলনী প্রজাস্বার্থের কথা বললেও কর্মসূচির ক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সতর্ক। ভাগচাষিদের অধিকারদানের বিরোধী ছিল তারা। এক্ষেত্রে সম্মিলনীর নেতৃত্বের চরিত্রও অত্যন্ত অর্থবহ। প্রধান নেতা জিতেন্দ্রলাল ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করেন নি। অন্যদিকে অবিনাশচন্দ্র প্রমুখ যে জমিদাররা সম্মিলনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা ইউনিয়ন বোর্ডের পদাধিকারীও ছিলেন। এই কারণে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত অর্থবহ।

১৯৩০ সময়কালে কৃষি সমাজের বিপর্যস্ত অবস্থা ও আইন-অমান্য আন্দোলনজনিত জাগরণের সুবিধা গ্রহণে বাংলার অন্য স্থানের মতো বীরভূম জেলার কংগ্রেস অগ্রসর হয় নি। এই সময়ে কর বন্ধের যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেগুলি অনেকটাই ছিল কৃষক সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ।

১৯৩৭ থেকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ কৃষকদের সংগঠিত করার প্রয়াস শুরু হয়। আর এক্ষেত্রে বহিরাগত প্রাক্তন বিপ্লবীরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মূলতঃ পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তির সাংগঠনিক ক্ষমতার কারণেই রাজনৈতিক দলগুলি জেলার এক বড়ো অংশের কৃষকদের সংগঠিত করতে পেরেছিল। এই পর্যায়ে কমিউনিষ্ট লিগ ও সি. পি. আই কৃষক সংগঠনগুলি জমিদারি প্রথার অবসান, খাজনা হ্রাস প্রভৃতি কেন্দ্রীয় দাবি নিয়ে কাজ করেছিল। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই দুই দলের কমিউনিষ্টরা একসঙ্গে কাজ করত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সে ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত বীরভূমের কৃষকদের প্রতিবাদী হয়ে উঠতে বাধ্য করেছিল। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বীরভূমের কৃষক আন্দোলনের ধারাকে বড়ো পরিবর্তনের সামনে এনেছিল।

আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছিল আন্দোলনের লক্ষ্যেরও। ১৯৩৭ খ্রি: পর্যন্ত কেবলমাত্র ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে কৃষকদের সংগঠিত করত কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। কিন্তু ১৯৩৭-৩৯ সময়কালে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন গুলির মূল লক্ষ্য ছিল কৃষক শোষণের অবসান ও ঔপনিবেশিক শাসকদের সমর্থক জমিদারের উচ্ছেদ সাধনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তির ভিতকে দুর্বল করা। জমিদারদের তারা শ্রেণীশত্রু হিসাবে চিহ্নিত করত এবং সংগঠনের নেতারা বিশ্বাস করত জমিদারি ব্যবস্থার পতনের ফলে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা কৃষক সংগঠনের লক্ষ্যে পুনরায় পরিবর্তন আনে। এই সময় থেকে জেলার কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বা কমিউনিষ্ট লিগ পন্থীরা বিশেষ লক্ষ্য পূরণের জন্য

কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে অগ্রসর হয় — ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার।

সূত্র নির্দেশ

১) অমিয় ঘোষ - জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম, ১৯১৫-১৯৪৭।
২) দুর্গা ব্যানার্জী - স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে বীরভূম।
৩) সুমিত সরকার - আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭
৪) গোয়েন্দা বিভাগের নানা প্রতিবেদন।
৫) সমসাময়িক পত্রিকা বীরভূম বার্তা ও বীরভূম বাণী।
৬) L. S. S. O'Malley - Birbhum.
৭) Ashoke Mitra - An Account of Land Management in West Bengal 1870-1950.

সারাংশ

"বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে বীরভূমের মহান্ত দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসী ও পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অবদান।"

বুদ্ধদেব আচার্য

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনীতি সচেতন মানুষ থেকে সাধারণ বাঙ্গালি সমাজ অংশ গ্রহণ করলেও জয়দেব কেন্দুবিল্ব নিম্বার্ক আশ্রমের মহান্ত দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসী (১৮৯৭-১৯২০ খ্রিঃ) বঙ্গের এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এছাড়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন-পত্রালাপ, সুরেন্দ্রনাথের ৭০ নং কুলুটোলা স্ট্রীটের বাড়িতে যাতায়াত যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এবং সুরেন্দ্রনাথের জয়দেব কেন্দুবিল্ব এলাকা আগমণ ও গ্রামে গ্রামে স্বদেশী প্রচার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান্ত দামোদর ব্রজবাসী কে হত্যা করা এক রহস্যপূর্ণ ঘটনা অবশ্যই। দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসী শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না তিনি সাহিত্য অনুরাগীও ছিলেন। তাঁর সাহিত্য অনুরাগের কাহিনী এই প্রবন্ধের আলোচনা করা হয়েছে।

পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের নিবাস ছিল বীরভূমের মঙ্গলডিহি-বাতিকারের নিকট কুরমিঠা গ্রামে। লেখাপড়া উচ্চ প্রাইমারি-সাহিত্যে হাতেখড়ি পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ও শিবরতন মিত্রের কাছে। বীরভূম সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা 'বীরভূমি'তে লেখা শুরু করেন। এরপর হেতমপুর রাজ-মহিমানিরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয়-বীরভূম বিবরণ রচনা, রাজ আনুকূলে গ্রাম অনুসন্ধান, ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করার কাজ শুরু করেন। শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের, এরপর স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ, কোলকাতা গমন, দামোদর ব্রজবাসী ও সুরেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসা ও সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ, বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণেতা।

স্বদেশী আন্দোলনের বঙ্গীয় রূপ ও নিজস্ব শৈলী নিয়েও এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আত্মকথা অবলম্বনে 'বন্দেমাতরম' প্রসঙ্গও এ প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে।

মুর্শিদাবাদের সমাজ ঃ আঠারো ও উনিশ শতক

দেবশ্রী দাশ

সুবে বাংলা রাজধানী হওয়ায় মুর্শিদাবাদের সমাজের বিভিন্ন দিক আলোকিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ গবেষণা-গ্রন্থের আলোচনায়। রজনকান্ত রায়ের পলাশীর ষড়যন্ত্র (কলকাতা, ১৯৯৮), সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর Life and times of Cantoo Babu; the banian of Warren Hastings (Calcutta-1978) এবং History of Cossimbazar Raj (Calcutta - 1986), কে এম. মহসীনের A Bengal district-in Transition : Murshidabad 1765-1793 (Dacca, 1973), গৌতম ভদ্রের Social groups and relations in the town of Murshidabad 1765-1793 (1976) শীর্ষক প্রবন্ধে মুজিবর রহমানের অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, Muslim casts in rural West Bengal: a study with special reference to the district of Murshidabad (1980), কিশোর রায়চৌধুরীব অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ মুর্শিদাবাদ জেলার আর্থ-সামাজিক রূপান্তর (১৭৬০-১৮৮৫)-১৯৯৬, ওয়াকিল আহমেদের মুসলিম বুদ্ধিজীবী (ঢাকা, ১৯৮৫), অভিজিৎ ভট্টের অপ্রকাশিত M. Phil, গবেষণা গ্রন্থ In Migrants community in culture contact, A study of the Marawari Community of Jiaganj Azimganj Municipal areas (1986) মুর্শিদাবাদের সমাজ জীবনের নানাদিক আলোকিত করেছে। আমার লেখাতে মুর্শিদাবাদের সমাজের কোন নূতন রূপান্তর দেখানোর প্রয়াস নেই। বোর্ড অফ রেভেনিউ (১৭৮৬-১৮২২), রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট (১৭৭৫-১৮১৫), জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট (১৭৯৩-১৮৫৩), পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (১৮৩৪-১৮৪৪), জেনারেল ডিপার্টমেন্ট (১৮৫৮-১৮৯৯) এবং গঙ্গাধর দাসের লেখা কিরীটী মঙ্গল (১২১৬ বঙ্গাব্দ) এবং মহারাষ্ট্র পুরাণ পুঁথি থেকে পাওয়া তথ্য উপরোক্ত, গবেষকদের দেখা সমাজে নতুন মাত্রা যোগ করেছে মাত্র। মুর্শিদাবাদের সমাজে ব্রাহ্মণদের অবস্থা, বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের সামাজিক অবস্থান, বৈষ্ণব আখড়াগুলোর সামাজিক ভূমিকা, মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের বিভিন্ন চিত্র, জমিদারদের ভূমিকা সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করেছি।

ক) মুর্শিদাবাদের সমাজে ব্রাহ্মণদের অবস্থা ঃ ব্রাহ্মণরা মুর্শিদাবাদের সমাজে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে তাঁদের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণে তাঁদের পারঙ্গমতার তারতম্য অনুসারে সামাজিক মর্যাদার হের-

ফের হত। তাঁরা চতুষ্পাঠী রাখতেন। ছাত্ররা বিনাব্যয়ে এই সমস্ত চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনা করত। এই সমস্ত চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণরা নিষ্কর জমি ও বৃত্তিলাভ করতেন জমিদারদের কাছ থেকে। মুর্শিদাবাদের বড়নগর, সৈদাবাদ, মহুলা, কাশিমবাজারের পণ্ডিতরা চতুষ্পাঠী রাখার জন্য বৃত্তিলাভ করতেন। তাঁরা সামাজিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বের নিরসন করতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়ে এঁরা অনেকেই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন। সৈদাবাদের সদাশিব ভট্টাচার্য, রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য; বড়নগরের মহাদেব ন্যায়বাগীশ, শ্রীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, মউলার কাশীনাথ সার্বভৌম সহ অনেকেই এই অবস্থার সম্মুখীন হন।[১]

খ) বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের পরিচয় ঃ আঠারো শতকের মুর্শিদাবাদে বসবাসকারি প্রায় সাঁইত্রিশ রকমের বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের তালিকা পাওয়া যায় ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ বিচার বিভাগীয় তথ্যে। এই বৃত্তিজীবীরা হলেন মুদি, হালুই, মোদক, পশারি, কলু, শাঁখারি, সোনারি, তামাক-ব্যবসায়ী, কাঁসারি, কাগজি, বিসতীজ যোগী, বেলদার, গাড়োয়াল, হুঁকা-ওয়ালা, ভিস্তী, কুমোর, ভারী, মোলি, চুনারি, মোল্লা-ফেরুস, খুচরো কাপড়-ব্যবসায়ী, হাটের ডিলার বা আড়ৎদার, দালাল, কর্মকার, ব্যাঙ্কার, মহাজন, গোলাদার, সাধারণ ব্যবসায়ী, শস্য ব্যবসায়ী, লবণ-ব্যবসায়ী, আয়রণ ফাউণ্ডার বা বিবিধ লৌহদ্রব্য নির্মাণকারি, বস্ত্র-ব্যবসায়ী, তুলা ব্যবসায়ী, কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী, প্রথম শ্রেণীর চিনি প্রস্তুত কারক, দ্বিতীয় শ্রেণীর চিনি প্রস্তুতকারক, পিতল-কাঁসার বড় ব্যবসায়ী। এই সমস্ত ব্যক্তিদের ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৭,৯১৪ টি দোকান ছিল মুর্শিদাবাদে। এদের মধ্যে সর্বাধিক দোকান ছিল মুদিদের।[২]

গঙ্গাধর দাসের কিরীটীমঙ্গলে মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ দেবী কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্যবর্ণনা আছে। দেবী কিরীটেশ্বরীকে এক শাঁখারি শাঁখা পরাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। সেই পুণ্যবান শাঁখারিকে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী তাঁদের দান-সামগ্রীতে পরিতুষ্ট করেছিলেন। এই বৃত্তিজীবীদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত, তাঁরা দান করেছিলেন টাকা। তন্তুবায় কাপড়, নবশাখ কাঁসা, দোকানিরা দানপত্র, স্বর্ণবণিক তার সামগ্রী, সূত্রধর খাসা ধানের চিঁড়া এবং ঘাটমাঝি পঞ্চডিঙ্গা উপহার দিয়ে শাঁখারির পুণ্যের অংশীদার হতে চেয়েছিল।[৩]

গঙ্গাধরের মহারাষ্ট্র পুরাণেও বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর পরিচয় পাওয়া যায়। আঠারো শতকের প্রথমভাগে মারাঠা বর্গিদের আক্রমণে সমস্ত রাঢ় অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছিল। বর্গিদের আক্রমণে যে সমস্ত বৃত্তিজীবী তাদের বৃত্তি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে মহারাষ্ট্র পুরাণে।

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাত্র কত নিক্তি হড়পি লইয়া।।

গন্ধ বণিক পলাত্র দোকান লইয়া জত।

তামা পিতল লইয়া কাসারি পলাত্র কত।।

কামার কুমার পলাত্র লইয়া চাক নড়ি।

জাউলা মাউছা পলাত্র লইয়া জাল দড়ি।।

সঙ্ক বণিক পলাত্র করাত লইয়া জত।

চতুর্দিকে লোক পলাত্র কি বলিব কত।।"[৩]

আঠারো শতকের মুর্শিদাবাদে এই বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের উপস্থিতি মুর্শিদাবাদের স্বচ্ছল অর্থনীতির পরিচয় বহন করে। উনিশ শতকেও এঁরা মুর্শিদাবাদের সমাজভুক্ত ছিলেন।

গ) নবাব পরিবারের সামাজিক চিত্র ঃ আঠারো-উনিশ শতকের মুর্শিদাবাদের অন্যতম শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ নবাব পরিবারের বিশেষ পরিচয় মেলে সংগৃহীত তথ্যে। আঠারো শতকের বেগমদের অন্যতম হলেন সুজাউদ্দিনের বেগম জেবুন্নিসা। তিনি তাঁর স্বামীকে শাসনকার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন। সুজাউদ্দিনের কন্যা ও দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁর পত্নী দরদানা বেগম আলিবর্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণাদান করেন। আলিবর্দী-পত্নী কখনো কখনো স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেও আসতেন।[৫] এই বেগমদের দানশীলতা ও ধর্মপ্রাণতা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। — তাঁরা মসজিদ, ইমামবাড়া নির্মাণ করেছিলেন এবং সমাধি-সৌধ রক্ষণা-বেক্ষণের কাজে নিরত ছিলেন।[৬] আলিবর্দীর মাতা দায়িত্ব নিয়েছিলেন লঙ্গর খানার। তার ব্যয় নির্বাহ হত খাস তালুক ভাণ্ডার দহের রাজস্ব ও নবাবগঞ্জের আয় হতে।[৭] মির জাফর পত্নী মণিবেগম নির্মাণ করেছিলেন ইমামবাড়া, মসজিদ। নবাব পরিবারের মহিলারা হজের জন্য মক্কা যাত্রা করতেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গঙ্গাতীরে ভ্রমণও তাঁদের নিষিদ্ধ ছিল না।[৮]

উনিশ শতক থেকে নবাব পরিবারের চিত্র অন্যরকম। নবাব পরিবারের সদস্যারা এইসময়ে ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুখাপেক্ষী। কলকাতার জৌলুষে নিজেদের ব্যয় বাড়িয়ে ঋণগ্রস্ত হন। নবাব রোশন-উদ-দৌল্লা কোম্পানির কাছে ৪০০০ টাকা ঋণ নিতে বাধ্য হন।[৯] ব্যভিচার আঠারো শতকেও অজানা ছিল না নবাব পরিবারের জেনানা মহলে। কিন্তু উনিশ শতকে তা আরো প্রকট হয়ে ওঠে।[১০] বহু বেগম নিম্নপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হলে তাঁকে দেউড়ির মহিলা প্রধানার পদ থেকে অপসারিত করা হয়।[১১] বেগম মহলে এই অনিয়ম দূর করার জন্য নবাব আগেই শরণাপন্ন হন কোম্পানির কাছে। গভর্নর-জেনারেলের এজেন্ট মেলভিল এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য নবাব পরিবারের বিধবাদের পুনর্বিবাহ চালু করার বিধান দেন। বিধবা-বিবাহ নবাব পরিবারে চালু ছিল না। এর সমর্থনে কোন শাস্ত্রীয় অনুশাসন তাঁরা উল্লেখ

করেননি। ইসলামীয় আইন অনুসারে বিধবা বিবাহ চালু ছিল এবং এর উপর কোন ধর্মীয় বাধা-নিষেধ ছিল না। তাছাড়া বর্ষায় নদীতীরে যাবার যে প্রথা ছিল তা তুলে দেবার ব্যবস্থা করেন লোকনিন্দার ভয়ে।[১২]

নবাব তাঁর কন্যার বিয়ের পণ হিসাবে দেড় লক্ষ টাকা নিজামত ফাণ্ড থেকে দাবি করেন। কিন্তু কোম্পানি এই টাকা পণ হিসাবে দিতে রাজি ছিল না। ৫০ হাজার টাকা মেয়ের বিয়ের খরচ হিসাবে এবং ৫০ হাজার টাকা ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য সঞ্চয়ের কথা বলেন।[১৩] উনিশ শতকেও (১৮৩৮) বেগমদের মক্কা ও কারবালাতে তীর্থ করতে যাবার ধারা অব্যাহত থাকে। নবাব রশন-উদ-দৌল্লা তাঁর কলকাতা বাসকালে দুর্গাপূজাতে উপস্থিত ছিলেন এবং তাই সংবাদ কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[১৪]

ঘ) মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব আখড়া : পশ্চিমবঙ্গ মহাফেজ খানায় রক্ষিত গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল এবং বোর্ড অফ রেভিনিউ থেকে মুর্শিদাবাদের একটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় মেলে। সমস্ত আঠারো ও উনিশ শতক ধরে এই প্রতিষ্ঠানগুলো মুর্শিদাবাদে সক্রিয় ছিল এবং সমাজশক্তিকে তারা দীর্ঘদিন অব্যাহত রেখেছিল। মুর্শিদাবাদের প্রায় শতাধিক বৈষ্ণবকেন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আখড়ার সন্ধান পাওয়া যায় এই জেলাতে। আখড়াগুলোর মহান্তরা কেউ ছিলেন সন্ন্যাসী কেউ বা গৃহী। গৃহীরা সাধারণত সেবাইত নামে পরিচিত ছিলেন। বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলির ব্যয় নির্বাহ হত জমিদারদের দেওয়া ভাতা বা নিষ্কর জমির উৎপন্ন ফসলের দ্বারা। পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই ভাতা দেবার অধিকারী হন। বাংলার নাবাবরাও অনেকেই এই আখড়াগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদের ভাতা বন্ধ করার উপক্রম করলে নবাব বৈষ্ণবকেন্দ্রের মহান্তদের পক্ষে আর্জি পেশ করেন এবং এই আখড়াগুলোর ধর্মীয় ও সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে কোম্পানিকে অবহিত করান।[১৫]

এই সমস্ত বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলোতে মহিলারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা বৈষ্ণব সমাজের নেত্রীপদে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। তিনি বৈষ্ণবপদও রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণব সমাজের মহিলারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের যেমন অধিকারিণী ছিলেন তেমনি পিতার মৃত্যুর পর বৈষ্ণব কেন্দ্রের সেবাইত পদেও নিযুক্ত হতে পারতেন এবং ঐ কেন্দ্রের ভাতা বা পেনসন পাবার অধিকারিণীও ছিলেন।[১৬]

বৈষ্ণবকেন্দ্রগুলি মুর্শিদাবাদের সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আঠারো শতকের আগে থেকেই মুর্শিদাবাদে এই কেন্দ্রগুলি ছিল। কিন্তু আঠারো শতক

থেকে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আখড়ার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এই আখড়াগুলো তাদের দৈনন্দিন খরচ মেটাবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ লগ্নী করেছিল। এমনকি অনেকেই জমিদারি ক্রয় করেছিল।

দায়িত্ববান অভিভাবকের যত্ন নিয়ে এই বৈষ্ণবকেন্দ্রগুলি দরিদ্র ও আতুরদের সেবা করত। আখড়াগুলি দরিদ্র-আতুরদের সেবা করত। আখড়াগুলি দরিদ্র আতুরদের সেবায় বিশেষ মনোযোগী ছিল। তারা টোল স্থাপন করে সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটিয়েছিল। মহান্তরা লৌকিক ঔষধপত্র দিয়ে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছিল। বৈষ্ণবকেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত ছিল বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান। তারসঙ্গে যুক্ত থাকত মেলা যেগুলি ছিল সমস্ত গ্রামের আনন্দের প্রাণকেন্দ্র। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড এই গ্রামীণ মেলাগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। যাত্রা, আলকাপ, কবিগান পুষ্টিলাভ করত এইসকল অনুষ্ঠানে। ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়াকে এইকেন্দ্রগুলি নিয়ন্ত্রিত করেছিল। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে সহজ ও সুন্দর করাতে তাদের বিশেষ অবদান ছিল।

ঙ) জমিদারদের ভূমিকা ঃ আঠারো ও উনিশ শতক ধরে মুর্শিদাবাদের জমিদার শ্রেণী মুর্শিদাবাদের সমাজে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদ নগরী ও তার নিকটস্থ অঞ্চলে বড় বড় জমিদারি গড়ে উঠেছিল। এছাড়া কিছু ছোট জমিদারি, জায়গিরদারি ও হুজুরি তালুকদারিও ছিল। কিন্তু দ্বৈত শাসনের সময় রেজা খানের কঠোর রাজস্ব সংগ্রহ নীতির ফলে বড় জমিদারিগুলো ভেঙে যেতে শুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। এই সময়ে গড়ে ওঠা জমিদারিগুলোর অন্যতম হল গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কান্দী জমিদারি, দেবীসিংহের নশীপুর জমিদারি, বনোয়ারীবাদে দানিশমন্দ ও নিত্যানন্দ পরিবারের জমিদারি, চোয়াঁর সর্বাধিকারী পরিবারের জমিদারি, মহারাজ নন্দকুমারের কুঞ্জঘাটা পরিবারের জমিদারি এবং বহরমপুরের সেন পরিবারের জমিদারি। এই সমস্ত জমিদারি পরিবারের প্রতিষ্ঠাতারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে যুক্ত ছিলেন। প্রচুর অর্থের মালিকও হয়েছিলেন তাঁরা। সেই অর্থ তাঁরা জমিদারি কেনায় ব্যয় করেন। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দেও নতুন নতুন জমিদারির পত্তন হয়। আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জের নাহার, দুধোরিয়া, দুগার, সিং, নওলাক্ষা, নাহার পরিবার জমিদারি কেনে। কিন্তু তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও মহাজনি কারবারও অব্যাহত রাখে। ১৮৩০ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নীলচাষ বিশেষভাবে গড়ে ওঠে এই জেলায়। নীলকররা ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ২৩টি জমিদারি কেনে। উনিশ শতকের এইভাগেই নবাব পরিবার জমিদার হিসাবে স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ ১৮৩৬ থেকে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মুর্শিদাবাদে কমবেশি ২৫০০ এর মত জমিদারি ছিল।[১৭]

আঠারো শতকের তিনজন জমিদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁরা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজধারাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছিলেন। রাজসাহীর জমিদার রানি ভবানী বড়নগরে তাঁর বৈধব্যজীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি ভাতা হিসাবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্রাহ্মণ পুরোহিত, গঙ্গাতীরবাসিনী বিধবা, শ্রীক্ষেত্রের মহান্ত ও সেবাইত, গয়াক্ষেত্রের গয়ালী, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দান করছিলেন।[১৮] এইদানকে স্থায়ী করার জন্য সমপরিমাণের জমি তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দান করেছিলেন। মহারাজা, রাজবল্লভ আঠারো শতকের প্রথমভাগের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর বাসভূমি রাজনগরকে (এখন বাংলাদেশ) সুসজ্জিত করেছিলেন বিরাট দীঘি খনন করে এবং মন্দির ও টোল স্থাপন করে। তিনি অগ্নিস্তোম ও বাজপেয়ী যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর কন্যা অভয়া বিধবা হলে তার পুনর্বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বিরোধিতায় তা ফলপ্রসূ হয়নি।[১৯] নবাবদের লঙ্গরখানাও, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেছিলেন।[২০] জঙ্গীপুরের ম্যানেজার এলিয়টের দেওয়ান কীর্তিচাঁদের জমিদারি জঙ্গীপুরে। তিনি বৃন্দাবনবিহারীর নামে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের পূজা নির্বাহের জন্য দেবোত্তর জমিদান করেছিলেন এবং সন্ন্যাসীদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।[২১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যেসব জমিদারির পত্তন হয়েছিল তাঁদের অধিকাংশই দেবসেবায়, দরিদ্র আতুরদের দানে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নিরত থাকতেন। কিন্তু নিজেদের অপরিমেয় ধনরত্নেরও জাহির করতেন বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে ব্যয় করেছিলেন ২০ লক্ষ টাকা। কান্তবাবুর পৌত্রের বিবাহে আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য এসেছিলেন নবাব এবং গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং। কান্দীর মহারাজা আঠারো থেকে কুড়িটি বোট ভরতি করে সাতশো থেকে আটশোটি সঙ্গী নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন।[২২]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে জমিদারদের কার্যকলাপে পরিবর্তন দেখা যায়। রানি স্বর্ণময়ী তাঁর দেওয়ান রাজীব লোচন রায় সৈদাবাদের ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করেন। আজিমগঞ্জের ধনপদ সিং বাহাদুর ও রানি স্বর্ণময়ী ভার্নাকুলার ও অ্যাংলো-ভার্নাকুলার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন।[২৩] লালগোলাপের জমিদার রায় যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় ছাত্রাবাস সহ একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য ভবনের নির্মাণে ১০ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। লালগোলা ও ভগবানগোলার জুনিয়র ও মাইনর বালিকা বিদ্যালয় জমিলাভ করেছিল।[২৪] এছাড়া ইসলামপুরের গোপীকৃষ্ণ মজুমদার, তালিবপুরের জমিদার, পাঁচথুপীর জমিদাররা শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। কাশিমবাজার রাজপরিবারের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় বহরমপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের

স্বপ্ন দেখে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে যান। তাঁর উত্তরসূরিরা বহরমপুর কলেজ স্থাপন করে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন।[২৫] দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে ধনপৎ সিং বাহাদুর, লালগোলার জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও, নশীপুরের রাজা রণজিৎ সিং, রাজা আশুতোষ নাথ রায়, কাঞ্চনতলার জমিদার ভগবতীবাবু বিশেষভাবে অর্থসাহায্য করেছিলেন এবং নিজ নিজ জমিদারির লোকজনদের চিকিৎসার সুযোগ দিয়েছিলেন। নবাব-বাহাদুর ও মুর্শিদাবাদের দাতব্য চিকিৎসালয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন।[২৬] পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করার জন্য তাঁরা কুয়ো ও দীঘি খনন করেন। নদীর বাঁধ ও রাস্তাঘাট মেরামতিতে বিশেষ মনোযোগ দেন। তালিবপুরের জমিদার পীর মহম্মদ, মহম্মদ গোলাম বাহুল, মুনশি নেওয়াজ হোসেন মসজিদ ও মুস্তাফির খানা নির্মাণে যেমন অর্থব্যয় করেন তেমনি রাস্তা-ঘাট নির্মাণে ও দীঘি খননে অর্থ সাহায্য করেন।[২৭] সালারের জমিদার এনায়েত উল্লা ও কেরামউল্লা এবিষয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। বন্যা ও খরাত্রাণেও জমিদারদের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেছেন সরকারি কর্তৃপক্ষ। নবাব পরিবার, মহারানি স্বর্ণময়ী রায় যোগেন্দ্রনাথ রাও অকাতরে সাহায্য করেন খাদ্যপীড়িত মানুষজনের।[২৮] এঁদের কেউ কেউ গ্রন্থরচনাও পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন আবার কেউ মনোরম নাট্যশালা তৈরি করে নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন।

(চ) সতীপ্রথা : আঠারো-উনিশ শতকের অন্যতম ব্যাধি সতীপ্রথা মুর্শিদাবাদেও ছিল। সরকারি নথিপত্রে মুর্শিদাবাদের সতীপ্রথা সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। এই ছ'বৎসরে সতী হয়েছিলেন মোট ২৬ জন। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ১৫ জন, কায়স্থ ৫ জন, নাপিত ২ জন এবং বানিয়া, বৈদ্য, তেলি ও শুঁড়ি ১ জন করে। এই ২৬ জন সতীর স্বামীদের অর্থনৈতিক সঙ্গতি ছিল মাঝারি ধরণের। সতীরা সকলেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের। অধিকাংশ সহমরণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাঢ়ে নয়ত ভাগীরথী সন্নিহিত অঞ্চলে। অর্থাৎ ধর্মপ্রবণ, রক্ষণশীল মানসিকতাই সতীপ্রথার মূলে কার্যকর ছিল। এদের মধ্যে চল্লিশোর্ধা ছিল ৭ জন এবং অনুর্দ্ধা ৩ জন।[২৯]

(ছ) সামাজিক অবস্থা : কিরীটীমঙ্গল পুঁথি থেকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ছবি পাওয়া যায়। তাছাড়া পাওয়া যায় সেই সময়ের খাবারের তালিকা।[৩০] এইসকল টুকরো, টুকরো ছবি সেই সময়ের মুর্শিদাবাদকে জানতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

সূত্র নির্দেশ :

১। দেবশ্রী দাশ—রানি ভবানী ও মুর্শিদাবাদের সংস্কৃতি চর্চা, ইতিহাস অনুসন্ধান ১৩, পৃষ্ঠা—৩১৪-৩১৫।

২। Judicial Criminal 1794-28th February - 7th March, Appendix - A. Fort William the 7th March 1794. No - 38, Resident of Benaras.

৩। গঙ্গাধর দাস—কিরীটী মঙ্গল, ১২১৬ সাল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি বিভাগ, পুঁথি সংখ্যা—৩৯৩৯, পত্রসংখ্যা—৬৯-৭০।

৪। অনিমা মুখোপাধ্যায়—আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৭।

৫। Kalikinkar Datta - Alivardi and his times. Calcutta, 1963. Page - 197.

৬। Enclosures accompanying a letter from the collector of Murshidabad, dated 25 February, 1792. Vol - 275, Page - 76 - 88.

৭। Petitions from the grand daughters of Lutfunessa, the widow of Siraj-ud-dowlah, dated - 20 May 1791. Vol - 228. P. 319-325

৮। From Macnaghton, Secretary to the Governor of Bengal to T. A Cobbe, agent to the Governor - General, Political Department, Vol - 4, Page - 264.

৯। From Macnaghton, Secretary to the Governor General in Bengal to T.A. Cobbe - agent to the Governor General at Murshidabad, dated 15 January 1835, Political Department, Vol - 2

১০। From L. Melville, Agent to the Governor General to Macnaghton, dated 8 July 1837, Vol - 11

১১। From W. H. Macnaghton, Secretary to the Governor General, to Melville, agent to the Governor General, dated 25 July 1837, Political Department, Vol - 11

১২। From Melville, Agent to the Governor General to W. H. Macnaghton, Secretary to Govt. of Bengal, dated - 22 June 1836, Political Department, Vol - 6.

১৩। From Princep, Secretary to the Governor General of Bengal to Elliot, Officiating agent to the Governor - General, dated - 4 January 1838, Political Department, Vol - 12, Page - 4.

১৪। From Cobbe, Agent to the Governor General, to Macnaghton, Secretary to the Governor of Bengal, dated 13 Oct. 1835, Vol - 5, Page - 390-91.

১৫। From Nawab Nasir-ul-Mulk, the Nawab of Bengal. This letter is enclosed with the letter of I. Shakespeare, Collector of Rajshahi to R Thakeray, Secretary to the Board of Revenue, dated - April 1807, Vol - 439, Page - 55.

১৬। From Bushby, Junior Secretary to the Commissioner of Murshidabad, dated 11 June 1830, Vol - 821, Page - 393.

১৭। সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত - চেনা মুর্শিদাবাদ ঃ অচেনা ইতিবৃত্ত, খাগড়া, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১১০।

১৮। Enclosure in letter from Revenue Board, Dated 10 Oct 1790, Vol - 198, Page - 266 - 67

১৯। শ্রী রসিকলাল গুপ্ত, মহারাজ রাজবল্লভ সেন, কলিকাতা, ১৩১৯, পৃঃ ১৯২ - ৯৯।

২০। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪।

২১। শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - মুর্শিদাবাদ কথা, পৃষ্ঠা - ২৪৬ - ৫৫।

২২। সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, চেনা মুর্শিদাবাদ : অচেনা ইতিবৃত্ত, খাগড়া, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১০৪।

২৩। From C H. Cambell, Commissioner of Rajshahi Division to the Secretary to the Government of Bengal, Dated 30 August 1866, General proceedings, Oct. 1866, Vol - 98, Page - 14

২৪। শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - মুর্শিদাবাদ কথা, পৃষ্ঠা - ২১৬ - ২১৭।

২৫। Krishna Kanta College Centenary Commemoration Volume. Berhampore, 1953, Page - 10.

২৬। General Administration Report - 1866, 1870, 1877, 1897.

২৭। শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ কথা, পৃষ্ঠা - ৩১৬ - ১৭।

২৮। General Administration Report - 1889 - 90

২৯। W H Macnaghton Register to H. Shakespeare, Secretary to Govt. on the Judicial Department, Judicial Criminal. Vol - 516, Page - 219 - 221, 475 - 76.

৩০। গঙ্গাধর দাস - কিরীটী মঙ্গল - পত্রসংখ্যা - ৩৬ - ৩৭, ৬৯।

কোচবিহার ভুটান সম্পর্ক (১৭৭২ - ১৮০১) এবং ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা একটি পর্যালোচনা

পার্থ সেন

ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজা বিশ্ব সিংহ কর্তৃক স্থাপিত কামতা কোচবিহার রাজ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী মহারাজা নরনারায়ণের সময় কামতা কোচ রাজ্যের সীমা পূর্বে ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী অরণ্য, উত্তরের তিব্বত, পশ্চিমে মিথিলা এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[১] রাজোপাধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে মহারাজা বিশ্ব সিংহ ভুটান দখল করেছিলেন এবং ভুটানের দেবরাজা বিশ্বসিংহকে প্রতি বছর রাজারাও উপঢৌকন দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।[২] ইতিমধ্যে ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা নরনারায়ণ তাঁর রাজ্য ভাগ করে শঙ্কোষ নদীর পূর্বাংশ তাঁর ভাগ্নে রঘুদেবকে দেন এবং সঙ্কোষ নদীর পশ্চিমাংশ মহারাজা নরনারায়ণ ও তাঁর বংশধরদের জন্য রেখে দেন।[৩] রাজ্য বিভাজনের পর থেকেই শুরু হয় পূর্ব কামতা কোচ রাজ্য এবং পশ্চিম কামতা কোচ রাজ্যের মধ্যে বিরোধ। যদিও রঘুদেব পূর্ব কামতা-কোচ রাজ্যলাভের সময় মহারাজা নরনারায়ণকে বার্ষিক কর দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী রাজা মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আমলেই রঘুদেব আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য আক্রমণ করেন।[৪]

রঘুদেবের আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষার্থে পশ্চিম কামতা কোচ রাজ্যের রাজা ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মোঘল বাদশা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলে পশ্চিম কামতা কোচ রাজ্যে মোঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে মহারাজা প্রাণ নারায়ণ বাদশাহি পেশকাশ দিতে অস্বীকার করেন। পরে ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের পর ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে মিরজুমলা কোচবিহার আক্রমণ করেন এবং কোচবিহারের রাজস্ব দশ লক্ষ নারায়ণী মুদ্রা ধার্য করেন।[৬]

মহারাজা প্রাণনারায়ণের ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু হলে মোঙ্গনারায়ণ সিংহাসনে বসেন। এই সময় থেকেই মহারাজা মোঙ্গনারায়ণ এবং ছত্র নাজির মহীনারায়ণ ও তাঁর পুত্রদের সাথে কোচবিহারের সিংহাসন দখলকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দেয়। মহারাজা মোঙ্গনারায়ণ ছত্র নাজির মহীপরায়ণ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎনারায়ণকে প্রাণদণ্ড দিলে

মহীনারায়ণের অপর পুত্রগণ ভুটানের দেবরাজার সাহায্যে মোঙ্গনারায়ণের সাথে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও মোঙ্গনারায়ণ মহীনারায়ণের পুত্র যজ্ঞনারায়ণকে ছত্র নাজিরের পদ প্রদান করে বিবাদের সাময়িক মিমাংসা করেন।[৮] এই প্রথম ভুটান কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিরোধের সুযোগ নিয়ে কোচবিহার রাজ্যে নিজ প্রভাব বিস্তারের উদ্যোগ নেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বসিংহ থেকে পাঁচজন রাজার অভিষেকের সময় বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতগণ ছত্রধারণের কাজ করেন এবং নজর প্রদান করতেন। কিন্তু মহারাজা মোঙ্গনারায়ণ মহীনারায়ণ এবং তার পুত্র যজ্ঞনারায়ণকে নাজিরের পদে অভিষিক্ত করেন।[৯] ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুরের মহীদেব রায়কত কোচরাজাদের অভিষেকের সময় ছত্র ধরতে অস্বীকার করেন এবং কোচবিহারকে কর দেওয়া বন্ধ করেন। তবে ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতগণ মহারাজা মোঙ্গ নারায়ণকে ভুটিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন।[১০]

মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকাল পর্যন্ত পশ্চিমকামতা কোচরাজ্যের সীমা উত্তরে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়।[১১] অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের পর থেকেই ভুটান কোচবিহার থেকে স্বাধীন হয়ে যায় বলে ধরে নেওয়া যায়। মোঙ্গ নারায়ণের সময় কোচবিহারে প্রভাব বিস্তার করতে অসমর্থ হলেও পরবর্তীকালে ভুটান কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোচবিহার রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কোচ ভুটান বিরোধ অবশ্য নতুন নয় বরং বলা যায় কম পশ্চিম দুয়ারের উপর আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কোচবিহার ভুটানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ ছিল। Dalton লিখেছেন "There was no doubt conflicts between the Kuch and Bhutias about three or four hundred years ago but these ? struggles for supremacy in the Duars"[১২] পেম্বারটনের বিবরণ থেকে জানা যায় পশ্চিম ডুয়ার্সে মোট এগারোটি দুয়ার ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই ভুটান এই দুয়ারগুলি দখল নিতে ব্যস্ত হয়। পশ্চিম ডুয়ার্সের অঞ্চলগুলি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং তাতে পান বৃক্ষ, ধান ও কার্পাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। পেম্বারটনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে পূবে ৪০,০০০ টাকার রাজস্ব ভুটান দুয়ারগুলি থেকে আদায় করত[১৩]। H. N. Choudhury লিখেছেন" "They also openly dispossensed some other lands covered by Taluks Chicha Khata, Paglaghet Inchkee Pnee, Kyranti and Maraghat, which were under direct management of the state" [১৪ (ক)] .

১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ভুটানের অনুগত কোচবিহারের দেওয়ান রামনারায়ণকে মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ হত্যা করলে ভুটান কোচবিহার আক্রমণ করা এবং মহারাজা

বৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে বন্দী করে নিয়ে যায়। রাজেন্দ্রনারায়ণের ভুটানের সহায়তায় কোচবিহারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় কোচবিহারে ভুটানের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। দেবরাজার প্রতিনিধি পেনসু লামা সৈন্যবাহিনী সহকারে কোচবিহারে অবস্থান করতে থাকেন এবং রাজকার্য তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত হতে থাকে।[১৫] ভুটানের কোচবিহারের উপর আধিপত্য বিস্তারের মূল কারণ ছিল যে ভুটান উপলব্ধি করেছিল যে কোচবিহারের উপর আধিপত্য বিস্তার ছাড়া পশ্চিম দুয়ারের দখল রাখা যাবে না।[১৬] এই বৈকুণ্ঠপুরের রাজা দর্পদেব সৈন্যবাহিনী সহ ভুটানকে সহযোগিতা করেছিলেন। দর্পদেবের উদ্দেশ্য ছিল ভুটানকে আমবাড়ী ফালাকাটা এবং জল্পেশ প্রদানের বিনিময়ে কোচবিহারে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করা।[১৭] ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হলে ভুটান রামনারায়ণের পুত্র বৃজেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের সিংহাসনে বসাতে উদ্যোগ নিলে নজির দেও যগেন্দ্রনারায়ণ বন্দী রাজা বৈর্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসান এবং ভুটানের হাত থেকে কোচবিহার রাজ্যকে উদ্ধার করার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।[১৮]

কোচবিহারের উপরে ভুটানের আধিপত্য বিস্তারের পর থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রঙ্গপুরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। রঙ্গপুর এবং ভুটানের মধ্যবর্তী রাজ্য কোচবিহার ভুটানের অধীনস্ত হলে নিঃসন্দেহে রঙ্গপুরেব নিরাপত্তা বিঘ্নিত হত। তাছাড়া ঐ সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মারাঠা আক্রমণ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কোম্পানি মনে করে যে কোচবিহারে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলার উত্তর সীমান্তে কোম্পানির নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাবে। এই দুই প্রয়োজন থেকেই লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস কোচবিহারের সাহায্যে এগিয়ে যান।[১৯] উল্লেখ্য ঐ সময় কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কোচবিহারের ইংরেজ হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।[২০] তথাপি ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে হেস্টিংস ইঙ্গো-কোচবিহার চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং চুক্তি অনুযায়ী কোচবিহার কোম্পানির অনুগতকরণ রাজ্যে পরিণত হয়। কোচবিহার কোম্পানিকে বার্ষিক অর্দ্ধাংশ রাজস্ব দিতে রাজি হয়।[২১]

ইঙ্গো-কোচবিহার চুক্তি স্বাক্ষরের পর কোম্পানি ক্যাপ্টেন জোনস এর অধীনে চার কোম্পানি সৈন্য ভুটানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে এবং ভুটান পরাস্ত হয় এবং ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৫শে এপ্রিল ইঙ্গো-ভুটান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভুটানের পক্ষে সন্নাসীরা ব্যাপক হারে অংশ নেয় এবং তারা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীদের জন্যই ইঙ্গো-ভুটান চুক্তি স্বাক্ষর করতে একবছর দেরি হয়। ঐ সন্নাসীদের পশ্চিম ডুয়ার্সের কৃষকদের উপর ব্যাপক প্রভাব ছিল।[২২]

ইঙ্গো ভুটান যুদ্ধ চলাকালীন ভুটান কোম্পানির কাছে যে সন্ধির প্রস্তাব দেয় তাতে বলা হয় যে ভুটান কোচবিহার রাজ্যের উপর দাবি ত্যাগ করবে বিনিময়ে কোম্পানি বৈকুণ্ঠপুরের উপর ভুটানের অধিকার স্বীকার করে নেবে। তাছাড়া ভুটান কোচবিহারের সঙ্গে ও গোপনে সন্ধিস্থাপন করতে চেয়েছিল।[১৩] ইঙ্গো-ভুটান যুদ্ধ থামানোর জন্য তিব্বতের তিও লামা উদ্যোগ নেন এবং মধ্যস্ততা করেছিলেন।[১৪] কারণ ঐ সময় নেপাল সিকিম দখল করে তিব্বত আক্রমণের উদ্যোগ নিচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই নেপালী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ব্রিটিশ সাহায্যের আশায় ইঙ্গো-ভুটান যুদ্ধে মধ্যস্ততা করা তিও লামা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।[১৫] তাছাড়া তিও লামার বাণিজ্যিক স্বার্থও ছিল। সেই সময় রঙ্গ পুর নগরে তিব্বতীয় ব্যবসায় যে কেন্দ্র ছিল সেখানে ভুটিয়াদের বার্ষিক ২ লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টাকার পণ্য আদান প্রদান হত। ইঙ্গো-ভুটান যুদ্ধ শুরু হলে ভুটানের মধ্য দিয়ে রঙ্গপুরে যাবার এই বাণিজ্যিক পথ বন্ধ হয়ে যায়। বাণিজ্যিক স্বার্থেই তিও লামা ইঙ্গো-ভুটান যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নেন বলে মনে করা যেতে পারে।[১৬]

১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত ইঙ্গো ভুটান চুক্তিতে ভুটান কোচবিহারের বন্দী মহারাজা বৈর্যেন্দ্রিনারায়ণকে মুক্তি দেয়। ভবিষ্যতে ভুটান বিদ্রোহী সন্নাসীদের ভুটানে আশ্রয় দেবেনা এবং কোম্পানিকে প্রয়োজন মত পার্বত্য বনের যে কোন স্থান থেকে মূল্যবান কাঠ সংগ্রহের অনুমতি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। বিনিময়ে কোম্পানিও ভুটানকে কোচবিহার পশ্চিম দুয়ারের পূর্বদিকে চেচাযাতী ও পাগনাহাটের অঞ্চল এবং পশ্চিম দিকে কৈরান্তি, মরাঘাট ও লক্ষীপুরের জমি ছেড়ে দিতে রাজি হয়। কোম্পানি ভুটানের ব্যবসাদারদের বিনা শুল্কে বাংলার সাথে বাণিজ্য করার অধিকার এবং তাদের অবাধে বঙ্গপুর এ ব্যবসা করার অনুমতি দেয়।[১৭] উল্লেখ্য যে কোম্পানি ভুটানকে কোচবিহারের রাজাংশ দিয়ে সন্ধি স্বাক্ষর করে। ভুটানকে তুষ্ট রাখার কারণে কোম্পানি সেই সময় তিব্বতের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যস্ত ছিল। এই সময় ভুটানের মধ্য দিয়েই তিব্বতে যাবার রাস্তা ছিল।[১৮] সন্ধির সময় তিও লামা গভর্নরকে যে সমস্ত দ্রব্য উপহার প্রেরণ করেছিলেন তাদের শিল্প নৈপুণ্য দেখে হেষ্টিংসের তিব্বতের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।[১৯] ইঙ্গো-ভুটান চুক্তি স্বাক্ষরের অল্পকাল পরেই হেস্টিংস ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ই মে বগল মিশন তিব্বতে প্রেরণ করাটা বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়াও তিব্বতে কৃষি, পশুপক্ষীর সংবাদ তিব্বত ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তীস্থানের অবস্থা, ব্রহ্মপুত্র নদের গতি এবং তাতে নৌকা চলাচলের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য বগল মিশনকে হেস্টিংস নির্দেশ দিয়েছিলেন[২০] ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা দর্পদেব এবং তাঁর

সন্ন্যাসী বাহিনীকে পরাস্ত করে কোম্পানি জলপাইগুড়ি দখল করে। ইঙ্গো-ভুটান চুক্তি স্বাক্ষরের পর বৈকুণ্ঠপুরের দর্পদেব ও সাধারণ জমিদারে পরিণত হন এবং কোম্পানিকে প্রতি বছর ৩২,০০ টাকা রাজস্ব হিসাবে দিতে সম্মত হন। [৩১] তখন জলপাইগুড়ির অপর নাম হয় বত্রিশহাজারী।

এই ভাবে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই কোম্পানির কোচবিহার ভুটান এবং জলপাইগুড়ির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ তিন অঞ্চলে সন্নাসী বিদ্রোহ দমন করাও সম্ভব হয়। ইঙ্গো ভুটান চুক্তির পর ভুটানের কোচবিহারের আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খা চিরতরে অবসান হয়। ইঙ্গো-ভুটান চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভুটানের সাথে অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে কোম্পানির তিব্বতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম হয়। বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই কোম্পানি ভুটানকে কোচবিহারের এক বিস্তীর্ণ অংশ দিয়ে ভুটানকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছিল। সাথে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে তিব্বতের তিও লামার মধ্যস্ততা ছাড়াও ভুটান অভ্যান্তরীণ দুর্বলতার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাথে সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল। ভুটানের দেবরাজা যখন বক্সা থেকে কোম্পানির বিরুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন সেই সময় লামারা এবং প্রজারা একতাবদ্ধ হয়ে নতুন দেবরাজা নির্বাচন করেন এবং পূর্ব দেবরাজা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন এবং ভুটানের সৈন্যগণও মনোবল হারিয়ে ফেলে। নব নির্বাচিত দেবরাজা কোম্পানির সাথে সন্ধি স্বাক্ষর করেন।[৩২]

কোচবিহার ভুটান সম্পর্ক অচিরেই তিক্ত হতে শুরু করে। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১৮০১ সালে বয়প্রাপ্ত হলে কোচবিহারের সে সমস্ত জায়গা জমি ইঙ্গো-ভুটান চুক্তি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল সেগুলি ফেরৎ পাবার জন্য দাবি জানাতে থাকে। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ভুটান পুনরায় কোচবিহার রাজ্যে আক্রমণ করতে শুরু করে। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুনরায় মরাঘাট কোচবিহারকে ফেরৎ দেয়। এখন দেখা যাবে যে কোম্পানি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কখনও ভুটানকে খুশি করেছে আবার প্রয়োজনে কোচবিহারে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোচবিহারকে সন্তুষ্ট করেছে। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে ইঙ্গো-নেপাল যুদ্ধ পর্যন্ত কোম্পানি কোচবিহারে তার প্রভাব বিস্তারে বেশি আগ্রহী ছিল। পরিশেষে বলা যায় যে, ভুটান এবং বৈকুণ্ঠপুরের আক্রমণ থেকে কোচ রাজাকে শুধু উদ্ধার করার জন্যই নজির দেও ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যের দ্বারাই হয় নি, নজির দেও যগেন্দ্রনারায়ণ পশ্চিম ডুয়ার্স সহ বেকুণ্ঠপুরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কোম্পানি।[৩৪] ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভ করার পর কোম্পানি যে বাংলায় রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে তা উপলব্ধি করার মত দূরদৃষ্টি নজির দেও যগেন্দ্রনারায়ণের ছিল না।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। খাঁন চৌধুরী আমানত উল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলি-১৯৯০ পৃ ১২৬

২। রাজোপাখ্যান, বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৮৫, পৃ-১৬।

৩। E. A. Gait. History of Assam. পৃ-৫৫।

৪। Study of Some aspects of the history of Kamta Koechbehar Since 1772 to the accension of Sivendranarayan Partha Sen. Unpublished thesis. N B U. 1989. P-1

৫। E A Gait. পূর্বোক্ত, পৃ-৬৩।

৬। কোচবিহারের ইতিহাস, আমানত উল্লা, পৃ-১৫৭

৭। H N Choudhury. The Coochbehar State and its Land Reveue Selttlement. P - 237

৮। *Mercen Chauret Report,* Vol II. PP 19, 20, 169

৯। *Mercen Chauret Report,* Vol II PP 19, 20

১০। Charu Chandra Sanyal. Face Rajbansis of North Bengal. PP 7-81

১১। আমানত উল্লা, *পূর্বোক্ত*, পৃ-১৫০

১২। Dalton. Descriptive Ethnology of Bengal. Cal 1872. পৃ-৯৬

১৩। A Deb. Bhutan and India. A Study in Frontier Political Relation (1771-1861). পৃ-১১২

১৪। R B Pembertan *'Report on Bhutan,* পৃ-১৩

১৪। ক) H N. Chowdhury. *পূর্বোক্ত* পৃ-২৬৪

১৫। A Deb. *পূর্বোক্ত* পৃ-৭৪। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের সময় (১৭১১ - ৬৪) মোঘল আক্রমণ প্রতিরোধে ভুটানের দেবরাজার সাহায্য গ্রহণ করার পর থেকে কোচবিহারে ভুটানের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ সময় থেকেই ভুটান নিম্নভূমির দিকে অগ্রসর হতে থাকে, কোচবিহার রাজ্যের উদ্যোগে সর্বদা লুঠপাঠ করত (আমানত উল্লা, *পূর্বোক্ত*, পৃ-১৮৩ - ১৮৫)

১৬। A Deb. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫

১৭। ঐ পৃ. ৭৪

১৮। Durga Das Mazumder. District Gazetteer of Kochbehar. Govt of West Bengal. 1997 পৃ. ৩৭

১৯। Back ground of British intervention in Coochbehar (1772-1773). Ratna Roy. in Early Historical Perspective of North Bengal. Edi. B N Mukherjee and Pranab Bhattachariya. PP 148 - 49.

২০। 1771 খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি Count of Direction লিখেছিলেন "Remember We are not fond of much territory . unless it will contribute directly to our real benefit" ? W K. 'Febtu Report from the Select committee the affairs of East India Company. Vol I. intro. P - 16

২১। A collective of Treaties. Engagements and Sanads. C U. Aitechison. Vol II Cal. 1930, P. 308 । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইঙ্গো কোচ চুক্তির মত নিয়ে দ্বিমত আছে। Aitchison এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ইঙ্গ-কোচ চুক্তি ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়। ভারত সরকার এর ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৬১ সালের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সরকার ইঙ্গো-কোচ চুক্তির যে দুটি প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাতে চুক্তির তারিখ চৌঠা ডিসেম্বর ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে লেখা আছে।

-- S. C Ghosal. *History of Coochbehar,* Coochbehar 1942. PP 154 - 155

২২। A. Deb. *পূর্বোক্ত*, পৃ - ৭২

২৩। আমানত উল্লা. *পূর্বোক্ত*, পৃ - ৩৩৯

২৪। A. Deb. *পূর্বোক্ত*, পৃ - ৭৭

২৫। D. R. Regmi. Modern Nepal. Vol I. পৃ - ১৬৮ - ৭০

A. Delo. পূর্বোক্ত, পৃ - ৭৭

২৬। *Narratives of Bogle Mission.* P - 12 - 131

২৭। আমানত উল্লা, *পূর্বোক্ত*, পৃ - ৩৪৩ - ৪৪

২৮। A. Deb. *পূর্বোক্ত*, পৃ - ৭৭

২৯। আমানত উল্লা, *পূর্বোক্ত*, পৃ - ৩৪৫

৩০। ঐ পৃ - ৩৪৫

৩১। Charu Chandra Sanyal, *পূর্বোক্ত*, পৃ - ৮

৩২। আমানত উল্লা, *পূর্বোক্ত*, পৃ - ৩৩৮

৩৩। Partha Sen, *পূর্বোক্ত*, পৃ - ১৫

৩৪। আমানত উল্লা, *পূর্বোক্ত*, পৃ - ৩৩৯

* ১১টি দুয়ার তিস্তা এবং সঙ্কোষ নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। D. F Rennie দুয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন 'The term Duar is derived from dwar meaning passes gate or entrance. It is appropriately applied to the level tract upon which the mountain passes open.

D. F. Rennie, *Bhootan and the Story of Dooar*, P-2

ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

বর্ণালী হালদার

সম্প্রতি আধুনিক ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্তরে গবেষণার সীমানা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। যার ফল-স্বরূপ জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন বিষয়ের উপর আলোচনার প্রবণতা। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল "ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা"।

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর বা বাংলার উত্তর-পূর্ব ভাগে অবস্থিত ছয়টি জেলা (মালদহ, দিনাজপুর, দার্জিলিং, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার) নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গ। জল-জঙ্গলার দেশ বলে মহাভারতের যুগে ভারতের এই ভূ-খণ্ডটি 'পাণ্ডব বর্জিত দেশ' নামে অভিহিত হত। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের নামকরণ হয় 'ডুয়ার্স অঞ্চল'। চা-শিল্প ও অরণ্য সম্পদই ছিল উত্তরবঙ্গের প্রধান দুটি অর্থনৈতিক স্তম্ভ। এই চা-শিল্পের সাথে জড়িত অধিকাংশ শ্রমিকেরাই ছিল রাঁচী, হাজারিবাগ, সাঁওতালপরগণা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসী। জীবিকার সন্ধানে তারা দূর-দূরান্ত থেকে আসতো এই অঞ্চলে। আর এটাই ছিল তৎকালীন উত্তরবঙ্গের ঔপনিবেশিক চরিত্র।[১] এ অঞ্চলের রোগব্যাধির সাথে স্যাঁতস্যাঁতে প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। বছরের ১২টি মাস এখানে শীত ও বর্ষা এই দুটি ঋতুতে বিভক্ত ছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের জ্বালা সইতে না সইতে আগমন ঘটতো বর্ষার। ১৮৭৫ সালের সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত উত্তরবঙ্গের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বাধিক ছিল ১০৭.৪৫ ইঞ্চি এবং সর্বনিম্ন ছিল ৫৬.৯৪ ইঞ্চি।[২] উত্তরবঙ্গের রোগব্যাধি ছিল অঞ্চল অধ্যুষিত। এ অঞ্চলের বাতাসে ছিল রোগের জীবাণু যার হাত থেকে স্থানীয় বাসিন্দা এবং বহিরাগত কেউই রেহাই পেত না। নিম্নে তৎকালীন ডুয়ার্স অঞ্চলের কিছু রোগের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

জ্বর ঃ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, তরাইজ্বর, টাইফয়েড, হাম, বসন্ত।

পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগ ঃ আমাশা, আন্ত্রিক, আমরক্ত, নেবা, ওলাউঠা, গলব্লাডার।

শ্বাসযন্ত্রের রোগ ঃ কাসি, যক্ষা, হাঁপানি, সর্দি।

সাধারণ তন্ত্রের রোগ ও চর্ম রোগ ঃ বাত, গলগণ্ড, দাঁতের সমস্যা, পশ্চিমা, খোশ,

পাচরা, গবাদিপশু সংক্রান্ত চর্ম রোগ প্রভৃতি। এক কথায়, এইসব রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরবঙ্গের জন-জীবনকে করে তুলেছিল বিপর্যস্ত।

প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গের চিকিৎসাব্যবস্থা

আদিবাসী অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গে রোগব্যাধি প্রতিকারের ক্ষেত্রে দুধরণের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যথা—লোক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং প্রাচীন দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। এ অঞ্চলের আদিবাসী জনজাতিগণ (রাজবংশী, রাভা, গারো, খাসিয়া, সাঁওতাল, মদেসিয়া ইত্যাদি) রোগব্যাধি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে লোক-চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল ছিল। লোক-চিকিৎসকদের মধ্যে রাজবৈদ্য, কবিরাজ, ওঝা ছিলেন প্রধান। ঝাঁড়-ফোঁক, বিভিন্ন গাছ থেকে সংগৃহীত জড়িবুটি, লতাপাতার পচন, তেলপড়া, জলপড়া, প্রভৃতির দ্বারা স্থানীয় হাতুড়ে চিকিৎসকেরা রোগীকে সুস্থ করে তুলতেন। রাভারা অসুখ-বিসুখ হলে তাদের আরাধ্য দেবী 'রুণতুকের' স্মরণাপন্ন হত এবং পাঁঠাবলি দিত।[৩] আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজবংশীরা অশুভ আত্মার (ভূত বা দ্যাও, পেঈরী, মগর, চন, ইত্যাদি) অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। এদের আক্রমণে রোগী বাক্‌ক্ষমতা হারাত, মলের রং বিভিন্ন ধরণের হত, প্রচণ্ড জ্বর, খাওয়া বন্ধ, পাগলের মত চিৎকার করত এবং কিছুদিন পর মারা যেত। এর প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য আদিবাসীরা ওঝাদের স্মরণ নিত এবং তামা দিয়ে তৈরি অ্যামিউলেট (তোপ) ধারণ করত। ওঝারা নানা ধরণের মায়াবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল। হাম, বসন্ত, কলেরা, রিকেট প্রভৃতি রোগে মন্ত্রের দ্বারা হাওয়ার বাণ (বারো গোলাপের বাণ, ট্যাপাবাণ, মহেরিবুড়িবাণ, খাসনাবাণ ইত্যাদি) চালানোর প্রথা তখন খুবই প্রচলিত ছিল।[৪]

লোক-চিকিৎসা ব্যবস্থা ছাড়াও প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে আয়ুর্বেদিক, হাকিমি ও ইউনানি এবং তিব্বতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি স্থানীয় জনগণের মধ্যে ছিল জনপ্রিয়। উত্তরবঙ্গে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ উভয় শ্রেণীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সমকালীন জলপাইগুড়ি জেলায় বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন শ্রীকবিরত্ন প্রবোধ কুমার সেনগুপ্ত। তার তত্ত্বাবধানে জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে স্থাপিত হয়েছিল 'কমলা আয়ুর্বেদিক ফার্মেসি'।[৫] উত্তরবঙ্গে পাঠশালা, টোল এবং গুরুগৃহে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র চর্চা হত। আয়ুর্বেদে সকল প্রকার ওষুধ তৈরি হত স্থানীয় ভেষজ পদার্থ (তুলসীপাতা, মধু, বেল, গোলমরিচ, পিপল, চেরতা, আমলা, তেঁতুল, মেথী, হরতুকি, আদা, হলুদ, নিম, মুথা ইতাদি) দিয়ে। ওষুধ প্রস্তুতিতে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করা হত। আয়ুর্বেদিক ওষুধের মধ্যে চ্যবনপ্রাস, মৃত-সঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট প্রভৃতি আরোগ্যকর ও বলবর্ধক ওষুধের বিক্রি ছিল মধবিত্তশ্রেণীর কাছে এক লাভজনক ব্যবসা।[৬] ১৮৩৫ সালে সরকারি আদেশে বাংলায় আয়ুর্বেদ

শাস্ত্রচর্চা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও উত্তরবঙ্গেও গ্রামাঞ্চলের কবি রাজ ও বৈদ্য পরিবারগুলি বে-আইনীভাবে তাদের পেশা চালিয়ে যেতে থাকে। তবে ডুয়ার্স-অঞ্চলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অবনতির অন্যতম করেন হল ইউনানি এবং হাকিমি চিকিৎসা প্রণালীর প্রসার। এ পদ্ধতি ভারতে প্রথম চালু হয় মুঘল আমলে, তবে এর জন্ম আরব দেশে। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে মালদহ, দিনাজপুর অঞ্চলে এই চিকিৎসা খুবই জনপ্রিয় ছিল। আয়ুর্বেদের সাথে ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক রয়েছে। আয়ুর্বেদে ধমনী বিদ্যা (নাড়িটেপা) সরাসরি ইউনানি পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করা।[৩] এছাড়া ভুটানী ও তিব্বতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির আমদানি উত্তরবঙ্গে হয়েছিল সীমান্ত প্রতিবেশী রাজ্য নেপাল, ভুটান ও তিব্বত থেকে। পাহাড়ি এই ভেষজ পদ্ধতি দার্জিলিং শহরে প্রচলিত ছিল। তবে ঔপনিবেশিক যুগে এই সব দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল তারা প্রগতির মূল্য-বিচারে সক্ষম হয় নি।

উত্তরবঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের বাধ্যতামূলক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন

ডুয়ার্সে হেস্টিংস থেকে উইলিয়াম বেন্টিক্ পর্যন্ত টলমল ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতে আগত আমলাদের স্বাস্থ্য রক্ষার সমস্যা নানা কাগজপত্রে বারবার আলোচনা হয়েছে। কারণ ক্রান্তীয় আবহাওয়া ও ব্যাধির তীব্রতায় সাহেবি আমলাদের বেঁচে থাকাই হয়েছিল অনিশ্চিত। উত্তরবঙ্গে চা-বাগানগুলি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে এখানকার মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের নজর পড়ে। ডুয়ার্স অঞ্চলের আর্দ্র আবহাওয়া ও দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের রক্ষা করতে যেমন অসমর্থ হতো অন্যদিকে তেমনি সরকারি আমলাদের পক্ষেও এই প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের অভিযোজন করা আরো ছিল দুরূহ ব্যাপার।[৪] ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার (কালাজ্বর), টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবে প্রায় সারা বছরই অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হত। টাইফয়েডের অব্যর্থ মৃত্যু কিংবা অঙ্গহানি বন্ধ হয় আমাদের দেশে চারের দশক থেকে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ব্যাধি দেখা যেত যা 'বোঙ্গা' (মানুষের সাথের অশুভ আত্মার প্রেম) নামে পরিচিত।[৫] রোগব্যাধির হাত থেকে আমলাদের এবং সাধারণ লোকদের রক্ষার জন্য সরকার ১৮৬৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় একটি হাসপাতাল ও কিছু দাতব্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। ১৮৮৯ সালে সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গে ভ্যাকসিন (টিকা) দানের প্রথা চালু হয়। প্রথমদিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকদের মধ্যে সবাই ছিল সাহেব, আর সাহেব নাড়ি ধরলে জাত যাবে এই কুসংস্কারের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগীর সমাগম ছিল খুবই কম। ১৯১৯ সালে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য আইন পাশ করে সরকার ১৯২১ সালে বিভিন্ন অঞ্চলে জেলা বোর্ড স্থাপন করে এবং তার অধীনে একজন করে

'ডিস্ট্রিক হেলথ অফিসার' নিয়োগ করে। ১৯৩৭ সালে জলপাইগুড়ি শহরে এক বৈপ্লবিক পট-পরিবর্তন হয় 'পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরী' স্থাপনের ফলে। এখানে খাদ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় মহামারি প্রতিরোধের জন্য।[১০] এছাড়াও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য মশারির ব্যবহার, কুইনাইন সেবন, ধূপধুনার ব্যবহার এবং বদ্ধ জলাশয়ে মশার ডিমগুলিকে ধ্বংস করার জন্য মাছ ছাড়ার সুপারিশ করে জেলা-বোর্ড।[১১] ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গে নানা পরিবর্তন ঘটেছিল যেমন—রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। তবে এটাও ঠিক এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায় সেই পরিবর্তন থেকে নিজেদের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছিল।[১২] জল-জঙ্গলার দেশ বলে এ অঞ্চল সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল

> ''জল, জলাভূমি, জঙ্গল।
> এই তিনেই জলপাইগুড়ির অমঙ্গল।''

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেশীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার

ভারতবর্ষের উপর কর্তৃত্ব করাই ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর এক্ষেত্রে ওষুধ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ওষুধ ছিল ইউরোপীয় সম্প্রসারণ নীতির একটি অঙ্গ বিশেষ। অ্যালোপেথিক ওষুধের দাম বেশি হওয়ায় সরকার ১৮৬৬ সালে স্বল্পদামের দেশীয় ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ দেন উত্তরবঙ্গের ডিসপেনসারিগুলিতে। রাজধানী কলিকাতা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা প্রচলনের এটাই ছিল সবচেয়ে কম ব্যয়সাধ্য উপায়। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে প্রযুক্তি আমদানি করা সরকারেব পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি তারা দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিল।[১৩] প্রমাণস্বরূপ শল্য চিকিৎসায় রোগীর দেহে অস্ত্রপ্রচারের পূর্বে তাকে অজ্ঞান করা হত আফিমের সঙ্গে ক্যালোমেল মিশিয়ে তা দিয়ে তৈরি মিশ্রিত ওষুধের দ্বারা। চোখের গঠন এবং ছানির অবস্থান সম্পর্কে দেশীয় চিকিৎসকদের তেমন জ্ঞান না থাকলেও তাঁরা দেশীয় পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে ছানি কাটতে পারতেন। অন্য দিকে ১৯২৭ সালে জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে 'পলিক্লিনিক' এ যাবতীয় চক্ষুরোগের চিকিৎসা ও ছানিকাটা হত পুরোপুরি ইউরোপীয় কায়দায়।[১৪] তথাপি বসন্তরোগে শীতলা-দেবীর পূজা, ঝাঁড়ফোঁক, কলেরারোগে ওলাউঠাদেবীর পূজা, বিষাক্ত সাপের কামোড় থেকে বাঁচার জন্য নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর পূজা ইত্যাদি কুসংস্কারের উপর স্থানীয় লোকের আস্থা থাকায় রোগ সারবার পরিবর্তে মহামারির আকার ধারণ করত।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে রোগ নির্ণয়ের কেবলমাত্র পদ্ধতি ছিল পর্যবেক্ষণ। ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এক্সরে, মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি উন্নত যন্ত্রের দ্বারা রক্তপরীক্ষা, রোগজীবাণু সম্পর্কে নতুন গবেষণা সঠিক রোগ সনাক্তকরণে চিকিৎসকদের সহায়তা করে।[১৫] সরকারি রিপোট অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের দাতব্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বেশির ভাগ দাঁত ও পেটের অসুখের রোগীর ভীড়ই বেশি থাকত। এ প্রসঙ্গে একটি অতি জনপ্রিয় প্রবাদ স্থানীয় লোকের মুখে প্রচলিত ছিল—"রেখে যাও দাঁত নিয়ে যাও বাত"। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিবর্তন প্রসূতি চিকিৎসা ও পরিচর্যার ক্ষেত্রকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। প্রসূতি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আদিবাসীরা চিরাচরিত পদ্ধতি (আঁতুড় ঘর) গ্রহণ করলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে পূর্বের চেয়ে মানুষ যথেষ্ট সচেতন হয় এবং অভিজ্ঞ ধাত্রীদের উপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। ধাত্রীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সরকারি হাসপাতালগুলিতে ধাত্রীশিক্ষণ বিভাগ পৃথকভাবে স্থাপিত হয়। এছাড়া জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বারান্দায় গর্ভবতী মহিলাদের সচেতন করার জন্য নানা পরামর্শ চার্টের মধ্যে ছবির মাধ্যমে ঝোলান হত। সুতরাং প্রসূতি পরিচর্যার সঙ্গে ইউরোপীয় কায়দা যুক্ত হওয়ায় স্ত্রীলোকেরা সঠিক চিকিৎসার সুযোগ পেতে থাকে।[১৬] ভারতের মত দরিদ্র দেশের জনগণ যাতে যথাযথ চিকিৎসার সুযোগ পায় তারজন্য সরকার চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নতুন শাখা 'হোমিওপ্যাথিক' চিকিৎসা ব্যবস্থাকে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন। এছাড়া এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য বেঙ্গলী পত্রিকা, সহচর, ত্রিস্রোতা, জনমত ইত্যাদি পত্রিকাগুলি অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। উত্তরবঙ্গে এই চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডাঃ নকুলচন্দ্র সরকার, ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র দাস, ডাঃ হেমচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।[১৭]

ঔপনিবেশিক যুগে চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারি পরিবর্তন বাংলায় ঘটেছিল তার ঢেউ সব জায়গায় সমান ছিল না। সরকারি রিপোর্ট অনুসারে (১৯৩৯, ১৯৪৭, ১৯৫৪ এবং ১৯৬০ সাল) রাজধানী কলিকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তুলনামূলক একরূপ বৈষম্যমূলক অবস্থা চলতে থাকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। তার বড় প্রমাণ হল ১৮৩৫ সালে রাজধানীতে স্থাপিত হয়েছিল ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ কিন্তু তার প্রায় ১০০ বছর পর উত্তরবঙ্গে ১৯৩০ সালে ঐ কলেজের অনুকরণে স্থাপিত হয়েছিল 'জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল'।[১৮] পরবর্তী পর্যায়ে এই স্কুলের এল. এম. এফ. ডিপ্লোমাধারী ছাত্ররা এই অঞ্চলের জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করত। এছাড়া চা-বাগানের শ্রমিক এবং সরকারি আমলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার

তাগিদে সরকার চা-বাগান আইন অনুসারে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তারকে নিয়োগ করেছিল ১৭৫০ জন শ্রমিকের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনার জন্য। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে উত্তরবঙ্গে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রগতি পরিলক্ষিত হয়। সরকারি প্রতিবেদনের বার্ষিক রিপোর্টে পূর্বের চেয়ে মৃত্যুর হার যথেষ্ট হ্রাস পায়, মহামারি জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকটা কমে আসে, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।[১৩]

পরিশেষে, পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও অমূল্য মানব-সম্পদকে রক্ষা করতে হলে দেশ ও দেশবাসীকে কেবলমাত্র সরকারি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করলে চলবে না, এর জন্য চাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। রোগ ও অসাম্যের মত রিপুর বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরে লড়াই প্রয়োজন এবং এই লড়াইয়ের হাতিয়ার হবে ঐতিহ্যগত এবং আধুনিক উভয়প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল একাউন্ট অফ বেঙ্গল—Vol - (১১) ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার।

২। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকি স্মারক গ্রন্থ ১৮৬৯ - ১৯৬৮, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল সম্পাদিত।

৩। রাভা ও তাদের দেবী 'রুণতুক - বাশেক'—শ্রীসুনীল পাল।

৪। দি রাজবংশীস্ অফ নর্থবেঙ্গল—ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল।

৫। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকি স্মারকগ্রন্থ, প্রাগুক্ত।

৬। উনিশ শতকে দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা—বিনয়ভূষণ রায়।

৭। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ : 'ঔপনিবেশিক বাংলায় আয়ুর্বেদ চর্চার বিপন্ন অস্তিত্ব এবং পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন'—চিত্তব্রত পালিত।

৮। ত্রিস্রোতা—স্মৃতির দর্পণে—শ্রীভবরঞ্জন গাঙ্গুলী (সাপ্তাহিক পত্রিকা, জলপাইগুড়ি)

৯। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকি স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত।

১০। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকি স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত।

১১। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স মালদহ—জি. ই. ল্যামব্রাউন।

১২। অনুষ্ঠান, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৯৬।

১৩। উনিশ শতকে বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা, দেশীয় ভেষজ ও সরকার—বিনয়ভূষণ রায়।

১৪। উনিশ শতকে বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা, দেশীয় ভেষজ ও সরকার—বিনয়ভূষণ রায়।

১৫। উনিশ শতকে বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা, দেশীয় ভেষজ ও সরকার—বিনয়ভূষণ রায়।

১৬। দি রাজবংশীস্ অফ নর্থ বেঙ্গল—ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল।

১৭। হোমিওপ্যাথি গৃহ চিকিৎসা—মন্মথনাথ দত্ত।

১৮। সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অফ দ্যা ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি— ১৮৮৯-১৮৯৫, ডি. ই., সান্ডার্স।

১৯। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকি স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

১। উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি— শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মন।

২। ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট্ গেজেটিয়ার্স রংপুর—জে. এ. ভাস।

৩। মেডিসিন অ্যাণ্ড দ্যা রাজ, ব্রিটিশ মেডিসিন পলিশী ইন ইণ্ডিয়া ১৮৮৫-১৯১১—অনিল কুমার।

৪। প্র্যাকটিস্ অফ মেডিসিন ইন বেঙ্গল—এ. এল. ব্যাসাম।

৫। ইনডিজেনাস্ মেডিসিন ইন নাইনটিথ (19th) অ্যাণ্ড টুয়েনটিথ (20th) সেঞ্চুরী বেঙ্গল—ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত।

৬। হিস্ট্রি অফ পাবলিক হেলথ্, কলোনিয়ল বেঙ্গল—(১৯২১-১৯৪৭) কবিতা রায়

৭। আয়ুর্বেদিক ধাত্রী বিদ্যা—প্রসন্নচন্দ্র মৈত্র।

৮। এনাটমি—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৯। দ্যা পলিটিকস্ অফ আয়ুর্বেদিক শিক্ষা—পি. আর. ব্রাস।

১০। ইতিহাস অনুসন্ধান (পঞ্চদশ অধ্যায়), স্বাধীনতা পূর্ব ডুয়ার্স ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা—দেবাশিষ নন্দী ও তনয় মণ্ডল।

উনবিংশ ও বিংশ শতকে বৌদ্ধিক সমাজে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহার ও তার প্রতিক্রিয়া

রত্না পাল

উত্তরবঙ্গ শব্দটি আজ বহুল প্রচারিত এবং বহু ব্যবহৃত। রাজনৈতিক প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং গবেষণাচর্চা সকল ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও এই নামে কোন প্রশাসনিক জনপদ নেই। কিন্তু কিভাবে এই শব্দটি মানুষের মনের ভাবনায় স্থান পেল, এ নিয়ে বিভিন্ন রকম তত্ত্বের উদ্ভব হল এবং ক্রমশ এই শব্দ এক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

আলোচনার শুরুতে উত্তরবঙ্গ বলতে আমরা কি বুঝি সে সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। উত্তরবঙ্গ বলতে যে ভূখণ্ডের ছবি আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তা হল বর্তমান উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা—মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বর্তমান পরিসীমার সঙ্গে প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের উত্তরবঙ্গের যথেষ্ট পার্থক ছিল। তখন উত্তরবঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল অবিভক্ত রাজশাহী বিভাগের দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দার্জিলিং, কোচবিহার দেশীয় রাজ্য, পূর্ণিয়ার একাংশ, অবিভক্ত নদীয়ার একাংশ, আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপের একাংশ। তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা উত্তরবঙ্গকে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ বলে অভিহিত করতেন। দেশবিভাগের ফলে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের অনেকাংশই তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

আমাদের আলোচ্য বিষয়কে দুটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করব—প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব ও স্বাধীনতাত্তোর পর্ব। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে দেখা যায় যে উত্তরবঙ্গ শব্দটি ঐ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মানসলোকে স্থান পেয়েছিল তা সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছিল। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর কালে দেখা যায় যে এই শব্দ ক্রমশ এক সত্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। আমাদের আলোচনাতে স্বাভাবিকভাবে বর্তমান বাংলাদেশস্থিত উত্তরবঙ্গ ও অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে উত্তরবঙ্গ শব্দের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ ইতিহাসের উষাকাল থেকে উত্তরবঙ্গ নামীয় ভৌগলিক ভূখণ্ডের লোকেরা প্রতি যুগেই একটি করে নাম নিয়েছে নিজেদের স্বকীয়তাকে বোঝানোর জন্য। কখনও পুন্ড্র, কখনও বরেন্দ্র কখনও গৌড় এবং সবশেষে উত্তরবঙ্গ। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজেন্দ্র চোল যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন তখন ঐ অঞ্চলকে তিনি

'উত্তীর লাঢ়ম' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই শব্দ দুটির অর্থ হল যা রাঢ়ের উত্তরে অবস্থিত। নবম ও দশম শতাব্দীর লিপি সমূহ থেকে জানা যায় যে, পাল যুগের শেষে বঙ্গদেশ উত্তর ও অনুত্তর নামে বিভক্ত ছিল।[১] মধ্যযুগে কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীতে উত্তরদেশ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন।

এগার নিগড়ে যখন বারতে প্রবেশ
হেনবেলা পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ।

সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারের কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় 'উত্তরবঙ্গ' নয় তবে 'উত্তরবাঙালা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (ইংরেজি ১৮৮০ সালে) 'বাঙালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "উত্তর বাঙ্গালা, দক্ষিণ বাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলজি জয় করিতে পারে নাই।"[২] এরপর আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'উত্তর বাঙলা মুসলমানদের হাতছাড়া হইয়াছে।'[৩] দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে ও তিনি এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন "পূর্ব্বকালে উত্তরবাঙ্গালায় নীলধ্বজ বংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন।"[৪]

উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৮৭ সালে। ঐ বৎসর রংপুরের মহীগঞ্জ থেকে 'উত্তরবঙ্গ হিতৈষী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।[৫] ১৮৯৭ সালে নিখিল নাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারের পরবর্তী উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহার করেছেন। ১৯০১ সালে তিনি 'বাঙালী' শিরোনামের প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহার করেছেন। ১৯০৮ সালে 'উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ' নামে প্রবাসী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ সময়েই রংপুরের 'সাহিত্য' পত্রিকায় হরগোপাল দাসকুণ্ডু 'উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার' শিরোনামে তিনটি পর্বে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।[৭]

এছাড়া এই সময় প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যাপকভাবে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙলার ইতিহাস' (১৯১৭) গ্রন্থে উত্তরবঙ্গ শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। রাজেন্দ্রলাল আচার্য তাঁর 'বাঙালীর বল' গ্রন্থে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৮] নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন "মৌর্য আমলে

উত্তরবঙ্গ মৌর্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।"[৯]

ইংরেজিতে North Bengal শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিল ১৮৭৮ সালের Famine Commission.[১০] ১৮৮০ সালে Brahmo Public Opinion এ North Bengal শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল।[১১] বিংশ শতকের শুরুতে বাংলায় উত্তরবঙ্গ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখে ইংরেজ কর্মচারীরাও সম্ভবত North Bengal শব্দটির ব্যবহার শুরু করেছিল। 1901 সালে C. E. Buckland 'Bengal under the Lieutenant Governors' গ্রন্থে একাধিকবার North Bengal শব্দটি ব্যবহার করেছেন। Census of India 1901 ও 1911 এ বহুবার North Bengal শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিভিন্নভাবে উত্তরবঙ্গ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। আসলে অবচেতন বা সচেতন যেভাবেই হোক না কেন এই অঞ্চলের পরিচয় দেওয়ার জন্য সকলে উত্তরবঙ্গ শব্দকেই বেছে নিয়েছিল।

সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিতে উত্তরবঙ্গ ভাবনার প্রতিফলন ঃ

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উত্তরবঙ্গ সম্পর্কিত ভাবনার ফলস্বরূপ উত্তরবঙ্গ নামাঙ্কিত বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র পত্রিকায় ও এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়।

সংগঠিতভাবে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারের প্রথম উদ্যোগ নেয় রংপুর সাহিত্য পরিষদ। এই সংস্থা ১৯০৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এই সংস্থার মুখপত্র রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা উত্তরবঙ্গ চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই পত্রিকার বিষয়বস্তু ছিল উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রভৃতি।[১২] রংপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগেই উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন শুরু হয়েছিল। ১৯০৮ সালে রংপুর শহরে এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গীয় নামীয় ভৌগোলিক ভূখণ্ডের গৌরব পুনরুদ্ধার করা। প্রায় দুই দশক ধরে এই সম্মেলনের অস্তিত্ব বজায় ছিল। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছিলেন "......... এক সময়ে, সমগ্র বঙ্গদেশের প্রাণ এই উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র প্রদেশেই বিশেষভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, এখানে আসিয়া সকলেই ... অনির্বচনীয় স্বাতন্ত্র লিপ্সায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙালির নাম ভারতবিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিলেন।"[১৩] ১৯০৯ খ্রিঃ বগুড়ায় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে উত্তরবঙ্গীয় সারস্বত ভবন স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৪]

রংপুর সাহিত্য পরিষদ ছাড়া ও রাজশাহী ... বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি উত্তরবঙ্গ

চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বরেন্দ্র নামটি গ্রহণ করে এরা প্রাচীন উত্তরবঙ্গের গৌরবকেই প্রচার করতে চেয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ছিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন। সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর মতে কলকাতার কেন্দ্রীকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।[১৫] Dr. N. N. Bhattacharya বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "... such a glorious achievement was treated with absolute indifference by Calcutta based scholars and intellectuals."[১৬] তবে একথা ঠিক যে যারা উত্তরবঙ্গ শব্দকে ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্রতার ধারা হিসাবে ব্যবহার করেছেন তারা সকলেই ছিলেন উত্তরবঙ্গের লোক।

এইভাবে প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে উত্তরবঙ্গ শব্দটি ভাবনা থেকে ক্রমশ তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

স্বাধীনতাত্তোর পর্বে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহার ঃ

দেশবিভাগের ফলে উত্তরবঙ্গ খণ্ডবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে এবং সর্বোপরি কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই ভৌগোলিক ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা মানসিক বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করেছিল। ফরাক্কা সেতু তৈরি হওয়ার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা দূর হলে ও মানসিক বিচ্ছিন্নতা কমেনি। এই বিচ্ছিন্নতাই উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারে নতুন করে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

পাকিস্তানস্থিত উত্তরবঙ্গের তুলনায় ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারের বেশি প্রবণতা দেখা যায়। যদিও রংপুর রাজশাহী অর্থাৎ যেসব জায়গায় এই শব্দ বেশি ব্যবহৃত হত সে জায়গাগুলি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তবে বলা যেতে পারে যে ঐ সব অঞ্চল থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে যারা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে বসবাস শুরু করেছিল তারাই উত্তরবঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করতে লাগল। এই সময়েই কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে ও উত্তরবঙ্গ শব্দের ব্যবহার শুরু হল, পূর্বে কিন্তু তারা এই অঞ্চলকে পূর্ববঙ্গ বলে অভিহিত করত। ক্রমশ সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থা, জাতীয় আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সকলেই উত্তরবঙ্গ শব্দ প্রচারে এগিয়ে এল।

যেমন ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম সংসদীয় নির্বাচনের সময় উত্তরবঙ্গের নির্বাচনি কেন্দ্রের নাম ছিল North Bengal Constituency. একইভাবে

পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের নির্বাচনের সময় "উত্তরবঙ্গ স্নাতক মণ্ডলী" নামে একটি নির্বাচনী কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ১৯৫৩ খ্রিঃ এদেশ কংগ্রেস দার্জিলিং এ উত্তরবঙ্গ কংগ্রেসকর্মী সম্মেলনের আহ্বান করেছিলেন।[১৬] এরপর থেকে ব্যাপকভাবে উত্তরবঙ্গের ব্যবহার দেখা যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

ক্রমশ বেসরকারিভাবে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। গড়ে উঠল উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ (১৯৫২), উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতিক সংঘ, জলপাইগুড়ি (১৯৬১), উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্রপত্র পত্রিকা সংসদ (১৯৭২) উত্তরবঙ্গ তপশিলি জাতি আদিবাসী সংগঠন (১৯৮১) প্রভৃতি। শুরু হয়েছে বাৎসরিক উত্তরবঙ্গ মেলা (১৯৭৪), উত্তরবঙ্গ কৃষি মেলা (১৯৮২) ও উত্তরবঙ্গ বই মেলা (১৯৮০)।

আলোচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গেও উত্তরবঙ্গ শব্দটির অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর গড়ে ওঠে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ (১৯৬৭), উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কোচবিহার) প্রভৃতি। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় গবেষণারত কিংবা গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তুর পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গ গবেষণাপত্রই বেশি।

তবে উত্তরবঙ্গের এই স্বাতন্ত্র্য ভাবনার বিকাশে এই অঞ্চলের সাময়িক পত্রিকা, ক্ষুদ্র পত্রিকার ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জলপাইগুড়ির প্রাচীনতম সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৫৭ সালে কলকাতার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে লিখেছে।

"আমাদের উত্তরবঙ্গও পিছাইয়া নাই। তাহার সুদীর্ঘকালের কত কৃষ্টি, কত সংস্কৃতি।"[১৭] এরূপ আরো অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মানসলোকও উত্তরবঙ্গ ভাবনায় আচ্ছন্ন। যদিও সরকারিভাবে সেখানে কখনও উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হয় না। পূর্ববঙ্গ যখন পূর্ব পাকিস্তান হয়েছিল তখন থেকেই উত্তরবঙ্গ নামযুক্ত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, পত্রিকার নামকরণ নতুন করে শুরু হয়েছিল। ১৯৫১ সালে রংপুরে 'নর্থবেঙ্গল ইসলামিয়া লাইব্রেরি' নামে একটি প্রকাশক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে বগুড়া থেকে 'উত্তরবঙ্গ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানকার পত্রপত্রিকায় উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন বগুড়ায় বহুল প্রচারিত দৈনিক করতোয়ার একটি শিরোনাম হল "রাজশাহীর সাথে উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।"[১৮]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে উত্তরবঙ্গ শব্দের ব্যবহার পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পুরনো। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার সময় Eastern Bengal শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ শব্দের জন্ম দেশবিভাগগত কারণে। অপরদিকে উত্তরবঙ্গ শব্দ ভৌগোলিক সূচক হিসাবে উনিশ শতকেই ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি ঔপনিবেশিক সরকারের দেওয়া নাম। এটি ঐ অঞ্চলের বৌদ্ধিক সমাজের চিন্তাপ্রসূত নাম।[১১] তবে দেশবিভাগের পর এই নাম রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ায় একপৃথক সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সত্তা কোন বিচ্ছিন্নতা নয়, এটি এই অঞ্চলের স্বাতন্ত্রতার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন "বাংলাদেশের ইতিহাসে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়-বরেন্দ্রর ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়, অন্তরের ভাগও ছিল। তার সঙ্গে সমাজেরও মিল ছিল না।" তিনি সম্ভবত এই অঞ্চলের বহুজাতি উপজাতি গোষ্ঠীর মিলিত পৃথক সাংস্কৃতিক বাতাবরণের কথাই বলতে চেয়েছেন।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। সুর, অতুল—বাঙালার সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ৩

২। হালদাব, গোপাল—বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, পৃঃ ৪৩৪

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী—তৃতীয় ভাগ, আনন্দমঠ, পৃ· ৬৯

৪। প্রাগুক্ত, দেবীচৌধুরাণী, পৃ. ১৯

৫। মামুণ, মুনতাসীর—উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র, ঢাকা ১৯৮৫, পৃঃ ৭২

৬। রায়, নিখিল নাথ—মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃঃ ৩৩৭

৭। সাহিত্য—পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩১৮, রংপুর

৮। আচার্য, রাজেন্দ্রলাল—বাঙালীর বল, পৃ ৬৭

৯। রায়, নীহাররঞ্জন—বাঙালীব ইতিহাস, পৃঃ ২০০

১০। Roy Chowdhury, P.C.—Bihar District Gaezetteers : Purnea, P-82

১১। Ghosh, Benoy - Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal, Vol - VII, P-146.

১২। রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, আশ্বিন ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

১৩। প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণী—উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, পৃ: ৪০

১৪। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫২

১৫। চৌধুরী, প্রমথ—প্রবন্ধ সংগ্রহ, পৃ: ৫৬

১৬। Banerjee, Tarashankar (edt) - Historiography in Modern Indian Languages P - 101

১৭। সাপ্তাহিক চলতিকথা—প্রথমবর্ষ, ১লা অক্টোবর ১৯৫০, শিলিগুড়ি

১৮। সাপ্তাহিক ত্রিস্রোতা—২৮.৪.৫৭, জলপাইগুড়ি

১৯। দৈনিক করাতোয়া—১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, বগুড়া।

২০। 'উত্তরবঙ্গের শব্দের ও জনজীবনে তাঁব প্রতিক্রিয়া—ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ, মৈত্রায়ণী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে প্রকাশিত, ১৯৯২।

উনিশ ও বিশ শতকের উত্তরবঙ্গের কৃষি পণ্য বাণিজ্য প্রসঙ্গে কিছু কথা

সুজিত ঘোষ

অখণ্ডবঙ্গে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলি প্রাক্ দেশবিভাগের পর্বে প্রশাসনিক ভাবে রাজশাহী বিভাগ হিসাবে এবং স্বাধীনতার উত্তরপর্বে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলি জলপাইগুড়ি বিভাগ হিসাবে পরিচিত। রাজসাহী ও জলপাইগুড়ি বিভাগ হিসাবে প্রশাসনিক ভাবে পরিচয় পেলেও উত্তরবঙ্গ বলেই এই জেলাগুলি সমধিক পরিচিত। ঔপনিবেশিক সময়কালে এই অঞ্চলের কৃষিপণ্য বাণিজ্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করাই বর্তমান নিবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য। তবে শাখা উদ্দেশ্যও কিছু আছে।

বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে উপনিবেশিক বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির বিশেষতঃ ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য মালদহ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে শুরু হয়েছিল। আর প্রশাসনিক ভাবে এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত ঘটেছিল বক্সার যুদ্ধের পরে রংপুর অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানির অধিকার আসার পরে। ১৭৬৫তে রংপুর অঞ্চলে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও আজকের উত্তরবঙ্গে তখন কোম্পানির শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল ১৮৬৪-৬৫ সালে ইঙ্গ-ভুটান দুয়ার যুদ্ধের পরে। কারণ এই দুয়ার যুদ্ধের ফলস্বরূপ কোম্পানি ভুটানের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং ১৮৬৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম হয়। এই জলপাইগুড়ি জেলার জন্মের পরেই আজকের যে উত্তরবঙ্গ আমরা দেখতে পাই তার সূচনা হয়েছিল বলে স্থানীয় ইতিহাসবিদ্‌দের অনেকেই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। এই নূতন অঞ্চলগুলি শাসন করার জন্য ইংরেজ ভারত সরকার রাজশাহী বিভাগের সূচনা করেছিলেন এবং যার প্রধান দপ্তর ছিল জলপাইগুড়িতে। এই বিভাগের মধ্যে জলপাইগুড়ি, মালদা, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, দার্জিলিং এবং দেশীয় রাজ্য কোচবিহারও যুক্ত ছিল। এই প্রশাসনিক ভৌগোলিক অঞ্চলের উনিশ ও বিশ শতকের কৃষিপণ্য বাণিজ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করব পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে এই অঞ্চলও খণ্ডিত হয়েছিল। তাই আলোচনা ক্যানভাসটি সাধারণভাবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।[1]

উনিশ ও বিশ শতককে আমরা উপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাল হিসাবেও আখ্যায়িত করছি। এই উপনিবেশিক শাসনপর্বে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলেও

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা এবং সর্বোপরি উপনিবেশিক অর্থনৈতিক স্বার্থেই শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। এই সম্প্রসারণের কারণগুলি মৌলিক হলেও এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যতার জন্য একটা স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। এই স্বকীয়তা যেমন জনবিন্যাস হয়েছে তেমনই যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যও এই অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সংগঠিত আকারে কোন বাণিজ্যিক বর্ণগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। রাজশাহী, মালদা ও দিনাজপুরে কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং ও রংপুরে স্থানীয় কোন বণিক সম্প্রদায়ের কথা জানা যায় নি এখনও পর্যন্ত। এর ফলে পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যপণ্যের যে প্রসার হচ্ছে তার সিংহভাগই নিয়ন্ত্রণ করছে বহিরাগত অবাঙ্গালি এবং এই অঞ্চলের বাইরের বণিক গোষ্ঠী। ফলে আমাদের আলোচ্য পর্বে স্থানিক বণিক গোষ্ঠীর শিল্প ও কৃষি বাণিজ্য পণ্যের ব্যবসায় অংশ গ্রহণের তেমন নজির পাই না।

সাধারণভাবে রেলপথ পরিবহণ শুরু হওয়ার সূত্রেই শিল্প ও কৃষি বাণিজ্যের প্রসার বেড়ে গিয়েছিল বলে অর্থনীতিবিদ্‌দের অভিমত। এ অঞ্চলেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৮৭৮ সালে North Bengal State Railway মানচিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর পিছনে British বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্যিক স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তা কতটা ব্যাপক ছিল। আবার একইভাবে Darjeeling Himalayan Railway স্থাপনের পেছনেও বাণিজ্যিক—অর্থনৈতিক কারণ বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল। এর কারণ হল এই অঞ্চলের কৃষিপণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করার একটা প্রয়াস। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহারের কাঠ, চা, পাট, তামাক, কমলা, এলাচ ও সিঙ্কোনাকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হয়েছিল। আবার উত্তরবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের দিনাজপুরের ধান ও আখ এবং মালদহের রেশম ও ধান প্রভৃতি কৃষিপণ্যকেও বাণিজ্যিক সম্পদে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কাবণ দিনাজপুর হল উত্তরবঙ্গের প্রধান ধান উৎপাদনকারী জেলা অন্যদিকে মালদহ হল রেশম, ধান ও আম উৎপাদনকারী জেলা। মালদা ও দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলের লোকমুখে এখনও একথা প্রচলিত যে—

আম, রেশম, ধান
এই তিন মালদার জান।।
চাল, চূড়া, গুড়
এই তিনে দিনাজপুর।।

দিনাজপুরকে এখনও Granary of North Bengal বলা হয়ে থাকে।

জেলাওয়ারিভাবে ধানের ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতি জেলাতে কমবেশি ধান উৎপন্ন হয়ে থাকলেও দিনাজপুরের নাম এ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধান রপ্তানিতেও পশ্চিম দিনাজপুরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।[১] ধান চাল এর ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ চালের কল স্থাপনের ক্ষেত্রে মারওয়াড়ী বণিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে বেশি চালের স্থাপিত হয়েছিল দিনাজপুর জেলাতে আর এই জেলার বেশি সংখ্যক চালের কলের মালিক ছিলেন মারওয়াড়ীরা তবে মারওয়াড়ীরা কিসূত্রে এই ধান চালের ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল তা নিবিড় গবেষণার অপেক্ষা রাখে। আমরা লক্ষ্য করেছি এই অঞ্চলের ধানচালের পাইকারি ব্যবসাটা সাহা ও তিলিরা নিয়ন্ত্রণ করলেও চালের কলের মালিক ছিলেন প্রায় সকলেই মারওয়াড়ী।

ধানের ব্যবসার পরেই উত্তরবঙ্গের অন্যতম অর্থকরী কৃষিপণ্য হল পাট এবং এখনও কাঁচাপাট উৎপাদনে একটা বড় অংশই উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলি উৎপাদন করে থাকে। এই অঞ্চলে পাটের ব্যবসা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলে মনে করা হয়। তবে পাট চাষের অঞ্চলগুলি উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চল এবং পূর্ববঙ্গ হলেও পাটকলগুলি সবই স্থাপিত হয়েছিল কোলকাতা ও হাওড়া সন্নিহিত অঞ্চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে পাটের চাহিদা দ্রুত বেড়ে যায় এবং পাটের গুরুত্বও বেড়ে গিয়েছিল অর্থনৈতিক ফসল হিসাবে। উনিশ শতকের শেষার্দ্ধ থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি সময়কালে পাট ব্যবসা বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছিল। এই পাট ব্যবসাটা উপরের স্তরে মারওয়াড়ী বণিকগোষ্ঠী পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতো Thomas A Timberg তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Marwaris From Traders to Industries" তে বলেছেন, Jute became a Marwari Trade.[২] অবশ্য বহু ইউরোপীয় কোম্পানিও পাটের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইউরোপীয় এরকম একটি পাট ব্যবসায়ী কোম্পানি হল বার্কমায়ার কোম্পানি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে বর্ধমান রোডের ধারে মহানন্দা নদীর তীরে এই কোম্পানির বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে গুদাম ছিল।[৩] এছাড়া শিলিগুড়িতে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় পাট কোম্পানির শাখা অফিস ছিল। যথা— রেলী ব্রাদার্স, ল্যাণ্ডেন ক্লার্ক, আরসীম ইত্যাদি।[৪] এই সকল ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি মাটিগাড়া হাট থেকে পাট কিনে কলকাতার অফিসে চালান দিত। এই সকল কোম্পানিগুলিতে নিযুক্ত কর্মচারীরা বেশিরভাগই ছিলেন বাঙ্গালি।[৫] আলোচ্য সময়কালে পাটের ব্যবসা কি বিপুলভাবে প্রসারিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বিভিন্ন জেলায় বড় বড় পাটগোলা বা পাটগুদামের অস্তিত্বে। জলপাইগুড়ি হোক আর

কোচবিহারই হোক সর্বত্রই পাটগোলা বা পাটগুদামের অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করে থাকি। এই পাট ব্যবসার সঙ্গে নীচের স্তরে অবশ্য পূর্ববাংলার সাহা, তিলি, বণিকরা বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় মারওয়াড়ীদের ব্যাপক উপস্থিতি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

উনিশ ও বিশ শতকে তৃতীয় যে পণ্যটির বাণিজ্য বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গে সম্প্রসারিত হয়েছিল তা হল কাঠের ব্যবসা। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চল জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং কাষ্ঠ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের বিরাট অংশ বনে পরিপূর্ণ ছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে এই কিংবদন্তি জঙ্গলের কিছুটা চেহারা পাওয়া যায়। ডঃ বরুণ দে ও প্রণব রঞ্জন রায় তাঁদের "Notes for Darjeeling"—এই নিবন্ধে এ অঞ্চলের কাঠ ও কাঠের ব্যবসা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনে কাঠের ব্যবসা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা চা চাস ও চা ব্যবসার বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে প্রাক্ ইংরেজ শাসন পর্বে ঐ অঞ্চলে কাঠ ব্যবসা চালু ছিল বলে কোন উপযুক্ত তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি। কাঠকে অর্থনৈতিক সামগ্রী হিসাবে রূপান্তরিত করে এ ব্যবসার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ইংরেজ বণিকরা। জনৈক ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী স্যার যোশেফ ডাল্টন হুকার ইংরেজ শাসনের আদি পর্বে এ অঞ্চলের কাঠের ব্যবসার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সুবিখ্যাত "Himalayan Journals" গ্রন্থে।[৭]

বণিক ইংরেজ কোম্পানি বন-সম্পদ সম্পর্কে সচেতন ছিল। পূর্ণিয়া সংলগ্ন মোরং ও তরাই ছিল বন-এ পরিপূর্ণ। কোম্পানির বণিকেরা মোরং-এ কাঠের ব্যবসার জন্য লণ্ডনের কোর্ট অব্ ডাইরেক্টার্সের নিকট অনুমতি চেয়েছিল এবং ব্যবসাটাও শুরু করেছিল। তবে কোম্পানির বণিকরা কাঠ ব্যবসা শুরু করলেও পরবর্তীতে তারা এ ব্যবসা আর বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে নি। এই সময় চা চাষ ও চা ব্যবসার প্রতি তাদের প্রবল ঝোঁকই সম্ভবত কাঠ ব্যবসার প্রতি তারা কম গুরুত্ব দিতে থাকে। যাইহোক কোম্পানি বণিকদের কাঠ ব্যবসায়ে শিথিলতা বাঙ্গালিদেরকে এই ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে। এ সময়ে কোম্পানির বণিকরা চা বাগান ও চা চাষযোগ্য জমির প্রসারের জন্য যে ব্যাপক হারে বৃক্ষচ্ছেদন শুরু করে তা ব্যাপকহারে কাঠ ব্যবসায়ের প্রতি ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙ্গালিদের উৎসাহিত করে তোলে। পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের বাঙ্গালিরা একে একে তরাই, ডুয়ার্স এবং আসাম অঞ্চলে আসতে শুরু করে কাঠের ব্যবসার উদ্দেশে। উত্তরবঙ্গের অপেশাদার গবেষক চোমং লামা তাঁর "চোমং লামার

চোখে উত্তরবঙ্গ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে তরাই অঞ্চলে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙ্গালিদের প্রধান তিনটি জীবিকার একটি হল কাঠ ব্যবসা।[৮] আমাদের আলোচ্য পর্বে কাঠের ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করলে দেখা যায় ৯০ শতাংশই ছিল পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি এবং কিছু বর্ধমানের বাঙ্গালি। ব্যাপক অনুসন্ধান করলে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলের বহু বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের কেউ না কেউ এক সময় কাঠের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আলোচ্য সময়ে জলপাইগুড়ির উল্লেখযোগ্য কাঠব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামেশ্বর লাহিড়ী ও বিহারীলাল গাঙ্গুলী। জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের পূর্বেই রাজগঞ্জ থানার করতোয়া নদীর ধারে সুখানি এলাকায় বয়রা বন্দর মারফৎ কাঠের ব্যবসা চলত।[৯] শিলিগুড়িতেও এই সময় কাঠের ব্যবসা একটি প্রধান ব্যবসা ছিল। শিলিগুড়ির আদিপর্বের কাঠ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আবদুল গফর খাঁ, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র দত্ত, মন্মথনাথ সরকার ও নিবারণচন্দ্র ঘটক প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের সকলেই কেউ কেউ পূর্ববঙ্গ আবার কেউ কেউ বর্ধমান থেকে এসেছিলেন শিলিগুড়িতে।[১০] একইভাবে কাঠের ব্যবসায়ের সূত্রে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙ্গালিদের আগমন ঘটেছিল এবং এখনও আসামে কাঠের ব্যবসায় বাঙ্গালিদের মুখ্যভূমিকা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই কাঠ ব্যবসা থেকে উদ্বৃত্ত টাকা বাঙ্গালি কাঠ ব্যবসায়ীরা চা বাগানে বিনিয়োগ করেছিল।[১১] সুতরাং কাঠের ব্যবসা সেই সময়ে বেশ কিছু পরিবারের আর্থিক স্থিতি এনে দিয়েছিল এবং তারা সমাজে একটি নতুন শ্রেণীর তৈরি[৬] করেছিল। একটি বিষয় আরো লক্ষ্য করার যে এই কাঠ ব্যবসা ও চা ব্যবসা বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রসারের ফলে জলপাইগুড়িতে একে একে বহু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির অর্থনীতি চা শিল্পকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধ হয়েছে বলা হয়ে থাকলেও এ কথা অবশ্যই বলতে হয় যে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির অর্থনীতির সমৃদ্ধ সাধনে কাঠের ব্যবসায়ের একটা বড় ভূমিকা ছিল। যাইহোক, এই আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে এই একটি মাত্র ব্যবসায় (কাঠ ব্যবসায়) বাঙ্গালিদের একচেটিয়াত্ব ছিল এবং কোম্পানির বণিকরা যদি এ ব্যবসায় পরবর্তীতে শিথিলতা প্রদর্শন না করত তা হলে হয়তো বাঙ্গালিদের পক্ষে এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ সহজ হতো কিনা বলার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং এই ব্যবসায় বাঙ্গালিদের একচেটিয়াত্ব অর্থনীতির গবেষণার ছাত্রদের নিকট এক বিস্ময়ের ব্যাপার। কারণ আমাদের আলোচ্য সময়েও নয় এবং এখনও পর্যন্তও নয় মারওয়াড়ীরা এই ব্যবসায় প্রবেশ করেছে। অধিকাংশ ব্যবসায়েই মারওয়াড়ীদের ব্যাপক প্রবেশ ও আয়ত্বে থাকলেও অর্থাৎ ধান, পাট, চাল প্রভৃতি আবহমানের কৃষিপণ্য ব্যবসাগুলি করছে মারওয়াড়ীরা আর বাঙ্গালিরা করছে কাঠের

ব্যবসা। সুতরাং কাষ্ঠ ব্যবসায়ের প্রতি মারওয়াড়ীদের অনীহা অর্থনীতির ছাত্র ও গবেষকদের কাছে নিবিড় গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

রেশম উৎপাদন এবং রেশম বস্ত্রে মালদার খ্যাতি বহুশতাব্দী কালের। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পর্বে মালদহে কাঁচা রেশমের উৎপাদন হলেও রেশমবস্ত্র উৎপাদনের খবর খুব একটা পাওয়া যায় না। মালদার মহানন্দা নদীর দক্ষিণ তীরে ইংলিশ বাজার বা ইংরেজবাদে সপ্তদশ শতকে যে ডাচ্ এবং ফরাসি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল তার মূখ্য কারণ অবশ্যই রেশমের উৎপাদন ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করে। কারণ ফরাসিরা এখানে রেশমের কারখানাও তৈরি করেছিল।[১২] ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা এখানে রেশমের কারখানা তৈরি করেছিল এবং এখনও সেই কারখানার কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে। ইংরেজবাদের পার্শ্ববর্তী লকড়িখানা, মুর্গখানা, প্রভৃতি নামের স্থানগুলি ইংরেজ বসতির সাক্ষ্য দেয়। যাইহোক ১৮৩৩ খ্রিঃ আইনের ফলে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান হয়। এ কথা বলা যেতে পারে যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসানে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রিত মালদার রেশমবস্ত্র উৎপাদনেরও অবনতি ঘটতে থাকে। এর পর থেকে দেখা যায় যে, মালদা কেবলমাত্র কাঁচা রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে এবং এই কাঁচা রেশম কাশী ও বেনারসের রেশম শিল্পে কাঁচা মাল হিসাবে রপ্তানি হতে থাকে। এই কাঁচা রেশমের ব্যবসায় ভারতীয়দের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বর্ধমান থেকে আগত তিলি ব্যবসায়ীরা এবং মারওয়াড়ী ও পোদ্দার, সাটিয়ার প্রভৃতি বণিকগোষ্ঠী মালদার কাঁচা রেশমের কারবারি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল।[১৩] এখানে উল্লেখ করা ভাল যে মারওয়াড়ীরা সেন আমলেই এখানে এসেছিল বলে অনেক স্থানীয় ইতিহাসবিদ্ অনুমান করেছেন। আর এই বর্ধমানের তিলি বণিক সম্প্রদায় বর্গী হাঙ্গামার সময় পালিয়ে এসেছিল গৌড়বঙ্গে। মালদাতে আমরা গিরি ও সন্ন্যাসী পদবিধারী বহু বণিক গোষ্ঠী দেখতে পাই, এরা অবশ্য ইংরেজ আমলের সূচনা থেকেই ব্যবসা করতেন।

১৮৩৪ সালে উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের দার্জিলিং অঞ্চলে (তাক্ভার, মকাইবাড়ি, পাংখাবাড়ি) চায়ের আবাদ শুরু করে ব্রিটিশ বণিক গোষ্ঠী। এরপর তারা সমতলে অর্থাৎ তরাই অঞ্চলে ১৮৬৪ সালে চায়ের আবাদ শুরু করে। তবে চা-কররা উত্তরবঙ্গে চায়ের আবাদ শুরু করলেও কিছু দিনের মধ্যে বাঙ্গালিরা ইংরেজ চা-করদের সঙ্গের সমান তালে পা রেখে এই নতুন কৃষিপণ্য বাণিজ্য শিল্পে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৮৭৯ সালে বাঙ্গালিরা জলপাইগুড়িতে চা কোম্পানি খোলে।[১৪] ধীরে ধীরে এই কৃষিপণ্যের বাণিজ্যটি বাঙ্গালির হাতেই হস্তান্তরিত হতে থাকে। এইভাবে লক্ষ্য করা যায় যে আসামে সুরমা ভ্যালি ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও বাঙ্গালিরা চা বাগান ও চা শিল্প

গড়ে তোলে। এই চাবাগানের সূত্রে বিপুলহারে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বাঙ্গালির আগমন ঘটেছিল জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে (১৯২৯-৩৩ খ্রিঃ) অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মহানন্দার সময়কাল থেকে চা শিল্প বাঙ্গালিদের হাত থেকে ক্রমে অবাঙ্গালিদের হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকে এবং সেই হস্তান্তর এখনও চলছে। ফলে চা শিল্পে বাঙ্গালিদের সে গৌরবের সূর্য উদিত হয়েছিল তা আজ প্রায় অস্তমিত। এছাড়া, পার্বত্য উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ দার্জিলিং জেলা এবং সিকিম রাজ্য ও ভুটান রাষ্ট্রের সানুদেশ অঞ্চলের কৃষিপণ্য সম্পর্কে বলা যায় যে চা ছাড়াও কাঠ, কমলালেবু, এলাচ এবং সিঙ্কোনা ছিল পার্বত্য উত্তরবঙ্গের মূখ্য কৃষিপণ্য। ১৮৬৯ সালে কালিম্পঙ্-এর বিয়াং উপত্যকায় সিঙ্কোনার চাষ শুরু হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই মংপু ও সিতং উপত্যকাতেও সিঙ্কোনার চাষ বিস্তৃত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে সিঙ্কোনা, কমলা, এলাচ প্রভৃতি পণ্যের ব্যবসাগুলিতে অধিকাংশই নেপালী ও ভুটিয়ারা যুক্ত ছিল। "ভুটিয়া সিঙ্কোনা এ্যাসোসিয়েশন"[১৫] এই নামের মধ্যে থেকেই তা অনুধাবন করা যেতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে এই সকল ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো তিব্বতীয় বণিকরা এবং তারা এই বাণিজ্যের মূখ্য ভূমিকায় ছিল। সিঙ্কোনা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কালিম্পঙ্। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে দার্জিলিং শহরের উদ্ভবের বহু পূর্ব থেকেই কালিম্পঙ্ ছিল পার্বত্য শহরের বাণিজ্যিক বন্দর এবং এ কথা আরও স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে ১৯৬২ সালের চীন ভারত যুদ্ধ পর্যন্তও কালিম্পঙ্ই ছিল হিমালয়ের এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক নগরী। এবং এই কারণে অনেক অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ বলতেন কালিম্পং হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নগরী।

সর্বশেষে বলা যায় যে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে কৃষিপণ্য বাণিজ্যে মূলতঃ স্থানীয় বণিক গোষ্ঠীর উপস্থিতি নাই বললেই চলে এবং এখানে বহিরাগত শব্দ ব্যবহার না করে অন্য অঞ্চলের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বলাটাই সমীচীন বলে মনে হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কৃষিপণ্য বাণিজ্যে অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে আলোচ্য সময়সূচি পর্বে উত্তরবঙ্গে functional Caste বা বৃত্তিমূলক শ্রেণী ও পেশা বলতে কিছু পাওয়া যায় না। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তাঁর Structure of the Hindu Society গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে রাজবংশী বর্ণব্যবস্থা ও সমাজে Caste System লক্ষ্য করা যায় না।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। Gazetteer of India, West Bengal, West Dinajpur by Jatindra

Chandra Sengupta - April - 1965, page - 126

২। The Marwaris from traders to industries - Thomas. A. Timberg. Vikas Publishing House PVT LTD, New Delhi - 1978, page - 57.

৩। শিলিগুড়ি শহরের ইতিবৃত্ত—বিজয়চন্দ্র ঘটক, মুদ্রক - সত্য গুপ্ত, জাগৃতি প্রেস, জলপাইগুড়ি, মহাঅষ্টমী—বাং - ১৩৮৯, পৃ: - ৩৭।

৪। বিজয়চন্দ্র ঘটক—ঐ, পৃ: ৯

৫। বিজয়চন্দ্র ঘটক—ঐ, পৃ: - ৯

৬। প্রসঙ্গ বাঙ্গালীর কাঠের ব্যবসা - ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ, রীডার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, Souvenir Silver Jubilee, 1962 - 87, A. C. College of Comerce.

৭। ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ — ঐ - পৃ:

৮। চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ—চোমং লামা, পরিবেশক, চক্রবর্তী এণ্ড কোং - ১২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট - কলকাতা—১২ পৃ: ২৯

৯। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ - ঐ

১০। বিজয়চন্দ্র ঘটক —ঐ পৃ: ৪২-৪৩

১১। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ - ঐ

১২। চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ— ঐ, পৃ: ১৬২

১৩। A Statistical account of Bengal - W. W. Hunter, Vol, VII, Districts of Maldah, Rangpur and Dinajpur, Trubener and Co, London-1876 Page - 44

১৪। চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারকগ্রন্থ—জলপাইগুড়ি শহরের একশ বছর ; শিল্প ও ব্যবসা (জলপাইগুড়ি)—চারুচন্দ্র সান্যাল, পৃ: ১৪

১৫। চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ— ঐ, পৃ: ৪৪

বিংশ শতকের উত্তরবঙ্গের সমাজ আন্দোলনের খণ্ডচিত্র (১৯১৯ - ১৯৬৯)

মধুপর্ণা গুহ

উত্তর-পূর্ব ভারতের এক ক্ষুদ্র ভুখণ্ড "উত্তরবঙ্গ" তার ভৌগোলিক অবস্থান ও জনগোষ্ঠীর বিভিন্নতার জন্য এক বিকল্প সামাজিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। উত্তরবঙ্গ, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ কিন্তু তার নিজস্ব বিশিষ্টতার জন্য বাংলার বিভিন্ন সমাজ আন্দোলনের সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারেনি। বাংলার যে সব আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে উত্তরবঙ্গে সে সব আন্দোলন প্রভাব পড়ে অনেক পরে, বা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। উত্তরবঙ্গে সমাজ আন্দোলন ঘটেছিল অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন কারণে।

প্রথমেই উল্লেখ্য যে উত্তরবঙ্গ বলতে বোঝানো হয়েছে ভারত বিভাজনের পরবর্তী উত্তরবঙ্গ বা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নিয়ে গঠিত। তবে সেহেতু আলোচনাকে মূলতঃ ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই অনেকক্ষেত্রেই ভারত বিভাজনের পূর্ববর্তী উত্তরবঙ্গের কথাও প্রসঙ্গক্রমেই এসে গেছে। ১৯১৯ সালে উত্তরবঙ্গের প্রথম নৃ-গোষ্ঠী ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্ষত্রিয় সমিতির ছিল পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের সামাজিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ যা জন্ম দেয় ক্ষত্রিয় আন্দোলনকে। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন সমাজ আন্দোলন। সময়ের স্রোতে ক্রমেই কিছু কিছু সমাজ আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। ১৯৬৯ সালে উত্তরখণ্ড নামক রাজনৈতিক দল স্থাপিত হয়।

উত্তরবঙ্গে বর্ণহিন্দুর সংখ্যা খুবই সীমিত। তাই বাংলার নবজাগরণ যা মুলতঃ বর্ণহিন্দুদের আন্দোলিত করেচিল উত্তরবঙ্গে তার প্রভাব ছিল নিতান্তই সামান্য। কিছু প্রভাব অবশ্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তা অনেক পরবর্তী ঘটনা। এককথায়, উত্তরবঙ্গের এক বিশাল জনগোষ্ঠী আধুনিকতা থেকে দূরে সরে ছিল। উত্তরবঙ্গে নানা জাতি ও উপজাতির বাস। এদের মধ্যে রাজবংশী, কোচ, মেচ, রাভা, সাঁওতাল, টোটো, চাই, গারো, খেন, ধীমল, ওরাও, লেপচা, ভুটিয়া, নেপালী, মোরাংগী ইত্যাদি। এছাড়াও আছে কিছু বর্ণহিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের বাস। উত্তরবঙ্গের জনসমাজের এক বিরাট অংশ ছিল অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ। কৃষি ও

পশুপালন ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় ছিলনা বললেই চলে। নবজাগরণের তাৎক্ষণিক প্রভাব না থাকায় জাতিভেদ প্রথা সহ নানা রক্ষণশীলতার নাগপাশে আবদ্ধ ছিল সমাজ। যখন জমি ব্যবসায়িক পণ্য রূপে পরিগণিত হতে শুরু হয় বাণিজ্যের জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। জনসাধারণ ক্রমেই বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেনি ঠিকই তবে সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষা বিস্তার ও বাগিচা শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এক আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। শিক্ষা আগে ছিল উচ্চশ্রেণী যথা—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের একচেটিয়া অধিকার ক্রমেই তা সর্বজনীন হয়ে ওঠে। ফলে এক সামাজিক সচেতনতা ধীরে ধীরে জন্ম দেয় বিভিন্ন সমাজ আন্দোলনকে। ক্রমেই অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষ তাদের সামাজিক অচলায়তনের কথা উপলব্ধি করতে পারে ও সচেষ্ট হয় তাদের হারিয়ে যাওয়া অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।[২]

উত্তরবঙ্গে বর্ণাশ্রম ছিল না বা কৌলিন্য প্রথাও ছিল না। উত্তরবঙ্গে ছিল বিভিন্ন অবর্ণ এমনকি বর্ণহীন মানুষের বাস। তারা উচ্চশ্রেণীর মতো সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতে পারতো না। অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠী তথাকথিত উচ্চবর্ণের কাছে লাঞ্ছিত হোত।[৩] বিংশ শতকের প্রারম্ভে দেখা যায় যে এই সব নিগৃহীত মানুষ নিজেদের সামাজিক মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন শুরু করে। এখানে উল্লেখ্য যে ক্ষত্রিয় বলে কোন জাতি এখানে ছিল না, তাই হয়তো বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিজেকে ক্ষত্রিয় পরিগণিত করার প্রবণতা দেখা যায়।

১৯১১ সালে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্বে 'অধিকারী সমিতি' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের রংপুরের ভোটমারী নামক স্থানে। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শশীমোহন অধিকারী। তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার। এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় আসামের গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুরে। এই সমিতির মুখপত্র ছিল 'বঙ্গজননী' পত্রিকা। কিন্তু এটি আশ্চর্যের বিষয় যে এই প্রথম অধিবেশনের পর তার অধিকারী সমিতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। হয়তো এই সমিতির স্থায়িত্ব ছিল খুবই স্বল্পকালীন। প্রকৃত পক্ষে অধিকারীরা ছিল রাজবংশীদের পুরোহিত শ্রেণীভুক্ত, তারা নিজেদের অন্যান্য রাজবংশীদের তুলনায় কিছুটা উন্নত মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করতো। হয়তো বা নিম্নমর্যাদার অধিকারী রাজবংশীদের

সাথে এই অধিকারীদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থসংঘাতে 'অধিকারী সমিতি' বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। আসলে উপযুক্ত প্রমাণ ও তথ্যের অভাবে 'অধিকারী সমিতি'র ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এরপরই রাজবংশী জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্ষত্রিয় সমিতি'। ক্ষত্রিয় সমিতির পরিচালনায় উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় আন্দোলন এক যুগান্তকারী ঘটনা। আন্দোলনের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল ১৮৭২ সাল থেকেই। ১৮৭২, ১৮৮১ এবং ১৮৯১ সালের জনগণনায় কোচ, রাজবংশী ও পালিয়া এই তিন ভিন্ন জাতিকে একত্রে কোচ বলে গণ্য করা হয়। এই গণনার বিরুদ্ধে রাজবংশী সমাজ সোচ্চার হয়।[৩] ১৮৯১ সালের আদমসুমারির প্রতিবাদে হরিমোহন খাজাঞ্চীর সভাপতিত্বে গড়ে ওঠে 'রংপুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী সভা'। এই সভার পক্ষ থেকে রাজবংশীদের কোচদের থেকে পৃথক করে ক্ষত্রিয় রূপে গণ্য করার জন্য রংপুর জেলা শাসকের কাছে আর্জি জানায়। ধর্মীয় সভা নামে অপর এক সভার পণ্ডিতরাও একই অভিমত প্রকাশ করে যে রাজবংশী ও কোচেরা ভিন্ন জাতি। তাদে : এই অভিমত গৃহীত হয় ও রাজবংশীদের ব্রাত্যক্ষত্রিয হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৪]

আন্দোলন কিন্তু এখানেই থেমে যায় নি। ১৯০১ সালের জনগণনা আবার রাজবংশীয়দের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তারা জেলাশাসকের কাছে তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আপীল করে। কিন্তু সে আর্জি গৃহীত হয়নি। এরপর রাজবংশীরা আন্দোলনের পথে পা বাড়ায় ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে। পঞ্চানন বর্মা কুচবিহারের সন্তান। তিনি ক্রমেই লক্ষ্য করেন যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করছে। এই সংকটাবস্থায় পঞ্চানন বর্মা রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি তোলেন। ক্ষত্রিয় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির স্বীকৃতির জন্য ঠাকুর পঞ্চানন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।[৫]

রাজবংশীরা যেহেতু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অনেক পিছিয়ে ছিল, সামাজিক মর্যাদাতেও তাদের স্থান ছিল নিম্ন। তারা বহুবছর ধরে ব্রাত্য বা বঙ্গক্ষত্রিয় নামে পরিচিত ছিল। ব্রাত্য বা বঙ্গ ক্ষত্রিয়রা ছিল হিন্দু তথা অন্যান্য জাতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—এই তথ্যের অবতারণা করে ক্ষত্রিয় সমিতি রংপুরের তৎকালীন জেলা শাসককে আবেদন করে যাতে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় রূপে পরিগণিত করা হয়। জেলাশাসক তখন আসাম ও পূর্ববঙ্গের আদমসুমারি অধিকর্তাকে সুপারিশ করেন যে ১৯১১ সালে আদমসুমারিতে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য। তিনি আরও বলেন যে 'রাজবংশী' শব্দটি 'ক্ষত্রিয়' শব্দের পাশে বন্ধনীতে রাখতে যাতে রাজবংশীদের ভারতের অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের থেকে পৃথক করা যায়। কিন্তু কোন কোন স্থানে জনগণনাকারীরা সেই

নির্দেশ অমান্য করে, পরে অবশ্য ক্ষত্রিয় সমিতির চেষ্টায় ১৯১১ সালের জনগণনার চূড়ান্ত রিপোর্টে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা দান করা হয়, অবশ্য ক্ষত্রিয় শব্দটি ছিল বন্ধনীর ভেতরে।[৮]

এরপরই শুরু হয় তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা, সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস। ক্ষত্রিয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজবংশীদেব উপবীত ধারণের প্রস্তাব পেশ করা হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৩১০ বঙ্গাব্দে করতোয়া নদীর তীরে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান ও সাথে যজ্ঞ উপবীতের ব্যবস্থা করা হয়। হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে সমবেত হয়। এই মিলনক্ষেত্রকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে কামরূপ ও মিথিলা থেকে প্রথিতযশা সংস্কৃত পণ্ডিতদের আহ্বান করা হয়।[৮] এরপর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মিলনক্ষেত্র রচনা করে উপবীত ধারণের ব্যবস্থা করা হয়। রাজবংশীরা মনে করেছিল যে উপবীত গ্রহণের মাধ্যমেই তারা উঁচু শ্রেণীর সাথে দূরত্ব ঘোচাতে পারবে।[৮] রাজবংশীদের মধ্যে শাঁখা-সিঁদুরের ব্যবহারও তাদের সংস্কৃতায়নের অপর এক উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কুচবিহারের রাজপরিবার এই উপবীত ধারণকে সমর্থন করতে পারেনি, এমনকি কুচবিহাবে মিলনক্ষেত্র নিষিদ্ধ করা হয়।

কুচবিহারে রাজবংশীরা তাদের প্রাক্তন উপাধি 'দাস' পরিত্যাগ করে সিংহ, 'রায়', 'বর্মণ' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করে।

ঊনবিংশ শতকের শেষপ্রান্ত থেকে যে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায় যোগীরা তার থেকে পিছুপা হয়নি। আসাম ও বাংলায় যোগীরা ছিল প্রায় ছয় লক্ষ। তারা ছিল গরিব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত উপরন্তু সামাজিক শোষণের শিকার। তথাকথিত হিন্দু সমাজ এই যোগী বা নাথদের নিজেদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সমাজে যোগীরা শূদ্রের মর্যাদা ভোগ করতো। যোগীদের প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য উপবীত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেন বিষ্ণুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। এই প্রসঙ্গে অসম-বঙ্গ-যোগী-সম্মিলনীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সম্মিলনীর বেশ কটি অধিবেশন উত্তরবঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। 'গোপী সখা' নামে পত্রিকাটি ছিল এদের মুখপত্র। যোগীরা বুঝতে পারে যে তাদের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শিক্ষাবিস্তার যা যোগীদের এক নতুন আলোয় আলোকিত করবে।[১০]

যাদব ক্ষত্রিয়দেব আন্দোলন বিংশ শতকের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যাদব ক্ষত্রিয়দের একটি শাখা 'গোপ' নামে পরিচিত। ১৯০১ সালে বাবা ধর্মানন্দ মহাভারতী গোপদের শূদ্র মর্যাদার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে

যাদবরা আর্যদেরই একটি শাখা যা বৈশ্যবর্ণভুক্ত ছিল। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে (১৯২২ সাল) কলকাতায় 'বঙ্গীয় গোপ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল গোপজাতির সার্বিক উন্নয়ন। শিক্ষাবিস্তার, শিল্পোন্নয়ন, পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহ দূরীকরণের সাথে সাথে গো-সুরক্ষা ও গো-পালনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ এই সমিতির কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, তাই গোপদের আন্দোলনের প্রভাব উত্তরবঙ্গেও পড়েছিল। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি দ্বারা তারা অনেকাংশে সফল হয়েছে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে।[১১]

বিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনে রাজপুত ক্ষত্রিয়রাও সক্রিয় ছিল। এরা দীর্ঘকাল বাংলায় থাকায় বঙ্গজনস্রোতে মিশে গেছিল। বৈবাহিক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরে দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় তাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে অ-ক্ষত্রিয়দের বিয়ে করলে তারা ধীরে ধীরে তাদের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে। এই কারণে তারা দিনাজপুরে বর্ষালুপাড়ায় এক অধিবেশনের আহ্বান জানান ১৩২৫ বঙ্গাব্দে (১৯১৮ ইং)। এই বঙ্গীয় রাজপুতসভা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। রাজপুত ক্ষত্রিয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়। বঙ্গীয় রাজপুত সভার অধিবেশনে উত্তরবঙ্গের থেকে বিভিন্ন সদস্য ছিলেন। নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির দ্বারা বঙ্গীয় রাজপুত সভা রাজপুত ক্ষত্রিয়দের উন্নতি সাধনে কাজ করেছে।

১৯১৪ সালে আরেক উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল যা টানাভগৎ আন্দোলন নামে পরিচিত। যাত্রা ওঁরাও নামে এক ব্যক্তি প্রথম সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার কথা চেষ্টা করেন। প্রথমে ছোটনাগপুরে শুরু হয়, এরপরই এই আন্দোলনের প্রভাব ডুয়ার্সে দেখা যায়।[১৩] উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে এই আন্দোলন প্রথম সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল কিন্তু কালক্রমে তা রাজনৈতিক ছোঁয়া পায়। ডুয়ার্সে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি ও বাগিচা মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে।[১৪] ডুয়ার্সের ওঁরাওরা স্বাধীন ওঁরাও সমাজ স্থাপনেরও চেষ্টা করে।[১৫] ওঁরাওদের এই টানাভগৎ আন্দোলন ফলপ্রসূ না হলেও যে ওঁরাও সমাজে আমূল পরিবর্তন আনে তা স্বীকার করতেই হয়।

ছত্রিশা আন্দোলনও উত্তরবঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯২২-২৩ সালে জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে দিনাজপুরে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলে ছত্রিশটি গ্রামের ছত্রিশটি জাতি এতে অংশগ্রহণ করে ছত্রিশটি দাবি পেশ করে। এই কারণে এটি ছত্রিশা আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের স্বার্থরক্ষা। সুরেশ রঞ্জন ও আমিরুদ্দীন ছিলেন এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা। ১৯২৮ পর্যন্ত এই

আন্দোলন স্থায়ী হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার সংখ্যা অনেক হ্রাস পায়।[১৬]

১৯২৬ সালে জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে সত্যম্ শিবম্ আন্দোলন মালদায় দানা বাঁধে। এ সময় স্বরাজীরা অস্পৃশ্যদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য শুদ্ধি আন্দোলন করেছিলেন। কাশীশ্বর চক্রবর্তী নামে এক স্বরাজী শুদ্ধি আন্দোলনের বীজ বপন করেন মালদায় সাঁওতালদের মধ্যে। সাঁওতালরা এরপর হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে তাদের সামাজিক মানোন্নয়নের চেষ্টা শুরু করে। এই সাঁওতালরা নিজেদের 'সত্যম্ শিবম্' বলে পরিচয় দিত। কাশীশ্বর চক্রবর্তীর উৎসাহে সাঁওতালরা মালদায় কালীপুজোর ব্যবস্থা করে।[১৭] সাঁওতালদের এই হিন্দুত্বের আন্দোলন সাঁওতাল সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরপর জিতু সাঁওতাল পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ দখল করার চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাধে এবং জিতু সংঘর্ষে প্রাণ হারায়। সাথে সাথে তাদের আন্দোলনও থেমে যায়।[১৮]

রাভা সমাজেও কিছু সামাজিক আন্দোলন চোখে পড়ে। উত্তরবঙ্গ ছাড়াও আসামের কিছু কিছু স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে এরা ছড়িয়ে আছে। কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ভাড়োয়া গ্রামে হরিসভায় রাভাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি এতে ব্যথাতুর হয়ে ১৯৩৪ সালে রাভাদের শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করেন যাতে রাভাদের আর শূদ্র বলে পরিগণিত না করা হয়। তারা শুদ্ধিকরণের ফলে শূকর ও মুরগি পালন বন্ধ করে ও মদ্যপান ত্যাগ করে।[১৯] তারা রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলন দ্বারাও বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল এবং তারাও আন্দোলন শুরু করে রাজবংশীদের মতো সমাজের উঁচুতলায় স্থান পাওয়ার উদ্দেশে। কিন্তু সমাজের কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তি সেই সব নতুন ধর্মান্তরিত রাভাদের সমাজে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফলে আবার পুরনো প্রথা সমাজে ফিরে আসে। এরপর তাদের আন্দোলনও কিছুকাল স্থগিত থাকে।[২০]

দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন আবার শুরু হয় ১৯৪০ সালে। খ্রিষ্টান মিশনারিরা যখন ধর্মান্তকরণ শুরু করে তখন কিছু ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন যে অচিরেই রাভাদের হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় না ফিরিয়ে আনলে রাভারাও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবে। ধনেশ্বর ভট্টাচার্য নামে এক সহৃদয় ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে যজ্ঞের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করে। অনেক রাভা প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুধর্মে ফিরে আসে। তারা বর্তমানে 'দাস' উপাধি গ্রহণ করছে।[২১]

১৯৩৪ সালে দার্জিলিং এ পাহাড়ি জনগণের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল

'নেবুলা'। নেপালী, ভুটিয়া ও লেপচা—এই তিন নামের সংমিশ্রণে তৈরি নেবুলা। জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষার উন্নতির জন্যই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি জনচেতনা বৃদ্ধি করতে অনেকাংশে সফল হয়েছিল।[৯]

তামাং বুদ্ধদের আন্দোলন এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে বৌদ্ধ ধর্ম সামাজিক সমতার কথা প্রচার করলেও দার্জিলিং-এ তামাংবুদ্ধরা সামাজিক মর্যাদায় নিম্নস্থানাধিকারী। বিংশ শতাব্দীর সমাজ আন্দোলনের ঢেউ তাদেরও স্পর্শ করে। তারা আন্দোলন শুরু করে তপশিলিজাতির মর্যাদা লাভের জন্য।

মেচ, যারা বর্তমান পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামের মূলতঃ বাস করে তারা নিজেদের অভাব ও সামাজিক অবজ্ঞা থেকে মুক্তি পেতে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। আসামে অনেক মেচ ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ করেছে ফলে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটেছিল। তবে একথা উল্লেখ্য যে আসামের গোয়ালপাড়ায় অনেক মেচ 'ব্রহ্ম' পদবি গ্রহণ করেছে যা ব্রাহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[১০]

চাই ও ধনুক জাতির আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উত্তরবঙ্গে বর্তমান চাইদের সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি। চাইরা সামাজিক অবজ্ঞার শিকার। ১৯৪২ সালে মালদায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় চাই বৈশ্য সম্মেলনে চাইরা নিজেদের ব্রহ্মবৈশ্য হিসেবে পরিচিত করার জন্য 'দাস' উপাধি ব্যবহার করার দাবি করেন। 'চাই সমাজ উন্নয়ন সমিতি' চাইদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য আজও লড়াই করছে। বর্তমানে তারা তপশিলি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতির জন্য লড়ছে।[১১]

ধনুক জাতি মালদার ছাপান্নটি গ্রামে বসবাস করে। বাংলার বাইরেও তাদের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। তারা শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ। মহারাষ্ট্র, কর্নাটক এবং গুজরাটে তাদের তপশিলি উপজাতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের O.B.C. তালিকাভুক্ত না করায় তারা সন্তুষ্ট না হয়ে তপশিলির উপজাতির মর্যাদা পেতে আন্দোলন করছে।[১২]

গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত মতুয়া ধর্ম যা নমঃশূদ্রদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য শুরু হয়েছিল তার প্রভাব উত্তরবঙ্গে ছিল খুবই কম। যদিও উত্তরবঙ্গে কিছু নমঃশূদ্র রয়েছে কিন্তু মতুয়া আন্দোলনের প্রভাব এখানে প্রায় ছিল না বললেই চলে।[১৩]

কিছু কিছু আন্দোলন উত্তরবঙ্গে ঘটেছিল যাদের ব্যাপ্তি সুদুরপ্রসারী ছিল না, কিন্তু সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল।[১৪] ১৯৩১ সালে কংগ্রেস যখন জনগণনা

বয়কট করে সেই সময় ব্রিটিশ সহ কিছু চা শিল্পপতি আদিবাসীদের অ-হিন্দু প্রকৃতিবাদী বলে তালিকাভুক্ত করেন। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় কিছু কংগ্রেস নেতা সহ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে আদিবাসীরা হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[২৮] তারা 'জনমত' ও 'ত্রিস্রোতা' নামে দুই স্থানীয় সংবাদপত্রে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। বিশিষ্ট সমাজবিদ চারুচন্দ্র সান্যাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'অস্পৃশ্য সেবক সংঘ' ছিল উত্তরবঙ্গের সমাজ আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ ছিল মুসলমান। তাই এদের মধ্যে যে সব সমাজ আন্দোলন ঘটেছিল সেগুলো উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রবেশ করেছিল প্রধানত পীর, ফকির ও দরবেশদের মাধ্যমে এরা প্রথম মালদায় পদার্পণ করেন এবং সেখান থেকে উত্তরবঙ্গের অন্যত্র তাদের মত প্রচার করেন। হিন্দুধর্মে জাতিভেদ প্রথা ছিল কঠোর। উচ্চবর্ণের লোকদের দ্বারা নিস্পেষিত হোত সাধারণ মানুষ। নিম্নশ্রেণীর মানুষদের ম্লেচ্ছ হিসেবে গণ্য করা হোত। এরা স্বাভাবিকভাবেই পীর-দরবেশদের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের সিংহভাগ মুসলমানই ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান। তাই এরা 'নস্য' হিসেবে পরিচিত। নস্য মানে নষ্ট। মুসলমান সমাজে তুর্কি, আরবি, ইরানি প্রভৃতি মুসলমানরা অভিজাত হিসেবে পরিগণিত হোত, যাদের আসরাফ নামে পরিচিত। অপরদিকে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আতরাফ নামে পরিচিত।

দিনাজপুর ও মালদায় সঈদ, মীর, শেখ, খান, মীর্জা প্রভৃতি উপাধিধারী মুসলমানদেরই দেখা যায়। সাধারণত এই সব উপাধিধারীরা অভিজাত শ্রেণীর তবে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় এরা জন্মসূত্রে এইসব উপাধি না পেয়ে পরবর্তী সময় গ্রহণ করেছে। একটি প্রচলিত কথা ছিল যে "আগে ছিলাম তুল্লা উল্লা / পরে হলাম উদ্দীন/তাহার পরে চৌধুরী সাহেব / কপাল ফিরলো সেইদিন।" তাহলে দেখা যায় যে উচ্চবর্ণভুক্ত হওয়ার ঝোঁক মুসলমানদের মধ্যেও স্পষ্ট।[২৯]

মুসলমানদের মধ্যে যে সকল সমাজ আন্দোলন হয়েছিল তার প্রভাব উত্তরবঙ্গে তেমন নেই। তবে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশে জামাইত-ই-ইসলামি নামে এক আন্দোলন স্বাধীনতাত্তোর ভারতে শুরু হয়। এটি ছিল আংশিক সামাজিক ও আংশিক রাজনৈতিক। এই আন্দোলনের প্রভাব উত্তরবঙ্গে দেখা যায় ১৯৬০-৭০ সালে।

জলপাইগুড়ি জেলায় স্থানীয় মুসলমানদের আন্দোলনও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নোয়াখালি থেকে এসে তারা জলপাইগুড়িতে বসবাস শুরু করে বলে

এদের নোয়াখালি মুসলমান বলা হত। এরা ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উন্নত। এই জেলার চা শিল্পের এদের অধিকার ছিল একচেটিয়া। সরকারি চাকরি তথা ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের আধিপত্য ছিল স্থানীয় মুসলমানদের চেয়ে বেশি। স্থানীয় মুসলমানরা শিক্ষা মর্যাদায় নিম্নমানের হওয়ায় নোয়াখালি মুসলমানরা এদের হেয়জ্ঞান করতো। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক তিক্ততা ক্রমশঃ বেড়েই চলে। এই কারণেই বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি স্থানীয় মুসলমানরা 'District Mohammadan Association' স্থাপন করে।[৩০]

খুবই সাম্প্রতিককালে নস্য মুসলমানরা আন্দোলন করছে O.B.C. মর্যাদার জন্য। তাদের এই দাবি স্বীকৃত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদিও অনেক সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হতে দেখেছি তার বেশির ভাগই উত্তরবঙ্গকে স্পর্শ করেনি। ফলে এখানকার সমাজ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং জাতিভেদ প্রথার নাগপাশে আবদ্ধ। অবজ্ঞা, বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য এরা লড়াই করেছে, কোন সময় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে, কখনো উচ্চবর্ণের ব্যবহৃত পদবি গ্রহণ করেছে, আবার কোন সময় অনুকরণ করেছে উচ্চবর্ণের জীবনযাত্রার ধরণ। এর সাথে সাথে সমাজে এক স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখার চেষ্টাও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে উচ্চশ্রেণীর কাছে এই সব তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মর্যাদা উল্লেখযোগ্যভাবে স্বীকৃত হয়নি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে পরিবর্তন যাই হোক না কেন পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রবাহ জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। Bandapadhyaya, Sekhar, "Caste, Politics And The Raj", Bengal 1872 - 1937, K. P. Bagchi & Co.

২। Roy, A. K. "Kshatriya movement in North Bengal", Journal of Asiatic Society of Bangladesh, Vol XX, No-1, 1975.

৩। Dasgupta, Biman Kumer, "The dynamics of social mobility movements among the Rajbansis of North Bengal", unpublished thesis.

৪। Roy, A. K. পূর্বে উল্লেখিত

৫। রায়, ধনঞ্জয়, "উত্তরবঙ্গের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন", নর্থ ইষ্ট পাবলিকেশন,

১৯৮৯।

৬। Roy, A K পূর্বে উল্লেখিত

৭। বর্মন, উপেন্দ্রনাথ, "ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত", ক্ষত্রিয় সম্মিলনী

৮। তদেব

৯। Bose, Nirmal Kumer, "The Structure of Hindu society".

১০। নাথ, প্রমথ এবং হরিহর, "অসম বঙ্গ যোগী সম্মিলনীর ইতিহাস", প্রথম পব

১১। ঘোষ, আশুতোষ সম্পাদিত "ভারত ও বঙ্গের গোপ-আহির-যাদব আন্দোলনের ইতিবৃত্ত"

১২। বঙ্গপ্রবাসী রাজপুত সভার প্রথম অধিবেশন, ১৯২৪

১৩। ঘোষ, সুবোধ, 'ভাবতেব আদিবাসী'

১৪। Dasgupta, Ranjit "Economy, Society and Politics of Bengal : Jalpaiguri, 1869 - 1947'

১৫। Bose, Nirmal পূর্বে উল্লেখিত

১৬। চক্রবর্তী কমলেন্দু 'জীবন প্রবাহ স্মৃতিচারণ"

১৭। Sarkar, Tanika, 'Jitu Santal's Movement in Malda 1924-32 A study in tribal protest, Subaltern Studies, ed Ranajit Guha, Vo -IV

১৮। Gazetteers of India, district of Malda, Ed . J C. Sengupta, 1969

১৯। পাল, সুনীল 'আদিবাসী রাভাদেব সংস্কার আন্দোলন' উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১, ৬, ৯০

২০। গুপ্ত, পবিত্র কুমার, 'উত্তরবঙ্গের রাভা সমাজ ও ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন', মধুপর্ণী, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা

২১। তদেব

২২। দাস, অমলকুমার, মুখোপাধ্যায় ডঃ শঙ্করানন্দ সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী আন্দোলন', কে. পি. বাগচী এণ্ড কোং, ১৯৮১।

২৩। Sanyal, Charu Chandra, 'Meches and Totoes of Bengal : Two sub-Himalayan Tribes of North Bengal', N B U.

২৪। Sanyal, Charu Chandra, "Meches and Totoes of Bengal" পূর্বে উল্লেখিত

২৫। বিশ্বাস, অচিন্ত্য, 'চাঁই সমাজ উন্নয়ন আন্দোলনের সাম্প্রতিক ভাবনা', উত্তরবঙ্গ, সংবাদ, ১,৬,৯০।

২৬। 'চাঁইদের দিল্লী চলো', উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৭। মালদার খবর - ৪-১০ ই মার্চ, ২০০০

২৮। ঠাকুর কপিলকৃষ্ণ সম্পাদিত 'চতুর্থ দুনিয়া'

২৯। ত্রিস্রোতা (সংবাদ পত্র) ১লা এপ্রিল, ১৯২৮

৩০। ত্রিস্রোতা

৩১। রহমান, বজলে, 'মণ্ডল কমিশন রিপোর্ট ও মুসলমান সমাজ'

৩২। দাশগুপ্ত, রণজিৎ, 'প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে জলপাইগুড়ি জেলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে'', চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ঃ নীরেন রাভা - শিক্ষক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, বজলে রহমান - শিক্ষক, কোচবিহার।

ঋণ স্বীকার ঃ আমার এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ তথ্য বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

রাঙাবেলিয়া টেগোর সোসাইটি—ইতিহাসের একটি নতুন দিগন্ত

দীপক মণ্ডল

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় বিশ্বের বৃহত্তম অরণ্য দ্বীপগুচ্ছের অন্যতম সুন্দরবনাঞ্চলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত রাঙাবেলিয়া গ্রাম। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনপর্বে রাঙাবেলিয়া গ্রামে জন্ম। অবশ্য জঙ্গল হাসিল করে এই গ্রামের উন্নতিতে এগিয়ে আসেন গুটি কয়েক মানুষ। তাদের অন্যতম হ্যামিলটন সাহেব গ্রামীন উন্নয়নে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন বিশশতকের এক এর দশকে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব সাহিত্য কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নানা সমস্যার নানা দিকে তাঁর যে চিন্তাধারা ছিল তার মূল্যও ছিল অপরিসীম। এই চিন্তাধারা আশ্রমবাসী ঋষির কর্ম নিরপেক্ষ তাত্ত্বিক চিন্তা নয়—বহুক্ষেত্রে, বিশেষত শিক্ষাদানে ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যবস্থাপনায় তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আদর্শ নিয়ে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও পরে বিশ্বভারতী স্থাপন করেছিলেন তার থেকে আমরা বহু দূরে সরে এসেছি। কিন্তু গ্রামীণ উন্নয়নে তাঁর নিজের কাজের সাফল্য বা অসাফল্য যাইহোক না কেন, তাঁর মূল চিন্তাধারা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের পরিকল্পনায় একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে। আমাদের বর্তমান কালের গ্রামোন্নয়ণ চিন্তাতে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মধ্যে একটা সাযুজ্য আছে তা অস্বীকার করতে পারি না। আর সেই সাযুজ্য অনুধাবন করার ফলপ্রসূ ফল হল আজকের রাঙাবেলিয়া টেগোর সোসাইটি।

হ্যামিলটন সাহেব যখন সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে রাঙাবেলিয়া, গোসাবা, সাতজেলিয়ায় ব্যস্ত, তখন রবীন্দ্রনাথও একই আদর্শ নিয়ে শান্তিনিকেতনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গোসাবাতে আসেন এবং হ্যামিলটনকে স্বাগত জানান। ১৯৩৯ সালে হ্যামিলটনের মৃত্যু হয়। বিশ্বব্যাপী তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষোদ্গার। সমবায় আদর্শের ভিতে তখন চিড় ধরেছে। এই পরিস্থিতিতে গোটা দেশে যেখানে টালমাটাল অবস্থা, সেখানে রাঙাবেলিয়ায় কি হওয়া উচিত সেটা ভাবতে কষ্ট হয় না। চাপ চাপ অন্ধকার নেমে এল এখানে। যেটুকু ছিটেফোঁটা কাজ হচ্ছিল তাও গেল বন্ধ হয়ে। ইংরেজ কর্মচারীদের দাপট, জমিদার-মহাজনদের চরিত্র যেখানে গোটা ভারতবর্ষে নির্মম, সেখানে রাঙাবেলিয়া আর কত সাধু হবে। সুতরাং রাঙাবেলিয়ার মানুষও অত্যাচারিত, শোষিত প্রথম থেকেই। প্রাক

স্বাধীনতা পর্বে ভারতবর্ষের নানা স্থানের মতো সুন্দরবনে যে তেভাগা আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সে আগুন রাঙাবেলিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও "জান দিব, তবু ধান দিব না" এই শ্লোগান চলছিল। সুতরাং দুটো ভাতের জন্য রাঙাবেলিয়াও চেঁচিয়ে আসছিল।

৬০ এর দশকে গ্রামীণ উন্নয়নের মানসিকতা নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত তুষার কাঞ্জিলাল রাঙাবেলিয়াতে আসেন শিক্ষকতা করতে। ৭০ এর দশকে এখানে গড়ে তুললেন টেগোর সোসাইটি। সালটা ১৯৭৫। রাঙাবেলিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষারবাবু ক্লাসের একটি ছেলের জ্ঞান হারানোর কারণ অনুসন্ধানে নেমে বুঝতে পারেন এখানকার অধিকাংশ মানুষ নিরন্ন, বুভুক্ষু। মাস্টারমশাই সমস্যার সমাধানে আলোচনা করলেন যোজনা কমিশনের সদস্য পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে। শ্রীদাশগুপ্তই তুষারবাবুকে দায়িত্ব দেন "রাঙাবেলিয়া টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের।" সেই শুরু হল বাস্তব যাত্রা স্বপ্ন তরণীর। ব্যতিক্রমী কর্মযজ্ঞের মধ্যদিয়ে রাঙাবেলিয়ার জনজীবনে এল এক নতুন দিগন্ত। যেখানে একসময় সমবায়ের চিন্তা ছড়িয়েছিল, সেখানে এল আর এক ঢেউ, কর্মীদের মনে, কাঞ্জিলালের মনে তখন পল্লী উন্নয়নের উদ্যোগ—কিভাবে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনা যায়, গ্রামের মুখ থুবড়ে পড়া অর্থনীতিকে কিভাবে চাঙ্গা করা যায়, কৃষিক্ষেত্রে কিভাবে বিপ্লব আনা যায়। অসংখ্য সাধারণকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের দারিদ্র্য মোচনের স্বপ্ন দিয়ে, যুবগোষ্ঠীকে নিয়ে শুরু করেন রাঙাবেলিয়ার দিন বদলের পালা এবং এটাই হলো একটা বড় বেসরকারি প্রচেষ্টায় গ্রামোন্নয়ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক সরব প্রচেষ্টা।

সোসাইটির পক্ষ থেকে গ্রামের পরিবারের সংখ্যা, পরিবার পিছু জমি, মোট পরিবার, ছাত্রের সংখ্যা, কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা, ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা, প্রান্তিক চাষি, ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে গ্রামকে চেনার চেষ্টা এবং তার পর গ্রামোন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। ভেবে নেওয়া হয়েছে চাষ বাড়াতে হবে, এক ফসলি জমি দেড় ফসলি করতে হবে, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে জাগাতে হবে সর্বপরি গণচেতনা জাগাতে হবে।

গ্রামের মানুষ কাজ পায়না, কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কাজ পাওয়া কঠিন ছিল। সমস্যা আরো ছিল কাজ করার জন্য প্রয়োজন ছিল গতর। কিন্তু গতর এদের নষ্ট হয়েছে প্রোটিন অভাবে। এরা অপুষ্টিতে ভোগে, এখানে যেকোন মুহূর্তে আন্ত্রিকের আক্রমণ, কিন্তু ডাক্তার নেই, হাসপাতাল নেই।

শিক্ষার সমস্যা তো আছেই, সংসার চালানোর পরিকল্পনা এদের মাথায় নেই।

অসংখ্য আদিবাসী পরিবার মদের নেশায় টাকা-পয়সা, জোতজমি বিকিয়ে রাস্তায় বসে। ঋণের জালে জড়িয়ে সাবেকি মহাজনের কাছে ঘটি-বাটি, জোত-জমি লিখিয়ে দিয়ে হয়ে পড়ে ভূমিহীন। যেটুকু ফসল উৎপাদন করে তার দামও পর্যাপ্ত পায় না। দূরের বাজারে বিক্রি করতে গেলে খরচ বেশি পড়ে, ফলে ভবিষ্যতের জন্য কোন সঞ্চয় থাকে না। এখানকার মানুষের মধ্যে কিছুটা অপরাধ পরায়ণতা ও অসাধু পথে নামার ঝোঁক দেখা যায় তা হলো চুরি ডাকাতির পথ। একাজে ২৪ পরগণার বদনাম বেশ কিছুটা আছে। রাঙাবেলিয়ার মানুষের মধ্যেও কিছুটা থাকলেও আশ্চর্য হওয়ায় কিছুই নেই।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারি নীতি গ্রামে গ্রামে চালু করেছে। জমিদারি প্রথা উঠে গেছে, জোতদারি নীতি, মহাজনি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে বটে, তাতে কি গ্রামের কাজে রূপান্তর এসেছে? স্বাভাবিকভাবে রাঙাবেলিয়াতে আসেনি। এখানে নদী বাঁধ একটা অন্যতম সমস্যা। বাঁধ ভেঙে একাধিকবার নোনা জল গ্রামে ঢুকেছে, ফসল নষ্ট হয়েছে। জমিদারি আমলের বাঁধ গুলোতে বছরে বছরে একটু মাটি ধরানো হয় ; পয়সাও খরচ হয়, অথচ কাজ হয় না।

এইরকম পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে টেগোর সোসাইটি নিল নতুন কর্ম উদ্যোগ। পান্নালাল দাশগুপ্ত সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তুষার কাঞ্জিলালকে। প্রকল্পকে আর্থিক সাহায্য দিতে এসেছে রাজ্য সরকার, ভারত সরকার ও বহু বিদেশী সংস্থা। আর্থিক সাহায্য না হলে কাজপ্রকল্পই স্বার্থক হয় না। সাথে সাথে আর একটা জিনিস দরকার তা হলো গণচেতনার জাগরণ, জনসাধারণকে স্বনির্ভর হতে হবে নিজের প্রচেষ্টায়, প্রকল্প তাই শুরু করল পাড়া বৈঠক। এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মমূল্যায়ন হতে লাগল, আত্মচেতনার জাগরণ হতে থাকল। প্রকল্পের কর্মসূচি রূপায়ণে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উপরে জোর দেওয়া হল। নিজেরাই যাতে নিজের অবস্থা ফেরাতে পারে। নিজেদের উন্নয়ন কিসে আসবে অপরে তা বলে দেবে না, নিজেদের করে নিতে হবে। প্রকল্পের সামনে ছিল ঠিক এই রকম এক আদর্শ।

প্রকল্পের সহযোগিতায় কৃষকরা নেমে পড়ে উৎপাদনের কাজে। পয়সা, বীজ, সার, বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে প্রকল্প এদের সহযোগিতা করে। আগে এখানে নোনা মাটিতে রবিচাষ ছিল অবহেলিত। ৭৬-৭৮ এর মধ্যে শুরু হলো লঙ্কা চাষ, তরমুজ চাষ ইত্যাদি। সেকেলে পদ্ধতি তুলে দিতে গ্রামে হাজির হয় আধুনিক কৃষি বিশেষজ্ঞ . ফলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস শুরু হল।

আশা, স্বনির্ভরতা, স্বপ্রচেষ্টা এই হচ্ছে রাঙাবেলিয়া প্রকল্পের বীজমন্ত্র। আর এক মন্ত্র হচ্ছে একক ভাবে যা করা যায় না, যৌথভাবে তা সম্ভব। সমষ্টিগতভাবে স্বনির্ভর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এখানে গড়ে উঠেছে মহিলা তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হস্তচালিত তাঁত, সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং, পোলট্রি, টেলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিম ও মাংসের যোগানের জন্য হাঁস পালন, আদিবাসী অঞ্চলের কথা মাথায় রেখে শুয়োর চাষ, কৃত্রিম গো প্রজনন কেন্দ্র, ডেয়ারি ট্রেনিং কেন্দ্র, স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র, পরিবেশে বৃক্ষ রোপনের পরিকল্পনা, পানীয়জল সরবরাহ, ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে মহিলা সমিতি, গর্ভবতী মায়েদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। রাঙাবেলিয়া প্রকল্প দুদশকের বেশি সময় ধরে উৎপাদন ও অর্থসাহায্য যোগান দিয়েছে মধু সংগ্রহকারিদের, জেলেদের, কাঠুরিয়াদের। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে পরিবেশ সচেতন ও সংস্কৃতিমনস্ক করে তুলেছে।

বনজ সম্পদের লুণ্ঠন বৃদ্ধি, নির্বিচারে ফসলি জমি নষ্ট করে বাগদাচাষ, নদীতে অসংখ্য ভিন্ন প্রজাতির মাছের মীনকে নষ্ট করে মীন বাগদা ধরা এবং এর জন্য নদী বাঁধের ভাঙন, অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহারে জমির উৎপাদন ক্ষমতায় ব্যাঘাত, এগুলির কোনটি সুন্দরবনের পক্ষে শুভ ফলদায়ক নয়। শ্রীকাঞ্জিলাল টেগোর সোসাইটির দ্বারা পরিবেশ দূষণ রুখতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুন্দরবনের মানুষদের সচেতন করতে এগিয়ে আসেন। He said, "We, the older generation, are leaving this world in a state of turmoil. We are a spent force." গোটা সামাজিক অবক্ষয় দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সমস্যার সমাধানে আশা ছাড়েন নি। তাই সদার্থকভাবে বলেছিলেন—"I sincerly believe that if the people themselves take responsibility for the development process, they will be able to make a better world for themselves." তাঁর সুন্দরবন উন্নয়নমুখী কার্যকলাপের জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে ১৯৮৪ সালে পান 'পদ্মশ্রী' উপাধি।

বিশ্বায়নের যুগে অন্যান্য N.G.O. গুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে যেতে চাইলেও গ্রামীণ নদীমাতৃক পরিবেশ, শহরতলি থেকে কয়েক শ কিলোমিটার দূরে অবস্থান ও বিদ্যুতহীনতার জন্য এই Society টি প্রগতিশীল, উন্নয়নমুখী গতিপথে বাধা পাচ্ছে।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, গ্রামীণ সমাজের কলহপ্রিয়তা ও অকারণ সন্দেহবাতিক মানসিকতা এবং মানুষ খেকো বাঘের চেয়েও বীভৎস দলগত প্রাণ রাজনৈতিক বেড়াল তপস্বীদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে গ্রামীণ লোকসমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ব্রতী হওয়া যে কঠিন কাজ, তা একমাত্র

অভিজ্ঞরাই বলতে পারে। এই প্রকল্প শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয় নি, গ্রাম রাঙাবেলিয়ার জীবনকথা এই প্রকল্পের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অবহেলিত মানুষের জন্য মহৎ বাস্তব আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। রাঙাবেলিয়াতেও হয় নি। উন্নয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্থানীয় মানুষের নেতৃত্বকে যুক্ত করতে পারলে সাফল্য এই ভাবেই আসে। উন্নয়নের পথে এটাই মানবিক ও বিজ্ঞান নির্ভর কর্মপন্থা। ভারতের সব গ্রাম যদি সত্যি সত্যি রাঙাবেলিয়া হয়ে উঠত! Henry David thoreau had rightly said, "I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by a conscious endeavour."

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। India's living Legends : Savants of Voluntary Action. Chapter-8

২। পশ্চিমবঙ্গ—জেলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা—তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

৩। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি—রবীন্দ্র প্রসঙ্গ।

৪। ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৫।

৫। কালিদাস দত্ত—"দক্ষিণ ২৪ পরগণার অতীত"।

৬। তুষার কাঞ্জিলাল—"পথে প্রান্তরে"।

৭। Tagore Society - Prayas.

৮। R. K. Ghosh & A. K. Mandal - 'SUNDARBAN'.

আধুনিক হাবড়া

শংকররঞ্জন মজুমদার

আওরঙ্গজেবের মৃত্যু থেকে ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিক যুগ ধরা হয়। আধুনিক হাবড়ার শুরু মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক ভবানন্দ মজুমদারের উত্তর পুরুষ রঘুরামকে উখরা পরগণার জায়গির দান করার মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকে গোড়ার দিকে।

পাটনার রাজা রামনারায়ণকে দখলের জন্য মীরজাফর যে অতিরিক্ত ভূমি ক্লাইভকে দান করেছিলেন সেটা হল সমগ্র ২৪ পরগণা। সুতরাং হাবড়ায় ইংরেজ অধিকার ধরা উচিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ২০-১২-১৭৫৭ তারিখ।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্রের আমলে উখরা পরগণা নিলাম হয়ে যায়। ফলে হাবড়ায় বিভিন্ন জমিদার যেমন খোজা, ধান্যকুরিয়া গোবরডাঙ্গা এবং ছোট ছোট জায়গিরদারের অধিকার কায়েম হয়।

নীলের চাষও হাবড়ায় ব্যাপকভাবে হত। রেনেসাঁ পর্বেও হাবড়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক বিধবা বিবাহ।

রেল লাইন স্থাপন ও রেনেসাঁর অন্যতম প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৮২ সালে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষভাবে বঙ্গভঙ্গ, লবণ, সত্যাগ্রহ এবং বোম্বের নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে অশোকনগর বিমানঘাঁটির সেনাদের সমর্থন প্রস্তাব প্রেরণ—ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই এলাকা অন্যতম উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকা। বিশ্বযুদ্ধের পর পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটি ও সংলগ্ন এলাকায় এদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

এছাড়াও এখানকার বানীপুর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী শিক্ষা ক্ষেত্রে। কুরুভিলা জ্যাকেরিয়া ছিলেন এর প্রাণপুরুষ।

'ইতিহাসের দর্পণে হিজলী'

প্রতীক মাইতি

সারাংশ ঃ

আলোচ্য প্রবন্ধে মেদিনীপুর জেলাব দক্ষিণ-পূর্বে হুগলী নদীর মোহনার পশ্চিম অংশে এবং রসুলপুর নদী মোহনার পূর্বভাগে অবস্থিত হিজলীর ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৫৫৩ সালে বি ব্যারোর, ১৬৬০ সালে ব্লেভের মানচিত্রে একটি দ্বীপ রূপে হিজলীর অবস্থান দেখা যায়। ১৫৭৪ সালে সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ বাংলাদেশ আক্রমণ করার কিছুদিন পরে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার কিছু অংশ নিয়ে হিজলী নামে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ১৬২৮-১৬৬১ খ্রিঃ পর্যন্ত হিজলীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

১৫১৪ খ্রিঃ পর্তুগিজরাই প্রথমে হিজলীতে আসেন। পরবর্তী পর্বে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসিরা হিজলীতে তাদের বাণিজ্য বিস্তার করে, মূলতঃ ধান ও অন্যান্য শস্য, সুতি কাপড়, লঙ্কা, চিনি, গুড়, ঘি ও মাখনাদি এখানে পাওয়া যেত। হিজলী লবণ উৎপাদনের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। প্রতি বছর আট লক্ষ মন লবণ উৎপন্ন হত। নবাবি আমলে এখান থেকে লবণ নেওয়ার জন্যে কাশ্মীরি, শিখ, সুলতানি ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের এখানে লবণের গোডাউন ছিল। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও হিজলীর উল্লেখ আছে।

১৮৮৬ সালে র‍্যাল্‌ফফিচ এর ভ্রমণ কাহিনীতে হিজলীর বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ আছে। পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুরা হিজলীতে প্রচুর লুটতরাজ করে। পর্তুগিজরা হিজলীকে বলত "অ্যাঞ্জেলিস", এরাই হিজলীতে প্রথম কাজু বাদামের চাষ করে। ১৬৩৬ সালে শাহজাহানের আদেশে বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁ হিজলী থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন।

১৬৮৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি জব চার্নক হিজলী দখল করলে তৎকালীন বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ এক বিশাল বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং হিজলীতে দুই পক্ষের লড়াই হয়। পরবর্তীকালে হিজলী ইংরাজদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে।

উনিশ শতকে চেনা অচেনা নারী

সুনৃতাবরী সেন

উনিশ শতকের নারী সমস্যা নিয়ে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে। এই নিয়ে নতুন করে কোন বিতর্ক উত্থাপন করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সমস্যাটি আলোচনা করবার চেষ্টা করছি। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের ফলে সমাজে কতকগুলি নতুন নতুন Stereotype বা ছাঁচে ঢালা চরিত্রের আবির্ভাব হচ্ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে রক্ষণশীলতা এবং আধুনিকতার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ছাঁচে ঢালা চরিত্রগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে[১]। আমরা বিস্তৃত আলোচনায় যাব না, শুধু ছাঁচে ঢালা নারী চরিত্রগুলির মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখবো।

মূলত এই সময় আমরা তিনটি রূপে মেয়েদের পাচ্ছি। একটি হচ্ছে চিরাচরিত ঐতিহ্যমণ্ডিত গলায় আঁচল দেওয়া, তুলসীপাতায় সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে 'চেনা' রূপ ; অপরটি হচ্ছে ইংরেজি কেতাদুরস্ত অত্যাধুনিকতার উচ্ছৃঙ্খল 'অচেনা' রূপ। তৃতীয়টির মধ্যে শিক্ষা, আধুনিকতা ঐতিহ্য এবং মার্জিত ভদ্রতার আবরণের 'অচেনা'-কে 'চেনা' করে তোলবার প্রচেষ্টা। প্রথম গোষ্ঠীটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিত্রগুলির ওপর আলোকপাত করবো। আমরা দুটি অল্প পরিচিত গ্রন্থকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে—যেগুলিকে সাধারণত বটতলার বই বলে অভিহিত করা হয়। যদিও বটতলা কথাটি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে তবে এখানে সে সুযোগ নেই। সাধারণভাবে আমরা বটতলা বলতে বুঝি পুরানো ভাঙা টাইপে এবং ভুলোট কাগজে সস্তার প্রকাশনী।

আমরা 'চেনা' নারী এবং উনিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে তার নবরূপ দেখতে পাই কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের _সংসারকোষ_ গ্রন্থে (সপ্তম সংস্করণ ১৩১৭)। মেরেডিথ বর্থউইক তাঁর গ্রন্থে যে ভদ্রমহিলা Stereotype নিয়ে আলোচনা করেছেন, তারই প্রতিফলন আমরা উপরিউক্ত গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় বইটিতে _মেয়ে পার্লামেন্ট বা ভগীতন্ত্ররাজ্য_ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০০) প্রকাশক হিসেবে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে। উল্লেখ্য যে এই ধরণের বইয়ের লেখক এবং প্রকাশক অনেক সময় একই লোক হতেন। এই বইটিতে বর্থউইক বর্ণিত new women image-এর সঙ্গে দ্বিতীয় ধরণের ছাঁচে ঢালা চরিত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এরা গৃহকর্মে অনভ্যস্ত, সংসারবিমুখ ইংরেজি

শিক্ষিত মহিলার দল। এদের বিপরীতেই মার্জিত রুচিসম্পন্ন সুগৃহিণীর চরিত্রকে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা হয়েছে।

জুডিথ ওয়ালশের[৭] মতে শিক্ষিত গৃহবধূর চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমতঃ মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করা আর দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ শাসিত সমাজের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা। উনিশ শতকের নারী শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে সুকুমার সেন[৫] বলেছেন যে শিক্ষিত মা এবং স্ত্রী ইংরেজি নব্য শিক্ষিত যুবকদের, অন্তত সন্তান পালনের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এই কথার পুনরাবৃত্তি আমরা সুমিত সরকারের লেখার মধ্যেও পাই। কিন্তু এই সুগৃহিণীরা পূর্ণ স্বাধীনতা কখনোই পাননি। এঁদের যে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, এগুলিও কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি পুরুষ স্ত্রী শিক্ষার জন্যে যে গণ্ডি কেটে দিয়েছিলেন সেখান থেকেই উদ্ভূত।[৮] এই আচরণ বিধির থেকেই 'ভদ্রমহিলা'-র জন্ম।

সংসারকোষে লেখক কিন্তু ভদ্রমহিলার রূপ তুলে ধরতে গিয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে অত্যাধুনিকতার দিকে মেয়েরা যেন না যায়। অর্থাৎ শুধু ঔপনিবেশিক প্রয়োজনেই নয় সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যেও এই চরিত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। সুতরাং সমস্যাটি দ্বিমাত্রিক। এক-নতুন চরিত্রায়ণ এবং দুই-একটা অস্থির পরিস্থিতিজনিত পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও রুচির প্রভাব থেকে সমাজকে নিরাপদ রাখা। স্বভাবতই উপদেশ এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। একজন মহিলাকে ভদ্রমহিলা হতে গেলে কি কি করতে হবে তার একটি নির্দেশিকা বা **manual** এই বইটি। প্রাথমিক বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রন্ধনপ্রণালি, স্বাস্থ্যবিধি, শিল্পকর্ম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। নিম্নোক্ত তালিকা দেখলে হয়ত আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারবো যে একজন পরিপূর্ণ নারীর রূপ কি রকম হওয়া উচিত বলে মনে করতেন তখনকার লেখকরা। রন্ধনপ্রণালি ; বৈজ্ঞানিক প্রকরণ ; সুবাসিত গোলাপি নারিকেল তৈল প্রস্তুতের প্রণালি ; যুবক যুবতিদের প্রতি উপদেশ ; নীতিকথা ; কলিকাতার স্ট্রীট ও লেনের ডাইরেক্টরী ; ম্যাজিক ; যোগতত্ত্ব ; সুখের সংসার ; গৃহিণীপনা ; আদর্শ কৃষক ; যন্ত্রশিক্ষা ; প্রেম সঙ্গীত ; ব্যায়াম ; সরল চিকিৎসা ; জ্যোতিষ ; ভোজবিদ্যা ; মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি। এর মধ্যেই সংসারে প্রতিটি আত্মীয় এবং অনাত্মীয়র সঙ্গে গৃহিণীর আচরণ বিধি লিপিবদ্ধ করা আছে। তাছাড়া গর্ভধারণ এবং সন্তান পালনের মতো বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

এই ধরণের বই অবশ্য তখন অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বটতলার লেখকদের

মধ্যে থেকে এই ধরণের প্রচেষ্টা বিশেষ চোখে পড়ে না। তাছাড়া এই লেখকদের সম্পর্কে আমাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা আছে যে এরা মূলতঃ রক্ষণশীলতার প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, সুতরাং এই প্রশ্নে তাঁরা রক্ষণশীল অথবা প্রগতিশীল যে কোন আদর্শকেই গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিত যুবক যুবতিদের মধ্যে যে চরম মানসিকতা প্রকাশ পাচ্ছিল তার বিরোধী শক্তি হিসেবে এই ছাঁচে ঢালা চরিত্রগুলি গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা হয়েছে। সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য নারীদের ইন্দ্রিয় সংযমের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কালীপ্রসন্ন এই বিষয় মেয়েদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে সৌন্দর্য নিয়ে তাদের গর্ব করা উচিত নয়। এটি আসলে অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু। বরং সমাজকে ব্যাভিচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের উচিত নিজেদের রূপকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা। জোরে কথা বলা বা সশব্দে হাসা, এগুলি ভদ্রমহিলা সুলভ আচরণ নয়। জীবনে সুখ এবং ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে স্বামীর সেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে জনৈক মা ও মেয়ের মধ্যে একটি কথোপকথনের নমুনা বিচার করলে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শিক্ষিত ভদ্রমহিলার রূপ কিন্তু এই লেখকদের বিচারে, সনাতন সতী-সাবিত্রীর সামান্য আধুনিক সংস্করণ। উদাহরণ স্বরূপ একটু উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। মা ও মেয়ের কথোপকথন-:

'প্রতিভা। মা আমাকে একটু চচ্চরি দেনা।

মা। না মা আর চচ্চরি নেই।

প্রতিভা। ঐ যে রয়েছে—দেনা মা একটু।

মা। চেয়ে খাওয়া মেয়ে মানুষের ভারি দোষ। আমি যা দিয়েছি, তাই খাও, না হয় আরো একটু দিচ্চি, কিন্তু আর কখন চেয়ে খেওনা?

প্রতিভা। মা, তোমার সবই উল্টো, খেতে ভালো লেগেছে, একটু চেয়েছি, তাতে অত বকাবকি কেন?—একটু দিলেই ত হয়।

মা। প্রতিভা, তুই থাম্! একটু দিলেই যে আমার কমে যাবে তা না, কিন্তু এই রকম চাইতে চাইতে একটা খারাপ অভ্যেস হয়ে যাবে, শেষে শ্বশুরবাড়ি গিয়েও চেয়ে বোস্‌বে। বল দেখি, কত লজ্জার কথা। মেয়েমানুষের লোভ বড় দোষ। যে মেয়েমানুষের লোভ আছে, তার নিন্দেতে দেশ ভেসে যায়। তাই এখন হতে তোদের শাসন করি মা। শেষে তোদের অভ্যাস দোষে কষ্ট পাবি।' (পৃ: ৬-৭)

সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে কোন আপোষ না করে যতটুকু আধুনিকতা গ্রহণ

করা সম্ভব লেখক ততদূর যেতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু যেখানেই আধুনিকতা গ্রহণ করতে দিয়ে সাবেকিয়ানা বর্জন করার ন্যূনতম প্রচেষ্টা হয়েছে সেখানেই লেখকদের মধ্যে নানা ধরণের বিরোধী মনোভাবের উদয় হয়েছে। অন্দরমহল ছেড়ে মহিলারা প্রকাশ্যে আসবেন কিনা, এই নিয়ে সারা ঊনবিংশ শতক জুড়ে বহু বাদ-বিসম্বাদ হয়েছে। রক্ষণশীলদের মধ্যে এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। রাধাকান্ত দেব নারী শিক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু পর্দার বাইরে এসে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণে একেবারেই সম্মত ছিলেন না। অথচ অন্যদিকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার নিজেই তাঁর দুই মেয়েকে, বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তাদের সেখানে পড়তে পাঠিয়েছিলেন।

এই দ্বিধাবিভক্ত মনোভাব বটতলার লেখকদেরও স্পর্শ করেছিল। অনেক নাটকের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে ইংরেজি শিক্ষার জন্য নিয়োজিত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাদের সাংসারিক অশান্তির জন্য দায়ি করা হয়েছে। লেখকরা এই মত পোষণ করেছেন যে স্ত্রী স্বাধীনতা (ইংরেজদের মধ্যে প্রচলিত রেওয়াজ) আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। প্রতি পদক্ষেপে আমরা দেখছি যে এই সব নাটকের নায়িকারা ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা করছে। আর এই শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে উচ্ছৃঙ্খলতাকে এর স্বাভাবিক পরিণতি বলে মনে করা হয়েছে।

ভগ্নীতন্ত্ররাজ্য বইটি মূলত কথোপকথন আকারে লেখা। ইংরেজি শিক্ষিত মেয়েদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। লেখক বলতে চেষ্টা করেছেন যে মেয়েরা অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষিত হয়ে গেলে তারা প্রবল হয়ে ওঠে এবং পুরুষের ওপর আধিপত্য করতে থাকে। বইয়ের বিষয়টি হচ্ছে—একটি কল্পিত রাজ্য যেখানে পার্লামেন্টের ক্রিয়াকর্ম মেয়েরাই করে। স্ত্রী স্বাধীনতা প্রসঙ্গে লেখক কতটা গোঁড়া মনোভাব পোষণ করতেন তা একটু উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে। একজন পার্লামেন্টের মেম্বরী (লেখক মেম্বারের স্ত্রীলিঙ্গে ব্যঙ্গার্থে কথাটি প্রয়োগ করেছেন) বলছেন—: 'পার্শ্ববর্তী রাজ্যসকল যদিও এখনও অসভ্য এবং তাহারা ভ্রাতা জাতীয় রাজার দ্বারা যদিও এখনও শাসিত, তথাপি তাহাদের লইয়া মানাইয়া চলিতে হয়.....তাহাদের সভ্য করিবার নিমিত্ত যে সকল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাও আশানুরূপ ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।' (পৃঃ১৫-১৬)

সমগ্র বইটিতে ঊনিশ শতকের সমাজব্যবস্থার একটি উল্টো ছবি বা inverted picture উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বইটিতে সমস্ত সংস্কারপন্থী বিষয়গুলিকে যেমন, সমাজসংস্কার, ব্রাহ্মধর্ম ইত্যাদি সমালোচনা করা হয়েছে। ঈশ্বরকে 'ভগ্নীপতি' অথবা 'বোনাইনি' বলে সম্বোধন করা এবং সংস্কারের নামে ব্যাভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া। এই ব্যঙ্গোক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে লেখক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বইটিতে একটি নৈরাজ্য কল্পনা করা হয়েছে, সমাজের সাবেকি ঐতিহ্যকে নষ্ট করলে, যেটা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে একই লোকের কলম দিয়ে, অথবা প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় _সংসারকোষ_ এবং _ভগ্নীতন্ত্ররাজ্য_ এর মতো দুটো বই বেরোয় কি করে? সংসারকোষে লেখক শুধু সমালোচনা করছেন না। প্রাপ্ত শিক্ষার সঙ্গে বহুযুগের সঞ্চিত মূল্যবোধের সংমিশ্রণে এক নতুন চেতনা মেয়েদের মধ্যে তৈরি করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বইটিতে সমগ্র ইংরেজ সভ্যতাকে তিনি আক্রমণ করেছেন। দুজন মেম্বরীর কথোপকথন থেকে লেখকের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যাবে-ঃ

৮ম মেঃ।.....আবার ওরই মধ্যে দুএকটা মিন্সের বাপ মা আছে দেখেছিস? মা...গুলো ত অসভ্যের একশেষ, বাপ মিন্সেরাও তথৈবচ।......

২য় মেঃ।-ও দুঃখের কথা আর বলিস্ কেন ভাই!......আমি শেষে জ্বালাতন হয়ে হয়ে, সে দুটাকে বার করে দিয়ে, তবে বোন নিস্তার পাই। মাগী শুনতে পাই কোথায় এখন আরদালিগিরি করে।.... ....

৯ম মেঃ। ....একে একে তলব করে বল্লাম, বলি বাবাজান দূরীভব!..... ....

.... আমিও তেমনি শেষে পুলিস দিয়ে বিদেয়। হ্যাঁ ভাই, তা বল দেখি, একি সহ্য যায়? এই সভ্যকাল, আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই সমান মানুষ, তা কেন আমরা একজনের ফাঁদে পড়ে থেকে নিজের সুখের পথে কাঁটা দেব?' (পৃঃ৭৬-৭৭) এখানে মূল্যবোধের প্রশ্নটাই সব থেকে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

দুটি বইতেই আমরা দেখি যে ইংরেজি শিক্ষাকেই নারী সমস্যার মূল ভিত্তি বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু _সংসারকোষে_ লেখক যে তাঁর সুর পরিবর্তন করছেন, তার পিছনে দুটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত manual বা নির্দেশিকা লেখবার প্রবণতা ঊনিশ শতকের বহু দেখা দিয়েছিল এবং পাঠকদের মধ্যে এগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ _ভগ্নীতন্ত্ররাজ্যে_ লেখক যে অনাসৃষ্টির কথা কল্পনা করেছেন তাতে হয়ত বিষয়ের গুরুত্বটা পাঠককে উপলব্ধি করাতে পারেননি। শুধুমাত্র ব্যঙ্গ করে যে সমাজকে পুনর্গঠন করা যায় না একথা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন।

নারী সমস্যা আলোচনার ক্ষেত্রে এই স্বল্প পরিচিত লেখকের দল ঊনিশ শতকের চিন্তাবিদদের মূল ধারাটাই অনুসরণ করেছেন। জেরেলডাইন ফোরব্স্[১] মন্তব্য করেছেন যে আমাদের সংস্কারকরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই মেয়েদের সমস্যার কথা বিচার করেছেন। এই ধরণের সীমাবদ্ধতা অল্পবিস্তর তখন অনেকের মধ্যেই ছিল। বটতলার লেখকদের মধ্যেও এটা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা তাঁদের মতন করে মেয়েদের

stereotype তৈরি করে 'অচেনা' মেয়েদের চেনা ছাঁচে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। আর এই সমস্যার মাপকাঠি বা parameter হিসেবে তাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনের ধারাকেই বেছে নিয়েছেন।

সূত্রনির্দেশ

১। এ বিষয় বেশ কয়েকটি বই বেরিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, Lou Ratte-*Uncolonised Heart* , Calcutta , 1995 Meredith Borthwick-*The changing role of women in Nineteenth Century Bengal (1849-1905), Princeton ; 1984*

২। ঐ

৩। ঐ

৪। Judith Walsh-*The virtuous wife and the well-odered home The Reconceptualization of Bengali women and their worlds* , published in Mind, Body and Society , ed by Rajat Kanta Ray , O U P , 1995

৫। Sukumar Sen-*Literary education of the Bengali female in the past* , Bethune College Centenary volume , 1980, Sumit Sarkar-*The Women's Question in Nineteenth Century Bengal* , published in A Critique of Colonial India ; Calcutta , 1985

৬। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী-*অন্দরে অন্তরে (উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা)* ; স্ত্রী ; ১৯৯৫

৭। Geraldine Forbes-*Women in Modern India* , Cambridge University Press , 1998

রীতি বনাম নীতি ঃ উনবিংশ শতকে বাঙালির বৈধব্য সমস্যা

ঐশিকা চক্রবর্তী

"... যাঁহারা বিধবার ব্রহ্মচর্য ব্রত বিধান করিয়াছেন ... তাঁহাদের হৃদয় ছিল, ... তাঁহারা রুগ্নের রোগ নির্ণয় করিয়া তন্নিবারণার্থ ঔষধ বিধান করিয়াছিলেন, তাহার দুঃখ মোচনোদ্দেশে। আর আজ আমরা রোগ থাকুক আর নাই থাকুক, ঔষধের প্রয়োজন হউক আর নাই হউক, বিধবাদিগকে সজোরে রাশীকৃত মহাতিক্ত কুইনাইন গলাধঃ করিয়া লোকহিতৈষণার বাহাদুরি লইতেছি! ... আমাদের কি কোমল প্রাণ! কি ধর্ম্মজ্ঞান! কি বিদ্যাবুদ্ধি! ..."[১]

উনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে শিক্ষিত উচ্চবর্গের অন্যতম কার্যসূচি ছিল প্রচলিত ও প্রথাগত সমাজের পটপরিবর্তন। বাহ্যতঃ এই পালাবদলের অপরিহার্য অঙ্গ যদি নারীর অবস্থার পুনর্মূল্যায়ণ হয়ে থাকে, তবে হিন্দু বিধবা-র "অস্তিত্বের সংকট" কিছু বাড়তি দাবি নিয়েই আত্মপ্রকাশ করে সংস্কারের বিষয়সূচিতে। উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায় রামমোহনের নজর কাড়ে স্বামীর চিতায় সহমৃতা বিধবার "জীবন সংকট।" আর সতীদাহের নিবৃত্তিতে সেই বেঁচে থাকা উদ্বৃত্ত জীবন-ই জটিলতর প্রশ্নের আকারে উপস্থিত হয়—বিদ্যাসাগরের সামনে।

যে সমাজের পরিধিতে, পরিসংখ্যান তত্ত্ব অনুসারে প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জন নারী বিধবা[২], সেই সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত ব্রাহ্মণ্য পিতৃতন্ত্রের কাছে অতিরিক্তের এই সংখ্যাধিক্য ছিল এক বিশেষ বিড়ম্বণা। বৈধব্য জনিত বিবিধ বাস্তব ও কাল্পনিক সংকট নিয়ে গঠিত সমস্যা-চিত্রের ছিল দুটি প্রধান দিক—

(১) সামাজিক—অর্থনৈতিক (২) নৈতিক।

এই দুটি সমস্যা, প্রধানতঃ দ্বিতীয়টিকে মাথায় রেখে এবং সংসারে প্রান্তিক নারীর বিবাহ-বর্জিত জীবনকে কিছুটা "স্বাভাবিক" করার জন্যই বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আইনসিদ্ধ করেন এক "সর্বশুভকরী" প্রথা—বিধবাবিবাহ। যে প্রথা, তাঁর জীবনের "সর্বপ্রধান সৎকর্ম" হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর জবানীতে তাঁকে "সর্বস্বান্ত" করে এবং পরিশেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বিধবার বিবাহ শাস্ত্রের বিচারে সিদ্ধ হলেও, হিন্দুর সংস্কার-সিদ্ধ হয় না। সরকারি ব্যবস্থা সমাজদেহের প্রতিটি স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হতে ব্যর্থ হয়। বাস্তবিক, মৃতের ইচ্ছা জীবিতের পথ রোধ করে দাঁড়ায়।[৩] বিবাহ আর পুনর্বিবাহের তার্কিক বাদানুবাদ, শাস্ত্র মন্থন করে বৈধব্য যন্ত্রণার প্রতিষেধক রূপে তুলে আনে মৃতের

স্মৃতিতে জীবিতের যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য বিধান।

বিধবার নীতিহীন কাম পরায়ণতার " বৈধ" নিয়ন্ত্রণের সন্ধানে সমাজের চিন্তাধিক্য দেখে প্রশ্ন জাগে, উনিশ শতকে হিন্দু সমাজের মূলব্যাধি কি শুধু বিধবার "স্খলন" ও "পতন", নাকি ব্রাহ্মণ্য পিতৃতন্ত্রের কাপট্য, অনাচার ও দ্বিধাগ্রস্ত আধুনিকতার দোলাচল? বৈধব্য কেন সূচিত করে পতি-হীনার নিশ্চিত সহজলভ্যতা? শুধু দেহগত অধিকার বা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই নারী কি অপচয়ের বিষয়বস্তু? শুধু যৌনতার বিচারেই কি বিধবা বার-বার লক্ষ্য হয় সংস্কারকের উদার চেতনার? নয়তো বিবাহ বনাম ব্রহ্মচর্যের প্রতিযোগিতায় কিভাবে হারিয়ে যায় বৈধব্য সমস্যার মানবিক সমাধান?

তাই সামাজিক অবক্ষয় ও নারীঘটিত কলঙ্ক প্রবাহে উদ্বিগ্ন, প্রাগ্রসর সংস্কারক যখন পরাশর তোলপাড় করে খোঁজেন বিধবার বিবাহে অনুমতির সূত্র, তখন সনাতনী রক্ষণশীলের বিচারে অনেক জোরবেলা ও কার্যকরী ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় ব্রহ্মচর্য। পরাশর স্বয়ং যেখানে "নষ্টে মৃতে" বচনে দ্বিতীয় পতিগ্রহণ অনুমোদন করেও, বিদবার ব্রহ্মচর্যকে ঊর্ধতর পূণ্যের স্থান দিয়েছেন[৪], সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মচার নিরাপদ আশ্রয় চায় সাত্ত্বিক কৃচ্ছ্রসাধনে। এছাড়া হিন্দু বিবাহের পবিত্র ও অনঢ় বন্ধনে নারীর অ-হস্তান্তরযোগ্যতার তত্ত্ব বিধবা-বিবাহের অবাস্তবতা প্রমাণ করে।[৫] বিবাহের অনির্বচনীয় আচারগত মহিমা এবং পুনরুত্থানবাদীর মতে, হিন্দুবিবাহের শাস্ত্রীয় (এবং প্রথাগত) বিশেষত্ব এই সাক্ষ্যই দেয় যে বিধবার বিবাহ (পুনর্ভূ ও পরপূর্বা ব্যতীত) অশাস্ত্রীয়।[৬]

আর সংস্কার-সংগ্রামের তৃতীয় শক্তি ব্রিটিশ সরকার একপ্রকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বিধবার সতীত্বের অনুসন্ধান করে—ভিন্ন এক স্তরে। শুরু হয় গর্ভাবস্থা প্রমাণে হিন্দু বিধবার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা।[৭] অধিকাংশ সরকারি সমীক্ষা নিঃশর্তভাবে জানান দেয় যে হিন্দু বিধবার এক বিরাট অংশের আশ্রয় গোপন বা প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তি।[৮] অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা ও শাস্ত্রনির্দেশ সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য যে বিধবার সতীত্ব রক্ষায় অক্ষম তারই দৃষ্টান্ত বহন করে সরকারি তদন্তে ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা ও ব্যভিচারের নিয়ত অভিযোগ। প্রাচ্যের "বিকৃত" পিতৃতন্ত্রের এই নির্দয়তায় মর্মাহত ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি, সম্ভবতঃ ছিল বিধবাবিবাহের "ঘরের" সমস্যাকে দীর্ঘায়িত করা।

এই ত্রিধা-বিভক্ত সামাজিক— রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ ভেদ করে পিতৃতন্ত্রের ঐতিহ্যকে মূল্যবোধে সহজেই ঠাঁই পেয়ে যায় বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য নীতি। ধীরে ধীরে, বিধবার ব্রহ্মচর্য আর্যাবর্তে হিন্দুত্ব ও হিন্দুর নারীত্বের প্রতীকী হয়ে ওঠে। আত্মোৎসর্গের মহিমায় ব্রহ্মচর্য জাতির জাগরণের মন্ত্রে হয় ভাস্বর। যাবতীয় ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রকে অগ্রাহ্য করে আপাদমস্তক পূণ্যতার আদর্শে বৈধব্য-ব্রত এক পরাধীন জাতির ত্যাগ-ধর্মের নামান্তর

হয়ে দাঁড়ায়।

বস্তুতঃ ঐহিক ত্যাগের অর্থনীতিটিও বেশ সুবিধাজনক ঠেকে মধ্যবিত্ত ভদ্র-সমাজে। ব্রহ্মচর্যের অন্যতম অবলম্বন যখন নির্জলা উপবাস, একাহার, ভূমি শয্যা, একাদশী বা মুখ্যতঃ অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, তখন বিধবার এই আত্মত্যাগ মধ্যবিত্তের ব্যয়-সংকোচের এক বিশেষ মাধ্যম হয়ে ওঠে। তবে, যে সম্ভ্রান্ত, উচ্চ সমাজে, ব্রাহ্মণ্য শাসনে ব্রহ্মচর্য ছিল স্বতঃঅনুমোদিত ও মান্য, সেখানে স্বনির্ভর, সম্পন্ন বিধবা, এমনকি বিধবা জমিদার ও এই নিয়মের অমর্যাদার স্পর্ধা করে নি। বিধবা লেখিকা কখনও ব্রহ্মচর্যের তত্ত্বগত সমালোচনা করলেও, বাস্তবে শুদ্ধান্তঃপুরের নীতির কোন ব্যত্যয় ঘটে নি।[৮] মনে হয়, ব্রহ্মচর্যের মহতী নীতির সাথে আর্থিক দুর্দশা এক সহযোগী উপচার ছিল মাত্র, ব্যক্তি বিধবার সমৃদ্ধি বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কখনও গড়ে তোলে নি।

বলা বাহুল্য, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছেও রীতিবিরুদ্ধ আচারহীনতা ও পুনর্বিবাহের চেয়ে নীতিগত নিষ্ঠাশক্তি অনেক বরণীয় ছিল। ১৮৭৩ সালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বৈধব্যের শক্তি ও শুদ্ধতা প্রত্যক্ষ করেন পরাধীন ভারতমাতার গ্লানি ও পবিত্র তেজের যুগপৎ বৈপরীত্যে। তাঁর মতে বৈধব্যের নিষ্কাম ধর্ম ও পাতিব্রাত্য দিয়ে হিন্দু নারী হিন্দু ধর্ম রক্ষা করে চলেছেন। " ... নয়তো এতদিনে ঠাকুরঘর ড্রইংরুম হইত, তুলসীমঞ্চে ক্রোটন বসিত, শালগ্রাম বিলিয়ার্ড হইত।"

উষ্ণতার বিচারে "পাতিব্রত্য বড় ঠাণ্ডা জিনিষ, প্রাণ শীতল।" অন্যদিকে বিধবা বিবাহ গরম গরম বরফের কুলফির মত, অতি উপাদেয় হইলেও তাহা হয় না। ... গরম করিতে গেলে, বরফ থাকে না, বরফ রাখিতে গেলে, গরম করা হয় না।"[১০]

কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের এ হেন সারগর্ভ ব্যাখ্যা নস্যাৎ করেন এক অজ্ঞাতনামা (আধুনিক গবেষণা মতে যিনি বিপিনচন্দ্র পাল)। বিধবার ব্রহ্মচর্যের যৌনতাহীন "সুন্দর কিন্তু ঘোরতর অলীক" প্রতিকৃতি দেখে তিনি প্রশ্ন তোলেন ভারতের প্রায় আশি লাখ বিধবাকে ধর্মের "বাহানা করিয়া" জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত রাখা "ধর্ম্ম কর্ম" না "শয়তানি আচরণ"! লেখকের আরও জিজ্ঞাসা, "বিধবার ব্রহ্মচর্যে ভাব বেশি না ভয় বেশি?" কারণ, তাঁর মতে, "তুমি আমি যে হিন্দু পরিবারের লোক ... সে পরিবারের বিধবাগণ ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া ভূতলে স্বর্গশোভা প্রকাশ করিতে পারে, এ কল্পনা কোন্ প্রাণে যে কর, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ... তুমি আমি ষড়রিপুর দাসের দাস, কামুকের কামুক ... ইহা কি জান না? আর আমরাই যে রমণীগণের ভ্রাতা বা পিতা বা অপর আত্মীয় স্বজন, সে রমণীগণ সর্বপ্রকার পূতিগন্ধ হইতে মুক্ত থাকিয়া, নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য ধর্ম পালন করিতেছি—এ অসম্ভব কথা প্রচার কর কেমন করিয়া, বুঝিয়া

উঠিতে পারি না।"[১১]

তবুও প্রচার চলে। জাতীয়তাবাদের রাজনীতি যখন ধর্ম, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যে আবর্তিত, তখন ধর্ম ও নারীর "দেবীত্ব" রক্ষার্থে ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য প্রচার চলতে থাকে। কিন্তু একদিকে যেমন হিন্দু জাতির যশ ও সৌভাগ্যের অন্তরায় রূপে বিধবাবিবাহ অস্বীকৃত হয় ; অন্যদিকে শুধুমাত্র হিন্দু সমাজ রক্ষা ও বিস্তৃতির জন্য বিধবা বিবাহের প্রস্তাবও আসে। এক শ্রেণীর সংস্কারি জাতীয়তাবাদী যুবতি বিধবার প্রজনন শক্তিকে বিবাহের মাধ্যমে জাতিনির্মাণের কাজে লাগানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১২]

কিন্তু বিধবা বিবাহের প্রশ্ন যখন নারীর যৌনতা ও সামাজিক বৈধতার শিকড়ে প্রোথিত, তখন এই বিধি কোনভাবেই প্রত্যয়ের মাটি খুঁজে পায় নি। আইনের গন্ডি পেরিয়ে শেষাবধি বিরোধ বাধে বিবাহ-সংস্কারে বালিকা বিধবার "ক্ষত" কিংবা "অক্ষত" যোনির প্রশ্নে। তখন শাস্ত্রকার ও সংস্কারকের তর্কের শরিক হয় লোকপ্রিয় রসিক কবিও। ঈশ্বর গুপ্তের দ্বর্থ্যহীন ভাষায় প্রকাশ পায় সমাজের শ্লেষ—

"অনেকেই এই মত লতেছে বিধান / "অক্ষত যোনির" বটে বিবাহ-বিধান।/ কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?/একেবারে তরে যাক যত রাঁড়ি আছে।"[১৩]

বিদ্যাসাগরের 'সর্বশুভঙ্করী' বিধি যে শেষপর্যন্ত এক নীতিহীন রীতিরই সূত্রপাত করে, তারই ইঙ্গিত আর এক গানে—"দিদি বিধি ভাল বিবেচনা করেছে/... একাদশী করা বুঝি উঠালে, ডায়মন কাটা মল বুঝি পরালে / বুঝি বিদ্যাসাগর এতদিনে বিধবা নারীগণের একলা শোয়ার কত জ্বালা জেনেছে।..."[১৪]

ঊনিশ শতক গড়িয়ে এসে, যখন বিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিব পরিণত রূপ ধারণ করে, তখন 'সংস্কার-সংগ্রাম' বা 'নারীর অবস্থার পূর্নমূল্যায়ণ'—দুই-ই বিস্মৃত, গৌণ বিষয়। তবু জেগে ছিল ব্রহ্মচারিণী বিধবা, জাতীয়তাবাদের স্বপ্নের আলোয় দেখা জগৎজননী রূপে। আর তার সমান্তরালে বয়ে চলে রক্তমাংসের বিধবার বিবর্ণ "অস্তিত্ব সংকটের" "কাহিনী" আর "গল্প"। যেখানে আদর্শচ্যুতির লাঞ্ছনা ও স্খলন, আত্মগোপন করে ব্রহ্মতেজের অন্তরালে। এই দুই শতকের নৈতিক চালচিত্রে, বিধবার শরীরী উপস্থিতি, রূপ থেকে রূপান্তরে পরিবর্তিত হয়ে, সংস্কারের ক্রীড়াভূমি থেকে সাহিত্য বা চটুল কাব্য। প্রহসনের উপাদান হয়ে রয়ে যায়।

সূত্রনির্দেশ

১। অজ্ঞাতনামা, **প্রতিবাদ ঃ অক্ষয়বাবু ও বিধবাবিবাহ**, কলিকাতা, প্রকাশকাল অজ্ঞাত, পৃঃ ১৮ ১৯।

২। ভারতীয় জনগণনা সূত্র, ১৮৯১, ৩, পৃঃ ১৮৩।

৩। দ্রঃ নন্দদুলাল চক্রবর্তী, **শরৎচন্দ্রিকা**, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ: ১৫৫।

৪। পরাশর ঃ "মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা, সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ।"

৫। দ্রঃ চন্দ্রনাথ বসু, "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য"। "হিন্দু পত্নী", অক্ষয়চন্দ্র সরকার, "হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?" গোবিন্দলাল দত্ত ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার (সম্পাদিত) **সাবিত্রী**, কলিকাতা, ১৮৮৬।

৬। পরাশর বা যাজ্ঞবল্ক্যের পরবর্তীকালীন মীমাংসা মেনে নিয়ে, বিধবাবিবাহ জাত সন্তানের উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি লাভ সূত্রে বিদ্যাসাগর পুনর্ভু। পরপূর্বার মনু নির্দেশিত বিবাহরীতি অস্বীকার করেন। গোপাল হালদার (সম্পা) বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ২, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৬৮-৬৯।

৭। রাজ্য লেখ্যাগার, জুডিসিয়াল-পুলিশ, ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, ৭৪-৭৬, ৩২৭-৩২৮।

৮। রাজ্য লেখ্যাগার, জুডিসিয়াল-জুডিসিয়াল, বি ২৫১-২৭৯, অক্টোবর, ১৮৭২।

৯। মানকুমারী বসু প্রভৃতি লেখিকা ব্রহ্মচর্যের কঠোর সমালোচনা করলেও কিছু দ্বিধা ও প্রকাশ করেন। ক্ষমতাসম্পন্ন জমিদার মহারানি স্বর্ণময়ী বা রানি রাসমণি ও এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অন্যথা করেন নি।

১০। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

১১। অজ্ঞাতনামা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২।

১২। দ্রঃ কুমিল্লা বিধবা সহায়ক সমিতি, **বিধবাবিবাহ**, কুমিল্লা, ১৯২৬, দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, **হিন্দুর নব জাগরণ**, কলিকাতা, ১৯৩১।

১৩। দ্রঃ ইন্দ্রমিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৯৬৯। পুনর্মুদ্রণ ২০০০, পৃ. ২৫১।

১৪। পূর্বোক্ত পৃ. ২৬২।

মধুসূদনের অঙ্গনারা ও উনিশ শতকের বাংলা

শ্যামলী সুর

বাংলা তথা ভারতের অন্যতম প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) বাঙালি মানসের নব নব বিচরণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'নতুন নারী'র ধারণাও তাঁর দান। অথচ, মধুসূদন গবেষণায় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নারীভাবনা বিশেষ আলোচিত হয় নি।[১] বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কবি মধুসূদনের নারীভাবনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক—বিশেষত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষপর্বে নারীর ভূমিকা ও প্রেমের আদর্শ সংক্রান্ত চেতনার বিকাশে তাঁর অবদান।

(১)

মধুসূদনের নারীভাবনার প্রেক্ষাপট নারীপ্রগতি সম্পর্কিত সমকালীন ধারণা। ঔপনিবেশিক শাসন, ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব " কেবল অর্থনৈতিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকলো না, জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও মনোভাবও দ্রুত বদলে যেতে আরম্ভ করলো। বিবাহ, মহিলা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে এমন চেতনা জন্ম নিলো, এমন অভাববোধ দেখা দিলো, যার অস্তিত্ব পূর্বপুরুষেরা কখনও অনুভব করেনি।"[২]

শুধু যৌক্তিক স্তরে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করাই নয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে নব শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকেরা স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কেবল রামমোহন ও তাঁর প্রগতিশীল বন্ধুরাই নন, রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীল ব্যক্তিও অন্তপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকে উৎসাহিত করেন।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর বিষয়ে নব্যবঙ্গীয় যুবকদের আগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩] নব্যবঙ্গীয় ধারার যোগ্য উত্তর সাধক মধুসূদন হিন্দু কলেজে পড়ার সময় ১৮৪২ সালে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে রামগোপাল ঘোষের দেওয়া সুবর্ণপদক লাভ করেন। এই প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ প্রথমত, ভবিষ্যৎ দার্শনিক ও কবিদের গড়ে তোলার জন্য ধাত্রীমাতার শিক্ষিত হওয়া উচিত। এইভাবেই একটি জাতি সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়ত, পুরুষের জৈবক্ষুধা পূরণ নয়, জীবনের জ্ঞানদীপ্ত অংশীদার হয়ে ওঠাই নারীর প্রধান কর্তব্য।[৪]

অক্ষয়কুমার দত্তও সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অপরিহার্য বলে মনে করতেন।[৫] তবে শিক্ষার মাধ্যমে নারীর প্রগতির উদ্দেশ্য অনেকটাই ছিল পুরুষের সন্তোষবিধান। নারীর স্বাধীনতার ধারণা ছিল অস্পষ্ট এবং কিছুটা অবাঞ্ছিত। মেরেডিথ বর্থউইকের মতে, সমকালীন ভদ্রলোকেরা বিশ্বাস করতেন নারীমুক্তি প্রকল্প নারীর জননী-জায়ামূর্তির সীমানাতেই আবদ্ধ থাকবে, তা তাদের অস্তিত্বকে কোনও ভাবেই বিপন্ন করবে না।[৬]

তবুও, সব মিলিয়ে স্ত্রীশিক্ষার সম্যক তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন বাংলার পুরুষতন্ত্র। যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৪৯ 'সংবাদ প্রভাকরে'র পাতায় প্রথম নারীশিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তিনিই অনতিবিলম্বে শিক্ষিতা রমণীকে আক্রমণ করেছিলেন ব্যঙ্গাত্মক ছড়ায়। পটুয়ার পটে, কবিয়ালের কবিতায়, তর্জাগানে এমনকি বিদগ্ধ নাট্যকারের নাটকে শিক্ষিত নারী ধিকৃত হয়েছিলেন।

পুরুষের আদর্শ রমণী প্রাচ্য আদর্শে গড়া অথচ দেশীয় রমণীর স্থূলতা, নীচতা, কলহপরায়ণতাবর্জিত। জাতীয়তাবাদের প্রাক্‌পর্বে ঐতিহ্যানুসারী সংস্কৃতির কয়েকটি বিশেষ উপাদান বেছে নিয়ে আদর্শ নারীর রূপ কল্পিত হয়েছিল। নারী আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিশীলন অর্জন করবে, অথচ গৃহে তার কল্যাণময়ী ভূমিকা ত্যাগ করবে না। অর্থাৎ নতুন জাতীয়তাবাদী প্রতর্কে নারী নতুন করে পুরুষের অধীন হয়ে পড়ল।[৭]

এছাড়া, নারীশিক্ষাবিস্তারে সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা কতখানি বা সফল হয়েছিল?

১৮১৮ সালে রবার্ট মে চুচুড়ায় ব্যাপটিস্ট মিশন পরিচালিত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরপর ১৮১৯ সালে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত গৌরীবেড়ে বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে প্রায় ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত কুমারটুলি, মল্লিকবাজার, মির্জাপুর, শোভাবাজার, ইন্টালী, জানবাজার, বেনেটোলা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮ সাল নাগাদ বীরভূম, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানেও বিভিন্ন স্কুল গড়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমশ খ্রিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে হিন্দুদের দ্বিধা, সরকারি অনুমোদনের অভাব এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিম্নবর্ণীয় বালিকাদের সঙ্গে কন্যাদের শিক্ষাগ্রহণে উচ্চবর্ণের আপত্তির ফলে ১৮৩০ সাল নাগাদ এই স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায়।[৮]

উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের বিদ্যার্জনের জন্য ১৮৪৭ সালে বারাসত কালীকৃষ্ণ বিদ্যালয় ও ১৮৪৯ সালে বেথুন বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক থেকে

স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। নারীশিক্ষার পাঠক্রমে সেলাই ও হিসাব রাখার বিশেষ গুরুত্ব সীমাবদ্ধতারই দ্যোতক। বাল্যবিবাহের ফলে বালিকারা খুব অল্পদিনই বিদ্যালয়ে যেতে পারত। এছাড়া, যারা সাহস করে কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন তাদের কঠোর সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি, ১৮৫৮ সালেও বিদ্যাসাগরের মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা সরকারি আনুকূল্যলাভে ব্যর্থ হয় এবং তিনি সরকারি পদ ত্যাগ করেন।[৮]

স্ত্রীশিক্ষা ও নারীপ্রগতি আন্দোলনের সকল সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের ফলেই মেয়েরা প্রথম যবনিকার অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৩১ সালে 'সম্বাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত চিঠিটি সম্ভবত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মেয়েদের লেখা প্রথম চিঠি। অমুকী দেবী ছদ্মনামে কোনও নারী কুলীনবিবাহ প্রথাজনিত বঞ্চনার কাহিনী শুনিয়েছেন।[৯] ৮৩৫ সালে 'সমাচার দর্পণে' সাত দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত দুটি চিঠিতেই কুলীন বিবাহের অনাচার এবং বিধবাবিবাহের দাবি উত্থাপিত হয়। ১৮৪০ সালে প্রকাশিত একটি পত্রে প্রকাশিত হয় নারীর সম্পত্তির অধিকারের দাবি।[১০]

শিক্ষালাভের প্রাথমিক বাধা দূর হওয়ায় মহিলারা তাঁদের রচনা প্রকাশে অগ্রসর হন। ১৮৫৬ সালে কৃষ্ণকামিনী দাসী 'চিত্তবিলাসিনী' নামে একখানি নাতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর পরবর্তী দশ বছরে আমরা আরও সাত জন গ্রন্থকর্ত্রীর পরিচয় পাই।[১১] নারীর আত্মপ্রকাশের এই প্রাথমিক পর্ব বাদ দিয়ে মধুসূদনের নারীভাবনার বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(২)

মনস্তত্ত্বের নিরিখে মানবজীবনের অন্যতম দুই প্রধান ধারক জননী ও জায়া বা প্রেমিকা।

অনুমান করা যায় মধুসূদনের নারীভাবনার মূল ভিত্তি গঠিত হয়েছিল মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে। মধু-জননী জাহ্নবীর জন্ম আনুমানিক ১৮০৭-৮ খ্রিষ্টাব্দে। পূর্বতন জীবনীকাররা তাঁকে শিক্ষিত বলে বর্ণনা করলেও সমকালীন নারীশিক্ষার অগ্রগতির নিরিখে গোলাম মুরশিদ এই সত্যকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন। সম্ভবত মুরশিদ ঐতিহ্যানুসারী বাচনিক সাংস্কৃতিক চর্চার প্রবহমান ধারার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। উনিশ শতকের গোড়ায় সংস্কৃত টোল-চতুষ্পাটির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারার পাশাপাশি প্রবহমান ছিল যাত্রা-কবিগান পাঁচালীর লৌকিক শিল্পরীতি এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসী মহাভারতচর্চার ধারা। মধুসূদনের বন্ধু

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে জাহ্নবীর গ্রন্থাগারে মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি সব বই ছিল।[১২]

সত্তাগঠনের এরিকসনীয় সংজ্ঞা অনুসারে মধুসূদনের সত্তার ভিত্তি মাতৃপ্রেম। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে অপরিসীম বিশ্বাসের সম্পর্ক, এই সম্পর্কই শিশুর মনে আশার সঞ্চার করে। সত্তাগঠন প্রক্রিয়ার নানা ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে বালকটি যুগপৎ নিজের কাছে সত্য হয়ে উঠতে এবং কৌমের অন্যদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চায়।[১৩] মধুসূদনের জীবনের চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস অনেকটাই মাতৃপ্রেম থেকে উৎসারিত।

মধুসূদনের পরবর্তী দুই ভাই, প্রসন্নকুমার ও মহেন্দ্রকুমারের অকালমৃত্যুর ফলে একমাত্র জীবিত পুত্ররূপে মধু তাঁর মায়ের অপরিসীম আদর ও প্রশ্রয়লাভ করেছিলেন। তাঁকে চোখের আড়াল করতে পারবেন না বলেই জাহ্নবী যশোহরের একান্নবর্তী পরিবারের দায়িত্ব ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। সেযুগে দেশের বাড়ি ছেড়ে মেয়েদের কলকাতায় বাস নিতান্তই ব্যতিক্রমী ঘটনা।

জাহ্নবীর অপত্যস্নেহ যে কোনও বাঙালি মায়ের মতোই সন্তানকে ছাপিয়ে আরও দূর প্রসারিত হয়েছিল। খিদিরপুরে প্রতিবেশী রামকমল মুখোপাধ্যায়ের মাতৃহারা ভাগিনেয় রঙ্গলাল তাঁকে মা বলে ডাকতেন এবং মধুসূদনের অন্যান্য বন্ধুরাও রন্ধন-পটিয়সী জাহ্নবীর আতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন।

এমনকি মধুসূদন ধর্মচ্যুত হবার পরও জাহ্নবীর উপরোধে পিতা রাজনারায়ণ মধুসূদনকে প্রায় এক-দেড় বছর অর্থসাহায্য করেছিলেন। যে যুগে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী স্বামীর সঙ্গে সংস্রব রাখলে ধর্মচ্যুত হতে হবে বলে রামমোহন বা দ্বারকানাথের স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীর সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেন, সেই যুগে ধর্মত্যাগী পুত্রকে কোলে টেনে নেওয়া নিশ্চয়ই মানসিক দৃঢ়তার পরিচায়ক। মাদ্রাজ যাত্রার পর আর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি মধুর। মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন। গৌরদাসের পত্র-মারফৎ। জাহ্নবীর জীবদ্দশাতেই রাজনারায়ণ সন্তানকামনায় পরপর তিনটি বিবাহ করেন কিন্তু কোনও সন্তানলাভ করতে পারেননি। এই দুখিনী মায়ের স্মৃতি ফিরে ফিরে এসেছিল মধুসূদনের জীবনে। হেনরিয়েটার স্থৈর্য ও তিতিক্ষা কি তাঁকে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল হারিয়ে যাওয়া মায়ের কথা? সন্তানহারা চিত্রাঙ্গদার বিলাপে কি অনুরণিত হয়েছিল জাহ্নবীর বেদনা? মাতৃস্মৃতিই কি কবিকে শেষ আশ্রয় দিয়েছিল, 'শ্যামা জন্মদে'র রূপকে?

নারীর দ্বিতীয় রূপ প্রেমিকা। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রেমের উদ্দিষ্টা

ছিলেন কোনও এক নীলনয়না সুন্দরী। 'I loved a maid. a blue eyed maid''[১৪] পংক্তিটি অতি-পরিচিত। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের সাহচর্যে ইংরেজি রোম্যান্টিক সাহিত্যের যে বিপুল ভাণ্ডার তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল, তাতে মধুসূদন রোম্যান্টিক আবেগের বন্যায় ভেসে গিয়েছিলেন রচনা করেছিলেন কিছু অকিঞ্চিৎকর রোম্যান্টিক কবিতা। তখনও পর্যন্ত প্রেম ছিল তাঁর কাছে একটা 'আদর্শায়িত বস্তু'। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসুর মতে, ''মধু তাঁর মাকে বলেছিলেন, ''মা তুমি যতই বল, বাঙ্গালির মেয়ে রূপেগুণে কখনই ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশও হতে পারে না।''[১৫] বাল্যবিবাহ এড়ানোর জন্য আঠার বছর বয়সে দিশাহারা মধুসূদন ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। এছাড়া, প্রকৃত প্রেম ভিন্ন বিবাহের অন্য কোনও যৌক্তিকতা তাঁর কাছে ছিল না। অথচ তখনও পর্যন্ত বিখ্যাত বাঙালি পুরুষদের বিবাহের গড় বয়স ১৪/১৫ বছর এবং স্ত্রীর বয়স ৬/১১ বছর।[১৬]

বিশ্‌প্‌স কলেজে পাঠ শেষ করে মধু গেলেন দূর মাদ্রাজে এবং অচিরেই (১৮৪৮) পাণিগ্রহণ করলেন অনাথা রেবেকা ম্যাক্টাভিশের। জীবনীকার দেখিয়েছেন রেবেকা পুরো ইউরোপীয় ছিলেন না, তবুও কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনীর প্রথম বিবাহরূপে এই ঘটনা শ্বেতকায় মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সাত বছরের সুখী দাম্পত্য জীবনের অবসানে ১৮৫৬ সালে মধুসূদন চিরতরে কলকাতা চলে গেলেন। ১৮৯২ সালে দীর্ঘ দারিদ্র্য-দুর্দশার পর রেবেকা ক্ষয়রোগে মারা যান। শেষ পর্যন্ত তিনি বিবাহবন্ধন ত্যাগ করেননি।

এমেলিয়া হেনরিয়েটাকে মধুসূদন কলকাতায় এনে স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছিলেন। হেনরিয়েটার সঙ্গে কবির বৈধ বিবাহের কোনও প্রমাণ নেই, তবু তাঁর সঙ্গে মধুসূদন আমৃত্যু অতিবাহিত করেছিলেন নিবিড় মমতায়। মাদ্রাজ স্কুলে মধুসূদনের সহকর্মী জর্জ জাইল্‌স্‌ হোয়াইটের কন্যা হেনরিয়েটা। অনাথা রেবেকার তুলনায় শিক্ষায় দীক্ষায় হেনরিয়েটা ছিলেন কবির উপযুক্ত সহচরী। শোনা যায়, হেনরিয়েটা বাংলা শিখে মাইকেলের রচনার রসাস্বাদন করেছিলেন। কিন্তু হেনরিয়েটা ঠিক কতটা শিক্ষিত ছিলেন, তাঁর কাব্যপ্রেম কতটা গভীর এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সুখে দুঃখে তিনি ছিলেন কবির একনিষ্ঠ সঙ্গিনী। প্রতিভাময় কবির জীবনের ঝঞ্ঝায় তিনি ছিলেন অবিচল। গৌরদাস বসাকের মতে তিনি প্রকৃত হিন্দু সাধ্বীর ন্যায় পতির মৃত্যুর পূর্বেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর আত্মত্যাগ একমাত্র জাহ্নবীর আত্মত্যাগের সঙ্গেই তুলনীয়। এই দুই রমণীর ত্যাগ ও প্রেম মধুসূদনের সৃষ্টিশীল প্রতিভার উন্মোচনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল।

৩

মধুসূদনের জীবনের প্রেম তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, আবার তাঁর কাব্যে প্রকাশিত রমণী ও প্রেমের আদর্শ বাঙালির কাছে প্রেমের এক নতুন ধারণা তুলে ধরেছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় বলা যায় 'বাঙালী জীবনে প্রেম ও বাংলা সাহিত্যে প্রেম, এই দুইটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটিকে আর একটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না..... সাহিত্যে প্রেমের যে অনুভূতি পাওয়া যাইতেছে তাহা জীবনে গিয়াছে, ও জীবনে যে প্রেম আছে তাহা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।''[১৭]

মেঘনাদবধকাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনাকাব্য (১৮৬২) — প্রধানত এই দুটি কাব্য থেকে মধুসূদনের প্রেম ও নারী বিষয়ক ভাবনাগুলি চিহ্নিত করা যায়।

মধুসূদনের মূল কাব্য বিশ্লেষণের পূর্বে পূর্বতন এবং সমকালীন বঙ্গীয় কবিদের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির সঙ্গে মধু-সৃষ্ট নারীচরিত্রের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য।

ভারতচন্দ্ররচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের নায়িকা বিদ্যা রতিবিদ্যায় পারঙ্গম, দয়িতের কাছে চরম আত্মসমর্পণেই তার প্রেমের পরম পূর্ণতা শৌর্যে, বীর্যে প্রেমের ঘোষণায় বিদ্যা কখনই সোচ্চার হয়ে ওঠেনি।

অন্যদিকে মধুসূদনের সমসাময়িক কবি রঙ্গলাল (১৮২৭-৮৭) তাঁর 'কর্ম্মদেবী' (১৮৬২) কাব্যে পাতিব্রত্যের সনাতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

''আর মম জীবনে কি ফল ভাই,

আর বল বাঁচিয়ে কি ফল?
নাথ-শোকে হৃদয় বিকল ভাই,
জ্বলে যেন প্রবল অনল।।''[১৮]

'পদ্মিনী উপাখ্যানে (১৮৫৮) পদ্মিনী তাঁর সহচরীদের হুতাসনে প্রাণ বিসর্জন দিতে উৎসাহিত করছেন,

''সতীত্ব সকল ধর্ম্ম সার,
যারপর নাই আর।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার।।
অতএব এসো লো সকলে,
গিয়ে প্রবেশি অনলে।''[১৯]

১৮২৯ সালে আইন-মারফৎ সতীদাহপ্রথা রহিত হয়ে গেলেও বাঙালি কবিদের

কাছে পবিত্র পাতিব্রত্যের দ্যোতক চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি করে বারে ফিরে এসেছে। অপস্রিয়মান প্রাচীন সামাজিক বিধির প্রতি আন্তরিক টান, আবার বাস্তবে পশ্চাপদ নারীর জন্য করুণা — এই দুই বিষম প্রবণতার সহাবস্থান ঘটেছিল উনিশ শতকীয় বাংলা কাব্যে। রঙ্গলালের নায়িকা কর্ম্মদেবী ও পদ্মিনী, মধুসূদনের নায়িকা কৃষ্ণকুমারী বা প্রমীলা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন স্বামীর চিতাগ্নিতে বা নিজের উদ্যত তরবারিতে। নারী হয়ে উঠেছিল আত্মিক পবিত্রতার প্রতীক।

বীরাঙ্গনা প্রমীলা চরিত্রের মাধুর্যে ও মহিমায় খাঁটি বঙ্গ নারী। সীতা বঙ্গনারীর প্রাচীন আদর্শ। চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী বাঙালী মায়ের প্রতীক।[২০]

সীতার আদর্শ নতুন নয়, সেখানে কবি পুরনোকেই নতুন মন্ত্রে আবাহন করেছেন। কিন্তু প্রমীলায় তিনি নতুনকে ভেঙে নিজের মনের মানসী গড়ে নিয়েছেন। সে একই সঙ্গে বীরাঙ্গনা ও কুলবধূ। সে প্রেমের দায়ে কখনও বীরাঙ্গনা, কখনও কুলবধূ। প্রমীলা চরিত্রে কবি নারীর প্রেমকে এক নতুন আদর্শে চিত্রিত করেছেন।[২১] প্রমীলা বীরদর্পে ঘোষণা করছেন,

"রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?" [২২]

আবার স্বামীর শব অনুগমনকারিণী প্রমীলার বিষণ্ন স্বর দৈববিধি নির্ধারিত নিয়তিকে বরণ করে নিয়েছে।

"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।...
কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তা লো ঘটিল
এতদিনে। যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনু লো আজি তাঁর
সাথে;—" [২৩]

এখানে সহমরণ আচারসর্বস্বতা নয় পতিপ্রেমের পরম প্রকাশ। মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, "প্রমীলার চরিত্রে কবি আমাদের দেশের মূক দাম্পত্য প্রেমকে যে মুখরতা দান করিয়াছেন .... এই মুখরতাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকাব্যে দাম্পত্য প্রেমকে নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।"[২৪]

কিন্তু সীতা চরিত্রে কবি যে প্রেমের ধ্যান করেছেন তা শুধুই দাম্পত্য প্রেম নয়, সীতার প্রেম করুণাময় পতিপ্রেম।

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের বিষয়বস্তু পৌরাণিক। পাত্রীর কথাই এই কাব্যের অবলম্বন। এই উপলক্ষ্য অবলম্বনে মধুসূদন নূতন যুগের নারীমুক্তির মন্ত্রকে তাঁর সমগ্র কবিচেতনা দিয়ে গ্রহণ করেছেন।[২৫]

মধুসূদনের বীরাঙ্গনারা অধিকাংশ আপনার হৃদয় ব্যতীত আর কারও পরতন্ত্র স্বীকার করেনি। প্রেমের ক্ষেত্রে এই আত্মঘোষণা নূতন যুগের নারী সত্তার উজ্জীবনের চিহ্ন বহন করছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তারা চন্দ্রকে বলেছেন

'ত্যজমাং ত্যজমাং চন্দ্র, সুরেষু কুল পাংশক।
গুরুপত্নীং, ব্রাহ্মণীঞ্চ, পতিব্রত - পরায়ণাং।।
গুরুপত্নী সঙ্গমনে ব্রহ্মহত্যা শতং লভেৎ।
পুত্রস্তং, তব মাতাহং ধৈর্য্যং কুরু সুরেশ্বর।।[২৬]

এই পৌরাণিক বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে মধুসূদন লিখলেন তারার প্রেমের কুলপ্লাবী উচ্ছ্বাস —

"ভুলি ভূতপূর্ব কথা, ভুলি ভবিষ্যতে।
এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে, — ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে।"[২৭]

বাংলার নায়িকারা পেল তাদের আত্মঘোষণার ভাষা।

বাইরের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-জীবনের লাঞ্ছিত জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে বাঙালি পুরুষ আশ্রয় চেয়েছিল অন্দরমহলের পবিত্র রমণীর আদর্শে।[২৮] রমণী হয়ে উঠেছিল অন্তর/ঘর বা অধ্যাত্মবাদের প্রতীক। মধুসূদন এই প্রজন্মের কবি হলেও তাঁর দৃষ্টি রমণীর পবিত্রতার আদর্শের সীমানা পেরিয়ে বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল। তিনি তাঁর অঙ্গনকে প্রেমের স্বাধীনতা দিতে পেরেছিলেন।

এই স্বাধীন নারী আগামী দিনের, পুরুষতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী প্রতর্কের বাইরে। সে যুগপৎ প্রেমিকা ও জননী, প্রেমে স্বরাট আবার আত্মত্যাগে অনন্ত - হেনরিয়েটা ও জাহ্নবী, প্রমীলা ও সীতা। যে প্রেমচেতনার সূচনা সমকালীন নব্যবঙ্গীয় রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাসে — তা শেষে পরিণতি লাভ করেছিল কালজয়ী ধ্রুপদী প্রেমের পূর্ণতায়।

জননী জাহ্নবী ও জন্মভূমি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। জন্ম নিয়েছিল 'শ্যামা জন্মদে'র ধারণা। এই ধারণাই পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদীদের উন্মেষপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃকা মূর্তিতে পরিণতি

লাভ করে।

সূত্রনির্দেশ

১) ক. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প', বীরাঙ্গনাকাব্য কলকাতা, ১৩৮২, পৃ ৩০৩-৩৬৬।

খ) Raghab Bandopadhyay. The First Indian Feminist. *The Telegraph*. 2000 8th March

২) গোলাম মুরশিদ, 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ১২।

৩) P C Mitra, 'A Few Desultory Remarks on the Cursory Review of the Institution of Hindooism Affecting the Interest of the Female Sex' Contained in Rev K M Banerjee's Prize Essay on Native Female Education in G Chattopadhyay ed. *Awakening in Bengal*. Calcutta, 1965. P-297

৪) ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত "মধুসূদন রচনাবলী", কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ ৫৫১।

৫) অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৭৭৩ শক, ১৮৫১, পৃ ১১৬-১১৭।

৬) Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal*, 1849-1905. Princeton, 1984 P 39

৭) Partha Chatterjee. *The Nation and its Fragments Colonial and Post Colonial Histories*. Delhi. 1994. P-122

৮) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল - 'বাংলার স্ত্রী শিক্ষা' কলিকাতা, ১৩৫৭।

৯) Asok Sen. *Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones*, Calcutta. 1977. P 32.

১০) সুতপা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য'*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ৩-৪।

১১) General Report on Public Instruction, for 1865-66 (PIII) and 1866-67 (P82) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যে বঙ্গমহিলা' প্রবন্ধে ব্যবহৃত। Kalidas Nag ed. Bethune School and College. Centenary Volume. 1849-1949. Calcutta 1949. পৃ ১৯৭।

১২) নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধুস্মৃতি', কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ ৫।

১৩) Sudhir Kakkar, *Indentity and Adulthood*, Delhi. Bombay Calcutta. 1979. P 61

১৪) নগেন্দ্র নাথ সোম, তদেব, পৃ ১৬।

১৫) যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'। কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ৮৯।

১৬) Ghulam Murshid, *Reluctant Debutaute* . Response of Bengali Women to Modernization 1849-1905, Rajshahi, 1983 P 194.

১৭) নীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'বাঙালী জীবনে রমণী', কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ ২৯২।

১৮) শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুমুটি সম্পাদিত, রঙ্গলাল রচনাবলী, কলকাতা, ১৩৮১, পৃ ২১০।

১৯) তদেব, পৃ ১৬৭।

২০) মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রীমধুসূদন, কলকাতা, ১৩৫৪, পৃ ৭৯।

২১) তদেব, পৃ ৮৬।

২২) প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'মাইকেল রচনা সম্ভার' কলকাতা, ১৩৭৩ পৃ ২১৪।

২৩) তদেব, পৃ ৩১২।

২৪) মোহিতলাল, তদেব, পৃ ৯১।

২৫) ক্ষেত্র গুপ্ত, 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প' পৃ ২৫১।

২৬) যোগীন্দ্রনাথ বসু, তদেব, পৃ ৩৫২।

২৭) সোমের প্রতি তারা, বীরাঙ্গনা কাব্য, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত তদেব, পৃ ৪৩১।

সরলা দেবী ও স্বদেশী আন্দোলন

ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বদেশী আন্দোলনের নির্মাণে অসাধারণ কৃতিত্ব স্থাপন করেছিলেন সরলা দেবী — সরলা ঘোষাল। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলির একটা বড় অংশ তাঁর কেটেছিল পাঞ্জাব প্রদেশে, রামভুজ দত্ত চৌধুরীকে বিবাহের সূত্রে। কিন্তু পাঞ্জাবে থেকেও বাংলার সেই আন্দোলন থেকে তিনি দূরে থাকেননি। দূরে থাকা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। কারণ তিনিই যে সে আন্দোলনের অন্যতম নির্মাতা। বরং তিনি বাংলার আন্দোলনকে যুক্ত করেছিলেন পাঞ্জাবের সঙ্গে। পাঞ্জাবে বসবাসকারি হিন্দু মহিলাদের সংগঠিত করার চেষ্ট করেছেন নিজের বাড়িতে ডাকা সভার মধ্যে দিয়ে। সেখানে কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হত। তার যে বিষয় নির্বাচন করেছেন[১] তিনি তার মধ্যে অন্যতম কবিতার ক্ষেত্রে 'দেশপ্রেম', প্রবন্ধের ক্ষেত্রে 'হিন্দু মুসলমান ইউনিয়ান'। সাংগঠনিক প্রতিভা সরলার জন্মগত বলে মনে হয়। নাম তার সরলা হলেও কাজ কর্মের গতিবিধি মোটেই সরল মনে হয়নি ব্রিটিশ পুলিসের। পুলিসের চোখে সরলা 'বিপজ্জনক মহিলা'।

সরলা ছোটবেলা থেকেই খুব জেদি ও প্রথাভাঙ্গার পথের পথিক। বেথুন স্কুলে পড়ার সময় জেদ করে পড়েছিলেন বিজ্ঞান। তখন মেয়েদের বিজ্ঞান পড়ার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। ফলে তাঁকে অনুমতি দিতে হয় যাদবপুরে মহেন্দ্রলাল সরকার প্রবর্তিত কালটিভেশান অব সায়েন্সে বক্তৃতা শুনতে যাবার। দুই দাদা জ্যোৎস্নানাথ ও সুধীন্দ্রনাথ এই একমাত্র ছাত্রীটিকে বক্তৃতা শুনতে নিয়ে যেতেন। সামনের সারিতে ব্যবস্থা করতে হয়েছিল তিনটি স্বতন্ত্র চেয়ারের — যাব মধ্যমণি সরলা আর ওপাশে দুই দাদা - সহপাঠীদের টিপ্পনীতে 'বডি গার্ডস'।

কিন্তু ঐ বিজ্ঞান পড়ার কাহিনী সরলাকে চিনতে, বুঝতে সাহায্য করে। কারণ ঐ জেদ ঐ প্রথাভাঙ্গা থেকে জীবনের চলার পথে তিনি বিচ্যুত হননি।

বেথুন কলেজের এন্ট্রাস ক্লাশের ছাত্রী সরলা ঘটালেন আর এক কাণ্ড। ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে ছিল সেকালের লেখা লর্ড ক্লাইভ গ্রন্থটি। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে ক্লাইভের বঙ্গ বিজয় বিষয়ে। পরীক্ষার্থী সরলা সেকলের আঁকা বাঙ্গালি চরিত্রের হেয়তার প্রতিবাদ করে তার বিপরীত বক্তব্য এত নিষ্ঠা, যুক্তি ও আন্তরিকতার সঙ্গে উপস্থিত করেন যে পরীক্ষক তাঁকে সর্বোচ্চ নম্বরই শুধু দেননি অনুসন্ধান করেছিলেন ছাত্রীটি

কে? এই ঘটনার সরলা সবার নজর কাড়েন - এমনকি তাঁর মায়েরও। হঠাৎ যেন সবার মনে হয় সরলা বড় হয়ে গেছেন। এই ঘটনাও ভবিষ্যতের সরলার জন্য খুব জরুরি। কারণ যে সাহস, দেশপ্রেম ও ওজস্বিতা এন্ট্রাস পরীক্ষার্থী সরলা দেখিয়েছিলেন পরবর্তী কর্মজীবনেও সরলা এই পথ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

সরলা দেবীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত খুঁজে পাওয়া যায় ১৯০২ সালে তাঁর ২৬, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড-এর বাড়িতে ফেনসিং ক্লাব স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। ঐ ক্লাবে লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, পিস্তল চালনা ইত্যাদি খুব সমাজকে শিক্ষা দেওয়া হত। বড় মুর্তজা ঐ সংগঠনের যুবকদের লাঠি খেলা ও বিভিন্ন অঙ্গচালনা শিক্ষা দিতেন। এ জাতীয় সংগঠন অবশ্য সে যুগে কলকাতায় অন্যত্র ছিল। যেমন কলকাতা অনুশীলন সমিতি। কিন্তু ফেনসিং ক্লাবের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়, যা অন্য সংগঠন থেকে তাকে স্বাতন্ত্র দিয়েছিল তা হচ্ছে অন্যত্র কোথাও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শেখানো হত না। কিন্তু সরলা দেবী ব্যক্তিগতভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন অন্তত আমাদের যুব সমাজের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, লাঠিখেলা, ছোরা খেলা এসবই যে ইংরেজ সরকারের মোকাবিলায় যথেষ্ট নয় — একথা সরলা দেবী বিশ্বাস করতেন। তাঁর সে বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৮শে অক্টোবর ১৯০২ দিনাঙ্কিত এক চিঠিতে। উক্ত চিঠিতে সরলা দেবী অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপদেশ দিয়েছিলেন 'কথার চেয়ে বেশি লেখ, লেখার চেয়ে বেশি কাজ কর, এবং বক্সিং, লাঠিখেলা ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শেখ।' সরলা দেবী নিজে আগ্নেয়াস্ত্রের শিক্ষায় উৎসাহী হলেও অন্য যেসব সংগঠন আগ্নেয়াস্ত্র চালনা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মানে নি এমন সংগঠনের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কলিকাতা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরলা দেবীর সক্রিয় ভূমিকা।[৫] সরলা দেবী চেয়েছিলেন যে প্রতিষ্ঠান বা যেকোন ব্যক্তির দ্বারাই বাংলার যুব-সমাজের বাহুবল এবং দৈহিক শক্তি, মানসিক বলিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাকেই উৎসাহিত করতে। সে কারণেই তাঁর নিয়মিত সংযোগ ছিল প্রমথ নাথ মিত্রের মত ব্যক্তির সঙ্গে, আবার বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাসী এমনও বহুজনের সঙ্গে। সরলা দেবীর সঙ্গে হার্দিক সম্পর্ক ছিল বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতা সঙ্গে।

বৈপ্লবিক কর্মপন্থার প্রতি তাঁর বিশ্বাস তাঁকে উৎসাহিত করেছিল সমিতি স্থাপনে। তিনি নিজেই লিখেছেন — দলে দলে স্কুল - কলেজের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলে - বয়স্করাও পিছিয়ে রইলেন না - অনেকেই যাঁরা পরে নামজাদা হয়েছিলেন। আমি তাঁদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম।

ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু মন ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতুম, তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা badge। রাখি-বাঁধা দলটি একটি গুপ্ত সমিতি নয়; তবু সঙ্কল্প মনে মনে রাখলেই উত্থাপনের দৃঢ়তা হয় বলে মুখে মুখে রটান বারণ ছিল।

সরলা দেবীর রাজনৈতিক জীবনের ভিন্নতর শুরু অবশ্য ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে। ১৩০২ সাল থেকে ১৩০৪ সাল পর্যন্ত হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে সরলা দেবী ভারতীর সম্পাদনা করেন। এবং ১৯০৬-১৯১৪ সাল তিনি এককভাবে ভারতীর সম্পাদিকা ছিলেন। যদিও ভারতী মূলত সাহিত্য পত্রিকা কিন্তু সরলা দেবী ভারতীকে ব্যবহার করেছিলেন দেশের মানুষকে বিশেষত যুবশক্তি বীর্য মন্ত্রে উদ্দীপিত করার কাজে। ইংরেজ রাজপুরুষ হলেও তার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসী কেবল কলম ধারণ করলেই যথেষ্ট হবে না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগও করতে হবে। যেখানেই কোন ইংরেজের অন্যায় আচরণ বা অত্যাচার করতে ভারতবাসীর উচিত শক্তি প্রয়োগ দ্বারা তার উচিত জবাব দেওয়া — এটাই ছিল সরলা দেবীর মত। সেটা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেরও প্রযোজ্য। সামগ্রিকভাবে জাতি ও দেশ হিসাবেও প্রযোজ্য। ভারতীর পাতায় সরলা দেবী উপস্থাপিত করেছিলেন 'বিলাতী ঘুসি বনাম দেশী কিল' (আষাঢ় ১৩১০) শীর্ষক রচনা। ঐ রচনায় উপস্থিত করা হয়েছে এমন একাধিক ঘটনা যেখানে এদেশীয় মানুষ ব্যক্তিগত বা সমবেতভাবে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায় আচরণকারী সাহেবদের ধরাসায়ী করেছে এবং তাদের সেই কাজ থেকে বিরত হতে বাধ্য করেছে। বিংশ শতাব্দী একেবারে শুরুতে (১৯০২/০৩) এ দেশীয়রা সাহেবদের গায়ে হাত দিতে পারে এবং তাতে সাহেবদের পিছু হঠতে বাধ্য করা যায় এবং আমাদের যুবসমাজের দৈহিক শক্তি সাহেবদের অন্তত দৈহিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশি—এ তত্ত্ব উপস্থিত করার মধ্যে সম্পাদিকার যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অপরদিকে দেশের মানুষের সামনে এমন তথ্য উপস্থিত করে তাদের সাহস বৃদ্ধি করা এবং ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিস্থিতি নির্মাণেও সহায়ক হয়। সুতরাং শুধু অস্ত্র চালনার শিক্ষা দেওয়াই নয়—একই সঙ্গে অস্ত্র চালনা করতে পারা এবং করবার মানসিকতা—দুই-ই সরলা দেবী তৈরি করতে চেয়েছেন।

যুব শক্তিকে বীর্য মন্ত্রে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই সরলা দেবী প্রবর্তন করেছিলেন বীরাষ্টমী ব্রত এবং বীর পূজা—শিবাজী উৎসবের আদলে প্রতাপাদিত্য উৎসব। প্রতাপাদিত্য উৎসব প্রবর্তনের কাহিনী সরলা দেবী সবিস্তারেই জানিয়েছেন তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা'য়। তিনি লিখছেন—"যেসব ছেলেরা তখন আমার কাছে আসত তার মধ্যে

মণিলাল গাঙ্গুলি বলে একটি ছেলে ছিল। সে Dawn পত্রিকার সম্পাদক সতীশ মুখুয্যের ভাগিনেয়। সতীশবাবুও মাঝে মাঝে এসেছেন। মণিলালের সাহিত্যের দিকে একটু ঝোঁক ছিল। তার পরিচালিত একটা সাহিত্য-সমিতি ছিল ভবানীপুরের ছেলেদের। সে একদিন আমায় অনুরোধ করলে তাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন আসছে আমি যেন তাতে সভানেত্রীত্ব করি"। যদিও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছি—কিন্তু কলকাতা শহরে ছেলেদের সভায় উপস্থিত হওয়া ও সভানেত্রীত্ব করা তখন আমার কল্পনার বাইরে। আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলুম। সে আবার পীড়াপীড়ি করাতে আমি একটু ভেবে তাকে বললুম—"আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেত্রীত্ব করতে যাব—এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্যালোচনার সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' কর, আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখ কর, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সভায় কোন বক্তৃতাদি রেখ না। সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে বের কর কোথায় কোন বাঙালি ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী কর—আর আমি তাদের এক-একটি বিষয়ে এক-একটি মেডেল দেব। একটি মাত্র প্রবন্ধ পাঠ হবে—সে তোমাদের সাহিত্য-সভার সাম্বৎসরিক রিপোর্ট নয়—প্রতাপাদিত্যের জীবনী। বই আনাও—পড় তাঁর জীবনী, তার সার শোনাও সভায়।"

মণিলাল রাজি হল। তলোয়ার খেলা দেখানোর জন্যে তাদের পাড়ার বাঙালি হয়ে যাওয়া রাজপুত ছেলে হরদয়ালকে যোগাড় করলে, কুস্তির জন্যে মসজিদ বাড়ির গুহদের ছেলেরা এল, বক্সিংয়ের জন্যে ভূপেন বসুর ভাইপো শৈলেন বসুর দলবল এবং লাঠির জন্যে দু'চারজন লোক কোথা হতে সংগ্রহ হল। আমি যেভাবে বলেছিলুম সেইভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালিত হল। কেবল আরম্ভে মণিলালের অনুরোধে আমাকে দিয়ে প্রতাপাদিত্যের একটা উদ্বোধনের দ্বারা সভার 'Atmosphare' তৈরি করে দেওয়া হল। তারপরে মণিলাল লিখিত তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠের পরই নানারকম খেলাধূলা চলল ও শেষে আমার হাতে মেডেল বিতরণ। সেই মেডেলের একদিকে খোদা ছিল—"দেবাঃ দুর্বলঘাতকায়।" এই ঘটনা তৎকালীন বাঙালি সমাজকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছিল। কারণ এই প্রথম একজন মহিলার সভাপতিত্বে সভা হল দ্বিতীয়ত সভার কার্যাবলী বা চরিত্রও একেবারে নতুন। গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা নেই অথচ বীরত্বের জয়গান আছে—এবং সে জয়গান মুখে গাওয়া হয়নি নিজেদের কাজ দিয়ে গাওয়া হল। সুতরাং প্রধান প্রধান সব সংবাদপত্রেই এই সভার বিষয় খবর প্রকাশিত হয়েছিল। কোথাও কোথাও অবশ্য মহিলা সভনেত্রী নিয়ে এবং তাঁর পরিচালনায় এমন বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলীর সভা নিয়ে টিপ্পনীও কাটা হয়। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে সে টিপ্পনী

কাটার ব্যক্তিদের অন্যতম বিপিন পাল[১০] পরবর্তী সময় যাঁর সঙ্গে সরলা দেবী একই মঞ্চে কাজ করেছেন যেমন অল ইন্ডিয়া ভলেন্টিয়ার লীগের কার্য নির্বাহীদের মধ্যে বিপিন পাল ও সরলা দেবী উভয়েই ছিলেন—"Among the officc bearers of the All India Volunteer League appear the names of B.G.Tilak, Bipin Chandra Pal, Sarala Devi, P. Mitra, Aswani Kumar Dutta, Arabinda Ghosh, Pulin Behari Das etc."[১১] এছাড়া উভয়ের একই সঙ্গে কাজ করার আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। সরলা দেবী পরিচালিত প্রতাপাদিত্য উৎসবের সপ্রশংস উল্লেখও অবশ্য একাধিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। সরলা দেবী আত্মজীবনীতে তাঁদের উল্লেখও করেছেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরলা দেবীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তা নিয়ে সরলা দেবীর সাথে তাঁর মতান্তরের কাহিনী আমরা সরলা দেবীর মুখেই জেনেছি।—"তীর এসে বিঁধল আমার বুকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে—সাক্ষাতে নয়, দীনেশ সেনের মারফতে। দীনেশ সেন একদিন তাঁর দূত হয়ে এসে আমায় বললেন—"আপনার মামা ভীষণ চটে গেছেন আপনার উপর"।

"কেন?"

"আপনি তাঁর বৌঠাকুরানীর হাটে চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তাঁর মতে প্রতাপাদিত্য কখনো কোন জাতির hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না।"

আমি দীনেশবাবুকে বললুম—'আপনি তাঁকে বলবেন, আমি ত প্রতাপাদিত্যকে normal মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাইনি—তাঁর পিতৃব্য-হনন প্রভৃতির সমর্থন করিনি। তিনি যে politically great ছিলেন, বাঙালির শিবাজী ছিলেন, মোগল-বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামে সিক্কা চালিয়েছিলেন— সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবই, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি। এতে যদি ইতিহাসগত কোন ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।" এর উত্তর নিয়ে দীনেশ সেন আর পুণরাগমন করেননি। বাঙালির বীরপূজা চলতে থাকল।"[১২] সরলা দেবীও অবশ্য প্রতাপাদিত্যেই থেমে থাকেননি। তিনি এরপর প্রতাপাদিত্যের ছেলে উদয়াদিত্যের নামেও উদয়াদিত্য উৎসব প্রবর্তন করেন। এই সময়ে সরলা দেবী 'বঙ্গের বীর' সিরিজে বিভিন্ন বাংলার বিভিন্ন বীরদের জীবনীর ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করতেও শুরু করেন। কিন্তু একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে বাংলার

স্বাধীনতার জন্য তিনি প্রতাপাদিত্যকে বীরপূজার উপযুক্ত বলে গ্রহণ করলেন এমন আরও অনেককে করলেন কিন্তু যে মুসলমান শাসকদের হাতে বাংলা স্বাধীন দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল তাদের কারো নামে তিনি বীরপূজার কোন আয়োজন করেননি। বা বঙ্গের বীর সিরিজেও তিনি বাংলার এই স্বাধীন শাসকদের বঙ্গের বীর-এর মর্যাদা দেননি।

সরলা দেবীর রাজনৈতিক জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ময়মনসিং সুহৃদ সমিতি। সুহৃদ সমিতি বঙ্গভঙ্গের কালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যদিও এই সংগঠনটি তার জন্মলগ্ন থেকে রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে গঠিত হয়নি এবং তার জন্ম কার্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ঘোষণার বহু পূর্বে। এ প্রসঙ্গে সরকারি নথিতেই যে তথ্য পাওয়া যায়—The "Suhrid Samiti" was established in 1307 Bengali year. The main object of the samiti was physical culture in the Indian method. The samiti did its level best and worked hard to combat the famine which broke out that year in the central and southern parts of India. In the Bengali year 1308 the samiti paid special attention to literary culture, the nursing of helpless patients, the sole use of country made goods, and the strengthening of the morals of the members. In the Bengali year 1309 the system of working of the samiti was the same as in the preceding year. In that year the samiti did its best to check even to a slight degree the growth of the habit of smoking students."[১৩] সরলা দেবী এই ময়মনসিং সুহৃদ সমিতির পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না তিনি ছিলেন সমিতির কর্ণধার। এমনকি যখন তিনি বৈবাহিকসূত্রে লাহোরবাসী তখনও তিনি এই সমিতির সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত থেকেছেন। তারও উল্লেখ মিলবে অপর একটি সরকারি নথিতে— "The Suhrid Samiti, Mymensing had its central Committee at Mymensingh and several branches under Tippera, Noakhali, Sylhet. The President of the committee was Kedarnath Chakravorty, Brajendra Lal Ganguli, Well known swadeshi singer, was Assistent President. The overall control of the samiti was reputed to be in the hands of Sarala Devi Chaudhuri who lived then at Lahore."[১৪] এই নথিতেই সুস্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, অল ইণ্ডিয়া ভলেন্টিয়ার্স লীগের সূত্রে সরলা দেবী ময়মনসিং-এ আসেন এবং তাঁর এই আগমন উপলক্ষ্যে তাঁরই উৎসাহে ময়মনসিং সুহৃদ সমিতি বীরাষ্টমী ও প্রতাপাদিত্য উৎসব

পালন করে। প্রতাপাদিত্য উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু এই নথিতে উল্লেখিত তথ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এই যে, সরলা দেবীর এই আগমন থেকেই সুহৃদ সমিতি রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। "The Suhrid Samiti has been a political organisation ever since the visit of Sarala Devi."[১৫] এবং সরলা দেবীর মধ্য দিয়েই বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে সুহৃদ সমিতির সংযোগ ঘটে যদিও তিলক সরাসরি এই সমিতির সঙ্গে কখনোই যুক্ত হননি। এই সমিতির বৈরাগী দল বাড়ি বাড়ি জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করতো—"The samiti has been teaching bairagis or professional hands & beggars to sing national songs when begging from door to door."[১৬] অপর এক সরকারি নথিতে মেলে সুহৃদ সমিতির প্রতাপাদিত্য উৎসবের সূচি।

New Year's Day and Protapaditya Anniversary (1312 B.S.)
President - Srimati Sarala Debi

1. Music (Chanting from the Vedas).
2. Athletic Sports.
3. Song (Who goes after coming ?)
4. Essay (Protapaditya)
5. Poem.
6 Essay in English ("Indian National Life.")
7. "Ananda Math" drama.
8. Addresses of the gentlemen present.
9. Presidential address.

10. Song ("Risest, than, O Goddess of Fortune of India")[১৭] এই অনুষ্ঠান সূচিতে লক্ষ্য করা যায় যে ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির ছেলেরা আনন্দমঠ নাটক করেছিল ১৯০৫ সালে এবং আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য—এখানে পঠিত প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লিখিত কিন্তু বিষয়টি 'ভারতীয় জাতীয় জীবন।' একটা সর্বভারতীয় জাতীয় জীবনবোধ বা চেতনা ১৯০৫ সালেই তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু যে সুহৃদ সমিতি ১৯০৫ এর স্বদেশী আন্দোলনে ইংরেজ-উৎপাদিত দ্রব্য বয়কটের আন্দোলনে, প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে—"The rules of the samiti laid down that every member must use swadesh things. It opened a swadeshi shop at

Mymensingh. To help the boycott movement the samiti arranged public lectures, its members sang national songs to awaken the sentiments of the people, guards were employed to see that no one sold or purchased belati goods, emissaries were sent into the interior to preach swadeshism with the aid of magic lanterns. It also arranged for supplying, swadeshi articles.''[১৮]—তাদের জাতীয় বীরপূজার উৎসবের প্রবন্ধটি পাঠ করা হয় ইংরেজি ভাষায়। আবার ঐ সভায় সভাপতি সরলা দেবী যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তার মূল সুর ছিল দেশকে, দেশের কাজকে একান্ত আপন করে ভাবার আহ্বান এবং নিজের দেশের জল মাটির সঙ্গে তিনি দেশের মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদিও নিজেদের দ্বারা উৎপাদিত হলে তবেই তাকে নিজেদের জিনিস বলা যাবে — সেইভাবে উৎপাদন করা গেলে তবেই দেশকে যথার্থ সভ্য দেশ বলে প্রমাণ করা যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেছেন এই বলে—''This small Suhrid Samiti of Mymensingh has grown to be the ideal of all the samitis in the country by taking a row to increase and utilise to advantage the power hidden in the first person, possessive word, ''My''. I hope and pray that their cause will advance more and more day by day. Each member of this samiti, after nestling to the mother country as ''mine'', should consider every act beneficial to the mother-country as ''my work'' ''my duties'' and try to accomplish it, without waiting for others. With the motto to accomplish my writchcraft (incantation) or to die', to guide you in life, carry through whatever you feel to be 'my works'.''

এই প্রতাপাদিত্য উৎসবে সুহৃদ সমিতির ছেলেরা শুধু আনন্দমঠ অভিনয়ই করেনি। তারাই প্রথম 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় ধ্বনি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এপ্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে সরলা দেবী লিখেছিলেন যে তিনি ময়মনসিং-এ উপস্থিত হলে সুহৃদ সমিতির ছেলেরা কিভাবে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে তাকে অভিবাদন করে।[২০] সরকারি নথিতেও এর প্রমাণ মেলে—''On Baisak 6th 1312 B.S. the 'New year's day and Pratapaditya Anniversary'' were celebrate with great eclat under the guidance of revered Srijukta Sarala Debi.

It was at this anniversary meeting that an attempt was for the first time made to use the word ''Bande Mataram'' as a national call.''[২১]

সরলা দেবী স্বদেশী আন্দোলনের নির্মাণের প্রধান ঋত্বিকের ভূমিকাই কেবল পালন করেননি। স্বদেশী আন্দোলনের মূল বীজমন্ত্রের তিনি ধারণ করেছিলেন তাকে লাহোরের মাটিতেও স্থাপনই শুধু করেননি নিজে সেচ করে তার চারা বিস্তারিত করেছেন তাকে বৃদ্ধি করেছেন। ফলে চিরদিনই পুলিশের চোখে বিপদ্জনকই থেকে গেছেন। তাঁর জীবনসঙ্গী তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপেরও সঙ্গী হয়েছিলেন। ফলে সরলা দেবী ও রামভূজ দত্ত লাহোর ছেড়ে কোথাও বেড়াতে গেলেও পুলিশ তার ডাইরীতে তার খবর লিপিবদ্ধ করে রেখেছে—"Lahore reports that Pandit Ram Bhuj Dat, pleader and his wife Sarala Devi travelled to Aligarh on the 1st March and returned on the 4th instant. Ram Bhuj Dat was met at Delhi by Girdhari Lal, pleader.

It is stated that the newspaper 'Circular of Freedom' is being ordered in large numbers through Ram Bhuj Dat."[২১]

সরলা দেবী ও রামভুজ দত্তের গতিবিধির খবর পুলিশ ও প্রশাসন যে রাখতো তার যুক্তিও ছিল। কারণ বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের নির্মাতা লাহোরেও স্বদেশী প্রচারের জন্য সংগঠন তৈরি করেছেন—"Lahore reports that Sarala Devi has inaugurated a society, to be called "The society of Practical Nationalism". Only those persons will be eligible who take a solemn oath to adhere to "Swadeshism". Sarala Devi will be the President and Kahn Chand, the manager of the Hindustan Press, the Vice President Lal Chand, the Secy. of the "Self improvement Society" has also joined this new society and attempts will be made to induce Mahamadans to join."[২৩] অর্থাৎ সরলা দেবীর মধ্যে দিয়েই বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সর্বভারতীয় চরিত্রেও উন্নীত হয়েছিল। বাংলায় তিনিই এই আন্দোলনের ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন—নিজের সঙ্গে এই আন্দোলনের বীজমন্ত্রকে তিনি অন্য প্রদেশে নিয়ে গিয়ে সেখানেও প্রোথিত করেছেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে পাঞ্জাবের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধও করে দিয়েছেন বাঙলার মেয়ে সরলা।

সূত্রনির্দেশ

১। Home Political - B. NOs 134 - 142 Dec. 1908.

২। Amiya Kumar Samanta (ed) - Terrorism In Bengal (Vol I) - Govt. of W. B. Calcutta, 1995

৩। চিত্রা দেব—ঠাকুর বাড়ীর অন্দর মহল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, চৈত্র, ১৪০৫।

৪। Sumit Sarkar - The Swadeshi Movement in Bengal 1903 - 1908 2nd reprint. New Delhi. 1994 [A C Banerjee Private Paper]

৫। জীবনতারা হালদার—অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস. কলিকাতা।

৬। সরলা দেবী—জীবনের ঝরাপাতা, কলিকাতা, ১৯৭৫।

৭। সুনীল দাস—ভারতী ; ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, কলিকাতা, ১৯৮৪।

৮। ভারতী—আষাঢ়, ১৩১০।

৯। সরলা দেবী—জীবনের ঝরাপাতা, কলিকাতা, ১৯৭৫।

১০। তদেব।

১১। Freedom Movement Papers Paper No 63, Bundle No 15

১২। সরলা দেবী—জীবনের ঝরাপাতা, কলিকাতা, ১৯৭৫।

১৩। Home Political Deposit. July 1909 No 13

১৪। Freedom Movement Papers Paper No. 63 Bundle No. 15

১৫। তদেব

১৬। তদেব

১৭। Home Political Deposit. July 1909 No. 13

১৮। Freedom Movement Papers. Paper No. 63. Bundle No. 15.

১৯। Home Political Deposit. July 1909 No 13

২০। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩

২১। Home Political -B.Nov. 1908 Nos. 134-142

২২। Home Political Deposit. July 1909 No. 13

২৩। তদেব।

পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী—নারীবাদী সংগ্রামের এক অনলস চরিত্র

করবী মিত্র

পাশ্চাত্য অভিঘাতে উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে উদ্ভূত আলোড়ন নানা মাত্রায় অনুভূত হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে, ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানকে ঘিরে নানা বিতর্কের উল্লেখ করা যায়। এই ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল অত্যন্ত গভীর কারণ মহিলাদের জন্য নগরকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা কিছুটা গড়ে উঠলেও গ্রাম ও মফস্বলের নারী জীবন অশিক্ষা ও কু-সংস্কারের আঁধারেই কেটে যেত।

সমাজ সংস্কারের যে বৃহৎ রূপরেখা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তা প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাবান সংস্কারকদের অবদান। মহিলাদের নিজেদের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহিলা সংক্রান্ত আইনগুলি প্রনয়ণ করা হয়নি। সতীপ্রথা নিবারিত হবার ফলে তাঁদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা হলেও মানুষের অধিকার অর্জনের স্বাধীনতা তাঁদের প্রায়শই দেওয়া হতনা। বিশেষত হিন্দু বিধবা মহিলাদের সমস্যা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।[১] কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্যাগুলিকে রাজনীতির জটিল আবর্তেও নিয়ে যাওয়া হত। আমরা এ প্রসঙ্গে সহবাস সংক্রান্ত আইন ও রুকমাবাঈ মামলার কথা মনে কবতে পারি। এ সমস্ত ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ও ঔপনিবেশিক পিতৃতান্ত্রিকতার মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না।

ভারতীয় হিন্দু পরিবারের অন্দর মহলকে সাধারণভাবে পশ্চিমী হস্তক্ষেপ থেকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য অভিঘাতের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে নবসংস্কৃতায়নের উল্লেখ করতে পারি। বাস্তবে সামাজিক শুদ্ধতা বজায় রাখার দায় ছিল অন্দরের উপর। রমাবাঈ রানাডের আত্মজীবনীতে এর চমৎকার বর্ণনা পাই।[২] ক্রমশঃ আপাতদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারমুক্ত নিম্নবর্ণের মহিলাদেরও এর আওতায় আনার চেষ্টা চলছিল। এইভাবে ঔপনিবেশিক হিন্দু সমাজে নারী জাগরণের বিরোধিতা বিস্তার লাভ করছিল।

বর্তমান নিবন্ধে পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতীকে বেছে নেবার কারণ এই যে, ঔপনিবেশিক সমাজে আলোচিত পরিমণ্ডলে যে কয়েকজন মহিলার তরফ থেকে নারীর গৌণ সামাজিক ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উৎসারিত হতে দেখি তিনি তাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। শিশুকাল থেকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠার ফলে তাঁর মধ্যে অনমনীয় দৃঢ়তা গড়ে

উঠেছিল। পিতা ও মাতার সূত্রে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করেছিলেন। বাস্তব জীবনে দীর্ঘ পরিব্রাজনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারী সমাজকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। অজস্র দেবী সমন্বিত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে মানবীর বিরুদ্ধে সামাজিক আক্রমণ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা ছিল। পরবর্তী জীবনে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও ভারতীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তিনি পরিত্যাগ করেননি।

সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁর জীবনকে এত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যে সর্বদা তাঁর পক্ষে হিন্দু সামাজিক আদর্শগুলিকে ধরে রাখা সম্ভবপর হয়নি। পরিণত বয়সে অসবর্ণ বিবাহ, বিদেশী শিক্ষাগ্রহণ, সমুদ্রযাত্রা, খ্রিষ্ট ধর্মান্তরিত হওয়া এগুলি তাঁর জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ। কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয় হিন্দু মহিলার জীবনে বর্ণভেদের চাইতেও লিঙ্গ বৈষম্য প্রধান সমস্যা।

মহারাষ্ট্রের সমাজে তাঁর কাজকর্মের যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা ছিল। সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের জনপ্রিয়তা ও বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হিন্দু ধর্মীয় নিয়ম ও সামাজিক কঠোরতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। রমাবাঈ তাঁর 'দ্য হাইকাস্ট হিন্দু উওম্যান' (১৮৮৮) এর প্রতি পৃষ্ঠায় উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা জীবনের সমস্যার নানা দিককে তুলে ধরেছিলেন। কাজেই বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর আমেরিকান অর্থসাহায্যে তিনি প্রধানত তাঁদেরই জন্য সারদা মিশন গড়ে তুললেন। এই সময় পর্যন্ত তাঁর কর্মধারায় আমরা শ্রেণী ও বর্ণসচেতনতা লক্ষ্য করি।

কিন্তু ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে কাথিওয়ারের দুর্ভিক্ষ তাঁর কাছে এক বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরল। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্য থেকে অগণিত মহিলার শিক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য তিনি মুক্তিমিশনের কাজ শুরু করলেন। তাঁর কাজের পরিধি অনেকদূর বিস্তৃত হওয়ায় শ্রেণী ও বর্ণভেদের বৈষম্য অতিক্রান্ত হল।

মুক্তিমিশনের উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের শিক্ষিত ও স্বয়ম্বর করে তোলা। প্রায় ১৯০০ জন মেয়ের জন্য যে কর্মকাণ্ডের রূপরেখা আমরা পাই[৩] তা সমকালীন যুগের তুলনায় বিস্ময় জাগায়। এই ধরণের কিছু প্রচেষ্টা ভারতের অন্যত্রও হয়েছে তবে মহারাষ্ট্রের গোঁড়া হিন্দু সমাজের প্রবল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধিতা[৪] সত্ত্বেও অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী হওয়ার ফলে রমাবাঈ এর পক্ষে এই কর্মকাণ্ড গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা তিনটি দিকের সন্ধান পাই—প্রথমত, ধর্মান্তরিত এক মহিলা যিনি নানা কারণে হিন্দু সমাজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন; দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবোধ তাঁর মধ্যে কতখানি সক্রিয় ছিল সে প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে

আসে কারণ তাঁর এই কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছিল বিদেশী অর্থসাহায্যে; তৃতীয়ত ভারতীয় নারীর উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা।

একবিংশ শতকে ধর্মের ভূমিকাকে আমরা স্বচ্ছন্দে গৌণ রাখতে পারি। জাতীয়তাবোধের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তিনি জাতীয় কংগ্রেসে ভারতীয় মহিলাদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলেন। এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় ঔপনিবেশিক সরকারের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা। পুনার সরকারি প্লেগ হাসপাতালে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল প্রতিবাদের বিরোধিতা করেছিল বঙ্গবাসী পত্রিকা[৫]। রুকমাবাঈ মামলায় স্বাভাবিকভাবে তাঁর সমর্থন ছিল স্পষ্টবাদী মেয়েটির পক্ষে। বিদেশী বিচারব্যবস্থার কঠোর সমালোচনাও তিনি এ প্রসঙ্গে করেছিলেন[৬]।

হান্টার কমিশনের সামনে তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতে নারীশিক্ষার চিত্র ফুটে ওঠে। তাঁর হিসাব অনুযায়ী ১৮৮১ খ্রিঃ এর জনগণনা অনুযায়ী ভারতে বসবাসকারী নিরানব্বই কোটি সাতশো হাজার মহিলার মধ্যে ৯৯[১]/ কোটি মহিলা শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। তিনি এক বিস্তৃত রিপোর্টে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক ও তার সমাধানের পথ নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানে এই পরিকল্পনাগুলির বাস্তব রূপায়ন ঘটেছিল। পাশ্চাত্য কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন কারণ এই ব্যবস্থায় মন ও কর্মক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

ধর্মান্তরীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয় নারী ছিলনে। তাঁর চেতনা দেশকালের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্বের উন্নত দেশের মহিলাদের কাছে ভারতীয় নারীর উন্নয়নে সহায়তা করার আবেদনের পথে এগিয়েছিল[৮]। মনুসংহিতার প্রবল সমালোচক প্রকৃত অর্থে ভারতীয় মহিলার সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে সচেতনতা জাগানোর জন্য করা হয়েছিল[৯]।

পণ্ডিতাকে পুরুষবিরোধী বলা যায়না যদিও তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারী দিকের উল্লেখ আছে[১০]। 'স্ত্রীধর্মনীতি'তে (১৮৮৮) তিনি এক সুস্থ পারিবারিক জীবনের ছবি এঁকেছেন যেখানে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তবে হাই কাস্ট হিন্দু উওম্যানে' এক feminist বিদ্রোহীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই যিনি একই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সমকালীন ঔপনিবেশিক সমাজে নারীর গৌণ অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনায় মুখর।[১১]

নারী শিক্ষার শহুরে পরিকাঠামোকে তিনি জনগণের জন্য বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন। মহিলাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। সমকালীন এক আলোচনায় দেখা

গেছে যে তিনি মহিলাদের পারিবারিক জীবন ও বহির্জীবনের মধ্যে সংযোগ সূত্র রক্ষা করেছিলেন।[১২] গান্ধীজীর বহুপূর্বে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার এই আদর্শ পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতে মহিলাদের 'সেল্ফ ইমেজ' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রমাবাঈ এক ব্যতিক্রমী অবদান রেখেছিলেন। পাশ্চাত্য প্রভাব পড়া সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি বুনিয়াদি ধরণের ছিল। ভারতের সমাজ, অর্থনীতির সব কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি মহিলাদের anglilised করে তোলার পরিবর্তে আত্মনির্ভরশীল পূর্ণ-ভারতীয় মহিলায় পরিণত করেন[১৩] যা পরিবর্তনশীল যুগ ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

সূত্রনির্দেশ

১। এ্যান এসে অন দ্য সেকেণ্ড ম্যারেজ অব উইডোজ বাট এ লার্নেড ব্রাহ্মণ অব নাগপুর, উইথ এ্যান ইনট্রোডাকশন বাই ল্যান্সলট উইলকিনসন, ১৮৪১।

২। রমাবাঈ রানাডে—হিমসেল্ফ এ্যান অটোবায়োগ্রাফি অব এ হিন্দু লেডি, লংম্যান্স, স্ট্রীন এ্যাণ্ড কোং, নিউ ইয়র্ক, টরন্টো, ১৯৩৮।

৩। ম্যাকনিকল নিকল—পণ্ডিতা রমাবাঈ, ক্যালকাটা, এ্যাসোসিয়েশন প্রেস (ওয়াই, এম, সি, এ), ১৯২৬।

৪। রমাবাঈ রানাডে, তদেব, পৃ: ৭৬-৭৭।

৫। বঙ্গবাসী পত্রিকা, ১৮ই ও ২৫ শে সেপ্টেম্বর, আর. এন. এন. বি. ১৮৯৭

৬। সুধীরচন্দ্র—দ্য এনস্লেভড ডটারস : কলোনিয়াল জন, ল এ্যাণ্ড উওম্যানস রাইটস, নিউ দিল্লী, ও ইউ. পি. ১৯৯৯, পৃ: ১৩৮

৭। ম্যাকনিকল, তদেব, পৃ: ৫৬।

৮। পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী—দ্য হাই কাস্ট হিন্দু উওম্যান, সম্পা—রাচেল বডলি, ফিলাডেলফিয়া, ১৮৮৮, পৃ: ১১৮-১১৯

৯। তদেব, পৃ. viii)

১০। ম্যাকনিকল, পৃ: ৩৬

১১। হাই কাস্ট, পৃ: ১১৬।

১২। মীরা কোশাম্বি—উওমেন, ইম্যান-সিপেশন এ্যাণ্ড ইকুয়ালিটি : পণ্ডিতা রমাবাঈ'স কন্ট্রিবিউশন টু উওমেনস্ কস্, ই.পি.ডব্লিউ, ভল্যুম ২৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৮, পৃ: ডব্লিউ. এস. ৪৮

১৩। জি. এল. চন্দ্রভারকর—মহর্ষি কাভে, বোম্বাই, পপুলার প্রকাশন ডিপার্টমেন্ট, ১৮৫৮, পৃ: ৬৩।

"মনোমোহন ঘোষ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে"

কেকা দত্তরায় (বসু)

মনোমোহন ঘোষ ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বয়রাগাদি গ্রামে ১৮৪৪ সালে ১৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামলোচন ঘোষ উনবিংশ শতাব্দীর কৃতিবিদ্য, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন স্বদেশ হিতৈষী ছিলেন। তিনি রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিশিষ্ট বন্ধুও ছিলেন। সেকালের বাঙালিদের মধ্যে অগ্রবর্তী ছিলেন এবং তখনকার কলকাতার প্রগতিশীল সমাজের সঙ্গে রামলোচনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সরকারি কর্মে লিপ্ত থাকলেও তিনি তাঁর স্বাধীন সত্তাকে কখনও বিসর্জন দেননি। নানা জনকল্যাণকর কর্মে বিশেষতঃ শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে তাঁর গভীর মনোযোগ ছিল। ঢাকা কলেজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। রামলোচন কৃষ্ণনগরে একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কৃষ্ণনগরে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনেও তিনি উদ্যোগী হন এবং একটি স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজের পরিবারের নারীদের মধ্যে সাধারণ লেখাপড়া এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রবিদ্যা চর্চারও তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর পূর্বকথায় লিখেছিলেন যে "সেকালের দিনেও সদরওয়ালা রামলোচন ঘোষ বাহাদুর রীতিমত মাষ্টার, পণ্ডিত, চিত্রকর রেখে বালিকা পত্নীকে (দুর্গামণী) সুশিক্ষিত করেছিলেন।"[১]

উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতার এই উদার প্রগতিমূলক মনোভাব তাঁর দুই স্বনামধন্য পুত্র মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ লাভ করেছিলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে তাঁদের স্বদেশ হিতোষীতার অবদানের উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৬০ সালে নদীয়ায় নীল বিদ্রোহের সময় মনোমোহন প্রজার পক্ষে লেখনী ধারণ করেছিলেন এবং তা 'হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ঐ পত্রিকার যখন অবস্থা হানি ঘটে তখন মনোমোহন একটি নতুন সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হলেন যার নাম 'ইণ্ডিয়ান মিরর'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থে, মনোমোহনের সম্পাদনায় এই পত্রিকা ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৬১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন এক সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন এবং পরিশেষে একজন প্রথম সিভিলিয়ন ও আর একজন ১৮৬৬ খ্রিঃ প্রথম ব্যারিষ্টার হয়ে

স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। যদিও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার হয়েছিলেন কিন্তু তিনি একদিনও স্বদেশে এসে এই পথ অবলম্বন করেননি। সুতরাং মনোমোহনকেই এদেশের আদালত প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার বলে স্বীকার করে নিয়েছে।[২]

ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এক কথায় ভারতবর্ষের নিজস্ব যা কিছু সে সকলের প্রতি মনোমোহনের গভীর অনুরাগ ছিল। কিন্তু এগুলির উন্নতিকল্পে প্রচলিত প্রথার বিরোধী কোনরূপ পন্থা অবলম্বন করতেও তিনি কখনও পেছাননি। স্ত্রী-শিক্ষার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৫৮ সালে টাকীর শ্রীপুরে রায় বংশের কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে মনোমোহনের বিবাহ হয়। বিলেত থেকে ১৮৬৭ সালে ব্যারিষ্টার হয়ে এসে স্বদেশে সমাজ সংস্কার কার্যে উৎসাহের পরিচয় দিতে থাকেন। স্ত্রী-জাতীর সম্যক উন্নতিসাধন সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক বিষয়ে অত্যাগ্রসর সম্প্রদায়গ্রস্থ লোকেরা যে মত প্রচার করেন সেই মত যাতে এদেশে গৃহীত ও প্রতিপালিত হয় সেই বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ দেশের মানুষেরা সে সব সামাজিক কু-রীতির অধীন তার সংস্কারের জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানকারী নামে অভিহিত সে সম্প্রদায় পৌত্তলিকতা ও দেশের পুরাতন কু-প্রথা সব সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ তার প্রতি গভীর বিরাগ প্রকাশ করলেন।[৩]

মনোমোহন ঘোষ স্বদেশে পদার্পণ করে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি বিধান বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। প্রথমে নিজের পত্নী স্বর্ণলতার শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হলেন। তখন স্বদেশের মধ্যে বালিকাদের উচ্চ-শিক্ষার স্থান ছিল না। তিনি শিক্ষা বিধানার্থে নিজের পত্নীকে লোরেটো কনভেন্টে রাখলেন। "এই সময় তাঁর যে সংযম মিতাচার ও স্বকর্তব্য সাধনে দৃঢ়মতী দেখা গিয়েছিল তা প্রশংসনীয়"। মনোমোহন বাংলার স্ত্রী-জাতীর উন্নতিসাধনে এমনভাবে উৎসাহবান ছিলেন যে হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতির স্ত্রী লেডি ফিয়ারের তত্ত্বাবধানে স্ত্রীকে রেখে লোরেটো কনভেন্টে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। সে সময়কার হাইকোর্টের অন্যতম জজ জে.বি. ফিয়ার সাহেব শিক্ষিত দেশীয় লোকদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশতেন। স্বর্ণলতা পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষা পেয়ে ঐ দেশের মেয়েদের মত আদব-কায়দা শেখেন তবে তিনি বাংলো বলতেন এবং বাংলা ভাষাতেই চিঠিপত্র লিখতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আবার বাংলার মেয়ে হয়ে ওঠেন। মনোমোহন ঘোষ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় সমাজ সংস্কারের কাজে নেতার ভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং স্ত্রী-লোকদের স্বাধীনতা প্রদান করবার জন্য উত্তেজিত হয়েছিল। এই শিক্ষিত যুবকগণ স্ত্রী লোকের অন্তঃপুরবার প্রথার প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। স্ত্রীকে ইংরাজ বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া তখন বীরত্বের কাজ ছিল। যখন মনোমোহন ঘোষ তার সহধর্মীনিকে জাস্টিস ফিয়ারের মত উচ্চ-পদস্থ এবং ভারতবাসীর

অনুরক্ত ইংরাজের বাড়ি গমন করেছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁর মনে এই ভাবের উদ্রেক হয়েছিল যে এই কাজের দ্বারা তাঁরা এমন একটি সংস্কারের সূত্রপাত করছেন যা সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রহণ করবে।[৪]

১৮৬৯ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ফরিদপুরের লোনসিংহ থেকে "অবলাবান্ধব" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নারীজাতির উন্নতি ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রদ বহু বিষয়ের আলোচনা এই পত্রিকাখানিতে থাকত। দ্বারকানাথ লিখেছেন যে এই পত্রিকাখানি প্রচারিত হলে মনোমোহন তাঁকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার অনেক রকম পরামর্শ দান করেন।[৫]

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন যে নারীদের উচ্চ-শিক্ষা দান সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে ১৮৭২ সালে যখন বিতর্ক উপস্থিত হয় তখন মনোমোহন নারীদের উচ্চ-শিক্ষায় পক্ষপাতীদের সমর্থন করেন। ১৮৬৯ সালে মেরী কার্পেন্টার নামে ইংরাজ জনহিতৈষী মহিলা বাংলাদেশে নারী শিক্ষা উন্নতির উদ্দেশে নর্মাল স্কুল স্থাপনের কর্মসূচি উত্থাপন করেন। মনোমোহন ঘোষ মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ১৮৭৩ সালে কুমারী এ্যানেট ত্রক্রয়েড (মিসেস বেভারিজ) কোলকাতায় এসে মনোমোহনের গৃহে আশ্রয় নেন এবং সেখানে এক বছর ছিলেন। নারীদের উন্নতি বিধায়ক একটি সুষ্ঠু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা কুমারী ত্রক্রয়েডের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সমাজের অগ্রণী ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরমার্শ করেন এবং আলোচনা ও অর্থ সংগ্রহের পর ১৮৭৩ সালে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোমোহন বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৬]

কুমারী ত্রক্রয়েডের বিবাহ ১৮৭৫ সালে হলে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠে যায়। পরে ১৮৭৬ সালে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। মনোমোহন অন্যান্য উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ব্রাহ্মগণ যেমন আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস সহ এর একজন কর্মকর্তা হন। ১৮৭৩ সালে বেথুন স্কুলের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন এবং এদেশীয় নারীশিক্ষা বিধানের বিষয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৭]

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, মনোমোহন ঘোষের আত্মীয় এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর স্ত্রী বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন এবং পরবর্তী কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হন। ১৮৯০ সালে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে মনোমোহন ঘোষ অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য হিসাবে কাদম্বিনীকে অধিবেশনে প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার বক্তৃতাটি দেবার সুযোগ দেন।[৮]

এছাড়া মনোমোহন ব্রাহ্ম মন্দিরে "পর্দা প্রথার" বিরোধী হয়ে মহিলাদের পরিবারের

সঙ্গে বসে প্রার্থনা করবার পক্ষপাতী ছিলেন। বাল্যবিবাহ প্রথার বিরোধী পক্ষ নিয়ে ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। তিনি ১৮৯১ "এ্যজ্ অফ কনসেন্ট বিল" সমর্থন করেছিলেন বলে সনাতন রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[৯]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম প্রিয় ছিলেন মনোমোহন। বিদ্যাসাগরের মত তাঁরও মাতৃভক্তি ছিল অত্যন্ত গভীর। মায়ের নির্দেশে দুঃস্থ লোকের মামলা করতেন। তাঁর অপূর্ব মাতৃভক্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এত কাজের মধ্যেও তিনি প্রতি বছর পূজার ছুটিতে কৃষ্ণনগরে গিয়ে মায়ের সঙ্গে কিছুদিন বাস করতেন। ১৮৯৬ সালে ছুটির সময় তিনি মায়ের কাছে কৃষ্ণনগরে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কর্তব্যপরায়ণ মনোমোহন বাংলা তথা ভারতবর্ষের বন্ধু ছিলেন যিনি ইংরাজের সাথে ভারতবাসীর সামাজিক আত্মীয়তা সংস্থাপন করে রাজনৈতিক, সামাজিক-এমন কি নারী জগতেরও উন্নতি হবে"- এমন দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতীক ছিলেন।[১০]

সূত্র-নির্দেশ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, কোলকাতা, ১৩৫৬, প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্বকথা, কোলকাতা, ১৯১৭ সিংহ, নির্মল কুমার ঃ Freedom Movement in Bengal (1818-1904) Calcutta, 1958

২। যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলকাতা ১৯৩৬, কুমুদ কুমার মল্লিক, নদীয়া কাহিনী, কলকাতা।

৩। যোগেশচন্দ্র বাগল, ভারতের মুক্তি সন্ধানী, কলকাতা ১৯৫৮।

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, ১৯০৩।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মনোমোহন ঘোষ - পুরাতন স্মৃতি" প্রবাসী, শ্রাবণ, ৩য় খণ্ড, কোলকাতা ১৯০৩।

৫। যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ ভারতের মুক্তি সন্ধানী, রাধাগোবিন্দ সান্যাল, 'A General Biography of Bengal Celebrities, Calcutta, 1889.

৬। Mary Carpenter, Six Months in India, London, 1868.

Journal of Aurobindo Archives and Research Vol 14, 1990 no. 1

৭। যোগেশচন্দ্র বাগল, ভারতের মুক্তি সন্ধানী ও শিবনাথ শাস্ত্রী - রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।

৮। বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা ১৯৫০।

শ্রীকান্ত রায়, Bengal Celebrities, Calcutta. 1906

৯। David Kopf, The Brahmo Samaj and the Shaping of Modern Indian Mind. New Jersey, 1979.

Malavika Karlekar, Voices from within, Delhi. 1991

Weekly Reports on the Native Papers 1891 (West Bengal States Archives)

১০। কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নদীয়ার মহাজীবন কলকাতা ১৮৭৯।

বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষা, ১৯০১-১৯৩১

মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম

প্রতিপাদ্যসারঃ বিশ শতকের শুরু থেকে তিন এর দশক পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষার বিস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষতঃ ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগের পর থেকে মুসলিম নারী শিক্ষার অনুকূলে ব্রিটিশ সরকারের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ এবং মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলে বাংলার মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। নারীশিক্ষার প্রসারে বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই কালপরিসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার অবস্থা কোন অংশে উন্নত ছিল না। সে সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল মূলত বালকদের জন্য। মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে প্রধানত পর্দার অন্তরালে রাখার তাগিদে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি অভিভাবকগণ মোটেও আগ্রহী হতেন না। শিক্ষার অভাব ও বিভিন্ন কুসংস্কারের কারণে নারীরা ছিল সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ফলে বাঙালি মুসলিম নারীগণ চরম দুরবস্থার মধ্য দিয়ে কাল কাটাতে বাধ্য হতো।[১] ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণকে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হতো। কারণ জনগণ বিশ্বাস করতো যে, এর ফলে মেয়েরা বিধবা এবং কুচক্রী হবে। বাংলার মুসলিম সমাজেও এই ধরণের কুসংস্কার বিরাজমান ছিল। অ্যাডাম মেয়েদের জন্য কোন স্কুল সে সময়ে ছিল না বলে উল্লেখ করেন। তবে অভিজাত মুসলিম পরিবারে মেয়েদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।[২]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছেলেদের শিক্ষার প্রতি যত্নশীল হওয়ার অনেক পরেও মেয়েদের শিক্ষার দিকে কোন নজর দেয়নি। ১৮৫০ সালে লর্ড ডালহৌসি (১৮১২-১৮৬০) প্রথমবারের মত সরকারি এক ঘোষণার মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রতি শুধু মৌখিক সমর্থন ও সহানুভূতি জানিয়েই কর্তব্য শেষ করেন।[৩] এছাড়া, ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী ভারতে নারী শিক্ষা প্রসারের অনুকূলে বিভিন্ন জোরালো পদক্ষেপের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি বেশিদূর এগোয়নি। (১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পরোক্ষভাবে এই প্রচেষ্টায় ক্ষতি সাধন করে কেননা এই ঘটনা সাধারণভাবে যেকোন সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারকে সতর্ক করে দেয়।[৪])

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসার প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগেই

সংঘটিত হয়। এ শতকের শেষ পাদে ও বিশ শতকের প্রথম দশকে যে সকল মুসলিম সমিতি সংগঠন নারী শিক্ষার প্রসারে অবদান রেখেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি হচ্ছে ঃ (১) *সেন্ট্রাল ন্যাশানাল মোহামেডান এসোসিয়েশন* (১৮৭৭) ; (২) *ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী* (১৮৮৩) ; (৩) *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি* (১৯০৩)।

ন্যাশানাল মোহামেডান এসোসিয়েশন সমাজ, শিক্ষা ও আইন বিষয়ে যে সব কাজ ও আন্দোলনের সূচনা করে সেগুলো নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা ও নারী প্রগতির বিষয়ে তাদের উদ্যোগকে প্রতিফলিত করে। নারী শিক্ষার পক্ষে এই সংগঠন প্রস্তাব দিলে রক্ষণশীলদের বাধায় তা প্রায় স্থগিত হয়ে যায়। তবে এ বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার জন্য সংগঠন থেকে একটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয় এবং নারী শিক্ষার পক্ষে প্রচেষ্টা চালানো হয়।[৫] এসোসিয়েশনের সম্পাদক বিচারপতি সৈয়দ আমির আলির (১৮৪৯-১৯২৮) দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বিষয়ের মত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল ছিল।[৬]

১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত *ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর* মূল উদ্যোক্তারা ছিলেন ঢাকা কলেজের কয়েকজন ছাত্র। আব্দুল আজিজ (১৮৬৩-১৯২৬), ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), ফজলুর রহিম, আব্দুল মজিদ প্রমুখ মনীষী উক্ত সম্মিলনীর অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। সংগঠনের প্রথম বছরের কাজ হিসেবে তাঁরা মুসলিম নারীদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব নয় ভেবে তাঁরা গৃহ শিক্ষাকে অবলম্বন করে বার্ষিক পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করেন। যারা পরীক্ষায় সফল হতো, তাদেরকে সম্মিলনীর পক্ষ থেকে পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক দেয়া হতো। কোন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে এটি ছিল একটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি। তবে তাঁদের এ প্রচেষ্টা ছিল সীমিত এবং ১৯০৫ সালে এ সংগঠনটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৭]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কর্মসূচিতে (১৯০৩) স্ত্রীশিক্ষাকে অঙ্গীভূত করার প্রসঙ্গে এর সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪) বলেছেন, "আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করাও শিক্ষা সমিতির এক প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রীশিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং যাহাতে মুসলমান বালিকাগণ ধর্ম ও নীতি শাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিতে পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"[৮]

১৮৯৬ সাল হতে কলকাতার কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলমান একটি মুসলিম

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ ও প্রয়াস শুরু করেন। কারণ বেথুন স্কুলে মুসলিম বালিকাদের অধ্যয়নের সুযোগ ছিল না।[৯] এর প্রেক্ষিতে ১৮৯৭ সালের ১৯শে জানুয়ারি 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা' নামে কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মুসলমানদের উদ্যোগে কলকাতায় স্থাপিত এটিই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়।[১০]

বেসরকারিভাবে এসব প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের শেষ পাদে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে তুলনামূলক অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৮৮৬-৮৭ সালে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ৪১৮৯৭ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল ৫৬০৩ জন। এবং ১৮৯৬-৯৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা ৭৯৮২ জনে দাঁড়ায়।[১১] মুসলমান ছাত্রীদের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। অপর দিকে, বিশ শতকের শুরুতে মুসলমান নারীদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের কথাও জানা যায়। ১৯০১ সালের আদমসুমারীতে *জেনানা শিক্ষা* [১২] ব্যবস্থায় ৪০০ মুসলমান ইংরেজি শিক্ষিত স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করা হয়।[১৩]

তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শ্রেণীতে এসময় মুসলিম বালিকাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ১৮৮৬-৮৭ সালে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষায় মোট ৪৫৩১ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল মাত্র ১১ জন। এ অবস্থা বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯০১-০২ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় মোট ৫৬০০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল মাত্র ১৪ জন।[১৪] মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মুসলিম বালিকাদের অবস্থা ও স্কুলের পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারি শিক্ষা রিপোর্টে বলা হয়, 'স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের উপস্থিতি একেবারেই কম এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৯% মুসলিম ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মাত্র ২৩ জন মুসলিম ছাত্রী বর্তমান রয়েছে এবং যেখানে প্রতি ৩০ জনে একজন হিন্দু মেয়ে সরকারি প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে সেখানে মুসলিম মেয়েদের উপস্থিতি হল ৬৮ জনে মাত্র এক জন।'[১৫] মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় বাঙালি মুসলিম নারীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ছিল। ১৯০৩ সালে বাংলায় কেবল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকার সংখ্যা ছিল ৩৮৮৩ জন, তন্মধ্যে মুসলিম বালিকা ছিল মাত্র ৫ জন।[১৬]

মুসলিম নারী শিক্ষার এরূপ পশ্চাৎপদ অবস্থায় বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার মুসলিম নারী সমাজের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমানের পর্দাপ্রথাই নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। উপযুক্ত শিক্ষালাভের মাধ্যমেই নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভ করা সম্ভব হতে পারে। *অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচূর* (১৯০৪), সুলতানের স্বপ্ন (১৯০৫) প্রভৃতি গ্রন্থে

তিনি মূখ্যভাবে এটাই প্রচার করেছেন। নারীমুক্তি আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি লেখনীর মাধ্যম ব্যতীত সমাজকর্মীরূপে জীবন নিবেদন করেন এবং নারী শিক্ষা বিস্তারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন।[১৭]

নারী শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৫৮-১৯০৯) মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর বেগম রোকেয়া মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে প্রথম 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "প্রথম যখন পাঁচটি মেয়ে নিয়ে স্কুল আরম্ভ করি তখন ভারি আশ্চর্য ঠেকিয়াছিল এই কথা যে, একই শিক্ষয়িত্রী কেমন করিয়া একসঙ্গে একই সময়ে পাঁচটি মেয়েকে পড়াইতে পারেন।"[১৮] তবে ভাগলপুরে বেগম রোকেয়ার বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত কারণে তিনি ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর ভাগলপুরের স্বামীগৃহ ও স্কুল ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় তিনি ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলসহ (১৮৭০-১৯১৭) অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবর্গের সহায়তায় ১৯১১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার স্কুল পরিচালনার কাজ শুরু করেন। ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ্ লেনের ছোট বাড়িতে মাত্র ৮ জন ছাত্রী ও দুইখানা বেঞ্চ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির পুনরায় নামকরণ করা হয় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। স্কুলের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বেগম রোকেয়া নানা সুবিধা প্রদান করে ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন[১৯] এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ্য শিক্ষয়ত্রী নিযুক্ত করেন।[২০] প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, যানবাহন সমস্যা, এমন কি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাব থাকা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে স্কুলের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।[২১] উল্লেখ্য যে, কলকাতার বুকে এটিই ছিল প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় যেখানে মুসলিম মেয়েদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।[২২] বেগম রোকেয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংমিশ্রণে ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় বঙ্গীয় মহিলা শিক্ষা সম্মেলনে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন এতে তা প্রমাণিত হয়।[২৩] তাঁর অবদানের ফলে বাংলার নারী সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চার ঘটে।

সাখাওয়াত স্কুল ব্যতীত বিশ শতকের প্রথম 'সোহ্‌রাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয়' নামে আরেকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এটি ১৯০৯ সালে বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৮৯৮-১৯৬৩) মাতা খুজিস্তা আকতার বানু প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের উদ্বোধন করে তৎকালীন ভাইসরয় পত্নী লেডি মিন্টো।[২৪] তবে এই স্কুল সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায়না।

সরকারিভাবে এ সময় নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকার জেনানা শিক্ষাকে বেশি জরুরি মনে করেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় মুসলমানদের এক সম্মেলনে মুসলিম জেনানা শিক্ষার জন্য একটি উপযুক্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হলে সরকার তার অনুমোদন দেন এবং এই- পাঠ্যসূচি স্কুল পর্যন্ত বিস্তৃতির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সরকার মেয়েদের স্কুলের জন্য পর্যাপ্ত অনুদান দেন যাতে শিক্ষকগণ নিয়মিত বেতন গ্রহণ করতে পারেন এবং ছাত্রীদের জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা করা হয়।[২৬] সরকারের পক্ষ থেকে মুসলিম নারী শিক্ষা প্রসারের কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর বাংলা বিভাগের ফলশ্রুতিতে গঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে সরকারি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও মুসলামানদের উৎসাহ উদ্দীপনার ফলে মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়।

সরকার প্রদেশের নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নারী শিক্ষায় সমস্যা অনুসন্ধান এবং উন্নয়নের সুপারিশ পেশ করার জন্য সরকার একটি 'নারী শিক্ষা কমিটি' গঠন করেন। সর্বস্তরে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সংস্কার সাধনের জন্য বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেয়া ছাড়াও এই কমিটি স্কুলের পরিদর্শন, উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার, ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন, মেয়েদের শিক্ষা অর্জনে উৎসাহী করতে 'লেডিস কমিটি' গঠন এবং জেনানা শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার কাজে ব্রতী হয়।[২৭] রবার্ট নাথনের সভাপতিত্বে নারী শিক্ষা কমিটির ১৫ জন সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে নবাব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫), নবাব আলি চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), মৌলভী আহ্সান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫)- এই তিনজন মুসলিম সদস্য ছিলেন।[২৮] নারী শিক্ষা কমিটি প্রাথমিক বালিকা স্কুলের জন্য নূতন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে। এতে ছিল পঠন, লিখন, ভূগোল ও ইতিহাস। পাঠের বিষয়গুলো ছিল বিশ্লেষণাত্মক। সুবিধা ছিল জটিল বাংলা অক্ষরগুলো পড়তে হত না। এসব শব্দকে ছবি এবং জিনিসের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হতো যাতে বাচ্চারা মনে রাখতে পারে।[২৯] কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার প্রদেশে অনেক বালিকা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করেন।[৩০] সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও মুসলমানদের ব্যাপক উৎসাহের ফলে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশে আধুনিক মুসলিম নারী শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। যেমন ঃ ১৯০৬-০৭ সালে পূর্ব বাংলা ও আসামে প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ৫১১৮০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান ছাত্রী ছিল ২২২২৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৪৩.৪২ শতাংশ। ১৯১১-১২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১১০৮১৭ জন ছাত্রীর মধ্যে ৫৬৫৭৫জনে অর্থাৎ শতকরা ৫১.০৫-শতাংশ এ দাঁড়ায়। এছাড়া, মাধ্যমিক শিক্ষায় ১৯০৬-০৭ সালে মোট ১৫০৩ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল ৪৮ জন এবং এর শতকরা হার ছিল ৩.১৯ শতাংশ। ১৯১১-১২

সালে মোট ২৪৮০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ১০৮ জনে অর্থাৎ শতকরা ৪.৩৫ শতাংশ-এ উন্নীত হয়।[৩১] উক্ত তথ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম নারীদের অবস্থা আশানুরূপ বলা যায়। তবে মাধ্যমিক শিক্ষায় সেরূপ না হলেও বিগত পাঁচ বৎসরে মুসলিম ছাত্রীসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে পশ্চিম বাংলায় ১৯১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৯,৭৭৮ জন এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় ছিল ২৫ জন।[৩২] এতে দেখা যায়, পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা পশ্চিম বাংলার চেয়ে অগ্রগামী ছিল।[৩৩]

১৯১৪ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত মুসলিম শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি মুসলিম নারী শিক্ষার উন্নয়নে কিছু সুপারিশ পেশ করে। কমিটির মতে, মুসলমান মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কমিটি মুসলমান নারী শিক্ষার জন্য আরও কিছু সুপারিশ পেশ করে। যেমন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, কলকাতা ও ঢাকায় মেয়েদের জন্য মডেল স্কুল তৈরি করা, সহকারি পরিদর্শক পদে মুসলিম মহিলা নিয়োগ, মুসলিম ছাত্রীদেরকে উদারভাবে বৃত্তি প্রদান ও মুসলমান মেয়েদের জন্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি। এছাড়াও কমিটি সুপারিশ করে যে, প্রয়োজনবোধে পর্দার মধ্যে মুসলমান মেয়েদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা যেতে পারে। সরকার কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে মুসলমান মেয়েদের জন্য বৃত্তি প্রদান, স্কুলগুলির জন্য অনুদান দেয়া, জেনানা শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৩৪]

মুসলমান নারীদের আধুনিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি আলোচ্য সময়ে বাংলার মুসলিম নারী সমাজ বেসরকারিভাবে সভা সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে এগিয়ে আসেন বেগম রোকেয়া। তিনি মুসলিম নারীদেরকে দেশ, জাতি এবং শিক্ষা ও সামাজিকতায় সচেতনতাবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা সমিতি আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মিসেস আব্দুল করিম এবং বেগম রোকেয়া আজীবন অবৈতনিক সেক্রেটারী হিসেবে সমিতির জন্য কাজ করে যান।[৩৫] অন্যান্য যাঁরা এই সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে বেগম সলিমুল্লাহ, লেডী আব্দুর রহিম, মিসেস এ.কে. ফজলুল হক, লেডী শামসুল হুদা, মিসেস আজিজুল হক, মিসেস এম.এ. মোমিন, নবাব বেগম ফারুকী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৬] শিক্ষা ও সামাজিকতায় নারীদেরকে সচেতন করে তোলা সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা বেগম রোকেয়া ও অন্যান্য কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম নারী সমাজের অভিজাত শ্রেণী এই সমিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ফলে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলার মুসলিম নারীদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রসারে আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম একটি প্রতিষ্ঠিত সমিতি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এভাবে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নারী শিক্ষার ব্যাপারে অধিক সচেতনতা ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে আমাদের আলোচিত সময়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মুসলমান ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নে ১৯১২ সাল থেকে ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত বাংলার প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান মেয়েদের অবস্থা দেখানো হল।

সারণি

প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমি নারীদের অগ্রগতি ঃ ১৯১২ থেকে ১৯২১-২২						
বছর	শিক্ষার স্তর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	হিন্দু ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	হিন্দু হার	মুসলিম হার
১৯১২	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫৩৭	১২৪৯৭৭	৭৬৩৫৩	৫৮.৫	৩৯.২
১৯১৭	ঐ	৯৩৬২	১৪০১৭৭	১২৯৩৪১	৪৮.৫	৪৫.৫
১৯১৮-১৯	ঐ	১০৬৩৬	১৪২৭৭১	১৪৮৮৫৪	৪৫.৬	৫১.৬
১৯২১-২২	ঐ	*	১৩৯২৯৯	১৭৩৪৯৪	৪১.৭	৫১.৯

সূত্র ঃ Supplement to the Progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17, Fifth Quinquennial Review, PP. 70-71. Reports on Islamic education and Madrash Education in Bengal (1861-1977), Vol. 3, Dr. M. Sekandar Ali Ibrahimy (ed.), Dhaka 1985, P. 210. Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal, 1918-1919. pp. 20-21. * তথ্য পাওয়া যায়নি।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উল্লেখিত সময়ে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান ছাত্রীদের বৃদ্ধি ও হার সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। লক্ষণীয় যে, ১৯১২ সালে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু ১৯২১-২২ সালে হিন্দু ছাত্রীদের সংখ্যার চেয়ে মুসলমান ছাত্রীসংখ্যা বেশ এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, হিন্দু ছাত্রীসংখ্যা অনেক কমে যায়। পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রীসংখ্যা ও হার আরো বৃদ্ধি পায়। এক তথ্যে জানা যায় যে, ১৯৩১-৩২ সালে বাংলার প্রাথমিক

শিক্ষায় মোট ৫,৩৫,১১০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান ছিল ৩,০২,৮০৮ জন এবং এর শকতরা হার ছিল ৫৬.৫।[৩৭] তবে প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় মুসলিম নারীদের মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি শ্লথ ছিল। যেমন, ১৯১২ সালে বাংলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক শিক্ষায় মোট মুসলিম ছাত্রী ছিল ১৩৩ জন এবং এর শকতরা হার ছিল ১.৫। ১৯১৮-১৯ সালে মুসলিম ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৪১৫ জন এবং এর হার ছিল শতকরা ৫.৩ শতাংশ।[৩৮] এছাড়া, ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে ১৯৩১-৩২ সালে মোট ৩,৮৫৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ৯৫ জন অর্থাৎ শতকরা ২.৪ শতাংশ ছিল মুসলমান। একই সময়ে ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে ৪৯১৬ জন ছাত্রীর মধ্যে ২৩৫ জন অর্থাৎ ৪.৭% ছিল মুসলমান। ১৯২১-২২ সালে ১০২ জন মুসলিম ছাত্রী ম্যাট্রিক পাশ করে। দশ বৎসর পরে ১৯৩১-৩২ সালে ৩৯৪ জন মুসলিম ছাত্রী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।[৩৯] মাধ্যমিক স্তরে মুসলিম ছাত্রীদের এই পাশের সংখ্যা মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যায়। মুসলিম নারীদের মাধ্যমিক শিক্ষায় ধীরে ধীরে উন্নতির ফলে আলোচ্য সময়ে উচ্চ শিক্ষাতেও তাদের অবস্থা উন্নতি দিকে এগিয়ে যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এই সময় কালে কয়েকজন মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন এবং মিস ফজিলাতুন্নেসা নামক এক মহিলা সরকারি বৃত্তি লাভ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডেও গমন করেছিলেন।

বাংলার মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা প্রসারের সূচনায় বহুবিধ বাধাবিপত্তি ও সমস্যা নিহিত ছিল। সেসব বাধাগুলোর মধ্যে ছিলঃ (১) পর্দা প্রথা, (২) ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও নারী শিক্ষার প্রতি বৈরী ধারণা, (৩) বাল্য বিবাহ, (৪) যোগ্য মহিলা শিক্ষিকার অভাব, (৫) পাঠ্যসূচির অপর্যাপ্ততা, (৬) ফান্ডের অভাব ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এ সকল কারণের কিছু অংশ অকার্যকর হয়ে গেলে মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষায় একটা উৎসাহের সৃষ্টি হয়। যেমন-রক্ষণশীলতা ও বৈরী ধারণাগুলো মুসলমানদের মধ্য হতে ধীরে ধীরে উঠে যায়। বাল্য বিবাহ সারদা আইনের কারণে অনেকাংশে কমে যায়। পর্দাপ্রথা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন বাধা ছিল না। কারণ এ শিক্ষায় ৯ হতে ১০ বছরের মেয়েদেরকেই ছেলেদের স্কুলে পাঠানো হতো। যা মুসলমান সমাজে পর্দাবিরোধী কাজ বলে মনে করা হতো না। এ জাতীয় অনুকূল পরিবেশের কারণেই আমরা আলোচ্য সময়ে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম নারীদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখতে পাই। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতিতে পর্দা প্রথা, গোঁড়ামী, বালিকা স্কুলের স্বল্পতা, যোগ্য শিক্ষিকার অভাব, যাতায়াত ও আবাসিক সমস্যা, দারিদ্র্য ইত্যাদি প্রধান অন্তরায় ছিল। এতদসত্ত্বেও আমাদের আলোচিত সময়ে বাংলার মুসলিম নারী সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

সূত্র-নির্দেশ

১. ইসলাম ধর্মে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দেখুন, আল-কোরআন, সুরা আলাক, পারা - ৩০, আয়ত: ১-৫। মেশকাত শরীফ, দ্বিতীয় জিল্‌দ, সপ্তম মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ১৪। কিন্তু মুসলিম সমাজ তখন ইসলামের মূল আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং তাদের মধ্যে নানাবিধ কুসংস্কার। অনুপ্রবেশ করে। A. K Nazmul Karim. *Changing Society in India and Pakistan*. Dacca, 1956, pp. 129, 137

২. *Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Bihar*, Submitted to Government in 1835, 1836 & 1838 (Calcutta. 1968), p 132.

৩. J P Naik & Syed Nurullah, *History of Education in India* (1800-1973), Delhi. 1945, pp. 42,43

৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৯২।

৫. *The Moslem Chronicle*, 21 March 1895, p. 125.

৬. Syed Ameer Ali, *Muhammadan Education and Muhammadan Society, Presidential Address delivered at the Muhammadan Educational Conference of 1899*, Calcutta, 1900.

৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, নওশের আলি খান ইউসুফজয়ী, *বঙ্গীয় মুসলমান*, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭, পৃ. ৪৩-৪৫। মুনতাসির মামুন, 'উনিশ শতকের পূর্ব বাংলার সভা-সমিতি', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ৬৩-১২৫।

৮. *ইসলাম প্রচারক*, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০, পৃ. ৪১৮

৯. বেথুন স্কুল ১৮৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রধানত হিন্দু বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশে স্থাপিত হয়েছিল। যার ফলে মুসলিম মেয়েরা এই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেতনা। যোগেশ চন্দ্র বাগল, *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা*, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ৩৩-৩৭। আরো দেখুন, *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৩৮২ সংখ্যা, নভেম্বর, ১৮৯৬, পৃ. ১৯৩। ১৮৯৬ সালে কলকাতার প্রভাবশালী ডাক্তার জহিরুদ্দিন আহমদের কন্যা বেথুন কলেজে ভর্তির আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়। দেখুন, *The moslem Chronicle*, 28 March, 1896, p. 142.

১০. *The Moslem Chronicale*, 23 January, 1897. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৩৮৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, পৃ. ২৯৮।

১১. *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal* (1861-1977), Vol. 3, Dr M. Sekandar Ali Ibrahimy(ed.), Dhaka, 1985. p. 47.

১২. সে যুগে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা কিংবা দুঃস্থ মহিলাদেরকে বাড়ির অন্দরমহলে শিক্ষা দেয়ার এক ধরণের ব্যবস্থা ছিল যা 'জেনানা শিক্ষা' বা 'অন্তঃপুর শিক্ষা' নামে পরিচিত। এই শিক্ষা পদ্ধতির অন্দর মহলে দেয়ার প্রচলন থাকলেও এতে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও ছিল। *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1907-08 to 1911-12 Vol.1. pp 98-99 *মিহির ও সুধাকর*, ২৩ মাঘ, ১৩০৯।

১৩. *মিহির ও সুধাকর*, ২৩ মাঘ, ১৩০৯।

১৪. *Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal*, op. cit., p 47.

১৫. *Progress of Education in Bengal*. 1902-03 to 1906-07, Third Quinquennial Review. p 128

১৬. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৪৭৭ সংখ্যা, মে-জুন ১৯০৩, পৃ. ৬-৮।

১৭. বেগম রোকেয়ার জীবন, সময়কাল, কর্ম ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশদ জানার জানার জন্য দ্রষ্টব্য, তাহমিনা আলম, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনঃ চিন্তা চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২। মুহম্মদ শামসুল আলম, *বেগম রোকেয়াঃ জীবন ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০।

১৮. শামসুন নাহার, *রোকেয়া জীবনী*, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ৩৯-৪০।

১৯. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৩৯।

২০. শামসুন নাহার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

২১. ১৯১৭ সালের ১৫ মার্চ স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্কুলের উন্নতি লক্ষ্য করে প্রেসিডেন্সী এবং বর্ধমান অঞ্চলের স্কুল পরিদর্শিকা মিস. এস. বোস. তার ভাষণে বলেন,

... it (Sakhawat Memorial Girl's School) was started in a very small house at

Waliullah lane with only 8 girls on the roll. When I first visited it, it could hardly be called a school, but now I am glad to notice the gradual development and rapid progress it had made in the course of only six years.

The Musslaman, Vol., XI, March 23, 1917, No. 17, p. 5.

২২. এম. আব্দুর রহমান, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা*, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৪২।

২৩. *The Mussalman*, Vol. XXV. T W. Edition, Vol. VII. March 5, 1931, No 26, p. 7. প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "Educational ideals for the Modern Indian Girl", দেখুন - ঐ।

২৪. *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ২৬০-২৬১।

২৫. *Progress of Education in Bengal*, op. cit., p. 128

২৬. H. Sharp, Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, to Chief Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam, No. 78, Shillong, 16 February, 1907: *Eastern Bengal and Assam Education Proceedings*, 1907.

২৭. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1907-08 to 1911-12, Vol. 1, p. 92.

২৮. M K. U. Molla, *The New Province of Eastern Bengal and Assam*, IBS, R U 1981, p. 204.

২৯. Note by Inspectress of Schools, Eastern Bengal and Assam on Books Prescribed for Girls schools (undated) : *Eastern Bengal and Assam Education Proceedings*, 1912.

৩০. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam* op. cit. p. 81.

৩১. Ibid, Vol. II. p. 89.

৩২. *Supplement to the Progress of Education in Bengal*, 1912-13 to 1916-17 Fifth Quinquennial Reveiw, pp. 70-71. ১৯১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় উভয় প্রদেশে মোট

মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৬,৩৫৩ জন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল ১৩৩ জন। দেখুন, ঐ pp. 70-71

৩৩. *Eastern Bengal and Assam Education Proceedings*, No. 5, September, 1910.

৩৪. *Calcutta University Commission Report*, 1917-19. Vol. I. Chapter-VI, pp 167-168.

৩৫. The Mussalman. Vol. XI. April 20. 1917. No. 21, p. 7.

৩৬. আঞ্জুমানে খাওয়াতিন, নিয়মাবলি, কলকাতা, ১৯৩৪, পৃ. ৬।

৩৭. শামসুন নাহার মাহমুদ, 'মসলিম বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা', *মোহাম্মদী*, ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭, পৃ. ৫৩-৫৪।

৩৮. *Supplement to the Progress of Education in Bengal*. 1912-13 to 1916-17, Fifth Quinquennial Review pp. 70-71. *Supplement to the Report on Public Instuction in Bengal,* 1918-19. pp 20-21

৩৯. শামসুন নাহার মাহমুদ, *'মুসলিম বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

ভোটাধিকার প্রশ্নে বাঙালি নারীর ভাবনা চিন্তা

জয়শ্রী সরকার

"আজ যদি আমরা যেমন ইংরেজ মহিলারা পার্লিয়ামেন্টের সভ্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য অতিশয় চেষ্টা ও গোলযোগ করিতেছে, সেইরূপ স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতাম"[১] — উক্তিটি কৃষ্ণভাবিনী দাসের। রক্ষণশীল পরিবারের অন্তঃপুরের কঠিন শাসনকে অগ্রাহ্য করে স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিলেন। চার দেওয়ালের বাইরের জগৎটাকে আস্বাদ করার মনে ছিল অদম্য ইচ্ছা। তিনবছর পর ১৮৮৫ তে প্রকাশিত হল তাঁর অনুভবের ফল, তাঁরই লেখা 'ইংল্যাণ্ডে বঙ্গমহিলা'।[২]

বাঙালী মহিলারা তো আরো দুই দশক আগেই বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথার সমালোচনা করে লেখনী ধারণ করেছিলেন। হয়তো কৃষ্ণভাবিনী বুঝেছিলেন যে তাতে কতটুকুই বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 'পিঞ্জরাবদ্ধা'[৩] বাঙালি নারীর কাছে প্রতিবাদের ভাষা আর বেশি কিছু হওয়া সম্ভব নয়। তবে সেই সময় যা ছিল অসহায়ের আক্ষেপ পরবর্তী শতকের সূচনায় তা রূপ নিল একটি বলিষ্ঠ আন্দোলনে।

তবে ব্রিটিশ সফ্রজিষ্টদের আন্দোলনের পন্থাও যে বাঙলায় সমর্থিত হয়েছে, তা নয়[৪]। কিন্তু বেশ কয়েকজন বাঙালি মহিলারা যেমন সবলা রায়, সুষমা সেন, মৃণালিনী সেন সুষমা সেন বা রেণুকা, রায় ইত্যাদি তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাঁদের আন্দোলনেও যোগদান করেছেন[৫], তাঁদের সাহায্যও পেয়েছেন। অকপটে সেই ঋণ স্বীকার করেছেন—"the final achievement of English feminist was to be our starling point."[৬]

১৯১৭ তে চৌদ্দ জন মহিলায় প্রতিনিধি যে সব সদস্যারা ভারতসচিব লর্ড এডউইন মন্টেগুর কাছে ভোটাধিকারের আবেদন পেশ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সরোজিনী নাইডু ও লেডী অবলা বসু।[৭] ব্রাহ্ম নেতা ও বৈজ্ঞানিক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা এবং বিবাহসূত্রে ডঃ গোবিন্দরাজালু নাইডুর স্ত্রী। উনিশ শতকের ব্রাহ্ম সংস্কারক দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী হলেন অবলা বসু। সদস্যারা এই মর্মে তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন যে নতুন সংবিধানে তাঁদের পুরুষদের সমান অধিকার প্রদান করতে হবে — ভোটদানের অধিকার উল্লেখ করতে হবে। মূল সুর ছিল মেয়েদের 'মেয়ে' হিসাবে নয়, 'মানুষ' (people) হিসাবে দেখতে

হবে।[৮] তবে পুরুষদের সহযোগিতাও তাঁরা আশা করেছিলেন কারণ ইতিমধ্যেই মহিলারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।[৯] ব্রিটিশ সফ্রজিষ্টদের মতো পুরুষবিরোধী মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও সরোজিনী নাইডু বলছেন যে ভারতীয় সমাজে মাতৃপূজার আয়োজন প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে।[১০] তিনি ভোটাধিকার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি, তা পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন "We might lay the foundation of National Character in the souls of the children and... we might be able by our own implacable ideas of moral purity to cleanse our public life."[১১] সমাজে নারী ও পুরুষের লক্ষ্য স্বতন্ত্র। নারীরা ক্ষমতায় এসে কখনোই পুরুষদের এতদিনকার ক্ষমতা বা অধিকারের দিকে হাত বাড়বে না।[১২] পুরুষ শাসিতসমাজে পুরুষ প্রধান্য স্বীকার করে যেন একটি মধ্যস্থতার মধ্যে আসা। কিন্তু নারী ও পুরুষের ক্ষমতার সাম্যের কথাও তিনি বিশ্বাস করতেন।[১৩]

কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী ও স্বর্ণকুমারী দেবী (ঘোষাল) কন্যা সরলাদেবী চৌধুরাণীর বক্তব্য ছিল আরো দৃঢ়। তাঁর কাছে নারী হচ্ছে পুরুষের সহকর্মী। পুরুষের মত নারীরও অধিকার আছে তাঁর আপন লক্ষ্য স্থির করা কারণ এ যুগটি হল মানবাধিকার, ন্যায় বিচার এবং আত্মনির্ভরতার যুগ।[১৪] হয়তো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর যোগদান সাম্যবাদের এই ধারণাটিকে তাঁর কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে। নারীর অধিকারের জন্য এই যে নারী আন্দোলন — কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের একটি অংশ হিসাবে মৃণালিনী সেন দেখেছেন। উনিশ শতকের ব্রাহ্ম আন্দোলনের পুরোধা আচার্য কেশবচন্দ্র সেন এর পুত্রবধূ এবং ব্রিটিশ সরকারের ইণ্ডিয়া অফিসে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা নির্মল চন্দ্র সেন এর পত্নী মৃণালিনী সেন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইংল্যাণ্ডে তাঁর দীর্ঘ বসবাসের ফলে সুযোগ পেয়েছিলেন সেখানে ভোটাধিকার আন্দোলনের নারীদের সংস্পর্শে আসার এবং তাঁদের আন্দোলনে যোগদান করার। ১৯২০ তে জেনিভাতে এবং ১৯২৬ শে প্যারিসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনে যোগদান করেন ভারতের মহিলাদের প্রতিনিধি হয়ে।[১৫] তিনি নারীর ভোটাদানকে দেখেছেন "To reform our homes....lands we the women of India require as much power and rights in the women of any country in the world".[১৬] এই অধিকার যতদিন না তাঁরা পাবেন, তাঁরা থাকবেন "helpless and powerless" হয়ে। জেনিভা অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিদের আলোচনা বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক সীমানা অতিক্রম করে এমন একটি স্তরে এসে উপনীত হয়েছিল "We were all women. A common bond brought us together."[১৮] তাঁরা যেন একটি বিশাল পরিবার। তিনি আরো উপলব্ধি করেছেন যে নারী প্রগতির ধারা

অব্যাহত থাকবে নারীর সমবেত চেষ্টা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।[২০] তিনি বিদেশে লেডী কন্সট্যান্স ও মিলিসেন্ট ফলসেট-এর সাহায্য পেয়েছিলেন।[২১] হয়তো এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল ১৯২১ এর আগস্টে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনের জন্য বঙ্গীয় নারী সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে।

বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা এবং মুন্সেফ চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী রায় ছিলেন 'বঙ্গীয় নারী সমাজ'এর সভানেত্রী।[২২] তাঁর সঙ্গে ছিলেন অবলা বসু ও কুমুদিনী বসু। ব্রাহ্ম সংস্কারক ও সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক, কৃষ্ণকুমার মিত্রর কন্যা কুমুদিনী ঐতিহ্যকে আঘাত করার থেকে সমাজে স্বীকৃত মহিলাদের কর্তব্যগুলি আরো ভালোভাবে পালন করার জন্যই মহিলাদের ভোটদানের দাবির কথা তুলে ধরেছেন। হয়তো সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের কথা তিনি মনে রেখেছিলেন। নারীর ভোটদানের স্বীকৃতি লাভ করাই ছিল তাঁর আসল লক্ষ্য। তিনি বলেছেন যে নারী ও পুরুষের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য থাকলেও, জীবনের প্রতিটি কেন্দ্রে একে অপরের পরিপূরক। সংসার তাঁর কর্তৃত্বই নারীকে কর্মব্যস্ত জগতের কল্যাণসাধনের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে। এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে নারীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না যেমন — সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও রোগ নিরাময়, ধাত্রীবিদ্যা, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি। সেই কারণে রাজনীতিতে প্রবেশের দ্বার নারীর কাছে রুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। নারীর যুক্ত প্রচেষ্টা ও ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত হলেই এই বিষয়গুলির উপর প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া যাবে।[২৩]

নারীর এই প্রচেষ্টা আংশিক সফল হয়েছিল যখন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বহু সদস্যদের প্রবল বিরোধিতার মুখেও ১৯ শে আগষ্ট ১৯২৫ এ নারী পুরসভায় ভোটদানের অধিকার লাভ করেছিল।[২৪]

প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না হলেও, নারীর ভোটাধিকারের একজন বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন অনিন্দিতা দেবী, গৌরীপুর এস্টেটের দেওয়ান দ্বিজেশ চক্রবর্তীর স্ত্রী। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে নারীর ভোটাধিকারের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে। একজন নারী শুধু একটি "পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন নাই, রাষ্ট্র সমাজেও" তাঁর জন্ম। সেইকারণে রাষ্ট্রসমাজের কাজে যোগদান করা অবশ্য কর্তব্য[২৫] কিন্তু তিনি দেখেছেন যে "মেয়েদের রাষ্ট্রসমাজে কোনো দাবি না থাকায় তাঁহাদের কাজগুলি কেবল পারিবারিক মাত্র হইয়া আছে। রাষ্ট্রসমাজের সহিত তাহার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই।"[২৬] মৃণালিনীর মত তিনিও এই ধারণা পোষণ করেন যে ক্ষমতা ছাড়া নারী তাঁর সামাজিক কর্তব্যগুলিকে কার্যে পরিণত করতে পারবে না অথচ নির্লিপ্ত

থাকলেও নারী সমস্যার কোন সমাধান হবে না।[২৭]

নারীর ভোটাধিকার নিয়ে যেসব মহিলারা আন্দোলন করছেন, অনিন্দিতা তাঁদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র চিন্তা পোষণ করছেন। তিনি পুরুষদের সহায়তায় প্রতি সন্দিহান হয়েছেন। তিনি একথা কখনোই মেনে নিতে পারেন নি সে ভারতে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা মেয়েদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারিণী করবে —"... স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইলেই মেয়েরা সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভ করবেন, সুতরাং এখন বিদেশী গভর্ণমেন্টের নিকট তাঁহাদের দরবার করা অন্যায়। কিন্তু তাঁহাদের (পুরুষদের) অনেক বেশি সুবিধা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁহারা উহা ছাড়িতে পারিতেছেন না, তখন মেয়েরা কোন ভরসায় উহার মধ্য হইতেও যেটুকু লাভ করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টাও না করিয়া থাকিতে পারেন?"[২৮] মৃণালিনীও প্রায় কাছাকাছি ধারণা পোষণ করেন — "ভারতের পুরুষ সমাজ দেশের প্রগতিতে তাঁদের যোগদানে এতই ব্যস্ত যে নারীদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পাচ্ছেন না। এই দূরদৃষ্টিতার একান্ত অভাবের কারণে পুরুষেরা বুঝতে পারছেন না ক্ষমতাপ্রাপ্ত নারী ও পুরুষের যৌথ কাজকর্মের উপরই দেশের প্রগতি নির্ভর করছে। দুজনের লক্ষ্যও অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য।[২৯] নারীর ভোটাধিকারের দাবিকে যে পুরুষেরা সমর্থন জানিয়েছেন তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যে স্বার্থ কাজ করেছে, তা হোল বিদেশী শাসকদের কাছে নিজের সম্মান রক্ষা করা। স্বাধীন দেশে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা নারীকে ক্ষমতা প্রদান করবেন না, তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে।[৩০] — "পাশ্চাত্যদের অপেক্ষা আমরা যে ছোট নই দেখাইবার জন্য মেয়েদের ভোটে পুরুষেরাও উৎসাহ দেখাইতেছেন। কিন্তু একবার শাসনব্যবস্থা পাকা হইয়া গেলে লব্ধ ক্ষমতা তাঁহারা যে মেয়েদের ছাড়িয়া দিবেন। সে সম্ভাবনা কমই।"[৩১]

অনিন্দিতা কিন্তু সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন-এর (AIWL) মত নারীর প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের কথাই তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। স্বামীর অধিকারে তাঁর স্ত্রী বা তাঁর বিধবার ভোটদানের প্রতিবাদ করেছেন কারণ তাহলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দেহমনের উপর পুরুষ নিয়ন্ত্রণের ধারাটাই বজায় থাকবে। কিন্তু নারী ভোটাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হল তাঁর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। বহু সময়েই দেখা যায় যে স্ত্রী তাঁর স্বামীর সিদ্ধান্ত দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল। সেই ক্ষেত্র স্বামীর ভোটেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণে বহু নারীই অবিবাহিতা অবস্থায় থাকছেন, ভোটাধিকার থেকে সেইসব অবিবাহিতা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলারা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। তাছাড়া যোগ্যতাকে সম্পত্তিভিত্তিক করলে সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণীগুলি বঞ্চিত হবেন।[৩২]

অনিন্দিতার কাছে প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বা স্বাক্ষরতা একজন মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের পরিচায়ক নয়।[৩৩] যে সমাজে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সেখানে শিক্ষা বা স্বাক্ষরতাকে ভোটদানের যোগ্যতা হিসাবে রাখা অনিন্দিতা উচিত মনে করেননি। তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না "বাঙালি নারীজীবন ভালো করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, দুঃখকেই তাঁহারা চরম ও পরমরূপে মানিয়া লইয়াছেন ... এ পৃথিবীতে যে তাঁহারা অনধিকার প্রবেশকারী।"[৩৪]

নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলন ছিল বহুমুখী। ব্যারিষ্টার প্রশান্ত কুমার সেনের স্ত্রী সুষমার কাছে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের দাবি উত্থাপনের পূর্বে অন্যান্য সামাজিক বাধাগুলির অপসারণ করা উচিত। সুষমা এখানে বহু মহিলা ও সংগঠানের সমর্থনও পেয়েছেন — মাদ্রাজের উওমেন্স ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, সরলা রায়ের মহিলা সমিতি, অবলা বসু, সরলাদেবী চৌধুরানি, অঘোরনারী সমিতি, বিহার কাউন্সিল অব উওমেন।[৩৫] তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁদের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের দাবি স্বীকৃত হবে না। স্বামীর সম্পত্তিগত যোগ্যতায় তাঁর স্ত্রী বা বিধবার ভোটাধিকারকে মেনে নিলেও সম্পত্তিগত যোগ্যতার মান কমাবার দাবি তুলেছিলেন যাতে অনেক বেশি সংখ্যক মহিলাদের ভোটদানের আওতায় নিয়ে আসা যায়।[৩৬] যদিও তাঁরা বারম্বার স্বীকার করেছেন যে তাঁদের মূল লক্ষ্য হল প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার।[৩৭]

১৯৩৫ এর Government of India Act এ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়নি, পেয়েছে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে। আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ নারীর মুষ্টিমেয় যে সংখ্যা এই আন্দোলনে যোগদান করেছেন। নারীর অধিকারবোধের কথা তুলে ধরেছেন, তাঁরা সমাজের শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁরা ভেবেছেন অবহেলিত বঞ্চিতা নারীদের কথা। তাই তো প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের দাবি তুলে ধরেছেন। প্রতিবাদের ফলে তাৎক্ষণিক যে সাফল্য এসেছিল, তা নয় কিন্তু "পাই বা না পাই, আমরা যাহা চাই তাহা কি জানাইবও না? সত্য ক্ষমতা দিতে হইলে সকলে বিরক্ত তো হইয়া থাকেন। তাহাদে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয়"।[৩৮]

সূত্র নির্দেশ

১। কৃষ্ণভাবিনী দাস, ইংল্যাণ্ডে বঙ্গমহিলা (সম্পাদনা ও ভূমিকা, সীমন্তী সেন), কোলকাতা, ১৯৯৬, পৃ ১৫২।

২। কৃষ্ণভাবিনী দাস, ইংল্যাণ্ডে বঙ্গমহিলা, কলিকাতা, ১৮৮৫ ।

৩। তদেব, পৃ. ১৫২

৪। মহিলা, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৯০৬; পরিচারিকা বৈশাখ ১৮৮৫; রেণুকা রায়, মাই রেমিনিসেন্সেস: সোশাল ডেভেলপমেন্ট ডিউরিং গান্ধীয়ান এরা এ্যন্ড আফটার, নিউ দিল্লী, ১৯৮২, পৃ. ৭৮।

৫। সুষমা সেন, মেময়রস্ অব এ্যন অক্টোজেনারিয়ান, দিল্লী, ১৯৭১, পৃ. ১১৭; সরলা রায়, মেয়েদের সম্বন্ধে গুটিকতক কথা, সরলা রায় সেন্টিনারি ভল্যুম, কোলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৬৫; কালিদাস নাগ, মুখবন্ধ, মৃণালিনী সেন, নকিং এ্যট দ্য ডোর, কোলকাতা, ১৯৫৪, পৃ. iii-iv ; রেণুকা রায়, পূর্বোক্ত।

৬। কর্ণেলিয়া সোরাবজি, পজিসন অব হিন্দু উওমেন ফিফটি ইয়ারস্ এগো, শ্যামকুমারী নেহরু (সম্পা:) আওয়ার কজ্: এ্য সিম্পোসিয়াম বাই ইণ্ডিয়ান উওমেন, এলাহাবাদ, পৃ. ১৮।

৭। এডউইন স্যামুয়েল মন্টেগু, এ্যন ইণ্ডিয়ান ডাইরি, লণ্ডন, ১৯৩০, পৃ. ১১৫-১১৬; জেরাল্ডিন ফোরবস্, উওমেন ইন মর্ডান ইণ্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৯৬, পৃ ৯২-৯৩;

৮। অরুণা আসফ আলি, উওমেনস্ সফ্রেজ ইন ইণ্ডিয়া, ভি গ্রোভার এবং আর অরোরা (সম্পা:) অরুণা আসফ আলি : হার কনট্রিবিউশন টু পলিটিকাল, ইকনমিক এ্যাণ্ড সোসাল ডেভেলপমেন্ট, নতুন দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ৭৮-৭৯।

৯। তদেব

১০। সরোজিনী নাইডু, ইণ্ডিযান উওমেন এ্যাণ্ড দ্য ফ্র্যানচাইস্, স্পিচেস এ্যাণ্ড রাইটিংস্ অব সরোজিনী নাইডু, মাদ্রাজ, ১৯১৮, পৃ. ২৩১-২৩৫

১১। তদেব

১২। তদেব, পৃ ২৩৫-২৩৮

১৩। তারা আলি বেগ, সরোজিনী নাইডু, নতুন দিল্লী, ১৯৭৪, পৃ. ৩১; রেজোলিউশন III ; রিপোর্ট অব দ্য স্পেশাল সেসন অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, বম্বে, ২৯ শে আগষ্ট — ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭, বম্বে, ১৯১৮, পৃ. ১০৯-১১১

১৪। রিপোর্ট অব দি থারটি থার্ড সেসন অব দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, দিল্লী, ডিসেম্বর ২৬-৩১, ১৯১৮, দিল্লী ১৯১৮, জেরাল্ডিন ফোরবস্, উওমেন ইন মডার্ণ ইণ্ডিয়া পূর্বোক্ত, পৃ ৯৪

১৫। কালিদাস নাগ, মুখবন্ধ, পূর্বোক্ত।

১৬। মৃণালিনী সেন, পূর্বোক্ত, পৃ২-৫।

১৭। তদেব।

১৮। তদেব, পৃ. ১৪-১৮

১৯। এ্যাডরেস এ্যট দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী কাউন্সিল অব উওমেন, কোলকাতা, ১৯৩২, মৃণালিনী সেন, তদেব, পৃ ৮১-৮৫।

২০। ইণ্ডিয়ান উওমেন এ্যণ্ড শেয়ার পার্ট ইন ফিউচার, লণ্ডন সেপ্টেম্বর, ১৯২৪, মৃণালিনী সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

২১। মৃণালিনী সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

২২। পদ্মিনী সেনগুপ্ত, পাইওনিয়ার উওমেন অব ইণ্ডিয়া, বম্বে, ১৯৪৪, পৃ. ৮৫-৮৭; উওমেন ইন ইণ্ডিয়া, হুজ হু? বম্বে, ১৯৩৫, পৃ. ix

২৩। দ্য মডার্ণ রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯২১; অমৃতবাজার পত্রিকা, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২১; দ্য ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, আগষ্ট ১৪, ১৯২১।

২৪। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস্, ভল্যুম XVIII ১৯ আগষ্ট, ১৯২৫, পৃ. ৩০৭

২৫। অনিন্দিতাদেবী, পারিবারিক ও রাষ্ট্রসামাজিক কর্তব্য, ভারতী, আশ্বিন ১৩৩০।

২৬। তদেব

২৭। তদেব

২৮। অনিন্দিতা দেবী, মেয়েদের ভোট, জয়শ্রী, শ্রাবণ, ১৩৪০।

২৯। মৃণালিনী সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৭০

৩০। অনিন্দিতা দেবী, মেয়েদের ভোট, পূর্বোক্ত

৩১। তদেব।

৩২। অনিন্দিতা দেবী, মেয়েদের ভোটাধিকার, জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯।

৩৩। তদেব।

৩৪। অনিন্দিতা দেবী, বাঙালি নারীজীবন ও দুঃখ, অভিজিৎ সেন (সংকলক), অনিন্দিতা

দেবীর রচনা সংকলন, কোলকাতা, পৃ. ১২৯।

৩৫। সুষমা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭।

৩৬। তদেব।

৩৭। তদেব, পৃ. ৩৬০

৩৮। অনিন্দিতা দেবী, মেয়েদের ভোট, জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৪০।

তেলেঙ্গানার গণসংগ্রামে মহিলাদের ভূমিকা : একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ

রাজশ্রী দেবনাথ

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে তদানীন্তন ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদের অধীন তেলেঙ্গনা অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন। নয়টি জেলা নিয়ে গঠিত তেলেঙ্গানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষ করে নালগোন্ডা জেলার জনগাঁও তালুকের ধর্মপুরম, মুন্দ্রাইগ্রাম, সূর্যপেট তালুকের এরাপদু, এরাভেল্লী, নূতনকল্লু, পটসূর্যপেট সহ অন্যান্য গ্রাম, হুজুরনগর তালুকের বেটাভোলু, জেরিপোতুলাগুড়েম প্রভৃতি স্থানে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন সকল শ্রেণীর কৃষক। প্রচলিত শস্যকর, বাধ্যতামূলক শ্রমদান বা ভেত্তিপ্রথা, জমি থেকে উচ্ছেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিজাম, সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, বিভিন্ন মধ্যস্বত্ত্বভোগী যেমন দেশমুখ, দেশপান্ডেদের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। এই সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুধুমাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণই নয়, বহু মহিলা যেমন পদ্মা দেশপান্ডে, সরোজিনী, আইলাম্মা, সত্যবতী, শশীকলা, রামালাম্মা, স্বরাজ্যম, যশোদাবেন, কমলাদেবী, প্রমিলাদেবী, জামুলিনিসা বেগম প্রমুখ আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে বিশেষত্বের দাবি রাখে। কিন্তু আন্দোলনের সামগ্রিক আলোচনার প্রাবল্যে মহিলাদের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের স্বার্থে তেলেঙ্গানার গণসংগ্রামের পুনর্মূল্যায়ন বিশেষতঃ মহিলাদের ভূমিকার যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ মতাদর্শগত ঝোঁক থাকলে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অনেক অসঙ্গতি থেকে যায়। কারণ ঐতিহাসিক যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেন সেই অনুযায়ী ঐতিহাসিক উপাদানকে ব্যবহার করেন, ব্যাখ্যা করেন। স্বভাবতই অন্যান্য উপাদানগুলি যথাযথ গুরুত্বসহ আলোচিত না হওয়ার বা উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমনটি ঘটেছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে। এধরণের ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা সঠিকভাবে বিশ্লেষিত না হওয়ায় ইতিহাস রচনায় যে অসঙ্গতি রয়ে গেছে তা দূর করতে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে নারীবাদী ইতিহাস রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

নারীবাদী ইতিহাস বা মেয়েদের ইতিহাস সম্পর্কে অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য বলেছেন, "মেয়েদের ইতিহাস" কথাটি দিয়ে যা বোঝানো হয় তা কেবল সমাজ ও রাজনীতির বিবর্তনে মেয়েদের ভূমিকা নির্ণয়ের কাজ নয়, তাদের চোখে নিজেদের ভূমিকা কিরকমভাবে দেখা দিয়েছিল তারও বিশ্লেষণ।"[১] এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিমধ্যে রচিত তেলেঙ্গানার গণ-আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় যে এখানে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে মহিলাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগদানের উল্লেখ থাকলেও, আন্দোলন সম্পর্কে এবং আন্দোলনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা স্থান পায়নি। একথা অনস্বীকার্য যে যে-কোনো আন্দোলন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আন্দোলনের সামগ্রিক চেতনা থেকেই সমাজের অন্যান্য অংশের মতই মহিলাদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধারণার সাথে তাঁদের একান্ত নিজস্ব ধ্যানধারণা যুক্ত হয়ে তাকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিতে পারে। এই কথার প্রমাণ মেলে ঐ সব আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের লেখা চিঠিপত্রে, স্মৃতিকথায় এবং তাদের প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে। স্ত্রী শক্তি সংগঠনের পক্ষ থেকে রচিত We were Making History....Life Stories of women in the Telengana People's Struggle[২] গ্রন্থে তেলেঙ্গানা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের ভূমিকা, তাদের চিন্তা ভাবনার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, তাদেরই মুখের কথা শুনে, তাদের চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা বিশ্লেষণ করে।

তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। কিন্তু কি কারণে এত বেশি সংখ্যক মহিলা বিশেষ করে দারিদ্র্য পীড়িত, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রাজনৈতিক চেতনা রহিত এই সব মহিলা পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় বাধাকে অতিক্রম করে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা যে কোন পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। তাই তেলেঙ্গানা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ বা নেতৃত্বকারীদের নামোল্লেখের মধ্যেই একজন ইতিহাস অনুসন্ধানী গবেষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে না। কি পরিস্থিতিতে, কেন এই সব মহিলা আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন, আন্দোলন সম্পর্কে তাদের মনোভাব কি ছিল তার অনুসন্ধান ও জরুরী।

পি. সুন্দরাইয়া তাঁর তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা গ্রন্থে লিখেছেন, "সামন্ততান্ত্রিক জবর দখলের সব থেকে জঘন্য দিকটি ছিল মেয়েদের 'দাসী' হিসাবে জমিদারদের বাড়িতে রেখে দেওয়ার প্রচলন। জমিদাররা তাদের মেয়েদের বিয়ে দেবার সময় ঐ সব দাসীদের উপঢৌকন হিসাবে ঐ বিবাহিত কন্যাদের সঙ্গে পাঠাত, তাদের নতুন বাড়িতে সেবা করার কাজ দিয়ে। এই দাসী মেয়েদের জমিদারেরা ব্যবহার করত

রক্ষিতা হিসাবে।" শুধু তাই নয় নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদে সামন্তপ্রভু এবং তাদের অনুচরেরা মহিলাদের বিশেষ করে কৃষিকাজে যুক্ত মহিলাদের যখন-তখন যে কোনো অজুহাতে শারীরিক নিগ্রহ করত। ধর্ষণ ছিল নিয়মিত ঘটনা। তেলেঙ্গানার মহিলাদের কাছে এই অসহনীয় পরিবেশ শুধু পথেঘাটে আর কর্মক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বাড়ির অভ্যন্তরেও। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত হায়দ্রাবাদেও কন্যা সন্তান ছিল অবাঞ্ছিত। অবহেলা, অনাহার আর অশিক্ষার মধ্যেই তারা বেঁচে থাকত, বড় হত। বিবাহিতা জীবনও তাদের সুখের হত না। শ্বশুর বাড়ির লোকেদের অত্যাচারে প্রায়ই তাদের ফিরে আসতে হত পিত্রালয়ে, যেখানে তাদের কখনই স্বাগত জানানো হত না। অভিজাত, সম্পন্ন পরিবারের মেয়েদের মধ্যে ছিল পর্দা প্রথার প্রচলন। অধিকাংশ গ্রামেই কোনো বিদ্যালয় ছিল না। আর বিদ্যালয় থাকলেও সেগুলিতে মেয়েদের পড়ারে সুযোগ ছিল না। সাধারণ পরিবারগুলিতে মেয়েদের পড়ার সুযোগ ছিল না। সাধারণ পরিবারগুলিতে মহিলাদের যখন এই অবস্থা তখন দরিদ্র ও তথাকথিত নিম্নবর্গের মহিলাদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে লম্বাডি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়। এই অঞ্চলের ভূস্বামীরা লম্বাডি মেয়েদের গৃহদাসী হিসাবে রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দিত এবং এই সব মেয়ে বিবাহযোগ্য হলে তাদের বিক্রি করে ধার দেওয়া টাকা উসুল করে নিত। গরু এবং কিছু পরিমাণ চালের বিনিময়ে মেয়েদের দাসী হিসাবে কেনা-বেচাও ছিল প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা।" সবমিলিয়ে এখানকার মহিলাদের জীবন ছিল এক কথায় দুর্বিসহ। এই দুর্বিসহ জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্খা এই সব মহিলাদের সংগঠিত হতে এবং আন্দোলনে সামিল হতে সাহায্য করেছিল। কমলাম্মা, আন্দোলনের এক প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী, তাঁর স্মৃতিচারণায় স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন যে দাস জীবনের কষ্ট, অপমান সহ্য করতে না পেরেই তারা কমিউনিষ্ট পার্টিতে এবং আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। "It was because we were to bear troubles like these that we came into the party. And it is this struggle that showed us a way"[৫] আন্দোলনের সাথে যুক্ত আরো একজন মহিলা দয়ানী প্রিয়ম্বদা তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন যে, যে গ্রামেই তারা যেতেন সেখানেই কৃষক রমণীরা স্বেচ্ছায় আন্দোলনে যোগদান করতে চাইতেন এবং তাদের মধ্যে এই ধরণের উপলব্ধি গড়ে উঠেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনে সামিল হলে তারা বঞ্চিত, শোষিত, মর্যাদাহীন জীবনের বিভীষিকা থেকে মুক্ত হবেন। "In those days whichever village we went to, the peasant women would say, 'we will come with you" eagerly... They probably felt that if they came to the party were men and women worked together

freely, their lives would change for the better.[৬] Peter Custers তাঁর women in the Tebhaga Uprising গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে তেলেঙ্গানা আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা এসেছিলেন প্রধানত নিজ নিজ অঞ্চলের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই।[৭] তাই তেলেঙ্গানা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক উদ্যোগকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে এই আন্দোলনে ব্যাপক হারে মহিলাদের অংশগ্রহণের পিছনে তাদের নিজেদের দুর্বিষহ জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতাও সমান কার্যকর ছিল।

তেলেঙ্গানা অঞ্চলে মহিলাদের কাছে আরো যে সমস্ত সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে ছিল কৃষিকাজে অসম মজুরি, অশিক্ষা এবং দারিদ্র্য। এই সম সমস্যাগুলি তুলে ধরা এবং সেগুলির প্রতিকারের জন্য উদ্যোগ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যেমন গ্রহণ করা হয়েছিল তেমনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল মহিলা সংগঠনগুলি। ১৯৪৩ সালে বিশাখাপত্তনম ও কাকিনাড়াতে জাপানি বোমা পড়ার পরে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার মোকাবিলা করার জন্য মহিলারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে গঠন করেছিল অন্ধ্র মহিলা সংঘম্।[৮] এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে অসহায় মেয়েদের নানাবিধ সাহায্য প্রদান করে এক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৪ সালে এই সংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় কুড়ি হাজার। অন্ধ্র মহিলা সংঘম্ এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি সংগঠন যেমন অন্ধ্র যুবতী মন্ডলী, নবজীবন মন্ডল প্রভৃতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালাকালে উদ্ভূত খাদ্যসমস্যা মোকাবিলা করার কাজে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এইসম কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার ফলে অন্ধ্রের মহিলারা যে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

বিভিন্ন সামাজিক, আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এই সব মহিলা তেলেঙ্গানা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জমি থেকে উৎপন্ন ফসল নিজেদের খামারে তোলার কাজে, সামন্তপ্রভুদের ভাড়াটে সৈন্য এবং পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ ও অত্যাচার প্রতিহত করার ক্ষেত্রে. মজুরি বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট, মিছিল বা সমাবেশে যোগদান করে এই সব মহিলারা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। কোন্দ্রাপল্লী, গোদাবরী অরণ্য অঞ্চল, পিন্ডিপ্রোলু, ইল্লেন্দু, প্রভৃতি স্থানের বিক্ষোভ সমাবেশে মহিলারাই ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়।[৯] বিভিন্ন স্থানে পুলিশের আক্রমণ প্রতিহত করতে, গ্রেপ্তার হওয়া নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করতে মহিলারা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। এমনকি আন্দোলনের নেতৃবর্গ যখন গেরিলা পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখনও মহিলারা ছিলেন আন্দোলনের সাথেই। গোদাবরী অরণ্য

অঞ্চলে কয়া বা কোইয়া উপজাতিভুক্ত নয়জন মহিলা গেরিলা বাহিনীর উপপ্রধান (ডেপুটি লীডার) হিসাবে এবং অন্যান্যরা নেতৃবৃন্দের কাছে খবর, অস্ত্রশস্ত্র আর খাবার পৌঁছে দেবার কাজে কিংবা গেরিলাবাহিনীর সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয় দানের কাজে যুক্ত ছিলেন। এইসব কাজে যুক্ত থাকার কারণে ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের চরম শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হত। এতসব নিগ্রহ সহ্য করেও মহিলারা যে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তার কারণ নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনের প্রতি তাদের দরদ, আন্দোলনের সাথে তাদের একাত্বতা।

কিন্তু এই ভালবাসা ও একাত্মতা সত্ত্বেও মহিলাদের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হয়নি। তাদের বিবেচনা করা হয়েচে অনেক সময় সমস্যা হিসাবে। পি. সুন্দরাইয়া উল্লেখ করেছেন যে বহু আগ্রহী ও উদ্যমী মহিলাকেও সংগঠনের কাজে যুক্ত করা যায়নি এই কারণে যে তাদের অধিকাংশই ছিলেন সন্তানের জননী।[৯] বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা শ্রী রাজেশ্বর রাও বলেছেন যে মহিলাদের ভূমিকা আন্দোলনে প্রশংসনীয় হলেও দলের পক্ষ থেকে তাদের আনার জন্য বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কারণ তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে সমস্যা ছিল।[১০] এই আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী প্রিয়ম্বদার মতে মহিলাদের সমস্যা মোকাবিলা করার প্রশ্নে দলের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাদের দলের সদস্য করা হলে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা মহিলাদের সদস্যপদ দেবার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন।[১১] অথচ মহিলারা এই আন্দোলনে সর্বতোভাবেই অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। সমাজের সকলস্তর থেকেই মহিলারা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ধনী জমিদার পরিবার, মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার, নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক- মজুর পরিবার, দেবদাসী, উপজাতি — সকল অংশের মহিলাদেরই প্রতিনিধিত্ব ছিল এই আন্দোলনে। এইসব মহিলাদের যোগদান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং কখনও কখনও দল ও পরিবারের উৎসাহ ছাড়াই। লাচাম্মা তাঁর স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন যে সঙ্ঘমে যোগদান করতে তাঁর স্বামীর ভয় ছিল কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অত্যাচার প্রতিহত করতে হলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরী।[১২] কিন্তু এই সচেতন, জাগরিত মহিলা সমাজকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল করতে তেলেঙ্গানা নেতৃবৃন্দ ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ এই আন্দোলনে নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করার জন্য যে ধরণের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন মহিলাদের দুরবস্থা দূর করার জন্য ঠিক ততটা সুসংবদ্ধ নীতি গ্রহণ করতে পারেননি। একথা সত্য যে দাসীপ্রথার অবসান, ধর্ষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থাদি গ্রহণ, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলারা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন যেমন শিশুর লালন-

পালন, দলীয় জীবনে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক প্রভৃতিকে বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের সমস্যা হিসাবে দেখার প্রবণতা এবং এই সব সমস্যাকে সামগ্রিক সমস্যার অংশ হিসাবে বিবেচনা না করার ফলে সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। এজন্যই মহিলাদের আগ্রহ ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের বৃহত্তর কাজে ব্যবহার করা যায়নি। এটি নিঃসন্দেহে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের অসম্পূর্ণতার একটি দিক। মহিলাদের আগ্রহ, যোগ্যতা, গ্রামে আন্দোলন সংগঠনে তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে নেতৃবৃন্দ ব্যর্থ হয়েছিলেন। তদানীন্তন সমাজ মহিলাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণের অসুবিধা, দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও তার কারণে আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশঙ্কা প্রভৃতিকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে আন্দোলনের স্বার্থেই মহিলাদের আরো বেশি হারে সামিল করার প্রশ্নে নেতৃবৃন্দের আরো বেশি যুক্তিবাদী ও আন্তরিক হওয়া উচিত ছিল।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে তেলেঙ্গানা আন্দোলন প্রধানত কৃষক আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত হলেও মহিলাদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এর অবদান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনে সামিল হয়ে মহিলারা লাভ করেছিলেন আত্মনির্ভরতা। পথে-ঘাটে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, পুরুষদের সাথে একযোগে বিভিন্ন কাজ করা, প্রকাশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করা, বক্তব্য তুলে ধরা তাদের পরিবারের সংকীর্ণ গন্ডি অতিক্রম করে সামাজিক জীবনে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিল। পরিবারের সংকীর্ণ পরিসর থেকে বৃহত্তর সামাজিক জীবনে প্রবেশ যে আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিল তা তৎকালীন মহিলাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি — একথা অস্বীকার করা যায় না।

সূত্রনির্দেশ

১। মালিনী ভট্টাচার্য, "মেয়েদের ইতিহাস' ও সাহিত্যের সাক্ষ্য" রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত) ভারত ইতিহাসে নারী, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ১১০

২। Shree shakti Sangthatana. 'We were Making History ... Life Stories of Women in the Telengane People's Struggle, Kali for women, New Delhi, 1989

৩। পি. সুন্দরাইয়া, তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২৫

৪। পি. সুন্দরাইয়া, তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি. কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৬৪ এবং We were Making History...."P-45

৫। "We were Making History..." P-47

৬। Ibid, P-72

৭। Peter Curters, Women in Tebhaga Uprising, Naya Prakash, Calcutta, 1987, PP-145, 146

৮। Renu Chakraborty. Communist Indian Women's Movement, 1940-50, People's Publishing House, New Delhi, PP-135. 136.

৯। পি. সুন্দরাইয়া, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০-৭১

১০। "We were Making History ...." P-17

১১। Ibid. P-263

১২। Ibid, P-16

মহিলাদের রাজনীতিকরণ : সমানাধিকার না সংরক্ষণ?

ইন্দ্রাণী লাহিড়ী

ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান ঠিক কি ছিল এই প্রশ্নটি বিভ্রান্তিমূলক। মধ্যবিত্ত মহিলাদের স্থান ছিল অন্তঃপুরে, উচ্চবিত্তদেরও তদ্রুপ, নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর স্থান বরাবরই এক রকম। মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও মহিলাদের রাজনীতিকরণ বিষয়টি ভারতীয় ধারণায় অনুপস্থিত ছিল।

ল্যাটিনের 'Politicus' শব্দটির অর্থ হল বেসামরিক জনগণ, যারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে গেলে নিজেদের রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। পুরুষশাসিত এই সমাজে নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব অর্জনের জন্য নারীদের এক দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এ্যান ওকলে বলেছেন—মহিলাদের নাগরিক অধিকার পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে এবং এই সংগ্রামে এখনও তারা পুরোপুরি জয়লাভ করতে পারে নি। কারণ পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের অবস্থান তাদের পারিবারিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল।[1]

[2] ভারতে নারীদের নির্দিষ্ট চাহিদাকেন্দ্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো 1917 তে। তবে 1917 তে কোন ভারতীয় মহিলা আইনসভায় ছিলেন না। 1937 সালে ভারতের আইনসভায় মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ৪0 জন। এই জাগরণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল Womens India Association, National Council of Women in India এবং All India Women's Conference নামক 3টি মহিলা সংস্থা। এগুলি 1917-27 মধ্যে গড়ে ওঠে। ক্রমশ দাবি উঠেছিল নারীদের ভোটাধিকারের। তবে এই পর্বে মোটামুটি অ্যানি বেশান্ত ও মার্গারেট কাজিন্সের নেতৃত্বে নারী মুক্তির প্রাথমিক পর্ব প্রস্তুত করার কাজ চলেছিল। যাকে কার্যে পরিণত করার সুযোগ আসে মন্টেগু ভারতে এলে।

সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে মন্টেগুর কাছে এক মহিলা প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন। তাদের আবেদনে বলা হয় মহিলাদের রাজনৈতিক মতামত থাকা বিশেষতঃ ভোটাধিকার থাকা প্রয়োজনীয়। কারণ ভারতের উন্নতির জন্য তাদেরও কিছু সুচিন্তিত মতামত আছে, তারা বলেন—নারী বুদ্ধি রাজনীতি, দেশগঠন, নৈতিকতা এক কথায় জাতি গঠনে সহায়ক হবে। কিন্তু তখনও ব্রিটিশ মহিলারাও ভোটাধিকার পান নি বলে মন্টেগু এ আবেদনে সাড়া দেন নি। বাংলায় কুমুদিনী বসু, কামিনী রায়, মৃণালিনী সেন, জ্যোতির্ময়ী

গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে বঙ্গীয় নারীসমাজ মহিলা ভোটাধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে এবং রামানন্দ চ্যাটার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং বিপিন পালের মত নেতার কাছ থেকে সমর্থন লাভেরও চেষ্টা করে। 1921 সালে বঙ্গীয় আইনসভায় আনীত নারীদের ভোটের অনুমোদন দানের প্রস্তাবটি এক লজ্জাকর পরাজয়ে বিধ্বস্ত হয়। অপ্রত্যাশিত পরাজয় সত্ত্বেও মহিলারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যান। 1923 সালে পৌর নির্বাচনে মহিলারা ভোটাধিকার অর্জন করে। 1925 সালে বঙ্গীয় আইনসভা মহিলাদের ভোটদানকে অনুমোদন করে এবং 1926 সালে সর্বপ্রথম বাংলার নারী এই অধিকার প্রয়োগ করে। এর মাধ্যমে সর্বজনীন পুরুষশাসিত সমাজে প্রবেশলাভের দৃঢ় অধিকার পায়। 1926 এর নির্বাচনে দুজন মহিলা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ও হ্যানেন অ্যাঞ্জেলো ভোটে দাঁড়ান। কিন্তু এরা দুজনেই পরাজিত হন। তবে সরকার এই সময় মুথুলক্ষ্মী রেড্ডীকে মাদ্রাজ আইনসভার সদস্যা হিসাবে মনোনীত করেন। 1927 সালে আইনসভায় মহিলা সদস্য ছিলেন 5 জন, 32 জন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর এবং 32 জন সাম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাবান হয়েছেন এবং এই সময় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা, শিশুসুরক্ষা সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রচার ও কার্যকলাপ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। বিশের দশকের শেষদিকে মেয়েরা আরো বেশি রাজনীতিতে থাকে। ফলে 1917-23 মধ্যে দুবার কংগ্রেস সভাপতি হন মহিলারা সরোজিনী নাইডু 1932 সালে AIWC দশ বছরের জন্য প্রাদেশিক সভায় 25% আসন সংরক্ষণের কথাও বলা হয়। কিন্তু যথোপযোগ্য সংস্কার সাধিত হয় নি। 1929 সালে পুরুষ ভোটার যেখানে ছিল 14% সেখানে মহিলা ভোটার ছিল 0.5%। ফোবসের মতে—নারীরা নিজেদের অধিকার দাবি করলেও তারা প্রাথমিকভাবে মেয়েলি কাজগুলিকেই তুলে ধরেন।

আজও শুধু ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বেই বিপুল সংখ্যক মহিলা সক্রিয় রাজনীতিতে আসার তেমন সুযোগ পান না। এর সঠিক কারণ বোঝা দুষ্কর। মহিলা এবং পুরুষদের ভোটাধিকার এবং উচ্চপর্যায়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। 1974 সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে 3% মহিলা, U.S.A. রাজ্যসভায় মহিলা প্রতিনিধি ছিল 5%। এইসব তথ্য উল্লেখ করে ওক্‌লে দেখিয়েছেন—রাজনীতির নিম্নস্তরে মহিলাদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও মহিলারা 'top political decision-making organs' এ অনুপস্থিত ছিল। U.S.A. 1974 সালে রাজ্যসভায় কেবলমাত্র 5% মহিলা প্রতিনিধি ছিল, ফ্রান্সের জাতীয় সভায় ছিল 2%। 1975 সালে সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যপদে 35% ছিল মহিলা, যেখানে পলিটব্যুরোয় মহিলাদের উপস্থিতির হার ছিল 0%। ভারতে 1998 সালের নির্বাচনে দেখা যায় জেলা পরিষদে—716 জন নির্বাচিত প্রার্থীর মধ্যে 243 জন মহিলা, পঞ্চায়েত সমিতিতে 8516 জনের মধ্যে 2915 জন

মহিলা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে—49225 জনের মধ্যে। 17557 জন মহিলা। সেখানে লোকসভায় 543 জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে 44 জন মহিলা [শূন্য আসন—2, পুরুষ—449, মহিলা—44, মোট—545] [4]

ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে যাঁরা এসেছেন তাদের ক্ষেত্রে natural ledership আজোও প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ শ্রেণীর বাইরে নেতৃত্ব সেভাবে ছড়ায়নি। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কোন নারী স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয় নি। প্রথাগত মতে ''insufficient masculinization'' মেয়েদের রাজনৈতিক মঞ্চে পিছিয়ে পড়ার জন্য দায়ি। Jane Jacquette বলেছেন—মহিলারা যদি আরোও বেশি পুরুষদের মত হয়, যদি রাজনীতিতে অংশ নেবার বিষয়ে তারা পুরুষদের নিয়মকানুন মেনে চলে তবেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। আর এই নিয়ম মেনেই এখানকার মহিলা নেতৃত্ব চলছেন। ব্যতিক্রমও আছে—রাজনৈতিক দলে মহিলাদের উচ্চপদ প্রাপ্তি না হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান বৃন্দা কারাত। তিনি বলেন সংরক্ষণ না হলেও রাজনৈতিক দলগুলি $^1/_3$ অংশ আসনে মহিলা প্রতিনিধি দিতে পারে। [5]

ভোটাধিকার অর্জন করতে মহিলাদের যেখানে দীর্ঘ আন্দোলন করতে হয়েছে সেখানে দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থায় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে মহিলারা অবহেলিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। পার্লামেন্টে মহিলা সদস্যদের সংখ্যা শিল্পোন্নত দেশগুলিতে 12%, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 10%। মন্ত্রীদের মধ্যে মহিলারা গড়ে মাত্র 6%। লোকসভায় মহিলা প্রতিনিধি আছেন 6.7%। গ্রাম পঞ্চায়েতে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য কিছু রাজ্য মহিলাদের জন্য $^1/_3$ অংশ আসন সংরক্ষণ করেছে। পার্লামেন্ট, মন্ত্রিপরিষদ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র মহিলা প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা অনেক কম। 1990 সালে তাই রাষ্ট্রসংঘ সুপারিশ করেছে—জাতীয় স্তরে নীতি নির্ধারক সংস্থায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অন্তত 30% হতে হবে। পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে এই হার অর্জন করেছে মাত্র 4টি দেশ।[6]

মহিলা সংগঠনগুলির নিরন্তর দাবির ভিত্তিতে 1922 সালে 73 ও 74 তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের জন্য $^1/_3$ অংশ আসন সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে যে সমস্ত রাজ্যে এর প্রভাব কার্যকর হয়েছে সেগুলি হল কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ। এর ফলে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে নির্বাচিত মহিলারা সাফল্যের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। [7]

UNDP (ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কর্তৃত্বের প্রশ্নে পুরুষ ও মহিলাদের তুলনামূলক অবস্থান পরিমাপের জন্য যে

মাপকাঠি উদ্ভাবন করেছে তাহল জেণ্ডার এম্পাওয়ারমেন্ট মেজার (GEM) এর মাধ্যমে পার্লামেন্ট, উচ্চ প্রশাসনিক পদে এবং মন্ত্রিত্বে মহিলাদের উপস্থিতির হারে দেখা যায় 0.6% এর বেশি মাত্র 9 টি দেশে (কিউবা, চিলি)। কুয়েত, সংযুক্ত আমিরশাহি সহ বেশ কিছু দেশে কোন মহিলা মন্ত্রী নেই। 55 টি দেশের রাজনৈতিক জগৎ মূলত পুরুষশাসিত। উচ্চ প্রশাসনিক পদে মহিলাদের উপস্থিতি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডাসহ কয়েকটি দেশে 40% মত হলেও উন্নয়নশীল দেশ—ভারত, ব্রাজিল তা 10% নয়। ফ্রান্স, জাপান, স্পেন প্রভৃতি দেশেও এক অবস্থা।[৫]

পরিশেষে বলা যায় দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নারীদের রাজনীতিকরণ হয়েছে। তারা ভোটাধিকার পেয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বিপ্লব বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মত চরম সংকটের মুহূর্তে শ্রেণী নির্বিশেষে নারী, পুরুষ এক হয়ে লড়েছেন কিন্তু তারপরই আবার নারীর প্রতি বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে। রাজনৈতিক সমতা, আর্থিক স্বনির্ভরতা, সমাজ বদল এগুলো একত্রে বা এককভাবে নারী বৈষম্যের সংস্কৃতিকে বদলাতে পারছে না। তাই প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণ দরকার। কারণ বর্তমান রাজনীতি বড় বেশি বোমা বন্দুক নির্ভর। এই রাজনীতি জগতে মেয়েদের অবস্থান তাকে এই হিংস্র পেশীবহুল পথেই অভ্যস্ত হতে শেখায়। যেখানে তার নারীসত্তা অবদমিত হয় পেশীর বাহুল্যে। এ কারণেই নারীকে তার স্বরূপে রাজনীতিতে পেতে গেলে দিতে হবে সংরক্ষণ।

সূত্র-নির্দেশ

১। Ann Oakley - Subject Women (Chapter - Politics in a man's World)

The New Cambridge History of India

২। Women in Modern India - Geraldine Forbes [Cambridge University Press - 1998]

৩। শাশ্বতী ঘোষ—সমতার দিকে আন্দোলনে নারী - প্রথম পর্ব

[প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স - 1999]

৪। ভারত ইতিহাসে নারী—(পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ) এর বই। প্রবন্ধ—ভারতী রায়—স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ

[কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি 1989]

৫। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট—1996 সংস্করণ। [Oxford]

৬। India Votes - M. S. Rana | B R. Publishing Company, Delhi |

৭। ভোটাধিকার থেকে আসন সংরক্ষণ : ভারতীয় মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস—রাজশ্রী দেবনাথ

| ইতিহাস অনুসন্ধান—15 | | ফার্মা. কে. এল. এম—2001]

(1) Ann Oakley - Subject Women (Chapter - Politics in a man's World)

(2) Geraldine Forbes - Women in Modern India [Page - 70-79]

(3) Ann Oakley - Subject Women ["]

(4) M. S. Rana - India Votes

(5) Ann Oakley - Subject Women | Page - 300-302]

(6) হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট—1996 সংস্করণ

(7) ভোটাধিকার থেকে আসন সংরক্ষণ . ভারতীয় মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস—| ইতিহাস অনুসন্ধান—15 | রাজশ্রী দেবনাথ

(৪) হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট—1996 সংস্করণ

মনোরমা বসু—একজন সাচ্চা কমিউনিষ্ট

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

"মেঘ ক্ষণিকের—চিরদিবসের সূর্য"। মাসীমার (মনোরমা বসু) কর্মময় জীবন এই সত্যটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। এই সত্যটি বহু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাঁর এই আদর্শনিষ্ঠ কর্মসত্তাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বহু দুর্যোগের মধ্যেও তাকে ভেঙ্গে পড়তে দেয়নি। তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে কত সহকর্মী এসেছে কত বা চলে গেছে। ভাঙ্গা হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাই যখন চুপ, তখন একাই তাঁকে চলতে হয়েছে। কিন্তু কোন বাধা কোন দুর্যোগ তাঁর চলাকে আটকে রাখতে পারেনি। ... ছোটখাটো অতি সাধারণ চেহারার এই স্বল্প শিক্ষিত মানুষটি প্রবল আত্মবিশ্বাসের দীপ্ত আভায় উজ্জ্বল শিখায় জ্বলছে।[১]

শুধু বরিশাল কেন, বাংলাদেশের মাসীমা—৭৪ বছরের বৃদ্ধা মনোরমা বসুকে আমি প্রথম দেখি ১৯৭১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের লড়াই শুরু হয়েছে— সে এক রক্তক্ষয়ী বীভৎস লড়াই—আর এই রক্তের মধ্যেই এক নবজাতকের আগমন ধ্বনিত হয়েছে— বাংলাদেশ। মাসীমাকে প্রায় জোর করেই কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল যদিও তার ছেলে মেয়ে সবাই এদেশে।

কথা বলতে বলতে মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এখনও এত কাজ করেন কি করে? মাসীমা হেসে বলেছিলেন 'কাজ করি বলেই তো এত বছর বেঁচে আছি। সেকি আজ! সেই কবে ১৯০৫ সালে ৮ বছর বয়সে হাতে হলদে সুতোর রাখি বেঁধে কাজে নেমেছিলাম দেশকে ভালবেসে, আজও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে নেমেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা না দেখে আমি মরবো না"।[২]

বাংলাদেশ হবার পরই মাসীমা ফিরে গেলেন তার নিজের দেশ, নিজের মানুষের কাছে—বরিশালে। সেখানে গিয়ে ২২ মে ১৯৭২ একটা চিঠিতে লেখেন "বরিশাল জিলা মহিলা পরিষদে ২৫০০ সাধারণ সভ্যা হয়েছে। এরা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্বামী পুত্রের তো মৃত্যুর কাহিনী আছেই—তা সত্ত্বেও কেউ লুটে সর্বহারা, পোড়ানোর কাহিনী ইত্যাদি দুঃখের বোঝা কেমন করে লাঘব করবো—তাইতো দিন রাত কাজ আর কাজ। ... বরিশালের সর্বহারা মেয়েদের আমি তিনটি ভাগে কাজ দেব বলে এসেছি। ১টি সেলাই, ২য়টি বাঁশ ও বেতের কাজ আর তৃতীয়টি তাঁত ও ঢেকি। ওরা তো রোজ ৭/৮ ঘন্টা কাজ করে খেয়ে থাকতে চায়।[৩]

বিদেশী জিনিষ বয়কট এই আন্দোলনেই মাসীমার রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি। বঙ্গভঙ্গের ব্রিটিশ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে মেয়েরা ঘরে ফিরেছে। কিন্তু শুধু হাতে নয়— এই প্রথম নারী জীবনে তারা আত্মবিশ্বাস ও সাহস ফিরে পেলেন। জানলেন তারা শুধু গৃহবধূ নন—সংগ্রামেও সৈনিক।

মনোরমা বসু মূলত রাজনৈতিক কর্মী দেশের পরিস্থিতি তাকে রাজনৈতিক কর্মীতে রূপান্তরিত করেছে। ১৮৯৭-এ বরিশালের নরোত্তমপুর গ্রামে তার জন্ম। সাধারণ বাড়ির সাধারণ পরিবেশে বড় হয়েছে। লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ নেই। ৮/১০ বছর হলেই আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মত বিয়ে ঘরসংসার, ছেলে মেয়ে মানুষ করা।

আশ্চর্য মানুষ এই মাসীমা। কত রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেছে তার জীবনের উপর দিয়ে, কত অভিজ্ঞতার ঠাস বুনুনীতে ভরা তার মন। ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হল বাঁকাই গ্রামের জমিদার বাড়িতে।

তখন সারা দেশ জুড়ে স্বদেশীর হাওয়া। মানুষ সভা সমিতি করছে মিছিল করছে— "আমার মনেও তোলপাড়। নাম শুনলাম গান্ধীজির—মস্ত বড় নেতা। তিনি নাকি মানুষকে এমনকি মেয়েদেরও রাস্তায় নামিয়েছেন। আমাদের গ্রামেও মিছিল এল। "চরকা ধর খদ্দর পর" ধ্বনি দিতে দিতে মানুষ এগিয়ে চলল।

মনে হল মেয়েদের নিয়ে আমরাও তো সমিতি করতে পারি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল স্বদেশী করতে মেয়ে বউরা আসবে কি? আমরা রামকৃষ্ণ দেবের উৎসব শুরু করলাম। এখানে আমরা মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ, চরকা চালানো—অর্থাৎ স্বাবলম্বী হওয়া—এই সব আলোচনা করতাম।"[৪] মেয়েদের মধ্যে সাহস এল।

একদিন মনোরমা এক দুঃসাহসিক কাজ করে ফেললেন। জমিদার বাড়ির বউরা কোথায়ও যেতে হলে পাল্কিতে যেতেন। কোন এক আত্মীয় বাড়ি যাবার জন্য পাল্কি এলে তিনি বেঁকে বসলেন। "আমি আর পাল্কিতে চড়বো না। পাল্কি বেহারাদের কাঁদে চেপে কোথাও যাবো না। ওরাও মানুষ।" আশ্চর্য, পরিপূর্ণ সহায়তা পেলেন স্বামী চিন্তাহরণ বসুর কাছ থেকে। মনোরমার পাল্কি চড়া বন্ধ হল সেই সঙ্গে গ্রামের বউরাও অনেকে পাল্কি চড়া বন্ধ করল।

১৯২৪ সাল। বরিশাল শহরে গান্ধীজি এসেছেন। গ্রাম থেকে বড় নৌকা করে অনেকের সঙ্গে মনোরমাও এলেন গান্ধীজিকে দেখতে। সেদিনই মনে মনে ঠিক করলেন কংগ্রেসে যোগ দেবেন। চলে এলেন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে বরিশাল শহরে।

যোগ দিলেন কংগ্রেসে। কয়কেজন মহিলাকে নিয়ে গড়ে তুললেন মহিলা সমিতি। সারাদিন কাজ, যেন এক নেশায় পেয়ে বসল মনোরমাকে। সকাল ৮ টার মধ্যে বাড়ির রান্না বান্না সেরে বেরিয়ে যেতেন। চাঁদা তোলা, মুষ্টিভিক্ষা, মিছিল করা, ভলান্টিয়ারদের খাওয়ানো—কাজের যেন শেষ নেই। বাড়ি ফিরতেন রাত ১১টা ১২টায়।

১৯০৮ এ ক্ষুদিরামের ফাঁসির কথা শুনে ১১ বছরের মনোরমার মন কেঁদে উঠেছিল—ইংরেজের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও দীনেশ দাশগুপ্তর ফাঁসির হুকুম হলে তার বিরুদ্ধে আপিল ও মিছিল করার দায়িত্ব নিলেন মনোরমা বসু। হিতৈষী প্রেসে ইস্তাহার ছাপতে দিয়ে এলেন। রাতে ছাপা হয়ে গেল। পরদিন সকালে মনোরমা তার মেয়ে এবং সমিতির মেয়েদের নিয়ে প্রভাত ফেরি করে টাকা তুললেন। ৫০ টাকা তুলে জমা দিয়ে এলেন কংগ্রেস অফিসে। বিকেলে রোজই বেরোতেন বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে যেতেন মদ, গাঁজা, আফিংয়ের দোকানে পিকেটিং করতে। কংগ্রেস ডাক দিয়েছে। পিকেটিং করে ৫ জন করে করে ৩৫ জন ছেলে গ্রেপ্তার বরণ করল। মাসীমার ৭ বছরের ছেলে দৌড়ে এসে খবর দিল "মা তাড়াতাড়ি এস, পুলিশ খুব মারছে।" মাসীমা কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে তক্ষুনি ভাটিখানার রাস্তায় গিয়ে দেখেন পুলিশ এলোপাথারিভাবে ছেলেমেয়েগুলোকে মারছে। মাসীমার নিজের বড় মেয়ে (১৬ বছর বয়স), ১১ বছরের ছেলেও আছে সেই মিছিলে। তারাও বেদম মার খাচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য কোন ছেলে মেয়ে পালাচ্ছে না। একেবারে বেপরোয়া চিৎকার করে শ্লোগান দিচ্ছে। মাসীমা "একবার টাউন হল যাচ্ছি একবার বাড়ি যাচ্ছি। বাড়িতে আহত মেয়ে আর টাউন হলে আহত ছেলেমেয়েরা। পরের দিন বেরোলাম এদের জন্য টাকা তুলতে। কত মানুষ যে কত কিছু দিল তার ইয়ত্তা নেই।"[৫]

শিক্ষিত ভদ্রলোক থেকে মুদিখানার সাধারণ লোক পর্যন্ত যে যা পারেন তাই দিয়ে সাহায্য করেছেন। দেশের মানুষই রাজনৈতিক আন্দোলনকে এইভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃস্থানীয়রা কয়েকদিনের মধ্যেই জেলে চলে গেলেন। কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে ২৬ শে জানুয়ারি সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

মাসীমাও বরিশালে পার্টি অফিসের ছাদে আরও অনেকের মত জাতীয় পতাকা তোলেন। সর্বত্র নেমে আসে দমন পীড়ন। কংগ্রেস বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। সভা, সমিতি, মিছিল করার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। মাসীমা এ সময় কংগ্রেসের ডিক্টেটর নির্বাচিত হলেন। গোপনে সভা করেন, মিছিলও করেন। ২রা ফেব্রুয়ারি এরকমই

একটা মিছিল আক্রান্ত হয়, পুলিশ ভলান্টিয়ারদের বেধড়ক মারধোর করে। পরদিন হরতাল। প্রচারে বেড়িয়েছেন মনোরমা, চারুবালা, সরলা রায় প্রমুখরা। পুলিশের বাধাকে উপেক্ষা করেও প্রচার চালালেন। এই প্রথম পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। বহরমপুর এবং বরিশাল জেলে মাসীমার দিন কাটে অন্যান্য মহিলা বন্দীদের সঙ্গে।

"দেখতে দেখতে জেলের দিন শেষ হলো। আর একদিন পরেই ছাড়া পাবো সেদিনই শুনলাম মাদারীপুরের বিপ্লবী কর্মী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ফাঁসি হবে ভোর ৫টায়। সারাটা দিন মনটা ছট্‌ ফট করতে লাগলো। আমরা মেয়েরা কেউ খেতে পারলাম না। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই, বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট, অথচ ছেলেটিকে কোনদিন দেখিনি, চিনিনা। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিকে সঠিক বলে মনে করিনা। তবুতো কত বিপ্লবীকে আমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছি। কতজনের প্রাণ বাঁচিয়েছি। এরা যে আমাদের ঘরের ছেলে। লড়ছে এরা শয়তান ইংরেজের বিরুদ্ধে।

ভোর হোল। চোখ দুটো টনটন করছে। বুকের নিঃশ্বাস দ্রুত ওঠানামা করছে। হঠাৎ কানে এল "বন্দেমাতরম," চিৎকার করে উঠলাম 'বন্দেমাতরম'। খুব আস্তে একটা গলা কানে এল। শুনলাম "মা ভগ্নীগণ আমার অসমাপ্ত কাজ রইল।" ইচ্ছে হল জেলের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলি। পাগলের মত আবার চিৎকার করে উঠলাম 'বন্দেমাতরম', আজও যখনই একথা মনে হয় আমার চোখ ভরে জল আসে।" [৮]

অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন—সব কিছুতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণের সাথে চলেছে মাসীমার নারী মুক্তি আন্দোলনের কাজ। জেল, জুলুম, নির্যাতনকে নিত্যসাথী করে এগিয়ে চলেছেন তিনি।' তার জীবনের একটা বড় অংশই তো কেটেছে বহরমপুর, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী জেলের মধ্যে, আর বছরের পর বছর পলাতক জীবনে।

১৯৩২-র গোড়ার দিকে মানুষের প্রতি বুকভরা ভালবাসা, প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় প্রত্যয়কে সম্বল করে বরিশাল শহরে তিনি গড়ে তুললেন একটি অপূর্ব প্রতিষ্ঠান——'মাতৃমন্দির'। ছোট, কিন্তু মহৎ আদর্শের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান। নিজের শেষ সম্বল গহনাটুকু বিক্রি করে প্রাথমিক কাজ শুরু করেন—বাচ্চা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল। পরে খরচ জুগিয়েছে দেশের বড় ছোট সব শ্রেণীর মানুষরাই। ঘরে ঘরে মুষ্টি ভিক্ষায় ঘট পেতে সেই চাল সংগ্রহ করে তা দিয়ে খরচ চালাতেন। এ যেন এক আশ্চর্য নিষ্ঠা। এই স্কুলে পড়তে আসতো নিম্নমধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানরা।'

একই সময় মাসীমা গরিব মেয়েদের জন্য নিজের বাড়ির বারান্দায় বিনা মাইনের স্কুল খুললেন। কেউ কি মেয়ে দিতে চান? ২৫/৩০ জন নিয়ে স্কুল শুরু করেন।

স্নেহলতা দাস রাজি হলেন স্কুলে দায়িত্ব নিতে। নিজের গহনা বেচে স্কুল বাড়ি তৈরি করলেন। বড় বড় মেয়েরা পড়তে আসা শুরু করল। মাসীমার ইচ্ছে পড়াশুনা করে এই মেয়েরাই আসবে দেশের কাজ করতে।

শুধু তাই নয় 'মাতৃমন্দিরে' গড়ে তুললেন, দুঃস্থা মহিলাদের জন্য কর্মশালা। সমাজের নিষ্ঠুর পীড়নে নিপীড়িতা ও সমাজ পরিত্যক্তা অনাথা মেয়েদের জন্য তিনি গড়ে তুললেন আশ্রম। তিনি রাজনৈতিক কর্মী, তিনি নির্যাতিত নিপীড়িত মেয়েদের মা। মাতৃমন্দিরের জন্য তিনি চাঁদার খাতা হাতে বাড়ি বাড়ি যেতেন গৃহিনীদের বোঝাতেন "অল্প বয়সে একটা ভুলের মাশুল দিতে দিতে মেয়েটার জীবনটা যাবে আর আমরা তাকে বাঁচাবো না?" মেয়েদের তিনি আটকে রাখেননি। ছিলনা কাঁটাতারের বেড়া, ছিলনা তালা চাবি—তবুতো কেউ চলে যায়নি।

বস্তিতে বস্তিতে ঘুরতেন—কার ওষুধ দরকার, কার পথ্য দরকার, কাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। মহামারি হলে মাসীমার ডাক পড়ত মুসলমান মেয়ে ও বাচ্চাদের টিকা দেবার জন্য। মুসলমান মেয়েদের মাসীমা ছাড়া কে টেনে বার করবে?'

এইসব জনহিতকর কাজ নিয়েই জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। কংগ্রেসের নেতারা সাধারণ মানুষের অভাব দারিদ্র্য, দুঃখ, ব্যথা, আশা আকাঙ্ক্ষাকে তত বেশি গুরুত্ব দিতে চায়না। তাবা মনে করেন স্বাধীনতা সংগ্রাম একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আগে স্বাধীনতার জন্য সমস্ত মানুষকে লড়াইয়ে সামিল করে স্বাধীনতা আসুক। তারপর মানুষের কথা ভাবা যাবে। তারা ভাবেন স্বাধীনতার জন্য লড়াই একটা মহৎ স্বার্থত্যাগের লড়াই, তার মধ্যে মানুষের প্রতি দরদ, ভালবাসা, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া আসবে কেন? ওটা পরের লড়াই। মাসীমা একথাটা মানতেই রাজি নন। তার কাছে দুটো লড়াই শুধু সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, সমন্বিতও বটে। মাসীমার মনে প্রবল অস্থিরতা।

মনোরমা বসু জমিদারি চালচলনে একেবারেই বেমানান। এতে সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেয়েছেন স্বামীর কাছ থেকে। নায়েব গোমস্তাদের কৃষকের উপর জোর জুলুম অত্যাচার অসহ্য মনে হত। কৃষক পরিবারের দুঃখ কষ্ট তাকে আঘাত করত। আরও মনে হত 'এতদিন রাজনীতি করছি এদের দুঃখের তো কোন সমাধান পেলাম না'। এই সময় 'মাতৃমন্দিরে' নিয়মিত আসতেন অমৃত নাগ, নলিনী দাস, মুকুল সেন। এদের সঙ্গে নানান কথা হোত, রুশ বিপ্লব, সমাজতন্ত্র—একটা ভাসা ভাসা ধারণা তখনই আমার হয়েছে। ওদের কাছে শুনতাম কমিউনিষ্টদের কাজকর্ম ও আদর্শের কথা। শুনতে শুনতে মনে হত এই বোধ হয় পথ। এক বছর দুবছরে নয়, বই পড়েও নয়। নিজের কর্মজীবনের

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কবে যেন আমি কমিউনিষ্ট হয়ে গেলাম। শুধু পতাকা বদল নয়, আমার জীবন ও কাজকর্ম যেন জড়তা কাটিয়ে সঠিক পথ খুঁজে পেল।" [৯]

জনগণের প্রতি ভালাবাসা ও মমত্ববোধ এবং সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা প্রকাশ ক্রমশ মাসীমাকে মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট করল। আত্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে জনতার মাসীমা জনতার মধ্যেই নতুন করে নিজের পরিচয় খুঁজে পেলেন। ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করে নতুন পরিচয়ে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে এসে দাড়ালেন। মাসীমার ভাষায় 'একদিন মুকুল সেনকে জিজ্ঞাসা করি আচ্ছা আমায় কেন কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী করে নাওনা? সে বলে কিনা, আমি তো আজীবন পার্টির সর্বক্ষণেরই কর্মী।' সত্যিই তাই আমৃত্যু তিনি একজন সৎ, নিষ্ঠাবান কমিউনিষ্ট কর্মী ছিলেন।

১৯৪৩ সাল। একদিকে জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা আতঙ্কিত, অন্যদিকে এল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। কলকাতায় ও আরও অনেক জায়গায় গড়ে উঠল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। বরিশালেও গড়ে উঠল আত্মরক্ষা সমিতি। মনোরমা বসু হলেন সম্পাদিকা। একই সময় বরিশালে গড়ে উঠল সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ও মহিলা সংগঠন। সুহৃদ সমিতির সহ-সভানেত্রী ছিলেন মনোরমা বসু। তখন মহিলা সংগঠনে কাজ করতেন মণিকুন্তলা সেন, বীণা দাস, বিভা দাশগুপ্ত প্রমুখরা।

মহিলা সংঘের বরিশাল জেলা ও প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন হেমপ্রভা মজুমদার, সোফিয়া খাতুন ও হাজরা বেগম। সম্মেলনে হাতের কাজ, সেলাই ইত্যাদির এক প্রদর্শনী হয়। এতে মেয়েদের মধ্যে একটা সাড়া জাগল। আত্মরক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধানে মাসীমারা গড়ে তুললেন নারী কল্যাণ ভবন ১৯৪৪-এ। সেক্রেটারী হলেন স্নেহলতা দাস। ৫০ জন মহিলা এবং বেশ কিছু বাচ্চা ছেলে মেয়েদের নিয়ে কল্যাণ ভবন দাঁড়িয়ে যায়। এদের জন্য তাঁত, ঢেঁকি, বাঁশ, সুতো এনে দেওয়া হল। মেয়েরা খাবার তৈরি করে স্থানীয় স্কুলে টিফিন দিতে লাগল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সেদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মেয়েদের শুধু খাবার দেওয়া নয়, পায়ের উপর দাঁড়াতে সাহায্য করার ব্রত নিয়ে কাজে নামল। এদের জন্য স্কুল খোলা হল।

গ্রামাঞ্চলে যে সব নির্যাতিত নিপীড়িত যুবতি মেয়েরা সংসারে কিছু অতি লোভী মানুষের শিকার হোতো, সমাজ যাদের পরিত্যক্ত বিবেচনা করে বাইরে ছুড়ে ফেলতে দ্বিধা করত না, সেই সব অসহায় মেয়েদের বুকে তুলে এনে মাসীমা তার গড়া মাতৃমন্দিরে সেদিন আশ্রয় দিলেন। এইভাবে তিনি অপঘাতে নারীর মৃত্যু ও অযাচিত শিশু মৃত্যুকে রোধ করে ঐ সমাজ পরিত্যক্তা মায়েদের মুখে হাসি ফুটিয়ে ছিলেন। সব সময় মাসীমার

সজাগ দৃষ্টি ছিল ওদের প্রতি যেন কোন অবহেলা বা অসম্মান দেখানো না হয়। নতুন করে যেন আর আঘাত না পায়। অতুলনীয় দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের সমন্বয়। এমন না হলে সার্থক রাজনীতি করা যায় না। "এমন মাসীমার ডাক অগ্রাহ্য করা যায়না। ১৯৪৩ সনের মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের সময় তার ডাকেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত ছিন্নভিন্ন মধ্যবিত্ত পরিবার যারা চিকিৎসার জন্য বাইরে বেরোতেন না তাদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসার দায়িত্ব আমি নিয়েছি—আর এভাবেই আমি কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি।"[১০]

বরিশালে আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে এসে অনেকগুলো লঙ্গরখানা পরিচালনার দায়িত্বও নেন মাসীমা। "ঠিক হল মাসীমার বাড়িতেও একটি খিচুড়ি ক্যান্টিন খোলা হবে। আমরা গেলাম ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে। ৩০০ মেয়ের খাবার ব্যবস্থা করবো। ম্যাজিষ্ট্রেট ১০০ টাকা দিলেন। এতে কি হবে? আমরা প্রাণপনে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকি। একদিন এক ব্যবসায়ী বলে বসলেন "আপনারা হিন্দু মুসলমান মেয়েদের একসঙ্গে খাওয়াচ্ছেন এখানে চাঁদা দেবো না। মাটির মানুষ মাসীমাকে জ্বলে উঠতে দেখলাম। "কি বললেন আপনি? জানেন এ জেলায় শতকরা ৮০ জন মুসলমান। ক্ষুধার্ত মানুষের সেবায় হিন্দু মুসলমান প্রভেদ করতে বলেন? চাই না সাহায্য। দিলেও নেবোনা। বেরিয়ে এলেন মাসীমা।[১১] মণিকুন্তলা সেন বলছেন বরিশালের মহিলা সংগঠন ও আন্দোলনের কথা বলাই হয়না যদি সেখানকার নেত্রী মনোরমা বসু সম্পর্কে কিছু কথা না বলি।

মাসীমা হিন্দু ঘরের বিধবা হয়েও সংস্কার মুক্ত জীবন যাপন করতেন। হিন্দু-মুসলমান সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে কোন কুসংস্কার তার ছিল না। তাই মাসীমার নিজের সংসার এবং 'মাতৃমন্দির' এক হয়ে গেল। অনেক শুভানুধ্যায়ী মাসীমাকে পরামর্শ দিয়েছেন যে "জাত বেজাতের মেয়ে ও অজ্ঞাতকুলশীল বাচ্চাদের সঙ্গে একত্র না করে মাসীমার সংসারটা পৃথক থাকা বাঞ্ছনীয়। মাসীমা তাদের কথা মন দিয়ে শুনেছেন—ভেবেচিন্তে জবাব দিয়েছেন যে সরকার কিংবা দানশীল ব্যক্তিরা অনাথ আশ্রম খোলে, কিন্তু 'মাতৃমন্দির' সে জাতের হতে পারেনা। আশ্রয়দাত্রী মাসীমা ও আশ্রিতা মেয়েদের মধ্যে যে সহজ, স্বাভাবিক, সাবলীল ও সমানাধিকারের সম্পর্ক ছিল 'মাতৃমন্দির' যারা দেখেননি তারা তা বুঝতে পারবেন না। মাসীমা তাদের আশ্রয় দিয়েছেন সে হল আরম্ভের কথা ; প্রকৃতপক্ষে, তিনি যা দিয়েছেন তা হল আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মসচেতনতা, এখানেই মাসীমার কমিউনিজমে উত্তরণ।[১২]

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এল। জন্ম হল দুটি রাষ্ট্রের—ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান প্রথম থেকেই একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিল। মাসীমা বললেন "কি রকম

দিশাহারা হয়ে পড়লাম এর নাম স্বাধীনতা? দলে দলে হিন্দুরা চলে যেতে লাগল ভারতবর্ষে, আর মুসলমানরা আশ্রয় নিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে। এমনটা হবারতো কথা ছিল না।' [১৩]

মাসীমা দেশ ছাড়লেন না। মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির মাসীমা রয়ে গেলেন তার মাতৃমন্দিরে। ১৯৪৭-এ কলকাতায় পার্টি মিটিংয়ে ঠিক হল আঞ্চলিক কমিটি গঠন করে স্থানীয় কমরেডদের সেখানেই কাজ করতে হবে। কাজ করতে অনেক সমস্যা, সমস্যার আগুনে পুড়ে পুড়ে মাসীমার সাহস, মনের জোর দুই বেড়েছে।

১৯৪৮ এ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন মাসীমা ও আরও কয়েকজন মিলে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এই সমিতিকে কাজ করতে দিলনা। তাছাড়া সমিতিটি গড়ে উঠেছিল বহু মধ্যবিত্ত হিন্দু মহিলা এবং কয়েকজন মুসলিম মহিলাদের নিয়ে। হিন্দুরা ভারতে চলে আসায় সমিতির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে।[১৪]

১৯৪৮ এ মাসীমার বড় মেয়ে বাসনা মারা যায়। অসীম ধৈর্য আর মনোবল মাসীমার। ঢাকা থেকে টেলিগ্রাম এলো মাসীমাকে কলকাতা থেকে ফিরে যেতে হবে ঢাকায় প্রাদেশিক সম্মেলনের দায়িত্ব নিতে। মাসীমা ফিরে এলেন।

এদিকে দেশের চরম দুর্দিন। জিনিষপত্রের দাম অগ্নিমূল্য—বিশেষ করে চালের দাম। মেয়েরা সমিতি অফিসে আসে সস্তা দরে চাল চাই দাবি নিয়ে। মেয়েদের সংগঠিত করে মিছিল করে মাসীমা বিভা দাশগুপ্ত প্রমুখরা কালেক্টরিতে ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে যান। ছাত্ররাও মিছিলে সামিল হয়। পুলিশ লাঠি চার্জ করে। মাসীমা ও আরও অনেকে গ্রেপ্তার হন। ৪ বছর কাটে প্রথমে বরিশাল ও পরে রাজশাহী জেলে। রাজশাহী জেলে মাসীমার সঙ্গে ছিলেন নলিনী দাস, ইলা মিত্র, ভানু চ্যাটার্জী, সুজাতা দাশগুপ্ত, অপর্ণা, অমিতা প্রমুখরা।

৪ বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেলেন। কিন্তু কাজ করবেন কিভাবে? কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী। ২/৪ জন শিক্ষিত লোক এলেও, বাকি মজুর আর মেয়েরা কেউই কমিউনিষ্ট পার্টিতে আসতে চায় না। মাসীমা কলকাতায় এলেন। এক বছর পর বরিশাল ফিরে এলেন। মাসীমার 'মাতৃমন্দির' ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা। মাসীমা অসহায় বোধ করেন। আর কি পারবেন মহিলা সমিতি গড়ে তুলতে। হিন্দু মেয়েরা একটু বয়স হলেই ভারতে চলে যাচ্ছে। মুসলমান মেয়েরা পর্দা ছেড়েছে, পড়াশুনা করে, এমনকি চাকরিও করছে—কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টিতে আসার ইচ্ছে, সাহস কোনটাই নেই। তবু মাসীমা নিরুৎসাহ হননা।

১৯৫২ তে ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৫৪ তে নির্বাচন ঘোষণা করা হল। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই জারি হল গভর্নর শাসন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল সমস্ত প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে।

শুরু হল মাসীমার পলাতক জীবন। লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করল গ্রামের সাধারণ মানুষ। চাষি মজুরের বাড়িতেই বেশিরভাগ দিন কেটেছে। চাষি বউরা গোয়াল ঘরে লুকিয়ে রেখে মাসীমাকে বাঁচিয়েছে। এই সময় মাসীমার নানান কথাবার্তা হয় গৃহস্ত বউ মেয়েদের সঙ্গে। মাসীমার কথা তাদের উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু সভা সমিতিতে যোগ দিতে ভয় পায়। মাসীমা তাদের বোঝান একা একা নয় সবাই মিলে একজোট হয়ে যদি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াই তাহলে ফল হতে পারে। মার্কসবাদী তত্ত্ব মাসীমার আয়ত্বে নেই—কিন্তু সহজ সরল ভাবে মানুষকে কাজের কথা মাসীমার মত খুব কম লোকই বোঝাতে পেরেছেন। মাসীমা এই সব মেয়েদের নিয়ে আর কিছু ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তোলেন মহিলা সমিতি। আবার তিনি গড়ে তোলেন তার মাতৃমন্দির। জাত পাত ধর্ম কোন কিছুই মাসীমার কাজের পথে অন্তরায় হয়নি।

১৯৭০'র বন্যায় সবাই মিলে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কমিউনিষ্ট অকমিউনিষ্ট সদস্যে তিনি কোন ভেদ করেননি বিপদে আপদে। মাসীমার ছেলে মেয়েরা ভারতে চলে এসেছে। কত বড় ঝঞ্ঝা কাটিয়ে অভ্রভেদী হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে সেই বরিশালেই কেটে গেল তাঁর অমূল্য জীবন। মাটির মানুষের সঙ্গে তার ছিল আত্মার আত্মীয়তা।

১৯৭১'র ২৫শে মার্চ। ঢাকার তাণ্ডবের দিন। মাসীমারা তৈরি হলেন লড়াইয়ের জন্য, হিন্দু মুসলমান একত্রে দলমত নির্বিশেষে। ১৮ এপ্রিল পাক সেনারা বরিশাল আক্রমণ করে। 'আসতে চাইনি আমার দেশ' আমার ছেলে মেয়েকে ছেড়ে। কিন্তু মুসলমান ছেলেরাই আমায় জোর করে পৌঁছে দিল ভারতবর্ষে ২০ জুন তারিখে। তখনই মাসীমার সঙ্গে দেখা করি। এরকম প্রত্যয়দৃঢ়, অথচ সরল সাধাসিধে স্বেচ্ছাসেবিকা ভারত বা বাংলাদেশ পাবে কি? কথা বলতে বলতে মাসীমা বললেন "শুনেছি ওরা আমার স্কুল ভেঙ্গে দিয়েছে। ইচ্ছে আছে আবার ফিরে গিয়ে স্কুল তৈরি করবো।" [১৫]

সূত্র-নির্দেশ

১। সত্যেন সেন : মনোরমা মাসীমা (ঢাকা ১৯৭০)

২। সাক্ষাৎকার : ৪.৯.১৯৭১ কলকাতা।

৩। চিঠিপত্র : মনোরমা বসু স্মারক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১১৬।

৪। সাক্ষাৎকার : ৪/৯/৭১

৫। সাক্ষাৎকার : ৪/৯/৭১

৬। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় : '*মনোরমা মাসীমা*' বিচিন্তা, ১৯৭১

৭। নিখিল সেন—পূর্ণ করিয়া জীবন পাত্র'—মনোরমা বসু স্মারক গ্রন্থ, ১৯৮৭

৮। মণিকুন্তলা সেন—সেদিনের কথা, কলকাতা।

৯। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়—'আত্মস্মৃতি কথা—মনোরমা বসু' মনোরমা বসু স্মারক গ্রন্থ।

১০। রেণুকা রায়—'বরিশালের মাসীমা'—স্মারক গ্রন্থ।

১১। মণিকুন্তলা সেন—সেদিনের কথা।

১২। জ্যোতি দাশগুপ্ত—'একটি বিরল চরিত্র' স্মারক গ্রন্থ।

১৩। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়—স্মারক গ্রন্থ।

১৪। নিবেদিতা নাগ—'উভয় বাংলার সংগ্রামী সাথীদের আপনজন', স্মারক গ্রন্থ।

১৫। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়—বিচিন্তা, ১৯৭১

নৃত্যের তালে তালে : বাংলার নগর সংস্কৃতিতে মহিলা শিল্পী

জাহানারা রায়চৌধুরী

আঠারো শতকের বাংলা—একদিকে পতনোন্মুখ নবাবি শাসন, অন্য দিকে বিদেশী বণিকের আনাগোনা। ক্রমে একদিন, 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে'—বাংলায় ইংরেজ শাসকের সূত্রপাত হল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভাগ্যান্বেষণের তাগিদে নতুন প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় নানা অঞ্চলের নানা পেশার মানুষ ভিড় করল। পেশা হিসাবে নৃত্যের সাথে যুক্ত ছিলেন যে মেয়েরা, তাঁরা নানা অঞ্চল থেকে এসে কলকাতার এই বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের অন্যতম অঙ্গ হয়ে ওঠেন।

একটি প্রচলিত ধারণা, বাঙালির নিজস্ব কোন নৃত্য ছিল না। কিন্তু নানা সূত্র থেকে বর্তমানে জানা গেছে বাঙালির নিজস্ব নৃত্যরীতিই শুধু ছিল না, মেয়েরাও তাতে পুরোমাত্রায় অংশ নিতেন।[১] দ্বাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গে শুধু উচ্চাঙ্গের গীত ও বাদ্যেরই প্রচলন ছিল তাই নয় ; নৃত্যাভিনয়েরও প্রচলন ছিল এবং মহিলারাই নৃত্যে অংশ নিতেন।[২] বাঙালি ঘরের বধূর নৃত্যগীতে পারদর্শিতার উল্লেখও বিরল নয়।[৩] অথচ ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ মানসিকতায় স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়, মেয়েদের নাচ-গান করা নিয়ে রক্ষণশীলতা। তাহলে, ঔপনিবেশিক বাংলার নাগরিক সংস্কৃতিতে অপরিহার্য হয়ে ওঠা নৃত্যাঙ্গনাদের পরিচয় কি? আঠারো-উনিশ শতকে যে সব বিদেশী চিত্রকর বাংলার নগর জীবনকে ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন, তাদের ছবির বড় অংশ জুড়ে আছেন এই নৃত্যাঙ্গনারা। নাগরিক সংস্কৃতি ছন্দময় হয়ে উঠতে পেরেছিল এঁদেরই নৃত্যের তালে তালে।

উনবিংশ শতাব্দীর উঁচুতলার বাঙালি সমাজে মেয়েদের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল অন্দরের ঘেরাটোপে। অথচ অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্র ধরে সমাজে নানা পরিবর্তনেরও সূচনা এই সময়েই লক্ষণীয়, বিরোধিতা থাকলেও একদিকে রক্ষণশীল এবং অন্যদিকে সংস্কারকামী পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি উভয়েরই ভাবনাচিন্তার প্রধান উপলক্ষ্য হয়ে ওঠেন মেয়েরাই। একদিকে যেমন মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে বাইরে নিয়ে আসাটা ভদ্রলোক বাঙালির সভ্যতার মাপকাঠি হয়ে ওঠে, অন্যদিকে রক্ষণশীলদের কাছে ঘরের মেয়ের অন্দরের চৌকাঠ অতিক্রম করা মানেই অনিয়ম, 'ছেনালিপনা'। তবে এই দুই বিপরীতমুখী চিন্তার মধ্যে টানাপোড়েন থাকলেও দুই পক্ষেরই মেয়েদের

আচার আচরণ সম্পর্কে ধারণায় পিতৃতান্ত্রিক একপেশেমি যথেষ্ট। সমাজের এই মনোভাবের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী—"মানুষ পৃথিবীতে একটা জাত। তাতে আবার দুভাগ—স্ত্রী ও পুরুষ। কিন্তু তাতে মানুষের সমস্যা মেটেনি, স্ত্রীজাতির মধ্যেও দাগ কেটে দুজন করেছে। একজন হল পুরুষের ঘর সংসারের গৃহিণী বা সন্তানের জননী সেবিকা, তার নামই হল সতী। আব অন্যজন হল তার প্রমোদ বিলাসের সঙ্গিনী, বহুবল্লভা, গৃহধর্মহীনা এক নিঃসঙ্গ নারী—তাকে অসতী বলা চলে"।[৮] প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণ রীতির বাইরে বলে বিবেচিত হলেই নারী 'অসতী' 'বেশ্যা'।[৫]

জনপ্রিয়তার নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, এই নৃত্যাঙ্গনারা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। একথা অন্তত উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নগর কলকাতায় প্রচলিত সবকটি নৃতশৈলী সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সদ্ব্যবহার করে হঠাৎ ধনী যে বাবুরা শহর কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির মাথা হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের আঙিনায় এদের যথেষ্ট চাহিদা ছিল।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বাইনাচের কথা। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই কলকাতার বিভিন্ন ধনী গৃহে বাইনাচের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করার মত। এর রসমোদীদের তালিকায় যেমন সেকালের একেবারে চিহ্নিত ধনী বিলাসী বাবুরা আছেন, তেমনই রয়েছেন পাশ্চাত্য শিক্ষিত, সংস্কারক বলে পরিচিত ধনী ভদ্রলোক বাঙালি। নিকি, আসরুম সহ বিখ্যাত বাইজিদের জন্য এঁরা বহু অর্থ ব্যয় করতেন।[৬] কলকাতার বাইনাচের আসরের বিখ্যাত বাইজিরা, মূলত এসেছিলো বাঙলার বাইরে থেকে। অবশ্য বাঙালি বাইজিও ছিলো। মোঘল শাসনের পড়ন্ত বেলায় আগ্রা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ এর নবাবি দরবারগুলি শ্রী হারানোর সাথে সাথে এদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল শিল্পীদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। ফলে অন্য অনেকের মতই এই বাইজিরা ভাগ্যান্বেষণে উপস্থিত হয় ইংরাজ শাসকের রাজধানী কলকাতায়। পুরোনো রাজদরবার না থাকলেও তারা বাঙলার নব্য ধনী জমিদার, বানিয়ান, দেওয়ান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।[৭] বাইজিদের নৃত্য কুশলতার পাশাপাশি তাঁদের শালীনতা বোধ নিয়েও বিদেশীদের প্রশংসা লক্ষণীয়।[৮] সমসাময়িক বাঙালির চোখেও বাইদের নাচ নিয়ে মুগ্ধতা। মনমোহন বসু সম্পাদিত মধ্যস্থ পত্রিকায় লেখা হয়—"এঁদের নৃত্য কৌশল, গীতির অনুযায়ী হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি, ভ্রুকুটি প্রভৃতি যথার্থ ভাবুক লোকে দেখিলে বিস্ময়োৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারেন না"।[৯]

কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নানা কারণেই অষ্টাদশ শতকের 'নেটিভ নচগার্ল' সম্পর্কিত বিমুগ্ধ ধারণা অনেকটাই নষ্ট হতে শুরু করে। এর একটা কারণ সেই

সময়ের কলকাতায় 'বেশ্যা সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি, জমিদার পরিবারগুলিতে অর্থের ঘাটতি এবং অবশ্যই শাসকের পরিবর্তিত মানসিকতা। এই সময় ইউরোপে ভিক্টোরিয় রক্ষণশীলতার প্রসার এদেশেও বিদেশী আমলা, কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তনের কারণ হয়ে ওঠে। এছাড়াও ছিল খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচার।

এদেশীয় সংস্কৃতিকে হেয় করার প্রচেষ্টা হিসাবে বলা হতে থাকে 'নেটিভ' মানেই নোংরা, অসুখগ্রস্ত ও অসাধু আর নেটিভ বেশ্যা মানেই একই সঙ্গে সব দোষের প্রতিমূর্তি।[১০] কাদের বেশ্যা বলা হবে তা নিয়ে এসময় সরকারি মহলে নানা আলোচনা ও সমীক্ষা করা হয়। সাতধরণের বারাঙ্গনা শ্রেণীর যে তালিকা তৈরি হয় তাতে চতুর্থ সারণীতে উল্লেখ আছে।[১১] এ প্রসঙ্গে রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, যে বাঙালি ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষরা একদিকে সাহেব প্রভুদের খুশি করতে চান, অন্যদিকে সামাজিক নেতার ভূমিকাও ত্যাগ করতে চান না তাদের রাগও গিয়ে পড়ে এই অরক্ষণীয়াদেরই ওপর।[১২] অন্যদিকে প্রাচীনপন্থীরা এই সমস্ত সামাজিক দোষের জন্য নারীশিক্ষা, তাদের গৃহের বাইরে আসার প্রচেষ্টাকে দায়ি করেন।[১৩] সমসাময়িক প্রহসনগুলিতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যঙ্গ দর্শন' প্রহসনটিতে স্পষ্টতঃ দেখানো হয়, স্ত্রী শিক্ষার পথ ধরে যে মেয়েরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে তারা যে যে বিষয়গুলি বেশি করে চর্চা করে তার মধ্যে প্রণয় প্রকরণ, নাটক উপন্যাস, পদ্য, পত্র রচনা, গুরুজন লাঞ্ছনা ছাড়াও সঙ্গীত ও 'নৃত্য প্রকরণ'।

ঔপনিবেশিক বাংলার নাগরিক সংস্কৃতিতে অবশ্য বাইজিরা ছাড়াও ছিল খেমটাওয়ালি, ঝুমুরওয়ালিরা। নগর কলকাতায় আখড়াই, হাফ আখড়াই, ঝুমুর, খেমটা ইত্যাদি যে শিল্প শৈলীগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যেগুলির আবির্ভাব ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় ভিড় করা নানা অঞ্চলের মানুষের সাথে আসা সাংস্কৃতিক উপাদানের মেলবন্ধনে। মহেন্দ্রলাল দত্ত ১৯২৯ এ তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, "বাংলার অপর জায়গায় এ প্রথা ছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু কলিকাতায় তখনকার দিনে ঝুমুরওয়ালি ছিল। তাহারা ছোট লোক, কেলে কেলে মাগি, তাহারা পায়ে ঝুমর দিয়া গাহিত। তখনকার দিনে বিবাহতে গরুর গাড়িতে কাগজের ময়ূরপঙ্খী করে তার উপর ঝুমুরওয়ালির নাচ দিত"।[১৪] অন্যদিকে জানা যায়, উনিশ শতকের মধ্যভাগে, যাত্রায় প্রথম খেমটা নাচের প্রচলন হয়। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই খেমটা ও বাইনাচকে এক করে দেখেছেন।[১৫] কিন্তু সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ বাইনাচের সাথে খেমটা, ঝুমুরের নৃত্যশিল্পীদের পার্থক্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল। কলকাতায় নতুন রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিজাত শিল্পচর্চা ও লোকসংস্কৃতির যে সহাবস্থান গড়ে উঠেছিল তাতে ফাটল ধরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই।[১৬] এর কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালির স্বতন্ত্র

সাংস্কৃতিক রুচি চিহ্নিত করার প্রয়াস। ফলে ভদ্রলোকের ঘরের কন্যার একমাত্র লক্ষ্য শিক্ষিত ভদ্রলোকের উপযুক্ত সহধর্মিনী হয়ে ওঠা।[১৭] তৈরি হয় গৃহকে কেন্দ্র করে করে আধ্যাত্মিক আদর্শের আর্কিটাইপ, গৃহিনী যার একমাত্র ধারিকা।[১৮] অন্যদিকে যে মেয়েরা স্বাধীনভাবে উপার্জন করতেন তাদের অবমূল্যায়ন করা হল। তাঁরা সবাই, যাদের মধ্যে অন্যতম মহিলা নৃত্যশিল্পীরা চিহ্নিত হলেন বেশ্যা হিসাবে। তবে তারই মধ্যেও শ্রেণী বৈষম্য ছিল বলে গবেষক দেখিয়েছেন।[১৯] বাইনাচের তুলনায় খেমটার ওপর কোপ পড়েছিল আরও আগে। তবে বৈষম্য অন্যদিক থেকেও ছিল। অভিজাত গৃহে নারী ও পুরুষের বিনোদনের ক্ষেত্রকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। পূর্ণিমা ঠাকুর তাঁর লেখায় জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে উৎসব অনুষ্ঠানের সময়, বারবাড়িতে যখন বাইনাচ চলত তখন অন্দরে নাচ দেখাতে আসত খেমটাওয়ালিরা।[২০] অবশ্য ব্রাহ্মরা বাইনাচেরও প্রবল বিরোধী ছিলেন। সাহনা দেবী তাঁর স্মৃতি কথায় তা জানিয়েছেন।[২১]

ঝুমুর, খেমটা বাঙালি ভদ্রলোকের অঙ্গন থেকে বিদায় নেয় ঠিকই। কিন্তু মেয়েদের নৃত্যচর্চার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন ঘটে ১৮৭৩ এ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণের ঘটনার মধ্যে। থিয়েটারের মঞ্চে ব্যালেট গার্ল হিসাবে নাচতে দেখা যায় মেয়েদের। এক দৃশ্য শেষ হওয়ার পর অন্য দৃশ্য শুরু হওয়ার মধ্যে যে সময়টা থাকতো অভিনেতাদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য, সেই সময়টাতে দর্শকের মনোরঞ্জন করতে সখীদের নৃত্য জুড়ে দেওয়া হত। সামাজিক ও পেশাগত প্রয়োজনেই এজন্য নিয়ে আসা হয়েছিল নৃত্যে পটিয়সী কন্যাদের, যারা অনেকই বারাঙ্গনা কন্যা। গিরিশ ও শিশির যুগের বেশ কিছু অভিনেত্রীই তাঁদের মঞ্চজীবন শুরু করেছিলেন সখীর দলে নেচে। তবে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটকের বদলে সামাজিক নাটকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সখীর দল ও তাদের নৃত্যের প্রয়োজন ফুরায়।[২২] রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের এহেন নৃত্যাভিনয়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন অনেকেই। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন — " এখনও প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে কলিকাতা শহরের ভদ্র পরিবারের যুবকবৃন্দ ঐ শ্রেণীর (দূষিত চরিত্র নারী) স্ত্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, আর দেশের অপরাপর বহু ভদ্রলোক গিয়া অর্থপ্রদান করিয়া উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।"[২৩]

বিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ারে বাঙালি ভদ্রমহিলাদের অবস্থাও পরিবর্তন হতে শুরু করে। ব্যাপক ক্ষেত্রে না হলেও ইতিমধ্যেই ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা অংশ নিয়েছেন অভিনয় ও গানে। তবে নাচের জগতে তখনও ভদ্র মেয়েরা আসতে শুরু করেন নি। এই ট্র্যাডিশন প্রথমে ভাঙেন রাধামাধব রায়ের কন্যা শ্রীমতী রেবা রায়। রবীন্দ্রনাথ এঁকেই তাঁর রক্তকরবীর 'নন্দিনী' করতে চেয়েছিলেন।[২৪] ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার সহপাঠীরা 'ঋতুচক্র'

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন যেখানে শেষ গানটি ছিল 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে'। এই গানের সাথেই রেবা হঠাৎই গানের দল থেকে বেরিয়ে এসে নাচ শুরু করেন। রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙ্গে ভদ্র ঘরের কন্যার নাচের জগতে পা রাখার এটাই শুরু। এর কিছুদিন পর জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উঠানে চিত্রা, নন্দিতা সুমিতা এই তিনকন্যা নাচেন 'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি' গানটির সঙ্গে।[২৫] শান্তিনিকেতনে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে আরও যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী ও ঠাকুরবাড়ীর বউ শ্রীমতী ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী শুধু নাচে অংশই নেন নি, রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে নৃত্যে রূপ দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই। রবীন্দ্রনৃত্যের প্রসারে যাঁর কথা না বললে এ তালিকা অসম্পূর্ণ থাকবে, তিনি রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। তিনি নিজে না নাচলেও, বিচিত্র নৃত্যভঙ্গি খাতায় ধরে রাখা, নতুন ভঙ্গিমা রচনায় তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, প্রতিমা নৃত্য নিয়ে যেমন লিখেছেন, তেমনই তাঁরই তাগিদে কবি বহু কাহিনীর নৃত্যনাট্য রূপ দিয়েছিলেন।

শুধু ঠাকুরবাড়ি নয়, নাচের জগতে পা রেখেছিলেন আরও কিছু ব্যতিক্রমী কন্যা। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম কেশবচন্দ্র সেনের নাতনী সাধনা সেন (বসু), নীলিমা সেনের নাম। পারিবারিক প্রেক্ষাপটের কারণেই সাধনা ছোটবেলা থেকেই পরিবারের সমর্থন পেয়েছেন। বিবাহের পরেও স্বামী মধু বসুর সক্রিয় সহায়তায় যোগ দিয়েছেন নাটকে, নৃত্যনাট্যে, সিনেমায়। গড়ে তুলেছেন ব্যালেগ্রুপ। সাধনা লিখেছেন—"ভদ্র পরিবারের মেয়েদের রঙ্গমঞ্চে অবতরণ তা সে পেশাদারিভাবেই হোক বা অপেশাদারি ভাবেই হোক — সে তো এককথায় ছিল যাকে বলে — 'স্ট্রিক্‌ট্‌লি প্রহিবিটেড'। এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের করে নিতে হয়েছে পথ, অজস্র ঝোপঝাড়, কাঁটা সরিয়ে নির্মাণ করতে হয়েছে চলার পথ"।[২৬] অবশ্য সাধনার স্মৃতিচারণে তেমন কোন রকম বাধার উল্লেখ নেই, বরং আছে সাফল্য, প্রশংসা ও সমর্থন পাওয়ার কথা। স্পষ্টতই তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষাপট এবং তার সহযোগীদের উচ্চ সামাজিক পরিচিতি এর অন্যতম কারণ (বোন নীলিমা ছাড়াও সাধনার সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন কোচবিহারের মহারাজকুমারীরা)। তবে সমস্ত ধনী অভিজাত গৃহেই যে মেয়েদের নাচে অংশগ্রহণ নিয়ে উদার মনোভাব ছিল এমন নয়। এ প্রসঙ্গে গায়িকা সাহানা দেবীর কথা বলা যায়। তিনি তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন এক বান্ধবীকে দেখে তিনি নাচ শিখতে আগ্রহী হয়েছিলেন। যদিও তাঁর এই আগ্রহ পূরণের ক্ষেত্রে তার মায়ের প্রবল আপত্তি ছিল।[২৭] বাধা থাকলেও অনেক মহিলার মনেই ছিল নৃত্য ছন্দে পা মেলানোর গোপন ইচ্ছা। ঠাকুরবাড়িতে প্রায়ই মেয়েদের নিজস্ব আসরে মেয়েরা নাচতেন, গাইতেন নাচের জন্য বেশভূষা, প্রসাধন রচনাতেও

তাঁরা অবহেলা করতেন না।[২৮]

তবে এক্ষেত্রে বাড়ির পুরুষদের সমর্থন তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার বিংশ শতকের বিশের দশকেও এহেন মনোভাব ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রম। ধনাঢ্য প্রগতিশীল পরিবারে অনেক কিছুই করা হয়েছে ট্র্যাডিশন ভেঙে। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে নৃত্যের তালে পা মেলানোর সুযোগ ও অভিজ্ঞতা চল্লিশের দশকের আগে হয় নি।

চল্লিশের দশক সব দিক দিয়েই এক তাৎপর্যপূর্ণ দশক ফ্যাসিবাদের জঙ্গি প্রকাশ সবার আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আসে প্রগতি আন্দোলনের চিন্তা যার একটি অংশ সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ১৯৪৩এ তৈরি হয় আই.পি.টি এ বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। আদর্শের তাগিদে এই আন্দোলনে যোগ দিলেন বহু মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তাগিদটা আদর্শের হলেও সংস্কৃতি চর্চায় মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের আত্মপ্রকাশের তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগ নিয়ে আসে এই পর্ব। আসেন রেবা রায়চৌধুরী, উষা দত্ত, সাধনা গুহর মত মধ্যবিত্ত কন্যারা যারা জনসমক্ষে মঞ্চে নাচ, গান, অভিনয়ে অংশ নিয়ে ভেঙ্গে দেন রক্ষণশীলতার আগল। বিশেষতঃ রেবা এবং উষা দত্ত তাদের নাচের জন্য উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। সাধনা সেন লিখছেন — ছেঁড়া জামা ছেঁড়া কাপড় দুর্ভিক্ষে পীড়িত মানুষ সেজে নাচে অংশ নিতেন উষাদি। .... নাচের কৌশলের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, বলিষ্ঠতার দিকেই দৃষ্টি ছিল। তা ছিল আন্তরিকতায় ভরা।[২৯] আন্তরিকতার পাশাপাশি তাঁদের শেখার আগ্রহও বড় কম ছিল না। রেবা রায় চৌধুরীর স্মৃতিচারণ থেকে তা জানা যায়।[৩০]

'তাঁদের লেখাপত্র বা স্মৃতিচারণ পড়লে বোঝা যায়, সাধারণ বাঙালি ঘরের কন্যা থেকে মঞ্চে স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী হিসাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশের পিছনে কত সংগ্রাম ছিল। তাঁদের এই সাহসী পদক্ষেপ নিঃসন্দেহেই বাঙালি কন্যার নৃত্যের জগতে পা রাখার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। মধ্যবিত্ত জগতের সামাজিক বাধা ভাঙার কৃতিত্ব এঁদেরই।

১৯৪৭এ স্বাধীনতা-দেশভাগ-দাঙ্গা-বাস্তুচ্যুতি , এই সমস্ত ঘটনাগুলি বাঙালি জীবনের স্থিতিশীলতায় বড় আঘাত হানে। তার ধাক্কায় সমাজ মানসিকতাও বদলালো নিশ্চয়ই। কিন্তু কতটা? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় এক নৃত্যাঙ্গনার, চল্লিশের দশক যাঁর শৈশব থেকে কৈশোরে পৌঁছানোর সময়। মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার জানিয়েছেন, ছেলেবেলায় তার নাচে আগ্রহে বাবা মার উৎসাহ থাকলেও আত্মীয় মহলে প্রশ্ন উঠত। তার শৈশবের যে আবহ আমরা পাই তা মফস্বলের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবি। তাঁর নাচের পিছনে বাবা মা দাদা-দিদিদের সমর্থন দেখে বোঝা যায় পরিবর্তন ধীরে ধীরে হচ্ছিল। তবুও মঞ্জুশ্রী

জানিয়েছেন শিল্পী হবেন এমন ভাবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু দেশভাগ, কলকাতায় চলে আসা ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে যে আমূল পরিবর্তন ঘটল তার ফলেই তিনি প্রবেশ করার সুযোগ পেলেন অন্য জগতে — তখনই শুনতাম বড় হলে নাচ ছেড়ে দিতে হয়। হয়তো হতই যদি না দেশভাগের দরুণ কলকাতায় আসতাম।[৩২] কিন্তু প্রশ্ন হল, কলকাতা ও দেশভাগোত্তর বাংলার নতুন প্রেক্ষাপটে মেয়েদের নাচের জগতে পা রাখাও তাকে পেশা হিসাবে গ্রহণের ক্ষেত্রটি কতটা উন্মুক্ত হল, সামাজিক ছাড়পত্র পেল। তার উত্তর মিলবে মঞ্জুশ্রীর স্মৃতিচারণেই। পঞ্চাশের দশকেই মঞ্জুশ্রীকে সিটি কলেজে অধ্যাপণার চাকরি হারাতে হয়, কলেজ কর্তৃপক্ষের এই অভিযোগে, যে তিনি প্রফেশনালি অনুষ্ঠান করেন। তাঁর ভাষায় ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে নৃত্যের মত একটা গর্হিত (?) কাজ করার অপরাধে চাকরি গেল।[৩৩]

সুতরাং সমাজ মানসিকতা সম্পূর্ণ মুক্ত হল একথা বলা কঠিন। তবে এটা অনঃস্বীকার্য যে পঞ্চাশের দশকের স্বাধীনতা উত্তর জগতে বেঁচে থাকার তাগিদে ও অন্যান্য আরও নানা কারণে মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ অনেক দ্বারই উন্মুক্ত হয়। একাজ অক্লেশে হয় নি, কিছু ব্যতিক্রমী কন্যার সাহস, অদম্য ইচ্ছা ও প্রয়াসের পথ ধরেই বাংলার নাচের জগতে বাঙালি কন্যার নূপুরছন্দে বেজে ওঠে, আরও অনেকের নাম উঠে আসতে থাকে নাচের জগতে।

সূত্রনির্দেশ

১। সুনীল সাহা, "বাংলার মাটি ও তার কিছু নাচ", দেশ, ১৫ মে ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৪২; ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, "গৌরী নৃত্যঃ প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ২০৪-২১৯।

২। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), আর্য সপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, কলকাতা, ১৩৬২, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫।

৩। সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী, কলিকাতা, ১৩৫৩ দ্রষ্টব্য।

৪। জ্যোতির্ময়ী দেবী, "সমাজের একটি অন্ধকার দিক", জ্যোতির্ময়ী দেবী রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, ১৯৯২, পৃষ্ঠা - ৩৬৯

৫। কালীঘাট পটে এই ভাবনারই প্রতিফলন মেলে। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, "রিপ্রেসেনটেশন অব জেন্ডার ইন ফোক পেইনটিংস অব বেঙ্গল", সোস্যাল সাইন্টিস্ট, ভল্যুম-২৮, নং - ৩-৪ (মার্চ-এপ্রিল, ২০০০) দ্রষ্টব্য।

৬। শিব চন্দর বোস, দ্য হিন্দুস অ্যাজ দে আর, কলিকাতা, ১৮৮৩, দ্রষ্টব্য। রাধারমণ রায়,

"কলকাতার দুর্গোৎসব", পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতা বিশেষ সংখ্যা), বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৮, আগষ্ট ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ২৭৭।

৭। সুমন্ত ব্যানার্জী, "দ্য বেশ্যা অ্যাণ্ড দ্য বাবু; প্রস্‌টিটিউট অ্যাণ্ড হার ক্লায়েন্টে ল ইন নাইনটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরি বেঙ্গল", ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইক্‌লি, নভেম্বর ৬, ১৯৯৩, ভল্যুম ২৮, নং - ৪৫ পৃষ্ঠা - ২৪৬১।

৮। বিনয় ঘোষ অনুদিত ফ্যানি পার্কসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত. রাধারমণ রায়, প্রাগুক্ত প্রবন্ধে, পৃষ্ঠা- ২৭৮; খ্রিষ্টিয় ধর্মযাজক বিশপ হেবরের পত্নী, শ্রীমতী হেবরএর রচনা, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ৬ নভেম্বর ১৮৭১. তিনি লিখেছেন বাইজিরা শালীনতার প্রতিমূর্তি কেননা শুধু মুখ, পায়ের পাতা ও হাত ছাড়া তাদের সারা শরীর আচ্ছাদিত থাকে।

৯। মধ্যস্থ, অগ্রহায়ণ, ১২৮০।

১০। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, "দ্য ইণ্ডিয়ান প্রস্‌টিটিউট অ্যাজ এ কলোনীয়াল সাবজেক্ট ঃ বেঙ্গ ল ১৮৬৪—১৮৮৩", কানাডিয়ান উইমেনস্‌ স্টাডিজ, ১৯৯২, ভল্যুম ১৩, নং-১, পৃষ্ঠা ৫১-৫৬।

১১। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৪৬২

১২। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, "পটের বিবি : উনিশ শতকের প্রহসন ও ব্যঙ্গচিত্রে নারী", আকাডেমী পত্রিকা (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমী), অষ্টম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ৬৫।

১৩। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রোডিউসিং অ্যাণ্ড রিপ্রোডিইসিং দ্য নিউ উইমেন"। সোস্যাল সাইন্টিষ্ট, নং - ২৪৮-৪৯, পৃষ্ঠা ২৪-২৬

১৪। মহেন্দ্রলাল দত্ত, কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা - ২৯।

১৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক নৃত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৯৮২, পৃষ্ঠা - ৮৯; গুরুসদয় দত্ত, দ্য ফোক ডানসেস অব বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা - ১৪

১৬। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাইনাচ বনাম খেমটা; উনিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতিতে শ্রেণী বৈষম্য, শারদীয়া বারোমাস, ১৯৮৬ পৃষ্ঠা - ১৭

১৭। বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৫ খণ্ড কলকাতা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা - ১৮৪; ১৮৫৬ তে কৈলাসচন্দ্র বসুর বক্তৃতা, অলোক রায়, নাইনটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরি স্টাডিজ গ্রন্থে, কলকাতা ১৯৭৫, পৃষ্ঠা - ২০০

১৮। মেরিডিথ বর্থউইক, দ্য চেঞ্জিং বোন অব উইমেন ইন বেঙ্গল, (১৮৪৯—১৯০৫), প্রিন্সটন, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা - ৫

১৯। সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়, "বাইনাচ বনাম খেমটা" প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা - ১৬

২০। পূর্ণিমা ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির গগন ঠাকুর, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৭৩।

২১। সাহানা দেবী, স্মৃতির খেয়া, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা - ১০০।

২২। সুশীল মুখোপাধ্যায়, "দর্শকের আসন থেকে : গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর বাঙলা সাধারণ নাট্যশালা", আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত, শতবর্ষে নাট্যশালা, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা - ২৫৯-৬০।

২৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কলকাতা, ১৯৮৩ দ্রষ্টব্য।

২৪। উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, কবি ও কুইনী", আজকাল, শারদীয়া ১৪০৬, পৃষ্ঠা - ৩২৩।

২৫। চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮৭, পৃষ্ঠা- ২১৬

২৬। সাধনা বসু, শিল্পীর আত্মকথা (কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুলিখিত), কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭০ পৃষ্ঠা - ৯-১০

২৭। সাহানা দেবী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০০

২৮। ঐ, পৃষ্ঠা - ১৯৪

২৯। সাধনা সেন, "গণনাট্যের গোড়ার দুচার কথা", গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ১১৯

৩০। রেবা রায় চৌধুরী, জীবনের টানে, শিল্পের টানে, কলকাতা, ১৯৯৯, দ্রষ্টব্য; এছাড়াও উষা দত্ত, দিন গুলি মোর, কলকাতা, ১৯৯৩, দ্রষ্টব্য।

৩১। মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার, "বলতে চাই", নীলিমা চক্রবর্তী (সম্পাদিত), আজ আমি কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ৬৬; মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার, নৃত্য রসে চিত্ত মম, কলকাতা ১৯৯৯ দ্রষ্টব্য।

৩২। আজ আমি, পৃষ্ঠা - ৬৭

৩৩। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৭।

লীলা রায় ঃ বিংশ শতকের নারী চিন্তার অনন্য একটি দিক

ছন্দা বসাক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় রাজনীতির এক বিশিষ্ট সময়ে লীলা রায় তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক শক্তির দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেন। প্রায় পঞ্চাশেরও অধিক সময় ধরে তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতি-অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে একটি মৌল চিন্তা গড়ে তোলেন। ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ যদি রাজনৈতিক চিন্তার বৃহত্তর পটভূমিকা তৈরি করে তাহলে সেই অর্থে লীলা রায় সেই পরিবেশেরই ধারক ও বাহক। ব্যক্তি স্বাধীনতা, শ্রেণী চৈতন্য, অভিজ্ঞান ও তার ক্যারেকটার জোনস্ সবই সেই অনুসন্ধানীয় বিষয়। লীলা রায় মানসিকতায় মধ্যবিত্ত চৈতন্য. অনুসারী। রাজনৈতিক আদর্শের ছায়ায় তাঁর ব্যক্তিমানস নির্মিত। রাজনীতি তার পরিবেশ প্রকৃতির জৈবিক বৃত্তি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর এই বিপ্লবী মানস গড়ে তোলার পশ্চাতে ছিল তার পিতা মাতার প্রেরণা। শৈশবেই মাৎসিনী ও জ্যারিবল্ডীর চিন্তার সঙ্গে তার পরিচয়। শৈশব ও কৈশোরের সেই পরিবেশ অতিসন্তপর্ণে তার অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার বীজমন্ত্র। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার শৈশব ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে rational up-bringing - এব ভাবধারার মধ্যে। দিবালোকের স্পষ্টতার মধ্যে তার ছাপ তীব্র হয়ে আছে জীবনে। তারপর যোগাযোগ হল যথার্থ হিন্দু সভ্যতা, খনন ও জীবধারা ও mysticism - এর একটি product- এর সঙ্গে। কতবার ধাক্কা খেয়েছি, মনকে গ্রহণ করতে পারিনি, বুদ্ধি বিচার বিচলিত হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু পেলাম তার নিকট যা আমার পূর্ব পুরুষের হাজার হাজার বৎসর ধরে রক্তে প্রবাহিত হয়ে আসছে।"

লীলা রায়ের জন্ম ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে আসামের গোয়াল পাড়ায়। তাঁর পিতা শ্রী গিরিশচন্দ্র নাগ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মাতা কুন্তলতা নাগ ও একজন শিক্ষিত মহিলা ছিলেন। রাজকর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের পরিবার স্বদেশী ভাবধারায় আপ্লুত ছিলেন। লবন করের বিরুদ্ধে পিতা লেজিসলেটিভ এ্যামেম্বলীর সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। মাতামহ প্রকাশচন্দ্র দেব ছিলেন আসাম সরকারের সেক্রেটারী। লীলা রায়ের জীবনের শুরুতেই বিপ্লবী চরিত্রের আত্মপ্রকাশ। ১৯২১ সালে তিনি বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে ঢাকায় ফিরে যান। সেই সময়ে মহিলাদের জন্য স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। দৃঢ় পদক্ষেপে, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বকে সম্বল করে তিনি অপূর্ব দৃষ্টান্ত গড়ে তুললেন। যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিলল এবং তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করেন। এই সময়ে তিনি

অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। বৈপ্লবিক সংগ্রামের পাশাপাশি সাংগঠনিক কার্যকলাপ এই দুইই ছিল তার চিন্তার প্রেক্ষাপট। ১৯২১ সালে তিনি বেথুন কলেজে আয়োজিত একটি সেমিনার করেন। এই বেথুন কলেজেই তার দেশ সেবার একটা প্রেরণাস্থল হয়ে ওঠে।

একটু বলে নেওয়া ভালো এই প্রজন্মে অর্থাৎ ২০ দশকের মাঝামাঝি ও শেষে উঠতি প্রজন্মের অস্থিরতার ফলে নানা ধরণের যুবক ও ছাত্র সংগঠন জন্মলাভ করে। যারা ছিল না স্বরাজী, আবার না পরিবর্তন বিরোধী। এই সময় সুভাষচন্দ্র বসু 'পূর্ণস্বরাজ' এর চেয়েও বেশি অবিচল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা দাবি করেছিলেন। সুতরাং লীলা রায় তার চিন্তায় ও মননে এই পথকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। সুতরাং লীলা রায় সুভাষচন্দ্র বসুর উত্তরসূরি। শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, পূর্ণস্বরাজ অর্জনই নয়, বিভিন্ন অরাজনৈতিকতা ধারা ও জাতীয়তাবাদকে সামাজিক ন্যায় বিচারের সঙ্গে যুক্ত করার কথা চিন্তা করলেন লীলা রায়। অবশ্য তার স্বামী অনিল রায়ও ছিলেন এই পথ অনুসরণকারী।

ভারতবর্ষে ২০ দশকের শেষে যে, অন্তর্দেশীয় রাজনীতির চরম বিশৃঙ্খল পরিবেশ রচিত হয়েছিল তারই মধ্যেই চরমপন্থী আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, চরমপন্থী আন্দোলনও জনগণকে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হয়নি। জনসাধারণের মধ্যে যে চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তা উপযুক্ত গণসংগঠনের মাধ্যমে চালিত করার কার্যকরী প্রয়াসের অভাব ছিল। এই পর্বেই কয়েকজন মুষ্টিমেয় ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে উপযুক্ত গণসংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষিত হয়। লীলা রায় এই মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতমা। লীলা রায় এর প্রত্যয় ছিল গণসংগঠন গড়ে তোলা তাই তিনি নারীদেরও এই গণসাংগঠনিক ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন। ১৯২৪ সালে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত হল দীপালি সংঘের। যার তার জীবনের অন্যতম লক্ষ্যকে পরিণতি দিল।

দীপালি সংঘের কাজ হল নারী প্রগতি ও সামাজিক কল্যাণ। এই উদ্দেশে দীপালি সংঘের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হল দুটি হাইস্কুল। (নারী শিক্ষা মন্দির ও শিক্ষা ভবন) শীঘ্রই স্কুলগুলি হয়ে উঠল রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রভূমি। লীলা রায় এরপর আরও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যা "গণ শিক্ষা পরিষদ' নামে পরিচিত হয়। ১৯২৬ সালে তিনি 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' নামে ছাত্রী সংঘ গঠন করেন ঢাকায় যার বহু শাখা বাঙলা ও আসামে ছিল। তিনি মহিলাদের কারুকর্ম ও হস্তশিল্পে আগ্রহী করেন তোলেন। লীলা রায় চেয়েছিলেন দীপালি ছাত্রী সংগঠনের মাধ্যমে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ পথ হবে সহজতর।

প্রশ্ন উঠতেই পারে এর বহু পূর্বেই নারী কল্যাণ সংঘের অস্তিত্ব ছিল যা অভিজাত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু লীলা রায় পুরোনো প্রজন্ম থেকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে মহিলা সংগঠনগুলি মূলত 'এলিট-ক্লাসের'। তাদের উৎস মূলের চরিত্রায়ন অনেকটা এইরকম - বলে মনে করেন চিত্রা ঘোষ।[৪]

1. Male direction –

2. A concept of complimentary sex roles, slowly replacing the traditional view point.

3. Absense of a radical onslaught on the particular basis of India Culture.

4. Orientation towards elite representation and not mass mobilization.

উপরিউক্ত চরিত্রগুলি নারী আন্দোলনের গতিপথকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছিল। এবং প্রগতিবাদী নারী সংগঠনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও অসম্ভব হয় উঠেছিল। স্বদেশী যুগে 'রাখি বন্ধন' ও 'অরন্ধন' উৎসবেই নারী আন্দোলন সীমিত। অথচ চরমপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে নারীদের এই সীমিত ও ক্ষুদ্রত্ববোধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন কেউ কেউ। অথচ ভারতীয় পরম্পরাকে অস্বীকার করার প্রবণতা নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলনগুলির কোনটাতেই ছিল না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত পর্যায়ে (১৯১৭-১৯২৩) নারীরা ছিলেন পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুসন্ধানী। দ্বিতীয়োক্ত পর্যায়ে (১৯২৮-১৯৩৭) নারীদের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের সংগ্রাম। লীলা রায়ের সাংগঠনিক চিন্তায় এই দ্বিমুখী আদর্শের মধ্যে সংযোগ সাধিত হল। আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের সর্বপ্রধান কথা হচ্ছে ' নারী সকলের আগে মানুষ আর মানুষ হিসাবে তাঁর বাঁচবার দাবি। অবশ্য 'পুরুষ সাম্য' লাভের ধারণাও এর সঙ্গে জড়িত।[৫]

দীপালি সংঘ নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ। ঢাকা শহরে নারী মহলেই শুধু নয়, পুরুষ মহলেও তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত নেত্রী। ১৯২৩ সালে এম.এ পাশ করে তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক জগতে প্রবেশ করেন। ঢাকা শহরে দীপালি সংঘের প্রায় ১১টি শাখা কেন্দ্র ছিল। মাসে ১ বার জেনারেল বডির মিটিং সংঘের এক একটি শাখা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হত।

ছবি রায় লিখেছেন[৬] "লীলা রায় আমায় একদিন বলেছিলেন যে, যেদিন জেনারেল বডির মিটিং থাকত সেদিন সবাই বুঝত। দলকে দল মেয়ে বউ সব মিছিলের মত চলেছে মিটিং করতে।" দীপালি সংঘ সাধারণ মেয়েদের একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান রূপে

গড়ে ওঠে। সুতরাং রাজনৈতিক সংগঠনে অভিজাত মহিলাদের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের যুগ শেষ হয় এই সময়কাল থেকেই। গ্রামে গ্রামে দুবৃর্ত্তদের হাত থেকে মেয়েদের উদ্ধার করা, সেইসব মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ইত্যাদি নানা প্রকার কাজকর্ম - এ দীপালি সংঘ মেয়েদের একান্ত আপনার হয়ে ওঠে। এর পশ্চাতে ছেলেদের সাহায্যও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু চিত্রা ঘোষ যেটিকে 'মেল ডিরেকশন' বলার পক্ষপাতী লীলা রায় তাঁর বিপরীত ধর্মী।

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে লীলা রায়ের বিখ্যাত দলটি শ্রী সংঘে রূপান্তরিত হয়। আয়ারল্যান্ডের মিস্ ম্যাকমইনির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছুটা সামাজিক কল্যাণ মারফৎ রাজনৈতিক অভিষ্ট সিদ্ধির আশা পোষণ করতেন লীলা রায়। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সামাজিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি। ক্রমশঃই ঢাকা শহর থেকে ছাত্রীরা কলকাতায় কলেজে পড়তে আসতে শুরু করে। কলকাতায় এসে মেয়েরা যাতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন না হয় তার জন্য গিয়ার্স পার্কে (বর্তমান লেডিজ পার্ক) মেয়েদের জন্য বিশেষ কেন্দ্র খোলা হয়। যেখানে শ্রী সংঘের মেয়েদের জন্য পুলিন দাসের নেতৃত্বে লাঠি, ছোরা খেলা শেখাবার ব্যবস্থা হয়। শ্রী সংঘের মেয়েদের ছাত্রী ভবন নামে একটি হোস্টেল খোলা হয় গোয়াবাগানে। সেখানে মেয়েরা যাতে যোগাযোগ রাখতে পারে এবং রিক্রুটমেন্ট ইত্যাদি দ্বারা সংগঠনকে সুসংহত করে তুলতে পারে তার প্রতি মনোযোগ যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়।[৮]

উপরিউক্ত কর্মপদ্ধতি বা working programme যে সংগঠনটির একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো রচনা করতে পেরেছিলো তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ঢাকায় দীপালি সংঘের যে কর্মপদ্ধতি প্রচারিত হয়েছিলো তার একটি পুরোনো ফর্মা, যা সম্পাদিকা লীলা রায় কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ফর্মাটিতে দীপালি সংঘের উদ্দেশ্যকে ও কার্যকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে।[৯]

ক) উদ্দেশ্য ঃ জ্ঞান কর্ম ও আনন্দহীন নারী সমাজকে স্থানে কর্মে প্রতিষ্ঠিত করে সজীব, সতেজ ও আনন্দময় জীবন গঠন করতে সহায়তা করাই দীপালি সংঘের উদ্দেশ্য।"

দীপালির কার্যবিভাগ ঃ- ক) সমাজসেবা ঃ মহিলাদের অর্থকরী শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিশুপালন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া, দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টার সহিত যোগ রাখতে শিক্ষা দেওয়া, সামাজিক কুপ্রথা দুর্নীতি ইত্যাদি দূর করার চেষ্টা করা। 'সমাজসেবার' উদ্দেশে দীপালি সংঘের মোট পাঁচটি শাখা ছিল,

১) উয়ারী, ২) বক্সি বাজার, ৩) রাজার দেউড়ী, ৪) তাঁতি বাজার, ৫) নারিন্দা

উয়ারী।

খ) জ্ঞান ও শিল্পচর্চা ঃ দেশের নানা বিষয়ে যাতে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, নিজেদের মতামত গঠন ও ব্যক্ত করতে স্বক্ষম হন এই বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল তাই।

গ) নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা ঃ মহিলা পাঠাগার স্থাপনের চেষ্টা, অল্পব্যয়ে সেলাই, বস্ত্রবয়ন, সঙ্গীত ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করাও ছিল এই সংগঠনটির কার্যাবলী।

এই ফর্মটিতে আরও বলা হয় যে, নারীর নির্বাচনাধিকারও সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। নারীকেও রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দেওয়া উচিত এই মত ব্যক্ত করে সভা আহ্বান করা হয়। গৃহীত প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করা হয়। সুতরাং দীপালি সংঘ কার্যত নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশে তার বিভিন্ন স্থানে শাখাগুলো প্রতিষ্ঠিত করে।

সুনীল দাস এ প্রসঙ্গে লিখেছেন [১০] "দীপালি প্রদর্শনীর সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভূমিকার অঙ্কুর লক্ষ্য করা গেছে। সেদিনকার বিজাতীয় সরকারের দেশী অনুচরেরা এই সম্ভাবনা উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, দীপালির মহিলা সমাবেশ ও তার অন্তর্বর্তী সমাজের মহিলাদের সংহতি চেতনা প্রতিহত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। দীপালি প্রদর্শনী সম্পর্কে সরকারি ব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যায় অল্পকালের মধ্যে ঢাকা জেলার উচ্চতম পর্যায়ের আমলার আচরণে। ঢাকার দায়িত্বশীল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই প্রদর্শনীকে বন্ধ করার আদেশ জারি করেন।

এই প্রসঙ্গে প্রবীন সমাজবাদী নেত্রী দীপালির সম্পাদিকা [১১] উমা দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে ১৯২৩ সালে দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই নারী মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়ে। নারীদের সামাজিক মুক্তির প্রাঙ্গন থেকে তা দেশ মুক্তির প্রাঙ্গণে জীবন দানের কাজে ব্রতী হয়ে পড়ে।

লীলা রায় ১৯৩১ এর মে মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ এর বৈশাখ) নিজ সম্পাদনায় জয়শ্রী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার নামকরণ করেন। কবিগুরুর আশীর্বাণী নিয়েই এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। কবির ভাষায় —

"বিজয়িনী নাই তব ভয়
দুঃখেও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান, সম্মান করিবে দান
জয়শ্রীর এই পরিচয়।"

লীলা রায় এই সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র জয়শ্রী, কিন্তু জয়শ্রীর ক্ষেত্র কি ছিল? — মূলতঃ

দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে জয়শ্রী প্রকাশিত হয়েছিল।

১) পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন

২) সমাজ পরিবর্তন।

লীলা রায় চেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্য চর্চার মূল উদ্দেশ্য হবে ভারতীয় জীবনবোধের স্পষ্টতর রেখাঙ্কন করার। অনেকে অবশ্য এই পত্রিকা সম্পর্কে এক সময় বলতেন এটি মহিলা পরিচালিত পত্রিকা, মহিলাদের লেখাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু সে সম্পর্কে তিনি নিজেই উত্তর দিয়েছেন (১৩৬৮ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ জয়শ্রী) "পুরুষ ও নারীর লেখা সম্পর্কে পার্থক্য কেন। এ বিষয়ে আমাদের মত এই যে, নারীদের মতামত সুসমৃদ্ধ করবার কার্যে আরও অধিকসংখ্যক নারী যখন আত্মনিয়োগ করবেন তখন এই পার্থক্যের প্রয়োজন থাকবেনা। বর্তমানে এত অল্পসংখ্যক নারী এই কার্যে ব্রতী হয়েছেন যে তাদের মতামত বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হওয়াতে বর্তমানে যুগের নারীদের সুচিন্তিত সুসংবাদ মতামত দেশ জানতে পারছে না। কাজেই এই পত্রিকা প্রকাশ হবে তার প্রধান উদ্দেশ্য"। সুতরাং নাবীবাদী সাহিত্য সৃষ্টি লীলা রায়ের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের এক বৃহত্তর অংশ যা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে তাকে সংযুক্ত করা। একদিকে নারী সমাজের চিন্তাধারাকে রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রাঙ্গণে তুলে ধরতে চেয়েছেন। অপরদিকে গণ সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার সমাধান করতে চেয়েছেন। 'সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে বিস্তৃতির করাই যুগধর্ম, একে সঙ্কীর্ণতর করলে আধুনিক মানুষের মনন ও ভাবরাজ্যের উপযুক্ত কখনো হতে পারে না।"

দীপালি সংঘ থেকে জয়শ্রী সম্পাদনা এই যে পদক্ষেপ এরই মধ্য দিয়ে লীলা রায় নারী মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্টতা আনতে সক্ষম হলেন। স্বদেশী যুগের সংগঠনগুলিতে mass mobilization ছিল না বললেই চলে। উপরিউক্ত চরিত্রগুলি নারী আন্দোলনের গতিপথকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছিলেন।

বস্তুত নারীদের এই সীমিত ও ক্ষুদ্রত্ববোধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন লীলা রায়। ভারতীয় পরম্পরাকে অস্বীকার করেই নিজের অধিকার ও আত্মমর্যাদাবোধের সংগ্রামে যিনি গড়ে তুলেছিলেন দীপালি সংঘ। লীলা রায় প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন নারী সকলের আগে মানুষ আর মানুষ হিসাবে তার বাক্যের দাবি। "পুরুষ সাম্য' লাভের এই ক্ষুদ্র ধারণাটির সেই সঙ্গে বিলুপ্তি। স্বীকার করতেই হবে 'দীপালি সংঘ' প্রতিষ্ঠা তাই একটি অখন্ড বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। কারণ নারীর আত্মসাতন্ত্রের দাবি প্রতিষ্ঠার কথা কেউই এই প্রজন্মে এমনভাবে বলেন নি। এই ভাবেই 'মেল ডিরেকশন' এর অবসান ঘটেছিল। সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনেও নারীকে

সমান ভাবে যুক্ত হতে হবে এই প্রত্যয় ও ছিল তার।[১২] ১৯৩৮ তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। কমলা দাশগুপ্তের মতে, লীলা রায় পরিকল্পনা কমিশনের কাছে বাঙলা মহিলা সাবকমিটির বক্তারূপে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক মহিলাদের তিনি সম্মিলিত সংস্থাতে মিলিত করার কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এটাও স্বীকৃত যে, দীপালি সংঘের উত্তরণ শ্রী সংঘের পটভূমিকায়। তাই দীপালি সংঘের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদ যুক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি, নারী প্রগতিবাদ, সমাজসেবা, স্থান ও শিল্পচর্চার সঙ্গে বিংশ শতকের নারী মুক্তি আন্দোলনকে যারা বৃহৎ পটভূমিকায় এনে দিয়েছিলেন, লীলা রায় তার অন্যতম অগ্রদূত।

সূত্রনির্দেশ

১। আমরা কথা — লীলা রায়, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

২। Dictionary of National Bio-graphy. (Roy, Lila volume III Institute of Historical Studies Calcutta - 1900 - 1970)

৩। সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, পৃ: - ২৫৫

৪। Chitra Ghosh "Women's movement politics in Bengal" Page-28

৫। হরিদাস মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী, ভূমিকা।

৬। ছবি রায়, বাঙলার নারী আন্দোলন, পৃ: — ১১০

৭। পুলকেশ দে সরকার, বিপ্লবী প্রতিমা লীলাবতী, জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ।

৮। ঐ

৯। বঙ্গলক্ষ্মী ১ম বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৩২ সাল, পৃ: — ১৮-২১

১০। সুনীল দাস (আত্ম আবিষ্কার) জয়শ্রী ৫ বর্ষ প্রথম সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৯৮।

১১। ১৩৯৯, পৌষ সংখ্যা, জয়শ্রী, 'আলোচনী', পৃ: — ৮১০

১২। কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার নারী।

১৩। লীলা রায়, সাহিত্য সমাজ প্রবন্ধ।

১৪। লীলা রায় সম্পাদকীয়, জয়শ্রী ভাদ্র ১৩৭৫ সংখ্যা।

অন্যান্য সংকেত :-

১। নলিনী কিশোর গুহ — বাঙলায় বিপ্লববাদ (কলকাতা, ১৩৩০)

২। সমর গুহ — প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টির জন্ম ও ভূমিকা

৩। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি।

৪। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় — ভারতের জাতীয় আন্দোলন (কলকাতা ১৯২৫)

৫। অনিল রায় — সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ

৬। Binoy Kumar Saikar - Political Philosophers since 1905. (Calcutta. Mritunjayee)

৭। Kumaresh Ghosh - Women Social Condition.

৮। Bharati Roy – From the Scens of history essays on Indian Women.

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলার জাগরণের ইতিহাস।

সৈয়দ তনভীর নাসরীণ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ বাঙালি সমাজ জীবনে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছিল। এই জাগরণে কাণ্ডারীরা ছিলেন পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত উদার মনোভাবাপন্ন নব্য প্রজন্মের কতিপয় তরুণ যুবা - যাঁরা মূলতঃ হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মানুষ। নবজাগরণের এই আলোকরশ্মি ক্রমে পৌঁছায় বাঙালির অন্দরমহলেও। লেখাপড়া শিখলে মেয়ে বিধবা হবে — এই কুসংস্কার কাটিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে বাঙালি নারীর যে ক্রমবিকাশ, সেই যাত্রাপথ আগ্রহী করেছে ঐতিহাসিকদের। স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের লেখার দর্পণে যে বাঙালি নারীরা চিত্রায়িত হয়েছেন, তাঁরাও পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। এই ইতিহাসচর্চায় প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলার জাগরণের ইতিহাস।

অপ্রতুল ইতিহাসবোধ থেকেই আমরা প্রায়শ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), যিনি বেগম রোকেয়া নামে সমধিক পরিচিত, এবং শতাব্দীর শেষে তসলিমা নাসরিন (জন্ম ১৯৬২, 'নির্বাচিত কলাম' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯৯২) — এই দুজনকে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করে থাকি। কিন্তু পারম্পর্যকে অস্বীকার করে কোনো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ইতিহাসের নিয়মে অসম্ভব — বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান মহিলার জাগরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে সেই ধারাবাহিকতার সন্ধানই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

ধর্মের পাশপাশি বাঙালি মুসলমানের পরিচিতির আরো দুটি সূত্র আছে — তার বাঙালি পরিচিত গড়ে উঠেছে·পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের অধিবাসী এবং বাংলাভাষাভাষী জনসম্প্রদায়রূপে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং মাতৃভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের রূপরেখা পৃথিবীর অন্যত্র বসবাসকারী সমধর্মাবলম্বীদের থেকে আলাদা। তাই ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজজীবনে নবজাগরণ যে প্লাবন এনেছিল, দেরিতে হলেও তা দোলা দিয়েছিল বাঙালি মুসলমানকে। উনিশ শতক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সমাজজীবনে বাঙালি মুসলমান মহিলাদের কোনো ভূমিকা ছিল না — পরিবারেও তাঁরা ছিলেন পিতৃতন্ত্রের ক্রীড়নক। আশরফ হবার বাসনায় পুরুষ তাঁদের স্ত্রীকন্যাদের অসূর্যম্পশ্যা করে রেখেছিলেন।[১] ইজ্জত এবং তমিজের এক বিচিত্র নীতিতে অনুপ্রাণিত মেয়েদের জন্য জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর-কঠিন পর্দার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনাত্মীয় মহিলাদের

সামনেও পাঁচ বছরের বালিকা রোকেয়াকে পর্দা করতে হত।[২] এই সমস্ত পরিবারগুলির অন্তঃপুরে গৃহকর্মশিক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হত — তার সঙ্গে বিজাতীয় ভাষায় ধর্মগ্রন্থপাঠ সেই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করত।

এই সমস্ত পরিবারগুলির পুরুষরা যখন আরবি ফারসির অভিমান কাটিয়ে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে প্রবৃত্ত হলেন, তাঁদের মানসিকতার প্রসার ঘটল।

সামাজিক প্রতিকূলতার আশঙ্কায় বেগম রোকেয়োর পিতা তাঁর কন্যাদের শিক্ষার আলোক দিতে পারেন নি। তাঁর পুত্র, বেগম রোকেয়োর অগ্রজ ইব্রাহিম সাবের রংপুর থেকে কোলকাতায় পড়তে এসেছিলেন—পিতা আর পুত্রের মানসিকতায় তাই প্রজন্ম-ব্যবধান ধরা পড়ে—রোকেয়াকে পাঠদানে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আবার মোমবাতির আলোয় বোনকে গোপনে শিক্ষিত করে তোলার যে উদ্যোগ ইব্রাহিম গ্রহণ করেছিলেন, রোকেয়ার বিলেতফেরত স্বামী সর্বসমক্ষে সোচ্চারে সেই প্রেরণা যোগাতেন স্ত্রীকে।

শিক্ষাপ্রসূত সমাজ সচেতনতা থেকেও উত্থাপিত হয় স্ত্রীশিক্ষার কথা। ১৮৮২ সালে আব্দুল আজিজ, বাজলুল করিম, ফজলুর রহিম প্রমুখ স্থাপিত ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মেলন মুসলমান স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

এর পাশাপাশি সহপাঠী-সহকর্মী ব্রাহ্ম-হিন্দু পরিবারগুলির মহিলাদের সপ্রতিভতার সমকক্ষ করে তুলতেও প্রয়োজন হয় স্ত্রীকন্যাদের শিক্ষিত করে তোলা। জ্ঞানের আলোকে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এই মহিলারা। তাই পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর অনুপ্রেরণার সম্পূরক হয়ে উঠেছে আত্মোপলব্ধির ব্যক্তিগত তাগিদ।

সাধারণ গৃহকর্মশিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষার বাইরে এই আধুনিক শিক্ষা বাঙালি মুসলমান মহিলাকে ধর্মীয়-সামাজিক ক্ষেত্রে 'মুসলমান' এবং ভাষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 'বাঙালি' পরিচিতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সাহায্য করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই লেখনী ধারণ করলেন এই মেয়েরা। বাংলাভাষাকে আত্মস্থ করে নিখাদ সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধেও উদ্বুদ্ধ করে তাঁদের। প্রায় প্রথম থেকেই পর্দাপ্রথার অসারতা, যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বিজাতীয় ভাষায় ধর্মশিক্ষার বিরুদ্ধে অসন্তোষ, অর্থকরী উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় এঁরা আরো সোচ্চার হয়েছিলেন।

অবশ্য এর আগে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পুঁথিসাহিত্য রচনা করেন রহিমুন্নেসা। ১৮৬৪ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় তাহেরন নেসার লেখা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সম্পর্কে দীর্ঘ একটি পত্রাকার প্রবন্ধ ছাপা হয়। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানির রূপজালাল। ব্যক্তিগত সাহিত্যচর্চা ছাড়াও বেগম রোকেয়ার অগ্রজা করিমুন্নেসা খানম ছিলেন আহমদী পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপনে এগিয়ে এসেছিলেন এই সম্প্রদায়ের মেয়েরাও। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানি। ১৮৯৭ সালে মুর্শিবাদের নবাব বেগম ফিরদৌস মহল কলকাতায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সুহ্‌রাওয়ার্দিয়া গার্লস্ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে।

অনগ্রসরতা ও আধুনিকতার এই যুগসন্ধিক্ষণেই বেগম রোকেয়ার আবির্ভাব। সাহিত্যচর্চা, বিদ্যালয় স্থাপন, সমাজসেবা মহিলা সমিতি (আঞ্জুমান-এ-খাওয়াতীন-এ ইসলাম) প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা এক কর্মময় জীবনের উদাহরণে বেগম রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মহিলাদের যেভাবে প্রভাবিত করলেন, সেখানেই জাগরণের ধারণা গতিশীল হয়ে উঠল।

পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি দেওয়ার তাৎপর্য এই যে বেগম রোকেয়ার প্রায় এক শতাব্দী আগেই বাঙালি মুসলমান মহিলাদের মধ্যে সংস্কারের আকাঙ্খা অংকুরিত হয়েছিল। বেগম রোকেয়ার উদ্যোগ এবং উদাহরণে তা মহীরূহে পরিণত হল। ডিরোজিওকে ঘিরে যেমন ইয়ং বেঙ্গল গড়ে উঠেছিল, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বেগম রোকেয়াকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান মহিলার জাগরণ সূচিত হল

বেগম রোকেয়ার মত তাঁর সমসাময়িকদের লেখাতেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যবস্থায় প্রেরণাদাতা পিতৃতন্ত্রের প্রতি 'আমাদের দাবী' প্রবন্ধে শ্রীমতি মাসুদা রহমান (১৮৮৫-১৯২৬) এর মন্তব্যঃ কর্তব্যপরায়ণ পিতা বড় বেশি করেন তো পাখি পড়ানোর মত কোরান পড়িয়ে কর্তব্যপালন করার আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন।[৩] উদারচেতা মাসুদার বিশ্বাস ছিল : যার নাম ধর্ম সে মহান মঙ্গল-বিধায়ক।[৪] নারী জাগরণের ভাবধারায় উদ্দীপিত মাসুদা মনে করতেন নারীত্ব সার্থক করবার সহস্র পথ আছে, বিবাহ ছাড়াও করবার কাজ অনেক আছে[৫] ... মানুষে যা পারে আমরাও তা পারবো।[৬]

নাতিদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে (১৯২৩-২৯) নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫) তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে নিছক সাহিত্যমূল্যের মানদণ্ডে নয়, নূরুন্নেসা রচিত উপাদান থেকেই বাস্তববাদী সমাজচিন্তকের ভূমিকায় তাঁর মূল্যায়ন করা যায়। পুরো সম্প্রদায়টিকে শিক্ষিত করে তুলতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : বিদুষী নারীর গর্ভজাত সন্তান মূর্খ হতে পারে না। আত্মপরিচয়

প্রসঙ্গে তিনি বলেন : আমরা বাঙালি মোস্‌লেম রমণী। বাঙ্গালা তো আমাদের মাতৃভাষা। বাংলা ১৩৩৩ সালে বঙ্গীয় মুসলমান মহিলা সংঘের সভানেত্রীরূপে আত্মপ্রত্যয়ী নূরুন্নেসা জাগরণের বাণী ঘোষণা করলেন : আলোকের দিকে মাথা তুলে বাতাসের দিকে শাখা মেলে আমাদের এখন গজিয়ে উঠতেই হবে।

শিক্ষা এনে দেয় আত্মবিশ্বাস। তাই ডাক্তার স্বামী পীরত্ব গ্রহণ করার পর যুক্তিবাদী মামলুকুল ফাতেমা খানম (১৮৯৪-১৯৫৭) ছেলেকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান ১৯২০ সালে। ১৯২৭ সালে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে যোগদান করলে তিনি রোকেয়ার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। শিক্ষাক্ষেত্র বাঙালি মুসলমান মেয়েদের অনগ্রসরতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। সেই বছরই তরুণ পত্রের সহ সম্পাদক আবুল ফজলকে এক চিঠিতে খানম লেখেন। অলস অকর্মণ্য মুসলমান সমাজের নারীজাতির জন্য এই প্রবীণা বিধবা মহিলাটি যা করছেন সমস্ত ভারতে তার তুলনা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙালি মুসলমানদের নিদ্রা তিনি কিছুতেই ভাঙাতে পারছেন না। বাঙালি মুসলমান মহিলাদের জাগরণের ক্ষেত্রে ফজিলতুননেসা। (১৯০৫-১৯৭৫) এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

তিনি বেথুন কলেজের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসের প্রথম মুসলমান ছাত্রী। এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা করেন — আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আর এক ধাপ এগিয়ে তিনি স্বনির্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করেন।

ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই 'মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ', 'মুসলিম নারীর মুক্তি' প্রভৃতি বক্তৃতা প্রবন্ধ রচনা করেন।

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলার জাগরণের ইতিহাসে দেশভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আলোকপ্রাপ্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বহু পরিবার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবার কারণে ১৯৪৭এর পরে দুই বাংলা মুসলমান মহিলাদের মধ্যে অগ্রসরতার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। দেশভাগের পরে ফজিলতুননেসার মতই ওপার বাংলায় চলে যান শামসুন নাহার মাহমুদ এবং বেগম সুফিয়া কামাল।

রোকেয়া স্নেহধন্যা শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ১৯৩২ সালে বি. এ পাশ করলে রোকেয়া তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। ১৯৩৯ সালে লেডী ব্র্যাবোর্ন কলেজে বাংলার অধ্যাপিকারূপে যোগ দেন শ্যামসুন নাহার। বেগম রোকেয়ার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা, বুলবুল পত্রিকার সম্পাদনা, অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ সালে এম. এ পাশ করেন তিনি।

বেগম রোকেয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী নূরুন্নেসার 'উকিল' স্বামীর মত, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শামসুন নাহারের স্বামী 'ডাক্তার' ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদও স্ত্রীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। সাধারণভাবে নারীবাদী বলে পরিচিত হলেও এই ভদ্রমহিলারা কিন্তু সে ঋণের কথা তাঁদের লেখায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

বেগম রোকেয়ার অপর এক প্রিয়পাত্রী সুফিয়া নেহাল হোসেন (পরে স্বনামধন্যা বেগম সুফিয়া কামাল) ১৯২৭-৩২ এই সময়কালে রোকেয়ার সহকর্মীরূপে তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। শামসুন নাহারের মত তিনিও 'বেগম' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন — উভয়েই যুক্ত ছিলেন রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানের সঙ্গে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমরা খায়রন্নেসা খাতুন নামক এক ব্যক্তিত্বের কথা জানতে পারি। রাজনীতিবিদদের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর — তাঁর লেখাতেও পাওয়া যায় স্বদেশপ্রীতির সৌরভ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা স্বদেশানুরাগ,[৭] প্রবন্ধে তিনি মহিলাদের দেশজ দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছেন — অর্থনৈতিক মানদণ্ডে এর উপকারিতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন।

বিশের দশকে রাজনৈতিক পরিবারের কন্যা এবং বধূ রাজিয়া খাতুনের (১৯০৭-৩৪) লেখায় আরা স্পষ্ট হয় রাজনীতির প্রসঙ্গ। তাঁর লেখায় রাজনীতি সচেতনতা তথা শ্রেণী সংগ্রামের চিত্র ধরা পড়ে।

জাগরণ একটি গতিশীল ধারণা — একটি প্রাপ্তি তৈরি করে আর এক প্রত্যাশার সোপান। ধারাবাহিকতা নিয়মে তাই দেখি রাজনৈতিক উদ্দেশে লেখনী ধারণের পাশাপাশি আজীবন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল।

সমবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত বেগম রোকেয়া লিখেছিলেন পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। .... আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জর্জ সবই হইব। উপার্জন করিব না কেন?[৮]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিক্ষিত, স্বাধীন, স্বাবলম্বী মেয়ের যে স্বপ্ন রোকেয়া দেখেছিলেন শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে তাই সাকার করলেন এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা। শতাব্দীর শুরুতে অজ্ঞান, অশিক্ষা এবং অবরোধের অন্ধকার থেকে আলোর শিখরে এই যে ক্রমোত্তরণ — সেই জাগরণকে এখনই সম্পূর্ণ মনে করা ইতিহাস সচেতনতার পরিচায়ক নয়। কিন্তু একে আমরা জাগরণের স্বীকৃতি অবশ্যই দিতে পারি, যখন দেখি নব্বইয়ের দশকে পেশায় চিকিৎসক একজন বাঙালি মুসলমান মহিলা বলছেন : আমার বুদ্ধিবিদ্যা, ব্যক্তিত্ব

ও মনুষ্যত্বকে আমি সবচেয়ে মূল্যবান মনে করি। আমার অহঙ্কারকে আমি কখনো তুচ্ছ করি না। ... আমি যে পদক্ষেপ রচনা করি তা আমার নিজস্ব পদক্ষেপ। কারো নির্দেশিত বা প্রভাবিত পদক্ষেপ নয়। আমি যা ইচ্ছা করি তা আমার নিজস্ব ইচ্ছা, আমার স্বোপার্জিত স্বাধীনতা থেকে উৎপাদিত ইচ্ছা।[৯]

সূত্রনির্দেশ

১। Shaista Ikramullah : From Purdah to Parliament, London, 1963.

২। বেগম রোকেয়া ঃ অবরোধবাসিনী - ২৩

৩। ধূমকেতু, ২রা আশ্বিন ১৩২৯

৪। বাড়বানল, বিজলী ২রা চৈত্র, ১৩২৯

৫। আমাদের স্বরূপ, ধূমকেতু ২১শে আশ্বিন, ১৩২৯

৬। সদনুষ্ঠান, বিজলী, ৩০শে চৈত্র, ১৩২৯

৭। নবনুর, আশ্বিন ১৩১২

৮। স্ত্রীজাতির অবনতি : মতিচুর

৯। তসলিমা নাসরিন, নির্বাচিত কলাম, কোলকাতা ১৯৯২ পৃ. ৯২

উচ্চশিক্ষায় বাঙলার নারী - সামাজিক প্রেক্ষাপট

১৯৪১-১৯৫০

পীযূষ কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।

উচ্চ শিক্ষায় বাংলার নারীদের অংশগ্রহণ স্বভাবতই শুরু হয় বেথুন কলেজের জন্মের মধ্যে দিয়ে। এই প্রবন্ধে আমার আলোচনার বিষয় আলোচ্য কালখন্ড তার পরবর্তী দশ বছর অর্থাৎ ১৯৪১ থেকে ১৯৫০। এই দশ বছরের মধ্যে যে সব কলেজে বাংলার মেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ করে নিয়েছেন সেই সব কলেজের নিজস্ব নথিপত্রই আমার প্রধান উপাদান। ছাড়াও অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর কয়েকটি বছরের ক্যালেন্ডার দেখেছি।

১৮৭৯ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কালখণ্ডে লক্ষ্য করাই গিয়েছিল যে, সামাজিক বাধা নিষেধের নিগড় ভেঙে মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ ক্রমশ বেড়েছিল। ১৯৪১ থেকে ১৯৫০ এর কালখণ্ডেও এই অগ্রগতির গতিরোধ সাধারণভাবে হয়নি। যদিও ১৯৪২ সালে কলকাতার বোমাতংকের প্রভাব উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। তবু এই সংখ্যাতত্ত্ব অবশ্য উল্লেখ্য যে কেবলমাত্র এই আলোচ্য কালখণ্ডেই কেবলমাত্র মহিলাদের কলেজই আত্মপ্রকাশ করেছে নয়টি। সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ক্রমশই বেড়েছে। ১৯৪২ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী বাংলার অন্তত ১৯টি কলেজে সহশিক্ষা তখনই ছিল। ১৯৫০ সালে পৌছে এই সংখ্যা অবশ্যই অনেক বেড়েছিল। এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত আসামের দুটি কলেজে সহশিক্ষা ছিল। একটি আন্তর্জাতিক ও অন্তত একটি জাতীয় ঘটনা ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা যা আলোচ্য কালখণ্ডে ঘটেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ভারতভূমির দ্বিখণ্ডীকরণসহ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঘটনা প্রবাহ-এর নারীর উচ্চশিক্ষায় অংশ গ্রহণের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সালে য়ুরোপে শুরু হলেও এদেশের কলেজগুলিতে ছাত্রী ভরতির বা পঠনপাঠনের উপর তার প্রতিক্রিয়া তখনই কিছু অনুভূত হয়নি। ১৯৪২ সালে কলকাতায় বোমা পড়বে — এই ধারণার ছায়াপাত যেমন কলকাতার বহু সক্ষম পরিবারকে কলকাতার বাইরে বসবাসে বাধ্য করে তেমনি অন্তত একটি কলেজের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল বলে লক্ষ্য করা গেছে। গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ ১৯৪২ সালের গাড়ার দিকেই হাজারিবাগে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কলেজটি হাজারিবাগেই ছিল। ১৯৪৬ সালে আবার কলকাতায় ফিরে আসে। সে কারণেই দেখা যায় ১৯৪১-৪২ শিক্ষাবর্ষে ইন্টারমিডিয়েট পাঠক্রমে ১৯৪২ সালের ৩রা মার্চ থেকে

৮ই মে পর্যন্ত যে চার জন ছাত্রী ভরতি হয়েছিল তারা হাজারিবাগের বাসিন্দা। ঐ শিক্ষাবর্ষে ১লা জুলাই ১৯৪১ পর্যন্ত যে নয় জন ছাত্রী ভরতি হয়েছে তারা সবাই কলকাতার বাসিন্দা এবং এদের মধ্যে একজন যাদবপুর থেকে আসত। এই শিক্ষাবর্ষের হিন্দু দুজন আবার বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত। ১৯৪২-৪৩, ৪৩-৪৪ এবং ৪৪-৪৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীরা সকলেই হাজারিবাগের ছাত্রী যদিও এদের মধ্যে ৪২-৪৩ শিক্ষাবর্ষের মাত্র এক জন ব্রাহ্ম বাদে বাকি সব ছাত্রীই এসেছে হিন্দু পরিবার থেকে। গোখেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সরলাবালা রায় তাঁদের হাজারিবাগের বাড়িতেই কলেজটিকে কলকাতা থেকে স্থানান্তর করে নিয়ে গিয়েছিলেন বোমার হাত থেকে বাঁচাতে। এই কলেজের ছাত্রীদের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগষ্ট পর্যন্ত ভরতি হওয়া ছাত্রীদের মধ্যে পূর্বেই উল্লেখিত হাজারিবাগের ছাত্রীটি ছাড়া ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষের একজন মাত্র ছাত্রী ব্রাহ্ম। এবাদে বাকি সব ছাত্রীরাই হিন্দু এবং এদের মধ্যে বেশ ভালো সংখ্যক ছাত্রী ব্রাহ্মণ পরিবার থেকেও আগত। সুতরাং উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের প্রথম দিকে যেমন ব্রাহ্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছাত্রীদের প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল সেই চিত্রটা ক্রমশই বিপরীত হতে দেখা যাচ্ছে। এই চিত্র অন্য কলেজেও প্রায় একই। যদি ও প্রধানত চাকুরীজীবী এবং শহরের অভিভাবকরা এ বিষয়ে বেশি আগ্রহী হয়েছে কিন্তু এই কালখণ্ডে মফস্বল অঞ্চলে তো বটেই কলকাতা থেকে বেশ অনেক দূরবর্তী স্থানেও কলেজ স্থাপন এবং সেখানে ছাত্রীদের পঠন পাঠনের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে ক্রমশ নারী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও বাড়ছিল। এর একটা কারণ, জমি থেকে আয়ের উৎস পরিবর্তিত হয়ে চাকুরীজীবী হওয়ায় পুরানো মানসিক গোঁড়ামিও অনেক অপসারিত হয়ে যায় — যেতে বাধ্য হয় চাকরীর কারণে। আবার অপর কারণ মহাযুদ্ধ ও দেশীয় রাজনীতির ৪০ এর দশকের চঞ্চলতা, — সব মিলে আর্থিক চাপও বাড়ে। বাড়ে জীবনের নিরাপত্তার কিছুটা অভাব এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সামাজিক সচেতনতাও। সুতরাং ক্রমশ একটা ধারণা জন্ম নিতে থাকে যে মেয়েরা একেবারেই গৃহের অন্ধকূপে চিরদিন আবদ্ধ থেকে যেতে পারবে না। স্বল্প সংখ্যায় হলেও মেয়েরা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেছিল। বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশে অনেক দিন ধরেই এদের কেউ কেউ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। সুতরাং মেয়েদের মধ্যে পাঠিকা ও লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি কতকটা অনিবার্য ছিল।

৪২ সালে কলকাতার বোমাতংক গোখেল কলেজকে স্থানান্তরিতই শুধু করেনি সব কলেজের ক্ষেত্রেই ছাত্রী ভরতির সংখ্যার হ্রাস ঘটিয়েছিল। এমনকি গোখেলও এই তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। গোখেল ১৯৪১-৪২ শিক্ষাবর্ষে ভরতি হয়েছিল ১৩ জন,

৪২-৪৩ শিক্ষাবর্ষে মাত্র ৪ জন, ১৯৪৩-৪৪-এ ৭ জন, ১৯৪৪-৪৫ এ মাত্র ২ জন, ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষে ৪ জন, ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে কলেজ পুনরায় কলকাতায় ফিরে এলে এর ছাত্রী ভরতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ জনে, ১৯৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষে হয় ২৮ জন, ৪৮-৪৯এ ৩৬ জন, ১৯৪৯-৫০ সালে ৩০ জন ছাত্রী ইন্টারমিডিয়েটে ভরতি হয়েছিল। লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজেও দেখা যায় ক্রমবর্ধমান ছাত্রী ভরতির তালিকায় সবচেয়ে কম ছাত্রী ভরতি হয়েছে ১৯৪২ সালে। ১৯৪৯ এর ২০৫ জন ছাত্রীর মধ্যে কলা বিভাগে পড়েছে ১৩৩ জন, বিজ্ঞান বিভাগে পড়েছে ৭২ জন ছাত্রী। ১৯৫০ সালে কলা বিভাগে ১০৮ এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৬৫ জন ছাত্রী ভরতি হয়েছিল। ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রীদের স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগই মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়ের। মোট ৭৮ জন হিন্দু ছাত্রী পড়েছে ১৯৪১ সালে, এবং এদের সামাজিক অবস্থান প্রধানতই চাকুরীজীবী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার; দুজন ছাত্রী অভিভাবকমাত্র জমির সঙ্গে সম্পর্কিত। সামান্য ৪ জন মতো ছাত্রীর অভিভাবক ব্যবসায়ী, একজন শিক্ষক এবং রোশানারা আহমেদ এর অভিভাবক আজিজুল হক সি.আই.ই. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলির অধ্যক্ষ। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পারিবারিক অবস্থানের ক্ষেত্রে এই ধারাই অব্যাহত থেকেছে। যদিও ধর্মের ক্ষেত্রে চিত্রটি ক্রমেই বিপরীত হয়েছে। হিন্দু ছাত্রীদের সংখ্যার ক্রমোন্নতি ঘটতে ঘটতে তারাই মুখ্য ছাত্রীদলে পরিণত হয়েছে। মুসলিম ধর্মাবলম্বী ছাত্রী সংখ্যা কমতে কমতে ১৯৪৮ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ জনে (১৮৯ জন মোট ছাত্রী) ১৯৪৯ সালে কলা বিভাগে ১২ জন (১৩৩ জনের মধ্যে) এবং বিজ্ঞান বিভাগে ২ জন মাত্র (৭২ জনের মধ্যে) এবং বিজ্ঞান বিভাগে একজনও নয়। (৬৫ জনের মধ্যে) অথচ ১৯৪৭ সালেও এই কলেজে ভরতি হয়েছে ৩০ জন মুসলিম ছাত্রী। (১২২ জনের মধ্যে)। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে দেশবিভাগের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রী ভরতির মধ্যে স্পষ্ট।

মিশনারিদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কলেজ লোরেটো কলেজের ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও এই সময় একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন অবশ্যই উল্লেখ্য। ১৯৪১ সালে পিতা মাতা উভয়েই ইংরেজ এরূপ ছাত্রী ভরতির সংখ্যা ছিল ২৯ জন যখন মোট ভরতির সংখ্যা ৪৯ জন। ১৯৪২ সালে ঐ সংখ্যা ১৪ জন মোট ভরতি হয়েছিল ২৩ জন। ১৯৪৩ সালে মোট ৩৫টি ছাত্রী ভরতি হয়েছে সেখানে পুরোপুরি ইংরেজ ছাত্রীর সংখ্যা ৬ জন। ১৯৪৪ সালে মোট ছাত্রী ভরতির সংখ্যা ৫৫ জন ঐ প্রকার ছাত্রীর সংখ্যা ১৮ জন। ১৯৪৫ সালে পিতা মাতা উভয়েই ইংরেজ এরূপ ছাত্রীর সংখ্যা ১০ জন যদিও মোট ভরতির সংখ্যা ঐ বছরে ৪৭ জন। ১৯৪৬ সালেও এই রকম পুরোপুরি ইংরাজ ছাত্রী ভরতি হয়েছে ১১ জন মোট ৪৫ জনের মধ্যে, ১৯৪৭ সালেও মোট

ভরতি হওয়া ছাত্রীর সংখ্যা ৫৩ জনের মধ্যে ১১ জন ছাত্রীর পিতা মাতা উভয়েই ইংরাজ। কিন্তু ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫০ সালে লরেটো কলেজে পিতা মাতা উভয়েই ইংরাজ এরূপ ছাত্রী একজনও ভরতি হয়নি। যদিও ১৯৪৮ সালে ভরতি হয়েছে ৭৩ জন, ১৯৪৯ সালে ৫৯জন এবং ১৯৫০ সালে ৭৪ জন ছাত্রী। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের আগষ্টে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যেসব ইংরেজ রাজকর্মচারী এদেশে শাসন কাজে এসেছিলেন তাঁরা ভারতভূমি ত্যাগ করেছেন। প্রসঙ্গত নিশ্চয় লক্ষণীয় ১৯৪২ সালের কলকাতার বোমাতংকের ফলে ছাত্রী ভরতির সংখ্যা হ্রাস থেকে লরেটোও বাদ পড়েনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে লরেটো কলেজ ছাত্রী ভরতির ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিল আলোচ্য কালখণ্ডেও সেই চরিত্র আরও দৃঢ়তর ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে যে নতুন কলেজগুলি মেয়েদের পঠন পাঠনের জন্য তৈরি হয় তারমধ্যে কলকাতার মুরলীধর গার্লস কলেজ এবং মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের প্রসঙ্গ কেবলমাত্র আলোচনা করবো দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিসাবে। মুরলীধর গার্লস কলেজ কার্যত স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে তার কাজ শুরু করে ৮ই জুলাই ১৯৪০ সাল থেকে বালিগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের প্রসারিত শাখা হিসাবে, তারই গৃহে। মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বালিগঞ্জ গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। পরিচালন সমিতি এবং এলাকার বাসিন্দা কয়েকজন অধ্যাপক উদ্যোগী হয়ে ঐ স্কুলের সঙ্গেই দুটি স্কুলকে সঙ্গে নিয়ে পরবর্তী কলেজের প্রথম ধাপের ক্লাশ শুরু করেন বিদ্যালয় পরিদর্শকের সমর্থন নিয়ে স্কুল গৃহে প্রাতঃকালে। অধ্যাপকরা বিনা বেতনে স্বেচ্ছায় এখানে পড়াতেন এবং কলেজ পরিচালনার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা দিতে এলাকার মানুষ। তাঁদের দানে ও সহযোগিতায় এই কলেজের ছাত্রীদের পঠন পাঠনের কাজ চলে কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। ১৯৪২ সালে বোমাতংকে কলকাতার বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলো কলকাতা ত্যাগ করলে স্বভাবতই এই কলেজটি খুবই সংকটে পড়ে। কিন্তু ৬টি ছাত্রীর পঠন পাঠন কোনক্রমে দু'চারজন অধ্যাপকের ঐকান্তিক যত্ন ও নিষ্ঠাকে মূলধন করে অব্যাহত থাকে। তাঁদের প্রাপ্তি ছিল কেবলমাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার ভালো ফল। বোমাতংকের অবসানের পর কলকাতার মানুষজন কলকাতায় ফিরে এলে ১৯৪৪ সালে এলাকার জনগণ কলেজটির প্রতি সযত্ন সচেতনতার পরিচয় দিয়ে অর্থ সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমে ১৯,০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। স্থায়ী কলেজ ফান্ড হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী প্রয়োজন ছিল ১৫,০০০ টাকা। বাকি টাকাও ধার হিসাবে সংগৃহীত হয় ফলে ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বাড়ির মালিকও বাড়িটির তিনতলা তোলার

অনুমতি দেন কলেজ বিভাগে জন্য। সুতরাং কলেজ প্রাতঃকালের পরিবর্তে দিবা কলেজ হিসাবেই শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শুভোময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১০,০০০ টাকা বিদ্যালয় ও কলেজকে দান করলে ৪০০০্ টাকার ধার পরিশোধ করে বাকি ৬০০০্ টাকা বিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হয়। তাতে কলেজের আর্থিক সংকট অনেকাংশে মোচন হয়। ১৮৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষে মুরলীধর গার্লস কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে বি. এ. (পাশ) কলেজ হিসাবে অনুমোদন পায়। এ কলেজের জন্ম বৃত্তান্তের মধ্যেই পরিষ্কার হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির ইঙ্গিত। যদিও এই কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রথম যুগের ছাত্রী ভরতির কোনো কাগজপত্র পাওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু অধ্যক্ষার প্রচেষ্টায় পাওয়া গেছে প্রথম যুগের এক ছাত্রীর স্মৃতিচারণ। সেই সূত্রে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে মুরলীধর গার্লর্স স্কুল থেকে যে ছাত্রীরা ভালো করতো ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সহ-অধ্যক্ষ ভোলানাথ ঘোষ তাদের অনেকরই বাড়ীতে গিয়ে ঐ কলেজে ভরতির জন্য অনুরোধ করতেন। এই স্মৃতিচারণার লেখিকা শ্রীমতী অমিতা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)-র ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তিনি ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৪৬ সালে মুরলীধর গার্লস কলেজ থেকে আই.এ. ও ১৯৪৮ সালে বি.এ. পাশ করেন। শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে তাঁর বছরের ও তার পরের বছরের কয়েকজন ছাত্রীর নামোল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ছাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই আমরা এসেছিলাম মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, অবস্থাপন্ন পরিবারের অবশ্য অল্প সংখ্যক ছিল।" এই স্মৃতিকথা সূত্রে এও জানা যায় যে মুরলীধর গার্লস কলেজের ছাত্রীরা ১৯৪৮ সালে কলেজের গৃহ নির্মাণ এবং পাঠাগারের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষের পরিচালনায় দক্ষিণ কলকাতার কালিকা থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করে"।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, নারীর উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ, নারীকে কেবলমাত্র নারী নয় মানুষ হিসাবে এই সামাজিক স্বীকৃতি শুধু কলকাতা শহরেরই ঘটনা। সুদূর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে কেবলমাত্র মেয়েদের জন্যই স্থাপিত হয়েছিল বহরমপুর গার্লস কলেজ ১৯৪৬ সালের ২৪শে জানুয়ারি। এছাড়া নৈহাটীর মতো মফঃস্বল শহরেও ১৯৪৭ সালের ২রা নভেম্বর নৈহাটী মহেন্দ্র উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে তদানীন্তন মহকুমা শাসক আর. ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় নৈহাটীতে ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নৈহাটী ভাটপাড়া অঞ্চলের মানুষের কাছে অর্থ সংগ্রহ করেই এই কলেজেরও গোড়া পত্তন হয়। কলেজ এর নিজস্ব বাড়ি তৈরি না হওয়ায় মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে সন্ধ্যাবেলায় কলেজের ক্লাস করার অনুমতি দেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ১৯৪৮ সালের ৯ই জানুয়ারি

কলেজের উদ্বোধন এবং সম্ভবত ১২ই জানুয়ারি পঠন পাঠন শুরু হয় অবশ্য প্রথমে ২৮ জন ছাত্রকে নিয়ে। কিন্তু অচিরেই কলেজ নিজস্ব জমি কিনে বাড়ি করে সেখানে চলে যায় ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৯৪৮ সালেই মধ্যন্দিন শাখা আই.এ এবং আই.কম পড়ানোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। "১৯৪৮ সালে মধ্যন্দিন শাখায় ১৩০ জন এবং সায়ন্তন শাখায় ১৫৫ জন ভরতি হলো। দিনের বেলা ২৩ জন ছাত্রীও যোগদান করলো।" কলেজসম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য— শ্রী পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৯৭২-৭৩)। ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজ কর্তৃপক্ষও তাঁদের প্রথম যুগের ছাত্রভরতির কাগজপত্র দিতে না পারলেও তাঁদের রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত উল্লেখিত প্রবন্ধটি থেকে জানা যায় ১৯৪৯ সালে ঐ কলেজের মধ্যন্দিন শাখায় ছাত্রী ভরতি হয়েছিল ২৭ জন।

এই কলেজের ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিষয়েও যতটুকু জানা যায় তাহচ্ছে প্রধানত মধ্যবিত্ত এবং চাকুরীজীবী পরিবার থেকেই এই কলেজের ছাত্রীরা এসেছিল। একটি বিষয়ে বিশেষ করেই লক্ষণীয় যে কলকাতা থেকে মাইল কুড়ি দূরবর্তী এই মফস্বল শহরে নবজন্মপ্রাপ্ত কলেজ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সহশিক্ষার প্রবর্তন করতে পেরেছিল। এথেকে এটা স্পষ্ট যে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন জনমানসে অনুভূত হয়েছে। ফলেই সহশিক্ষার বিষয়েও হিন্দু পরিবারগুলি মানসিক বাধা ক্রমশই দূরীভূত হতে শুরু করেছে।

এরই ফলশ্রুতির প্রমাণ মেলে খোদ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসে। গত বছরেব আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৮৯৭ সালে এফ.এ. ক্লাশে দুটি ছাত্রীকে ভরতি করা নিয়ে সমগ্র বাংলা দেশ এবং সরকারি প্রশাসন পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে যায় এবং পত্রিকাগুলির বিরোধিতা এবং জন সমর্থনের অভাবে শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐ দুটি ছাত্রীর শিক্ষার্থী জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সহশিক্ষা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ৪০-এর দশকের পরিবর্তিত মানসিকতার পরিবেশে সহজেই প্রেসিডেন্সী কলেজে পুনরায় প্রবর্তিত হয় সহশিক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষে বি. এ. ক্লাশে ইংরাজি সাম্মানিক বিষয় নিয়ে ভরতি হয় একজন ছাত্রী কিন্তু ঐ বছরেই বি.এস.সি. কোর্সে ভরতি হয়েছে ৯ জন ছাত্রী। এদের মধ্যে উদ্ভিদ বিদ্যায় পড়েছে ৩ জন, পদার্থবিদ্যায় পড়েছে ৩ জন, এদের একজন ব্রাহ্ম বাকি সকলেই হিন্দু। ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে কলা বিভাগে পড়েছে ৮ জন ছাত্রী।

১৯৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষে কলা বিভাগে যারা পড়েছে তাদের মধ্যে অর্থনীতিতে ২ জন

যাদের ১ জন ব্রাহ্ম, ইতিহাসে ২ জন যাদের মধ্যে ১ জন মুসলিম, ভূগোলে ১ জন, দর্শনে ১ জন সাম্মানিক পড়েছে। ঐ বছরই বিজ্ঞান বিভাগে পড়েছে ৮ জন যাদের ২জন পড়েছে উদ্ভিদবিদ্যা, ১ জন পদার্থবিদ্যা, ১জন রসায়ন, ৪ জন শারীরবিদ্যা। ১৯৪৮-৪৯ সালে কলা বিভাগের ছাত্রী ১৪ জন এদের মধ্যে দর্শন নিয়েছে ২ জন, ইতিহাসে ৫ জন, অর্থনীতি ৪ জন, বাংলা ১ জন, ইংরেজি ২ জন ঐ বছরই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ১০ জন যাদের মধ্যে উদ্ভিদ বিদ্যা ৩ জন, রসায়নে ২ জন, শারীরবিদ্যায় ৩ জন, গণিতে ২জন। ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীরা কলেজকে এনে দিয়েছে অনেকগুলি সম্মান। ইতিহাসে সাম্মানিকের ছাত্রী শিপ্রা সরকার দখল করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থানটি। উদ্ভিদবিদ্যার দুই ছাত্রী দখল করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি স্থানই। প্রথম হয়েছে সন্ধ্যা ঘোষ, দ্বিতীয় হয়েছে সুমিত্রা তালকুদার।১৯৪৯-৫০ শিক্ষাবর্ষে কলা বিভাগের ছাত্রী ১৮ জন। এদের মধ্যে ইতিহাস ২জন, বাংলা পড়েছে ৩ জন, দর্শন ৫ জন, ভূগোল ১ জন, অর্থনীতি ৫ জন, ইংরেজি ১ জন, সংস্কৃত সাম্মানিক পড়েছে ১ জন। ঐ বছরের বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রীর মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যা সাম্মানিক পড়েছে ২ জন, পদার্থ বিদ্যা ২ জন, শারীরবিদ্যা ২ জন, ভূগোল ১ জন, গণিত ১ জন। এই বছরে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীরা কোন স্থানে দখল করতে না পারলেও কলা বিভাগের ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীলা মহালানবিশ ছিনিয়ে এনেছিল দর্শন-সাম্মানিকের প্রথম স্থানটি। ১৯৫০ সালের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের একমাত্র মুসলিম ছাত্রীটির নাম কানিজা ফতিমা মেসুদা।

১৯৪১ থেকে ১৯৫০ এই কালখণ্ডের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪২ সালের ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রীদের যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাও নিতান্ত নগণ্য নয়। এবং এটা স্পষ্টই বোঝায় যায় যে এই সংখ্যা সর্বত্রই প্রধানত উর্ধ্বমুখীই থেকেছে। এই সূত্র থেকে এটাও লক্ষণীয় যে শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত কলেজগুলিতেও ১৯৪১-৪২ সালেই ছাত্রী সংখ্যা মোটেই কলকাতার কলেজগুলির তুলনায় খারাপ নয়। যেমন বহরমপুর শহরের কৃষ্ণনাথ কলেজে ১৯৪১ সালের ১৫ই নভেম্বর-এর ছাত্রী সংখ্যা শ্রেণী অনুযায়ী কলা বিভাগে — ১ম বর্ষে ৭ জন, ২য় বর্ষে ১১, ৩য় বর্ষে ৮ ও ৪র্থ বর্ষে ২ জন। যদিও ঐ একই দিনে ছাত্ররা বিজ্ঞান বিভাগেও ঐ কলেজে পড়াশুনা করেছে কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগে কোন ছাত্রী ছিল না। চিটাগাং কলেজের ছাত্রী সংখ্যা বর্ষ বা শ্রেণী হিসাবে না পাওয়া গেলেও বর্তমানে এই কলেজে ৩১ জন ছাত্রী আছে — একথা স্পষ্ট করেই উল্লেখিত। সেই ধারা যে অব্যাহত ছিল তাও স্পষ্ট হবে এবছরের সংখ্যা থেকে ১৯৩৯-৪০, শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ আই.এ. শ্রেণীর ছাত্রী সংখ্যা ৪১ জন, ২য় বর্ষ আই. এ. তে

৬২, ১ম বর্ষ আই.এস.সি. ৮, ২য় বর্ষ আই.এস.সি. ২০, ৩য় বর্ষ বি.এ. তে ২০, ৪র্থ বি.এ. তে ৫৫, ৩য় বর্ষ বি.এস.সি. তে ১২ ও ৪র্থ বর্ষ বি.এস.সি. তে ১০ জন ছাত্রী পড়েছে। রাজসাহী কলেজের ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা জানা না গেলেও সকল শ্রেণীতে ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরা পড়েছে সে তথ্য জানা যাচ্ছে। বর্ধমান রাজ কলেজে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ১ম বর্ষ আই.এ. শ্রেণীতে ৪ জন ছাত্রী পড়েছে এবং ৩য় বর্ষ বি.এ. শ্রেণীতে ৩ জন ছাত্রী ছাত্রদের সঙ্গে পড়েছে। বেথুন কলেজে ১৯৪১ সালের ৩১ শে জুলাই-এ ১ম বর্ষ আই.এ.তে. পড়েছে ১১৭ জন, ২য় বর্ষ আই.এ.তে ১০৫ জন, ১ম বর্ষ আই.এস.সি.তে ১৬ জন, ২য় বর্ষ আই.এস.সি.তে ১৭ জন, ৩য় বর্ষ বি.এ.তে ৫৮ জন, ৩য় বি.এ. সাম্মানিক শ্রেণীতে পড়েছে ১৪ জন, ৪র্থ বর্ষ বি.এ.তে ৪৭ জন, ৪র্থ বর্ষ বি.এ. সাম্মানিক শ্রেণীতে পড়েছে ২৪ জন ছাত্রী। অর্থাৎ মোট ছাত্রী সংখ্যা ৩৯৮ জন ছাত্রী।

অধুনা পূর্ববঙ্গে তদানীন্তন বাংলার এক ঐতিহ্যময় কলেজ বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাঁকে বরিশালের মুকুটহীন রাজা বলা হত সেই আশ্বিনী কুমার দত্ত তাঁর পিতার নামাংকিত ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। ব্রজমোহন কলেজে ১৯৪০ সালের ৩১ আগষ্ট দিনাংকে এই কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে যে সংখ্যায় ছাত্রীরা পড়েছে তা হ'ল — ১ম বর্ষ আই.এ.তে. ২৭ জন, ২য় বর্ষ আই.এ.তে. ২০, ১ম বর্ষ আই.এস.সি.তে ৬ জন, ২য় বর্ষ আই.এস.সি. তে ৩জন, ৩য় বর্ষ বি.এ. তে ১৪ জন, ৪র্থ বর্ষ বি.এ. তে ১৬ জন, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ বি.এস.সি. তে ছাত্রী ছিল না। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের মত অধুনা ওপার বাংলায় তদানীন্তন ময়মনসিং জেলায় ছিল আনন্দমোহন কলেজ ১৯০৮ সালের জুন মাসে কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। সেই কলেজে ১৯৪১ সালের ১৫ই আগষ্ট দিনাংকে ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরা পড়েছে শুধু কলা বিভাগে। বিজ্ঞান বিভাগের কোন শ্রেণীতেই ১৯৪১ সালে অন্তত মেয়েরা এই কলেজে পড়েনি। কলা বিভাগের মধ্যে ১ম বর্ষ আই.এ.-র ছাত্রী সংখ্যা ২৩ জন, ২য় বর্ষ আই.এ.তে ২৫ জন, ৩য় বর্ষ বি.এ.তে ছাত্রী সংখ্যা ২১, ৪র্থ বর্ষ বি. এ. তে ৫ জন।

কলকাতার ভবানীপুরের আশুতোষ কলেজের ছাত্রী সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট ভালো। এই কলেজে ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪১ দিনাংকে ১ম বর্ষ আই.এ.তে ছাত্রী ছিল ১৪৮ জন, ১ম বর্ষ আই.এস.সি.তে ৩০ জন, ২য় বষয় আই.তে ১৪৭ জন, ২য় বর্ষ আই.এস.সি.তে. ৩০ জন, ৩য় বর্ষ বি.এ. তে ১০৯, ৩য় বর্ষ বি.এস.সি. তে ৮, ৪র্থ বর্ষ বি.এ.তে ৯৬ এবং ৪র্থ বর্ষ বি.এস.সি.তে ৭ জন ছাত্রী পড়েছে। রংপুর জেলার কারমাইকেল কলেজের ছাত্র সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও স্পষ্ট করেই এটুকু জানা যায় যে, এই

কলেজের আই.এ. ও বি.এ. শ্রেণীতে ছাত্রীরা ভরতি হত এবং আই.এ. শ্রেণীতে উদ্ভিদ তত্ত্ব বিষয়টিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ছাত্রীদের নিতে দেওয়া হত। ফরিদপুর জেলার রাজেন্দ্র কলেজে ১৯৪২ সালে মোট ছাত্রী সংখ্যা ১৩ জন। ১ম বর্ষ আই.এ. শ্রেণীতে ৩ জন, ২য় বর্ষ আই.এ.তে ৪ জন, ১ম বর্ষ আই.এস.সি.তে ১ জন, ২য় বর্ষ আই.এস.সি.তে কোন ছাত্রী ছিল না, ৪র্থ বর্ষ বি.এ.তে ছিল ১জন ছাত্রী, ৩য় বর্ষ বি.এ.তে ছিল ৪ জন ছাত্রী। এখানে বি.এ.তে ছাত্রীদের সম্মানিক পাঠক্রম পড়ার ব্যবস্থাও ছিল এবং তারা তা পড়তোও। নোওয়াখালি জেলার ফেনী কলেজে মোট ৮জন ছাত্রী পড়েছে ১৯৪১-৪২ শিক্ষাবর্ষে। কলকাতার লা মার্টিনিয়ার কলেজে ১৯৪২ সালে আই.এ. শ্রেণীতে পড়েছে ৩ জন ছাত্রী ও ২ জন ছাত্র এবং আই.এস.সি.তে ১ জন ছাত্রী ও ১০ জন ছাত্র। কালিম্পঙ-এর স্কটিশ ইউনিভার্সিটিস্ মিশন কলেজেও মেয়েরা পড়তো। যদিও তার নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যাচ্ছে না। কার্শিয়াং-এর সেন্ট হেলেনস্ কলেজেও মেয়েরা পড়তো।

সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ দিনাংকে মোট ছাত্রী সংখ্যা ৭২ জন। এদের মধ্যে ১ম বর্ষে ৩৪ জন ও ২য় বর্ষে ৩৮ জন ছাত্রী পড়তো। লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রীদের বিষয়েও আগে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বরিশাল জেলার দি ফজলুল হক কলেজেও ছাত্রীরা ঐ সময়েই পড়াশুনা করেছে। যশোর কলেজ যেটি ১৯৪১ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েছিল সেখানেও ৪জন ছাত্রী শুধু পড়তো তাই নয় লক্ষ্য করার বিষয়ে এদের মধ্যে ১ জন ছাত্রী মুসলিম এবং সেও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গেই বিদ্যা চর্চা করতো। ১৯৪১ সালেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায় শিলেট টাউনের উইমেন্স কলেজ। এই কলেজে ১ম বর্ষের ছাত্রী সংখ্যা ১৭ এবং ২য় বর্ষে ছাত্রী সংখ্যা ৩৮। এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪২ সালের ক্যালেণ্ডারে কলকাতার উইমেন্স কলেজ, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশান, — এই কেবলমাত্র মেয়েদের কলেজগুলির ছাত্রী সংখ্যা উল্লেখিত না থাকায় এই কলেজগুলিতে কতজন মেয়ে সে সময় পড়েছে তা জানা যাচ্ছে না। তেমনি একটা বড় অংশের কলেজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সংখ্যার ক্ষেত্রে তারা সকলেই ছাত্র না ঐ সংখ্যার মধ্যে ছাত্রীরাও আছে সে বিষয়ে কোন তথ্য উল্লেখিত না থাকায় সেই কলেজগুলির মধ্যে কোন কলেজে সহশিক্ষা ছিল কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

এই কালখণ্ডের পুর্ববর্তী দশ বছরের আলোচ্য অংশের সঙ্গে যে ধারাটি একই ভাবে প্রবাহমান তা হচ্ছে ছাত্রীদের সাফল্য। ছাত্রীরা তাদের যোগ্যতা দিয়েই এই রক্ষণশীল সমাজের বুকে উচ্চশিক্ষার পথ কেটে নিয়েছিল। সূচনা পর্বের সেই ধারা তারা অব্যাহত

রেখেছে অন্তত ১৯৫০ সাল পর্যন্ত — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সার্বিকভাবেই তারা পরীক্ষার ফল ভালো করেছে। অন্যান্য কলেজগুলোর পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে মেয়েদের মধ্যে অকৃতকার্যের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে বেশই কম। শুধু তাই নয় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ-এর আনুপাতিক হারও যথেষ্ঠ ভালো। অনেক সামাজিক, পারিবারিক, মানসিক বাধার পাহাড় ঠেলে যে মেয়েরা উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে পৌছতে পেরেছিল তারা তাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখতেও পেরেছিল। তাদের সাফল্যও অনেকাংশে ভবিষ্যতের নারীর অগ্রগতির পথকে সুগম করার ক্ষেত্রে আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে অন্তত সহায়ক হিসাবে নিঃসন্দেহে কাজ করেছে।

১৯৫০ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজিতে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে ৬ জন, তৃতীয় বিভাগে ৪ জন। সংস্কৃতের প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটিও দখল করেছে চিন্ময়ী পাঠক, ঐ বিভাগেই ষষ্ঠ স্থানাধিকারিনী ভারতী সান্যাল। বাংলায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ২০ জন ছাত্রী পাশ করেছে। হিন্দির প্রথম শ্রেণীর ২য় স্থানটি দখল ক রেছে নির্মল তলওয়ার নামের ছাত্রীটি যদিও যে নন-কলিজিয়েট ছাত্রী হিসাবে পরীক্ষা দিয়েছিল। এছাড়া ২য় শ্রেণীতে পাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনিমা ধর। ইতিহাস-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানটি লাভ করেছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রী উমারানি সেন, দ্বিতীয় বিভাগে ৯ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৮ জন ছাত্রী পাশ করেছে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়েও প্রথম বিভাগের প্রথম স্থানটি দখল করে নিয়েছে বেলা চৌধুরী (শ্রীমতী লাহিড়ী) নন-কলিজিয়েট ছাত্রী হিসাবে। এছাড়াও আরও ৩ জন ছাত্রী পাশ করেছে তৃতীয় বিভাগে। ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন ছাত্রী নব-কলিজিয়েট ছাত্রী হিসাবে পাশ করেছে। দর্শনে এম.এ. পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানটি শুধু নন-কলিজিয়েট হিসাবে পরীক্ষার্থী রাজলক্ষ্মী দেবী দখল করেনি প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানটিই যুক্তভাবে একটি ছাত্রের সঙ্গে দখল করেছে শকুন্তলা মহান্তী নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এছাড়া দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম স্থানটিও দখল করেছে অনিমা চক্রবর্তী এবং মোট ৮ জন ছাত্রী এই বিভাগে ও ৪জন ছাত্রী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। পলিটিক্স (নূতন পাঠক্রম) বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩ জন তৃতীয় শ্রেণীতে ২ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থনীতি (নূতন পাঠক্রম) বিষয়েও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩ জন ছাত্রী পাশ করেছে। ফলিত গণিত-এর মতো বিষয়েও মেয়েরা সে যুগেই বেছিয়ে থাকেনি। দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন ও তৃতীয় বিভাগেও ১ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। অবশ্য এরা দুজনেই কলা বিভাগের ছাত্রী। মনঃস্বত্ব বিষয়েও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেছে ৪ জন ছাত্রী। উদ্ভিদতত্ত্বে তো প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দুজন এবং ২ জনই মহিলা দীপ্তি

ভট্টাচার্য ও মাধুরী দত্ত এবং এরা দুজনেই বিজ্ঞানের ছাত্রী। এছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন ছাত্রী পাশ করেছে সেও বিজ্ঞান শাখাতেই পড়াশুনা করেছে। ভূগোল বিষয়েও ১৯৫০ সালে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের দ্বিতীয় স্থানটি দখল করেছিল মায়া দত্ত বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্রী। এছাড়া দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম স্থানটি যৌথভাবে অধিকার করে নিয়েছিল একটি ছাত্রী।

১৯৫১ সালের এম.এ. পরীক্ষার ফলাফল দেখলেও ছাত্রীদের সাফল্যের ধারা যে অব্যাহত ছিল তা বোঝা যায়। বাঙলার মেয়েরা যে শুধু বহু বাধা অতিক্রম করে উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাই নয় তার পাশাপাশি প্রথমাবধিই নানা সামাজিক, রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনও করেছে। নিজেরা অভিনয় করে নিজেদের কলেজ নির্মাণের অর্থ সংগ্রহের চেষ্টার মধ্যে একদিকে যেমন সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরির পরিচয় মেলে অপর দিকে তা আত্মবিশ্বাসের প্রমাণও বটে বেথুন কলেজ যেমন প্রথম বাঙলার নারীর উচ্চশিক্ষার অঙ্গন তেমনই আবার সেখানকার ছাত্রীরাই উত্তাল স্বাধীনতা আন্দোলনের রাইফেল বন্দুকও কাঁধে তুলে নিয়েছিল — সরলা দেবী ঘোষাল থেকে প্রীতিলতা, বীণা দাস, কল্পনা দত্তদের কথা আগের বছরের পর্বেই আলোচিত। ১৯৪০-৪১ সালের আর একটি ক্ষেত্রেও প্রথম বাঙালি মহিলারা অংশগ্রহণের সঙ্গে বেথুন কলেজ জড়িত। বেথুন স্কুল ও কলেজের ছাত্রী ইলা সেন (মিত্র) 'ভারতীয় অলিম্পিকে' অংশগ্রহণকারি প্রথম বাঙালি মেয়ে, ১৯৪০-৪১ এ আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টনে সে চ্যাম্পিয়ান হয়। সে অ্যাথলেট হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে। যদিও তার আরও বড় পরিচয় রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে। ১৯৪০ সালে বেথুন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৪২ সালে বেথুন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগেই আই.এ. পাশ করে। তারপর বাংলা অনার্স নিয়ে উইমেন্স কলেজে ভরতি হয়ে বি.এ. পাশ করে। মালদহের রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্বামী স্ত্রী উভয়েই দেশের কাজে নামে। ১৯৪৭ এর দেশভাগে তাঁর শ্বশুরবাড়ি রামচন্দ্রপুর সমেত নবাবগঞ্জ সাবডিভিশান পূর্ব পাকিস্থানে রাজশাহীতে পড়ে। তাঁরা দুজনে রাজশাহীতে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ইলা মিত্র সেখানে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করার অপরাধে পাক পুলিশের গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় তার নাম উঠে। পুলিশের চোখে ৩ বছর ধরে ধুলো দিয়ে সে সংগঠনের কাজ করে। অবশেষে ১৯৫০ সালে ধরা পড়ে অকথ্য পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়। তাকে নিয়ে কবি গোলাম কুদ্দুস 'ইলা মিত্র' নামেই কবিতা লেখেন—তার ইস্পাত কার্বন ব্যক্তিত্বকে কবি অভিনন্দিত করেন। ইলা মিত্রের যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হয়। পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্যারোলে মুক্ত হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যাও নির্বাচিত হয়। বেথুন কলেজের আর এক ছাত্রী পূরবী

মুখোপাধ্যায় ১৯৪২ সালে আই.এ. পাশ করে। সেও ভবিষ্যতে প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভার কারা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হয়। ১৯৪০ সালে আভা মাইতি বেথুন কলেজে আই.এ. ক্লাশে ভরতি হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. আভা মাইতি ছাত্র জীবন থেকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভার সদস্যা আভা মাইতি প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভার উদ্বাস্তু সাহায্য-ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী। আভা মাইতি ১৯৭৭ সালে মোরারজী দেশাই সরকারের শিল্প মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রীও।

সুতরাং পড়াশুনা, খেলাধূলা, রাজনীতি, সমাজকল্যাণমূলক কাজ — সর্বক্ষেত্রেই বাঙালি মেয়েরা কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। এ সবেরই স্বাভাবতই মূলে ছিল উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের কঠোর কঠিন আন্দোলনের ইতিহাস। কারণ নারীর আপনভাগ্য জয় করার প্রচেষ্টার পথ কোথাওই কোনদিন কুসুমাকীর্ণ ছিল না।

সারাংশ

শারীর শিক্ষা, সরকারি নীতি ও বাংলার মেয়েদের ভূমিকা

(১৯৪৭—১৯৬০)

সুপর্ণা ভট্টাচার্য

আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় হল স্বাধীনতা-উত্তর কালে শারীর শিক্ষায় বাংলার মেয়েদের ভূমিকা ও তৎসম্পর্কিত সরকারি নীতি। এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে শারীরশিক্ষার অর্থ কি, ১৯৪৭ এর পরবর্তী কালে এরকম সরকারি নীতি কেন গৃহীত হয়। বাংলার বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শারীরশিক্ষার অবস্থান কি ছিল। এই প্রসঙ্গে ব্রতচারিণী আন্দোলনের ভূমিকা ও প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে। বাংলার মেয়েরা কিভাবে খেলাধুলার জগতে প্রবেশ করছে, কি-কি অসুবিধার মধ্য দিয়ে তারা প্রতিযোগিতামূলক ক্রিড়ায় অংশগ্রহণ করছে, কি কি বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলার মেয়েরা অন্যান্য প্রদেশের মেয়েদের তুলনায় পিছিয়ে ছিল কি না, বিদেশী মহিলাদের সঙ্গে বাংলার মেয়েদের পার্থক্য কি ছিল। সমর শিক্ষার্থীবাহিনী ও ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ এর সদস্যরূপে তারা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার কথাও আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর স্থান

সায়মতারা যশ

প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্র—ধর্মসূত্রকারগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অনেকক্ষেত্রেই এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। তাঁর বিরচিত স্মৃতিশাস্ত্র গুপ্ত গুপ্তোত্তর যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করে। যাজ্ঞবল্ক্য ও সমসাময়িক কালের অন্যান্য শাস্ত্র সূত্রকারদের তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্ত্রী জাতি সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের সব শাস্ত্রকারগণেরই যে মন্দ ধারণা ছিল—এ কথা সত্যের অপলাপ। গুণমানের বিচারে বিশ্লেষণ করে যাজ্ঞবল্ক্য নারীজাতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর উদার মনের পরিচায়ক। মনু, বশিষ্ঠ, বৌধায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের মতবাদও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যর সব ধারণাই যে গ্রহণযোগ্য নয়—একথা বলা যায়; কিন্তু তাঁর মন্তব্য স্থান-

কাল-পাত্রের আধারে বিচার-বিবেচনা করাই শ্রেয়। বর্তমান প্রবন্ধে তারই এক ইতিহাসভিত্তিক প্রয়াস।

প্রসঙ্গ ঃ আত্মসমীক্ষা ও স্বনির্ভরতা—'ভারতী'তে হিরন্ময়ী দেবী

মধুময় রায়

১৩০১ বঙ্গাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর অবসরগ্রহণের পর 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন দুই বোন—হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী। কিন্তু নামে যৌথ সম্পাদনার দায়িত্ব থাকলেও সরলাদেবী ছিলেন মহীশূরে—ফলে যুগ্মসম্পাদনার দায়িত্ব একা হিরন্ময়ী সামলেছেন। হিরন্ময়ী নিজেই বলেছেন 'ভারতীর সম্পাদকত্ব গ্রহণ এই একটি কর্তব্যের মধ্যে জননীর ভারলাঘব এবং জন্মভূমির কার্যসাধন। এই দুইটি উদ্দেশ্য একত্রে মিলিত হইয়াছে।' (ভারতী, বৈশাখ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ) হিরন্ময়ী দেবীর নিজের কথাতেই প্রকাশ যে পত্রিকা সম্পাদনার বিষয়টির মধ্যে নিহিত ছিল 'জন্মভূমির কার্যসাধন'। জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল জন্মভূমির কার্যসাধনের মধ্যে। সমসাময়িককালে প্রকাশিত বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনাতেও এই মানসিকতা প্রাধান্য পেয়েছিল। 'ঠাকুর বাড়ির পারিবারিক পত্রিকা' ভারতীর সমাজসংস্কৃতিমূলক গতিশীলতার মধ্যে স্বর্ণকুমারীর সময় থেকেই এই রাজনৈতিক কৃষ্টি ও স্বদেশীয়ানার বিষয়টি সঞ্চারিত হয়। সেক্ষেত্রে হিরন্ময়ীদেবীর সম্পাদনাকাল অবশ্যই স্বর্ণকুমারী ও সরলাদেবীর সময়কালের মধ্যে সেতুবন্ধন।

হিরন্ময়ীদেবীর সম্পাদনায় 'ভারতী' বাঙালি সংস্কৃতির গতিময়তাকে যেমন ধরে রেখেছিল তেমনি রাজনৈতিক কৃষ্টি ও সদ্যজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে বাঙালি জীবনে সঞ্চারিত করেছিল। হিরন্ময়ী দেবীর সময়কাল ভারতীয় রাজনৈতিক বাতাবরণেও ক্রান্তিকাল। একদিকে ব্রিটিশরাজের তীব্র দমনপীড়ন—ভার্নাকুলার অ্যাক্ট, অস্ত্র আইন, ইলবার্ট বিল, বাধ্য নিয়ন্ত্রণ আইন, রাজদ্রোহিতার আইন, সরকারি গোপনীয়তা রক্ষা আইনগুলি জারি করা হচ্ছে, অন্যদিকে সভাসমিতির রাজনীতি থেকে জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হচ্ছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ভারতীর পাশাপাশি বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকাগুলির মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা, জাতীয় মর্যাদাবোধ, শিল্পায়ণ, স্বয়ম্ভরতা, গণচেতনা ও সংঘশক্তির প্রকাশ ঘটতে থাকে। শ্রমিক—কৃষক অসন্তোষে শুরু হয় হরতাল ও ধর্মঘট। আবেদনে নিবেদনের নিষ্ফলা রাজনীতির বিরুদ্ধে ও আর্থ—সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একাধিক রচনা এইসময় ভারতীতে প্রকাশিত হতে

থাকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পারিবারিক স্বনির্ভরতা ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে ভারতীতে। ভারতীর প্রতিটি পৃষ্ঠায় সাংস্কৃতিক গতিময়তার পাশাপাশি হিরন্ময়ী দেবী নারী জাগরণ ও আত্মনির্ভরতার বিষয়টি তুলে ধরেন। এই সময় ভারতীতে তাঁর 'মাতৃপূজা' (মাঘ,১৩১২), 'মহিলা—শিল্প সমিতি' (আশ্বিন,১৩১৫), 'রমণীর স্বদেশব্রত' (পৌষ,১৩১২) নবযুগ (ফাল্গুণ,১২৯৭) এবং একগুচ্ছ রাশিয়ার রাজনীতি, প্রশাসন ও অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

'মাতৃপূজা' প্রবন্ধের বক্তব্য ছিল গ্রামীণ মহিলাদের যৌথ উদ্যোগ—আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও গ্রামোন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা। ভারত মহিলা পরিষদে পঠিত আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তিনি দেখান কিভাবে একটি গ্রামের মহিলারা একটি সমবায়ভিত্তিক মহিলা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। সমিতির সদস্যারা 'মায়ের কৌটা' ব্রতগ্রহণ করে দিনে একমুঠো চাল/একটি পয়সা ঐ কৌটোতে রাখতেন। সদস্যাদের সমিতির দেওয়া উপকরণে ব্যবসায় ভিত্তিক শিল্পকর্ম করতে হতো। সমিতির তিনখানি খাতা ছিল—একটিতে গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ির হিসাব থাকতো, দ্বিতীয়টিতে থাকতো শিল্পকর্মের জন্য প্রদত্ত উপকরণের হিসাব, তৃতীয়টিতে থাকতো এককালীন দানের হিসাব। আয়ের উদ্বৃত্ত অংশে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়কে সাহায্য করা হতো। আলোচ্য প্রবন্ধে শিল্পোন্নতির সহায়ক শিল্পপ্রদর্শনীর উল্লেখ আছে—উদ্দেশ্য শিল্পসচেতনতা ও স্বদেশী শিল্পদ্যোগে প্রোৎসাহদান। ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সখিসমিতি'র উদ্যোগে প্রতিবছর মহিলা শিল্পমেলার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পারিতোষিক ও স্বীকৃতিদানেরও ব্যবস্থা ছিল। আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশের শিল্পসামগ্রী এখানে প্রদর্শিত হতো। বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পপ্রকরণকে জাতীয় শিল্পদ্যোগে সামিল করার প্রবণতাটি এখানে লক্ষণীয়। পাঁচ/ছয়টি অধিবেশনের পর Industrial Association এর দায়িত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় মেলায় সখিসমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পরে এটি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে Industrial Exhibition-এ পরিণত হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সার্থক উত্তরসূরি হিরন্ময়ী দেবী 'মহিলা শিল্প সমিতি' প্রবন্ধে মহিলাদের গ্রামীণ শিল্পক্ষেত্রে ও বাণিজ্যিক অর্থকরী মানসিকতাকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি 'রমণীর স্বদেশব্রত' প্রবন্ধে গণচেতনা, গণউদ্যোগ, স্বদেশচিন্তা স্বদেশী শিল্প, শিক্ষাবিস্তার ও জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষায় ভারতীয় মহিলাদের বলিষ্ঠ ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন। স্বদেশী গ্রামীণ শিল্প ও স্বনির্ভরতাকে সমবায় ভিত্তিক কর্মপ্রয়োগের অঙ্গীভূত করার পাশাপাশি তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও মর্যাদাবোধকে পারিবারিক জীবনে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উদার বাতাবরণে তিনি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও পুরুষপ্রাধান্যের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। সমকালীন রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক

সংস্কার, প্রশাসনিক অগ্রগতি ও বিপ্লবোত্তর অগ্রগতির উল্লেখ তাঁর রচনাতে পাওয়া যায়।

বাংলায় স্বনিযুক্তি ও স্বদেশী শিল্পায়ণের পথে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রয়াসকে জাতীয়জীবনের তৃণমূলস্তরে নিয়ে আসার প্রয়াসটি প্রশংসনীয়, প্রাক-স্বদেশী যুগ থেকে স্বদেশিয়ানা ও গঠনমূলক স্বদেশী উদ্যোগে উত্তরণকে হিরন্ময়ী দেবী স্বাগত জানিয়েছেন নিজস্ব স্বাতন্ত্রে তিনি সাংগঠনিক স্বদেশী সমবায় শিল্পদ্যোগ, গ্রামোন্নয়ন ও কর্মসংস্কৃতিকে কখনই একমাত্র পুরুষদের জন্য একমাত্র বরাদ্দ বলে মানেননি। সমাজে ও পারিবারিক জীবনে লিঙ্গভিত্তিক সাম্য, স্ত্রী জাতির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধ তথা তার অর্থকরী স্বনির্ভরতার গুরুত্ব তাঁর কাছে উত্তরোত্তর প্রাধান্য পেয়েছে। বাঙ্গালি জীবনের সামাজিক সংস্কৃতিমূলক গতিশীলতা হিরন্ময়ী দেবীর 'ভারতী'তে স্বাদেশিকতা ও স্বনির্ভরতার সঙ্গে সত্যিই একাত্ম হয়ে গেছে।

জেমস অগাস্টাস হিকি ও ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র

মোঃ শাহাদাত হোসেন সরকার

ভূমিকা ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ঃ শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটায়, সংবাদপত্র প্রকাশ তার একটি অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য দিক। যে কোন দেশের প্রবাহমান রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হল সে দেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র।[১] ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *Bengal Gazette* প্রকাশ করার মাধ্যমে জেমস অগাস্টাস হিকি নামের জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাসের শুভ সূচনা করেন। যদিও হিকির সংবাদপত্র আধুনিক সাংবাদিকতার দৃষ্টিতে ছিল নিম্নমানের একটি কাগজ, তথাপি ভারতবর্ষের প্রথম সাংবাদিক ও সংবাদপত্র হিসেবে হিকি ও *Bengal Gazette* সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

পটভূমি ঃ

ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের ইতিহাসে বাংলার স্থান অতি উচ্চে। এ প্রসঙ্গে Smarájit Chakravarti, *The Bengali Press 1818-1868* নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "ভারতবর্ষের প্রথম ইংরেজি ও প্রথম স্বদেশী ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশের দিক দিয়েও বাংলা এক অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছে।"[২] ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল এই বাংলায় এবং প্রথম স্বদেশী ভাষার সংবাদপত্রটিও প্রকাশিত হয়েছিল এই বাংলা থেকেই। এর পশ্চাতে একাধিক কারণও অবশ্য বিদ্যমান ছিল।

প্রথমত ঃ আমরা জানি যে, উনবিংশ শতকে বাংলাতেই শুরু হয়েছিল এক নবজাগরণ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও সময় একই সাথে তাল মিলিয়ে চলে। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ছিলেন বেঙ্গল রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অগ্রদূত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে inaugurator of modern age বলে বর্ণনা করেছেন। বাংলার এই নবজাগরণ কলকাতায় বসবাসরত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তা চেতনার সৃষ্টি করায় ইংরাজি ভাষায় পাঠকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এছাড়াও পলাশীর পর ইংরেজ সম্প্রদায় কলিকাতাতেই ঘাঁটি গেড়ে বসায় এদের দ্বারাও এদেশের শিক্ষিত

সমাজের একটি বড় অংশ পাশ্চাত্য ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়। যারা সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করে।[৩]

দ্বিতীয়ত : পলাশীর পর থেকে কলিকাতাকে কেন্দ্র করেই অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। কলিকাতাতেই ধনীক, বণিক ও ব্যবসায়ীদের ঘাঁটি গড়ে উঠে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপনের জন্য এবং বাণিজ্যিক প্রচারের মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।[৪] সম্ভবতঃ এই দুটি কারণেই ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র ভারতের অন্য কোন স্থান থেকে প্রকাশিত না হয়ে বাংলার তদানীন্তন প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

ইউরোপে সংবাদপত্রের উৎপত্তি :

ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের অনেক আগেই ইউরোপ ও অপরাপর দেশে সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় এবং সংবাদপত্র যোগাযোগের উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। তাং শাসকদের রাজত্বকালে (৬১৮ থেকে ৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ) চীন দেশে পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র *তিপাও* (তিচানও বলা হতো) অর্থাৎ দরবারের গেজেট প্রচলিত ছিল বলে দাবি করা হয়। খ্রিষ্ট পূর্ব ৫ম দশকে রোমের সংবাদপত্রগুলির (নিউজ লেটার) লেখকরা রাজধানী থেকে দূরে বসবাসকারী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে নিয়মিত লিখিত সংবাদ সরবরাহ করত। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০ অব্দে রোমের কনসাল জুলিয়াস সিজার প্রতিদিন ফোরামে সরকারি বিজ্ঞপ্তির একটি বুলেটিন সেঁটে দিতেন। জার্মান প্রমুখ ইউরোপীয় বহু দেশে এসময় যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, রাজ্যভিষেক, আশ্চর্যজনক ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ের এক পৃষ্টার সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল। এগুলিকে বর্তমান সংবাদপত্রের পূর্বসূরি বলা হয়ে থাকে। আধুনিক কালের সংবাদপত্র বলতে আমরা যা বুঝি সাধারণ মানুষের বিজ্ঞাপন মাধ্যম, ঠিক সেই জিনিস পৃথিবীতে প্রথম প্রচলিত হয় ইউরোপের বেলজিয়াম দেশের এ্যান্টওয়ার্প শহরে ১৬০৫ সালে। তারপর সংবাদপত্র প্রচলিত হয় ১৬০৯ সালে জার্মানীর অগস্‌বার্গ শহরে। সেটির নাম ছিল *অবিশা ওডার জাইটুঙ্গ*।[৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর প্রথম ইংরেজি ভাষার দৈনিক সংবাদপত্র *লন্ডন গেজেট* প্রকাশিত হয় ১৬৬৫ সালে।[৬] এরই প্রেক্ষাপটে ১৭০২ সালে লন্ডনে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।[৭] সুতরাং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আসার বহু আগেই সংবাদপত্রের সাথে তাদের পরিচয় ঘটে এবং তারা সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হয়। বাংলায় আসার পর ১৭৬৫ সালে তারা দেওয়ানি লাভ করে ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করেন। কিন্তু বাণিজ্যিক সংবাদ ও বিজ্ঞাপন প্রচার করার জন্য সংবাদপত্রের প্রয়োজন হয়।

সংবাদপত্র প্রকাশে উইলিয়াম বোল্টসের প্রচেষ্টা :

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরই জনৈক কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস সংবাদপত্রের গুরুত্ব

এবং এতদসংক্রান্ত কোম্পানির উপলব্ধি অনুধাবন করতে পেরে ১৭৬৮ সালে মুদ্রণযন্ত্রের স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির বেশ কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী দেশীয় রাজন্যবর্গের সাথে অবৈধ ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকার কারণে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশের ঘোর বিরোধী ছিলেন, অন্ততঃ নিজেদের স্বার্থেই। আর সে জন্যই সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বোল্টসের অদম্য আগ্রহ লক্ষ্য করে তাকে সংবাদপত্র প্রকাশ করতে তো দিলেনই না অধিকন্তু তাকে এদেশ থেকেই বিতাড়িত করলেন।

জেমস অগাস্টাস হিকি ও *Bengal Gazette*

উইলিয়াম বোল্টসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও বাংলার নবজাগরণ ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীদের নিকট সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা এত ব্যাপকভাবে দেখা দেয় যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়াসকে আর বেশি দিন দমিয়ে রাখতে পারে না। উইলিয়াম বোল্টসের উদ্যোগ গ্রহণের মাত্র বার বছর পরই ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি জেমস অগাস্টাস হিকি প্রকাশ করেন ভারতবর্ষের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *Bengal Gazette*.[৮]

জেমস অগাস্টাস হিকির প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ ব্যবসায়ী। তিনি ১৭৭২ সালে ভারতবর্ষে আসেন একজন শল্য চিকিৎসকের সহকারী হিসেবে। কলিকাতা এসেই তিনি পত্রিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করেননি। বিলাতে থাকাকালীন তিনি ছাপাখানায় শিক্ষানবীস পদে চাকুরি করতেন। কলিকাতায় এসে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি জাহাজ থেকে মালপত্র খালাস করে তা বিক্রি করতে থাকেন। ১৭৭৫-৭৬ সালের দিকে তাব অনেক মালপত্র পানিতে ডুবে যায়। দেনার দয়ে তাকে কারাগারে যেতে হয়। কারাগারে থাকাকালীন সময়ে অজ্ঞাত কিছু লোকের সহায়তায় বেশ টাইপ সংগ্রহ করে ১৭৭৬ সালে একটি প্রেস স্থাপন করেন এবং এটিই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম ছাপাখানা। কলিকাতার প্রথম প্রেস হিসেবে হিকি বেশ কয়েক বছর কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও পঞ্জিকা ছেপে ভাল ব্যবসা করেন। কিন্তু ১৭৮০ সালে *Bengal Gazette* প্রকাশ করার পর তার সব ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের দিকেই তিনি বিশেষ নজর দেন।

Bengal Gazette প্রকাশে ফ্রান্সিসের পৃষ্ঠপোষকতা

কোম্পানির শাসনকালে এদেশে ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসা করতে গেলে কোম্পানির অনুমতি নিতে হতো বলেই ইংরেজ কর্মচারী বোল্টসের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়।[১০] এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কোম্পানি তো প্রথমে থেকেই এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাহলে হিকিকে তারা পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দিলেন কি করে?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বোল্টস যে বছর ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হন তার দু'বছর পর গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস। হেস্টিংস এদেশে আসার পর পরই এখানে আসেন গভর্নিং বোর্ডের অন্যতম সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস। ভারতবর্ষে আসার আগে ফিলিপ ফ্রান্সিস ইংল্যান্ডে সংবাদপত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কাজেই সংবাদপত্রের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদা সচেতন। ভারতবর্ষে আসার অল্পদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিসের সাথে ওয়ারেন হেস্টিংস এর দ্বন্দ্ব বাধে। ফিলিপ ফ্রান্সিস হিকির সংবাদপত্র প্রকাশের অদম্য আগ্রহ লক্ষ্য করে হিকিকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলে ফ্রান্সিসেরই প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হিকি Bengal Gazette প্রকাশ করেন যা কলিকাতায় Hicky's Gazette নামে সমধিক পরিচিত ছিল।[১১]

Bengal Gazette এর বিষয়বস্তু

পলাশী যুদ্ধের ঠিক ২৩ বছর পর অর্থাৎ ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি শনিবার হিকির *Bengal Gazette* প্রথম প্রকাশিত হয়। কাগজের গোড়াতেই সম্পাদক স্পষ্টাক্ষরে এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিখেন "A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none"[১২]-এ লেখা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, হিকি তথা প্রদেশের প্রেস জন্মের সময় থেকেই স্বাধীন মতামত প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন। Bengal Gazette আকারে ছিল বার ইঞ্চি লম্বা ও আট ইঞ্চি চওড়া। প্রতি পাতায় থাকত তিনটি করে কলাম। *Bengal Gazette* - এ যা প্রকাশিত হতো তার সবটাই ছিল বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের সাথে থাকত বিদেশের ইংরেজি পত্রিকা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি, স্থানীয় ও দূরের সাংবাদিক ও লেখকদের কিছু প্রবন্ধ ও রচনা। বিশেষ আকর্ষণ ছিল "পোয়েটাস্ কর্ণার"— জনসাধারণের নিকট নিবেদন গোছের রচনা। লিখতেন হিকি স্বয়ং। প্রাথমিক পর্যায়ে হিকি নিজেই কবিতা লিখতেন। তারপর অবশ্য অন্যদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সব কবিতাতেই ছিল ইউরোপীয়দের মানসিকতা ও মেজাজের প্রতিচ্ছবি। যেমন-ঋতু বিষয়ক কবিতা লিখতে গিয়ে হিকি এদেশ নয়, বেছে নিয়েছিলেন তার স্বদেশকেই। তিনি লিখেছিলেন—

> "The flowers of july can't compare
> To the fragrance that hangs on her lips."

এছাড়াও *Bengal Gazette* এর নিত্যকার বিষয় হিসেব ব্যক্তিগত রচনা, আক্রমণ, কেচ্ছা অসম্মানজনক রচনা প্রভৃতি তৎকালীন ইংরেজ সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আর থাকত কলিকাতায় ইউরোপীয়দের ঘরোয়া কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার মুখরোচক খবরাখবর। প্রথম দশ মাস *Bengal Gazette* ছিল রাজনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নির্বিবাদী। কিন্তু তারপর থেকেই ক্রমান্বয়ে *Bengal Gazette* এর পাতায়

বিক্ষোভের ঝাঁজ স্পষ্ট হয়ে ওঠায় বাংলায় বসবাসকারী কোম্পানীর কর্মচারীগণ গেজেটের জনপ্রিয়তায় ক্রমে ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েন।[১৪] তবে *Bengal Gazette* এ শুধুমাত্র নয় সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা যেমন- *Kurrachee Advertiser* ও প্রায় একই ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের যথেষ্ট সমালোচনা করে।[১৫] সম্পাদক Charls Naphieer ও জেমস অগাস্টাস হিকির মত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসক ও তাদের শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো এই পত্রিকায় তুলে ধরেন।[১৬]

Bengal Gazette এর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইংরেজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকেও গেজেটের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে নিঃসংশয় করতে পারছিল না। ইতিমধ্যে *Bengal Gazette* এ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। "The strictly private arrangement by which Mrs. Imhaf became the wife of the first Governor General in India."[১৭] এই সংবাদ প্রকাশের সাথে সাথেই ওয়ারেন *Gazette* এর প্রতিদ্বন্দ্বী *ইন্ডিয়া গেজেট* নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই সাথেই প্রস্তাবিত কাগজের পক্ষে আর হিকির কাগজের বিপক্ষে প্রচারণা শুরু করেন। Bengal Gazette এর পাঠকেরা যাতে *ইন্ডিয়া গেজেট* পড়েন সে মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। *ইন্ডিয়া গেজেটকে* সরকারি সব রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করায় হিকি হেস্টিংস সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। ফলে হেস্টিংস ১৭৮০ সালের ১৪ই নভেম্বর Bengal Gazette বন্ধ ঘোষণা করেন এবং হিকির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। গ্রেফতার হবার পর জেলখানায় কোন প্রেস 'ল' না থাকায় বন্দী দশাতেও হিকি সংবাদপত্র সম্পাদনা অব্যাহত রাখেন। তার ভাষা সে সময় আরো তীব্র হওয়ায় Bengal Gazette এর আকর্ষণও অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু সংবাদপত্রের আকর্ষণীয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ইলাইজা ইম্পাকে হাত করে হিকিকে একের পর এক মামলায় জড়িয়ে ফেলেন এবং জরিমানা ধার্য করেন। জরিমানার টাকা শোধ করতে না পারায় ১৭৮২ সালের শেষের দিকে হিকির ছাপাখানা আটক করা হয় এবং পরে তা বিক্রি করে দেয়া হয়। আর এইভাবেই চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে যায় ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র Bengal Gazette এর কণ্ঠ।[১৮]

উপসংহার

হিকির সংবাদপত্র যদিও আধুনিক সংবাদপত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ সংবাদপত্র বলে স্বীকৃতি লাভ করেনি, তথাপি জেমস অগাস্টাসের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে বেশ কয়েকখানি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১৯] পরবর্তীকালে খ্রিষ্টান মিশনারিদের অদম্য উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের

সর্বপ্রথম স্বদেশী ভাষার সংবাদপত্র।[২০] এরই প্রেক্ষাপটে হিন্দু সমাজ সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালে।[২১] কিন্তু মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা চেতনা আরো পরে অনুপ্রবেশ করায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমান সমাজে সংবাদপত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়।[২২] এটা প্রশংসনীয় যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে সমাজের সমাজ সংস্কার আন্দোলন, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, নারীমুক্তি আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সংবাদপত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২৩]

সে দিক দিয়ে বিচার বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার আদি গুরু বা পথ প্রদর্শক হিসেবে জেমস অগাস্টাস হিকির নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সূত্র নির্দেশ

১) দ্রঃ গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১৯০০-১৯১৪)*, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ-১।

২) Sınarajit Chakravarti, *The Bengali Press 1818-1868,* Calcutta, 1976, P.-7

৩) A. F. Salahuddin Ahmed, *Socicl Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835),* Leiden, E.J. Brill, 1965, P.-47.

৪) *Ibid, P.-49.*

৫) ডঃ এস. পি. সেন (সম্পাদিত), *দি ইন্ডিয়ান প্রেস*, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ.-১৩৫।

৬) এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্র *দি বস্টন নিউজ লেটার অ্যান্ড ডেইলী এ্যাডভার্টাইজার* প্রকাশিত হয় ১৭৮৪ সালে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আরো দেখুন - *বংশী মান্না, ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস*, সুবর্ণ প্রকাশণী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ.-১২।

৭) S. Natarajan, *A History of the Prees in India,* Bombay, 1962, P.-4.

৮) *পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালী নবজাগরণ*, মন্ডল এন্ড সন্স. কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ.-৬।

৯) গোলাম মোরশেদ, *বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.-১২।

১০) নিজেদের স্বার্থেই কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পত্রিকা প্রকাশের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আরো দেখা যেতে পারে - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র (১৮১৮-১৮৬৮), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ*, কলিকাতা, ১৩৪২ পৃ.-১৭।

১১) তারাপদ পাল, *ভারতের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৮৪৭)*, সাহিত্য সদন, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ.-৩৮।

১২) উদ্ধৃত, শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বসু, "ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র", *প্রবাসী*, ১৬শ ভাগ, ১ম খন্ড. ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-১৩২৩, পৃ.-৪০।

১৩) ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য, *সংবাদপত্রের ইতিহাস*, কলিকাতা, বৈশাখ-১৪০৫, পৃ.-২৬।

১৪) *পূর্বোক্ত, পৃ.-৩৯।*

১৫) *Kurrachee Advertiser* পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ থেকে প্রকাশিত পাকিস্তানের প্রথম সংবাদপত্র। ১৮৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন- Dr. Abdus Salam Khurshid, *Journalism in Pakistan*, United Limited, Anarkali, Lahore, 1964, P.-11.

১৬) *Ibid*, P.-13.

১৭) ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য, *সংবাদপত্রের ইতিহাস*, কলিকাতা, বৈশাখ-১৪০৫,পৃ.-২৭।

১৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.-৬।

১৯) হিকির *Bengal Gazette* প্রকাশের পর পরই কলিকাতায় বসবাসকারী ইউরোপীয়গণ *ইন্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট (১৭৮৪), হরকরা (১৭৯৮), কলিকাতা ক্রোনিক্যাল (১৭৮৬)* প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তবে এ সময় প্রকাশিত এসব পত্র পত্রিকায় ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার ধ্যান ধারণাকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হতো। বাঙ্গালি সমাজ সম্পর্কে এসব পত্রিকায় উদাসীন্য পরিলক্ষিত হতো। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে- সাখাওয়াত আলি খান, "উন্মেষকালে বাংলা সাংবাদিকতা", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ম ও ৮ম খন্ড, আষাঢ় - ১৩৮৫, পৃ.-৫৪।

২০) খ্রিষ্টান মিশনারীদের অসামান্য কৃতিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ হল স্বদেশী ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্র মাসিক *দিকদর্শন*। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এরপরে সাপ্তাহিক *সমাচার দর্পণ* প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের ২৩শে মে শনিবার। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র (১৮১৮-১৮৬৮)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৪২, পৃ.-১৭।

২১) বাঙ্গালি পরিচালিত প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক *সংবাদ কৌমুদী* ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি সম্পাদনা করতেন তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে *সমাচার চন্দিকা, সংবাদ তিমিরনাশক, সংবাদ প্রভাকর* ইত্যাদি পত্রিকাও বহুল প্রচলিত হয়। দ্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ-১৭।

২২) মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকার নাম *সমাচার সভারাজেন্দ্র*। ১৮৩১ সালের ৭ই মার্চ প্রকাশিত পত্রিকাখানি সম্পাদনা করতেন কলিকাতার কলিঙ্গ নিবাসী শেখ আলিমুল্লাহ। এছাড়াও *সওগাত, মোহাম্মদী, আল-ইহলাহ্, আল-এসলাম* ইত্যাদি পত্রিকাও মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

২৩) পলাশী যুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে যে অধঃপতন শুরু হয়, তা রোধ করে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করতে কিছু মহাপ্রাণ ও ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। যাদের হাতে বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি হয়। যেমন— *সওগাত, সুধাকর, নবনূর, আল-নূর, আল-ইসলাহ্* ইত্যাদি। এসব পত্র পত্রিকা মুসলমান সমাজের সংস্কার আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আরো দেখুন - ডঃ মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম, ''বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য ঃ একটি পর্যালোচনা'', *বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুর্দশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৯৬, পৃ.-৮০।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ঃ একজন ভদ্রলোককে বিনির্মাণ

অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান নিবন্ধটি একটি বৃহত্তর আলোচনার অংশ হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে। ১৮৫০ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের উদ্ভব, বিকাশ ও অবক্ষয়ের ইতিহাস পরিস্ফুট করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা। ঐ যুগের ঐ গোষ্ঠীর কয়েকজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তির আত্মজীবনীর মাধ্যমে তাঁদের মর্মলোক উদ্ঘাটন করতে চাই। এঁরা নিজেদের জগৎ ও জীবনকে কীভাবে দেখেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন তা উন্মোচন করাই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। বোঝাই যাচ্ছে যে, ঘটনার বর্ণনা, তুলনা বা মূল্যায়ন এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ঘটনা দেখতে ও দেখাতে গিয়ে এঁদের চৈতন্যলোকে যে বোধ/ঝোঁক/ বিশিষ্ট ভঙ্গী ক্রিয়াশীল ছিল তারই কিছু কিছু পুনরুদ্ধার করার জন্যই এই প্রবন্ধ। বর্তমানে আমার প্রারম্ভিক প্রস্তুতি, সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ একান্ত ভাবে এই প্রবন্ধটিকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে। আর সব বক্তব্যই প্রস্তাবিত, তাই স্থির সিদ্ধান্ত নয়।

আমরা যে সমস্যার উত্তর সন্ধান করছি, তা এই ভাবে বলা যায়। বর্তমান আলোচনাধীন ভদ্রলোকদের সম্বন্ধে সচরাচর প্রশংসাবাক্য বিশেষ শোনা যায়না। ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ থেকে শুরু করে কেম্ব্রিজের আধুনিক গবেষক, রাজনীতি সচেতন ভিন্ন ভাষী প্রতিবেশীরাজ্যের লোকেরা থেকে চরম বামপন্থী সকলের কাছে এই ভদ্রলোকগণ সংখ্যাগতভাবে নগণ্য হয়েও বিসম অনুপাতে সম্পদের উপভোক্তা। শুধু আত্মস্বার্থ নিমগ্নই নয়, অন্যের স্বার্থ পদদলনকারী স্বদেশীয়দের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে তা বিদেশীদের বিক্রয় বা বন্ধক প্রদানকারী, ঘরের লোকের কাছে উৎপীড়ক অথচ অন্যের উৎপীড়নে মদতদাতা, বাঙলার রেনেশাঁস বলে এক পরগাছা সংস্কৃতির অহংকারে স্ফীত, তোষামুদে, ভীরু, সামরিক শৌর্যহীন। বিপদের সামনে পলায়নপর।

প্রশংসাবাক্য এদের কপালে জোটেনি তা নয়, তবে তা বোধহয় দৈত্যের দান। নইলে বালগঙ্গাধর তিলক যে বহু পরিচিত মহাবাক্যটি বলেছিলেন তার বিষম ফল সম্ভবত এরা এতদিনে অর্থাৎ আজকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের বাস্তবের চাপে মনুষ্য পদবাচ্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে।

কিন্তু এরা তো আমরাই। এখানে উপস্থিত কেউ কেউ হয়তো আদর্শগত কারণে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে ও দেখাতে প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে আমরা গোষ্ঠীর বহু লক্ষণ বহন করে চলেছি— আবার আমরা নিজেদেরই

মুণ্ডুপাত করছি মুক্ত বিবেকে। সমস্যা এই আপাত বিরোধীতা নয়। সমস্যা হচ্ছে কোন্ বিশিষ্ট মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রবাহে এই জটিল ধ্যান ধারণা গড়ে উঠেছে তার জট ছাড়ান। আর জীবনী আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা এক্ষেত্রে কিছু আলোকপাত করতে পারে কিনা তা খতিয়ে দেখা। সেই দিক থেকে এই নিবন্ধটি অনুসন্ধানের প্রয়াসমাত্র। কিছু প্রকল্পকে যাচিয়ে দেখার চেষ্টা।

রাষ্ট্রগুরু বলে পরিচিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরাজিতে লিখিত সুবৃহৎ রচনা '*এ নেশন ইন মেকিং*' হচ্ছে পঞ্চাশ বছরের লোককর্ম জীবনের স্মৃতিকথা Reminiscences of public life শিরোণামের সত্যতা প্রতিপাদন করে। এটিকে মোটামুটি সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতি কেন্দ্রিক জীবনের ধারাভাষ্য বলাই বেশি লাগসই রক্তমাংসের মানুষটির আভাষ আছে কচিৎ কদাচিৎ।

ইংরাজি বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে অর্থাৎ রাষ্ট্রগুরু মহাপ্রয়াণের বছরেই। বর্তমান লেখকের হাতে ১৯৬৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ছাপা সংস্করণটিতে দেখা যাচ্ছে এর আগে এটি আরো তিনবার ছাপা হয়েছে। ইংরাজি বইটি পাওয়া কঠিন হলেও বাঙলায় দুটি সহজ লভ্য সংস্করণ আছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক ১৯৭৭ সালে অন্যটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ কর্তৃক ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সাড়ে তিনশ পাতা জুড়ে ৩৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বইটিতে প্রায় ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ সাল অব্দি তিনি যে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন তার বর্ণনা রয়েছে। মানব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নেই বললেই চলে। জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে আগুয়ান সুরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশীদার রূপে অদৃশ্য উপস্থিতি বিলুপ্ত করে রাখা সম্ভব নয় বলেই যেটুকু উল্লেখ সেটাই আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য। নইলে যে ক্রান্তি লগ্নে এদেশের এক বিশিষ্ট লোক কর্মকাণ্ডের আনুসঙ্গিক ভোট ভিত্তিক পরিষদীয় রাজনীতির নাড়া বাঁধার কাজ অগ্রসর হচ্ছিল তাতে বহুমাত্রিক রাজনীতির অতীত পরম্পরা ও নতুন যুগের সদ্য আগত ব্যবস্থাদির যে বোঝাপড়া সম্পন্ন হচ্ছিল তার মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা এ নিবন্ধের আওতার বাইরে। আমরা ভদ্রলোক পদবাচ্যদের সন্ধান প্রার্থী। আর সেই সন্ধান দিতে রচনাটি প্রায় অপারগ।

এখানে ভদ্রলোক বলতে কী বুঝবো প্রশ্নটি প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। এ বিষয়ে অনাবশ্যক কালক্ষেপ না করে শ্রোতাদের ইতিহাস অনুসন্ধান - ১০-এর ৩৩০-৩৩৬ পাতায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের নিবন্ধটি দেখে নিতে অনুরোধ করে একজন ভদ্রলোকের সন্ধানে একটি চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। তাহলে এখন একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্তে হতে চাই যে এখানে উপস্থিত আমরা আমাদের ভদ্রলোকের সম্বন্ধে এক কাজ চালানো ধারণা নিয়ে অগ্রসর হব। যে সব লক্ষণ দেখে আমরা ভদ্র অভদ্র ভাগ করি সেই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থেকে তাঁদের জন্য তাদের নিয়েই সুরেন্দ্রনাথের লোক কর্মকাণ্ড অনুসৃত হয়। কিন্তু মূল ইংরাজি গ্রন্থে কোথাও 'ভদ্রলোক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। তবে এই লক্ষণাক্রান্ত গোষ্ঠীকে বোঝাতে 'educated middle

class' "upper educated classes" বড়জোড় 'respected classes' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙলায় শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্গ কি সম্ভ্রান্ত শব্দ এসেছে। হাল আমলে পশ্চিমী গবেষকদের হাতঘুরে আমরা ভদ্রলোক শব্দটি ব্যবহার করছি— খানিকটা ওরিয়েন্টালিজমের প্রভাবে ইদানিং বিভিন্ন পরিচয় বাচক পদ (term) -কে যথা সম্ভব তার দেশজ স্বনামে অর্থাৎ স্বক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিচিত লেবেলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাই সানতাল্ রিবেলিয়ান বা মুন্ডা আপরাইজিং হচ্ছে যথাক্রমে সাঁওতাল হুল বা মুন্ডা উলগুলান। তাই সুরেন্দ্রনাথ যদি শব্দটি ব্যবহার না করে থাকেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু ঐ শব্দগুলি যে ভদ্রলোক হতে পারে তার প্রমাণ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সংস্করণে বেশ কয়েকবার (৩৩/১৩৩) শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

অতঃপর দেখুন বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে থেকে উঠে আসা তাদের আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ করার চেষ্টায় নিয়োজিত সুরেন্দ্রনাথ কিভাবে আপন গোষ্ঠীর ক্রমবর্দ্ধমান পরিপক্কতাকে (growing naturity) কে চিত্রিত করেছেন। আপন যৌবনকালের গণআন্দোলন সমূহকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন They (the Public movements) did not indeed, acquire the volume and intensity of those that fallowed them, far they did not appeal to as wide a public and had not behind them the same measure of public support or approval - The newspaper Press had not then become a power, public speaking on the platform had not come into vogue.' (পৃ. ৫)

"বাস্তবিক পক্ষে পরবর্তীকালে তার (দেশের গণআন্দোলন সমূহের) পরিসর ও গভীরতা যে রূপে দেখা গিয়েছিল পূর্বে সে রূপে কিছু ছিলনা। কারণ তারা এত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে আবেদন রাখতো না এবং তাদের পিছনে এই পরিমাণ জন সমর্থন ও অনুমোদন থাকত না। সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্র তখন এতটা শক্তিশালী হয়নি। মঞ্চ থেকে বক্তৃতার প্রথাও গড়ে ওঠেনি।"

বইটির অন্তিমপর্বে কনক্লুশন বলে উপসংহার মূলক অধ্যায়ে প্রায় জীবনের সালতামামি করতে গিয়ে জে. এন. গুপ্ত, আই. সি. এস. কর্তৃক প্রস্তুত রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনীতে সুরেন্দ্রনাথকে লিখিত রমেশ দত্তেরই একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে এই বইটিতে যেন সুরেন্দ্রনাথ বলতে চান, "কী অদ্ভুত বিপ্লবেই না আমরা এক প্রজন্মের ব্যবধানে দেখতে পেলাম। এ যেন অর্জন করেছিল রক্তপাতহীন বিপ্লবের আকৃতি ও গভীরতা। এ কোনো ভাষার অতিরঞ্জন নয়, বরং খাঁটি সত্য এবং সমসাময়িক ইতিহাস এর প্রমাণ। (পৃ. ৩৭০)

অতঃপর সুরেন্দ্রনাথ আপন জীবনীব্যাপী প্রয়াসের হিসাব দিতে গিয়ে ১৮৭৫ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে (১) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অগ্রগতি (৪ টি থেকে ১১৬টি নগরপালিকার সৃষ্টি ও সেগুলির নির্বাচন ব্যবস্থা), (২) সর্বভারতীয় প্রশাসনের উচ্চপদে দেশীয়দের নিয়োগের তুলনামূলক সংখ্যাল্পতার অবসান; (৩) মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধীনতাও

জনমতের পরিপক্কতা নির্দেশ করে বঙ্গ বিভাগ নাকচ; এবং (৪) বহুধা বিভক্ত স্বার্থবোধ থেকে জাতীয়তাবাদী আদর্শ সমৃদ্ধ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আভাস ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে যা ঘটেছে তাকে বার বার জোর দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ 'রক্তপাতহীন বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করতে চান যার ব্যতিক্রম কিছু সাময়িক ক্ষণস্থায়ী নৈরাজ্যবাদী হিংসাত্মক বিস্ফোরণে।"

এই উপসংহার অংশে অতঃপর সুরেন্দ্রনাথ আর সে সমস্ত বিষয়গুলিকে এসেছেন তার মধ্যে আমরা পাব সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লববাদ সম্পর্কে তাঁর অসম্তি, গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি অসমর্থন, ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গী সর্বোপরি ভারতের ভবিষৎ সম্পর্কে ভদ্রলোকদের সোচ্চার চিন্তা। এরই মধ্যে ঐ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সুপরিচিত ও বহু চর্চিত সমালোচনাগুলির সূত্র সন্ধান করা সম্ভব। আর ঐ অভিযোগ বা সমালোচনার যথার্থ সমর্থন অস্বীকার বা মূল্যায়ন কোনটাই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়।

ভদ্রলোকদের মানসলোক অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারে আমরা ধাক্কা খাই। ঐ যুগের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের সুবাদে ডেভিড কফ্ যে আইডেনটিটি ক্রাইসিস বা স্বানুসন্ধান সংকটের সন্ধান পেয়েছিলেন তা এখানে বিস্ময়কর ভাবে অনুপস্থিত। ঔপনিবেশিক জগতের শাসন/শোষণ/সাংস্কৃতিক প্রভাবাধীনতা (rule, exploitations, hegemonic domination)-র ফলে এ যুগের আরো অনেক গণ্যমান্য মানুষ তাঁদের কৈশোর বা প্রথম যৌবনে পূর্বকথিত সামাজিক সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই জাতীয় কিছুর উল্লেখ করেন নি। কোনো আভাসও আমরা খুঁজে পাইনা।

খুঁজে খুঁজে সত্যিই পাইনা ব্যক্তি মানুষকে। অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ট মানুষ কী ঘটনার, নিজের পছন্দ অপছন্দের এমনকি আগন্তুক ব্যক্তি/বিষয় সম্বন্ধে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ যৎসামান্য। কদাচিৎ একটি আধটি বাক্য সীমাবদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বাধ্য হয়েই রাজনীতিতে এসেছিলেন। স্বেচ্ছায় নয় ক্ষমতা বৃত্তের পিচ্ছিল অলিন্দে স্বেচ্ছায় ঘুরতে যায় কে আর; বিশেষ করে সে যদি বুদ্ধিজীবী পেশা বা চাকুরিজীবী পরিবারের সদস্য হয়। সমসাময়িক কাল অর্থাৎ শতকের শেষ চতুর্থকে (last quarter) যখন ঔপনিবেশিক কাঠামোর পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া ক্রমবর্দ্ধমান হারে সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল তখন হারিয়ে রাজনীতিতে এসে ম্যাককুলী কিংবা কেম্ব্রিজ লেখকগোষ্ঠীর প্রস্তাবিত / নির্দেশিত বহু পরিচিত To politics from job frustration-এর লাগসই দৃষ্টান্ত নিখুঁত প্রতিমা হয়ে পড়েছেন সুরেন্দ্রনাথ। বার দু'য়েক বলেছি আবার বলি নেমিয়ার নির্দেশিত enlightened self-interests-এর যথার্থ মডেল সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন কিনা তা আমাদের বিবেচ্য নয়। কেবল একটাই জিজ্ঞাসা তাঁদের কী স্ত্রী-পুত্রও থাকতে নেই? না কী থাকলেও তাদের মৃত্যুও কি এদের বিচলিত

করে না? বইটি মূলত তাঁর বাহ্যিক কর্মজাগতিক বর্ণনা। সেখানেও কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে আপন দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সতর্ক ও সংক্ষিপ্ত। বারবারই এই আভাস মেলে যে জীবনের অন্তরঙ্গ দিক সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

আর এই জীবনী যদি তারই ইঙ্গিত বহন করে চলে তবে আরো কিছু ইঙ্গিত এর থেকে সন্ধান ও নির্দেশ করা সম্ভব। বঙ্গদেশ তাঁর জন্মকর্মের পাদপীঠ হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়কর ভাবে সুপ্রসারিত সারা ভারতের ওপর পরিব্যাপ্ত। লক্ষ্য করুন প্রকাশ ভঙ্গীটি : সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার "একই বছরে আমাদের একই সঙ্গে তিনজনের সাফল্য ভারতীয় জনমতের ওপর এক গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। সফল প্রার্থীদের তালিকা থেকে আমাদের নাম অপসারণ সারা ভারতে বিশেষ করে বঙ্গদেশে সার্বিক ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমি অনুভব করলাম যে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম। কারণ আমি ছিলাম একজন ভারতবাসী, এমন এক সম্প্রদায়ের সদস্য যারা রয়েছে অসংগঠিত অবস্থায়, কোন জনমত বিহীন এবং প্রশাসনিক পরামর্শের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে যিনি আত্মজীবনীর শিরোণাম '*এ নেশন ইন মেকিং*' রেখেছেন তাঁর চিন্তা চেতনায় এই জাতীয় একটি বিস্তৃত জাতিসত্তার উপস্থিতি স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষটির ধ্যানে ও চিন্তায় ভারতের একটি সুস্পষ্ট ভৌগলিক ভাবে সীমায়িত ইতিহাসসম্মতভাবে সুচিন্তিত সত্তা আছে যাকে বোঝা ও বোঝানো যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্মত জাতীয়সত্তা যদিও বা তখনো গড়ে উঠে থাকে; তবে তা নির্মীয়মান। "The early nationalists were fully aware of the fact that India was a Nation in the making that Indian nationhood was gradually coming into being and could not therefore be taken for granted as an accomplished fact" এ যেন ভারতীয় জাতি সত্তার সম্ভাব্য অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজে বিশ্বাস করা ও অন্যকে তা করানো। এও এক ধরণের সৃজন। সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক বিনির্মাণ। নিজের চিন্তা চেতনার অন্তরতম প্রদেশ থেকে ধীরে ধীরে রূপদান করা। আর আত্মজীবনী রচনার দ্বারা বৃহত্তর গ্রাহক মন্ডলীর কাছে তাকে উপস্থাপিত করা, তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা। "The Indian who actively worked for the creation, presented a new social forces, that were increasingly opposed to the exploitation of India for British interests. They needed an organization that would fight for Indian political and economic advancement and were in no way stooges of the foreign government."

আমাদের আলোচনা আরো একটি নতুন মাত্রা প্রদান করেছে আদি জাতীয়তাবাদের একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য কার্যকরী কাঠামো গড়ে তুলতে আগ্রহ। এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ছিল একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠন। আর সব বিমূর্ত আদর্শকে সীমারেখায় আবদ্ধ করলে যে সমস্যা ঘটে এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দেবতার মাটির পা দৃষ্টিকটুভাবে দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ে।

বিপিন চন্দ্র পাল-এর রাজনৈতিক মতবাদ ঃ একটি দিক

রঞ্জিত সেন

বিপিনচন্দ্র পাল জন্মেছিলেন ১৮৫৮ সালের ৭ নভেম্বর। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩২ সালের ২০মে। এই প্রায় চুয়াত্তর বছরের জীবনে তিনি ভারতীয় জাগরণের পাঁচটি অধ্যায়কে দেখেছিলেন। প্রথম অধ্যায়টি ছিল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের ঠিক পরবর্তী সময় যখন ভারতীয় পরাজয় ও আত্মসমর্পণ এই দুইকে নিশ্চিত করে ইংরেজরা চালু করেছিল মুসলিম ও জমিদার অভিজাত তোষণ নীতি। এই একই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্তানের দিকে প্রসারিত করতে চাইছিল নিজের প্রান্তসীমা। অপচয় হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ ভারতীয় আর্থিক ও মানবসম্পদের। অবিরত সম্পদ নিকাশ (Drain of Wealth) দেশকে ভেতর থেকে কতখানি নিঃসার করে তুলছিল তার সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত ও দাদাভাই নৌরজীর লেখা পড়ে মানুষ ক্রমশঃ নতুন চেতনায় জেগে উঠছিল। এই জাগরণ থেকে আসল ভিন্নতর আরেক জাগরণ— রাজনৈতিক জাগরণ— সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে বঙ্গীয় যুবজাগরণ আর তারপরে কংগ্রেসের মঞ্চে জাগ্রত জনমানসের সোচ্চার ঐকতান। এটি জাগরণের দ্বিতীয় পর্যায়, কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংগঠনের এটিই প্রথম পর্যায়। ১৮৫৭-র অব্যবহিত পরে সনাতন ভারতীয় প্রতিরোধ কাঠামোর যে অবনির্মিতি ঘটেছিল তার থেকে সরে এসে শুরু হল নতুন রাজনৈতিক চৈতন্যের উদ্বোধন— সংগঠিত ভারতীয় রাজনৈতিক নির্মিতির নবোন্মেষ। এই অধ্যায়ে বিপিনচন্দ্র পালের বয়োপ্রাপ্তি— ইতিহাসের সন্ধিলগ্নের সঙ্গে সংলগ্ন এই বয়োপ্রাপ্তি। ১৮৫৭ সালের পর দুই দশক সময় হল মোটামুটিভাবে বিপিনচন্দ্র পালের চোখ মেলার সময়— তাঁর দেখা ভারতীয় জাগরণের প্রথম পর্যায়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাব থেকে দুই দশক বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক বয়োঃপ্রাপ্তির কাল— তাঁর দেখা ভারতীয় জাগরণের দ্বিতীয় অধ্যায় যখন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি হয়েছে— শাসকদের কাছে আবেদন নিবেদনের নীতি চালু হয়েছে— প্রদেশে প্রদেশে রাজনৈতিক যোগাযোগ বেড়েছে— দেশীয় ও ইংরাজি ভাষায় বা বাগ্মীতার দ্বারা জনমনে তরঙ্গ তোলার অভ্যাস ভারতীয়রা আয়ত্ত করে ফেলেছে। বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক উত্থান এই সময়ে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, সরকারি নিপীড়ন এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্গব্যবচ্ছেদ রোধ ও কলকাতা থেকে রাজধানীর অপসারণ (১৯১১-১২) ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে বিপিনচন্দ্র

পাল তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক জাগরণকে দেখেছিলেন। নিপীড়নের মুখে এই অধ্যায়েই অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর বিপিনচন্দ্র পাড়ি দিয়েছিলেন বিলাত ও আমেরিকায়। বিপিনচন্দ্রের দেখা রাজনৈতিক জাগরণের চতুর্থ অধ্যায় হল হোমরুল আন্দোলনের অধ্যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং ভারতীয় যুবকদের দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র নিরন্তর সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে ক্রমান্বয়ে মৃত্যু আর বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়ার অধ্যায়। ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের বিরোধ আগেই ঘটেছিল— যেমন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ — এবার অন্য নেতাদের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ আরম্ভ হল। এ পর্যায়ে এনি বেসান্ত-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ গুরুত্বপূর্ণ। বিপিনচন্দ্রের দেখা ভারতীয় জাগরণের পঞ্চম পর্বটিই হল তাঁর জীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্ব। এটি হল গান্ধীর আগমনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পর্ব — অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ভারতীয় জনজাগরণের পর্ব। এটি একদিকে চিত্তরঞ্জন দাস ও গান্ধীর মধ্যে যেমন ঐক্যমত হওয়ার অধ্যায়, অন্য দিকে তেমনি খিলাফৎ আন্দোলন ও ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্টের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমানের মিলনের অধ্যায়। এই অধ্যায়েরই সম্প্রসারিত পর্বে বিপিনচন্দ্র দেখেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণের পর বাংলার রাজনীতির দূরাবস্থা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আকাঙ্খায় এই পাঁচটি জনজাগরণের অধ্যায়ের গতি লক্ষ্য করতে করতে বিপিনচন্দ্রের মনে হয়েছিল যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন যে বাঙ্গালি জাতির যে গৌরবসূর্য উনিশ শতকে গগণবিহারী ছিল তা যেন বিশ শতকে অস্তায়মান হয়ে পড়েছে। এই দুটি বোধ তাঁকে ক্রমশ বেদনার্ত করে তুলেছিল এবং ক্রমশঃ তিনি অন্তর্মুখীন আত্মজিজ্ঞাসায় বিভোর হয়ে রাজনীতির থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার মধ্যে বিপিনচন্দ্রের জন্ম। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্যে তাঁর জীবনের অন্তিম অধ্যায়ের সূচনা। এই দুই ব্যর্থতার প্রান্তিক বিন্দুর মধ্যে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্ফোরিত প্রগতিকে দেখেছিলেন। এর সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন যে ১৮৫৭ সালের গণঅভ্যুত্থান থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম কীভাবে ১৯২১-এর গণঅভ্যুত্থানে শেষ হয়ে একটি জনজাগরণের পূর্ণবৃত্ত রচনা করল। শেষ পর্বে গান্ধীজির সত্যাগ্রহকে তিনি বুঝে উঠতে পারেননি আর খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মেল বন্ধনকে তিনি মেনেও নিতে পারেননি। জীবনের বিভিন্ন পর্বে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন কিন্তু সবসময়ে তিনি যে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন, বা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন তা নয়। এই একাত্ম হতে না পারাটা তাঁর মনস্তত্ত্বের একটি অতি প্রাসঙ্গিক বিষয়। তিনি পিতার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি। একাত্ম হতে পারেননি তাঁর পারিবারিক ধর্ম,

প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা, তাঁর চাকুরি, তাঁর রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় সহকর্মী এবং এমনকি সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও। শ্রীহট্টের গ্রাম বিদ্যালয় থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে প্রথাগত শিক্ষার প্রতি বিরূপ হলেন এবং কলেজের শ্রেণীকক্ষের পঠনপাঠন থেকে পলাতক হয়ে বাইরের সর্বজনীন গ্রন্থাগারে নিরন্তর পরিশীলিত জ্ঞানচর্চার মধ্যে ডুবে গেলেন। কালক্রমে হয়ে উঠলেন মহাপন্ডিত ও বাগ্মী।

যে মানসিকতায় তিনি প্রথাগত শিক্ষায় বিমুখ ছিলেন সেই মানসিকতায় তিনি উপার্জনশীল জীবিকার লাগাম ধরতে পরান্মুখ হয়েছিলেন। স্বয়ংসিদ্ধ মানুষ ছিলেন বলে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটেছিল তাঁর। আর আত্মপ্রত্যয়ের সুমেরুতে যাঁর অধিষ্ঠান তিনি স্বাভাবিকভাবেই আত্মদর্শী। অথচ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে যিনি সজাগ রেখেছিলেন, নিগূঢ় আত্মকর্ষণের মধ্য দিয়ে যিনি মেধার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, যিনি উজ্জীবিত আত্মশক্তিতে বলশালী ব্যক্তিত্ব হয়েছিলেন, তিনিই ধর্মের ব্যাপারে নিজের অবস্থানকে স্থির রাখতে পারেননি। প্রথম জীবনে কলেজে পলাতক কৈশোরকে আচ্ছন্ন করেছিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব; যৌবনে তাঁকে আবিষ্ট করলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, আর তারপরেই তিনি মুগ্ধ হলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্মচেতনার দ্বারা। এরফলে তিনি পরিবারের অজ্ঞাতে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তারপরে ঝুঁকে পড়লেন বৈষ্ণব ধর্মের দিকে এবং অবশিষ্ট জীবনে না হতে পারলেন সক্রিয় ব্রাহ্ম না হলেন সক্রিয় বৈষ্ণব।

এইভাবে একজন রাজনৈতিক সচেতন মানুষ সারা জীবন তাঁর ধর্মীয় অবস্থান খুঁজে গেলেন। প্রথাগত শিক্ষায় অসফল মানুষ ব্যবহারিক জীবিকাতেও ব্যর্থ হলেন। অথচ তাঁর চেতনায় ছিল প্রচুর বিদ্যা অন্তঃকরণে ছিল প্রগাঢ় বোধ। যুক্তিকে কৃপাণ করে আত্মশক্তিতে হয়েছিলেন বলবান বীর। এরকম মানুষরা সহিষ্ণু হননা— বিপিনচন্দ্রও হননি। নরমপথে এরা চলেননা— চরমের পথেই এঁদের বিরতিহীন পদসঞ্চার। তাই বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন চরমপন্থী। তাঁকে নানা বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছ— করেছেন ঐতিহাসিকরা, করেছেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ প্রশাসকরা। বলা হয়েছে বিপিনচন্দ্র ছিলেন 'দেশদ্রোহী চিন্তার প্রধান যোগানদার'('Cheif purveyor of seditions ideas'), 'চরমপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টবক্তা' ('the most outspoken of the extremists') 'বাংলাদেশে বৈপ্লবিক চিন্তার জনক' ('the father of revolutionary thought in Bengal') ইত্যাদি। বিপিনচন্দ্র পাল যে চরমপন্থী ছিলেন এই নয় যে তিনি সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছিলেন। বরং সারা জীবন তিনি অনেকের থেকে বেশি শান্তিপ্রিয় ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি দুবছরের জন্য বিদেশ চলে যান এবং ইংল্যান্ড ও আমেরিকা ঘুরে আসার পর থেকে তিনি হিংসার পথ পরিহার করেছিলেন। তবু তাঁকে চরমপন্থী বলা হত কারণ তিনি সময়ের আগে অনেক কাজ করতে চাইতেন যা আপাতভাবে মনে হত

হটকারী, সময়ের থেকে এগিয়ে গিয়ে অনেক কথা বলতেন যাতে মনে হত তিনি ঘটনার রশিতে টান দিতে চান সময়ের কথা না ভেবেই সময়কে রূঢ়ভাবে সঙ্কুচিত করে ঘটনাকে চাবুক মেরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আরেক নাম চরমপন্থা বা চূড়ান্তবাদ(extremism)। বিপিনচন্দ্র পাল এই অর্থে চূড়ান্তবাদী ছিলেন— অন্য অর্থে নয়।

দেশচর্যার দীক্ষা বিপিনচন্দ্র পেয়েছিলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে। "তিনিই আমাদের স্বাধীনতা সাধনার ও স্বদেশচর্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক'জন মিলিয়া একটা ছোটদল গড়িবার চেষ্টা করি"— একথা লিখেছিলেন বিপিনচন্দ্র। এইখানেই বিপিনচন্দ্রের চরমতন্ত্র বা চূড়ান্তবাদের সূচনা। তিনি লিখলেন ঃ "আমাদের প্রতিজ্ঞা পত্রের প্রথম কথা ছিল — 'স্বায়ত্বশাসনই (তখনও স্বরাজ শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।' অর্থাৎ যে শাসন স্বায়ত্ব শাসন নহে, শাসিতের উপরে ধর্ম্মতঃ তাহার কোনও অধিকার আছে বলিয়া আমরা মানিনা। 'তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্নমেন্টের আইন কানুন মানিয়া চলিব— কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র, দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্নমেন্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিবনা।"[১]

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৯০৬ সালে বিপিনচন্দ্র একটি দাবি তুললেন — তা হল ইংরাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন (Total autonomy 'free of British control')।[২] এইখানেই বিপিনচন্দ্রের চূড়ান্তবাদ। সমকালের বাইরে, সময়ের পরপারে অনেক দূরের কোন সম্ভাব্য ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে এসে ভাববার দুরপনীয় প্রতিভা তাঁর ছিল। বঙ্গভঙ্গ হয়েছে, তাকে রদ করার চেষ্টা চলছে, মুসলমানরা স্বতন্ত্রপ্রয়াসী হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। ১৯০৬ সালে সিমলায় বড়লাটের কাছে তারা একটি ডেপুটেশনও পাঠিয়েছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বড় ধরণের অনৈক্যের ভাব দেখা গেছে এবং এর এক বছর পরেই সুরাটের অধিবেশনে কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে পড়ল। ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই বিভক্ত হয়ে পড়েছে এই প্রশ্নে যে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রকৃত পথ কী হবে প্রার্থনা, প্রতিবাদ ও অনুনয়ের নীতিই (the policy of three 'P's - Prayes, Protest and Please) থাকবে না আরও জোরালো আক্রমণাত্মক নীতি গৃহীত হবে। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সন্ত্রাসকে নতুন প্রকরণ হিসাবে দেখার প্রবণতা ইতিমধ্যেই ভারতীয় চেতনায় বাসা বেধেছে। হিন্দুদের রাজনৈতিক সত্তা বিভক্ত হচ্ছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক সত্তা সৃষ্টি করার প্রাথমিক কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে — জাতিগত বিপর্যয়ের এটি একটি বিপন্ন মুহূর্ত। পূর্ণস্বায়ত্বশাসনের চরম ডাক দেওয়ার এইটিই কী হতে পারে একটি সমাহৃত মুহূর্ত? কিন্তু বিপিনচন্দ্র সে ডাক দিলেন — সময়ের কাছে অনুগত না থাকার এই বন্ধন অসহিষ্ণু যৌবনের তাড়না তাঁকে এক চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের জন্য লড়াই করার হাতিয়ার কোথায়? লড়াইয়ের কাজকে সুবিন্যস্ত

করার সংগঠন কোথায়? সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সেই উদ্বেলিত গণশক্তি কোথায় যা আমরা পরে পেয়েছি, যার দ্বারা আন্দোলনে যোদ্ধা মানব উপাদানের যোগান অক্ষুণ্ণ থাকে? ১৯০৬ সালে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ডাক রাজনৈতিক ভাবে ১৯৪২ সালের 'ভারতছাড়ো' ডাকের মতই ওজস্বী ডাক — কিন্তু 'ভারতছাড়ো' ডাকের সময়ানুবর্তিতা স্বায়ত্বশাসনের ডাকে ছিল না। মনে রাখতে হবে যে ১৯০৬ সালে বাংলার সমস্যা সর্বভারতীয় সমস্যার রূপ নেয়নি। বঙ্গভঙ্গ, বয়কট, স্বদেশী কোন ঘটনাই ভারতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচির অঙ্গীভূত বিষয় হয়ে উঠতে পারে নি। এই অবস্থায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করে পূর্ণস্বায়ত্ব শাসনের ডাক একটি চরমপন্থী ইস্তাহারের রূপ নিচ্ছিল।

আসলে ১৯০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় বিপিন চন্দ্র যা লিখেছিলেন তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ছিল এবং এই আত্মপ্রত্যয়ই জাতির একটি সঙ্কট মুহূর্তে কিঞ্চিৎ বেপরোয়া ও উচ্চকিত আত্মঘোষণার রূপ নিয়েছিল। বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ "সময় হয়েছে যখন সত্য, পৌর অগ্রগতি এবং জনগণের স্বাধীনতার স্বার্থে আমাদের ব্রিটিশ বন্ধুদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে তারা আমাদের জন্য ইতিমধ্যে যে করুণাঘন কাজগুলি করেছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা সত্বেও আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রগতি ও মুক্তির কাজে তাদের দ্বারা আর পরিচালিত হতে পারি না। তাঁদের দৃষ্টিকোণ আমাদের নয়। তাঁরা ভারত সরকারকে জনপ্রিয় করতে চান কিন্তু তার একান্ত ব্রিটিশ চরিত্রকে তাঁরা বদলাতে চান না। আমরা চাই তাকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বায়ত্তশাসিত করতে।"[৩] বিপিনচন্দ্র পালের এই রচনাটির পুরোটাই সমকালীন লন্ডন টাইমস্ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সরকার মোটেই তাকে ভালো নজরে দেখেননি। আসলে অতি অল্পবয়স থেকে বিপিনচন্দ্র প্রতীচ্য বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে তাঁর কর্মসূচিতে সবসময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক রূপান্তরের আভাস থাকত। শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে তাঁরা যে দলটি গড়েছিলেন তার প্রতিজ্ঞা পত্রের প্রথম কথাই ছিল স্বায়ত্ব শাসনের কথা। ১৮৭৬-৭৭ সালে এই প্রতিজ্ঞা পত্র রচিত হয়েছিল। এতে আরও চারটি বৈপ্লবিক কর্মসূচির কথা বলা ছিল। বিপিনচন্দ্র এইভাবে এই কর্মসূচিকে বর্ণনা করেছেন।

> "এই প্রতিজ্ঞা পত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল— 'আমরা জাতিভেদ মানিবনা; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোল বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।"
>
> "তৃতীয় কথা ছিল— 'লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিব।"
>
> "চতুর্থ কথা ছিল— 'অশ্বারোহন, বন্দুক ছোঁড়া (তখনও অস্ত্র আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।"

"পঞ্চম কথা ছিল — আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহা অর্জন করিব তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভান্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ করিব।"

'ইহা ১৮৭৬-৭৭ ইংরাজির কথা। আমরা এই প্রতিজ্ঞার সকলগুলিই যে রক্ষা করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলিতে পারিনা। যে কমিউনিজমের (Communism) আদর্শে" আমরা এই দলটা বাঁধিতে গিয়াছিলাম অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, সাধারণ অর্থ ভান্ডারে নিজ নিজ উপার্জিত অর্থ দান করিব এবং সেই ভান্ডার হইতে প্রয়োজনোপোযোগী বৃত্তি লইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিব, — এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিজ্ঞা গুলি সকলেই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।"[৪]

১৮৭৬ সালে বিপিনচন্দ্রের বয়স ছিল ১৮বছর। ১৮০৬ সালে ছিল ৪৮ বছর। ১৮ বছর বয়সে তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তির সামাজিক মুক্তি। ৪৮ বছর বয়সে চাইলেন ব্যক্তির তথা সমস্ত জাতির রাষ্ট্রিক মুক্তি। এই মুক্তি চেতনাই বার বার ভারতীয় রাজনীতিতে 'স্বরাজ' নাম নিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা হয়েছে ভিন্ন। অরবিন্দ ঘোষের কাছে স্বরাজ প্রাচীন ভারতীয় চৈতন্যের পুনঃস্থাপনা, সত্যযুগের প্রত্যাবর্তন। অপগত জাতীয় গৌরবের পুনরাবির্ভাব, বিশ্ব শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকরূপে ভারতবর্ষের লুপ্ত ভূমিকার পুনর্নবীকরণ এবং শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে বেদান্তের আদর্শকে সার্থক করার জন্য জনগণের আপন মুক্তির নিরলস প্রয়াস।[৫] অরবিন্দ ঘোষ এই শর্তসাপেক্ষ আত্মমুক্তির কথা বলে বলেছিলেন— এইটিই প্রকৃত স্বরাজ— ভারতবর্ষের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় প্রকৃত স্বরাজ। বিপিন চন্দ্রের কাছে স্বরাজের বোধটি ছিল অন্য। ১৮৭৬-৭৭ সালে যিনি মার্ক্সীয় ব্যক্তি স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে ব্যাক্তি সম্পত্তির ধারণার অপনোদন ঘটিয়ে যূথবদ্ধ আর্থ সামাজিক অস্তিত্বের কথা ভাবেন তাঁর পক্ষে সনাতন ভারতের লুপ্ত হিন্দু মহিমাকে ফিরিয়ে আনার কথা বলা সম্ভব ছিল না। তিনি সচেতন ছিলেন কারণ তাঁর ইতিহাসবোধ প্রখর ছিল — যে ভারতবাসীর ভাগ্যকে উন্নত করার জন্য ইংরাজরা ত্যাগ ('sacrifice') স্বীকার করেছেন। অতএব ইংরেজদের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু ইংরাজদের অধীনে দাসত্বকে তিনি অনপনেয় কলঙ্ক বলে মনে করতেন— ইংরাজদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন স্বশাসনের মধ্যে দিয়ে আপন প্রভুত্বকে সতত স্বয়ংক্রিয় রাখার সর্বকালীন অধিকারটুকু। লক্ষণীয় যে প্রাচ্যকে ভাবালু আবেগে তিনি তুলে ধরেননি, অকারণে অতীতে ফিরে যাননি, প্রাচ্যকে অনুমোদন করতে গিয়ে প্রতীচ্যকে পরিহার করেননি— বিজ্ঞান, কারিগরী ও আধুনিকতার রাস্তা থেকে সরে যাননি যা গান্ধীর নেতৃত্বে ঘটেছিল। ভ্যালেন্টাইন চিরোল একবার বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে যা হয়েছিল প্রাচ্যের

আর কোথাও তা হয়নি। প্রতীচ্যের উত্থানকে একটি প্রত্যক্ষ ও স্বীকৃত 'শাসকত্বে' পর্যবসিত করা হয়েছিল।[৬] বিপিনচন্দ্র পাল এই 'শাসকত্ব' বা Rulership কে আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন এই 'শাসকত্ব' আসবে 'আত্মশক্তি'র উদ্বোধনে। অরবিন্দের মত ভারতীয় সনাতনত্বের নির্নিমেষ আরাধনা তিনি চাননি, কিন্তু আত্মশক্তির নিশর্ত উত্থানকে তিনি সমস্ত কর্মসূচিতে দেখতে চেয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল রাজনীতির মধ্যে ভাবের বিমূর্ত উপস্থিতিকে দেখতে চাননি। চেয়েছিলেন ভিন্নতর লড়াই যার দ্বারা নিজের শাসকত্বকে নিজের দখলে রাখা যায়। বেদান্তের পরিশীলিত মনন এবং আত্মশক্তির অনুশীলিত উদ্বোধন এই দুইকে অস্বীকার না করেও তিনি চেয়েছিলেন পরিষ্কার রাজনীতির অবহেলিত মর্যাদায় তার যথাযথ পুনর্বাসন হোক। সমকালীন নেতাদের মধ্যে বিপিন চন্দ্র পাল ছিলেন একজন বিরল রাজনীতিজ্ঞ যিনি রাজনীতির অঙ্গনে ভিন্নতর বোধের কুসুমশোভা দেখতে চাননি। শাসকত্ব যেখানে লক্ষ্য সেখানে রাজনীতিই একমাত্র মাধ্যম— অন্য কিছু নয়। একথা তিনি বুঝেছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১) বিপিন চন্দ্র পাল, *নবযুগের বাংলা,* পৃ. ১২৬। বিপিন চন্দ্র ১৩২৮-৩১ সনে ১৬টি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলি *বঙ্গবাণী* নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়। এই প্রবন্ধগুলি নিয়েই ১৩৬২ সনে প্রকাশিত হয় তাঁর বই *নবযুগের বাংলা*। ১৩৭১ সনে (ইং ১৯৬৮) এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছিল একটি প্রবন্ধ—'বাংলার নবযুগের নাট্যকলা ও নাট্যচার্য গিরিশচন্দ্র'। এই প্রবন্ধে সম্বন্ধে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক জানিয়েছেন "ইহা বিপিন চন্দ্রের এক পৃথক রচনা। 'নবযুগের বাংলার' ধারাবাহিকতা মধ্যে পড়ে না।" এই দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থটিই এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

২) *Bipin Chandra Pal centenary 1858* (1958) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। পৃ. ২৩৪ ১৯০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর *বন্দেমাতরম* পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ "The time has come when in the interest of truth and ciric advancement and the freedom of people,Our British friends should be distinctly told that while we are thankful for all the kind things they have done for us already, the sacrifices they have made to make our lot easy and their yoke light, we can not any longer suffer ourselves to be guided by them in our attempts at political progress and enancipation. Their point of view is not ours . They desire to make the Government of India populer without ceasing in any scense to be essentially British; we desire to make it autonomous absolutely free of British control."

৩) তদেব

৪) *নবযুগের বাংলা* পৃ. ১২৬-১২৭

৫) স্বরাজ বলতে অরবিন্দ ঘোষ বুঝেছিলেন এই ধারণাটিকে ঃ "the fulfilment of the ancient life of India under modern conditions, the return of the *satyayuga* of national greatness, the resumption by her of her great role of the Teacher and guide, self liberation of the people for the final fulfilment of the vedantic ideal in politics ..." তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন ঃ "... this is the fine swaraj for india", অমলেশ ত্রিপাঠীর *The Extremist challenge* গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ২৯

৬) Valentine chirol লিখেছিলেন ঃ "For no where else in the orient has the accendancy of the accident been translated as in India into terms of direct and accepted rulership"– *The Reawekening of the orient and other Addresses* by Sir Valentine chirol , Yusuke Tsurumi and Sir James Arthur Salter, New Heven, 1925, The Yale University Press, p. 30 বর্তমান প্রবন্ধে 'rulership' শব্দটি গ্রহণ করে তার বঙ্গানুবাদ 'শাসকত্ব করা হয়েছে।

"উনিশ শতকে সাহেবিপনা ও বাঙ্গালিয়ানা : একটি দৃষ্টিকোণ"

অনমিত্র দাশ

পাশ্চাত্যের অভিঘাত এ দেশের শিক্ষিত মানুষের মানসিকতার নানান স্তরে পরিবর্তন এনেছিল একথা ঠিকই, কিন্তু তাদের বোধবুদ্ধিকে সম্পূর্ণ অগোছাল করে দেয় নি। সেই সময়ে পাশ্চাত্য তথা ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা আপাত দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বিপরীতধর্মী মননের পরিচয় দিয়েছিলেন। অথচ খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তাদের মধ্যে এই বিরোধ ছিল আপেক্ষিক। বিশেষতঃ দেশকে ভালবাসা এবং এর ঐতিহ্য রক্ষা ও উন্নতির প্রশ্নে, সবাই ছিলেন একই পথের পথিক। তবে কোনও বিশেষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চয়ই পার্থক্য ছিল। এই ফারাক গড়ে উঠেছিল তাদের সামাজিক অবস্থান ও রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। সব কিছুকে না মেনে, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস এদের মধ্যে দেখা দেয়।

এর সব থেকে বড় প্রমাণ পাওয়া যাবে, উনিশ শতকের অল্প পরিচিত মৌলিক সামাজিক বাংলা নাটকগুলির তালিকার দিকে দেখলে।[১] শুধু এর বিষয়-বৈচিত্র্য আমাদের অবাক করে এমন নয়, একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখার সংখ্যাও প্রচুর। যেমন বিধবা বিবাহ, নারীশিক্ষা[২] ইত্যাদি সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ সম্বলিত নাটক আছে; তেমনই সমসাময়িক ঘটনা, যথা - মোহন্ত কাহিনী, ইত্যাদি নিয়েও পক্ষে বিপক্ষে নাটক পাওয়া যায়।[৩] এমনই একটি আকর্ষণীয় দিক হলো উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়া। যেমন '*বুঝলে কি না*' নাটকের উত্তর দেওয়া হলো '*কিছু কিছু বুঝি*' নাটকের মাধ্যমে। আমাদের আলোচ্য নাটকদ্বয়ও এই পর্যায় ভুক্ত।

প্রথম নাটকটি '*একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?*'; লেখার সময় ১৮৭৪ খ্রিঃ। লেখকের ছদ্মনাম ছিল 'বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য'। উত্তর হিসেবে দ্বিতীয় নাটকটি লেখা হয়েছিল এর দুবছর পরে ১৮৭৬ খ্রিঃ (সংবৎ ১৯৩৩)। '*একেই বলে বাঙ্গালি সাহেব!*', নামে এই নাটকটি লেখক 'শ্রী গিরিগোবর্দ্ধন' ছদ্মনামে লিখেছিলেন। উভয়েরই প্রকাশ স্থান ছিল কলকাতা।

দুটি নাটকেরই বিষয় ছিল, বিলেত ফেরৎ সিভিলিয়ানের সাহেব হওয়া। নাম দেখলে বোঝা যায়, প্রথমজন এই সাহেব হওয়াকে ভাল চোখে দেখেননি; অন্যজনের মত ভিন্ন। কিন্তু তাঁদের এই পার্থক্য সত্যিই খুব গভীর ছিল না ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে

সংযোগে তারা দিশেহারা হয়ে যাননি। নিজের মতো করে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বুঝে, তার ভাল দিকগুলিকে নিয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাদের ধারণার মধ্যে যে পাশ্চাত্য ধরণ ছিল, সেটি আসলে রেনেসাঁসের মনন। সঙ্গে ছিল দেশজ মন। অন্ততঃ এই দুই নাটককারের বিপরীত দৃষ্টিকোণ সম্বলিত দুটি নাটক আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব।

উনিশ শতকের এই নাটকের সাহিত্যিক মূল্যের তুলনায় ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। কারণ, স্বল্প পরিচিত কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এই নাট্যকারদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, তৎকালীন অবস্থার উপর নির্ভরশীল নিজের কিছু বক্তব্য জনগণের সামনে তুলে ধরা। সাহিত্যস্রষ্টা বা কাহিনীকার কখনোই তারা হতে চাননি। যেমন, "এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ[৪] পাঠে, বর্তমান হটাৎ বাবুরা নিজ নিজ কুব্যবহার পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় জনক জননীর প্রতি প্রীতি সহকারে ভক্তি প্রদর্শন এবং সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যতনবান হয়েন তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ মনে সমুদায় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।" (৩; ভূমিকা) আমাদের আলোচ্য লেখকদ্বয়ও এর ব্যতিক্রম নন। 'একেই কি বলে ... ' ভূমিকাতে লেখা হয়েছে, "উপহাস রূপ টুপি শিরের ভূষণ/গড়লেম 'বাঙ্গালি সাহেব' নব্য প্রহসন। /যদি কারোও মস্তকেতে এ টুপি হয় ফিট/ হিন্ট লয়ে শুধরে যাও হয়ে পড় টীট্।" *'একেই বলে...'*-তে লেখক প্রথমেই স্মরণ করেছেন যে "কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত" এটি লেখা হয়নি। তিনি বলছেন, "এই প্রহসন পাঠ করিয়া যদি আপনাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়, তবে দেশের পরম সৌভাগ্য।" অর্থাৎ উভয়েরই একটি নির্দিষ্ট সামজিক কর্তব্য থেকে এই রচনা করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শক্তি এদেশের যুব সম্প্রদায়ের মনে তার প্রতি অন্ধ অনুকরণের যে স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিল, সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখাই ছিল এই প্রহসনদুটির উদ্দেশ্য।

বরং এই মিল সম্পর্কে তারা নিজেরাই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের চাহিদা ছিল পার্থক্য গড়ার। কারণ, যুগচেতনা তাদের ভাবতে শিখিয়েছে; নিজের মতো করে ভালমন্দ বিচার করে তর্ক করার ক্ষমতা দিয়েছে। যদিও *'একেই বলে ...'*-র লেখক স্পষ্ট বলছেন, "অনেকেই এই পুস্তকের নাম পাঠ করিয়া মনে করিতে পারেন যে, ইহা ইহার সদৃশ অপর এক প্রহসনের উত্তর স্বরূপ। আমি তাঁহাদিগকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, কোন প্রকার জনরঞ্জনকারী পুস্তক পাঠে ইহা লিখিত হয় নাই।" (২; ভূমিকা) কিন্তু আমাদের এমনটি বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। আসলে এটি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনের প্রভাব। কারণ, "আমি পাঁচালিদলভুক্ত ব্যক্তি নহি যে অন্যের সহিত বাগ্বিতন্ডায় প্রবৃত্ত হইব।" (২; ভূমিকা) লেখক নিজেকে পাঁচালি কথকতার পুরানো গ্রাম্য ট্রাডিশনের সঙ্গে মেলাতে চান না।[৫] বরং, নাটকদ্বয়ের গল্পের কাঠামো থেকে মনে হয় যে দ্বিতীয়টি, প্রথমটির অনেকাংশে অনুসারী। উভয় নাটকে মূল চরিত্র

বিলেত ফেরৎ সিভিলিয়ান। দুটিতেই প্রথম দিকের দৃশ্যগুলিতে গ্রামস্থ স্বার্থান্বেষী কুটিল চরিত্রগুলির প্যাঁচকষার গল্প আছে। তাছাড়া গল্পের গতি অনেকাংশে আবর্তিত হয়েছে, সিভিলিয়ানদ্বয়কে সমাজে গ্রহণ করা হবে কি না, এই প্রশ্ন ঘিরে। এছাড়া প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির পার্থক্যও যেন আরোপিত। যেমন *'একেই কি বলে ...'*-র মূল চরিত্র গোপাল বাংলা বলে সাহেবি ঢঙ্গে; অথচ *'একেই কি বলে ...'*-র মূল চরিত্র গদাধর কথা বলে স্বাভাবিক ভাবে। গল্পের কাঠামোয় শেষের দিকে যে পার্থক্য আছে, সেটি থাকা নাটককারের উদ্দেশের জন্য জরুরি ছিল। *'একেই কি বলে ...'*-র লেখক তার উদার মন নিয়ে পাশ্চাত্যের ভালগুণগুলি দেখাবেন বলেই যেন আগের নাটকের সঙ্গে পার্থক্য তৈরি করেছেন।

'একেই কি বলে ...'-র লেখক যদি উদার ও উন্নয়নমুখী মননের পরিচয় দেন, সেক্ষেত্রে *'একেই কি বলে ...'*র লেখক কি রক্ষণশীল ও পশ্চাৎমুখী বক্তব্য রেখেছিলেন? নাটক দুটি পড়লে কখনও সেটি মনে হবে না, বরং বোঝা যাবে, বিলেত ফেরৎ বাঙ্গালি-সাহেবদের ভাল মন্দ দুটি দিক তারা দুজনে বিচার করেছিলেন।

সাহেবদের নকল করেত গিয়ে বাঙ্গালিদের মধ্যে যে সামাজিক অন্যায় করার ঝোঁক তৈরি হয়েছিল, *'একেই কি বলে ...'*-র লেখকের আপত্তি ছিল তার বিরুদ্ধে। নাটকের এক চরিত্রের বক্তব্য থেকে লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়, - "বাপ মার মনে দুঃখ দেওয়া কি বিলাতি সভ্যতার ফল?" (১;পৃঃ ২৬) সাহেব সেজে পিতামাতার প্রতি অভক্তি প্রদর্শনের যে প্রবণতা কিছু ব্যক্তির মধ্যে দেখা গিয়েছিল, সেটি নিন্দা করাই ছিল এই প্রহসনের উদ্দেশ্য। নাটকের মূল কাঠামো থেকেই এটি পরিষ্কার। বিলেত ফেরৎ সিভিলিয়ান গোপাল প্রথমে তার পিতামাতার কথা শুনতে নারাজ। বরং সে তার কৃতকর্মের পক্ষে নানারকম যুক্তি দিতে থাকে, যার কোনটাই শিক্ষিত রুচিশীল মানুষের পক্ষে সমর্থন যোগ্য নয়। সবশেষে অবশ্য গোপাল টডের 'রাজস্থান' পড়ে তার মত বদলায় এবং পিতামাতার কাছে ফিরে যায়। রামায়ণের প্রসঙ্গ নাটকে এনে লেখক বুঝিয়েছেন, রামায়ণের দেশে পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা সমাজের কাছে কাম্য হতে পারে না। (১; পৃঃ ৫,৩৭) বরং পিতামাতাকে ছেড়ে যাওয়ার যুক্তি হিসাবে গোপাল যখন মনুষ্যেতর সমাজের উদাহরণ দেয় এবং ডারউইনের শরণাপন্ন হয়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই লেখক অন্য একটি চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করেন - "কালেতে যে মানুষ থেকে এক নতুন জানোয়ার উৎপত্তি হবে তা তোমাদের দেখেই বিশ্বাস হচ্ছে।" (১; পৃঃ ৪৭)

কিন্তু লেখক যে সার্বিকভাবে ইংরাজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পক্ষে ছিলেন, সেকথা নাটকের কথোপকথনের মাধ্যমে অনেকবারই স্পষ্ট করেছেন। এই নাটকের এক চরিত্র নিবারণের (প্রধানতঃ এরই বোঝানোর ফলে গোপাল মত বদলায়)। মধ্যে দিয়ে লেখক বলেন, 'ইংরেজি লেখাপড়া শিখলে যে পিতামাতার

উপর অনাদর জন্মে এ আমি কখন বল্‌তে পারিনে।" (১;পৃঃ ৩৯) এর পরেই তিনি হরিশ, রামগোপাল, দ্বারকানাথ ইত্যাদির নাম করে বলেছেন যে, এদের মতো মাতৃভক্তি মুণিঋষিদের ছিল কিনা সন্দেহ। এই নাটকেরই অন্যত্র দেখি গোপালের মার এক প্রতিবেশীনী, কৃষ্ণদাস বাবুর (কৃষ্ণদাস পাল[৬]) প্রশংসা করছেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষিত হয়েও মদ খান না; সমাজের পুরোন আচার অনুষ্ঠান কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সচেতন। আসলে লেখকের আপত্তি ইংরেজি শিক্ষা বা সভ্যতার প্রতি নয়, আপত্তি দেশজ ঐতিহ্যকে হেয় করার বিরুদ্ধে।

এ সম্পর্কে উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। গোপালের মাকে এই প্রতিবেশিনী এসে, বিনোদ বলে এক বিলেত ফেরৎ 'মেজেষ্টরের' গল্প শোনায়। এই বিনোদ বিলেত থেকে এসে মা বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এমন কি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ হিন্দুর আচার আচরণ মানে। পিতামাতার ঠিক করে দেওয়া পাত্রীকে বিয়ে করে (১; পৃঃ ৫৬) শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগর ও মহেন্দ্রলাল সরকার যে ইংরেজি শিখেও বাঙ্গালির চালচলন ও ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন, সেকথাও লেখক তার এক চরিত্রের মাধ্যমে বলিয়াছেন। (১; পৃঃ ৩) এই ধরণের চরিত্র ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি লেখকের সমর্থন খুবই স্পষ্ট। কারণ, তার মূল চরিত্র গোপালের ঐতিহ্য অবমাননার প্রেক্ষাপটে, এই সকল ঐতিহ্যাশ্রয়ী ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা নাটকের উদ্দেশ্যকে অনেক স্বচ্ছ করে।

কোন গোপালকে নাটককার অপছন্দ করছেন? নাটকের প্রথম দিকে আমরা দেখি, সে বৃদ্ধ শিরোমণি মশায়কে ঘুষি মারতে উদ্যত হচ্ছে। (১; পৃঃ ২০) যদিও তাকে গোবর খেতে বলা হয়েছিল বলেই এই আচরণ। কিন্তু বয়স্কদের প্রতি এই ব্যবহার উনিশ শতকে তো বটেই, এখনকার সমাজও সমর্থন করবে না। তাছাড়া বিলেত ফেরৎ গোপাল নিজে মুখে স্বীকার করছে, সে 'duplicity' ও 'obstinacy'-তে বিশ্বাস করে। যার ব্যাখ্যা তার কাছে- "... আমি করবো এক রকম, আর তোমাকে দেখাবো অন্য রকম।" তার কাছে 'obstinacy' মানে - "paying no regard or heed to the clamorous opposition of the press or public opinion." (১; পৃঃ ৪৩) খুবই স্বাভাবিক যে এই গোপাল, একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষের সমর্থন পাবে না। শুধু তাই নয়, এই গোপাল যখন free love অথবা abolition of marriage ইত্যাদির কথা বলে, তখন নাটকের এক চরিত্রের মুখে এক সামাজিক শঙ্কা প্রকাশ পায় - "স্বেচ্ছাচারের তুফান লেগে পশ্বাচারের ঢেউ উঠবে।" লেখক বলান - "নকলে আসলকে জিতেছো ! সত্যিকারের সাহেবরা তোমাদের কাছে কল্‌কে ছেড়ে ঠিক্‌রেও পাবে না।" (১: পৃঃ ৪৯)

এই আসল কথা। সাহেবিয়ানায় হয়তো তার আপত্তি হতো না, কিন্তু 'সাহেবিপনা' দেখানোতে লেখকের আপত্তি। বরং এক্ষেত্রে লেখকের মনে কোনও রক্ষণশীলতা নয়, যুগ ধর্মের সঙ্গে তাল মেলানোর আভাস পাওয়া যায়। "এখন বিলেতে যাওয়া কি

ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোনও দেশে গমন করা যদি পাপ বলে গণ্য করা যায় তাহলে বাঙ্গালির আর উন্নতির কোন পথই থাকে না।" (১; পৃঃ ৬৯)

তবে *'একেই কি বলে ...'* নাটকের একটি ক্ষেত্রে লেখকের ব্যবহার আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। তিনি তার নাটকে যে ভাবে বারেবারে হিন্দুধর্মের পক্ষে সওয়াল করেছেন সেটি থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষ ইংরাজি শিক্ষা তিনি কী ভাবে গ্রহণ করেছিলেন? নাটকটি ভালভাবে পড়লে আমরা দেখব - যখনই তিনি হিন্দুধর্মের সঙ্কট ও সঙ্কটমোচনের কথা বলেছেন,, তখনই প্রায় একই সাথে কলিকাতার প্রসঙ্গ তুলেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে এই কলিযুগের কল্পনা এক ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।[৭] শ্বেতমুখের আগমন আমাদের প্রচলিত সমাজকে উল্টে পাল্টে দিয়েছে এবং এর থেকে মুক্তি কল্কি-অবতার এলে, এরকম ধারণা তখন বহুল প্রচলিত।[৮] অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষ একটি সামাজিক সঙ্কটকে তারা ধর্মের মোড়কে দেখেছেন মাত্র। আমাদের লেখকও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তার 'কলির গান' পড়লে বোঝা যায় তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের পরিবর্তনের সমস্যাকে ইংরেজি শিক্ষার কুফল হিসাবে দেখছেন। (১; পৃঃ ৪০-৪১) যে একই কুফলের দ্বারা প্রভাবিত তার সমালোচিত চরিত্র গোপাল। সুতরাং, তিনি ধর্মের কথা বলে কেবল তুলনা করেছেন মাত্র।[৯] তার আসলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। তিনি যদি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের অন্ধ অনুরাগী হবেন, তাহলে কেন প্রথমেই পুরোহিত রঘুনাথ শিরোমণিকে লোভী স্বার্থান্বেষী করে আঁকবেন? শুধু এটাই নয় - যদিও তার নাটকের শেষে গোপাল গোময় ভক্ষণ করে প্রায়শ্চিত্ত করে, কিন্তু তিনি একথাও বলেন যে, " ... এখন আর উৎসাহশীল নব্যদের বিলেত যাওযার দরুণ প্রায়শ্চিত্ত করতে পেড়াপিড়ি করা নিতান্ত অনুচিত কার্য।" (১; পৃঃ ৬৯)

আরও একটি কথা বলে আমরা এই প্রসঙ্গের ইতি টানব। এই নাটকে আমরা দেখি, ব্রাহ্মণের প্রতি লেখকের ক্ষোভ আছে। ফলে মনে হতে পারে তার সনাতন -হিন্দু মন এর জন্য দায়ি। কথাটা আংশিক সত্যি। কারণ আমরা দেখলাম, তার সনাতন-হিন্দু মনের আড়ালে কাজ করছে স্বদেশ চেতনা। যেটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ একটি বিষয়। অতএব যখন কোনও ব্রাহ্ম প্রকাশ্যে হিন্দু হওয়ার জন্য লজ্জাবোধ করেন, তখন নাটকের এক চরিত্র বলে - "পৃথিবীতে কী সভ্য কী অসভ্য কোন জাতিরই লোক আপনার স্বীয় কুলের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না।" (১; পৃঃ ৩৮) তাছাড়া, ব্রাহ্মদের মধ্যেও তো দোষত্রুটি ছিল। এই নাটকে আমরা দেখেছি - একটি ব্রাহ্ম পত্রিকায় হিন্দুর ছেলে সঙ্গে ব্রাহ্ম মেয়ের বিয়ে হয়েছে বলে সমালোচনা করা হচ্ছে। আর এক পেছনে যুক্তি, হিন্দুর ছেলেটি বিলেতে গিয়ে গোমাংস খেয়েছে (১; পৃঃ ৬২)। হিন্দুদের রীতিনীতিতে অবিশ্বাসী ব্রাহ্মরা যখন এই যুক্তি দেখান, তখন লেখকের যুক্তিবাদী মন তাকে সমর্থন

করার কোন কারণ খুঁজে পায় না। এই লেখক যখন টডের রাজপুত ঐশ্বর্যের গল্প পড়িয়ে স্বদেশ চেতনা ফেরান, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সনাতন হিন্দু ধর্ম তার কাছে স্বাদেশিকতার উপায় স্বরূপ। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে যে স্বাদেশিকতা অবশ্যই কাম্য।

অবশ্য *'একেই বলে বাঙ্গালি সাহেব'* নাটকে ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। লেখক বহুবার হিন্দুদের দ্বিচারিতা প্রকাশ করেছেন। হিন্দুদের পাপাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ ইত্যাদি জনসমক্ষে তুলে ধরে তার সৃষ্ট ব্রাহ্ম চরিত্র গৌরীশঙ্কর। (২; পৃঃ ৭-১০) এছাড়া লেখক তার গল্পের কাঠামোর মধ্যে দিয়ে তথাকথিত সমাজরক্ষক হিন্দুদের আসল ক্লেদাক্ত রূপটি প্রকাশ করে দেন। ধর্মের এই সব ধ্বজাধারীরা কীভাবে নীচ স্বার্থের জন্য অন্যদের ক্ষতি করছে এবং দলাদলি ও ক্ষোভ লালসার বশবর্তী হয়ে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে, নাটককার সুনিপুণ ভাবে সে কথা আমাদের জানিয়েছেন। ব্রাহ্মদের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকলেও একটি ক্ষেত্রে দেখি তিনি ব্রাহ্মদের দু-এক জনের মদ খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলছেন, -"আর কেউ 'ব্রহ্মানন্দ' পান করে ক্ষান্ত থাকে।" (২; পৃঃ ৩৫) শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মদের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে উৎসবের ঘটা দেখে তার মুর্ল চরিত্রের বক্তব্য - "... ঐ দলের উৎসাহ দেখে দুঃখ হয়"। (২; পৃঃ ৬৬) এই পরিমিতি বোধ পাশ্চাত্য শিক্ষারই প্রতিফলন। একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি এখানেও নেই। ধর্ম নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষা তার মধ্যে অনেক সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল। অন্ততঃ পূর্বের নাটককারের মতো স্বদেশ চেতনার খাতিরেও তিনি ধর্মকে ব্যবহার করেননি। তার কাছে বাঙ্গালির সাহেব হওয়ার সঙ্গে স্বাদেশিকতার কোনও বিরোধ নেই এবং ধর্ম দিয়ে স্বদেশপ্রীতিকে ব্যাখ্যা করতে হয় না। জাতীয়তাবাদ তার কাছে অনেক স্পষ্ট ও সরাসরি আসে। ভূমিকাতে তিনি বলেন -"এ প্রহসনের উদ্দেশ্য কেবল দেশের হিতসাধন।"

এ নাটকের গল্পের কাঠামোতে আমরা দেখি, লেখক বিলেত ফেরৎ সিভিলিয়ান গদাধরের ভাল গুণগুলি দেখার চেষ্টা করছেন। তার পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা অসীম। বরং তার পরিবারের দুর্যোগের জন্য দায়ি, তথাকথিত সমাজ রক্ষকদের কুচক্রী মন। অথচ নাটকের এক জায়গায় আমরা দেখি, এই কুচক্রীদের একজন বিপদে পড়লে গদাধরই তাকে রক্ষা করে। (২; পৃঃ ৪৮-৪৯) এই গদাধরের প্রতি লেখকের সমর্থন খুবই স্পষ্ট নাটক যতো এগায়, আমরা ততো এক নিঃসঙ্গ গদাধরের ছবি দেখি। "আত্মীয় স্বজনেরা জীবদ্দশাতেই ত পরিত্যাগ করেছে ... এ সব জেনে শুনেও ত ইংরেজরা আমাদের Civil Service Fund থেকে বাদ দিয়েছে।" (২; পৃঃ ৫৩)

আসলে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে গদাধরের মধ্যে দিয়ে লেখক তখনকার ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর লোকেদের সঙ্কট ও মানসিক টানাপোড়েনের ছবি এঁকেছেন। যারা তাদের প্রাপ্ত শিক্ষার মর্যাদা পাচ্ছে না। এবং খুব সম্ভবত লেখক নিজেকে এর সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন। সমাজে শিক্ষিত সুযোগ প্রাপ্ত লোকেদের অযথা

হয়রানি বন্ধের উদ্দেশে, তার এক চরিত্র বলে -"যদ্যপি এই সকল উচ্চপদ যুক্ত উন্নত লোককে সমাজ হতে বহিস্কৃত করে দিই, তবে কি ১০ টাকা মাইনের সরকার ও কেরাণি লয়ে সমাজ করতে হবে?" (২; পৃঃ ৭)[১০]

এই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন। এরা Lecture ও Deputation - এর বিরোধী। কারণ, East Indian Association "কেবল জমিদারি আর রায়ত এই লয়েই ব্যস্ত"। (২; পৃঃ ৬৮-৬৯) তারা ভাবে "আমাদের দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে।" (২; পৃ ৭১) এক্ষেত্রে হয়তো, গদাধর বা এই শ্রেণীর লোকেরা দেশের উন্নতির প্রসঙ্গে নিজেদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং একটি শ্রেণীস্বার্থ ভিত্তিক ধারণা গড়ে তুলেছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, তারা দেশের উন্নতি যথার্থই চায়। তাদের শিক্ষিত মন ও বুদ্ধি তখনকার সীমাবদ্ধ তাকে বুঝতে শিখেছে। তারা বলছে - "কেবল Reformation -এর জন্য এক জনের সমস্ত জীবন ওতে দেওয়া চাই।" শুধু বাক্য দ্বারা কিছু হয় না। হাতে কলমে করে দেখাতে হবে (২; পৃঃ ৭২)। আর এরা যেহেতু বৃত্তিগত স্বার্থের কারণে সেটি পারবে না, সেজন্য তারা নিজেদের জীবন ও পরিবারকে পাশ্চাত্যের সমস্ত ভাল গুণগুলির মোড়ক দিয়ে গড়ে তুলছেন।

এই ভাবে আমরা দেখি বাঙ্গালির সাহেব হওয়ার সমস্যাকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলেও, স্বদেশ চেতনা কিংবা সমাজের উন্নতি তারা উভয়েই চেয়েছিলেন। তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের ফারাকের জন্যই এই বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে। ছদ্মনামেলেখার ফলে আমরা তাদের যথার্থ পরিচয় পাই না।[১১] কিন্তু *'একেই কি বলে'*-র লেখক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ছদ্মনামে 'ভট্টাচার্য্য' থাকাতে সেটি বোঝা যায়। আর তখনই আমরা বুঝতে পারি, কেন তিনি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়াতে শঙ্কিত? তবে এটাও বুঝতে হবে, তিনি কিন্তু কোথাও পাশ্চাত্যের বিরোধী ছিলেন না। নিজের মতো করেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বুঝেছিলেন।

এই আপেক্ষিক পার্থক্য ছাড়াও, এদের অনেক সরাসরি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যা আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। যেমন উভয়েই আধুনিক খবরাখবর রাখতেন। যেমন, *একেই কি বলে*'-তে দেখি লেখক ডারউইনের বিরোধী Mivart-এর প্রসঙ্গ তুলেছেন।[১২] আবার *'একেই কি বলে'*-তে 'Mysteries of the court of London'-এর প্রসঙ্গ পাই।[১৩] আরও দেখা যায় যে, উভয়েই গণতন্ত্রের পক্ষে। *'একেই কি বলে'*-তে "The Glorious House of Commons" প্রসঙ্গে লেখক বলছেন "যাহা প্রজা লোক চায় না এই হাউস অব কমন্স টাহা করিটে ডেয় না"। (১; পৃঃ ১৬) আবার *'একেই কি বলে'*-তে আমরা দেখি নায়ক চরিত্র গদাধর পার্লামেন্টে প্রতিনিধি পাঠানোর পক্ষে। (২; পৃঃ ৬৯) এটি নিশ্চয়ই লেখকদ্বয়ের গণতন্ত্র বিশ্বাসের প্রতিফলন।

আশ্চর্যের বিষয়, এরা উভয়েই সঠিকভাবে তাদের আলোচ্য সমস্যার মূল খুঁজে পেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত সঙ্কটের মধ্যে। *'একেই কি বলে'*-র লেখক এক জায়গায় বলছেন -"বেশী লেখা পড়া শিখলে সারত্ব জন্মায়, ... কিন্তু যে সকলগুণপুরুষেরা পাত কতক পুঁতি উল্‌টেছেন, তারাই কেবল গরবে পৃথিবীকে সরাখানা দেখেন।" (১; পৃঃ ৩৯) এই একই কথার প্রতিধ্বনি আমরা পাই *'একেই কি বলে'* - নাটকে। "আমাদের দেশে লিখতে পড়তে অনেকে শিখেছে; কিন্তু বিবেচক লোক কম। শুদ্ধ ইংরাজি লেখাপড়াকে শিক্ষা বলে না; কিন্তু আমাদের তৃতীয়াংশে লোকের ওইরূপ "Education"। (২; পৃঃ ৭৫)[১৪] তাদের এই মিল আমাদের এইটুকু বুঝতে সাহায্য করে যে, সমাজের মৌলিক প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না।

শুধু তাই নয়, তাদের মুখ্য চরিত্রের মূল সঙ্কট সম্পর্কেও তাদের মত পার্থক্য ছিল না। বিলেত ফেরৎ এই বাঙ্গালিরা যে পরিচয় সঙ্কটে ভুগছেন সে সম্পর্কে উভয় লেখকই সচেতন ছিলেন। *'একেই বলে ...'* -তে দেখি গদাধর বলছে, "সাহেবী পোষাককে সকলে ঘৃণা করুক কিন্তু মান্য করে।... এই সব কারণ ভেবে পোষাক বদলানো উচিত স্থির করেছি।" (২; পৃঃ ২৩)[১৫] এমনকি এই নাটকের একটি স্থানে দেখি, গদাধরও নিজ কর্মস্থলে সাহেবি ঢঙ্গে বাংলা বলে। কিন্তু এত করেও কাছারিতে জজ সাহেব তাকে গুরুত্ব দেয় না। (২; পৃঃ ৬২-৬৩) তার এই সঙ্কট *'একেই কি বলে ...'* -র গোপালের থেকে আলাদা কিছু নয়। এখানে লেখক গোপালের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন "বাঙ্গালীর চেলে চল্লে আমলা সকল রাস পেঙ্গে নেবে, তারা বাবু বলে ডাকবে ...consequently for the sake of keeping one's position and honour, আমাদের সাহেবি চালে চলতে হবে।" (১;পৃঃ ৪৫)

দুজন নাটককারই চান এরকম যাতে না হয়। তাদের কাহিনীতে, বক্তব্যে, একথাই বারবার প্রকাশ হয়েছে। সাহেবি চালে চলা নয়, অর্থাৎ 'সাহেবিপনা' নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আত্মস্থ করে, দেশের মঙ্গলের জন্য ভাবলেই সত্যিকারের 'বাঙ্গালিয়ানা' প্রকাশ পাবে। এবং সেই একটি 'দৃষ্টিকোণ' আমরা দেখি উভয়েরই মধ্যে।

টীকা ঃ

১) কোনও তালিকাই সম্পূর্ণ নয়। তবে তথ্যপঞ্জীর ৬ ও ৭ নম্বর বইদুটি মিলিয়ে একটি ধারণা করা যেতে পারে।

২) উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে মুবশিদের বইয়ে। (তথ্যপঞ্জী ৯ নম্বর)

৩) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে, দুশান জ্‌বাভিতেল ও হানা নাইৎসকোভার প্রবন্ধ - 'কাম এন্ড হিয়ার দি স্টোরি ...'। New Oriental by Monthly; 6th vol, 1967. (৭; পৃঃ ৫৭)

৪) লক্ষণীয়, এরা নিজেরাই নাটকগুলিকে নাটক না বলে প্রবন্ধ বলছেন। অর্থাৎ এগুলির সাথে ইউরোপের ইতিহাসের 'প্যামফ্লেটে'র তুলনা করা যায়।

৫) সুমন্ত ব্যানার্জী বলছেন, উনিশ শতকের প্রহসনের উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্যে 'কবিওয়ালাদের' গ্রাম্য ট্র্যাডিশনের একটি মিল পাওয়া যায়। "The primal need for excitement, best found in slanging matches between rivals, was something t *bhadralok* society could not escape." (১১; পৃঃ ১৭৫) কিন্তু আমরা দেখছি, আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষিত লেখক সচেতন ভাবে এটি অস্বীকার করছেন। তার শিক্ষিত মন বিচার করে অন্য কথা বলতে চেয়েছিল বলেই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। 'খেউড়' করার জন্য নয়।

৬) প্রখ্যাত সাংবাদিক। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের স্থায়ী সম্পাদক হয়েছিলেন। (৮; পৃঃ ৯৬)

৭) উনিশ শতকে সামাজিক ক্ষেত্রে যে গভীর পরিবর্তন হয়েছিল, সাধারণ ভাবে তখনকার মানুষ সেটিকে কলিযুগ বলে বর্ণনা করতেন। সেই সময়ের নাটক, সাহিত্য ইত্যাদি পড়লে এই বিষয় স্পষ্ট হয়। এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ যে, ঔপনিবেশিক শাসন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কলিযুগ সম্পর্কে আলোচনা দেখা যেতে পারে। -'Renaissance and Kaliyuga : Time Myth and History in colonial Bengal' প্রবন্ধে। (১৩; পৃঃ ১৮৬-২১৫)

৮) তপন রায়চৌধুরীর আলোচনায় Halbfass আলোচনা উল্লেখে এই তথ্য পাওয়া যেতে পারে।(১৪; পৃঃ ৪-৫)

৯) "In the case of any culture facing challenge, a crisis, a search for an alternative paradigam and a frantic effort to adopt tradition is noticeable." অমলেশ ত্রিপাঠীর এই প্রতিপাদ্যকে কোনে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। (১০;পৃঃ ৩৩)

১০) পড়াশোনা শিখেও কেবলমাত্র কেরাণির চাকরির সুযোগে এদের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, সেটি জানতে দ্রষ্টব্য "Renaissance and Kaliyuga : Time Myth and History in colonial Bengal" (১৩; পৃঃ ২১৫)

১১) জয়ন্ত গোস্বামী উভয়েরই নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যুক্তি ও তথ্যসূত্র না থাকায় সেটি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। (৬; পৃঃ ৮১৯, ৮২৩)

১২) পুরো নাম ছিল - Saint George Jacson Mivart, ডারউইনের তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। (তথ্যপঞ্জী ১৫) যদিও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু আমাদের কাছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, 'Calcutta Medicine of Journal'-এ প্রকাশিত এই খবরও লেখক রাখতেন।

১৩) G.M.Reynolds-এর এই উপন্যাসটি বিলেতে নিষিদ্ধ হয়। বড়লোকের কুৎসাপূর্ণ এই বই মাদ্রাজে ছাপা হয়ে, এদেশে ইংরাজি জানা পাঠকদের সমাদর পায়। (৫; পৃঃ ২৪৫)

১৪) সমসাময়িক বহু আলোচনাতেই এই মতের সমর্থন পাওয়া যাবে। একটি উদাহরণ -"অনেক যুবক নভেল পাঠ করিয়াই বিদ্যাচর্চ্চার অভিমান করেন।" (৪; পৃঃ ৪৩)

১৫) পোষাক- পরিচ্ছদ যে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা আছে Cloth, Clothes, and colonialism : India in the Nineteenth Century প্রবন্ধে। (১২; পৃঃ ১০৬-১৬২)

সূত্র-নির্দেশ

১) *একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?* -বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য। কলিকাতা, ১৮৭৪ সাল।

২) *একেই বলে বাঙ্গালি সাহেব।* -শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন। কলিকাতা, ১৯৩৩ সম্বৎ।

৩) *একেই কি বলে বাবুগিরি?* -শ্রীকালাচাঁদ উকিল ও শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৭৮৫ শকাব্দ।

৪) *বঙ্গের পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা।* -শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী কলিকাতা, ১৭৯৭ শকাব্দ।

৫) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খন্ড (উনবিংশ শতাব্দ) -সুকুমার সেন, কলিকাতা, ৫ম সংস্করণ ১৩৭০।

৬) *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন* - জয়ন্ত গোস্বামী, কলিকাতা, ১৩৮১।

৭) *বাংলা নাটকের প্রথম আমল* - দুশান জ্‌বাভিতেল। পাওয়া যাবে; চতুষ্কোণ পত্রিকা। বৈশাখ, ১৩৮৩।

৮) *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান* - শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা), কলিকাতা, ১৯৭৬।

৯) *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৮৫৪-১৮৭৬)* - গোলাম মুরশিদ,, ঢাকা, ১৯৮৪।

১০) *ইতালীর র‍্যানেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি* - অমলেশ ত্রিপাঠী। কলিকাতা, ১৯৯৪।

১১) *The Parlour and the streets : Elite and popular culture in nineteenth century Calcutta* - Sumanta Banerjee. Calcutta, 1989.

১২) *Colonialism and its forms of knowledge :* - The British rule in India - Bernard S. Cohn Delhi, 1997.

১৩) *Writing Social History* - Sumit Sarkar, Delhi, 1998.

১৪) *Perceptions, Emotions, Sensibilities : Essaays on India's colonial and Post-colonial Expriences* - Tapan Raychaudhuri, delhi, 1999.

১৫) *Enclyclopedia Britannica 2001* - Compact Disk edition. Chicago, 2001. (Search result. Mivart).

সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইয়ং বেঙ্গলের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও ভূমিকা

ভবতোষ কুণ্ডু

ইয়ং বেঙ্গল বলতে এখানে হিন্দু কলেজের ইংরাজি ও ইতিহাসের শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) শিষ্য ও ঘনিষ্ট সহযোগীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে — যাঁদের একটি তালিকা ডিরোজিওর ছাত্র ও শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র *এ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ অফ ডেভিড হেয়ার* (১৮৭৭) নামক গ্রন্থে প্রদান করেছেন এবং যার উপর মূলতঃ ভিত্তি করে সুশোভন সরকার ও সুমিত সরকারের ন্যায় ঐতিহাসিকগণ ইয়ং বেঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর নীল বিদ্রোহ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উল্লেখ্য নীলদর্পন মামলায় বিচারক Mr. Mordaunt wells এদেশবাসীকে "A nation of perjurers and forgerers" বলে অভিহিত করলে রামগোপাল ঘোষ ১৮৬১ সালের ২৬শে আগষ্ট রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ঐ বিচারকের সমালোচনা মুখর হয়েছিলেন।[২]

আলালের ঘরে দুলাল (১৮৫৮) নামক গ্রন্থে প্যারীচাঁদ মিত্র যশোহরের নীল চাষিদের পক্ষে কলম ধারণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে নীলকর সাহেবদের শোষণ, বিচারের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সুবিধাজনিত আইনের (অর্থাৎ মফঃস্বল আদালতের পরিবর্তে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে ইংরাজি আইনে বিচারের সুবিধা) ত্রুটি এবং সরকারি আমলাদের তাদের প্রতি গুরুতর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় নীলচাষিরা নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছে এবং জমিদারগণ চাষিদের সাথে এই বিদ্রোহে সামিল। তিনি মন্তব্য করেছেন যে জমিদারগণ নীলকর সাহেবদের তুলনায় ভাল।[৩]

কিশোরীচাঁদ মিত্র *দি ইন্ডিয়ান ফিল্ড* নামক পত্রিকায় ১৮৫৯ ও ১৮৬১ সালে ধারাবাহিক ভাবে নীলচাষিদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, শোষণ, বলপ্রয়োগ ও বঞ্চনামূলক আচরণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন।[৪] কিন্তু তিনি নীলচাষিদের "Insurgent conduct to their land holdings" কে সমর্থন করেন নি।[৫] তিনি চেয়েছিলেন নীলচাষি ও নীলকর সাহেবদের এমন একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক বা উভয়ের পারস্পরিক সুবিধা বা স্বার্থ নিশ্চিত করবে।[৬] ১৮৪৯ সালের ব্ল্যাক এ্যাক্ট সমর্থনে রামগোপাল ঘোষ বিচারের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ানদের বিশেষ সুবিধা বিলোপসাধনকে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে

যে একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বলে মনে করেছিলেন ১৮৫৯ সালে কিশোরীচাঁদ তারই পুনরুক্তি করেছিলেন।[৭] কিশোরীচাঁদ এদেশে ব্রিটিশ পুঁজি অনুপ্রবেশের বা ইউরোপীয়দের দেশের ভিতরে বসতি স্থাপনের বা প্ল্যানটেশন স্থাপনের বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি ব্রিটেনের শিল্পের কাঁচামালের যোগানের জন্য ম্যানচেষ্টারের পুঁজিপতিদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সুন্দরবন এলাকায় cotton চাষের জন্য।[৮] তিনি মনে করতেন যে ভারতে ইউরোপীয় উদ্যোগীদের ও পুঁজির অনুপ্রবেশ ভারতবাসীদের সুখ সমৃদ্ধির সহায়ক।[৯] সুতরাং তিনি নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করলেও ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের মূল শোষণমূলক দিকটি উপেক্ষা করেছেন এবং মূলতঃ এদেশে ইউরোপীয়দের বসতিস্থাপনের বা নীলকর সাহেবদের এদেশ থেকে উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন না। এখানেই নীল বিদ্রোহে তাঁর চিন্তা ও ভূমিকার মধ্যে রয়েছে বৈপরিত্য। বৈপরীত্যের আর একটি দিক হল যে তিনি নীলচাষের ক্ষেত্রে বিত্তশালী চাষিদের স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। সেক্ষেত্রেও নীলকর সাহেবদের সাথে চুক্তিভঙ্গের জন্য তিনি Criminal Procceding - এর বিরোধী ছিলেন কিন্তু Civil Proccedings - এর নয়।[১০]

(দুই)

জমিদার ও চাষি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদের চিন্তার ঝোঁক কোন দিকে ছিল? উত্তর পশ্চিমে ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রস্তাব প্রদান কালে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই ব্যবস্থা খুদকস্ত ও পাইকস্ত উভয় শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবে এবং তাদেরকে জমিদার শ্রেণীর দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে না।[১১] তিনি New sale law কে (১৮৫৯) স্বাগত জানিয়েছিলেন যার একটি লক্ষ্য ছিল Under tenure holders -এর স্বার্থ রক্ষা করা।[১২] তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন ১৮৫৯ সালের Rent Bill-কে যা মূলতঃ খুদকস্ত রায়তদের স্বার্থকে রক্ষা করতে চেয়েছিল।[১৩] তিনি মনে করতেন যে রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের পরিবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হোক খুদকস্ত রায়তদের পক্ষে নূতন শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে।[১৪] সুতরাং তিনি খুদকস্ত চাষিদের স্বার্থ নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন।

অন্যদিকে তিনি মনে করতেন যে রায়তওয়ারী এবং ভায়াচারী বন্দোবস্তের তুলনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাল, কেমনা ভূস্বামী শ্রেণী জনগণের সাথে সার্বভৌম শক্তির একটি স্বাভাবিক যোগসূত্র এবং ভারতবর্ষ ও সমস্ত সভ্য দেশের স্বাভাবিক অবস্থার একটি condition। তিনি জমিদার শ্রেণীকে মহাদানব এবং কৃষক শ্রেণীকে একেবারে নির্দোষ বলে মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন যে জমিদার ও কৃষক উভয়েরই কিছু দোষ ও কিছু গুণ আছে।[১৫] ১৮৪৬ সালে তাঁর দাদা প্যারীচাঁদ মিত্র জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে যে

Theory of Natural Identity of Interests -এর ধারণা তুলে ধরেছিলেন। কিশোরীচাঁদ ১৮৬১ সালে তারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।[১৬] তিনি লিখেছেন যে, জমিদারদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করলেও কৃষকদের প্রতি উদার মনোভাব দেখায় নি বা চাষিদের অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে তাদের উপর আরোও কর চাপিয়েছেন। কিন্তু তারা সংখ্যায় সামান্য বা ব্যতিক্রম। এদেশীয় জমিদারগণ স্বভাবসিদ্ধভাবে ইউরোপীয় জমিদার বা নীলকর সাহেবদের ন্যায় স্বার্থলোলুপ নহে। অবস্থার চাপে পড়ে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক অবস্থার চাপে দেশীয় জমিদারগণকে নির্মমতা ও অর্থদোহনের আশ্রয় নিতে হয়। যে বাধ্যবাধকতা ইউরোপীয় জমিদারদের ছিল না।[১৭] জমিদারদের প্রতি এই ঝোঁক তাঁর দাদা প্যারীচাঁদের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বঙ্গদেশের লেফটেনান্ট গর্ভনরের কাউন্সিলে রাজস্ব এবং জমিদার ও রায়ত সংক্রান্ত বিতর্কে ঐ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে প্যারীচাঁদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৮ সালে তিনি জমি বিক্রয় বা হস্তান্তরের ফলে under tendure holders -এর স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।[১৮] ঐ সালে ছোটনাগপুর টেনিওর বিল সংক্রান্ত আলোচনার সময় Forced labour -এর অবসানের বা ঐ labour আদায়ে যারা অভিযুক্ত তাদের শাস্তিদানের বা তাদের কাছ থেক ক্ষতিপূরণ আদয়ের দাবি তিনি উত্থাপন করেছিলেন।[১৯] কিন্তু ১৮৬৯ সালে ল্যান্ড লরড্ ও টেনান্ট প্রসিডিওর বিলের আলোচনার সময় তিনি জমিদারদের রায়তদের উপর, এমন কি occupancy রায়তদের উপর খাজনা বাড়ানোর অধিকারের বা জমি থেকে উৎখাতের বিরোধিতা করেন নি।[২০] ঐ বিলের ৬৮ নং সেকসনে রায়তদের নিজের ক্ষেত্রে জমিদারদের Distraint-এর অধিকারের বিরোধিতা তিনি করেন নি।[২১] উল্লেখ্য তিনি ১৮৪৬ সালে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্য হিসাবে জমিদারদের ঐ সব অধিকারের সমালোচনা করে যে Pro-Ryoti মনোভাব দেখিয়েছিলেন (*ক্যালকাটা রিভিউতে* প্রকাশিত 'জমিদার ও রায়ত'' শীর্ষক প্রবন্ধে) তা থেকে সরে এসে জমিদারদের স্বার্থের দিকে ঝুঁকেছিলেন সম্ভবতঃ জমিদার প্রভাবিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রভাবে (যে এ্যাসোসিয়েশনের সাথে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন)।

উল্লেখ্য ১৮৬৯ সালে লেবার ট্রান্সপোর্ট এবং কন্ট্রাক্ট এ্যাক্টস এ্যামেন্ডমেন্ট বিল সংক্রান্ত আলোচনার সময় প্যারীচাঁদ চা বাগানে কুলিদের প্রতি চা বাগানের মালিক ও তার সহয়োগীদের খারাপ আচরণের বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তিনি মূলতঃ যে সমস্ত কুলিরা তিন বছর কাজ করেছিল তাদের মজুরি বৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞ কুলিদের নয়া চুক্তির স্বাক্ষরের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আগত নূতন কুলিদের স্বার্থ বা অধিকারের বিষয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন বলে মনে হয় না।[২২]

যাই হোক, ইয়ং বেঙ্গলের কোন কোন সদস্য শিক্ষাকে রায়তদের অবস্থার উন্নতির একটা উপায় বলে মনে করেছিলেন। ১৮৫৯ সালে কিশোরীচাঁদ লিখেছিলেন যে বিজ্ঞানসম্মত কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে চাষি বা জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং রাজস্ব বৃদ্ধিও ঘটবে।[২৩] ১৮৬৮ সালে কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী মন্তব্য করেছিলেন যে শিক্ষার মাধ্যমে রায়তদের নৈতিক মানসিক ও বাস্তবিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। বিশেষ করে খাজনা আদায় নিয়মিত এবং কম খরচে হবে।[২৪] ১৮৭০ সালে প্যারীচাঁদ মন্তব্য করেছিলেন যে শিক্ষা রায়তদের অবস্থার উন্নতির একটি উপায় এবং শিক্ষা শুধুমাত্র উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত থাকা উচিত নয়।[২৫]

কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য ক্রমান্বয়ে কোন আন্দোলন গড়ে তোলে নি। দ্বিতীয়তঃ তাদের বিশেষ করে কিশোরীচাঁদ ও প্যারীচাঁদের শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে শ্রেণীচরিত্র প্রতিফলিত অর্থাৎ উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জন্য এবং মাতৃভাষায় প্রাথমিক বা কৃষি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ মানুষের জন্য। তৃতীয়তঃ প্রশ্ন উঠতে পারে ঔপনিবেশিক অবস্থায় ভারতবাসী এবং শাসক ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যে ক্ষেত্রে মূলগত শোষণমূলক দিকটি বিদ্যমান সেক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার কৃষক বা সাধারণ মানুষের অবস্থার কতখানি উন্নতি ঘটাতে পারত। উল্লেখ্য ১৮৭০ সালে প্যারীচাঁদ এবং কিশোরীচাঁদ চাষিদের মধ্যে cotton বা তুলা চাষের শিক্ষা বিস্তারের কথা ভেবে ছিলেন।[২৬] কিন্তু cotton তখন ভারত থেকে ইংল্যান্ডে রপ্তানি হত ইংল্যান্ডের বস্ত্র শিল্পের স্বার্থে। সুতরাং cotton - এর চাষ দেশীয় বয়ন শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে ভারতের ঐ শিল্পের পুরানো গৌরব পুনপ্রতিষ্ঠিত করত কিনা এবং কৃষক বা সাধারণ মানুষের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে পারত কিনা তা প্রশ্নের দাবি রাখে।

(তিন)

ব্রিটিশ আমলে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে কৃষক বা সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন হত। ১৮৬০ সালে প্যারীচাঁদ কলিকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এবং মাদ্রাজ ও বোম্বের শাখা সংস্থার কাজে আবেদন জানিয়েছিলেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে তহবিল গঠন করার জন্য টাকা আদায় করতে। তিনি মনে করেছিলেন যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের দুর্দশার মূল কারণ ঐ অঞ্চলের অদ্ভুত রাজস্ব ব্যবস্থা। কিশোরীচাঁদ ঐ রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে থমসন প্রবর্তিত ব্যবস্থায় গ্রাম্য জনগণের উপর অতিরিক্ত কর আদায় (Rack-rental of the village system under the Thomsonian settlement) দুর্ভিক্ষের জন্য বিশেষভাবে দায়ি। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অবশ্য কিশোরীচাঁদ জমিদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন চেয়েছিলেন।

১৮৬৬ সালে বেথুন সোসাইটিতে কিশোরীচাঁদ "Lessons of Famine" নামক বক্তৃতায় দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের কতকগুলি প্রস্তাব প্রদান করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল কৃষি ফসল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি কৃষি বিভাগ এবং দুর্ভিক্ষের সময় দ্রুত কাজের জন্য তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নরের বদলে একটি গভর্নর-ইন-কাউন্সিল স্থাপন।[২৯] ঐ সোসাইটিতে ১৮৬৭ সালে প্যারীচাঁদ প্রস্তাব দিয়েছিলেন দেশের কৃষিসম্পদ দেখাশোনার জন্য একটি ডিপার্টমেন্ট গঠনের।[৩০] প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ পরাধীন ভারতে দুর্ভিক্ষের মৌলিক কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেন নি।

(চার)

ব্রিটিশ সরকারের কর নীতি, যা মূলতঃ জমিদার শ্রেণী উচ্চবিত্ত শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত করেছিল তার বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গলের কয়েকজন সদস্য সরব হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য রামগোপাল ঘোষ এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র ভূমিকার এবং জলাজমি বিক্রয়ের অনুমতি প্রদানের সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[৩১] প্রশ্ন উঠতে পারে যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার কি ভূমি কর ধার্য করেছিলেন?

যাই হোক, ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের এ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী কৃষ্টদাস পালকে দক্ষিণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় যে দক্ষিণারঞ্জন জল কর বা Fisheries -এর উপর কর আরোপের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রদত্ত জমিদারের অবিচারের উপর ঐ কর একটি আক্রমণ।[৩২]

কিশোরীচাঁদ মিত্র রাস্তা শুল্ক এবং আয়করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ঐ কর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মোতাবেক জমিদার কর্তৃক দেয় নির্দিষ্ট কর প্রদানের শর্তকে লঙ্ঘিত করেছে। তাঁর মতে আয়কর শুধু ধনিক শ্রেণী নয় ইতিপূর্বে ট্যাক্স প্রদান করেছে এমন জমিদার এবং গরিব ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে। তিনি বলেছিলেন যে Road Cess ধনী ও দরিদ্র সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ ব্যহত করবে।[৩৩] রামগোপাল ঘোষ যদিও সরকারি ব্যয় কমানো এবং আয়করকে একটি সাময়িক ব্যবস্থা বলে মনে করতেন তথাপি তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে আয়কর অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যাহৃত হবে।[৩৪] প্যারীচাঁদ মিত্র ও আয়করের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন।[৩৪(এ)]

কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির কর সম্পর্কে ইয়ং বেঙ্গলের কোন কোন সদস্য মুখ খুলেছিলেন। ১৮৬৪ সালে রামগোপাল ঘোষ বলেছিলেন যে করের সর্বাধিক হার নির্ণয় নিষ্প্রয়োজন। এই হার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত।[৩৫] ১৮৬৮ সালে প্যারীচাঁদ মন্তব্য করেছিলেন যে প্রতিটি বাড়ির উপর কিছু

পরিমাণ কর ধার্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে করের সর্ব্বোচ্চ হার ৫ টাকা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। যদিও তিনি ভেবেছিলেন যে দশ টাকা গরিব বাড়ির মালিকদের পক্ষে দেওয়া দুষ্কর।[৩৬] প্যারীচাঁদ এবং কিশোরীচাঁদ কলিকাতার উপর সরকার কর্তৃক সমস্ত পুলিশী ব্যয় চাপানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিশোরীচাঁদ বলেছিলেন বোম্বাই শহরের তুলনায় কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল করের হার বেশি।[৩৭]

ব্রিটিশ সরকারের করনীতির বিরুদ্ধে বিশেষ করে রাস্তাশুল্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সময়ে কিশোরীচাঁদ একসময় ব্রিটিশ শাসনের সুফল বা ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে Mutual Identity of Interests -এর তত্ত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, যদিও পরক্ষণেই তিনি ব্রিটিশ F. John Bright Fawcatt বা ঐ তত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য কে (যিনি আয়করের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন) লেখা প্রশংসাপত্র রচনার সময়ে।[৩৮] যাই হোক সরকারের করনীতিতে তিনি বা তাঁরা ক্ষুদ্ধ ছিলেন। এজন্য তিনি ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সঠিক প্রতিনিধিত্বের দাবি তুলেছিলেন[৩৯] এবং প্যারীচাঁদ ১৮৮০ সালে পার্লামেন্টের সামনে ভারতীয়দের সংস্থার প্রস্তাব নিয়ে হাজির হওয়ার কথা বলেছিলেন।[৪০] উল্লেখ্য অযোধ্যার জমিদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জর্জ কুপারের ভূমিকরের বিরুদ্ধে অসন্তোষহেতু প্রাদেশিক কাউন্সিলে অর্ধেক দেশীয়, বিশেষ করে ভূম্যধিকারে প্রতিনিধি এবং Supreme council -এর অর্ধেক সদস্য প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা মনোনয়নের দাবি তুলেছিলেন।[৪১]

উল্লেখ্য সরকারের প্রতি, বিশেষ করে করনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ হিন্দুমেলায় (১৮৬৭) যোগ দিয়েছিলেন। ঐ মেলায় ১৮৭২ সালে "মিলে সব ভারত সন্তান" গান গাওয়া হয়েছিল। ঐ সময় কিশোরীচাঁদ মেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৪২] কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান লীগের (১৮৭৫) চেয়ারম্যান এবং ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি এবং কিয়দংশে শিবচন্দ্রদেব ও রামতনু লাহিড়ী ঐ এ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[৪৩] উপরিউক্ত আধারাজনৈতিক বা রাজনৈতিক এ্যাসোসিয়েশন, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন জাতীয় কংগ্রেসের পটভূমি রচনায় সাহায্য করেছিল। তবে ইয়ং বেঙ্গলের জাতীয়তাবাদী চেতনার সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বা ঐ শ্রেণীর প্রভাবাধীন ইয়ং বেঙ্গল গরিব কৃষক শ্রেণী বা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশাকে ভিত্তি করে কোন গণ আন্দোলনের কথা ভাবেন নি বা ঐ দুর্দশার মৌলিক সমাধানের কোন চিন্তা কারণ নি। তাছাড়া ব্রিটিশ শাসনের বা ব্রিটিশ পুঁজিবাদের মৌলিক শোষণের দিকটি তাঁরা ভাবেন নি। কিছুদিন পর জাতীয় কংগ্রেসের কোন কোন রচনায় যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছিল তা তাঁদের কাছে ছিল দূরান্ত।

উল্লেখ্য প্যারীচাঁদের রাম কমল সেনের জীবনী সংক্রান্ত রচনায়(১৮৮০) উইলসন উল্লিখিত ব্রিটিশ শিল্পের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধনের উক্তির উদ্ধৃতি স্মরণীয়।[৪৪] কিন্তু দেশীয় শিল্পের এই করুণ পরিণতি ব্রিটিশদের সাথে ভারতের যোগসূত্র সম্পর্কে তাঁর আশাবাদকে আচ্ছন্ন করে নি। অন্যদিকে এগ্রিহরটিকালচারাল সোসাইটিতে Raw Cotton সম্পর্কে রচনায় তিনি Cotton কে রপ্তানির সম্ভাবনার আলোকে বিশ্লেষণ করেছিলেন।[৪৫] যখন বোম্বাইতে ভারতীয় মিল গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।[৪৬]

সূত্রনির্দেশ

১) মিত্র, প্যারীচাঁদ, *এ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ অফ ডেভিড হেয়ার,* কলিকাতা, ডবলিউ নিউম্যান এ্যান্ড কোঃ, ১৮৭৭, পৃঃ ২৭-২৮, ৩২

২) সিনহা, নির্মল, *ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল,* কলিকাতা, একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃঃ ১৫৯

৩) মিত্র, প্যারীচাঁদ, *আলালের ঘরে দুলাল,* বন্দোপাধ্যায়, অমিত কুমার সম্পাদিত, *প্যারীচাঁদ রচনাবলী* (বাংলা), কলিকাতা, মন্ডল বুক হাউস, ১৯৭১, পৃঃ ১০৬-১০৮

৪) *দি ইন্ডিয়ান ফিল্ড,* আগষ্ট ১৩, ১৮৫৯, পৃঃ ২৪৬-২৪৭, অক্টোবর ২২, ১৮৫৯, পৃঃ ৫০-৫১, জানুয়ারি ১৯, মার্চ ২, ৯ ও ২৩, এপ্রিল ৬ ও মে ৪, ১৮৬১, পৃঃ ৫১৯, ৫২৩, ৫৯৩, ৬০৩,৬২৬,৬২৭ ও ৬৫২, মে ১৮, জুন ২৯, ডিসেম্বর ১৩ ও ৩১, ১৮৬১, পৃঃ ১,৭,৮,৩৬১ ও ৩৭৪

৫) ঐ, মার্চ ২৩, ১৮৬১, পৃঃ ৬২৮

৬) ঐ, মে ৪, ১৮৬১, পৃঃ ৬৯৯

৭) ঐ, আগষ্ট ১৩, ১৮৫৯

৮) ঐ, এপ্রিল ১৩, ১৮৬১, পৃঃ ৬৬২

৯) ঐ, ডিসেম্বর ২, ১৮৬১, পৃঃ ৩৭৪

১০) ঐ, এপ্রিল ৬, ১৮৬১, পৃঃ ৬৫০

১১) ঐ, নভেম্বর ৩০, ১৮৬১, পৃঃ ৩৩৮

১২) মিত্র, কিশোরীচাঁদ, "দি নিউ সেলল" (১৮৫৯), ঐ, জুন ২৫, ১৮৫৯, পৃঃ ১৩৩

১৩) মিত্র, কিশোরীচাঁদ, "দি রেন্ট বিল", ঐ, মে ৭, ১৮৫৯, পৃঃ ৭৮-৭৯

১৪) মিত্র, কিশোরীচাঁদ, "দি রায়ত এ্যান্ড দি জমিদার", ঐ, জুলাই ১৬, ১৮৫৯, পৃঃ ১৯৮

১৫) ঐ

১৬) ঐ

১৭) মিত্র, কিশোরীচাঁদ, "এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া", ঐ, সেপ্টেম্বর ১৭, ১৮৫৯, পৃঃ ৩০৬

১৮) প্রসিডিংস অফ দি কাউন্সিল অফ দি লেফটেনান্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল, ভলিউম ৩, জুলাই ১১, ১৮৬৮, পৃঃ ২৫৮-২৬২

১৯) ঐ, নভেম্বর ১৪, ১৮৬৮, পৃঃ ২৭৬-২৭৭

২০) ঐ, মে ১, ১৮৬৯, পৃঃ ৩৫৪-৩৫৮, মে ৯, ১৮৬৯, পৃঃ ৩৮৮-৩৮৯, জুলাই ৩, ১৮৬৯, পৃঃ ৫০২

২১) ঐ, জুলাই ৩, ১৮৬৯, পৃঃ ৫১১-৫১২

২২) ঐ, জুলাই ২৪, ১৮৬৯, পৃঃ ৫৫৭, জুলাই ১২, ১৮৬৯, পৃঃ ৪৯০, আগস্ট ৭ ও ১৪, ১৮৬৯, পৃঃ ৬০৫. ৬৩০-৩২, ৬৪২

২৩) *দি ইন্ডিয়ান ফিল্ড*, সেপ্টেম্বর ১৭, ১৮৫৯, পৃঃ ৩০৬

২৪) প্রসিডিংস অফ দি বেথুন সোসাইটি, পার্ট ২, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, পৃঃ ১৬৩

২৫) ট্রানজ্যাক্সাসন অফ দি বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন, ভলিউম ৪, ফেব্রুয়ারি ১১, ১৮৭০, পৃঃ ৬

২৬) প্রসিডিংস অফ দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ভলিউম ২, সেপ্টেম্বর ২২, ১৮৭০

২৭) ঐ, ১৮৬০, পৃঃ ২

২৮) ঐ, *দি ইন্ডিয়ান ফিল্ড*, জানুয়ারি ২৬ ও ফেব্রুয়ারি ৯, ১৮৬১ পৃঃ ৫১১, ৫৫৫

২৯) প্রসিডিংস অফ দি বেথুন সোসাইটি, পার্ট ২, ডিসেম্বর ১৩,১৮৬৬, পৃঃ ১৭৮-১৭৯

৩০) প্রসিডিংস অফ দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ভলিউম ২, সেপ্টেম্বর ১৮, ১৮৬৭

৩১) ঐ, ভলিউম ২, ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৮৬২, *দি ইন্ডিয়ান ফিল্ড*, মে ৮, ১৮৬১, পৃঃ ৩, অক্টোবর ১, ১৮৬১, পৃঃ ২৭৮-২৭৯

৩২) প্রসিডিংস অফ দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ভলিউম ২, সেপ্টেম্বর ১১, ১৮৫৯

৩৩) ঐ, ভলিউম ২, ১৮৬০, পৃঃ ২, মার্চ ৬, ১৮৬৭, পৃঃ ৯, ভলিউম ৩, জুন ৭, ১৮৭১, পৃঃ ৭-৯, নভেম্বর ১৭, ১৮৭১, পৃঃ ৫, সেপ্টেম্বর ৩০, পৃঃ ১০-১১, দি ইন্ডিয়ান ফিল্ড, এপ্রিল ১৩, ১৮৬১, পৃঃ ৬৬৪, জুলাই ২৭, ১৮৬১, পৃঃ ১২২, নভেম্বর ২, ১৮৬১, পৃঃ ২৯১, দি হিন্দু পেট্রিয়ট, ডিসেম্বর ২০, ১৮৬৯, পৃঃ ৩৯৯

৩৪) প্রসিডিংস অফ দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ভলিউম ২, ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৮৬২

৩৪(এ) ঐ, ভলিউম ৩, নভেম্বর ২৬, ১৮৭২, পৃঃ ৪,
ভলিউম ৪, এপ্রিল ৩০, ১৮৮০, পৃঃ ১৬

৩৫) প্রসিডিংস অফ দি কাউন্সিল অফ লেফটেনান্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল, ভলিউম ১, ফেব্রুয়ারি ২০, ১৮৬৪, পৃঃ ৪১৬

৩৬) ঐ, ভলিউম ৩, মে ২৩, ১৮৬৮, পৃঃ ১৫৩, ১৭৪-১৭৫

৩৭) প্রসিডিংস অফ দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ভলিউম ২, জুলাই ৩, ১৮৬৬,পৃঃ ৮, দি হিন্দু পেট্রিয়ট মার্চ ৪, ১৮৬৭, পৃঃ ৭০

৩৮) প্রসিডিংস অফ দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ভলিউম ৩, নভেম্বর ১৭, ১৮৭১, নভেম্বর ২৬, ১৮৭২, পৃঃ ৪

৩৯) ঐ, নভেম্বর ২৬, ১৮৭২

৪০) ঐ, ভলিউম ৪, এপ্রিল ৩০, ১৮৮০

৪১) ঘোষ, মন্মথনাথ, *রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়* (বাংলা), কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সনস্, ১৩২৪ সাল, পৃঃ ১৮৯-১৯২

৪২) সর্বাধিকারি দেবপ্রসাদ, "কিশোরীচাঁদ মিত্র", *দি ক্যালকাটা রিভিউ*, ভলিউম ৪২ (জানুয়ারি-মার্চ) ১৯৩২, পৃঃ ৩৪৯

৪৩) বাগল, জে. সি. *হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন* কলিকাতা, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ১৯৫৩, পৃঃ ১০, ৩৩-৩৪, ৪৪, ৬১-৬২, সিনহা, নির্মল, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০-১৩১, ৫০৮, ৫১০, ঘোষ, রামচন্দ্র, *এ ব্যায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ অফ দি রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি*, কলিকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮০ , পৃঃ ৪৩-৪৯, দি *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, ভলিউম ৩৮, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯২৯(পার্ট ২, সিরিয়াল নং ৭৬) পৃঃ ১৪০, ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র, *নরদেব শিবচন্দ্র দেব-ও-তৎসহধর্মিনীর আদর্শ জীবনালেখ্য*, কলিকাতা, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১৮, পৃঃ ১২৮-১২৯, মজুমদার, এ.সি. *ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল এভলিউশন*, মাদ্রাজ, জে, এ.ন্যাটেশন, ১৯১৭, পৃঃ ৪১

৪৪) মিত্র, প্যারীচাঁদ, *লাইফ অফ দেওয়ান রামকমল সেন* (কলিকাতা, আই. সি. বোস এ্যান্ড কোং, ১৮৮০), বঙ্গানুবাদ, বাগল, জে.সি. কলিকাতা. সামবোধি পাবলিকেশন লিমিটেড, ১৯৬৪, পৃঃ ১৮-১৯

৪৫) মিত্র, প্যারীচাঁদ, "কৃষি পাঠ" (বাংলা) বন্দোপাধ্যায়, অমিতকুমার সম্পাদিত *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*, (বাংলা), ২৮৮-২৯০

৪৬) সরকার, সুমিত, "দি কমপ্লেকসিটিস অফ ইয়ং বেঙ্গল", *নাইনটিস্থ সেনচুরি স্টাডিস*, নং ৪, অক্টোবর ১৯৭৩, পৃঃ ৫২৩

বোলানের পটভূমি হিসেবে গাজন

অসীম কুমার পাল

চৈত্রের শেষ হয়ে বৈশাখের সূচনা। একটি বছবের কালিমা মুছে নতুন বছরের দিকে পা বাড়ায় মানুষ আর সেই সঙ্গে সমগ্র গ্রাম বাংলা উৎসব আনন্দে মেতে ওঠে। গ্রাম বাংলার এই উৎসবগুলির মধ্যে গাজন উৎসব হল অন্যতম। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলার নানা প্রথা পালন করা হয়ে থাকে। একদিকে সন্ন্যাসগ্রহণের মাধ্যমে কৃচ্ছসাধন, বান ফোঁড়া,জিভফোঁড়া, কাঁটা ঝাঁপ ও আগুনখেলা ইত্যাদির মত কঠোর শারীরিক নির্যাতনের দ্বারা দেবতার আশীর্বাদ লাভের প্রয়াস, আর অন্যদিকে থাকে বিনোদন। গাজন উৎসবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তার বিস্তৃতি। জাতপাত, বয়স, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষই এই উৎসবে যোগদান করতে পারে। শিবঠাকুর গ্রামবাসীর প্রিয় দেবতা। গ্রামজনেরা একত্রে মিলিত হয়ে শিব ভজনায় মেতে ওঠে। তাঁর পূজাকে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ গ্রামবাসীর মনে উৎসারিত হয়ে থাকে। গাজনের গান, পাঁচালী, শ্লোক, সঙ, ছড়া ও বোলান গান তারই অভিব্যক্তি। সন্ন্যাসগ্রহণ ও নানা প্রকার রীতি-প্রথা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল কিন্তু আনন্দ মূলক অনুষ্ঠানগুলি তার বিপরীত। সমস্ত গোষ্ঠীকে নিয়েই তার প্রকাশ। এই দ্বিতীয় ধারার প্রকরণের সমস্ত গ্রাম ও গ্রামজনেরা তাই একাত্ম হয়ে যায়।[১]

বোলান গান হল এই ধরণের একটি আনন্দময় অনষ্ঠান। বলা বাহুল্য এই বোলান গানের সংঘটনকাল হল প্রধানত চৈত্র সংক্রান্তির সময়। বোলান সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-এ (প্রথম খন্ড) বলেছেন যে, 'শিবের গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরিয়া যে তর্জা ছড়া বলিত তাহার বিশিষ্ট নাম বোলান '।[২] আলোচ্য বোলান গান বর্তমানে এক বিশেষ ধরণের লোকসংস্কৃতি হিসাবে বিবেচিত। লোকসংস্কৃতির পশ্চিমাঞ্চল যথা-নদীয়া, বর্ধমান. মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষে বোলান গান অনুষ্ঠিত হয়। বিশদ বিবরণে বলা যায় নদীয়া জেলায় কালীগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, তেহট্ট থানার গ্রামাঞ্চলে এবং সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণাংশের ভরতপুর, সালাব খড়গ্রাম, বড়এঞা প্রভৃতি থানার গ্রামাঞ্চলে বোলান গান অতি মাত্রায় জনপ্রিয়।[৩]

লোকসংস্কৃতির পটভূমিতে বোলানের বয়স খুব বেশি নয়; বরং বলা যায় বোলান এখনও শতবৎসর পূর্তি করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু বোলানের প্রচলিত রূপটি নতুন

হলেও আসলে তা নিঃসন্দেহে প্রাচীন। আজকের দিনে বোলান আমাদের সামনে নৃত্য অভিনয় গান রূপে এসেছে। অবশ্য নৃত্য হয় গানের সুরে আর বিষয় অনুযায়ী অভিনয় হয় যাত্রা ও গীতিনাট্যের মাধ্যমে এবং গান হয় কখনও একক কণ্ঠে কখনও সম্মিলিত কণ্ঠে। সবমিলিয়ে এটাই হল প্রচলিত বোলান। বোলান অধ্যুষিত অঞ্চলের চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত মানুষ চৈত্র সংক্রান্তির দিনগুলিতে বোলান দল তৈরি করে। বিশেষ, করে বাগদি, মুচি, হাড়ি, ডোম, জেলে, মাঝি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরাই বেশি দলে থাকে। এদের উৎসাহ উদ্দীপনায় চৈত্র মাসের বোলান দলগুলি সজীব হয়ে ওঠে।[৪]

বস্তুতঃ বোলান রাঢ়বঙ্গের গ্রামের মানুষের প্রাণের উৎস। বোলান শত দুঃখ,বেদনার মধ্যে ও মানুষকে বেঁচে থাকার কথা শোনায়। বোলান রচয়িতারা অধিকাংশই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কিন্তু একদিকে তারা যেমন রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী নিয়ে বোলান গান রচনা করেন। অন্যদিকে তেমনি কৃষিজীবী দরিদ্র মানুষের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা চিত্রিত করেন। সেইসঙ্গে সমসাময়িক সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বঙ্গ ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরতে ভোলেন না বোলান রচয়িতারা।[৫] সুতরাং চৈত্রশেষে গাজন উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ হল এই বোলান গান।[৬] আসলে গাজন গান হল ধর্মীয় প্রথা পালন আর বিনোদনের মাধ্যম হল বোলান গান। এই সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানটি পরস্পরের পরিপূরক।[৭]

চৈত্র সংক্রান্তির গাজন শিবের গাজন নামেই পরিচিত। কিন্তু বোলান গানে শিব কখনই সামনে আসেন না, সম্ভবতঃ পটভূমিতেই তার অধিষ্ঠান তাই বোলান গানের অনুষ্ঠেয় সময়টাই হল শুধু গাজনের সময়[৮]। আবার গাজন উৎসব কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেচৈত্রমাস হলেও বৈশাখ জৈষ্ঠমাসেও গাজন উৎসব হয়, এবং সে গাজন ধর্ম গাজনরূপে পরিচিত। বাংলায় নানা প্রকার গাজনই আছে যেমন চড়ক গাজন, নীল গাজন, শিব গাজন, বোলান গাজন, গম্ভীরা বা আদ্যের গাজন প্রভৃতি। আবার এই গাজন উপলক্ষেই বোলান গান হয়, তা সে শিবের গাজন বা ধর্মের গাজন যাই হোক না কেন। যদিও সাম্প্রতিককালে বোলান কোন কোন স্থানে ধর্ম বিচ্ছিন্ন নিছক একটি আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু গাজন উপলক্ষেই রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কোন নির্দিষ্ট দেবতাকে পটভূমিতে রেখে বোলান প্রিয় গ্রামগুলি এক বৈচিত্র্যময় আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে পড়ে যার প্রকাশ ঘটে নাচ গান ও অভিনয় সমৃদ্ধ বোলানে।

বোলানের পটভূমি যেহেতু গাজন সেহেতু গাজনের দেবতা ও তাঁদের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজন। গাজন শব্দটির অর্থ নিয়েও আছে নানা মতভেদ। গাঁয়ের সর্বজনের উৎসব, সন্ন্যাসী বা ভক্তদের হুংকার থেকে গাজন, লোকসাধারণের গর্জন থেকে গাজন - এই ধরণের মত কেউ কেউ পোষণ করেন। বঙ্গীয় শব্দকোষে বলা হয়েছে, ধর্মের

উৎসবে ভক্তগণ 'জয় জয় নিরঞ্জন - ধর্ম জয়' 'জয় জয় ধর্ম' ইত্যাদি বলে উচ্চস্বরে গর্জন করে বা ডাকে তাই ধর্মের উৎসব গাজন নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে শ্রী যুক্ত রামকমল সেন চড়কের গাজন সম্পর্কে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাকে গাজন শব্দের ব্যুৎপত্তি হিসেবে তিনি 'গা-জন' অর্থাৎ গ্রামজনের উৎসবের কথাই বলেছিলেন। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে শ্রী যুক্ত বিনয় ঘোষ উক্ত মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গাঁ এর আনুনাসিকতা কখনোই এমনভাবে বিলুপ্ত হয় নি।[৯]

গাজন শব্দটি মূলতঃ শিবের গাজন নামেই বিখ্যাত। গাজন উৎসব শিবের বিবাহ উৎসব রূপেই গ্রামাঞ্চলে উদযাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'মরণমিলন' কবিতায় বিলোচনের বিবাহ চিত্রটি এই লৌকিক ভাবনা থেকেই রূপায়িত করেছেন। ভূতপ্রেতাদির উল্লাসধ্বনিতে, বৃষের গর্জনে, ভুজঙ্গের তর্জনে, বরানুগামীদের পথ কোলাহলমন্ডিত। শিবের গাজন উপলক্ষে এই ধরণের দৃশ্য আজও দেখা যায়।[১০] এই প্রসঙ্গে কালী প্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্‌সা' উল্লেখ্যযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি সেকালের কলকাতার চড়ক পার্বণের বর্ণনা দিয়েছেন। বস্তুতঃ পার্বণ ও গাজন একই সূতায় বাঁধা। তিনি লিখেছেন — "১২০২ সাল কলকাতা শহরের চারিদিকেই ঢাকের বাদ্দি শুনা যাচ্ছে, চড়কীর পিঠ সড় সড় কচ্চে; গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েচে - ছেলেরা গাজন তলায় বাড়ী করে তুলেছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রোদে রোদে রপ্টে রপ্টে বেড়াচ্চে; কখন বলে "ভদ্রেশ্বরে শিব মহাদেব" চিৎকার সঙ্গে যোগ দিচ্চে।"[১২]

রাঢ় বঙ্গের গাজন উৎসবগুলিতে এই দৃশ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। যোগেশ রায় বিদ্যানিধি বলেছেন, শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু গাজন শব্দ আসিয়াছে ধর্মের গাজনে ও মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন।[১৩]

বস্তুতঃ শিবঠাকুরই হলেন চৈত্র সংক্রন্তির গাজনের মূল দেবতা এবং লৌকিক দেবতাদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রাচীনতম। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও এই দেবতাকে কৃষকের দেবতারূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশে 'ধান ভাঙতে শিবের গীত' হয়। অন্যদিকে ধর্মঠাকুরও প্রাচীন গ্রাম্যদেবতার অন্যতম। কূর্মকৃতি প্রস্তরখন্ডই হল ধর্মের প্রতিরূপ আর গ্রামান্তের বৃক্ষমূলে এর অধিষ্ঠান। এই ধর্মঠাকুর কালক্রমে বাংলার অতিপ্রিয় গ্রামদেবতা শিবঠাকুরের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং উভয় প্রকার গাজনই সংমিশ্রিত হয় পড়ে। তাই ধর্মের গাজন ও শিবের গাজনের প্রথা পালন প্রায় একই রকম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য অবশ্য রয়েছে। যেমন ধর্মগাজনে ঘোড়া অপরিহার্য কিন্তু শিবেরগাজনে ঘোড়ার বাবহার নেই।

ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে শিবের গাজনই প্রাচীনতর বলে মনে হয়। সম্ভবত অনুরূপ আচার অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকান্ড পরবর্তী কালে ধর্মগাজনে গৃহীত হয়ে থাকবে। তাই ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াট সাহেবের বিবরণীতে ধর্মপূজা 'দ্বিতীয় প্রকার শিব পূজা' বলে উল্লিখিত হয়েছে। ধর্ম ঠাকুর যে অবশ্যই প্রাচীনতম সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই কিন্তু শিবের পূজা ধর্মঠাকুরের বহু আগে চালু হয়েছে। ধর্মপুরাণের কাহিনীতে ধর্মঠাকুরকে আদিদেব নিরঞ্জন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের স্রষ্টা বলা হলেও তা ঐতিহাসিক সত্য নয়। নিছক কবি কল্পনা মাত্র। শিবপূজার ভারতব্যাপী প্রসারতা, প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্য আলোচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ধর্মঠাকুরের চেয়ে শিবঠাকুরই প্রাচীন দেবতা। অবশ্য ধর্মঠাকুর প্রাচীনতম হলেও বর্তমানে যেরূপ পূজিত হচ্চেন সেরূপে নয়।[১৪]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ধর্ম ছিলেন সেকালে ডোম জাতির দেবতা তাই সেই সমাজই ছিল এঁর প্রধান ভক্ত। কালক্রমে তা অন্যান্য সমাজেও প্রসারিত হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে 'ধর্ম' শব্দটি অষ্টিকগোষ্ঠীর। তাছাড়া ধর্মঠাকুর যে, প্রাগুক্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর দেবতা এ বিষয়েও কোন মতভেদ নেই। সুদূর অতীতে বাংলাদেশের অনুন্নত নিম্নবর্ণের হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মঠাকুরের পূজা সীমাবদ্ধ ছিল।[১৫] একদা ইনি পশ্চিবঙ্গের সর্বত্র পূজিত ছিলেন। পরে ভাগীরথীর দক্ষিণ ও পশ্চিমতীরে রাঢ় অঞ্চলে সীমিত হন।

ডঃ সুকুমার সেনও বলেছেন, 'ধর্মঠাকুরের পূজা চলে এসেছে দেশের তথাকথিত নিম্নস্তরের জনগণের মধ্য দিয়ে। এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বিদ্যায় এঁদের অধিকার ছিল না। গুপ্ত রাজাদের সময় থেকেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণরা ব্যাপকভাবে আসতে শুরু করেন। তারা বাংলাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী নন। তাই ধর্মপূজার সঙ্গে তাদের কোন সংস্রব ছিল না। যে সমস্ত পুরানো ব্রাহ্মণ আগে থেকে ছিলেন তাঁরা নবাগত ব্রাহ্মণদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এঁদের অনেকে পরে বর্ণ-ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। কেউ কেউ বা জাত খুইয়েছিলেন। এমন অনুমানও অসঙ্গত নয়। রামাই পন্ডিতের কাহিনীতে এই প্রাক্তন জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণদেরই জয় ঘোষণার আভাষ পাওয়া যায়। এঁরা সূত্র উপবীতধারী ছিলেন না, তাঁরা তাম্র পবিত্রধারী ছিলেন। এঁদের বেদ, ঋক্, সাম, যজুর বাইরে অথর্ব বেদের ব্রাত্য সুক্তগুলি এমনই অব্রাহ্মণপন্থী প্রাক্‌বৈদিক আর্যদের লুপ্ত ভাঁড়ারের টুকরো। ব্রাত্য ব্রতের উপাস্য; ব্রাত্যের উপাস্য এবং বৈদিক ব্রত বাহ্য। এই তিন অর্থেই অথর্ব বেদের ব্রাত্য বাংলা সংস্কৃতির ধর্মঠাকুরের প্রাচীন প্রতিরূপ। ধর্মঠাকুরের পূজায় বহু লোকজনের আবশ্যক। তিনি বহুলোকের পুজ্য সার্বজনিক দেবতা, ব্যক্তির উপাস্যমাত্র নন। সুতরাং তিনি ব্রাত্য আর তাঁর পূজক হাড়ি, ডোম, চন্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ ও অব্রাহ্মণ জাতি।[১৬]

স্বাভাবিকভাবেই উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজে এই দেবতার কোন স্থান ছিল না। এর প্রাধান্য ছিল কেবলমাত্র হাড়ি, ডোম, চন্ডাল প্রভৃতি সমাজে। অবশ্য কালক্রমে ধোপা, কৈবর্ত, শুঁড়ি, জেলে, বাগদি, নাপিত, সদগোপ এমনকি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সমাজেও ধর্মঠাকুরের পূজা প্রসারিত হয়েছে। ফলে ব্রাহ্মণ্য পূজা পদ্ধতিতে ও ধর্মঠাকুর ক্রমে স্থান করে নিয়েছে। ধর্মঠাকুরের যেরূপ ধর্মপূজার পুঁথি এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় সেই পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বহিরাগত বিশ্বাস ও সংস্কার মিশে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় ও ইরাণীয় সূর্য পূজার ধারা এবং পলিনেশীয় আদিদেবতার বিশ্বাস এর মধ্যে বর্তমান। অধ্যাত্মভাবনা এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে অবৈদিক ও লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা মিশ্রিত হয়েছে।[১৭]

এই কারণে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন - "ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্ আর্য আদিবাসী দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।"[১৮] ফলে ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতিতে বৈদিক ও পৌরাণিক অর্থ ও অনর্থ উভয় পদ্ধতির সমাবেশ হয়েছিল। ধর্মঠাকুরকে কিভাবে লোকদেবতা শিব ক্রমে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন ও এখনও নিচ্ছেন, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ধমানে পাওয়া যায় জামালপুরে বুড়োরাজ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

এই প্রক্রিয়ায় হয়ত ধর্মঠাকুর ক্রমে শিবের সঙ্গে একীভূত হয়ে শিবের গাজনের মধ্যেও নিজের স্থান করে নিয়েছে। তাই ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতিতে লৌকিক প্রভাবের প্রাধান্য এবং ধর্মঠাকুরের তুষ্টিতে আর্যতর প্রভাব লক্ষণীয়। শৈবতান্ত্রিক যুগে ধর্মঠাকুরকে শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল চরমভাবে আর এর ফলেই শিবের গাজনের সঙ্গে ধর্মের মিল পরিদৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে একদা ধর্মের গাজনেই প্রচলিত হয়েছিল মৃতদেহ নরমুন্ড নিয়ে নৃত্যগীত-এ কাজ করত দেয়াশীরা। এর নাম ছিল পাতা নাচ। উত্তর রাঢ়ের কোন কোন স্থানে এরই টুকরো ছবি আজও দেখা যায়। তাই আজকের শিবগাজনের একটি জনপ্রিয় প্রকরণ হল 'কালিকা পাতারি' বা 'কালকে পাতারি' নাচ। এখানেও শবদেহ বা সদ্যকর্তিত নরমুন্ড নিয়ে নৃত্য করার বীভৎস প্রথাটা রয়েছে। মৃতদেহকে শিবরূপে কল্পনা করা হয়। পোড়ো বোলানের একটি প্রকরণে এই প্রথা এখনও টিকে আছে।

ধর্মঠাকুরের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক স্বীকৃতির প্রমাণ ধর্মমঙ্গলকাব্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শশতকে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এই ধর্মমঙ্গলকাব্য। বাঙালির নিজস্ব সাহিত্য হিসেবেও এর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। এই মঙ্গলকাব্যগুলির রচনার যুগে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য আরও বেশি করে কীর্তিত হতে থাকে এবং তিনি আদিদেব নিরঞ্জনে পরিণত হন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মঠাকুর মানব মনে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

প্রবাদে একটি জাতির জীবনচর্যার সুদীর্ঘ ইতিহাস পাওয়া যায়। "ধর্মের নামে কাঠি দেওয়া" প্রবাদটি অতীত সামাজিক রীতির একটি নিদর্শন, যে সামাজিক রীতির মধ্যে ধর্মঠাকুর আশ্রিত হয়েছেন— কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানানোর একটি প্রথা এক সময়ে সমাজে চালু ছিল। অভিযোগকারী তার অভিযোগের বৃতান্ত সকলকে জ্ঞাত করানোর উদ্দেশে ধর্মঠাকুরের ঘট মাথায় নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে উপস্থিত হতেন, তার সঙ্গে থাকতো একজন ঢাকি, যে কাঠি দিয়ে সবাইকে সচেতন করে দিত - এই প্রথা যদিও আজকে আর নেই। কিন্তু এই প্রথাটির মধ্যে ধর্মঠাকুরের প্রভাব ও তার অস্তিত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাস যে বিদ্যমান তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে লাউসেন ও রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী সুবিদিত এবং বহুল প্রচারিত ও আলোচিত বস্তু; যদিও এই কাহিনীদ্বয়ের ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। নিছক কাহিনীস্তরেই এই প্রবাদগুলির স্থান। কিন্তু একথা সত্য যে, ধর্মমঙ্গলকাব্যের ব্যাপক প্রচার ও ব্যাপকহারে বিভিন্ন কবির কাব্য রচনার দরুন এককালে বাংলায় ধর্মঠাকুর বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন। এ থেকে মনে হয় যে, পাঁচশো থেকে দুশো বছর আগে পর্যন্ত এই পূজার পর্যাপ্ত প্রসার ঘটেছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলি সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই এই মঙ্গলকাব্যগুলি রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় কাব্যরূপেই বিবেচিত হয়। এই কাব্য সঙ্গীত রচনার পেছনেও ছিল নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও সামাজিক পরিবর্তন। এদের মধ্যে প্রধান ঘটনা হল তুর্কী আক্রমণে দেশের লোক অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে ও তাদের মনোবল হারিয়ে যায়। ফলে তারা নানা অনার্যশক্তির প্রতীক দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়ে নিরাপত্তা ও মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে। সাধারণ মানুষ একদিকে শাসক শক্তির হাতে আর অন্যদিকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর কাছে শোষিত ও অবহেলিত হওয়ায় বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। আর যে সব নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নি; তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সম্প্রীতি ও সামাজিক সংহতির সৃষ্টি হয়। এই সব কারণে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের কল্পিত দেবদেবীর বার ব্রত, পূজা অর্চনা সাধারণভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে নিম্নবর্গের দেবদেবী উচ্চবর্ণের সমাজে গৃহীত হয়ে পৌরাণিক দেবদেবীর মর্যাদা পায়। তাই আমরা দেখি, মঙ্গলকাব্যগুলির সূচনায়, 'বন্দনা' অংশে নানা ধরণের দেবদেবীর বন্দনা। আর এই কাব্যে অভিজাতদের কথা কম - বণিক, ব্যাধ, ডোম, কামার, ছুতোর প্রভৃতি শ্রেণীর কথাই বেশি। এই প্রক্রিয়াতেই ধর্মঠাকুর এক মিশ্রদেবতায় পরিণত হয়ে বর্ণহিন্দু সমাজে স্থান করে নিয়েছেন।

আবার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধমতের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং এর প্রতীক প্রস্তরখন্ডকে বৌদ্ধচৈত্যের রূপান্তর বলে মনে করেছেন বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্মপূজা এবং বুদ্ধদেবের অন্যতম নাম

"ধর্মরাজ"— এই দুটি তথ্যের উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। "ধর্মপূজা বিধানের" ভূমিকায় সম্পাদক ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় ও ঐ তত্ত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং লিখেছেন যে, বাঙ্গালাদেশেই অনার্যসঙ্গমে বুদ্ধদেবের চরম অধোগতি হয়। এইখানেই বুদ্ধদেব নৈরাত্মদেবীর সহিত শূন্যে ঝাঁপ দিয়া করুণায় দ্রব্য হইয়া গেলেন। তিনি কোথায় মিশিয়া গেলেন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"[১৯]

কিন্তু ধর্মঠাকুর যে বুদ্ধদেব তা প্রমাণিত সত্য নয়। এককালে রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তার কিছু প্রভাব পড়েছে ধর্মঠাকুরের পূজানুষ্ঠানে আর ধর্মঠাকুরও লোকদেবতায় পরিণত হয়েছেন। লোকদেবতা শিব যেমন ক্রমে ক্রমে ধর্মঠাকুরকে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন তেমনি বুদ্ধ ও কালক্রমে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মিশে গেছেন। তাই গ্রামবাংলার সহজিয়া মানসে শিবঠাকুর, ধর্মঠাকুর ও বুদ্ধ একত্র হয়ে এক মিশ্রদেবতার রূপ নিয়েছেন বহুদিন ধরে। চৈত্রসংক্রান্তি থেকে বুদ্ধপূর্ণিমা পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলের লোকোৎসবগুলির নিগূঢ় সমীক্ষায় এই সত্য ধরা পড়ে। তাই গাজন ও বোলান পরস্পর পরিপূরক অনুষ্ঠান।[২০] শিবের গাজন চৈত্রমাসের উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তিতেই তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যে গাজন অনুষ্ঠিত হয় তা সরাসরি ধর্মের গাজনের কথা মনে করিয়ে দেয়। সম্ভবতঃ ধর্মের গাজন সেকালে গুরুত্বপূর্ণ ছিল , একালে শিবের গাজনের মধ্যে তারই প্রভাব দেখা যায়। তাই রাঢ় বঙ্গের বহু স্থানে চৈত্রসংক্রন্তির গাজন ছাড়াও অন্যসময় ধর্মের পূজাতে বোলান গাওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, রাড়বঙ্গে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ও চৈত্রমাসে ধর্মপূজার প্রচলন রয়েছে। তাই বিভিন্ন সময়ের ধর্মপূজা উপলক্ষে বোলান গাওয়ার রীতিও চলে আসছে।

বস্তুতঃ রাঢ়দেশের ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবতা বলে পরিগণিত এবং তার আরাধনা বেশ সমারোহর সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর এর সঙ্গে যুক্ত থাকে ব্যাপক উৎসব। বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের এমন কিছু অঞ্চল সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় যেখানে ধর্মরাজের উৎসব অন্যতম প্রধান লোকোৎসবে পরিণত হয়েছে - অন্য কোন দেবতার পূজা ও তৎসংশ্লিষ্ট উৎসব থেকে পৃথক এক বিশিষ্ট উৎসব।[২১] অতীতে দুর্গাপূজার সময়ে অষ্টমীর রাত্রে পূজার অঙ্গরূপে যে নাচ গান ছড়া কাটাকাটি হত পরবর্তী কালে তা যে ধর্মের গাজনে এসেই স্থান নিয়েছে সেকথা গাজনের বোলান প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রায়োজন।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কোপাই নদীর বাঁকের মাঝামাঝি বাঁশবাঁদী কাহারদের গ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। তাদের প্রিমিটিভ জীবনের পরিচয় দিয়েছেন ধর্মীয় উৎসবের কথা উল্লেখ করে। তিনি লিখেছেন, 'এদের

ধুম গাজনে, ধরমপূজায়, চৈত্রসংক্রান্তির গাজনের বোলানের পালায়। গ্রামের প্রতিনিধি বনওয়ারী গাজনের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়। গজালপেটা চড়কপাটায় শুয়ে কে ডাকে -

"শিবোহে কালারুদ্রহে। বম্ বম্ বম্
শিব চলেন জল শয়নে, চাকে বাজে
ড্যাড্যা ড্যাং
ড্যাড্যা ড্যাং, ড্যাং ড্যাং"।[২২]

আসলে গাজন উৎসবের, তা শিব বা ধর্ম যাঁরই হোক না কেন, অন্যতম অঙ্গই হল বিনোদন। গাজনে সারাদিন ধরে সন্ন্যাসব্রত ধারীরা নানা রকম শারীরিক কসরৎ করেন, কেউ আগুনের উপর দিয়ে হাঁটেন, কেউ গায়ে কাঁটার বাড়ি মারেন, তাদের এই কঠোর কৃচ্ছসাধনার জীবনে বিনোদনের নিতান্ত প্রয়োজন। রাঢ় অঞ্চলে শিব বা ধর্মের যে কোন গাজন উপলক্ষে নানা প্রকার নৃত্যগীত ও বাদ্যের সমারোহ থাকে, এগুলি মূলগতভাবে গাজনের অঙ্গ না হলেও বিনোদন হিসেবে কালক্রমে তা গাজনের অঙ্গীভূত হয়েছে আর এই বিনোদনের অন্যতম উপাদান হল বোলান গান। এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত নৃত্যগীত বাদ্য উৎসব - তার সবকিছুই যে গাজনের সঙ্গে সংপৃক্ত তা নাও হতে পারে কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি ও বিনোদনের নিমিত্তেই তা গাজনের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এমন কি গাজন উৎসবের মধ্যেও নানা ধরণ আছে এবং তার উদযাপনের সময়ের মধ্যেও আছে ভিন্নতা। গাজনের অঙ্গ হিসেবে বোলানও তাই জনপ্রিয় উৎসব হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

কিন্তু বর্তমানে বোলানের বিবর্তিত রূপের মধ্যে তাঁর ধর্মীয় চরিত্র আর ততখানি বজায় নেই। বোলান এখন নিছক আনন্দানুষ্ঠান মাত্র। তাই ধর্মাচরণ অপেক্ষা আনন্দ গ্রহণই প্রধান। ধর্মীয় উপলক্ষ থেকে বিনোদনের লক্ষ্যে বোলানের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় তার বিবর্তনের ও পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়েছে ইতিহাসের চলনের সঙ্গে তাল মিলিয়েই বোলান চলেছে, পিছিয়ে পড়েনি। কিন্তু আজও তা যে প্রধানত গাজন উপলক্ষেই হয়ে থাকে তা বলাই বাহুল্য। বোলানের পটভূমি হিসেবে গাজন থাকবেই, তা সে শিব গাজন বা ধর্মগাজন যাই হোক না কেন। বাংলার বিশিষ্ট গাজন উৎসবের সঙ্গে বোলান জড়িত বলেই নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কতিপয় অঞ্চলের মানুষের কাছে বোলান একান্ত নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে।

সূত্র নির্দেশ

১) শ্রী শ্রীহর্ষমাল্লিক, *বোলান কথা*, পৃঃ ১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭।

২) শ্রী সুকুমার সেন, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৮, ১৯৬৫।

৩) শ্রী অসীম পাল, *বোলান লোক সংস্কৃতির আধুনিকীকরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,* পৃঃ ৫৩ পত্রিকা 'সমাজ জিজ্ঞাসা' ৩য় বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোসাল স্টাডিজ, মেদিনীপুর।

৪) ঐ পত্রিকা পৃঃ ৫৩-৫৪

৫) ঐ পত্রিকা পৃঃ ৫৪

৬) মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, প্রবন্ধ, *গাজন ও বোলান,* আনন্দবাজার পত্রিকা (২৭/৪/৮৬)

৭) সুধীর চক্রবর্তী, প্রবন্ধ, *অবসরের গান বোলান,* দেশ পত্রিকা পৃঃ ১৩, (২২/৭/৭৮)

৮) শ্রী শ্রীহর্ষ মল্লিক *বোলান গানের সুর বৈচিত্র্য* 'প্রসঙ্গ লোকগীতি' পৃঃ ১০০ (লোকজীবন গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ)

৯) ডঃ সুধীর কুমার করণ, *সীমান্ত বাংলার লোকগান,* পৃঃ ৫৫, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০২।

১০) ডঃ সুধীর কুমার করণ, *সীমান্ত বাংলার লোকযান,* পৃঃ ৫৫, করুনা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০২।

১১) কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম পেঁচার নক্সা।*

১২) কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম পেঁচার নক্সা।*

১৩) ডঃ অমলেন্দু মিত্র, *'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর',* পৃঃ ১০৭, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১২, ১৯৭২, প্রথম।

১৪) ডঃ অমলেন্দু মিত্র, *'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর,'* পৃঃ ৬৭

১৫) ডঃ সুধীর কুমার করণ, *সীমান্ত বাংলার লোকগান,* পৃঃ ৪৯-৫০, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০২।

১৬) ডঃ অমলেন্দু মিত্র, *'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর,'* পৃঃ ৪৮

১৭) ডঃ অমলেন্দু মিত্র, *'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর,'* পৃঃ ৪৮

১৮) ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (প্রথম খন্ড) পৃঃ ৫৮৫

১৯) ডঃ অমলেন্দু মিত্র, *'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর,'* পৃঃ ৯২

২০) সুধীর চক্রবর্তী, *অবসরের গান বোলান, দেশ,* পৃঃ ১৩(২২/৭/৭৮)

২১) বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,* পৃঃ ৩১৬, (প্রথম খন্ড), প্রকাশ ভবন, কলি, ১৯৮৯।

২২) তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, উপন্যাস *'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'।*

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

চিত্তব্রত পালিত

আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাসে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক হিসেবে প্রসিদ্ধ। ঔপনিবেশিক শিক্ষা জাতি এবং দেশগড়ার কাজে প্রধান অন্তরায়, এই ছিল তার সিদ্ধান্ত, এরই বিকল্প হিসেবে তিনি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলেন।

সতীশচন্দ্র ১৮৬৫ সালে হুগলী জেলার বন্দীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতার হাইকোর্টে দলিল অনুবাদকের কাজ করতেন। তিনি ফরাসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সতীশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও বি.এল পাশ করার পর কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু কিছু কাল বাদে এই পেশাকে তাঁর মিথ্যের বেসাতি বলে মনে হয়। ওকালতি ছেড়ে তিনি ভবানীপুরের সাউথ সাব-আর-বার্ণ স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সময়েই তিনি মেধাবী ছাত্রদের ছাত্রাবাসে এবং বাড়িতে গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করতে থাকেন। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ একটি উৎকৃষ্ট প্রজন্ম সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে ছিল তাঁর নিত্যই আনাগোনা। এখানে তিনি ভবিষ্যতের আই সি এস কিরণ দে এবং অতুল চ্যাটার্জীকে ছাত্র হিসেবে পান। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকেও তিনি শিষ্য হিসেবে পান। এছাড়া ছিলেন রাধাকুমুদ মুখার্জী এবং বিনয় সরকার।[১]

১৮৯৭ সালে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি ভাগবৎ চতুষ্পাঠীর পরিকল্পনা করেন। কলকাতার মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) সন্ধ্যায় এর সাপ্তাহিক পঠন পাঠন চলতো ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং তার চর্চাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে ধর্ম, দর্শন, এবং সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে পাঠক্রম চালু ছিল।[২] এই সময় সতীশচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত ডন ম্যাগাজিনও শুরু করেন। ডন ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। এর শিরোণামে ছিল দেশকে ভালবাসতে গেলে দেশকে আগে জানতে হবে' এই পত্রিকার একটি অংশ 'ইন্ডিয়ান' নামে পরিচিত ছিল। সেখানে দেশের কথা, দেশবাসী এবং সংস্কৃতির কথা বিশেষভাবে লেখা হত।[৩] ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভাগবত চতুষ্পাঠী এবং ডন ম্যাগাজিন চালাবার পর ঐ বছরে তিনি তাঁর জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হন — তাঁর প্রিয় শিষ্য রাধাকুমুদ মুখার্জী, বিনয় সরকার, রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ এবং হারান চন্দ্র চাকলাদার।[৪]

১৯০২ সালে লর্ড কার্জন 'ইউনিভারসিটি কমিশন' নিয়োগ করেন ১৯০৪ সালে ইউনিভারসিটিজ এ্যক্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও সিন্ডিকেটে সরকার মনোনীত ইউরোপীয়দের প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষার মান বজায় রাখার অছিলায় স্বদেশী কলেজ গুলির অনুমোদন বাতিল করে শিক্ষা সংকোচন নীতি গ্রহণ করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের প্রসার রোধ করা। সতীশচন্দ্র তাঁর আগেই ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'Over literary, all-too-academic,, Unscientific unindustrial' বলে আখ্যা দেন।[৫] এই ভাবে তিনি সরাসরি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে লেখেন এই শিক্ষা দেশ ও জাতি গড়ার কাজে লাগে না। শুধু সরকারি কাজে কেরানির সৃষ্টি করে। ভাগবত চতুষ্পাঠীতে শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা হত, সোসাইটির পাঠক্রম আরো প্রসারিত করা হয়। ডন সোসাইটির সান্ধ্য ক্লাশগুলিও মেট্রোপলিটন কলেজে অনুষ্ঠিত হত। এখানে কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই তিন শাখারই পাঠক্রম চালু ছিল[৬]।

সতীশচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, কতকটা সেই কারণেই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসান ফর দি কাল্টিভেসান অব সায়েন্স (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৭] এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে সগৌরবে চললেও এখানে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের চর্চা হত না, সরকারি বি.ই কলেজেও (শিবপুর) প্রযুক্তির চর্চা ছিল নিম্ন মানের মূলত পূর্ত দপ্তরের ওভারসিয়ারের পদপূরণের জন্য সতীশচন্দ্র ডন সোসাইটিতে প্রযুক্তি বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার আয়োজন করেন। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের পাঠক্রমে তাত্ত্বিকও ব্যবহারিক উভয়দিকেই তালিম দেবার ব্যবস্থা ছিল। কর্মশালার ব্যবস্থাকে সেখানে ছাত্রদের নানারকম কারিগরী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ছাত্ররা এখানে নানারকম যন্ত্রপাতি নির্মাণ, কাঠের কাজ, কাপড় বোনা সাবান ও কেশতেল তৈরির প্রণালী শিখত। ছাত্রদের তৈরি শিল্প সামগ্রী বড়বাজারে কুঞ্জবিহারী সেনের দোকানে বিক্রি হত।[৮] এই সব প্রযুক্তি শেখাবার উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যেতনা, রমাকান্ত রায় ও কুঞ্জবিহারী সেন জাপান থেকে যথাক্রমে ইলেকট্রিকাল এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফেরেন এবং ডন সোসাইটিতে শিক্ষক হিসেবে যোগ দান করেন।

বিজ্ঞান শাখায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং নীলরতন সরকারের মত পন্ডিতেরা ক্লাস নিতেন। এমন কি স্যার জগদীশচন্দ্র বসুও ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা করেছিলেন বলে শোনা যায়।[৯] কলা বিভাগে স্বয়ং সতীশচন্দ্র একাধিক বিষয় পড়াতেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর শিষ্য চতুষ্টয় (বিনয় সরকার প্রমুখ) ইতিহাস অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিতেন। এ সমস্ত বিষয় মূলত ভারতসম্বন্ধীয় ছিল। এটাই ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মূল পার্থক্য।[১০]

ডন সোসাইটিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতিও ছিল অভিনব। ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হত। বিষয় বিষয়ে তারা যে বক্তৃতার নোট রাখত, সেগুলি আবার শিক্ষকেরা দেখে দিতেন। ছাত্রদের স্বাধীনভাবে প্রবন্ধ লেখার জন্য আহ্বান করা হত, সেজন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। এই ভাবে স্বাধীন চিন্তা এবং নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করার তালিম দেওয়া হত। এবং উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি ডন ম্যাগাজিনে ছাপা হত।[১১] প্রবন্ধের বিষয় ছিল ভারতের নানা সমস্যাও তার প্রতিকারের উপায় এই পাঠক্রম তিন বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

সতীশ মুখার্জীর অবদান এই যে তিনি এই জাতীয়তাবাদী শিক্ষার আন্দোলন ১৯০৪ এর কলা আইন চালু হবার আগেই শুরু করেছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়।[১২] এমন কি ১৯০৬ এর বঙ্গভঙ্গের পর যে সমস্ত মনীষীরা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করে (১৯০৬) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরও পূর্বসূরি। তবু ১৯০৬ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ডন সোসাইটি তুলে দেন এবং ঐ কলেজের প্রথম পরিচালক হিসেবে কাজ করেন এবং অরবিন্দ ঘোষ প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করলে তিনি আন্দোলন থেকে অবসর গ্রহণ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন।[১৩]

ডন সোসাইটি একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হলেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পথিক। এই প্রতিষ্ঠানই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ব্রিটিশ সরকারের অনুগত কেরানির পরিবর্তে জাতি ও দেশ গড়ার সৈনিক সৃষ্টির জন্যে ডন সোসাইটির প্রথম পদক্ষেপ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।[১৪] এ প্রসঙ্গে ডন ম্যাগাজিনের অবদানের কথা আলোচনা না করলে সতীশচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৮৯৭ সালে ডন ম্যাগাজিনের প্রকাশনা শুরু হয় এবং ১৯১৩ সাল পর্যন্ত চলেছিল। যদিও ডন সোসাইটি ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে মিশে যায়।[১৫] ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ডন সোসাইটির মুখপাত্র ছিল। পরবর্তী কালে জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তার দর্পন হয়ে ওঠে। এর বেশির ভাগ প্রবন্ধই লিখতেন সতীশ মুখার্জী স্বয়ং এবং তাঁর শিষ্যরা। তবে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নীলরতন সরকার, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশ বোস এমন কি রবীন্দ্রনাথও ডন ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন[১৬]। সরকারও ডন ম্যাগাজিনকে বাঙালি জনমতের মুখপত্র মনে করত। বাঙালি মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে এই পত্রিকা নেওয়া হত। সরকার বিভিন্ন দপ্তরের জন্যে এই পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। বাংলার বাইরে এমনকি বিদেশেও এর সমাদার ছিল। প্রধানত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর আদৃত হলেও বহু বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এতে স্থান

পেয়েছিল। এগুলিতে ভারতীয় বিজ্ঞানের ধারা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারার উপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

1) Haridas Mukherjee, Satis Chandra Mukherjee; The Father of Bengali Revolution, Calcutta, 1948, pp. 182-83
2) Haridas & Uma Mukherjee, The Origin of the National Education Movement, 1905-1910, Calcutta, 1957, p. 12
3) Haridas Mukherjee, Satis Chandra and the Down Magazine, Calcutta, 1953, p. I
4) Haridas Mukherjee, Dawn Societir Satis Chandra Mukhopadhyay (in Bengali) Calcutta, 1958.
5) Haridas & Uma Mukherjee, op. cit, 1957
6) Haridas and Uma Mukherjee, op. cit
7) A Century (the Centenary volume of Indian Association for the Cultivation of science)
8) Haridas Mukhopadhyay, op. cit (in Bengali) p-8
9) Haridas & Uma Mukherjee op. cit 1957
10) Haridas & Uma Mukherjee, op. cit (in Bengali), 1948
11) Haridas Mukherjee, op. cit (in Bengali), p. 298
12) Haridas & Uma Mukhopadhyay, Swadeshi Andolon Banglar Nabayug (in Bengali), Calcutta, (1368 BS) pp 47, 52
13) Amitabha Mukherjee
14) Haridas & Uma Mukherjee, op. cit (in Bengali) 1948
15) The Dawn and the Dawn Societies Magazine
16) Classified List of the Articles published in the Dawn and the Dawn societies Magazine (1897-1913) compiled by the Jatindranath Bhattacharyya, Samgrahashala Jadavpur, Calcutta 32,
17) The Dawn 1897-1913, see relevant volume.

প্রচলিত ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা ও রবীন্দ্র শিক্ষার আদর্শ

দিলীপ ঠাকুর

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের চারের দশক পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষায় ধারা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একদিকে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা যা বঙ্গদেশের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত আর অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তাভাবনা প্রসূত বিদ্যালয় শিক্ষাধারা পাশাপাশি বর্তমান ছিল। এই সমস্ত শিক্ষা ধারাগুলির মধ্যে যেমন মিল বা সমজাতীয়তার ভাব ছিল আবার অমিল বা স্বতন্ত্রতাও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একটি অন্যটির দ্বারা প্রভাবিত বলা যায় না। তবে বঙ্গদেশের সমাজ পটভূমিতে মথিত হতে হতে তা ক্রমশঃ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ যথাযথ ছিল না কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন সেই শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী হয়েছিলেন। আর এদের প্রতিবাদ ও বঙ্গদেশের প্রয়োজনে গণ আন্দোলনের ফলে আর একটি বিদ্যালয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবার এখান থেকে সরে এসে একটি তথাকথিত ক্লাসিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায় পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় দেশ উপহার পায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ঐ সময়ের বঙ্গদেশের বিদ্যালয় শিক্ষাধারার মিল বা সমজাতীয়তা এবং অমিল বা স্বতন্ত্রতা যথাসম্ভব পর্যালোচনা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ ছিল জীবন উদ্দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার উদ্দেশ্য একই। জীবনে যা হয়ে উঠতে হবে শিক্ষার মধ্যে তাই থাকবে। শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সামগ্রী নয়। হয়ে ওঠার শিক্ষাই রবীন্দ্রনাথের বড় অবদান।

ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কেরানি তৈরি করা। জীবনে হয়ে ওঠা নয় সরকার পরিচালনার বশংবদ শ্রেণীর জন্ম দেওয়া ছিল তার উদ্দেশ্য। ঐ সময়ের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দেশের যোগ্য নাগরিক তৈরি করা। দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সচেতন ও দায়িত্বশীল এবং জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ও তারপ্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ গড়ে তোলা। মানুষ গড়ে তোলার সঙ্গে মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ অনন্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় শিক্ষার বড় উদ্দেশ্য দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা

ব্যবস্থার রূপায়ণ। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের মানুষের কথা মনে রেখেই সেই বিদ্যালয় শিক্ষার গোড়াপত্তন করেছিলেন। এখানে শ্রেণীভাগের কোনো স্থান ছিল না। সমগ্র মানব সত্তার দিকেই সেই উদ্দেশ্যের গতি।

ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছু মানুষকে লেখা পড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা। উপরতলার মানুষকে শেখালে তা চুঁইয়ে নিচের দিকে পড়বে। সকলের শিক্ষার দরকার নেই। জাতীয় শিক্ষা সকল মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শিক্ষার উদ্দেশ্য ভারতীয়কে সাহেব করা, জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ভারতবাসী হিসেবে গড়ে তোলা, আর রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য মানুষকে বিশ্ব মানবত্বে উন্নতি করা।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় শিক্ষায় দেশের মানুষকে সাংস্কৃতিক - নান্দনিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সৃষ্টিশীল, সামাজিক ও আর্থিক সয়ম্ভর হিসেবে গড়ে তোলা। কারণ মানুষের সমস্ত গুণাবলীর ও সম্ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করাই সেই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের এই বহুমুখী সম্ভাবনাকেই রবীন্দ্রনাথ তার সমস্ত মানুষ গড়ার উদ্দেশ্য বলেছেন।

ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষায় মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বই মুখস্থ করানো, নির্দিষ্ট সময় অন্তে তাকে পরীক্ষা পাশের উপযোগী করা। শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রতিভাকে স্বীকার করা হত না। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রতিভার বিকাশের উদ্দেশের কথা ভাবা না হলেও অনেক দিকের কথাই ভাবা হত। এইসব বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের কেবল বই পড়তে হত না। তারা অনেক প্রতিভার পরিচয় দিতেন। এমনকি তাদেরকে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হত।

রবীন্দ্রশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। ভারতবাসীকে ভারতীয় হিসেবে গড়ে তোলাই সে শিক্ষার মূল কথা। জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হলে ক্রমশ শিক্ষার্থীকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করা যাবে। বিদ্যালয় শিক্ষা জীবন থেকেই তার আরম্ভ হওয়া উচিৎ। এই উদ্দেশ্যই রবীন্দ্র বিদ্যালয়ের আদর্শ।

ইংরেজ পরিচালিত বঙ্গদেশের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কথা ভাবা হত না। সে শিক্ষার উদ্দেশে জাতীয় ভাবনাকে সঙ্কুচিত করার বাবস্থা ছিল। অবশ্য ঐ সময়ের জাতীয় বিদ্যালয় গুলি সে অভাব পূর্ণ করে। এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয় চেতনার উন্মেষ। জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ধারণার আদর্শকে ভিত্তি করেই বিদ্যালয় শিক্ষাকেই গঠন করার কথা ভাবা হয়।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় শিক্ষা ধারায় আদর্শের গোড়া হিসেবে দেশের সমাজ পরিবেশকে ধরা হয়েছে। সমাজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান দিতে হবে। অতএব বিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশের সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তিনি বঙ্গ দেশের মাটির টানেই পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের শস্য শ্যামলা উর্বর প্রকৃতি ও রাঢ়বঙ্গের

উষর ধূসর রুক্ষ শুষ্ক প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছেন। নগর সভ্যতায় শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছু ব্যবহৃত হয়েছে ভেবেই গ্রাম সভ্যতার প্রাণে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন।

বঙ্গদেশের ঐ সময়ে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রামে কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু গ্রাম ভারতবর্ষের প্রাণের সঙ্গে সেই আদর্শের মিল ছিল না। ঐ সময়ের বিদ্যালয় শিক্ষায় ইংরেজ ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাই সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। কিন্তু তারই পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের বিদ্যালয়গুলিতে এদেশের মাটির সঙ্গে যোগসূত্র ঘটাবার উদ্দেশ্যকে বড় করা হয়েছিল। অখণ্ড বঙ্গদেশের গ্রাম থেকে শহরে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহে অনুসৃত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে উদ্দেশ্য হিসেবে দেশ গঠনের সঙ্গে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করানো হত। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের আদর্শের সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে একধরণের মিল বা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ভাবনা, দেশ গঠন, জাতীয় রাষ্ট্রের কল্পনা, শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে উভয় ব্যবস্থার মধ্যে এক ভাবনা কাজ করেছে। যদিও সময়ের নিরিখে বিদ্যালয় ব্যবস্থায় সমধর্মীতা ও সমজাতীয়তা দেখা যায় কিন্তু কোনোটাই প্রভাবিত বলা যায় না। তেমনি ইংরেজ শিক্ষা ব্যবস্থায় আদর্শের ভিত্তি উপনিবেশবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আদর্শের সাথে তার মিল ছিল না কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে রবীন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক মিল দেখা যায়। আবার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয় পরিবেশ ভাবনা, প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষা, ভূমার মধ্যে সুখ ও শিক্ষা, মুক্ত শিক্ষা, আবাসিক ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘরোয়া সম্পর্ক ইত্যাদির সাথে জাতীয় বিদ্যালয় শিক্ষায় খুব মিল দেখা যায় না। তবে সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত ও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন থেকেও কিছু বিদ্যালয় বিশেষ কিছু আদর্শ নিয়ে পরিচালিত হয়েছে যার সঙ্গে রবীন্দ্র শিক্ষা আদর্শ ও জাতীয় শিক্ষার রূপরেখার মিল দেখা গিয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ

১) তপোবন — পৃঃ ৯৭, ৯৮

২) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম — পৃঃ ১৯, ২০

৩) জীবনস্মৃতি — পৃঃ ৬

৪) ছেলেবেলা -- পৃঃ ১১৯

৫) বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড — পৃঃ ৭৪৯

৬) বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাস চৈত্র — ১৩৭৬

৭) The National Council of Education, Bengal, 1906-56 (page - 1)

৮) অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়
'জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়'। পৃঃ ৪৪

৯) 'ডন ম্যাগাজিন', সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, চতুর্থ অংশ, পৃঃ ৫, ৬

১০) S. N. Mukherjee. History of Education in India (Modern Period). Page - 522.

১১) J. P. Naik and Syed Nurullah.
A Students History of Education in India. Page 382, 383.

জমিদার - কৃষক সম্পর্ক ও রবীন্দ্রনাথ

বিপাশা রাহা

গ্রাম বাংলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট পরিচয় হয় মাত্র বাইশ বছর বয়সে যখন, তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে পাঠান তাঁদের বৃহৎ জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল তাঁদের এই জমিদারি। এর অন্তর্গত ছিল পাবনা জেলার সাহাজাদপুর পরগণা; রাজসাহী জেলায় কালিগ্রাম পরগণার পাতিসর সদর; নদীয়া জেলায় বিরাহিমপুর পরগণার শিলাইদহ সদর; কুষ্ঠিয়া; কুমার খালী; এবং উড়িষ্যার কটক জেলার কিছু অঞ্চল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী জীবনের বেশির ভাগ সময়ই গ্রামাঞ্চলে অতিবাহিত করেন— হয় তাঁদের জমিদারি পরিদর্শন করে না হয় বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকটবর্তী শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে এই দীর্ঘ পরিচিতি তাঁর মনে গ্রামোন্নয়নের ইচ্ছা জাগায়। সাধারণ গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য ও দূর্দশা তাঁকে পীড়া দেয়। এর নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্র ও ছোট গল্পে।[১]

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি করতে হলে সব চেয়ে প্রথমে কৃষকদের উন্নতি করতে হবে কারণ ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ কৃষিনির্ভর। এই কথাই তাঁর বারবার মনে হয়েছিল যে তিনি নিজে যদি এদের জন্য কিছু না করেন তাহলে, তাদের অবস্থার কোনদিন উন্নতি হবে না।[২] তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে তিনি কৃষকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করতেন যে গ্রামীণ সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্য দিয়ে সম্ভব নহে। সব চেয়ে আগে কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। আর এই কাজে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ধনী জমিদারেরা। বাংলার জমিদারদের কাছে তাই তিনি আবেদন করেন বাংলার গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে। 'মুখুজ্জ্যে বনাম বাঁড়ুজ্জ্যে' গল্পে তিনি গ্রামোন্নয়নের কাজে নেতৃত্ব দিতে জমিদারদের আহ্বান জানান। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত ক্ষমতা জমিদার শ্রেণীর আছে। ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে তাদের দয়া, দানধর্ম, গঠনমূলক কাজ ও শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা জমিদারেরা সম্মান অর্জন করেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের এই মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে। ব্রিটিশ যুগে শহরে বাস করতে ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে তারা বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ে।[৩]

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে, বাংলার গ্রামীণ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা তাদের স্বনির্ভরতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের উন্নতি

করতে আর তাদের আগ্রহ নেই। সব কিছুর জন্য আজ তারা সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নিজেদের ক্ষমতার উপর তাদের আর কোন আস্থা নেই। এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই কাজে জমিদারদের অগ্রগণ্য ভূমিকা নিতে হবে।[৪] ঊনবিংশ শতকে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও খাজনা আইনের ফলে জমিদার ও কৃষক শ্রেণীর পূর্বের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। জমির উপর সকল স্বত্ব ব্রিটিশরা জমিদারদের আরোপ করে। রায়তদের কোন অধিকার থাকে না। ফলে, কৃষকদের উপর জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের দুর্দশার আর সীমা থাকে না। এর জন্য গ্রামীণ সমাজজীবন ও কৃষির ক্ষতি হয়। দুইয়ের উন্নতির জন্য এই সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা একান্ত প্রয়োজন।

এই সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে কতকগুলি পদক্ষেপ নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ জমিদারদের উপর প্রথম দায়িত্ব দেন কৃষকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার ও নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার। এর ফলে জমিদারদের অত্যাচার কমবে। যতদিন না কৃষকরা নিজেদের বাঁচাতে শিখবে, ততদিন তারা বিভিন্ন ভাবে শোষিত হবে। কৃষকদের শিক্ষিত করার নিমিত্তে, জমিদারদের গ্রামে বসবাস করতে হবে। শহরে বসবাস করে এবং উন্নতির জন্য শুধুমাত্র অর্থ বিনিয়োগ করে কৃষকদের হিতসাধন সম্ভব নহে।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ১৮৮৫-র বাংলা প্রজা আইনে কিছু পরিবর্তন করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিতর্কের মূল বিষয় ছিল যে অক্যুপেন্সি (Occupancy) রায়তদের খোলা বাজারে স্বাধীনভাবে জমি হস্তান্তরের এবং নন-অক্যুপেন্সি (non-occupancy) রায়ত ও বর্গাদারদের অক্যুপেন্সি (Occupancy) অধিকার দেওয়া হবে কি না। শেষের দুই বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোন মন্তব্য করেননি। কিন্তু প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায় প্রথম চৌধুরী রচিত 'রায়তের কথা' গ্রন্থের ভূমিকায়। এখানে জমিদারদের উপর রবীন্দ্রনাথের আস্থা স্পষ্ট। প্রথমদিকে তিনি 'লাঙল যার জমি তার' এই নীতিতে বিশ্বাস রাখতে পারেননি। লাঙলের প্রকৃত অধিকারী চাষিদের হাতে জমি অর্পণ করা অপেক্ষা জমির স্বত্ব জমিদারের হাতে রাখাই তিনি শ্রেয় মনে করতেন। এইখানে তিনি প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি লিখলেনঃ

"এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে?... প্রজাকে ছেড়ে দেব? এখন দেখতে দেখতে এক বড় জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে; ... তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে?

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না, কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। ... আমেরিকায় শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে

ফেলে বড়ো বড়ো ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে; তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠতে থাকে।"[৫]

সম্পত্তি আইন অনুযায়ী জমি উত্তরোত্তর ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। কৃষকের পরিবারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়বে এই ক্ষুদ্র জমির আয়। ফলে জমির কেনাবেচা বৃদ্ধি পাবে। এতে লাভবান হবে স্থানীয় মহাজনেরা কারণ তাদের কাছে অর্থ আছে। বেশির ভাগ জমি তাদের দখলে চলে যাবে। মহাজনদের কাছে জমি হস্তান্তর হলে, জমিদারদের অধীনে কৃষকদের যতটুকু অধিকার আছে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

জমিদারি প্রথা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মিশ্র অনুভূতি ছিল। একদিকে তিনি জানতেন যে এক শ্রেণীর জমিদার আছে যারা পরজীবীর ন্যায় জীবন যাপন করে। তারা প্রজা শোষণ করে থাকে। তাই দুর্বল, অশিক্ষিত প্রজাদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দিলে তারা তা রক্ষা করতে পারবে না। তাদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে।[৬] অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের আবার এ কথাও মনে হয়েছিল যে সকল জমিদারই অত্যাচারী নহে। তিনি নিজে দেখিয়েছেন যে কিভাবে তিনি তাঁর জমিদারিতে জমি হস্তান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। এর ফলে বহু কৃষকের জমি, মহাজনের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে নীল বিদ্রোহের পূর্বে, জমিদাররাই কৃষকদের জমি বলপূর্বক হরণ করা থেকে নীলকর সাহেবদের বিরত করেছিলেন। তখন জমি হস্তান্তরের উপর আইনগত নিষেধাজ্ঞাই কৃষকদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এখন তাহা তুলে নিলে সমস্ত জমি মারোয়ারি ব্যবসাদার ও মহাজনের দখলে চলে যাবে। কারণ জমিতে বিনিয়োগ করতে পারলে তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। কৃষকদের কাছে ক্ষমতা, অর্থ বা শিক্ষা নেই যা দিয়ে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে যদিও কৃষকদের স্বাধীন ভাবে জমি ব্যবহার করাতে বাধা দেওয়া ঠিক নহে তবুও, এই সময়ে তাদের জমি হস্তান্তরের স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার সামিল। তিনি লিখলেন ঃ

"আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে এই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে।"[৭] ভবিষ্যতে যখন রায়তরা এই অধিকার উপভোগ করার উপযুক্ত হবে, তখন তাদের তাহা দেওয়া যাবে। যতদিন না তাহা হচ্ছে ততদিন জমিদারের আশ্রয়ে থাকাই কৃষকদের পক্ষে মঙ্গলজনক।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারদের উপদেশ দেন যে কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থে তাদের প্রজাবৎসল হয়ে উঠতে হবে। আমূল ভূমি সংস্কারের কথা তাঁর এই সময়ে মনে হয়নি। তিনি বলেন

যে জমিদারদের খাজনা সরকার চিরকালের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছে। সুতরাং কৃষকদের খাজনাও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। তাহলে, কৃষকের খাজনা জমিদার আর তার ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি করতে পারবে না। বারবার খাজনা বৃদ্ধি জমির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। কৃষকের মনোবল ভেঙে দেয়। খাজনা নিয়ে দুই শ্রেণীর মধ্যে ক্রমাগত মামলা বাধে। এতে দুই পক্ষই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কৃষিকার্য ব্যাহত হয়। কৃষির স্বার্থে জমির সঙ্গে কৃষকের যোগটা সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। তার জন্য রবীন্দ্রনাথ কতগুলি প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে কৃষক যে জমি চাষ করে তাতে তাকে কতগুলি অধিকার দিতে হবে যেমন গাছ কাটার, কোঠাবাড়ি নির্মাণের ও পুকুর খনন করার অধিকার।

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুনর্গঠনের কাজকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে- শিলাইদহ, পাতিসর ও শ্রীনিকেতন। এই সকল স্থানে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন যে কিভাবে একজন জমিদার প্রজানুরঞ্জক হয়ে উঠতে পারেন। এর ফলে জমিদার - কৃষক সম্পর্কের ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন হতে পারে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ, জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুহৃদপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে তিনি পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায় কৃষিকার্য সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে। শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে এসে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাজে যোগদান করেন। জমিদারি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য তাঁর জমিদারিতে তিনি কতগুলি পদক্ষেপ নেন- কৃষকদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য করার শিক্ষা প্রদান করা; সাধারণ শিক্ষার প্রসার করা; কৃষকদের স্বনির্ভর করে তোলা; আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করাও; গ্রামের উন্নতি জন্য যুব সম্প্রদায় থেকে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা প্রভৃতি।[৮]

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে কৃষিকার্যে উন্নতি হলে উৎপাদন ও কৃষি আয় বৃদ্ধি হবে। তবেই কৃষকের অবস্থার আসল উন্নতি সম্ভব হবে। প্রাচীন কৌশল অবলম্বন করে কৃষিকার্য চলতে থাকলে তা সম্ভব নয়। ইউরোপে যে কৃষি বিপ্লব হয়ে গেছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে বাংলার চাষিরাও যেন সেই যন্ত্র-কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু তিনি জানতেন যে এই সমস্ত খরচ সাপেক্ষ। যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন তা দরিদ্র চাষিদের কাছে নেই। তিনি বাংলার জমিদারদের তাই আহ্বান করলেন কৃষিকার্যে আগ্রহ নিতে এবং বিনিয়োগ করতে। রবীন্দ্রনাথ নিজের জমিদারিতে নতুন শষ্য ও আনাজের চাষ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেন। শিলাইদহতে আমেরিকা থেকে ভুট্টার বীজ আনিয়েছিলেন। আলুর চাষ করার চেষ্টা করেন। তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ফুল, বাদাম, কলাই, ফুলকপি ও অন্যান্য ফসলের চাষ করান। নানারূপ সার নিয়ে পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন সময়ে, কৃষি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেন।[৯] এই সকল কাজের পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, নিকটে বসবাসকারী কৃষকদের উৎসাহিত করা। তিনি আশা করেছিলেন যে চাষিরা হাতে কলমে শিক্ষা লাভ

করবে। ব্রতীবালক বা স্বেচ্ছাসেবক দলকে পাঠিয়েছিলেন কাছাকাছি গ্রামগুলোতে গিয়ে চাষিদের নতুন কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কেশিক্ষা দান করতে। আমেরিকা থেকে শিক্ষালাভ করে ফিরে এসে রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহে, ৮০ বিঘা জমির উপর একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র গড়ে তোলেন। সেখানে কৃষি পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা চালানো হতো। এছাড়া, কৃষকদের মঙ্গলের জন্য রবীন্দ্রনাথ নানারকম উপকারী কাজ করেছিলেন যথা রাস্তা নির্মাণ করা, সেচকার্যের সুবিধার জন্য কুয়ো ও খাল খনন করা। এর আংশিক খরচ মেটানোর জন্য তিনি শিলাইদহতে 'কল্যাণবৃত্তি' ও পাতিসরে 'হিতৈষীবৃত্তি' নামক দুটি কর আদায় করতেন প্রজাদের কাছ থেকে। সেই সঙ্গে তাঁর জমিদারির আয় থেকে সম-পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন এই কাজের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে কৃষিকার্য শুরু করতে ও সারা বছরের খরচ চালাতে কৃষকদের সব সময় অর্থের প্রয়োজন হয়। ফলে, তারা মহাজনদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মহাজনরা কড়া সুদে এই টাকা ধার দেয়। কৃষকদের জমি বন্ধক হয়ে থাকে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা ঋণ মুক্ত হতে পারে না। এই ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারদের কাছে আবেদন করলেন কৃষকদের সাহায্য করার জন্য। কৃষকদের আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য তিনি জমিদারদের প্রস্তাব দিলেন কৃষি ব্যাঙ্ক খোলার। তিনি নিজেই এই ব্যাপারে পথ দেখালেন। ১৯০৫ সালে শিলাইদহে একটি কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন।[১০] প্রথমে তিনি তাঁর কয়েকজন ধনী বন্ধু ও মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন। পরে তাঁর নোবেল পুরস্কারের অর্থের বেশির ভাগটাই এতে রেখেছিলেন। যদিও চাষিদের সমস্ত আর্থিক চাহিদা নিবারণের জন্য ব্যাঙ্কের মূলধন যথেষ্ট ছিল না তবুও তাঁর এই প্রয়াস একটি দৃষ্টান্ত। পাতিসর ও শ্রীনিকেতনেও তিনি পরে এরকম কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন। ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প সুদে কৃষকদের টাকা ধার দিত। কৃষকদের মিতব্যয়িতা শেখানোর জন্য নজর রাখা হতো যাতে কৃষিকার্যের উদ্দেশে নেওয়া টাকা সেই কাজেই যেন খরচ করা হয়। এর ফলে মহাজনদের উপর কৃষকদের নির্ভরশীলতা কিছুটা কমাতে সক্ষম হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ[১১]। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী লেখেনঃ

"রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কি করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি, কেন না তাঁর জমিদারি সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো। কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে বাংলার জমিদার মাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি 'Unique'।"[১২] রবীন্দ্রনাথ যখন কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন তখন, আর কোথাও চাষিদের কথা এমন ভাবে কেউ ভাবেননি। ইহা জানা যায় যে কৃষি ব্যাঙ্কের জনপ্রিয়তা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তাতে আশেপাশের অনেক ব্যবসায়ী মহাজনেরই ব্যবসার বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল।

দরিদ্র কৃষকদের সাহায্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ধর্মগোলা তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে প্রতি বছর তারা যে ফসল উৎপন্ন করবে তার একটি অংশ সকলে এই ধর্মগোলায় জমা রাখবে। এর ফলে কোন বছর যদি ভাল ফসল না হয়, তাহলে এই জমানো ফসল তাদের কাজে আসবে। দুর্ভিক্ষ এড়ানো যাবে।

কৃষকদের উপর পীড়ন বন্ধ করার নিমিত্তে রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দেন যে জমিদাররা যেন তাদের সেরেস্তার কর্মচারীদের উপর দৃষ্টি রাখে। তিনি নিজের জমিদারিতে দক্ষ কর্মচারীদের স্নেহ করতেন। কিন্তু, লোভী ও অশুভ বুদ্ধি সম্পন্ন আমলাদের প্রতি কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন। তিনি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ও পেনশনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই সকল কাজের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন যে একজন আদর্শ জমিদারের কেমন হওয়া উচিৎ। জমিদারদের প্রজাবৎসল হওয়া প্রয়োজন। জমিদার কৃষক সম্পর্কের উন্নতি ছাড়া কৃষকদের দারিদ্র্য মোচন সম্ভব নহে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা করার সময় লর্ড কর্ণওয়ালিস আশা করেছিলেন যে জমিদাররা কৃষি ও কৃষকের উন্নতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। রবীন্দ্রনাথেরও সেই আস্থা ছিল। জমিদারি প্রথার কোন বিকল্প তিনি ভাবতে পারেননি। পরবর্তীকালে, রাশিয়া থেকে ১৯৩০ সালে ঘুরে আসার পর আমূল ভূমি সংস্কারের কথা তিনি প্রথম চিন্তা করেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে জমির স্বত্ব ন্যায়ত চাষির, জমিদারের নহে।[১৩] রাশিয়ার তিনি দেখেছিলেন কিভাবে সম্পূর্ণ আলাদা প্রক্রিয়ার কৃষিকার্য হয়। রাশিয়া ভ্রমণকে তিনি তীর্থদর্শনের সমতূল্য বলেন। তিনি দেখলেন কিভাবে সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ করার ফলে চাষের উন্নতি হয়েছে। তিনি লেখেনঃ

"আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়, আমরা যেন ট্রাসটির মত থাকি।"[১৪]

জমিদারি প্রথার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। তাঁর মতে জমিদাররা ট্রাসটি হিসেবে জমিদারি থেকে শুধুমাত্র একটি রবাদ্দ ভাতা পেতে পারে।

১৯৩০ সালের পর তাঁর মনে হয় যে জমিদার-কৃষক সম্পর্ক মূলতঃ শোষণকারী ও শোষিতের সম্পর্ক। জমিদার যতই প্রজানুরন্জক হোক না কেন, কৃষকের শ্রমের উপরেই সে নির্ভরশীল। তাই জমিদারি প্রথা বজায় রেখে কৃষকদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন অসম্ভব।

সূত্র নির্দেশ

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪; গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, ১৯৮৬।

২) শিলাইদহ থেকে রচিত পত্র, ১০ মার্চ, ১৮৯৩, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, শতবর্ষ সং, ১৯৬১, পৃ. ১০৭।

৩) ঐ, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৮১৩।

৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃ. ৬।

৫) প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, রবীন্দ্রনাথ কৃত ভূমিকা, বিশ্বভারতী, ১৩৫১, পৃ. ১০-১৩।

৬) সুকুমার মল্লিক, রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১।

৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ৩৪৯।

৮) শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৭১।

৯) পল্লীপ্রকৃতি, পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ২১১।

১০) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ২৪৯।

১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫, পৃ. ৭-৮।

১২) রায়তের কথা, পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ২১।

১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোল্লেখিত, দশম খণ্ড, পৃ. ৬৮৪।

১৪) অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ. ৫৬।

প্রাক্ স্বাধীনতা কালে উত্তরবঙ্গের চারণকবি ও স্বদেশীগান

ধনঞ্জয় রায়

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রসঙ্গের আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। ওই সময় রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য' (১৮৬১), 'হেমচন্দ্রের বীরবাহু' (১৮৬৪) প্রভৃতি কাব্যে স্বদেশ প্রেমের উচ্ছাস, জাতির প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ এবং স্বদেশ বন্দনার আদর্শ প্রকাশিত হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে জনমনে দেশ অনুরাগ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টায়* হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করে বাঙালি এক নতুন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। ওই কাজের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের দুঃখ দুর্দশা মোচনে ও স্বদেশের উন্নয়নের জন্য বাঙালি মননে স্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষা ও স্বাবলম্বনের আদর্শকে জাগ্রত করা। জাতীয় সভা, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিল্প, জাতীয় ব্যায়ামশালা ইত্যাদির মাধ্যমে তার স্ফূরণ ঘটেছিল। স্বভাবতই দেশ অধিবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যের আদর্শকে চর্চিত করে তুলতে সঙ্গীতের গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। সত্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর বচনা করলেন, 'মিলে সবে ভারত সন্তান' ও 'মলিন মূক চন্দ্রিমা ভারত তোমারি' গান দুখানি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানটি 'গাও ভারতের জয়' হিন্দুমেলাতেই প্রথম জাতীয় সঙ্গীত রূপে রচিত ও গাওয়া হয়েছিল।[১]

বাঙালি সমাজে দেশপ্রেম নির্ভর স্বদেশীগান রচনার উদ্ভবের মূলে ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ। ইংরেজের সঙ্গে পরিচয় ও পরাধীনতা বোধ, এই বোধ মূলত হীন মন্যতা ও বেদনার প্রতিশেধক। এরমধ্যে রয়েছে দেশের বিপন্নতা ও বিপর্যয়ের একটি নিগূঢ় যোগ। ১৯৫০ সালে লর্ড কার্জনের ঘোষিত বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পটভূমি বাঙালির অন্তরে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। ওই সময় থেকে জনগণের বিরাট অংশ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংঘবদ্ধভাবে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে উঠে।[২] সেই যাত্রা পথের পাথেয় ছিল চারণকবিদের স্বদেশীগান। রবীন্দ্রনাথ নিজে ঘোষণা করেছিলেন, বিলাতী জিনিস ক্রয় করে 'কিনব না মা গলার ফাঁসী'।

রাজপুতনায় জনগণকে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানর শক্তি জোগাতে ও স্বদেশ

* হিন্দুমেলা - ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল।

* উত্তরবঙ্গ বলতে সাবেক রাজশাহী বিভাগের অধীনে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ ও পাবনা জেলার কথা বলা হয়েছে। এই নিবন্ধে মূলত দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি, এই চারটি জেলায় আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। রচনাকার।

প্রেমে প্রেরণা দিতে একদল গায়ক গান গেয়ে অরণ্য, পর্বত ও জনপথে ঘুরতেন। তাদেরই বলা হত চারণ।[৩] বাংলায় বিশেষ করে* উত্তরবঙ্গে এই রকম চারণ কবিরা স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫)। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩২) যার প্রাক্ দেশভাগ কাল পর্যন্ত গানগেয়ে গ্রামগঞ্জের মানুষকে স্বদেশপ্রেমে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। এদেরই আরও একটি ধারা ওইসময় (১৯৪৩-৪৭) শ্রমজীবী ও মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনে সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তুলতে কণ্ঠে গান নিয়ে গণসঙ্গীতের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন। এই রকম সর্বজনপূজ্য পূতচরিত্র কিছু চারণকবির কথা ও তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠের কিছু গান এখানে দেওয়া হল।

মনোরঞ্জন দাস

মালদার ইংরেজ বাজারের অধিবাসী চারণকবি মনোরঞ্জন দাস (১৮৯৬-১৯৫৭)। মালদার ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা গানের তিনি শিল্পী ছিলেন। তার গানে বিদেশী পণ্য বর্জন করে স্বদেশী জিনিষের প্রতি আগ্রহ জাগানর স্পহা ব্যক্ত হতে দেখা যায়।

স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা, তবে খেতে দিব মাণিককলা
নইলে আঁঠার কলা। কত মন্ডা মিঠাই টাঁড়ার খাজা
*ধীরেন বাবুর চস্তা গাঁজা। *রায়চৌধুরীর ঠান্ডাপানি,
ভর্যা দিব সিদ্ধির ঝোলা।।
ইস্কুল কলেজ সব মেতেছে, মাষ্টার পন্ডিত সব জেগেছে
কাঁচ দিয়ে কাঞ্চন নিয়ে, হাতে দিল খোলা -।।[৪]

(গানের রচনাকাল ১৯১২)

মহম্মদ সুফি

মালদার অধিবাসী মহম্মদ সুফি (১৮৮৯-১৯৫১) সরকারি পোষ্টাল পিয়নের কাজ করতেন। ইনিও মালদার বিখ্যাত গম্ভীরা গানের শিল্পী। গম্ভীরা গানের ভেতর দিয়ে স্বদেশ প্রেমের কথা তুলে ধরে তিনি মালদাবাসীর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। গান গাওয়ার অপরাধে ব্রিটিশেব কারাগারে অশেষ নির্যাতনও ভোগ করেছিলেন।

হে মহাকাল আর কতকাল রইবে বসে যোগে
গা তুলে উঠেছি সব জেগে
তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী ঘুমে কুম্ভকর্ণ
ভরতের ধন করে হরণ লন্ডন পরিপূর্ণ

---

* ধীরেন্দ্র নাথ দাস — বিশ শতকের গোড়ায় মালদায় তার একটি গাঁজা ভাঙের দোকান ছিল।
* শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী — ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে মালদায় তিনি দেশীমদের দোকান খুলেছিলেন।

বঙ্গ লক্ষী ভারত মাতা, কাঁদছে নিয়ে সুতাসুতা
মোরা ক্যামনে জীবন কাটি
পরাধীন সেও দেশলাই কাঠি
গান্ধীর কামরূপ মন্ত্র মহাযন্ত্র, ফনা তুলবে না শ্বেত নাগে
গা তুলে উঠেছি সব জেগে।।
ভারত পঞ্জাব আর মিলে সবে
খেলাফৎ কমিটির চর্চা করেছিল সবে পনজ্বে
জানতে পেরে ইউরোপবাসী, এনে কামান তোপ রাশিরাশি
তোপে লাগিয়া দিয়া আগুন
সবকে করলে পোড়া বাগুন
ধনে প্রাণে মারলে মোদের, ঘেরে জালিয়ানা বাগে
গা তুলে উঠেছি সব জেগে।[৫]

(রচনাকাল ১৯১৯)

নীলকণ্ঠ রায়

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জলপাইগুড়ি জেলার অবদান ইতিহাসের এক আলোকিত অধ্যায়। ১৯২০-২১ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমা কংগ্রেসের নেতৃত্বে যখন কোর্ট বয়কট ও খাজনা বন্ধ আন্দোলন প্রবল, আলিপুরদুয়ারের চাবণ নীলকণ্ঠ রায় (১৯০৭-১৯৭২) গান বাঁধলেন,

*রসিক বাবুর বাসার সামনে কংগ্রেসের মিটিং বান্ধা
ইংরেজ সাহেব হোচটখান চক্ষুতে খান ধান্ধা।
সেথায় নিত্যদিনে ধ্বনি উঠে
ইংরেজ করিবে বিচার
নেভার নেভার স্যার
শুনহে কংগ্রেসী ভাই, ব্রিটিশ সরকারের কোনও খাজনা নাই

স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায় ঃ শ্রী নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, উত্তরবঙ্গ অনুসন্ধান সমিতি, জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫; পৃষ্ঠা ঃ ১৩। এই গ্রন্থে গানটি এভাবে প্রকাশিত হয়েছে, 'ভাত দিম, পানি দিম, খাজনা দিম না। জাল দিম, পান দিম, ট্যাকসো দিম্ না। ইংরেজের খাজনা দিম্ না, বিলাইতি কাপড়া পরমু না। হাট বন্ধ কুলকুলি, বন্দেমাতরম হামার বুলি'। রচনাকার।

ইংরেজ কে খাজনা দি ব না
বিলাতী কাপড় প র ব না
হাট বন্ধ কুল কুলি বন্দে মাতরম হোক বুলি।[৬]

(রচনাকাল ১৯২১)

দৈত্যমোহন দাস

১৯২০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আসেন জলপাইগুড়ি জেলায়। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকান্ডের নিন্দা করে তিনি একটি সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। জলপাইগুড়ি অধিবাসী দৈত্যমোহন দাস-এর (১৮৮৭-১৯৪৮), একটি স্বদেশী গান গেয়ে ওই সভার কাজ শুরু হয়।

মিটাতো যে দেশ আপন শস্যে জগতের ক্ষুদা অন্নাভাব
পৃথিবীর খোলা বলিয়া যাহার এখনো বাখানে পৃথিবী মার।।
কোহিনূর যার নগন্য মণি তাজ যাহার শ্মশান বেশ
আজি কি না তার অন্ন অভাবে কঙ্কাল সার জীর্ণ বেশ।।
এসো হে জৈন এসো হে পার্শী এসো হে হিন্দু মুসলমান,
ডাকিছে আজি গো দেশের বন্ধু দেশের পুত্র দেশের প্রাণ।
মিটাতে যে দেশ আপন বস্ত্রে শ্যাম আরব মিশর মাঝ,
ঘরে ঘরে যার কুল নিবারিত দীন দুখীর লাজ।।
মসলিন যার হস্তশিল্প এখানে বাখানে পৃথিবীময়,
আজি কি না তার বস্ত্র অভাবে ছিন্ন চটের অভাব হয়।
কি সে গো আনিল এতেক দৈন্য এতেক দুঃখ হাহাকার
বিদেশী লালসা বিদেশী আয়েস বিদেশের হাওয়া বিদেশীভাব।
এখনো ধরগো দেশের শিল্প দেশে ব্যবসা কৃষি নিয়ে,
আবার আসিবে ভারতে সুদিন মহারাজ গান্ধীর জয়।।[৭]

(রচনাকাল ১৯২০)

শবমন দাসী

বিশ-ত্রিশের দশকে উত্তরবঙ্গের একমাত্র মহিলা চারণ। ১৯২৫ সালে গান্ধীজি আসেন জলপাইগুড়িতে। ওই সময় রচিত জলপাইগুটি বাসী মহিলা চারণ শবন দাসী-র (১৮৯৯-১৯৪১) স্বদেশী গান।

মহাত্মা গান্ধীজী হামরা খদ্দর ধৈরাছি,
বিলাইতি নুন আর খামনা দেশী ধৈরাছি।
চাষের তুলায় চরকা কাটা হাতে বুনোন খদ্দরে,
চক্ষে হেরি বক্ষে ধরি রাখি আদরে।
ও গান্ধী তোমার চরণ বন্দী তোমারি করি নমস্কার।।[৮]
(রচনাকাল ১৯২৫)

প্রবোধ মজুমদার

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন দিনাজপুরের চারণ প্রবোধ মজুমদার (১৮৮৩-১৯৬৩) গলায় হারমোনিয়াম আর পায়ে ঘুঙুর বেঁধে* ধনকৈল, কুনোর, কমলাবাড়ি পতিরাজ, বিষ্ণুপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি হাটে স্বদেশী গান গেয়ে বেড়াতেন। ১৯২৮ সালে দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ওই সময় রচিত তাঁর একটি দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী গান,

ওঠে হাহাকার গগন ভেদিয়া দেহ গো অন্ন, বাঁচাও প্রাণ,
নরনারী হায় মরিজে ক্ষুধায়, যার যাহা আছে কর গো দান।
রোদনের ধ্বনি পশিছে কি কানে? অলসে বিলাসে থেকোনা আর,
দুয়ার সম্মুখে ক্ষুধিতে কাঁদিছে - মুছাও তাদের অশ্রুভার।
শিশুগণ কাঁদে ক্ষুধার জ্বালায়, দে মা দে মা বলে চরণে লুটায়,
ব্যাকুলা জননী বক্ষ চাপিয়া - ডাকিছেন কোথা হে ভগবান।
আপন ক্ষুদ্র মুখের লাগিয়া, করিতেছে কত অর্থ ব্যয়,
তারি হাতে দিলে একমুঠো চাল- একটি পরাণ বাঁচিয়ে যায়।
তোমার অন্ন যদি জোটে আর - ভাগ পেতে তার আছে অধিকার,
তারা যে তোমার ভাই প্রতিবেশী তারা যে তোমার প্রাণের প্রাণ।
ধণী খোল তব ভান্ডার দ্বারে, ক্ষুধিতে অন্ন দেওভারে ভার।
নিঃস্ব তোমার একটি পয়সা, দেখাবে ভাই-এর প্রাণের টান।[৯]
(রচনাকাল ১৯২৮)

গোবিন্দ চন্দ্ররায়

১৯৪৬ সালের জুন মাসে *রায়গঞ্জে উত্তরবঙ্গ কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই

* হাট গুলি বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে।

* রায়গঞ্জ বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহর।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেত্রী লীলারায়। দিনাজপুর জেলার হাড়গাঁও গ্রামের অধিবাসী চারণ গোবিন্দ চন্দ্র রায়-এর (১৮৮১-১৯৫৬) স্বদেশী গান দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়।

*বাজাও ঈশান প্রলয় বিষাণ শম্ভু ত্রিশূল ধারী
লিঙ্গীভূত যে কপর্দি মহাকাল ত্রিপুরারি।
কাঁপাও বিশ্ব প্রলয় তান্ডবে জটাতে গঙ্গা নামুক ভৈরবে
ললাটে জ্বালো প্রলয় বহ্নি জীবন উন্নততর
বর্তমানের দুনীর্তি ভরা শ্মশান ভস্মোপর
জল স্থল দ্যৌঃ গ্রহতারা ভানু স্থাবর জঙ্গম অনুপরমাণু
শ্মশান ভস্মে কর পরিণত শিব শ্মশান চারি।[১০]

(রচনাকাল ১৯৪৬)

নবদ্বীপ চন্দ্র বর্মা

দিনাজপুরের চারণ নবদ্বীপ চন্দ্র বর্মা (১৯০৯-১৯৭১) স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশজননীর গান গেয়ে গ্রামগঞ্জের মানুষকে প্রেরণা জোগাতেন।

প্রাণের সাড়া পেয়েও তোরা, কেনরে ভাই উদাসীন
চেয়ে দেখ জাতি মাতার ভেবে তনু ক্ষীণ।।
আত্ম কলহতে মজে, সদাই নিজের ধর্ম ত্যজে,
ছেড়েছিল প্রায় মায়ের পূজা, যেন রে ঘোর অর্বাচীন
জাতি মাতার সুত তোরা, বলিয়ে কাঁপাস ধরা,
কার্যকালে যেন মড়া, নড়াচড়া শক্তিহীন।।
বিনা গুণে বিনা কর্মে, বিনা মনে বিনা ধর্মে,
লভে না উন্নতি কেহ, কোন দেশে কোনদিন।।[১১]

(রচনাকাল ১৯৪২)

মঙ্গল রায়

দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ির চারণ মঙ্গল রায় (১৮৯৯-১৯৪৯) স্বদেশী গানে দেশ জননীর শৃঙ্খল মোচনের কথা ব্যক্ত করেন।

গানটি সুর দিয়েছিলেন দিনাজপুরের বিখ্যাত পাঁচালী গায়ক, সঙ্গীত কলা বিশারদ ও কবিশেখর সঞ্জীব কুমার বাগচী। সুর ইমন কল্যান; তাল তেওড়া। গানটি গেয়েছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের কন্যা কল্যাণী রায়। রচনাকার।

হামার মায়ের মুখত হাসি নাইরে ভাই,
মা যে হামার পরদেশী শত্রুর কারাগারে
তাক কেমনে বাঁচাই।
সগায় জাগরে ভাই, এখনও সময় আছেরে জাগিয়া উঠিবার,
তোমাদের লাগি কাঁদিছে মাতা।
যে তোমারে জন্ম দিছে, তাক করিছে অপমান।
সঙ্গে হামাদের গান্ধী আছেত,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
বিদেশী গোলাম থাকব না ভাই, বিদেশী শিক্ষা নেব না রে ভই।
মা মা বলে হাক দে রে ভাই,
মায়ের দুঃখ ঘোচাই।[১২]

(রচনাকাল ১৯৪৩)

বনমালী কুণ্ডু

গণসংগীত শিল্পী বনমালী কুণ্ডু (১৯১৩-১৯৬৮) দিনাজপুর থেকে এসে মালদায় বসবাস করেন। তেতাল্লিস সনের দুর্ভিক্ষে তাঁর রচিত একটি গান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ খুলে দেয়। শ্রেণীবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক প্রচার গানের মাধ্যমে করা হচ্ছে বলে এই অভিযোগে, ব্রিটিশের কারাগারে তিনি নির্যাতিত হন।

শোনরে ভোলা নানা মাঠে নাই কো দানা
ক্যানে দিলি এমন সাজারে, ভাত নাই আধ পেটা
হামার খাঁচা হয়্যাছে বুকের পাঁজারে।।
এবারকার আকাশ হতে কানা আগুন ঝড়েছে ভোলা
গায়ের মানুষ উজার হল ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বরে
ভোলা বাঁচি কেমন করে।।
মহাজনের চোরা বাজারে ও ভোলা
তুই তাদের করলি রাজারে
সকলি দেখা নাক ডাক্যা ঘুমাও পড়্যা খায়্যা গাঁজারে
স্বরাজ পাইলে ঘুচাব তোর মজারে।।[১৩]

(রচনাকাল ১৯৪৩)

সুকরা ওঁরাও

জলপাইগুড়ির মালবাজার থানার অধিবাসী। তরাই ডুয়ার্সে তেভাগা লড়াইয়ের উপর গান লিখে ও গেয়ে সুকরা ওঁরাও (১৯১১) শ্রমিক-কৃষকের মনে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

*মালবাজার আনা যানা
মাটিয়ালী থানারে
শুনো ভাই স্বাধীন দেশকা গানারে।
এক বিতা পেট লিগিন
গিলি জেল খানারে
শুনো ভাই স্বাধীন দেশকা গানা রে।

(দুই)

হাওয়া চলে সর সর
লাল ঝান্ডা ধড়ে ফর ফর
চলু কিশান চলু মজদুর
নিকালিনা যার কিরে
লড়াই কে ময়দান।।[১৪]

এই সব চারণ কবিরা শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের নয়, বলা যায় বাংলার গর্ব। এঁদের বেশির ভাগই জাতিতে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর। তাছাড়া, মাহিষ্য, তিলি, ব্রাহ্মণ ও উপজাতি সম্প্রদায়ের চারণও রয়েছে। সমাজের নিচু তলায় দাড়িয়ে পরাধীণতা ও শোষণের যে অভিশাপ খুঁড়ে খুঁড়ে খেয়েছিল, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাদের স্বদেশী গানে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তারা গলায় গান নিয়ে ঘুরেছেন পুলিশের সর্তক চোখকে ধুলো দিয়ে, আবার ব্রিটিশের শাসন ও অত্যাচারে দেশ যে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে তাই বোঝাতে গিয়ে ইংরেজের কারাগারেও অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছেন। এঁদের গান সেদিন বাঙালির মনে শুধু অসীম সাহসই দেয়নি, দেশ সেবার জন্য দুঃখকে যেমন বরণ করেছিলেন তেমনই হিন্দু মুসলমান ঐক্য, সংহতি আর মিলনের কথাও তারা উচ্চারিত করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এঁদের লেখনী আমাদের শোকসাহিত্যের অনন্য সম্পদ। বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে প্রাক্ স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত স্বদেশী গানের এই সব চারণ কবিদের গান সাবেক হয়ে গেলেও আজও এর অবদান অনস্বীকার্য। এঁদের কন্ঠের গানেই সেদিন শত শত মানুষের মনে ইংরেজ বিরোধী, শোষণ বিরোধী প্রতিবাদী সত্তার জন্ম দিয়েছিল, যা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মানুষের সংগ্রামী -চেতনাকে সংগঠিত ও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল।

গান দুটি সাদরি ভাষায় রচিত।

হামার মায়ের মুখত হাসি নাইরে ভাই,
মা যে হামার পরদেশী শত্রুর কারাগারে
তাক কেমনে বাঁচাই।
সগায় জাগরে ভাই, এখনও সময় আছেরে জাগিয়া উঠিবার,
তোমাদের লাগি কাঁদিছে মাতা।
যে তোমারে জন্ম দিছে, তাক করিছে অপমান।
সঙ্গে হামাদের গান্ধী আছেত,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
বিদেশী গোলাম থাকব না ভাই, বিদেশী শিক্ষা নেব না রে ভাই।
মা মা বলে হাক দে রে ভাই,
মায়ের দুঃখ ঘোচাই।[১২]

(রচনাকাল ১৯৪৩)

বনমালী কুণ্ডু

গণসংগীত শিল্পী বনমালী কুণ্ডু (১৯১৩-১৯৬৮) দিনাজপুর থেকে এসে মালদায় বসবাস করেন। তেতাল্লিস সনের দুর্ভিক্ষে তাঁর রচিত একটি গান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ খুলে দেয়। শ্রেণীবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক প্রচার গানের মাধ্যমে করা হচ্ছে বলে এই অভিযোগে, ব্রিটিশের কারাগারে তিনি নির্যাতিত হন।

শোনরে ভোলা নানা মাঠে নাই কো দানা
ক্যানে দিলি এমন সাজারে, ভাত নাই আধ পেটা
হামার খাঁচা হয়্যাছে বুকের পাঁজারে।।
এবারকার আকাশ হতে কানা আগুন ঝড়েছে ভোলা
গায়ের মানুষ উজার হল ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বরে
ভোলা বাঁচি কেমন করে।।
মহাজনের চোরা বাজারে ও ভোলা
তুই তাদের করলি রাজারে
সকলি দেখা নাক ডাক্যা ঘুমাও পড়্যা খায়্যা গাঁজারে
স্বরাজ পাইলে ঘুচাব তোর মজারে।।[১৩]

(রচনাকাল ১৯৪৩)

সুকরা ওঁরাও

জলপাইগুড়ির মালবাজার থানার অধিবাসী। তরাই ডুয়ার্সে তেভাগা লড়াইয়ের উপর গান লিখে ও গেয়ে সুকরা ওঁরাও (১৯১১) শ্রমিক-কৃষকের মনে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

*মালবাজার আনা যানা
মাটিয়ালী থানারে
শুনো ভাই স্বাধীন দেশকা গানারে।
এক বিতা পেট লিগিন
গিলি জেল খানারে
শুনো ভাই স্বাধীন দেশকা গানা রে।

(দুই)

হাওয়া চলে সর সর
লাল ঝান্ডা ধড়ে ফর ফর
চলু কিশান চলু মজদুর
নিকালিনা যার কিরে
লড়াই কে ময়দান।।[১৪]

এই সব চারণ কবিরা শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের নয়, বলা যায় বাংলার গর্ব। এঁদের বেশির ভাগই জাতিতে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর। তাছাড়া, মাহিষ্য, তিলি, ব্রাহ্মণ ও উপজাতি সম্প্রদায়ের চারণও রয়েছে। সমাজের নিচু তলায় দাড়িয়ে পরাধীণতা ও শোষণের যে অভিশাপ খুঁড়ে খুঁড়ে খেয়েছিল, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাদের স্বদেশী গানে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তারা গলায় গান নিয়ে ঘুরেছেন পুলিশের সর্তক চোখকে ধুলো দিয়ে, আবার ব্রিটিশের শাসন ও অত্যাচারে দেশ যে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে তাই বোঝাতে গিয়ে ইংরেজের কারাগারেও অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছেন। এঁদের গান সেদিন বাঙালির মনে শুধু অসীম সাহসই দেয়নি, দেশ সেবার জন্য দুঃখকে যেমন বরণ করেছিলেন তেমনই হিন্দু মুসলমান ঐক্য, সংহতি আর মিলনের কথাও তারা উচ্চারিত করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এঁদের লেখনী আমাদের শোকসাহিত্যের অনন্য সম্পদ। বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে প্রাক্ স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত স্বদেশী গানের এই সব চারণ কবিদের গান সাবেক হয়ে গেলেও আজও এর অবদান অনস্বীকার্য। এঁদের কন্ঠের গানেই সেদিন শত শত মানুষের মনে ইংরেজ বিরোধী, শোষণ বিরোধী প্রতিবাদী সত্তার জন্ম দিয়েছিল, যা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মানুষের সংগ্রামী -চেতনাকে সংগঠিত ও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল।

গান দুটি সাদরি ভাষায় রচিত।

সূত্র নির্দেশ

১) বাংলা স্বদেশী গান ঃ গীতা চট্টোপাধ্যায়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩; পৃষ্ঠা ৮,৯

২) ঐ; পৃষ্ঠা ঃ ৪১, ৪২

৩) মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪) ঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য; বাঙলার মনীষা (প্রথম খন্ড) ঃ সুধীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৬, ২৭৭

৪) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জেলা মালদহ ঃ কমল বসাক ; রূপান্তরের পথে, ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৯৮৫, গৌতম পাল সম্পাদিত, মালদা; পৃষ্ঠা ঃ ৪১

৫) ঐ; পৃষ্ঠা ঃ ৪১

৬) দৈনিক বসুমতী পত্রিকা, শিলিগুড়ি সংস্করণ, ১৪ জুন ২০০০; পৃষ্ঠা ঃ ৩

৭) ঐ; পৃষ্ঠাঃ ৩

৮) ঐ; পৃষ্ঠা ঃ ৩

৯) ঐ; পৃষ্টাঃ ৩; দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ বিশ্বনাথ চত্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ ১৩৯২, রায়গঞ্জ, পৃষ্ঠাঃ ৫৫, ৫৬

১০) ১৯৮৭ সালে চারণকবি গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের কন্যা কল্যাণী রায়ের কাছ থেকে গানটি সংগ্রহ করেছিলাম; দৈনিক বসুমতী পত্রিকা, ১৪ জুন ২০০০; পৃষ্ঠা ঃ ৩

১১) স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায় ঃ নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, উত্তরবঙ্গ অনুসন্ধান সমিতি, জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫; পৃষ্ঠা ঃ ৫৭

১২) ১৯৯৪ সালে এই গানটি নকশালবাড়ির বাউল পদকর্তা গোপাল দাস বাউলের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি, তখনই তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর।

১৩) তেভাগা আন্দোলন ঃ সম্পাদনা ধনঞ্জয় রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০০; পৃষ্ঠা ২১৪

১৪) ঐ; পৃষ্ঠা ঃ ২১৭

*উত্তরবঙ্গে প্রাক্ স্বাধীনতাকালে অন্যান্য চারণ কবিদের মধ্যে মালদার রেবতী মৈত্র (১৯০৮-১৯৭৭), রচিত স্বদেশীগানের দুটি কলি, 'রক্তে রাঙাবি শ্যামল বসুধা, জননীর হাসি ফুটাবি আয়', গৌর গোবিন্দ সেন (১৮৯৯-১৯৫৯), রচিত একটি গানের কয়েকটি লাইন, 'মার দেখি, কত গুলি, সব হবে বৃথা, গৌরগোবিন্দ হেঁকে বলে করিস নে আর দেরি, আয়রে আয় দ্রুত পদে খুলতে মায়ের বেড়ি', রায়গঞ্জের রাধাবল্লভ সরকার (১৯২১-১৯৮৪), রচিত গান, 'মা মা ডাকে সবাই যে তোর মুখের পানে চেয়ে, মা তোর একি দশা করলে কারা ব্রিটিশ হারামজাদা', বালুরঘাটের কমল রায়, রচিত গানের কয়েকটি কলি, ও গো পনেরই আগষ্ট, কি বলে আজ গাইবো তোমার গান, র‍্যাডক্লিফের ছুরিখানা, এল তেড়ে দিলো হানা, মায়ের বুকে হানলো ছুরি, করলো তারে খান খান,' এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র - ঢাকা বিক্রমপুর

শমিতা সিংহ

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের বিক্রমপুর গ্রন্থে একটি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া যায়। এই কবিতায় বিক্রমপুর অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। বিক্রমপুরের চারদিকে নদী। পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, পূবে পদ্মা। ইছামতীর নদীতীরে স্বর্ণগ্রাম।

ঢাকেশ্বরী পূর্বভাগে যোজনদ্বয় বাত্যয়ে
ইছামতী নদীপার্শ্বে স্বর্ণগ্রামো বিরাজতে —
দিল পুরোত্তরে ভাগে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে
বৃদ্ধগঙ্গা দক্ষিণে চ পূর্বে পদ্মানদীবহাৎ[১]

জনশ্রুতি ছিল যে বিক্রমপুর নাম রাজা বিক্রমের নাম থেকে হয়েছে। রাজা বিক্রম ইছামতী তীরে বিদ্বান ব্যক্তিদের, ব্রাহ্মণদের এবং দরিদ্রদের মধ্যে ধন বিতরণ করতেন। একসময়ে বিক্রমপুরে বহু পন্ডিতের বাস ছিল।

লৌকিক কল্পনায় উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ অঞ্চলে তাঁর নামে একটি নগর স্থাপন করেন। তার থেকে বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি। উজ্জয়িনীর রাজার সঙ্গে বিক্রমপুরের কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। ইতিহাসের সঙ্গে রূপকথা মিশে জনমানসে উজ্জয়িনীর সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে রাজা বিক্রম এক হয়ে গিয়েছিলেন।

বঙ্গদেশে বহুকাল যাবৎ নবদ্বীপের পরই বিক্রমপুর বিদ্বৎ সমাজের গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল। নদীয়া ছিল ন্যায়শাস্ত্র চর্চার পীঠস্থান বলে বিখ্যাত আর বিক্রমপুর স্মৃতিশাস্ত্র চর্চার কেন্দ্র রূপে পরিচিত। যদিও অন্যান্য শাস্ত্রর চর্চাও এখানে হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিক্রমপুরের জমিদার কাশীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরীর প্রচেষ্টায় বিক্রমপুরে শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। তিনি বিক্রমপুরে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। কাশীকান্ত বন্দোপাধ্যায় সংস্কৃত পন্ডিতদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই কারণে পন্ডিতেরা তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন। পরবর্তীকালে শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায় জমিদার হওয়ার পর উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয়। তাঁর সভায় পন্ডিতেরা বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা করতেন।

ব্রাহ্মণদের আচারানুষ্ঠান এবং শাস্ত্র চর্চার উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তবে একথা সত্যি নয় যে বিক্রমপুরের পন্ডিত সমাজের উন্নতি তাকে দিয়েই শুরু হয়।

এর সূচনা অনেক আগে। পরবর্তী কালে সংস্কৃত চর্চার অগ্রগতিতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি কালীপাড়াতে হিতোপদেশিনি সভা এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামাকান্তের পর তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রকান্ত সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায় চৌধুরী প্রথম পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসেন। প্রথম হিতোপদেশিনি সভার স্থাপন করে পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করার পর ঢাকা সারস্বত সমাজের মধ্যে দিয়ে তা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল।

বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, ব্যাকরণ, পুরাণ, কাব্য এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করতেন শ্যামাকান্ত। তাঁর সংগ্রহে সংস্কৃত এবং বাংলা অভিধান ও বহু দুর্মূল্য পুঁথি ছিল।[২]

শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায় হিতোপদেশিনি সভার সভাপতি ছিলেন। বিক্রমপুরের দুজন বিখ্যাত পন্ডিত জগৎবন্ধু তর্কবাগীশ এবং কালীকুমার বিদ্যারত্ন ঐ সভার দুজন সম্পাদক ছিলেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের উৎসাহে হিতোপদেশিনি সভার পরিচালনায় সংস্কৃতে লিখিত পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়।[৩]

পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি অনেক খানি ইংরেজি স্কুলের পরীক্ষা পদ্ধতির মতই ছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রে পন্ডিত ব্যক্তিদের দিয়ে প্রশ্নপত্র করা হত। পরীক্ষার সময়ে তারা বাইরে থেকে অনেকে এসে বিভিন্ন বাড়িতে থাকতেন। পরীক্ষা চলাকালীন গ্রাম সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিতে মুখর হয়ে থাকত। সারা দিন পন্ডিতরা শাস্ত্র আলোচনা করতেন।[৪]

হিতোপদেশিনি সভার পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতেন তাদের প্রশংসাপত্র এবং যারা সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন তাঁদের স্বর্ণপদক দেওয়া হত। পরীক্ষকেরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতেন। হিতোপদেশিনি সভার বার্ষিক সমাবেশ হত জ্যৈষ্ঠ মাসে। বিক্রমপুর এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে পন্ডিতেরা সমাবেশে যোগ দিতেন এবং শাস্ত্র আলোচনা করতেন। সভা শেষে তাদেরও পুরস্কৃত করা হত। হিতোপদেশিনি সভার অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় পাশ করার পর ছাত্রদের যে প্রশাংসাপত্র দেওয়া হত তার উদাহরণ নীচে উল্লেখিত হল।

শ্রীশ্রী ঈশ্বরো জয়তি —

কালীপাড়া হিতোপদেশিনি সভায়াঃ শ্রী যুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায় চৌধুরী ভূম্যাধিকারিণা প্রতিষ্ঠিতায়া শ্রীযুক্ত পন্ডিত শ্রীহরি বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য

ব্যাকরণ ছাত্রায়াঃ শাস্ত্রাধ্যাপকস্য শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যায়িণী তৃতীয় শ্রেণী ভূক্তায়। বিদ্যাগৌরব বিখ্যাত পন্ডিতানাম সুসম্মতা প্রশংসা পত্রিকা দত্তা সুশিক্ষা ফল ভাগিনী।

প্রথম পরীক্ষা শকাব্দ ১৭৯৯।

পরীক্ষানাম্ তারিখ ২০ জ্যৈষ্ঠ। শ্রীশ্রী অভয়াচরণ বিদ্যারত্নানাম্ শ্রী শ্রী কালীকৃষ্ণ শিরোমণিনাম্ শ্রীশ্রীহরি বিদ্যালঙ্কারানাম্ শ্রী শ্রী কালিকুমার বিদ্যারত্ন সম্পাদকস্য।[৫]

শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল পন্ডিতদের উৎসাহিত করা এবং সংস্কৃত চর্চা চালু রাখা। বিভিন্ন পন্ডিতদের বাড়িতেও তিনি নতুন টোল স্থাপন করেন।[৬]

কালীপাড়া পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় হিতোপদেশিনি সভা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭৮ এর সেপ্টেম্বরে ঢাকা সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে এটি হিতোপদেশিনি সভার মতই পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। ঢাকা সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসে বিক্রমপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়ের কাছ থেকে। বিক্রমপুরের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পন্ডিতরা ঢাকা সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ দেখান।

ঢাকা সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠার বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্য ছিল। সেগুলি হল সংস্কৃত টোলে পঠন পাঠনের জন্য কিছু বই স্থির করে দেওয়া, টোলে পঠন পাঠনকে বিশেষ একটি নিয়মের মধ্যে বেঁধে দেওয়া প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এছাড়া টোলের শিক্ষার্থীর বিশেষ করে পূর্ব বাংলা থেকে যারা পরীক্ষার বসতে আগ্রহী তাঁদের পরীক্ষার ব্যবস্থা ও যোগ্য পরীক্ষক নিযুক্ত করা, সফল পরিক্ষার্থীর মধ্যে পুরস্কার এবং বৃত্তি ও উপাধি দানের ব্যবস্থা করা, টোলের পন্ডিতদের বিশেষ উৎসাহিত করা যাতে তারা অধ্যাপনার ব্যাপারে যত্নশীল হন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি অধ্যাপনায় আরও উন্নতি করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। টোলগুলির পড়াশুনা ইত্যাদির মান দেখে পুরস্কৃত করা এদের লক্ষ্য ছিল। ঢাকা সারস্বত সমাজের অন্যান্য কতকগুলি উদ্দেশ্যও ছিল। তা হল পুরনো এবং মূল্যবান সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করা এবং সংস্কৃত গ্রন্থাগার স্থাপন করা, টোলে আধুনিক বিজ্ঞান পাঠ চালু করা যাতে এদেশে জনগণের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়।[৭]

ঢাকা সারস্বত সমাজের হাতে ২০০টি টোলের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত ছিল। সারস্বত সমাজ পরীক্ষার পাঠ্যসুচি স্থির করে দিত। ১৮৭৯-র মে মাসে ঢাকা কলেজ ভবনে অন্যান্যদের সঙ্গে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে সারস্বত সমাজের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।[৮]

ঢাকা জেলায় সম্রান্ত ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদানেই প্রধানত ঢাকা সারস্বত সমাজের বৃত্তি এবং পুরস্কার বিতরণ করা হত। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে এই ভাবে প্রথমে হিতোপদেশিনি সভা এবং পরে ঢাকা সারস্বত সমাজ বিশেষ নিয়মের মধ্যে আনতে পেরেছিল। ঢাকা সারস্বত সমাজ সারস্বত পত্রিকা নামে একটি সাপ্তাহিকও প্রকাশ করত।

ছাত্রবৃত্তি এবং পুরস্কার দান করতেন সাধারণত ঢাকা জেলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। তাছাড়া সারস্বত সমাজের নিজস্ব কিছু আয়ও ছিল। যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঢাকা সারস্বত সমাজ, আর্থিক অনুদান পেত তাদের মধ্যে কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ এবং বিক্রম পুরের কুন্ডু বংশের উল্লেখ করা যায়।

সুধারাম (নোয়াখালি) কুমিল্লা কলকাতা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, পাটিয়া (ফরিদপুর) কবিরাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সারস্বত সমাজের পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্র ছিল। পরীক্ষা হত

ন্যায়, সংখ্যা, বেদান্ত, স্মৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, পুরাণ, আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে। তিনটি স্তরে পরীক্ষা হত আদ্য, মধ্য এবং উপাধি। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসার জন্য কোন অর্থ দিতে হত না। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা প্রশ্নপত্র করতেন।

প্রতিবছর মহালয়ার দিন সারস্বত সমাজের বাৎসরিক সভা হত। ঢাকা ময়মনসিংহ ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ কলকাতা, চুঁচুড়া এবং ভট্টপল্লীর পন্ডিতরা সভায় আমন্ত্রিত হতেন। সভা শেষে তাঁরা বিদায় পেতেন। যে সমস্ত ছাত্ররা পরীক্ষার সফল হত তারা বাৎসরিক সভায় উপাধি পদক এবং প্রশংসাপত্র পেত। সারস্বত সমাজের কার্যনির্বাহিক সভার সচিব ছিলেন প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিক্রমপুরের খ্যাত নামা স্মার্ত পন্ডিত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন ছিলেন সারস্বত সমাজের সভাপতি। ঢাকা সারস্বত সমাজ পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা করার ফলে কাব্য এবং অলঙ্কার শাস্ত্র চর্চা যা মূলতঃ কলকাতা সংস্কৃত কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ক্রমশঃ পূর্ববাংলায় প্রসারিত হয়।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন Report on the Tols of Bengal, Bihar and Orissa গ্রন্থে (১৮৯১) ঢাকা সারস্বত সমাজের উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন ঢাকায় টোল পরিদর্শনে যান দেখেন যে ঢাকা সারস্বত সমাজ একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান যার বাৎসরিক গড় আয় ২৬৩০/- টাকা। এই সমাজের সাফল্যের কারণ অনেকটাই এর সচিব পন্ডিত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্নের সংগঠন ক্ষমতা। মহেশ ন্যায়রত্ন বলেছেন যে ঢাকা সারস্বত সমাজ সরকার থেকে বাৎসরিক ৫০০ টাকা অনুদান পায়।[৯]

হিতোপদেশিনি সভা এবং পরে ঢাকা সারস্বত সমাজ সংস্কৃত শিক্ষার মান অনেক খানি উন্নত করেছিল। আগে প্রত্যেক টোলের পন্ডিত পঠনপাঠন শেষে তার নিজের ছাত্রদের পরীক্ষা নিতেন এবং উত্তরে সন্তুষ্ট হলে ছাত্রদের উপাধি দিতেন। কেবল মাত্র মৌখিক পরীক্ষা হত। পরীক্ষার দিন একটি সূচ পুঁথিতে বিঁধিয়ে দেওয়া হত। যে পাতায় সূচটি গিয়ে বিঁধত সেই পাতা থেকে প্রশ্ন করা শুরু হত। এই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সূচীভেদ পরীক্ষা বলা হত। গুরু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী উপাধি দিতেন। এই ভাবে উপাধি পাওয়ার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র টোল খুলে পড়ানো শুরু করতেন। সারাজীবনই তাঁকে প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে হতো। পন্ডিত সভায় বিবাহ বা শ্রাদ্ধ বাসরে তাকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করা হত। এই সব সভায় প্রবীন এবং অভিজ্ঞ পন্ডিতদের মধ্যস্থতা করার জন্য মনোনীত করা হত। এরা তর্কে অংশগ্রহণকারী পন্ডিতদের শাস্ত্রজ্ঞান পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে পুরস্কৃত করতেন। সুতরাং টোলের শিক্ষার শুরু থেকে আমৃত্যু তাঁকে তার পান্ডিতের প্রমাণ দিয়ে যেতে হত। যেকোনো সময়ে প্রতিপক্ষ তাকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করতে পারতেন।

বিক্রমপুরে একসময়ে অনেক সংস্কৃত পন্ডিতের বাস ছিল। আউটসাহীর চক্রবর্তী বংশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং এই বংশের অনেকই পন্ডিত ছিলেন। এই গ্রামের গাঙ্গুলি বংশ তালুকদার ছিলেন এবং উচ্চরাজকর্মচারী ছিলেন। গাঙ্গুলি বংশের পন্ডিতরা এই গ্রামে চাটাতি, বাড়রী মুখুটা ও ঘটক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চাটাতি বংশে বহু পন্ডিত ছিলেন, চন্ডীচরণ সার্বভৌম প্রভৃতি এই বংশেরই কৃতি সন্তান ছিলেন। ঘটক বংশও পান্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণনাথ চিন্তামণি, বংশীবদন তর্কভূষণ প্রভৃতি এই বংশের রত্ন স্বরূপ ছিলেন। পূর্বপাড়া থেকে আগত মহানন্দ বংশীয় চক্রবর্তীগণ সংস্কৃত ও জ্যোতির্বিদ্যায় এই অঞ্চলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আবহমান কাল থেকে তাদের বংশ পুরুষ পরম্পরাক্রমে সংস্কৃত ও জ্যোতিষে ও অধ্যাপনা চলে এসেছে। গৌরীশংকর চক্রবর্তী অশ্বিনীকুমার বিদ্যারত্ন কাব্যতীর্থ প্রভৃতি সুবিখ্যাত পন্ডিতগণ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করে ছিলেন এই গ্রামে চন্ডীচরণ সার্বভৌম নামে একজন সুবিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। এই গ্রামের কালীকান্ত শিরোমণিকে বঙ্গের লোক দ্বিতীয় রঘুনন্দন আখ্যা দিয়েছিলেন।

জপসা গ্রামে বৈদিক, রাঢ়ি, বারেন্দ্র এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বৈদিক ও রাঢ়ী বংশে বহু পন্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার, বিশ্বেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আউটসাহী গ্রাম বিক্রমপুরের সংস্কৃত শিক্ষার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। প্রাচীন কালে যে এখানে সংস্কৃত শিক্ষার বহু প্রচলন ছিল। তার প্রমাণ আছে। পন্ডিত শ্রেষ্ঠ ভবানীশংকর তর্কবাগীশ পূর্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পন্ডিত ছিলেন। 'এক সময় যেমন এই গ্রাম সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খ্যাতি ও গৌরব লাভ করেছিল বর্তমান কালে তেমনি সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া ঘোর অপযশ অর্জন করিয়াছে। সম্প্রতি এখানে কোন টোল বা সংস্কৃত বিদ্যালয় নাই'।[১০]

বিদগাঁওএ সকাল সন্ধ্যায় সব সময়ে স্মৃতি, পুরাণ ও ব্যাকরণের আলোচনা চলত। টোলের অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে সংস্কৃত চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বিক্রমপুরের বিবরণ' গ্রন্থে বলেছেন — 'বানারি গ্রামের বিখ্যাত পন্ডিত ভোলানাথ সার্বভৌম নবদ্বীপ থেকে পান্ডিত্য গৌরব প্রভাবে পন্ডিতমন্ডলীকে মোহিত করে সার্বভৌম এই গৌরবাত্মক উপাধি লাভ করেন।[১১] ভোলানাথ ব্যাকরণ শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পন্ডিত ছিলেন। এই গ্রামে আনন্দচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার স্মৃতি শাস্ত্রের পন্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন।

বজ্রযোগিনীর কালীশংকর সিদ্ধান্তবাগীশ ময়মনসিংহের রাজা রাজসিংহের সভা পন্ডিত ছিলেন। তার রচিত কালীশঙ্কর পত্রিকা নবদ্বীপ, বারাণসী, ও মাদ্রাজের টোলে পঠন পাঠন হত। তবে কালীশংকর ভাল তার্কিক ছিল না। নৈয়ায়িকদের মতে কালীশংকরের টীকা এ পর্যন্ত ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত টীকার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তার বহু ছাত্রদের মধ্যে মহেশ্বরদি চাকদার কমলাকান্ত তর্কশিরোমণি তার পান্ডিত্যের জন্য সোনার কমল এবং কাটাদিয়ার কমলাকান্ত সার্বভৌম রূপার কমল বা জল কলম নামে আখ্যাত হয়েছিলেন।[১২]

তিনি কমলাকান্ত সার্বভৌম সর্বাপেক্ষা সুপন্ডিত বলে একসময় পরিচিত হন তাঁর প্রচেষ্টাতেই কালীশংকরের টীকা বিভিন্ন দেশে বহুল পঠিত ও প্রচলিত হয়।

কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতের মৃত্যুর পর বিক্রমপুরের সংস্কৃত চর্চার বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। এইসব পন্ডিতদের মধ্যে কমলাকান্ত সার্বভৌমের নাম করা যায়। যে কোন পন্ডিত সভায় তিনি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বিদায় পেতেন।[১৩] তিনি তর্কে পারদর্শী ছিলেন এবং নবদ্বীপের বহু পন্ডিতকে তিনি তর্কে পরাজিত করেন। বিক্রমপুরের আর একজন স্বনামধন্য পন্ডিত অভয়াচরণ চমৎকার। তিনি এত কম সময়ের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেন যে তাকে চমৎকার উপাধি দেওয়া হয়।[১৪] কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন বাংলাদেশ থেকে বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় পঞ্জিকা সমিতির প্রতিনিধি হন। তিনি সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলাতেও গ্রন্থ রচনা করেন। "বসন্ততিলক' তাঁর রচিত একটি বাংলা কাব্য গ্রন্থ। গুরুনাথ বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর সংস্কৃত টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সমেত সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। বিক্রমপুরের বশহিল গ্রামের অমর চন্দ্র স্মৃতি সাংখ্যতীর্থ দিনাজপুর ধর্মসভা চতুস্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষকতা করতেন। পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে সাংখ্য দর্শনের তর্ক সভায় তিনি জয়ী হয়েছিলেন। তিনি পার্থপশুপতম নাটক রচনা করেন। এই নাটক কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অভিনীত হয়ে প্রশংসিত হয়।

কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন একজন অসাধারণ বক্তা কবি, এবং তার্কিক ছিলেন। মনুসংহিতার উপর তাঁর রচিত টীকা "চিরপ্রভা" অসাধারণ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের পরিচয় বহন করেন। বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি তিনি বাংলার প্রতিনিধি হয়ে গিয়ে ছিলেন। ঐ সভার সংস্কৃতে বিদ্যারত্নের ভাষণ এবং তর্ক অনেককেই মুগ্ধ করেছিলেন। বাল গঙ্গাধর তিলক এবং অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। এরপর তিনি ভারত বিখ্যাত হন। সারা জীবন তিনি কোন চাকুরি করেননি এমনকি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদও গ্রহণ করেন নি। শৈশব থেকে তিনি কাব্য এবং সঙ্গীত রচনায় পারদর্শী ছিলেন।

কাটাপাড়া গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত মহামন্ডল স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক অভিনয় করান। সংস্কৃত পদ্যগোষ্ঠী স্থাপন করে তিনি অনেক সংস্কৃত কাব্য প্রকাশ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা এবং সম্পাদনা করেন।

আয়ুর্বেদশাস্ত্র চর্চার জন্য বিক্রমপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। বিক্রমপুরের প্রায় সমস্ত গ্রামে একজন কি দুজন আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের টোলেই বেশ কিছু ছাত্র ছিল। বিক্রমপুরে আরও অনেক পন্ডিত ছিলেন। এদের কেউ কেউ বিক্রমপুর থেকে পরে অন্যত্র চলে যান। তাদের উল্লেখ তাই এখানে করলাম না।

পন্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তার রিপোর্টে সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার পীঠস্থান হিসাবে বিক্রমপুরের বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে পূর্ববঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বিক্রমপুর বহু দিন থেকে প্রসিদ্ধ যদিও মহেশ ন্যায়রত্ন যখন টোল পরিদর্শনে যান তখন সেখানে পন্ডিত ও ছাত্রদের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। তিনি বলেছেন 'শাস্ত্রব্যবসায়ের ক্রমাবনতির ফলে সারস্বত সমাজাদির প্রতিষ্ঠা সত্বেও ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জিলায় টোল সংখ্যা ছিল মোট ৮৮ তন্মধ্যে ন্যায়ের টোল ছিল মাত্র ১৩ (ছাত্রসংখ্যা ৬১)।[১৫]

বিক্রমপুরেও অন্যান্য অঞ্চলের মত সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চার অবনতি হয়েছিল ঠিকই তবে অনেকদিন পর্যন্ত এখানে তবু কিছুটা শাস্ত্রচর্চা হত বলা যায়। বিক্রমপুরের ধনী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা সম্ভব হয়ে ছিল। এটি পুরোপরি পাশ্চাত্য করণের প্রতিক্রিয়া। জমিদাররা ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করে ছিলেন। স্কুলগুলি সরকারি সাহায্য পেত আর জমিদাররা টোলে আর্থিক সাহায্য করতেন। তবে জমিদাররা পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। তারা পাশ্চাত্যের পরীক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করার চেষ্টা করে ছিলেন, টোলের ছাত্রদের পুরস্কৃত করতেন এবং পন্ডিতদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেন। জমিদাররা বুঝতে পেরেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিজ্ঞানের চর্চা ব্যতীত দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তারা চেয়েছিলেন ঐতিহ্য বজায় রেখে এক ধরণের আধুনিকতা নিয়ে আসতে।

এ প্রসঙ্গে পন্ডিত অনন্ত লাল ঠাকুর যিনি বিক্রমপুরের ঐতিহ্য এখনও বজায় রেখেছেন তার সঙ্গে কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে[১৬] বুঝতে পারলাম যে বিক্রমপুর ইত্যাদি সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র কিভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ রেখে চলত। ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ ভারতসংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। পন্ডিতদের মাধ্যমে এই সংস্কৃতি বাংলার সুদূর গ্রাম থেকে পশ্চিম এবং দক্ষিণাঞ্চলের গ্রাম শহর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১) হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, বিক্রমপুর, ২য় খন্ড, ঢাকা ১৩৫০,

২) ঐ পৃষ্ঠা ৪৪

৩) ঐ পৃষ্ঠা ১৬

৪) ঐ পৃষ্ঠা ৪৬

৫) ঐ

৬) ঐ

৭) এডুকেশনাল প্রসিডিংস, জানুয়ারি ১৮৮০, রিপোর্ট অব্ মওয়াট, এক্স.এম.এ. অফিসিয়েটিং

ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্, ইষ্টার্ন সার্কল টুদি ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান, ফোর্ট উইলিয়ম, ঢাকা, দি টেন্থ ডিসেম্বর ১৮৭৯

৮) ঐ

৯) মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, রিপোর্ট অন্ দি টোলস্ অব বেঙ্গল, বিহার এন্ড ওড়িশা , ক্যালকাটা, ১৮৯৯, পৃষ্ঠা ২৬

১০) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিক্রমপুরের বিবরণ, ২য় খন্ড, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৩২

১১) ঐ পৃষ্ঠা ৩৯

১২) দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বাঙ্গালার সারস্বত অবদান, বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা, কলকাতা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৬

১৩) ঐ পৃষ্ঠা ২৪৭

১৪) হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, বিক্রমপুর, ২য় খন্ড, ঢাকা ১৩৫০ পৃষ্ঠা ৪১৯

১৫) মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, রিপোর্ট অন্ দি টোলস্ অব্ বেঙ্গল, বিহার এন্ড ওড়িশা, ক্যালকাটা, ১৮৯১, পৃষ্ঠা ২৬

১৬) পন্ডিত অনন্ত লাল ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৪শ নভেম্বর, ২০০০।

ফুটবল ও বাঙালি ঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রকাশ

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক কালে ইতিহাস চর্চায় সাংস্কৃতিক উপাদানের সমাজশ্রয়ী ইতিহাস-গবেষণার যে নিরন্তর প্রয়াস চলেছে,— তারই প্রেক্ষাপটে বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বা চরিত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের সীমারেখায় যে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল না — এ তথ্য আজ ঐতিহাসিক মহলে সর্বজন স্বীকৃত। উনিশ শতক জুড়ে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে উপনিবেশ তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণকে আশ্রয় করে প্রতিভাত হয়েছিল।[১] ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান চর্চা, সঙ্গীত নৃত্য, পরিবার ও নারী, যাত্রা- কথকতা, নাটক, ক্রিড়া, চলচ্চিত্র - সংস্কৃতির বিবিধ অঙ্গনে জাতীয় চেতনার পূর্ণ বা খণ্ডিত প্রকাশ ও প্রতিফলন এ যুগে লক্ষিত হয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের একটি বিশেষ রূপ প্রতিফলিত হয় বাংলাদেশে ফুটবল চর্চার মধ্যে। উপনিবেশিক বাংলায় বিকশিত এই 'ক্রিড়া জাতীয়তাবাদ'[২]- এর উৎস, চরিত্র ও প্রভাব এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য সংক্ষেপে অথচ বিশ্লেষিত রূপে উপস্থাপনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে খেলাধূলার সামাজিক ইতিহাসশ্রয়ী গবেষণার ঐতিহ্য বেশি দিনের নয়। আশির দশক থেকে ক্রিকেট নিয়ে এ-ধরণের গবেষণা[৩] শুরু হলেও ফুটবলের ক্ষেত্রে এই প্রয়াস আজ পর্যন্ত খুবই সীমিত। সৌভাগ্যক্রমে বাংলার ফুটবল নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ আশির দশকের শেষ দিকে করেছিলেন সৌমেন মিত্র।[৪] ঐ গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও ছিল মুলতঃ কলকাতা কেন্দ্রিক এবং পদ্ধতিগত ভাবে সীমাবদ্ধ। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ্য,— ঔপনিবেশিক বাংলার খেলাধূলোর মধ্যে ক্রিকেট, পোলো বা হকি কিংবা কোনো দেশীয় ক্রিড়াকে না বেছে ফুটবলকে নির্বাচন করার মূলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। প্রথম, বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে তৃণমূল স্তরে গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা ও সর্বোপরি সর্বজনীনতার বিচারে ফুটবলের ধারে পাশে ঐ খেলাগুলো ছিল না।[৫] দ্বিতীয়, বিদেশী ক্রিড়াগুলোর মধ্যে একমাত্র ফুটবলকে কেন্দ্র করেই বাংলায় জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। বিশ শতকীয় বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অংশ রূপে ফুটবলের গুরুত্ব এই প্রেক্ষিতে সহজেই অনুধাবনীয়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালির ফুটবল যেমন এক অপ্রচলিত প্রকারের 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-

এর প্রতিনিধিত্ব করেছিল, তেমনি ঐ যুগের সমাজ-রাজনীতির উত্তেজক পরিস্থিতিতে ঐ খেলাটা বাঙালি দৈনন্দিন জীবন-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে ফুটবল চর্চা প্রসারের উৎসকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক ও বিনোদন চর্চার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা যায়। ১৮৩৫ সালে মেকলে মিনিট-এর সময় থেকে ভারতীয়দের 'পশ্চিমীকরণ' নীতির শুরু। এই পাশ্চাত্য শিক্ষিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বাঙালি সমাজের উৎসাহে ও উদ্যোগেই ফুটবল চর্চার দেশীয় ক্লাবগুলো গড়ে ওঠে। ভারতে ফুটবল খেলাটা অবশ্য প্রথম দেখিয়েছিলেন কোম্পানির নৌ-সেনারা। তাঁরা বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচি প্রভৃতি বিভিন্ন বন্দরে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অবসর বিনোদনের জন্য ফুটবল খেলতেন বলে জানা যায়।[৬] তবে অসংগঠিত স্তরে বাংলাদেশে ফুটবলের প্রসার ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। এক্ষেত্রে নানা স্তরের ব্রিটিশ আমলা, সেনা অফিসার, ব্যবসায়ী-বণিক, কলেজ-শিক্ষক, সাংবাদিক এমনকি পাদ্রিরাও বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রের তথ্যানুযায়ী ১৮৫৪ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে কলকাতায় প্রথম ফুটবলের আসর বসে। সামাজিক অনুষ্ঠান স্বরূপ ঐ খেলায় অংশ নেয় Calcutta Club of Civilians এবং Gentlemen of Barrakpore। এরপর পর পর দু'বছর-১৮৬৮ ও ১৮৭০ সালে দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ সালে প্রথম ফুটবল ক্লাব ট্রেডস্ ক্লাব (পরবর্তীতে ডালহৌসি ক্লাব) স্থাপিত হয়।[৭]

ভারতীয় তথা বাঙালি উদ্যোগে ফুটবল খেলার জন্ম সম্পর্কে ক্রিড়াসাহিত্যে কিছু মত পার্থক্য থাকলেও এটা মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত যে ১৮৭৭ সালে হেয়ার স্কুলের নয় দশ বছর বয়স্ক বালক-ছাত্র নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর Kick off -এর মাধ্যমেই বাঙালির প্রথম ফুটবলে পাদস্পর্শ ঘটে।[৮] 'ভারতীয় ফুটবলের জনক'-রূপে স্বীকৃত নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রথমে বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব এবং পরে ওয়েলিংটন ও শোভাবাজার ক্লাব গঠন করেন। ব্রিটিশ কলেজ শিক্ষকগণ বিশেষতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক স্ট্যাক (Stack) ও গিলিগ্যান (Giligan) ফুটবল চর্চার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়াও মেডিকেল কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং, লা-মার্টিনিয়ার এবং স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাঙালিরাও ক্রমশঃ অনুকরণমত্ততা থেকে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে ফুটবল খেলতে শুরু করে।

বাঙালিদের মধ্যে ফুটবলের প্রসারে নগেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাদের নাম উচ্চারিত হয় তাঁরা হলেন,— দুখীরাম মজুমদার, মৃন্ময় গাঙ্গুলি, কালীচরণ মিত্তির ও হরিদাস শীল। শোভাবাজার, ভুকৈলাস প্রভৃতি রাজপরিবার, বনেদী লাহা পরিবার, কোচবিহারের মহারাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর সহ বাঙালি সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক, বাবুসমাজ,

জমিদার, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উদ্যোগে ১৮৮০-র দশকের দ্বিতীয়ভাগে পর পর প্রতিষ্ঠিত হয় শোভাবাজার, টাউন, ন্যাশানাল, স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন, মোহনবাগান, এরিয়ান, খিদিরপুর, চিনসুরা স্পোর্টিং, কুমারটুলি, চন্দননগর স্পোর্টিং, মহামেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি ক্লাবগুলো। ১৮৮৮ সালে সিমলার ডুরান্ড কাপ ভারতে প্রথম সংগঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতা হলেও ১৮৮৯ সালে কলকাতায় ট্রেডস্ কাপ দিয়েই বাঙালির ফুটবল যাত্রার সূচনা। বাঙালি বাবুদের দল শোভাবাজারে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বাংলার লেফটন্যান্ট গভর্নর তাঁর ঘোড়াগাড়িতে বসে সেই খেলা দেখেন।[৯] একটা ভ্রান্ত ধারণা এখনও প্রচলিত, ফুটবল মাঠে স্বাদেশিকতার প্রেরণা দিয়েছিল শুধু মোহনবাগান ক্লাব। ১৮৯২ সালে শোভাবাজারই প্রথম গোরাদল ইস্ট সারে রেজিমেন্টকে হারিয়ে ব্রিটিশ সেনাদলের বিরুদ্ধে বাঙালির ফুটবল বিজয়ের কেতন উড়িয়েছিল।[১০] ১৮৯৩ সালে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আই. এফ.এ) গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ঐ বছরেই খেলায় মাঠে ও ব্রিটিশ বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদ কোচবিহারের মহারাজা কোচবিহার কাপ ফুটবল প্রবর্তন করেন। ফুটবল খেলাটা ক্রিকেট, পোলো বা হকির তুলনায় বাঙালির কাছে কেন এত আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার ব্যাখ্যা নানাবিধ। অন্য খেলাগুলোর একটা 'Elitist' চরিত্র হয়ত আবেগ প্রবণ বাঙালির ঘরে ঘরে সেভাবে পৌঁছোতে পারে নি; শহুরে সংস্কৃতিতেই সেগুলো আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফুটবল খেলার কম খরচ আর সহজবোধ্য নিয়ম-পদ্ধতি এই খেলার সামাজিক প্রসারে সাহায্য করেছিল বলা বাহুল্য। মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়কে যদিও বাঙালির ফুটবলের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বলা চলে, কিন্তু তার আগেই গন্ডগ্রামে পর্যন্ত ফুটবল ছড়িয়ে পড়েছিল। না হলে শীল্ড-বিজয়ী মোহনবাগান দলে পল্লী-বাংলা থেকে সদ্য এসে যোগ দেওয়া খেলোয়াড়ের সন্ধান মেলে কেমন করে। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৯০-এর দশকে মন্তব্য করেন, 'গীতা পাঠ- করার চেয়ে, ফুটবল অনেক কাছে পৌঁছে দেবে ঈশ্বরের'। বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল স্তরে সংগঠিত ও অসংগঠিতভাবে ফুটবল খেলার প্রসার ও জনপ্রিয়তাও লক্ষ্য করা যায় প্রায় এই সময় থেকেই। বিশ শতকের প্রথম দু'দশকে যে সব স্থানে ফুটবলের জনপ্রিয়তার নানা ধরণের লিখিত বা মৌখিক ইতিহাস সূত্র পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, দিনাজপুর, ঢাকা, রংপুর, কিশোরগঞ্জ, নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া এবং চব্বিশ পরগণা।

ফুটবলের জনপ্রিয়তার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল; যেটা আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। ফুটবল এমন একটা খেলা, যার মাধ্যমে শাসক ইংরাজদেরও হারানো যায়। বাঙালি কল্পনাপ্রবণ জাতি। জীবনের ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে শাসকদের সীমাহীন অত্যাচার ও শোষণ সহ্য করতে করতে সেই সময় তাঁরা কল্পনা করতেন, সাদা চামড়ার লোকেদের 'পাল্টা মার' দেবেন। তাঁদের সেই কল্পনা মাঝে মাঝে বাস্তবও হয়ে

যেত ফুটবল মাঠে। পরাধীন বাঙালির কাছে সেটাই হয়ে উঠত চরম কিছু পাওয়া।[১১] এই কারণটা বাঙালির আরও কাছে এনে দিয়েছিল ফুটবলের।

ইংরেজরা ভারতীয়দের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রসারে স্কুল-কলেজ স্তরে উৎসাহ দিয়েছিল, তার একটা অন্যতম কারণ ছিল বাঙালি যুব সমাজকে এ ধরণের বিনোদন মূলক ক্রিড়ায় নিমগ্ন রেখে যে কোন রকম জাতীয় আন্দোলন বা কার্যকলাপ হতে দূরে সরিয়ে রাখা বা পথভ্রষ্ট করা। কিন্তু ইংরেজ স্বপ্নেও ভাবে নি যে একদিন, এই সব মনে প্রাণে ও বহিরাবরণে ইংরেজিয়ানায় দীক্ষিতের দলই ইংরেজের জাতীয়তাবাদ আর স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজভাষাকে রাজদ্রোহ প্রচারে ব্যবহার করবে। ফুটবলে মোহনবাগানকে কেন্দ্র করেই এই ব্রিটিশ বিদ্বেষী জাতীয়তাবাদ প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯১১ সালে গোরাদলকে হারিয়ে মোহনবাগানের শীল্ডবিজয় এই বার্তাই বয়ে নিয়ে আসে।[১২] মোহনবাগানের এই জয় কিভাবে সমস্ত বাংলাদেশে জাতীয়তাবোধের এক প্লাবন এনেছিল, আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালির আহত আবেগ আর ধূমায়িত হতাশা কিভাবে ক্রিড়া জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিল,— তা নিয়ে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিম বাংলায় এক উৎকৃষ্ট ধারার ক্রিড়াসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।[১৩] গণমাধ্যম তথা সংবাদ পত্র জগতেও এই ক্রিড়া বিজয় এক নতুন আঙ্গিকের জাতীয়তাবাদী ক্রিড়া সাংবাদিকতার জন্ম দিয়েছিল।[১৪] এমন কি বাংলার তৎকালীন ব্যবসায়িক মহলেও মোহনবাগানকে পরিকল্পনা (Project) করে ঐ সময় বিক্রেতা সংস্কৃতি (Consumer Culture)-র বিকাশ ঘটানো হয়েছিল।[১৫]

ইংরেজরা প্রথম থেকেই কলকাতা ফুটবলে বর্ণবিদ্বেষী নীতি গ্রহণ করে। আই এফ এ শীল্ড ও ট্রেডস্ ছাড়া প্রায় সব উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতাতেই ভারতীয় দলের খেলার দরজা বন্ধ ছিল। কলকাতার প্রথম বিভাগীয় লীগ ফুটবলেও ১৯১৪-১৫ সালে মোহনবাগান ও এরিয়ান এই দুটো দলের খেলার সুযোগ দানের মধ্যেই ভারতীয়দের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ রাখা হয়। উপযুক্ত নিয়মানুগ যোগ্যতামান থাকা সত্ত্বেও ঐ একই দশকে কুমারটুলিকে পর পর দু'বার প্রথম বিভাগে খেলতে দেওয়া হয় নি। ১৯২৫ সালে ইষ্টবেঙ্গলের প্রথম বিভাগে ওঠাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের আগে পর্যন্ত এই বিদ্বেষী ও বৈষম্য নীতি বজায় ছিল। কলেজ ফুটবলেও দেশীয় ও বিদেশী ছাত্রদের জন্য পৃথক পৃথক এলিয়ট ও ক্যাডেট চ্যালেঞ্জ শীল্ড প্রবর্তন করা হয়। এই বর্ণ বিদ্বেষের জবাব বাঙালিরা মাঠেই দিতে শুরু করেন। মোহনবাগান ছাড়াও এরিয়ান ও কুমারটুলি ১৯২০-র দশক পর্যন্ত, ১৯৩০-এর দশকে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং ১৯৪০-এর দশকে ইষ্টবেঙ্গলকে কেন্দ্র করে ক্রিড়া জাতীয়তাবাদ পুষ্ট হয়েছিল।

বিশ শতকের প্রথম দশকে মোহনবাগানের উত্থানের প্রেক্ষাপটে আহত বাঙালি মানসিকতায় ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছিল, তার চরিত্র ও রূপ বিশ্লেষিত গবেষণার দাবি রাখে। প্রথমেই বলা যায়, ফুটবল খেলা

বাঙালি জাতির সামনে এমন এক সাংস্কৃতিক অস্ত্র তুলে ধরেছিল, যার মাধ্যমে ইংরেজদের সঙ্গে একই নিয়ম নীতির আধারে শারীরিক ও মানসিকভাবে সমানে সমানে লড়াই করা যায় এবং তাদের পরাজিত করা যায়। এই অর্থে ফুটবল বাঙালিকে এক বিশেষিত ঐক্যমূলক সাংস্কৃতিক একরূপতা বা সত্তা (identity) দান করেছিল। বাঙালির এই ফুটবলীয় সত্তা ক্রমশঃ জাত-পাত, ধর্ম-সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিভাজনের উর্ধ্বে এক জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসনের জন্মলগ্ন হতেই ব্রিটিশ ধারণায় ও লেখনীতে বাঙালি জাতিকে বিশেষতঃ বাঙালি 'বাবু' ও 'ভদ্রলোক'-দের শারীরিক দুর্বলতা ও অলসতার জন্য বার বার নানাভাবে কটাক্ষ করা হয়েছিল।[১৬] উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও লেখকরাও অনেকেই বাঙালির বাহুবলের অভাবকে স্বীকার করে নিয়ে তার পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস করেছিলেন।[১৭] ব্রিটিশ নির্মিত 'দুর্বল বাঙালি' ('Effeminate Bengali')-র অপবাদ মোচন-রত প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি মানসিকতা থেকেই ১৮৬০-এর দশক থেকে পুষ্ট হয়ে ছিল বাঙালি শরীর সংস্কৃতি চর্চা এবং ঐ সম্বন্ধীয় 'আখড়া' বা সংগঠনের প্রসার।[১৮] স্বদেশী যুগে শারীর সংস্কৃতির এই ধারা যুব সমাজকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের বিকাশে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

বাঙালির পৌরুষ তথা বাহুবল প্রকাশের এই স্বদেশী ধারার সমান্তরালে ফুটবল খেলাও ক্রমশঃ বাঙালি যুব সমাজের কাছে বাহুবীর্য বা পৌরুষ অন্যতম মাধ্যম রূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বুটপরা ইংরেজ সেনাদলের বিরুদ্ধে ফুটবলের মতো শারীরিক বা শক্তি ক্রেড়ায় খালি পায়ে বাঙালিদের লড়াই এবং সাফল্য ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। আর এই জন্যই স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ খেলা ফুটবলকে বয়কটের ভাবনা বাঙালি প্রশ্রয় দেয়নি। বরং বিদেশী বুটকে বর্জন করে খালি পায়ে ফুটবল চর্চার মধ্যে দিয়ে ফুটবল খেলার শৈলীতে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য তথা ভারতীয়ত্ব' (বাঙালিত্ব?) আরোপ করে নিঃশব্দ প্রতিবাদ করেছিল বাঙালি সমাজ। এমন কি, পরবর্তীতে ফুটবলকে ভারতীয় খেলারূপে প্রতিপন্ন করবার লিখিত প্রয়াসও করা হয়েছিল।[১৯]

পরাধীন ভারতে সামাজিক জীবনের প্রতি পদে ইংরেজদের হাতে বাঙালি তথা ভারতীয়দের যে দৈনন্দিন লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হত, তার সকল প্রতিবাদ বা পাল্টা জবাব দেবার প্রয়াস শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই।[২০] ফুটবল ময়দান ছিল এই প্রতিবাদের এক মোক্ষম ক্ষেত্র। ইংরেজ রেফারির পক্ষপাতিত্ব আর ইউরোপীয় দলগুলোর শারীরিক শক্তির অপপ্রয়োগের জবাব বাঙালি খেলোয়াড়রা 'পাল্টা মার' (Reverse hit)-এর দ্বারা মাঠেই দিতে শুরু করেন। কলকাতা ময়দানের গোষ্ঠ পাল, অভিলাষ ঘোষ কিংবা বলাই চ্যাটার্জী প্রমুখ খেলোয়াড় তাঁদের ক্রিড়ানৈপুণ্যের সাথে সাথে পাল্টা মারের সার্থক রূপকার হিসাবেও বাঙালি সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন

করেন। অন্যদিকে, শহরে মধ্যবিত্ত বাঙালি, বিশেষত সরকারি চাকুরে, কেরানি অথবা শ্রমিক শ্রেণী যাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ সরকার বা ব্রিটিশ বিরোধিতা সম্ভব ছিল না, তাদের অবচেতন ও অবরূদ্ধ অথচ প্রকাশ লিপ্সু জাতীয়তাবাদ (Pent up Nationalism)-এর স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটত ফুটবল মাঠের দর্শকাসনে কিংবা ক্লাব সংগঠন কার্যে। ব্রিটিশ দলের বিরুদ্ধে স্বদেশী দলের খেলায় স্বদেশী দলের প্রতি সমর্থন প্রায়শই এক জাতীয়তাবাদী সমর্থনের স্তরে উন্নীত হতো। সাধারণত দেশীয় দলের পরাজয় যেমন তীব্র হতাশার সৃষ্টি করত; তেমনি বিদেশী দলের পরাজয় তাদের কাছে এক জাতীয়তাবাদী জয়ের তৃপ্তি লাভ স্বরূপ ছিল।

প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতে ফুটবল খেলা বিশেষতঃ ফুটবল ক্লাব সংগঠনগুলো কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল কিনা, সে সম্পর্কে ভবিষ্যত তথ্যনিষ্ঠ গবেষণাই কেবল মাত্র আলোকপাত করতে পারবে। তবে এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্য ও নথিপত্র হতে জানা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ অনেক সময়েই ফুটবল মাঠকেও স্পর্শ করেছিল। ময়দানে জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটে ১৯৩০ সালে যখন আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মহিলা পিকেটারদের অবরোধ কলকাতায় ফুটবল লীগ বন্ধ হয়ে যায়।[২১] ফুটবল মাঠে অভিনব সত্যাগ্রহের পরিচয় পাই ১৯৩৫ সালে ইংরেজ রেফারির পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে গোষ্ঠ পালের নেতৃত্বে মোহনবাগান খেলায়াড়দের মাঠে শুয়ে পড়ে খেলা বয়কট করেন।[২২] এই অর্থে ফুটবল ছিল গান্ধীবাদী অহিংস জাতীয়তাবাদ প্রকাশের এক সার্থক ক্ষেত্র। (বাঙালির জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতাও ফুটবল সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অমৃত বাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, মানসী, নায়ক প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় ক্রিড়া জাতীয়তাবাদী মানসিকতার সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বিশ শতকের প্রথম তিন দশক জুড়ে। অমৃত বাজার পত্রিকার ক্রিড়া সাংবাদিক গজেন মল্লিকের নাম এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য।)

ফুটবলকে কেন্দ্র করে পুষ্ট ও আবর্তিত ক্রিড়াজাতীয়তাবাদের সামাজিক চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, এই বিশেষিত জাতীয়তাবাদের ধারা সম্পূর্ণ ঐক্যমূলক ছিল না; বিভিন্ন সামাজিক কারণে তার মধ্যে ক্রমিক বিভাজন বা খন্ডন সৃষ্টি হয়েছিল দেশীয় ফুটবল সংগঠন ও পরিচালন-ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে বিশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ফুটবল পৃষ্টপোষক 'ভদ্রলোক' - 'বাবু' সমাজের মধ্যে দলাদলির সূচনার এর প্রথম প্রকাশ ঘটে।

বাংলার ফুটবলীয় সমাজে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী বিভাজন-রেখা নিয়ে এসেছিল ময়দান সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ। কলকাতায় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে কেন্দ্র করে ক্রিড়াক্ষেত্রে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের সূচনা ১৮৮৭ সালে।[২৩] তবে মহামেডান যে প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রকাশ করেছিল, এ কথা অবশ্য বলা যায় না। ১৯১১

সালে মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়ের লগ্নে হিন্দু ভাইদের বিজয়োৎসবে মুসলিমরা ও যথেষ্ট উৎসাহিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েছিল।[২৪] কিন্তু ভারতীয় তথা বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধি এবং ১৯২০-এর দশকে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষাপটে খেলার মাঠেও তার প্রতিফলন পড়তে শুরু করেছিল। ১৯৩০-এর দশকে ইংরেজ দলগুলোকে পর্যুদস্ত করে পর পর পাঁচবার মহামেডানের লীগ বিজয় বাংলার ফুটবলে দেশীয় শক্তির চূড়ান্ত ও স্থায়ী উত্থান ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক, মহামেডানের এই জয়ে হিন্দু সমাজ ততোটা উল্লসিত হয় নি, বরং দু'একটা ক্ষেত্রে অন্য বাঙালি হিন্দু দলের বিরুদ্ধে মহামেডানের জয়কে আদৌ সুনজরে দেখা হত না।[২৫] বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি ও ফজলুল হকের শাসনকালে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে মহামেডানের ফুটবল সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।[২৬] এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন পরগণা, জেলা ও মফস্বলে মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠান যে এই ক্লাবকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেচ্ছ বেআইনি সরকারি সাহায্য দিয়েছিল, তার প্রমাণও পাওয়া যায় যখন দেখি, নাজিম উদ্দিন একক ক্ষমতাবলে প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে ময়দানে মহামেডানকে এককভাবে মাঠ ভোগ করার অধিকার এবং তার আর্থিক গ্যারান্টি প্রদান করেন।[২৭] হিন্দুরা যে এই ধরণের সরকারি একদর্শিতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল, বলাই বাহুল্য।

অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস[২৮] ১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে কেন্দ্র করে যে 'Self mobilization'-এর ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা কিন্তু শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে যে স্বদেশী শারীর সংস্কৃতি মূলতঃ আখড়া বা ব্যায়াম সমিতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, ১৯৩০-৪০ এর দশকে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে ঐ প্রয়াসেরই চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে এইসব সংগঠন ভিত্তিক হিন্দু 'Self mobilization' প্রক্রিয়ায় ফুটবলের মতো খেলাধুলোর ভূমিকাকে অস্বীকার করা অসঙ্গত হবে।[২৯] বিশেষতঃ দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ময়দানী হিংসার একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র এ সময়ে প্রকট হয়ে পড়ে।

ফুটবল কেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শেষ আঘাত হেনেছিল জনগোষ্ঠী ভিত্তিক খণ্ডিত চেতনার বিকাশ। ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগের পর থেকেই বাংলার সমাজ জীবনে পূর্ব বাংলার অধিবাসী বা তথাকথিত 'বাঙ্গাল'দের প্রতি যে তাচ্ছিল্য পূর্ণ এ দেশীয় মানসিকতা জন্ম নেয়, ১৯২০ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্ম লাভের পর তা সাংগঠনিক আধারে পুষ্ট হতে থাকে। ১৯৪০-এর দশকে, বিশেষতঃ ভারত বিভাজন তথা বাংলা বিভাগ-এর প্রেক্ষিতে ফুটবল মাঠে মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল খেলাকে কেন্দ্র করে 'ঘটি-বাঙ্গাল' সামাজিক দ্বন্দ্ব ছিল এক বিকৃত উপ প্রাদেশিকতার উগ্র প্রতিফলন।[৩০]

ময়দানে এর ফলে যথেচ্ছ হিংসাও ছড়ায়। ১৯৫৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় বিধান সভায় ইষ্টবেঙ্গলসহ কয়েকটা ক্লাবের প্রাদেশিক উষ্ণতা সম্পন্ন নামকরণ পরিহারের ইঙ্গিত মূলক অনুরোধ করেন।[৩১] ক্রিড়া জাতীয়তাবাদের এই ক্রম-বিভাজিত চরিত্রের পরিণামেই স্বাধীন ভারতে জাতীয় ফুটবল দলের জাতীয় চেতনাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে প্রাদেশিক ও ক্লাব ভিত্তিক আনুগত্য।

আধুনিক বিশ্বে রাজনীতি ও ক্রিড়াক্ষেত্রের মধ্যে কোন প্রাকারীকরণ করা হয় না, কারণ এরা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্বাস্থ্য সংস্কৃতি বা অবসর বিনোদনের চাইতে খেলাধূলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বর্তমানে অনেক বেশি। উপনিবেশিক বাংলাতে এ কথা প্রযুক্ত হতে পারে ফুটবলের ক্ষেত্রে। বিশ শতকের প্রথম ভাগে ঔপনিবেশিক ভারতে এমন বিশেষিত জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটেছিল, যার সাথে রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না।[৩২] ফুটবল ছিল এ ধরণেরই এক ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রতিভূ। ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিব আন্দোলনের পাশাপাশি ফুটবল ময়দানে ব্রিটিশ প্রদত্ত এক সাংস্কৃতিক উপকরণকে ভিত্তি করে ইংরেজকে পরাজিত করার মধ্যে দিয়ে যে জাতীয়তাবাধের উদ্বোধন ঘটত, তা ইংরেজ উপনিবেশিক শক্তির ও জাতির অপ্রতিরোধ্যতার মিথকে ভেঙ্গে দিয়ে সাধারণ বাঙালির আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল। এর ফলে দৈনন্দিন জীবন চর্চা ও বিনোদন সংস্কৃতির অঙ্গনকে ছাপিয়ে বাঙালি জীবনে ফুটবলের সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ফুটবলীয় সমাজের দর্পণে বাঙালি জীবনের মানসিক প্রতিছবির এক সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১) এই প্রবন্ধে 'জাতীয়বাদ' ধারণাটাকে মূলতঃ একটা 'সাংস্কৃতিক সত্তা' (Cultural Phenomenon) রূপে দেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য John Plamenatz, 'Two Types of Nationalism' in Eugene Kamenka, ed., Nationalism : The Nature and Evolution of an Idea (Edward Arnold 1976), পৃ. ২৩-৩৬। এছাড়াও পার্থ চ্যাটার্জীর 'The Nation and its Fragments' (Princeton : 1993) গ্রন্থে উপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদের দ্বিবিধ চরিত্র নিয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য; পৃ. ৩-১৩।

২) বাংলার ফুটবল চর্চার জাতীয়তাবাদী রূপ আলোচনা প্রসঙ্গে 'ক্রিড়া জাতীয়তাবাদের' (sporting nationalism) কথাটা প্রথম ব্যবহার করেন সৌমেন মিত্র তাঁর 'Babu at play : Sporting Nationalism in Bengal : A study on Football, 1880-1911' প্রবন্ধে (নিশীথ রায় ও রনজিত রায় সম্পাদিত Bengal : Yesterday and Today, Papyrus : ১৯৯১ এর অন্তর্গত)।

৩) ক্রিকেট নিয়ে গবেষক উৎসাহীদের মধ্যে অন্যতম হলেন এন. এম. রামাস্বামী, আশিস

নন্দী, রামচন্দ্র গুহ, এ. আপ্পাদুরাই, মিহির বোস, সন্দীপ বামজাই প্রমুখ।

৪) সৌমেন মিত্রের অপ্রকাশিত M. Phil dissertation 'Nationalism, communalism and sub-regionalism : A study of Football in Bengal, 1880-1950' (Centre for Historical studies. School of Social sciences. Jawaharlal Nehru University ১৯৮৮)।

৫) এ প্রসঙ্গে আনন্দ বাজার পত্রিকা ২.১.২০০১ এ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'বাংলাদেশ এ ক্রিকেট' শিরোণামে আমার লেখা পত্র দ্রষ্টব্য।

৬) সৌমেন মিত্র, পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ; শচীন সেন, খেলাধূলার বিচিত্র কাহিনী (গীতাঞ্জলি বুক সেন্টার ঃ ১৯৮৩); জয়ন্ত দত্ত, ভিক্টোরিয়াস মোহনবাগান, পৃঃ ১৮ (সাহিত্য প্রকাশ ১৩৮৬ সন)।

৭) বাংলাদেশে প্রথম ব্রিটিশ ফুটবল অনুষ্ঠান / খেলাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য দেখুন — আর বি, কলকাতার ফুটবল (ইষ্টলাইট বুক হাউস, ১৩৬২ সন), শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস (মন্ডল বুক হাউজ, ১৯৭৮); জয়ন্ত দত্ত, ঐ; শচীন সেন, ঐ; মতি নন্দী ' Football and Nationalism' in The Calcutta psyche,' গীতি সেন সম্পাদিত (The India International centre : ১৯৯০-৯১); মতি নন্দী, 'Calcutta soccer' in Calcutta : The Living city, Vol. II,' সুকান্ত চৌধুরী সম্পাদিত (Oxford University Press : ১৯৯০); রূপক সাহা, 'বাঙালীর ফুটবল,' দেশ পত্রিকা, ২৮.৮.১৯৯৩; Anthony De Mello. Portrait of Indian sport (R. R. Macmillan : ১৯৫৯)।

৮) বাঙালি তথা ভারতীয় ফুটবলের জন্ম ও প্রসারে নগেন্দ্র প্রসাদের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন — P. L. Dutt, Memoir of "Father of Indain Football" Nagendra Prosad Sarvadhikari (N. P. Sarvadhikari remorial committee : ১৯৪৪); শৌরিন্দ্র কুমার ঘোষ, ক্রিড়া সম্রাট নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী (নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী স্মারক কমিটি ঃ ১৩৭০ সন)।

৯) The Englishman ১২.৭.১৮৮৯।

১০) ঘটনাটা The Times - সহ লন্ডনের কয়েকটা সংবাদপত্রে সম্পাদকীয়তে উল্লেখিত হয়েছিল, The Indian Field, ৯.১০.১৮৯২।

১১) পরাধীন বাঙালির মানসিক টানা-পোড়েনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ক্রিড়ায় ব্রিটিশকে পরাজিত করার মানসিক ও সামাজিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, আশিস নন্দী, The Intimate Enemy : Loss and Recovery of self under colonialism (Oxford University press : ১৯৮৩), পৃ. ৮, ১১, ৫২, ৮০।

১২) সুমিত সরকার 'The city Imagined : Calcutta of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries' in Writing Social History, সুমিত সরকার লিখিত (Oxford University press : ১৯৯৭), পৃ. ১৮৪।

১৩) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলো হল ঃ পরেশ নন্দী, মোহনবাগান ১৯১১ (করুণা ঃ ১৩৮৩ সন); শিবরাম কুমার (সম্পা.) মোহনবাগান অমনিবাস (প্রভাবতী ঃ ১৩৯০ সন); শান্তিপ্রিয়

বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্লাবের নাম মোহনবাগান (নিউ বেঙ্গল প্রেস ঃ ১৯৭৯); জয়ন্ত দত্ত, ঐ; রূপক সাহা (সম্পা.) মোহনবাগান প্রথম একশো বছর, আনন্দ বাজার পত্রিকা, খেলা, ২৪ ও ২৮ নভেম্বর ১৯৯০, করুণা শংকর ভট্টাচার্য, বিদেশে মোহনবাগান (প্রবর্তক ঃ ১৯৬৪), অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ (কলকাতা ঃ ১৩৫৭ সন), পৃ. ৬৬-৭৫, ১২৬-২৭)।

১৪) Report on the Native Newspapers in Bengal, আগষ্ট, ১৯১১।

১৫) The Standard cycle company বিজয়ী মোহনবাগান দলের লক্ষাধিক ছবি বিতরণ করে। Messrs. Hald & Chatt এই উপলক্ষে দুমাসের জন্য তাদের বিক্রীত হারমোনিয়ামের ওপর ১০% ছাড় ঘোষণা করে। Messrs. S. Roy & Co. সস্তা দরে ফুটবল বিক্রয়ের মাধ্যমে যুবকদের মোহনবাগান দলে স্থান করে নেবার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। অন্যদিকে মঞ্চজগতে Great National Theatre তাদের সমকালীন প্রচলিত নাটক 'বাজীরাও'-এর প্রচারে মোহনবাগানের নাম ব্যবহার করেঃ "Mohan Bagan has won the shield! It is a victory for Baji Rao.", Mohan Bagan Club Records. সৌমেন মিত্র, ঐ. পৃ. ৫৭-৫৮ হতে গৃহীত।

১৬) Thomas Macanlay, critical and Historical essays. vol. III. (London ১৮৪৩), পৃ. ৩৪৫; M. Gilbert, Servant of India (London ১৯৬৬), পৃ. ৫৬। Macanlay-র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "The physical organization of the Bengali is feeble even to effiminacy. He lives in a constant vapour bath. His pursuits are sedentary, his limbs delicate, his movements languid. During many ages he has been trampled upon by men of bolder and more hardy breeds. Courage, independence, veracity, are qualities to which his constitution and his situation are ernally unfavourable."।

১৭) বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সমাজবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে লিখেছিলেন, — বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙালির বাহুবল,' বঙ্কিম রচনাবলী, ৩খন্ড (কলকাতা ঃ ১৯৫৩-৬৯), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২০৯-১৩; সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা (কলকাতা ঃ ১৯৫৭), পৃ. ১২৫-২৬; রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল (কলকাতা ঃ ১৮৭৪), পৃ. ৩৮-৫৩; শিবচন্দর বোস, The Hindoos as they are (কলকাতা ঃ ১৮৮১), অনুচ্ছেদ - ১৫; কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত (কলকাতা ঃ ১৯৩৭), পৃ. ৮)।

১৮) ঐ দশকের শেষ থেকে পরবর্তী দশক জুড়ে হিন্দু মেলার আধারে বাঙালি শারীর সংস্কৃতি চর্চা কি ভাবে এক পুনরুজ্জীবিত 'আখড়া' সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছিল, তার বিস্তৃত পর্যালোচনার জন্য দেখুন,— যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত (কলকাতা ঃ ১৯৪৫)।

১৯) নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী, 'ফুটবল', দেশ পত্রিকা, বর্ষ, সংখ্যা-৩৪, ২৯ আষাঢ়, ১৩৪১ সন/ ১৪.৭.১৯৩৪।

২০) দৈনন্দিন সমাজ জীবনে ইংরেজদের বৈষম্যমূলক আচরণ অত্যাচার এবং ভারতীয়দের ক্রমশঃ সশক্ত বা সবল প্রতিঘাতের সুন্দর বর্ণনা পাই সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মকথায়। সুভাষচন্দ্র বসু, An Indian Pilgrim; An Unfinished Autobiography and collected

Letters. 1897-1921 (London : ১৯৬৫), Netaji Researeh Bureau (ed.) পৃ. ২২-২৩, ৬৪-৬৬।

২১) The Stateman ২৫.৫.১৯৩০।

২২) The Stateman ১১.৫.১৯৩৫।

২৩) ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় মুসলিমদের ক্রিড়াসংস্থা জুবিলি ক্লাব, পরে ঐ নাম বদলে হয় ক্রিসেন্ট ক্লাব, আরও পরে হামিদিয়া ক্লাব। ১৮৯১ সালে শেষপর্যন্ত ঐ ক্লাব পরিণতি পায় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। Mohammadan Sporting Club Records হতে প্রাপ্ত।

২৪) মাসিক মোহম্মদি, মুসলমান পত্রিকা, আগষ্ট ১৯১১, Report on the Native Newspapers in Bengal, আগষ্ট ১৯১১।

২৫) 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহম্মদ নাসির উদ্দিনের মন্তব্য, লুৎফর রহমান রিটন, ফুটবল (ঢাকা ঃ ১৯৮৫) গ্রন্থে উল্লেখিত, পৃ. ২১।

২৬) এম. এ. এইচ ইস্পাহানি, Qaid-E-Azam Jinnah As I Knew Him. (করাচি ঃ ১৯৬৬), পৃ. ৪, ১২ দ্রষ্টব্য।

২৭) শীলা সেন, Muslim Politics in Bengal 1937-47 (নিউ দিল্লী ঃ ১৯৭৬), পৃ. ১১০-১৯১ হতে প্রাপ্ত।

২৮) সুরঞ্জন দাস, Communal Riots in Bengal, 1905-47 (নিউ দিল্লী ঃ ১৯৯১), পৃ. ১৭০।

২৯) জয়া চ্যাটার্জী, Bengal Divided. Hindu Communalism and Partition 1932-47, (কেম্বিজ ঃ ১৯৯৫) পৃ. ২২৩-২৪, জয়া চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন, এই সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যার অধিকাংশই হিন্দু মহাসভা নিয়ন্ত্রিত, ফুটবলকেও গুরুত্ব দিত; বেহালা যুব সম্প্রদায় যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ (পৃ. ২৩৬)।

৩০) ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসকাররা প্রায় সকলেই ক্লাবের জন্ম, প্রসার ও প্রভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে উপ-প্রাদেশিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্লাবের নাম ইষ্টবেঙ্গল (নিউ বেঙ্গল প্রেস ঃ ১৯৭৯); জয়ন্ত দত্ত, গ্লোরিয়াস ইষ্টবেঙ্গল (সাহিত্য প্রকাশ ১৩৮১ সন); পরেশ নন্দী, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ঃ ১৯২০-১৯৭০ (বিচিত্রা ঃ ১৩৮০ সন); পন্ডিত মশাই (রমেশচন্দ্র গোস্বামী), ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস (ক্যালকাটা পাবলিশার্স ঃ ১৯৬৩); রূপক সাহা, ইতিহাসে ইষ্টবেঙ্গল (দীপ ঃ ২০০০)।

৩১) অমৃত বাজার পত্রিকা, ১৭, ১৮, ২৪ জুলাই, ১৯৫৭।

৩২) J. H. Broomfield তাঁর 'The social and Institutional Bases of Politics in Bengal, 1906-1947' প্রবন্ধে (Rachel Van Baumer, ed. Aspects of Bengali History and Society, Hawaii : ১৯৭৬ গ্রন্থের অন্তর্গত) মন্তব্য করেছেন — "... in the early twentieth century there was much politics to which nationalism was irrelevant or only marginally important." (পৃ. ১৩৫), ফুটবল জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিতে মন্তব্যটার তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়।

সারাংশ

পুলিশ ও জনতা ঃ উপনিবেশিক বাংলা

রঞ্জন চক্রবর্তী

গবেষণাপত্রটির মূল প্রতিপাদ্য তিনটি ১) আধুনিক ভারতের পুলিশ ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক বাংলায়, ১৭৯৩ সালের ২২নং রেগুলেশন অনুযায়ী, ২) কর্ণওয়ালিসের পুলিশি সংস্কার পরবর্তী সময়ে নানা সংশোধন সত্ত্বেও প্রায় দুই শতাব্দীরও বেশি সময় যাবৎ আধুনিক যুগের পুলিশ ব্যবহার প্রধান কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে, এবং ৩) ঔপনিবেশিক পুলিশের দুর্নীতি, অপরাধ প্রবণতা, লুঠেরা মনোবৃত্তি এবং অন্ধকার জগতের সাথে নিবিড় সংযোগ ক্রমেই সাধারণ মানুষের থেকে পুলিশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পুলিশ ও জনতার এই বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়া উত্তর-ঔপনিবেশিকতার কাঠামোর মধ্যে স্বাধীন ভারতেও অব্যাহত থাকে। কাগজে কলমে পুলিশের আইন-রক্ষকের ভূমিকা পালন করার কথা কিন্তু বাস্তবে পুলিশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে পড়ে শাসক রাজনৈতিক দল অথবা স্বাধীন বণিক শ্রেণীর হাতের পুতুল। স্বাধীনতা উত্তর কালের পুলিশ-জনতা সম্পর্কের উৎস সন্ধানে তাই ঔপনিবেশিক পুলিশের চরিত্র ও কাঠামো পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই পুনর্মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত করে যে ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে পুলিশ এখনও সর্বাধিক ঔপনিবেশিক।

শ্রী অরবিন্দ ও পল্লী সংগঠন

রাজলক্ষ্মী কর

শ্রী অরবিন্দের পল্লী সংগঠন ও তার উন্নয়নের চিন্তাভাবনা রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রসূত। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে সবার উপরে স্থান পেয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ। এর জন্য প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজন ছিল স্বশাসন ও স্বনির্ভরতা লাভ। এই স্বনির্ভরতার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি। তিনি চেয়েছিলেন একদিকে হবে বিদেশী শাসনের অবসান ও সেই সঙ্গে স্বাধীন স্বয়ংভর রাষ্ট্র গঠন। বিকল্প সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য গ্রামীণ বিকাশ ছিল প্রস্তুতি পর্ব। গ্রাম সমাজের সংগঠনের মধ্যে স্বরাজের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্য নিহিত ছিল।

প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের মূলে ছিল স্ব-নির্ভর ও স্বশাসিত গ্রাম। শ্রী অরবিন্দ পল্লী সমাজের মধ্যে জাতীয় জীবনের মূল ধারাটিকে লক্ষ্য করেছিলেন।

স্ব-নির্ভরতা অর্জন ছিল স্বাধীনতার প্রথম সোপান ।এই স্ব-নির্ভরতা প্রশিক্ষণ তিনি সবচেয়ে নিচু স্তরে গ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে জাতীয় স্তরে নিয়ে যাবার কথা বলেছেন। জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য গ্রাম সমাজের সুস্থ বিকাশ প্রয়োজন, তাই স্বরাজের শুরু তিনি গ্রাম থেকে করতে চেয়েছেন।

শ্রী অরবিন্দ চেয়েছিলেন স্ব-শাসন ও স্ব-নির্ভরতার মধ্য দিয়ে স্বরাজ আসবে ও দীর্ঘদিনের পরনির্ভরতার অভ্যাস ও নিষ্ক্রিয়তা জাতীয় জীবন থেকে দূর হবে, অধীনতার বদলে স্ব-নির্ভরতার জন্ম হবে। প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা বাণিজ্য শিল্প, বিচার ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসেবা প্রতিটির দ্বায়িত্ব ভারতবাসী নিজ হাতে তুলে নেবে। এই কাজের শুরু হবে গ্রামস্তর থেকে। গ্রাম সমিতির ভূমিকা এখানে হবে অপরিহার্য। গ্রাম সমিতি শুধু কার্যনির্বাহক সমিতি হিসাবে নয়, বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে স্ব-নির্ভর গ্রামীণ সমাজের বিকাশ ঘটাবে। গ্রাম সমিতির প্রধান কাজ হবে গ্রামস্তরে স্বরাজের আদর্শকে বাস্তবায়িত করা। তবেই জাতীয় স্তরে তাকে বাস্তবায়িত করা যাবে।

বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসাহিত্য 'বলাকা'

অসিত দত্ত

কথামুখ ঃ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন ও বিচিত্র সমাজজীবনের ছবি দেখি, মানব সম্পর্কের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি, জীবনবোধেরও। সমাজ সম্পর্কের মূল্যবোধের বিচিত্র গামিতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আমাদের আকৃষ্ট করে। সমাজ সম্পর্কের পরিবর্তনে, জীবনের সঙ্গে অন্বিত মূল্যবোধ, সাহিত্য চিন্তা, দর্শন, ব্যক্তিপরিচয়, সামাজিক বোধ পরিবর্তিত হয়। তা কখনই যান্ত্রিকী পদ্ধতি অবলম্বন করে না। এ বস্তুবাদের ভাবনা নিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যকে পর্যবেক্ষণ করব, সমীক্ষা করব।

'বলাকা' কাব্য ও দ্বন্দ্বময় সামাজিক অবস্থান ঃ

'বলাকা' কাব্যের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায় যে জীবনবোধ ও ভাবনার কথা আছে, তা কখনই একটি সহজ সরল বিরোধহীন সামাজিক অবস্থানের ছবি নয়। একটি 'ভিন্নমুখী' দ্বন্দ্বমুখর সত্তার আবির্ভাবের এবং তদ্জনিত জীবনভাবনার পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

"এবার যে ঐ 'এল' সর্ব্বনেশে গো

বেদনায় যে বান ডেকেছে"

রোদনে যায় ভেসে গো।

ভারতবর্ষের সনাতন সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন আর্থসামাজিক কাঠামোর পত্তন ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রবর্তিত পুঁজি বিকাশের হাত ধরে। বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামন্ত সম্পর্ককে ভেঙে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ এ কাঠামো প্রবর্তনের ফসল। রবীন্দ্রনাথ এ নতুন বোধ, জাগরণকে বরণ করতে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন। সমাজ বিকাশের ধারায় অনিবার্য পরিবর্তনকে মানতে হবে। এ সত্য এবং ইতিহাসকে গ্রহণ করতে হবে। এ বোধই হল নতুনকে আবাহন জানানোর সঙ্গে একাত্ম।

"চাহিস নে আর আগুপিছু

রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছু।"

নতুন সরল জীবনের পথে আসে না। যা কিছু পুরাতন বৃদ্ধ, অক্ষম, জীবনবিমুখ তাকে ভেঙে নতুনের আবির্ভাব ঘটে।

"কিসের তরে চিত্তবিকল

ভাঙুক না তোর ঘরের শিকল

বাহির পানে চেয়ো না, সকল

দুঃখ সুখের শেষে গো।

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো।"

পুঁজি বিকাশের সার্বিক রূপ ভারতের মাটিতে দেখা না গেলেও বুর্জোয়া বোধ, দর্শন, গণতান্ত্রিক চেতনা সর্বোপরি বুর্জোয়া ঔদার্য্যের উন্মেস ঘটেছে। এ নিরেখেই রবীন্দ্র কাব্যকে যেমন বিচার করতে হবে, 'বলাকা' কাব্যকেও এর বাইরে রাখা যায় না। কারণ ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রকাশ এটাই।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কেরানিবাবুদের বিক্ষোভ

অনুরাধা কয়াল

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালি কেরানি সম্প্রদায় কমবেশি, একটি দৃঢ় সামাজিক ভিত্তিতে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। কেরানি বাবুকুলের সামাজিক শ্রেণীর অবস্থান বেশ একটা মর্যাদা পূর্ণ জায়গায় এসে পৌঁছতে পেরেছিল। বাণিজ্যিক সংস্থা বা কারখানায় কেরানির চাকরি অথবা সরকারি বা পৌর সংস্থায় অফিসের কথা তো বলাই বাহুল্য এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চলে স্কুল মাস্টারের চাকরিও মধ্যবিত্ত বাঙালি যুব সম্প্রদায়ের কাছে বেশ লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের বেতন ছিল স্বল্প এবং অনিয়মিত, এবং চাকরির নিরাপত্তাও ছিল না সর্বোপরি উদ্ধর্তন ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের উদ্ধত ব্যবহার তাঁদের সহ্য করে যেতে হত। কেরানিবাবুদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। সর্বাপেক্ষা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কেরানিবাবুদের এই আন্দোলনের (বিদ্রোহ) বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মুদ্রণ কর্মী, রেলকর্মী এবং চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে।

আমার বর্তমান আলোচনা পত্রে কেরানি সম্প্রদায়ের বিষয়ে আলোকপাত করার ক্ষেত্রে, আমি দৃষ্টি নিবন্ধ করব শুধুমাত্র মুদ্রণ ও রেলকর্মীদের ওপরে, চটকল শ্রমিকেরা আমার আলোচনা পরিসরের বাইরে থাকবে।

আপেক্ষিকভাবে কম সংখ্যায়, কলকাতার মুদ্রণ-কর্মীরা তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে এক অভিনব পদ মর্যাদায় আসীন হতে পেরেছিলেন, এবং বাংলাদেশে প্রথম প্রকৃত শ্রমিক সংঘ স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁরাই অর্জন করেছিলেন। তাদের পেশা দাবি করেছিল ন্যূনতম সাক্ষরতার নিশ্চয়তা, যখন সংবাদপত্র অধিকৃত মুদ্রণ সংস্থার কেরানিবাবুরা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ ও নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন।

কলকাতার দুটো বড়ো সরকারি মুদ্রণ সংস্থায় কেরানি বাবুদের মধ্যে রুক্ষ সহানুভূতিশূন্য কাজের পরিবেশ এবং শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমে উঠেছিল। ১৯০৫ এ যথাক্রমে ১৪৫০ এবং ৬৩৭ জন কর্মী সম্বলিত গভঃ অফ ইণ্ডিয়া প্রেস এবং বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসের কেরানিবাবুরা আলাদা আলাদা উপলক্ষে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। ১৯০৫র সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরের মাঝামাঝি গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া প্রেস এবং বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসে বড় ধরণের বিবাদ-বিতর্ক শুরু হয়েছিল কতকগুলি

অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যেমন স্বল্প অপর্যাপ্ত বেতন, জরিমানা, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, তত্ত্বাবিধায়কদের কৌশল বর্জিত ব্যবহার ইত্যাদি।[২]

১৯০৫ Feb Govt. Of India প্রেসের কেরানিবাবুদের দ্বারা পাঠানো আবেদন পত্রটি কর্তৃপক্ষের দ্বারা অগ্রাহ্য হয়েছিল।[৩] নতুন বেতন কাঠামোয় পূজা-অগ্রিমকে কমিয়ে দেওয়ার তাৎক্ষণিক ফল হিসাবে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল।[৪] এ.সি. ব্যানার্জী এ.কে ঘোষ এবং বি.এম চ্যাটার্জী এই ব্যারিস্টার ত্রয়ী, ১৯০৫ এর ২৩শে সেপ্টেম্বর ময়দানে কর্মী মিটিং এ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেই মিটিংয়ে একটি বারোজনের কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল। ব্যানার্জী সাথে আলাপ আলোচনার জন্য। ব্যানার্জী তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পুনরায় আবেদনপত্র পাঠানোর উপদেশ দিয়েছিলেন। একই সাথে আগামী কার্যক্রমের জন্য একটি প্রতিরক্ষা তহবিল গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে কর্মীরা ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মঘট শুরু করেছিলেন এবং বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসের সহযোগীদের সাথে মিলিত হয়ে তত্ত্বাবিধায়কদের উদ্ধত ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল।[৫] বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের একটি ক্রুদ্ধ বার্তায় প্রস্তাবিত হয়েছিল যে কলকাতার মুদ্রণ-কর্মগুলিকে এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, লাহোর, বোম্বে এবং সিমলার সরকারের প্রেসগুলিতে বিতরণ করা হবে এবং এর ফলস্বরূপ ক্যালকাটা গেজেটের প্রকাশনা ৪৮ ঘন্টা বিলম্বিত হয়েছিল।[৬] অমৃত বাজার পত্রিকার ২৭শে সেপ্টেম্বর কেরানিদের জন্য একটি প্রতিরক্ষা সমাজ গঠনের প্রস্তাব করেছিল। প্রথম ধর্মঘটটি স্বল্পমেয়াদী প্রমাণিত হয়েছিল। সংগ্রামের দ্বিতীয় এবং অনেক বেশি জোরালো আবর্তটির সূচনা হয়েছিল অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে। Govt. of India Press এর সাতজন নেতার আকস্মিক বরখাস্তকরণের মধ্যে দিয়ে।[৭] ইতিমধ্যে ২১শে অক্টোবর College Square এর মিটিং এ অপূর্ব কুমার ঘোষ এর পরামর্শের ভিত্তিতে একটি প্রিন্টার (Printer) এবং কম্পোজিটার লীগ গঠিত হয়েছিল। ধর্মঘট চলাকালীন কলকাতার পথ ধরে প্রেস কর্মীদের মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন A C.Banerjee[৮]। সান্ধ্য পত্রিকা দরিদ্র Compositor এবং ট্রাম কনডাকটরদের একত্রে সংগ্রামে সামিল করানোর জন্য অভিনব ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছিল। এমনকি ছাপাখানার কম্পোজিটার তাঁদের স্ত্রী-পুত্রদের দুর্দশার মীমাংসা করতে ধর্মঘট শুরু করে দিয়েছিল।[৯] সুতরাং প্রত্যেকটি স্তরে মুদ্রণ বিভাগের কেরানিরা European কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল।

ফলস্বরূপ কর্তৃপক্ষকেও নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের প্রধান জে. পি. হেভেট সিমলা থেকে এসেছিলেন Govt. of India Press-র কর্মীদের অসন্তোষের তদন্ত করতে।[১০] তিনি কর্মীদের ছয়জন প্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং কিছু সুবিধা মঞ্জুর করেন, যেমন, রবিবার কাজের বদলে ছুটি, যার দরুণ শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের ইতি ঘটেছিল।[১১] লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্রেজার বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট

প্রেসের বিবাদ বিতর্কে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং তদন্তের আশ্বাস দিয়ে কর্মীদের পুনরায় কাজেও যোগ দিতে রাজি করেছিলেন।[১২]

১৯০৬'র ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি বিশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখিত রয়েছে যে কলকাতার প্রিন্টার প্রেসগুলিতে ধর্মঘট মহামারীর মত ঢুকে পড়েছিল। যদিও অল্পকিছুদিনের জন্য এর প্রভাব পড়েছিল ছয়টি বেসরকারি প্রেস এবং Bengal Secretariat প্রেসের উপর।[১৩] মুদ্রণ-সম্রাট এ.কে ঘোষের হস্তক্ষেপের ফলে এরা আলাদা আলাদা ঘটনায় তারা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। আরো অধিক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় সংবাদপত্রের ফাইল থেকে জুনে Printers Union এর পাঁচটি মিটিং এর বাংলা প্রতিবেদন সমেত।[১৪] থেকার Spink প্রেসে Union টির বারোদিনের ধর্মঘটটি সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল। বিজয় এসেছিল একজন অপ্রিয় অফিসারের বিতাড়ন উপলক্ষে উপস্থিতি ও দুটির আইনে বদল এবং ধর্মঘটের দিনগুলিতে পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির দাবি আদায় করে। ১২ই জুন ১৯০৬ বিজয়-বার্তা সম্বর্ধিত হয়েছিল। Cornwallis এবং College st মুদ্রকদের মিছিলে।[১৫] ১৬ জুনে আয়োজিত বিজয় সম্বর্ধনাটিতে যোগদানের মধ্যে ছিলেন মুসলিম, হিন্দু, Europian এবং Madrasi বৃন্দ।[১৬] ২৩শে Juneএব পরবর্তী Union Meeting এ. কে. ঘোষের এর বিবৃতি অনুযায়ী কলকাতার প্রায় সমস্ত বড় প্রেসগুলি সমবেত হয়েছিল। এই Meeting একটি সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।[১৭] এই সময় Union এবং জাতীয়বাদী আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখিত আছে। শিবাজী উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় উপস্থিত মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ তিলক এবং Union head quarter-এ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল ১৯০৬ সালে। ১৯০৭ এর একটি পুলিশ প্রতিবেদনে Printers Union এর দুটি Meeting এর কথা উল্লিখিত রয়েছে।[১৮] ১৯০৭ Oct. Printer's Union পুনরায় অর্থ সংগ্রহ শুরু করেছিল যুগান্তর পত্রিকার কারারুদ্ধ মুদ্রক বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের পরিবারকে সাহায্য কবার উদ্দেশ্য।[১৯]

কিন্তু উল্লেখ্য যে ক্রমশ ভীত হয়ে নিজের ভেতরেই গুটিয়ে ফেলেছিল সন্ধ্যা পত্রিকা। তার ২৫শে জানুয়ারি ১৯০৮ প্রতিবেদনে রহস্যপূর্ণভাবে Union এর অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিল।[২০] তথাপি সকলের কাছে স্বদেশী Trade Union এর এই স্মৃতি কখনই মলিন হবে না। ১৯৩৬ একটি নির্বাচনী আবেদনে প্রখ্যাত স্বদেশী নেতা মৃণালকান্তি বসু Printers Union এর পুনরুজ্জীবনের কাজে ১৯১৯ এ Chittarajan Das-র সাথে তার যুগ্ম প্রয়াসের কথা স্মরণ করেছেন। ১৯০৫ সনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগঠনের উৎস সন্ধানের ক্ষেত্রে তাঁর ইতিহাস চেতনার এটি একটি অনন্য নজির।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারতীয় রেলের প্রায় ৪৫,০০০ কেরানি বাবু European কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল।[২১] বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ধর্মঘটগুলির মধ্যে উচ্চপদস্থ কেরানিবাবুদের দুটি মঞ্জুর এবং ভাতা সংক্রান্ত কিছু সুবিধা পাবার দাবিকে নিয়ে কেন্দ্র করে ১৯০৬র ২৫ থেকে ২৭ জুন সাহেবগঞ্জ লুপলাইন এবং আসানসোল বিভাগের কেরানিদের ধর্মঘটগুলিতে এই ক্ষেত্রে আলোকপাত করা যেতে পারে।[২২] কিন্তু সত্যিকারের গুরুতর বিকাশটি ঘটেছিল হাওড়া ব্যাণ্ডেল বিভাগে ২৩শে জুলাইর ১৯০৬ ধর্মঘটের ক্ষেত্রে যেটি শুরু হয়েছিল ১৭ জন সদস্য বিশিষ্ট কর্মী-প্রতিনিধিদের সাথে সংগঠিত আলোচনাটি ভেস্তে যাওয়ার পর। এর অন্যতম হেতু ছিল কোন্নগরের প্রতিনিধি স্টেশন মাস্টার সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর মিটিং এ জাতিগত বৈষম্যের প্রসঙ্গটি তোলার স্পর্ধা দেখিয়েছিল এবং সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়া, হাওড়া ব্যান্ডেল বিভাগের বাঙালি Station Master এবং কেরানিদের মধ্যে কার্যত ধর্মঘটের ইতি ঘটেছিল এবং ক্রমে ধর্মঘটগুলি মেন লাইনে বিস্তারিত হয়। কর্তৃপক্ষও অনড় হয়েছিল এবং ১৯০৬র ১০ই আগস্ট থেকে শতাধিক কর্মীকে বরখাস্ত করা শুরু করেছিল।[২৩] ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী উকিল এবং সাংবাদিকরা ধর্মঘটীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন এবং ২৪শে জুন ১৯০৬ সন্ধা পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে "ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ধর্মঘটীদের কলকাতায় এসে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।[২৪] সন্ধ্যা পত্রিকার অফিসটি মিটিং এর মহাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং ২৭ জুলাই এই অফিস এর মিটিং এ Railway Union এর সূত্রপাত ঘটেছিল। এখানে Apurba Kr. Ghosh কে মাল্যদান করেছিলেন নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে দু'দিন পর Pantir Math খোলা আকাশের নীচে একটি Meeting বসেছিলেন, যেখানে Chittarajan Das-র সভাপতিত্বে একটি Resolution সমর্থন জানানো হয়েছিল Pal, লিয়াকত হুসেন এবং জে. এন রায়ের উপস্থাপিত ধর্মঘট প্রস্তাবকে।

কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত হওয়া ধর্মঘটীদের পুনর্বহাল না করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকার ফলে এবং সরকার মধ্যস্থতা করতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী অংশ গ্রহণের ফলে এই ধর্মঘটকারীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।[২৬] প্রতিবেদন জানাচ্ছে যে ধর্মঘটীদের অতিরিক্ত দাবিগুলি মঞ্জুরের জন্য কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টির সবরকম প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর কলকাতায় বিক্ষোভকারীরা, আগষ্ট মাস থেকে তাদের দুরভিসন্ধির কার্যক্ষেত্র স্থানান্তরিত করেছিলেন আসানসোল, রাণীগঞ্জ, জামালপুর এবং সাহেবগঞ্জের রেলওয়ে Union কেন্দ্রগুলির এর লক্ষ্য ছিল যাতে সেখানকার রেলওয়ে কর্মীরা Railway Union এর যোগদান করতে পারে এবং ধর্মঘটে যোগ দিতে ইচ্ছুক Rail

কর্মীদের সমর্থন করা হয়।

সপ্তাহ ধরে মিটিং বসতে থাকে এবং বিস্ফোরক ভাষায় কর্মীদের প্ররোচিত করা হয়। এই Meeting গুলিতে স্বদেশীয়ানার দোহাই দিয়ে বিদেশী পণ্য বর্জনের ব্যাপারে জনগণকে ক্ষ্যাপানোর সুযোগকেও হাতছাড়া করা হয়নি।

Railwayর কেরানিবাবুদের Union ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল এর একটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল আসানসোল (১৯০৬)/Liakat Hussainএর সাথে একটি মিটিং এ রাখতে গিয়ে এ.কে ঘোষ সরকারের কপট নীতির নিন্দা করেছিলেন কেননা Comp বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বলেও সরকার সশস্ত্র Police পাঠিয়ে Compকে সাহায্য করেছিল। ২৭শে আগস্ট ১৯০৬ এর জন্য European Overseersটি রেলওয়ে কর্মীদের মিটিং এ যোগদানকে প্রতিহত করার চেষ্টা করার ফলে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। এর পরের দিন কেরানি এবং বড়বাবুরা কাজ করতে অস্বীকার করেছিলেন। অবশেষে ৬ই সেপ্টেম্বর নিঃশর্তভাবে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছিল। ৫ই সেপ্টেম্বর Asansol অঞ্চলে একটি ধর্মঘট শুরু হয়েছিল সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী Asansol Railway Traffic বিভাগের সমস্ত কেরানিরা বাস্তবিকভাবেই এতে যোগ দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তারকনাথ পালিত, উপেন্দ্রনাথ বসু এবং কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতো নেতৃবৃন্দ Indian Association হলে একটি Meeting ডেকেছিলেন। তারাও চেয়েছিলেন ধর্মঘট বজায় থাকুক যাতে ধর্মঘটীদের বিক্ষোভ দূর করতে সরকার হস্তক্ষেপ করতে হয়। Howrah Asansol section-এর ১০০ জন কর্মচারী কেরানিবাবু তাদের চাকরি হারিয়েছিলেন এবং জামালপুরে অবদমন মূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এখানে কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশুতি ভঙ্গ করেছিলেন। কিছু বরখাস্ত হওয়া কেরানি স্বদেশী সেবক "Anti Circular Society" নামক সংগঠনটির পাশের বাড়িতে একটি স্বদেশী পণ্য বিক্রয় কার্যালয় খুলেছিলেন।

আন্দোলনকারীদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘটগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল এবং পুনর্প্রয়াস গ্রহণের প্রাণশক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল। একটি পুলিশ প্রতিবেদনে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছিল যে কিছু ই.আই.আর ধর্মঘটী নেতা নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্যকে চাঁদার অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য অভিযুক্ত বারোজনের মধ্যে রাণীগঞ্জে একজন বরখাস্ত হওয়া কর্মচারী তিক্তভাবে অভিযোগ করেছিলো যে ধর্মঘটের জন্য প্ররোচিত করার সময় নেতারা সবরকম সাহায্য করবে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তা নিস্ফল প্রতিপন্ন হয়। এমনকি নেতাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও তাদের সাক্ষাৎ মেলেনি।

১৯০৭ নভেম্বরেই আই.আর. আবার শিরোণামে উঠে আসে। ১৮ই নভেম্বর Asansol এ ধর্মঘট শুরু হয় এবং হাওড়া Delhi line এ ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় কর্মচারীরা সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছিল। ৩০শে নভেম্বর ধর্মঘটের অবসান ঘটে গিয়েছিল। ২৪-২৫শে নভেম্বর Kharagpurএর Beng-Nagpur রেল প্রহরীদের মধ্যেও একটা ছোট ধর্মঘট হয়েছিল।[২৭]

কেরানি বাবুদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘটগুলির প্রতি জাতীয়তাবাদী সংবাপত্রগুলির মনোভাব অনিবার্যভাবেই কিছুটা দ্বিধাপূর্ণ ছিল। Amrita Bazar পত্রিকা।[২৮] ভারতীয় যাত্রীদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে উদ্যোগ প্রকাশ করেছিল এবং ধর্মঘটের সমালোচনা করেছিল। বন্দেমাতরম পত্রিকা স্থিতিশীল তহবিল সহ একটি শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করেছিল[২৯] এবং ই.আই.আর এর ধর্মঘটে বিপ্লবাত্বক কিছু নিদর্শন খুঁজে পেয়েছিল। সমস্তিপুরের রেল কার্যালয়ের কেরানিবাবুদের এবং Chakradharpur রের বেঙ্গল নাগপুরের রেলের দ্বারা সংক্ষিপ্ত ধর্মঘটগুলির এবং East Bengal State Railwayর কেরানিবাবুদের কর্তৃক সংগঠিত বড় ধর্মঘটগুলির সাক্ষী ছিল ১৯০৭-৮ এর শীতকালটি প্রায় ১৯০৮ ফেব্রু মধ্য লগ্ন-অবধি ধর্মঘট চলার পর অবশেষে তা ভেঙ্গে যায়। এই সময় জাতীয়তাবাদী সমর্থন সম্ভবত সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলির ভিতরে। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক অসন্তোষ তখন ভিন্ন ভিন্ন খাতে বইছিল।

সবকিছু সত্ত্বেও মুদ্রণকর্মী এবং Railway কেরানিদের সামাজিক শ্রেণী অবস্থান ছিল ভদ্রলোক সমাজের প্রান্তে, জুটমিলের Proletariat রা বাস করতেন তাদের থেকে এক ভিন্নতর জগতে অনিবার্যভাবেই এই ভিন্নতর সামাজিক শ্রেণীর প্রতি জাতীয়তাবাদী আগ্রহ ছিল অনেক বেশি সীমাবদ্ধ।[৩১]

১৯০৮র মধ্যলগ্ন থেকে কেরানিবাবুদের সমস্যার বিষয়ে জাতীয়তাবাদী আগ্রহের আকস্মিক ও তীব্র অবনমন ঘটতে থাকে। কেরানিবাবুদের সংবাদের ফাইলগুলি ১৯০৮-১৯২১ পর্যন্ত সময়কালে কার্যত ফাঁকা পড়েছিল।

সংখ্যায় কমলেও, স্বতস্ফূর্ত ধর্মগুলি তখনও ঘটে চলেছিল। কিন্তু বাংলার জাতীয়তাবাদীরা সে বিষয়ে তাদের উৎসাহ হারিয়েছিলেন, হয়ত তারা পুরোনো ধাঁচের আবেদন নিবেদন ব্যবস্থার নিরাপদ স্থানে ফিরে গিয়েছিলেন। যখন যুদ্ধ অব্যবহিত পরেই নতুন প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ কেরানি বাবুদের শ্রমিক আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত উঠে এসেছিলেন, এবং তখন স্বদেশী প্রাক-ইতিহাস পর্বটিকে কদাচিৎ স্মরণ বা সন্ধান করা হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। আর. সি. মজুমদার, *হিস্ট্রি অফ দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া খণ্ড-২ (১৯৬২)* সুমিত সরকার প্রণীত *দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল* ১৯০৩-০৮ গ্রন্থে উদ্ধৃত। (পিপলস পাবলিশিং হাউস ১৯৭৩) পৃ. ১৮২, সরকারই প্রথম ঐতিহাসিক যিনি স্বদেশী আন্দোলনে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের ভূমিকাকে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন।

২। আই.এম.রিণসার এবং এন.এন. গোল্ডবার্গ (সম্পাঃ), *তিলক অ্যাণ্ড দ্য স্ট্রাগল ফর ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম* (নিউ দিল্লী ১৯৬৬) ঐ

৩। এইগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ —

ক) হেমেন্দ্র ঘোষ, *কংগ্রেস* (১৯২০) — প্রেমতোষ বসুর নেতৃত্বাধীন ১৯০৬ এর রেলওয়ে ধর্মঘটটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

খ) যাদুগোপাল মুখার্জী, *বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি* (১৯৫৬) ১৯০৫-০৬-র মধ্যে সংঘটিত গাড়োয়ান, বার্ণ কোম্পানির কেরানি, ট্রাম কনডাক্টর, মুদ্রণ ও রেল কর্মীদের ধর্মঘটগুলির উল্লেখ রয়েছে এবং প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী ও অপূর্ব কুমার ঘোষ কর্তৃক প্রচারিত সুদৃঢ় সমাজতান্ত্রিক মতার্দশের উল্লেখ করা হয়েছে। গ) ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম* (১৯৪৯), স্বল্প পরিচিত অপূর্ব কুমার ঘোষ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রয়েছে। এবং ঘ) কৃষ্ণ কুমার মিত্র, *আত্মচরিত* (১৯৩৭) ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫-এ অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী কর্তৃক আয়োজিত গাড়োয়ানদের হরতালটির বিবরণ রয়েছে। ঐ. পৃ. ১৮৩।

৪। ঐ. অধ্যায়-৫, বিভাগ-৩।

৫। বিজয়া-সম্মিলন-বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১২ (১৯০৫) পি.আর ৪; ঐ পৃ. ১৮৯।

৬। *সঞ্জীবনী*, ২৮শে ভাদ্র ১৩১২ (৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) সঠিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, ঐ. পৃ. ২০০।

৭। *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ সি এফ হাওড়ার মাসিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। হাওড়া মাহুলি আলোচনা, আশ্বিন ১৩১২। কিন্তু এখানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাবুদের প্রতি দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা দুর্ব্যবহারের প্রেক্ষাপট রয়েছে। এক্ষেত্রে জনৈক কেরানি উল্লেখ করেছেন একটি পত্রে, যেটি প্রকাশিত হয়েছে ১০ই সেপ্টেম্বরে ১৯০৫র বেঙ্গলী পত্রিকায়। ঐ.।

৮। *বেঙ্গলী*, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯০৫ ঐ.

৯। জ্ঞানচন্দ্র ব্যানার্জীর অপ্রকাশিত ডায়েরি, লেখা হয়েছে ৪ঠা অক্টোবর, ১৯০৫ ঐ.

১০। *বেঙ্গলী*, ১৯শে অক্টোবর, ১৯০৫ ঐ. পৃঃ-২০৪

১১। *বেঙ্গলী*, ১৯শে অক্টোবর, ১৯০৫ ঐ. পৃঃ-২০৪

১২। *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৭ ঐ

১৩। ২৬টি বেসরকারি মুদ্রণসংস্থার ৯টিতে কর্মরত ৫০ জনেরও বেশি কলকাতাতে সংবাদ পত্রগুলি অংশভুক্ত ছিলেন। স্টেটমেন্ট অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লেবার (১৯০১-০৫) গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল জেনারেল মিসেলনিয়াস প্রোগেস বি, সেপ্টেম্বর, ১৯০৭, ঐ. পৃ. ২০৬।

১৪। প্রাগুক্ত. ঐ.

১৫। বঙ্গ সরকারের প্রথম পাক্ষিক প্রতিবেদন, বঙ্গবিভাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং স্বদেশী সংগ্রামের প্রগতির বিষয়ে, এফ এ আর নং. ১, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬, প্যারা ১০ হোম পাবলিক প্রোগাম.বি.অক্টোবর ১৯০৬, পৃ. ১৩ ঐ. পৃ. ২০৭।

১৬। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল আণ্ডার অ্যাড্রু ফ্রেজার, ১৯০৩-১৯০৮ বিভাগ শিরোণাম "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আনরেস্ট" ঐ. পৃ. ২০৯।

১৭। *বেঙ্গলী*, ১৬ই নভেম্বর ১৯০৫, ঐ. পৃ. ২১১।

১৮। *ডেইলি হিতবাদী*, ২৩-২৪শে মার্চ ১৯০৬ আর এন পি (বি) সপ্তাহান্তের জন্য ৩১শে মার্চ (১৯০৬). ঐ.।

১৯। *বেঙ্গলী*, ১৩ই জুন, ২৪শে জুন ১৯০৬ ১২ শিবনারায়ণ দাস লেনের ইউনিয়ন মিটিং, ১২ এবং ২৩শে জুন, ঐ. পৃ. ২১২।

২০। *সন্ধ্যা*, ২৫শে জানুয়ারি, ১৯০৮ (আর এন পি (বি) সপ্তাহান্তের জন্য ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) ঐ. পৃ. ২১৪।

২১। ১৯০৫ এ রেলকর্মীরা ৩৭২, ৯৫১ সংখ্যক লাইনগুলি খোলেন। তাছাড়া, রেলপথগুলির সাথে সংযুক্ত কারখানাগুলিতে ৭৯, ০৮২ জন কর্মনিযুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে এইরকম তিনটে কারখানায় — লিলুয়ায়, খড়গপুরে এবং জামালপুরে (বর্তমান বিহার) যথাক্রমে প্রায় ৫,০০০, ৩,৬০০ এবং ৮,২০০ লোক কর্মরত ছিলো।

স্টেটমেন্ট অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লেবার ফর ১৯০১-০৫ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল জেনারেল মিসেলেনিয়াস প্রোগেস বি, সেপ্টেম্বর ১৯০৭, ৬৮-৬৯ ঐ. পৃ. ২১৫।

২২। *বেঙ্গলী*, ২৮ এবং ৩০শে জুন, এবং ৬ই জুলাই ১৯০৬ ঐ. পৃ. ২১৬।

২৩। প্যারাস ২ অ্যাণ্ড ৬ অফ নং ২১২২ পি. ডি অফ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৬ ফ্রম গভর্নমেন্ট অভ ইণ্ডিয়া (হোম)। হোম পাবলিক প্রোগেস এ, এপ্রিল ১৯০৭ এন ১-৫, ঐ. ২২১।

২৪। প্যারা ৭ অভ এফ এ আর ২, ৮ অক্টোবর ১৯০৬ (বাংলা থেকে পাক্ষিক প্রতিবেদন) হোম পাবলিক প্রোগেস এ, ডিসেম্বর ১৯০৬, এন ১৪৪. ঐ. পৃ. ২২৪।

২৫। প্যারা ৪ — বঙ্গভঙ্গরদ এবং বাংলায় স্বদেশী সংগ্রাম এর ওপর প্রতিবেদন, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬, হোম পাবলিক প্রোগ্রেস. বি. অক্টোবর ১৯০৬, এন-৯৩, ঐ.।

২৬। 'ট্রাফিক অন দ্য কর্ড অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনস স্টিল কমপ্লিটলি ইনটারাপটেড"— রানস পার্ট অভ টেলিগ্রাম নং- ৯৭৭২ -৯৭৭৩ অফ ২২ নভেম্বর ১৯০৭ ফ্রম কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট অভ দ্য ভাইসরয়'স প্রাইভেট সেক্রেটারি-হোম পাবলিক প্রোগ্রেস বি. নভেম্বর, ১৯০৭, এন ২৫৪-২৬৮ (ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রহরী ও চালকদের ধর্মঘট), ঐ. পৃ. ২২৫।

২৭। টেলিগ্রামস নং ৯৮৪১ — ৯৮৪২ অভ ২৪ নভেম্বর ৯৮৯৭-৯৮৯৯ অফ ২৬ নভেম্বর ফ্রম কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট টু দ্য ভাইসরয়'স প্রাইভেট সেক্রেটারি — হোম পাবলিক প্রোগ্রস্ বি নভেম্বর, ১৯০৭, এন ২৫৪-২৬৮. ঐ.।

২৮। *অমৃত বাজার পত্রিকা* ২২,২৩,২৭ এবং ২৮ নভেম্বর ১৯০৭ ঐ.।

২৯। *বন্দে মাতরম,* ৩০ নভেম্বর, ১৯০৭ (আর এন পি (বি) সপ্তাহান্তের জন্য ৩০ নভেম্বর ১৯০৭) ঐ. পৃ. ২২৬।

৩০। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অভ বেঙ্গল আণ্ডার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ১৯০৮-০৮ সেক্টর অন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আনরেস্ট ঐ.।

৩১। শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া-ও-*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৩ই জানুয়ারি ১৯০৪ (আর এন পি (বি) সপ্তাহান্তের জন্য ২৩ জানুয়ারি ১৯০৪) ঐ. পৃ. ২২৭।

চিত্তরঞ্জন ও পৌর আন্দোলন

মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সময়কালে পৌর আন্দোলন শাক্তিশালী হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন মনে করতেন ভারতের মত পরাধীন দেশে যেখানে আইন পরিষদ প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত নয় এবং সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শৈশবস্থায়, সেক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি একমাত্র প্রকৃত ক্ষমতার আসন, জাতীয়তাবাদের মঞ্চ ও গঠনমূলক জনকল্যাণমুখী কাজের কেন্দ্রস্থল। এদের মাধ্যমে জনগণ তাদের অধিকার দাবি করতে পারে।[১] তাছাড়া ভারতীয়রা তাদের নিজেদের ঘর পরিচালনায় অক্ষম, ব্রিটিশদের এই অভিযোগের মিথ্যা প্রমাণের সুযোগও এইখানে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে স্বরাজীদের মতভেদ ছিল। এই স্থানীয় সংস্থাগুলির সৃষ্টিশীল সম্ভাবনার প্রতি স্বরাজীদের উচ্চ আস্থা ছিল। কিন্তু গান্ধীজি এক্ষেত্রে পদ ও ক্ষমতার ক্ষতিকারক প্রভাব এবং স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন।[২] চিত্তরঞ্জনের সুপরিকল্পিত নীতি ছিল সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে করায়ত্ত করে গণভিত্তিতে তাঁর দলকে গড়ে তোলা কারণ, এই প্রতিষ্ঠানগুলি তৃণমূলের সঙ্গে সংযোগের সেতু। গান্ধীপন্থীদের প্রভাবে গয়া কংগ্রেস স্থানীয় বোর্ডগুলিকে বর্জন করেছিলেন। কিন্তু দিল্লী কংগ্রেস (১৯২৩) স্বরাজীদের জয়লাভের ফলে তারা সকল পুরসভা ও জেলা-বোর্ডগুলি দখলের স্বাধীনতা লাভ করল। 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা এবং 'আত্মশক্তি'তে হেমন্তকুমার সরকার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করার আহ্বান জানালেন।[৩] পৌর নির্বাচনে স্বরাজ্য দল ১৯২৩ সালে উত্তরপ্রদেশে এবং ১৯২৪ সালে বাংলায় বিপুলভাবে এবং বিহার-উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, গৌহাটি ও আমেদাবাদে আংশিক সাফল্য লাভ করেছিল।[৪] চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য ঐ সকল প্রদেশে পৌরশাসনে বিপুল কর্মশক্তি ও সৃষ্টিশীল কাজের পরিচয় রেখেছে।

উত্তরপ্রদেশে স্বরাজ্যদলের পৌর কার্যকলাপ উল্লেখের দাবি রাখে। লক্ষ্ণৌ পুরসভায় ২৭টি আসনের মধ্যে তারা ২৫টি দখল করেছিল। এলাহাবাদ, বেনারস আগ্রা, আলিগড়, বেরিলি, ঝাঁসি ও হাত্রাসে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কানপুব পৌরসভায় তারা উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করেছিল। কয়েকটি বোর্ডে স্বরাজী চেয়ারম্যান ছিলেন, যেমন বেনারসে ভগবান দাশ, আলিগড়ে আবদুল মজিদ ও লক্ষ্ণৌএ খালিকুজ্জুমান। সরকারি নথিপত্রে উল্লেখ রয়েছে পুরনো বোর্ডগুলি প্রশাসনিক কৃতিত্বের বিশেষ কোন পরিচয় রাখে নি, কিন্তু স্বরাজী-অধিকৃত বোর্ডগুলি 'নতুন উপাদান ও তাজা রক্তে' সঞ্জীবিত হয়ে

পরিচ্ছন্ন পৌর প্রশাসনের স্বাক্ষর রেখেছিল। এক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ বোর্ডের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[৫] উত্তরপ্রদেশের গভর্নর লড ম্যারিস বড়লাট লর্ড রিডিংকে লিখেছিলেন। 'এই প্রদেশে কিছু বোর্ড ভালো কাজ করছে। লক্ষ্ণৌ স্বরাজী পৌরসভা কর্মশক্তি ও নাগরিক চেতনায় সমৃদ্ধ। এলাহাবাদ বোর্ড অন্ততঃ কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেছে', যদিও বেনারস বোর্ডের মত কিছু সংস্থা কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি।[৬] উত্তর প্রদেশের বেশির ভাগ বোর্ড ঋণের ভার লাঘব করে আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেছিল। বিহারে স্থানীয় বোর্ডগুলিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলে বিহারের গভর্নর বড়লাটকে জানিয়েছিলেন।[৭] উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে পুরসভায় খদ্দরকে প্রাধান্য দেওয়া এবং স্কুলে চরকা প্রবর্তন করা হয়েছিল। স্বরাজী নেতা বিঠলভাই প্যাটেল বোম্বাই পুরসভার মেয়ররূপে দুর্নীতি দমন করে পৌর-প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণ করেন। তিনি ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ ও শহরে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন।[৮]

১৯২৪ সালে কলকতায় পৌর নির্বাচনে স্বরাজ্যদলের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়েছিল। তার কিছু পূর্বে ১৯২১ সালে স্বরাজী নেতা ও দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী বীরেন শাসমল মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে অসাধারণ কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দীপ্ত নেতৃত্বে ১৯১৯ সালের Bengal Village Self Government Act কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর্থিক ক্ষমতাহীন ইউনিয়ন বোর্ডগুলি প্রত্যাহারের এবং মাহিষ্য কৃষকদের উপর আরোপিত চৌকিদার খাজনা বন্ধের আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। শাসমল জেলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করেছিলেন, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর দূরীকরণে চিকিৎসার সুব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা, কূপ খনন (১৯২৪-২৫ সালে ১৯৬ ট্যাঙ্ক ও ১৩০ কূপ নির্মিত হয়েছিল), পথঘাট সংস্কার ও পরিবহনের উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ও রাজস্বের উন্নতি। এই সকল ক্ষেত্রেই বোর্ডের নমিনেটেড সদস্যদের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তাঁকে এগোতে হয়েছিল।[৯] এইভাবে শাসমল দেশবন্ধুর পল্লীসংগঠনের আদর্শকে বাস্তবায়িত করেন ও জনগণের সঙ্গে স্থানীয় বোর্ডের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়।

বাংলায় ১৯২৩ সালে পুরনো মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধিত হয়ে নতুন পৌর আইন প্রবর্তিত হয়, যার পিছনে ছিল স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা। নতুন আইনে পুরসভাকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয় ও ভোটাধিকার বর্ধিত করা হয়। আগে পুরসভায় সরকার-মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ছিল বেশি। তাই সেখানে জনমতের প্রাধান্য ছিল না। নতুন আইনে নির্বাচিত অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই আইন অনুযায়ী ১৯২৪ সালে কলকাতায় প্রথম পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। স্বরাজ্য দল ছিল এর এক প্রধান প্রার্থী। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তখন মহানগরীতে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। অজস্র জনসভায় স্বরাজী নেতাদের ভাষণ শুনতে বিপুল জনসমাগম হত। ৬৮টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে স্বরাজ্য দল ৫৮টি আসন দখল করেছিল। এই

জয়কে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা 'দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে সুদৃঢ় কীর্তি' বলে অভিহিত করেছিল।[১০] এই সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল দেশবন্ধুর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিপুল জনপ্রিয়তা ও দলের সংগঠন শক্তি। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি জোরদার করার উদ্দেশে দেশবন্ধু চেয়েছিলেন একজন মুসলমান মেয়র হোন্ এবং তিনি মৌলনা আজাদের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আজাদ সম্মত হন নি। তখন চিত্তরঞ্জন সর্বাধিক ৬৩টি ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হলেন। সুরাবর্দী হলেন ডেপুটি মেয়র, আক্রাম খান ও শরৎ বোস অল্ডারম্যান এবং সুভাষচন্দ্র বসু প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার। অনেক মুসলমান স্বরাজ্য প্রার্থী রূপে পৌরসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। পৌর ও জেলাবোর্ড নির্বাচনে স্বরাজ্য দল মেদিনীপুর, ময়মনসিং, দিনাজপুর, নদীয়া ও যশোরে সাফল্য লাভ করেছিল।

তখন কোন কোন মহলে দেশবন্ধু 'high priest of destruction' বলে বর্ণিত হয়েছিলেন আইনসভায় তাঁর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের জন্য যেখানে তিনি প্রতিরোধমূলক পদ্ধতির দ্বারা কাউন্সিলগুলিকে অচল করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ররূপে তাঁর এক ভিন্ন মূর্তি উদ্ভাসিত হল — তা সৃজনধর্মী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের রূপ। মেয়র হয়ে তাঁর প্রথম ভাষণেই চিত্তরঞ্জন জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সর্বভারতীয় জাতিগঠনের আদর্শ তুলে ধরেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নয়-দফা কর্মসূচি পেশ করেন, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, দরিদ্রদের বিনা অর্থে চিকিৎসার সুযোগ দান, সস্তায় খাদ্য ও দুধ সরবরাহ, উন্নততর জল সরবরাহ, বস্তি এলাকায় উন্নততর স্বাস্থ্যবিধান, দরিদ্রদের বাসগৃহের ব্যবস্থা, শহরতলী অঞ্চলের বিকাশ, উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অধিকতর সুদক্ষ ও সুলভ প্রশাসন। মহানগর ও শহরতলীর মানুষ, বিশেষত দরিদ্রদের ত্রাণের জন্য এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।[১১] ভারতের সনাতন আদর্শ অনুযায়ী চিত্তরঞ্জন বিবেকানন্দের মতো দরিদ্র জনগণকে 'দরিদ্র নারায়ণ' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভগবান আবির্ভূত হন দারিদ্রের বেশে' এবং 'দরিদ্রের সেবা হল ঈশ্বরের সেবা'। এই সেবার আদর্শ স্বরাজ্য দলের পৌর কার্যক্রমের মর্মকথা।

চিত্তরঞ্জনের বেগবান নেতৃত্ব কলকাতা পুরসভাতে নতুন উদ্যম ও প্রাণ সঞ্চারিত করেছিল। তরুণ সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত কর্মশক্তি ছিল তাঁর সহায়ক। স্বরাজী শাসনকালে প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসা বিধান ও জল সরবরাহে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। স্বরাজ্য দলের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার এক বছরের অল্প বেশি সময়কালে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা ১৯ থেকে ৫৬তে বেড়ে ১৯২৭এ তা দাঁড়ায় ১৫০এ। কোন সরকারি অর্থসাহায্য ছাড়াই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল।[১২] এই প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে পুরসভার এডুকেশান অফিসার ক্ষীতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সুভাষচন্দ্রের সুহৃদ ও কেমব্রিজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সুভাষচন্দ্র

নতুন শিক্ষাবিভাগের ভার তাঁর উপর অর্পণ করেন। বিদেশ ভ্রমণকালে বহুদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি শিক্ষাবিভাগকে ঢেলে সাজালেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয় সাধন।[১৩] লণ্ঠন লেকচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে অনেক কংগ্রেস কর্মী ও বিপ্লবীদের পৌরসভায় এবং ৮৮জন বিপ্লবীকে পৌর বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চাকরি দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষাব্যবস্থার নব রূপায়ণের জন্য দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র, ক্ষীতিশপ্রসাদ ও সন্তোষকুমারী গুপ্তাকে নিয়ে এক এডুকেশান কমিটি গঠন করেন। চিত্তরঞ্জনের অনুপ্রেরণায় সন্তোষকুমারী শ্রমজীবী নারীদের শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি শ্রমিক বস্তিগুলিতে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'সংহতি', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকায় শ্রমিক সমস্যার উপর নানা প্রবন্ধ লিখতেন। শ্রমিকদের চেতনা বৃদ্ধি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চনা ও আন্দোলনকে রূপ দেবার জন্য তিনি 'শ্রমিক' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯২৪ সালে, যে কাজে তাঁকে উৎসাহ দেন চিত্তরঞ্জন। 'শ্রমিক' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রমজীবীদের পত্রিকা। এর পূজা সংখ্যায় (২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪, যার মূল্য ছিল এক আনা) দেশবন্ধু স্বয়ং লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষে শ্রবজীবীদের সংখ্যা শতকরা ৯৫ জন। ১০০ জনের মধ্যে ৯৫ জনকে বাদ দিয়া স্বরাজের চেষ্টা বাচালতা ও বাতুলতা মাত্র। শ্রমিক স্বরাজকামী—তাই 'শ্রমিক' এই দরিদ্র উৎপীড়িত ও বহুভারাক্রান্ত নারায়ণের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে।'[১৪]

পুরসভার প্রত্যেক ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এছাড়া আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ৪টি কেন্দ্র ছিল। বহু প্রকার ব্যাধির চিকিৎসা ও জনগণের স্বাস্থ্যচেতনার উন্মেষ ছিল এর লক্ষ্য। এই উদ্দেশে প্রত্যেক ওয়ার্ডে হেল্‌থ অফিসার নিযুক্ত করা হয়। জেলাগুলিতে চিকিৎসা দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল সাধারণ মানুষকে বিনা অর্থে চিকিৎসার সুযোগ দেবার জন্য। কলকাতায় হাসপাতাল যুক্ত একটি প্রথম শ্রেণীর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরে দেশবন্ধুর নামে নামাঙ্কিত হয়।

শহরে খাঁটি দুধ সরবরাহের জন্য পুরসভা সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধসভা প্রতিষ্ঠা করেছিল। গরীব শিশুদের বিনা মূল্যে দুধ বন্টনের জন্য দুগ্ধভাণ্ডার খোলা হয়। পুরসভা শহরে ৬ মিলিয়ন গ্যালন বাড়তি জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে। তিনটি পাম্পকেন্দ্রের বৈদ্যুতিকরণ হয়। বস্তি এলাকার স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্যোগে নেওয়া হয়।

দেশবন্ধু মেয়র হবার ঠিক পরেই উত্তর কলকাতায় মেথর ধর্মঘট হয়েছিল। দারিদ্র্য ও ঋণের বোঝার জন্য তারা বর্ধিত মজুরি দাবি করেছিল। মেয়র তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনে তিনি তাদের বোঝালেন যদি তারা নিঃশর্তভাবে কাজে যোগ দেয় তিনি তাদের অভিযোগের প্রতিকারের

দায়িত্ব নেবেন, নয়তো নিজে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে জঞ্জালে পরিষ্কারে নামবেন। এইভাবে তাদের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশবন্ধু মেথরদের শান্ত করলেন। তারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করল। কিন্তু মেথরদের দারিদ্র্য মেয়রের মনে রেখাপাত করেছিল। এর ফলশ্রুতি পুরসভা কর্তৃক সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন, যেখান থেকে সুলভ মূল্যে দরিদ্র মানুষরা দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের সুযোগ পেল।[১৭] এই সব বিপনিতে স্বদেশী দ্রব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হত। কলকাতা পুরসভা সমবায়ের নীতিকে উৎসাহিত করেছিল কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী শিল্পের উন্নয়ন। সেজন্য ভারতীয় শিল্পোদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সেই কারণে ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির টেণ্ডার গ্রহণ করা হত। বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কসের টেণ্ডার গ্রহণের ফলে তাদের দ্রব্যাদির উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়। ভারতীয় ফার্মগুলির সঙ্গে কয়লার চুক্তি সাক্ষর করা হয়েছিল। প্রত্যেক কাউন্সিলরের পক্ষে খদ্দরের পোযাক পরিধান বাধ্যতামূলক ছিল। খাদিকে উৎসাহিত করা হয়। পুরসভায় মদ নিষিদ্ধ হয়েছিল। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার, বিশেষত পৌর বিদ্যালয়গুলি পুরসভা থেকে অর্থ সাহায্য লাভ করেছিল। পথঘাট সংস্কার কার্যকরী করা হয়। ঢাকুরিয়ায় লেক খনন করা হয়। পুরসভায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় চেতনার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত পুরসভা কর্তৃক জাতীয় নেতৃবৃন্দকে সম্মানসূচক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং ব্রিটিস রাজকর্মচারীদের সম্বর্ধনা পরিহার। দেশবন্ধু লর্ড রিডিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (১৯২৪) এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন লর্ড আরউইনের সম্বর্ধনায় যোগদানে (১৯২৬) অস্বীকার করেছিলেন।

নাগরিকদের পৌর শিক্ষাদানের জন্য পুরসভা 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিল, যে পত্রিকা সম্বন্ধে স্টেটসম্যান মন্তব্য করেছিল যে এই জার্নাল মহানগরীর নানা বিষয়ে নাগরিকদের বর্ধিত আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছে। একজন ব্রিটিশ কাউন্সিলর বলেছিলেন, 'মেয়রের অফিস যা সতর্ক নিরপেক্ষতার এক কঠিন পরীক্ষা, সেখানেও মিঃ দাশ উচ্চমানের আচরণবিধির পরিচয় দিয়েছেন......তাঁর সততা বিশ্বজনীন।'[১৮] সুভাষচন্দ্র প্রধান কর্মকর্তারূপে পুরসভায় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করেছিলেন। পুরকর্মীদের নিয়মিত হাজিরা আবশ্যিক ছিল। তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ কোটস্‌কে তাঁর সামনে ধূমপান করা থেকে বিরত রেখেছিলেন।

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলকাতা পুরসভার গণতন্ত্রীকরণ হয়েছিল। কিন্তু এই প্রচেষ্টা শুধু পুরসভার সরকারি ব্লক ও সরকারি প্রশাসন নয়, স্বার্থান্বেষী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র পুরসভার সঙ্গে এদের 'অবিরত সংঘর্ষের' কথা উল্লেখ করেছেন। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রূপে সুভাষচন্দ্রের নিয়োগ দলের কোন কোন মহলে ঈর্ষার সঞ্চার করেছিল।[১৯] বীরেন শাসমল, অশ্বিনী ব্যানার্জি, হরিধন দত্ত

ও জে. সি মুখার্জি, এঁরা সকলেই ঐ পদলাভে আগ্রহী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন শেষোক্ত তিন জনের চেয়ে শাসমলকে পছন্দ করায় তাঁকে মৌখিকভাবে ঐ পদ দানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সমর্থনের ভিত্তি অনেক ব্যাপক দেখে তাঁকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। সুভাষচন্দ্রের পিছনে ছিল কলকাতার প্রভাবশালী অংশ, মুসলমান সম্প্রদায় ও বিপ্লবী যুগান্তর দলের সুদৃঢ় সমর্থন, যারা শাসমলকে সমর্থন করেনি তিনি নিম্ন মাহিষ্য শ্রেণীভুক্ত ও হিংস্র বৈপ্লবিক পদ্ধতির বিরোধী বলে। এতে শাসমল ক্ষুব্ধ হয়ে দল ত্যাগ করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর অসাধারণ সংগঠন শক্তি ও কর্মের দ্বারা তাঁর মনোনয়নের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছিলেন। দেশবন্ধুর নীতি ছিল মুসলমান ও সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার। তাই তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়, প্রাক্তন বিপ্লবী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি নিম্নবর্গের নিপীড়িত মানুষ প্রমুখের মধ্যে সতর্ক বিবেচনার সঙ্গে পুরসভার বিভিন্ন পদ বন্টন করেন। তিনি রসিকলাল বিশ্বাস নামে এক নমঃশূদ্র স্নাতক ও তার স্ত্রীকে পুরসভায় চাকরি দেন। সুভাষচন্দ্র ৩৩টি শূন্য পদে ২৫ জন মুসলমানকে নিয়োগ করে দেশবন্ধুর নীতি কার্যকরী করেন ও এজন্য মহাত্মা গান্ধীর সমর্থন লাভ করেন।[১৮] কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই নীতির বিরোধিতা করেছিল।

কৃষকদের অল্প সুদের হারে ঋণদান ও কৃষির উন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা চিত্তরঞ্জনের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর পৌর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও বস্তির উন্নয়নের জন্য ঋণপ্রকল্পের প্রচেষ্টাকে সরকার বাধা দিয়েছিল।

ভারতীয় ফার্মের টেণ্ডারকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য স্বরাজী কাউন্সিলরদের সঙ্গে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের সংঘাত ঘটেছিল। স্বরাজ্য দল পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস্ সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য কার অ্যাণ্ড কোম্পানির থেকে টেণ্ডার গ্রহণ করেছিল, যারা এই কাজে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু সরকার কিছু পরে পুরসভাকে চাপ দেয় কুমার এ্যাণ্ড কোম্পানির টেণ্ডার গ্রহণ করতে কারণ তাদের টেণ্ডারের হার ছিল নিম্ন। সুভাষচন্দ্র বিশ্লেষণ করে দেখালেন দুটি টেন্ডারের পার্থক্য সামান্য এবং কার এ্যাণ্ড কোম্পানির টেণ্ডার এখন প্রত্যাহার করে নিলে দ্রুত জল সরবরাহের কাজ শুধু বিঘ্নিত হবে তাই নয়, ঐ কোম্পানিকে বিপুল ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মেয়র পুরসভার কাজে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টাকে তীব্র নিন্দা করলেন। পুরসভার অধিবেশনে তিনি গর্জে উঠলেন, 'কলকাতা পুরসভার ইতিহাসে এ জিনিস কখনো ঘটেনি।' সরকারের এত দেরিতে হস্তক্ষেপ করাকে তিনি 'দায়িত্বহীন আচরণ' বলে আক্রমণ করলেন এবং উল্লেখ করলেন, 'এমন অজস্র দৃষ্টান্ত আছে যে পুরসভা নিম্নহারের টেণ্ডারকে গ্রহণ করেনি এবং সরকারও তাতে কখনো হস্তক্ষেপ করেনি।'[১৯] এর ফলে সরকারের বাধাদানের এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ সরকার বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারি করে সুভাষচন্দ্র ও কয়েকজন বিশিষ্ট স্বরাজী সদস্যকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগসাজসের চক্রান্তের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। এর বিরুদ্ধে সারা দেশ তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। সুভাষচন্দ্র তখন পুরসভার নানা প্রগতিশীল পরিকল্পনা কার্যকরী করত উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে তখন কোন বৈপ্লবিক চক্রান্তে লিপ্ত থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ইউরোপীয় ফার্মগুলির টেণ্ডার প্রত্যাখ্যানের জন্য সরকার তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল। বিপ্লবী ষড়যন্ত্রকে নির্মূল করার উদ্দেশে এই অর্ডিনান্স — সরকার একথা ঘোষণা করলেও তার আসল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার স্বরাজ্য দলকে খর্ব করা, কারণ ঐ দল বিধানসভায় সরকারকে নাজেহাল করেছিল। মতিলাল নেহেরু প্রকাশ্য বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন বাংলায় ৭২জন বন্দীর মধ্যে ৬০জন স্বরাজী। পুলিশ স্বরাজ্য দলের কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে এদের বন্দী করেছিল। মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন 'সুভাষ বোসের গ্রেপ্তার পুরসভার প্রতি ভীতি প্রদর্শন ও ঐ সভার স্বরাজী প্রশাসনকে ধ্বংসের পথে পদক্ষেপ।' দেশবন্ধুর বিশ্বস্ত কর্মীদের সরিয়ে দিয়ে সরকার তাঁকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। চিত্তরঞ্জন তৎক্ষণাৎ এই অর্ডিনান্সকে 'lawless law' আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। গান্ধীজি তাঁকে সমর্থন করে এই জরুরি আইনকে 'Viccregal bomb' বলে নিন্দা করেন।এই প্রসংগে পুরসভার অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের মর্ম্মস্পর্শী ভাষণ ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে — 'দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তবে আমি অপরাধী। যদি পুরসভার চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার দোষী সাব্যস্ত হয় তবে মেয়রও দোষের ভাগীদের। সুভাষচন্দ্র বসু আমার চেয়ে বড় বিপ্লবী নন। কেন তারা আমায় বন্দী করেনি?'[১০]

দেশবন্ধুর কার্যকালে সরকারি মহল স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছিল, যেমন কর্পোরেশনের পদ বিক্রয়, ফরোয়ার্ড কাগজের শেয়ার বলপূর্বক পুরসভার কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া, পুরসভার তহবিলে থেকে বিপ্লবীদের ও আইনসভার সদস্যদের ভোট কেনার জন্য অর্থদান। ব্রিটিশ সূত্র থেকে এমন কথা বলা হয়েছিল যে কার অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির বিনিময়ে স্বরাজ্য দল ৭৫০০০্ টাকা গ্রহণ করেছিল এবং গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে ঐ অর্থ থেকে দেশবন্ধু বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্য ১০০০০্ টাকা দান করেন।[১১] এই সব অভিযোগের কোন প্রমাণ তৎকালীন নথিপত্র থেকে পাওয়া যায় নি। তখন বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন বড়লাট রিডিং-এর কাছে স্বীকার করেছিলেন তিনি কোন প্রমাণ দেখাতে পারবেন না, যার জন্য রিডিং দুর্নীতি অনুসন্ধানের জন্য কোন কমিশন বসাতে পারেন নি, কারণ তিনি বুঝেছিলেন কমিশন কিছু প্রমাণ করতে না পারলে বিপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি ও সরকারের মর্যাদাহানি ঘটবে। যুগান্তর দলের দুই প্রবীণ নেতা অরুণ চন্দ্র গুহ ও ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত সুস্পষ্ট

ভাষায় লিখেছেন দেশবন্ধু বিপ্লবীদের কোন অর্থ দেন নি কারণ তাঁরা জানতেন দাশ সমেত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হিংসা বা সন্ত্রাসে বিশ্বাস করেন না এবং সেই কারণে ঐ কাজের জন্য অর্থদানের কোন প্রশ্ন ওঠে না।[১১] মতিলাল নেহেরু বলেছিলেন ঘুষ দেওয়ার মত কোন অর্থ স্বরাজ্য দলের নেই এবং নির্বাচনে সমগ্র বাংলায় মাত্র ৩০,০০০ টাকা খরচ করা হয়েছিল ও এই অর্থ দেশবন্ধু সংগ্রহ করেছিলেন 'promissory notes' থেকে।[১৩] ১৯২৪ সালে গান্ধী যখন কলকাতায় আসেন তখন দাশ তাঁকে স্বরাজ্য দলের সব হিসাবপত্র দেখিয়েছিলেন। সেইসব খতিয়ে দেখে তুষ্ট হয়ে গান্ধী রায় দিয়েছিলেন স্বরাজ্য দল দুর্নীতিমুক্ত। সত্যরঞ্জন বক্সী যিনি দেশবন্ধুর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে ও ফরওয়ার্ড পত্রিকার ম্যানেজমেন্টের সংগে যুক্ত ছিলেন তিনি স্বয়ং এই নিবন্ধের লেখককে বলেছিলেন ফরওয়ার্ডের শেয়ার জোর করে চাপানের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মতিলাল ব্রিটিশ সরকারকে 'greatest bribe giver' বলে ধিক্কৃত করেন। তিনি বলেছিলেন সরকারের অর্থদান ও পদ দেবার শক্তি অনেক বেশি কলকাতা পুরসভায় অন্তর্কলহ, দুর্নীতি ও নিয়মানুবর্তিতার শিথিলতা এসেছিল অনেক পরে, চিত্তরঞ্জনের সময়কালে নয়।

এইভাবে চিত্তরঞ্জন পৌরব্যবস্থাকে নব কলেবর দান করেছিলেন। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মৌলিক নীতি ও দৈনন্দিনের কর্মসূচির অভ্যাস, দুই দিক থেকে স্বরাজ্য দল সমগ্র পৌর প্রশাসনকে বৈপ্লবিক রূপ দান করেছিল।' এর ফলশ্রুতি এক সুদক্ষ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন যা নগরজীবনের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। যে পুরসভাকে বিদেশীরা 'কথার অস্ত্রাগার' ও 'বিলম্বের ভাণ্ডার' বলে বিদ্রূপ করত তা এখন এক বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হল, যে যজ্ঞের ঋত্বিক চিত্তরঞ্জন। স্বরাজ্য দলের পৌর কার্যকলাপের ফলে জনসাধারণের পৌর বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুভাষ চন্দ্র লিখেছেন, জনগণের মধ্যে এক 'নতুন নাগরিক চেতনা' জাগ্রত হয়েছিল এবং এই প্রথম তারা পুরসভাকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান ও পুরকর্মীদের আমলা না মনে করে জনগণের সেবক বলে মনে করতে শুরু করল। পুরসভা আর রাইটার্স বিল্ডিংএর অতিরিক্ত অঙ্গ হয়ে রইল না। আমলাতান্ত্রিক দুর্গ থেকে এই সভা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হল। দেশবন্ধু বলতেন, আমাকে এক বিন্দু ক্ষমতা দাও, কিন্তু তা যেন সত্যকার ক্ষমতা হয়। তুলসী গোস্বামী লিখেছেন, দেশবন্ধুর সময়ে কলকাতা পুরসভা ছিল এক স্বায়ত্তশাসিত সরকার। শহর ও জেলার মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণী এই স্বায়ত্তশাসনের সুফল ভোগ করেছিল।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। *ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট*, ১৯২৫, খণ্ড ২, নম্বর ৭; মাইরন ওয়াইনার, পার্টি বিল্ডিং ইন এ নিউনেশন — ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, শিকাগো, ১৯৬৭, পৃ: ৩২৭-৮।

২। *রিপোর্ট অন এ্যাডমিনিস্ট্রেসন অফ বেঙ্গল*, ১৯২৪-২৫, পৃ: xiii।

৩। *ফরোয়ার্ড*, ৯ ডিসেম্বর ১৯২৩; *আত্মশক্তি*, ৫ ডিসেম্বর ১৯২৩।

৪। *হোম পলিটিক্যাল, ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট*, ফাইল ২৫/১৯২৪, বিহার-উড়িষ্যা, মে-জুন, মাদ্রাজ, ডিসেম্বর; ইউ পি, মার্চ ১৯২৩।

৫। *রিপোর্ট অন মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেসন এ্যাণ্ড ফাইনান্সেস ইন দ্য ইউনাইটেড প্রভিন্সেস অফ আগ্রা এ্যাণ্ড আউধ*, ১৯২২-২৩ পৃ: (৮) ও (৯)

৬। *ম্যারিস টু রিডিং*, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, রিডিং পত্রাবলী, খণ্ড ১০, পৃ: ৫৮৮।

৭। *হুইলারের চিঠি রিডিংকে*, ২৬ জুলাই ১৯২৪, *রিডিং পত্রাবলী*, খণ্ড ২৬, পৃ. ৪২৭।

৮। ভি. জে. প্যাটেল টু জয়াকর, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২২, ১০ নং ফাইল, *জয়াকর পেপারস্*; জি. আই. প্যাটেল, *ভিঠলভাই প্যাটেল: লাইফ এ্যাণ্ড টাইমস্*, খণ্ড ১।

৯। প্রমথনাথ পাল, *দেশপ্রাণ শাসমল*, ২য় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৮; নরেন্দ্রনাথ দাশ, *হিস্ট্রি অফ মিডনাপুর*, প্রথম খণ্ড, *মেদিনীপুর* ১৯৫৬, ১ম সংস্করণ, পৃ: ৯৯, ২৪৪; *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ২১ ও ২২ অক্টোবর, ১৯২১, *ফরোয়ার্ড*, ৬ নভেম্বর ১৯২৬

১০। উদ্ধৃত, *ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট*, খণ্ড ৫, ১২ মার্চ ১৯২৭; *ফরোয়ার্ড*, ১২এপ্রিল ১৯২৪

১১। *মাইনিউটস্ অফ দ্য প্রোসিডিংস্ অফ দ্য ক্যালকাটা কর্পোরেশন*, এপ্রিল — সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃ: ৫-৬

১২। *ফরোয়ার্ড*, ১৮ জুলাই, ১৯২৪; *মাইনিউটস্, পূর্বোক্ত*, পৃ: ৫১৪-২২: রজতকান্ত রায়, *আর্বান রুটস্ অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম*, দিল্লী, ১৯৭৯, পৃ: ১১৩-১৮

১৩। দেশ, ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯, পৃ: ২১

১৪। দীপ্তিময় রায়, 'বাংলার প্রথম শ্রমিক নেত্রী ও 'শ্রমিক' পত্রিকা, *দেশ*, ২৯ জুন ১৯৯৬, পৃ: ৪৭-৫০

১৫। *ফরোয়ার্ড*, দেশবন্ধু নম্বর, ১ জুলাই ১৯২৭, পৃ: ২৯

১৬। উদ্ধৃত, *ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট*, ১৯২৫, খণ্ড ২, ৬ নং, পৃ: ২১৫,

১৭। সুভাষচন্দ্র বসু, *ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল*, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ১৩৮, ১৩৬; মঞ্জুগোপাল

মুখোপাধ্যায়, 'সুভাষচন্দ্র এ্যাণ্ড ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ভিসন ও নিউ ইণ্ডিয়া, *ইকনমিক থিঙ্কিং অফ সুভাষচন্দ্র বোস*, কলকাতা, ১৯৯৮।

১৮। *দ্য মুসলমান*, ২৫ জুলাই, ১৯২৪; *কালেক্টেড ওয়াকর্স্ অফ মহাত্মা গান্ধী*, খণ্ড ২৪, পৃ: ৪৭৯।

১৯। *ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট*, খণ্ড ৫, মার্চ ১৯২৭; *মাইনিউটস্*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৫৯-৬৭।

২০। *মাইনিউটস্*, পূর্বোক্ত, অক্টোবর ১৯২৪-মার্চ ১৯২৫, পার্ট২, পৃ: ১৫০৬-১০; ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯ অক্টোবর ১৯২৪

২১। লিটনের পত্র অলিভিয়ারকে, ২৮মে ১৯২৪, রিডিংকে, ১০ জুলাই ১৯২৫, রিডিংকে ১২ই আগস্ট, ১৯২৪, *রিডিং পত্রাবলী*, খণ্ড ২৬

২২। অরুণ চন্দ্র গুহ, *অরবিন্দ ও যুগান্তর*, কলকাতা ১৯৭৫, পৃ: ৫৭-৫৮; ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের নিবন্ধকারকে চিঠি, ২১-৪-১৯৭৫ এবং উভয়ের সঙ্গে নিবন্ধকতার সাক্ষাৎকার, ১৯৭৫-৭৬

২৩। *ইণ্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯২৪, খণ্ড ২, পৃ: ১৩৫-৩৬; মতিলাল নেহেরুর চিঠি সি.আর.দাশকে, ২৭ জুলাই ১৯২৪, *মতিলাল নেহেরু পত্রাবলী*

মুনশিগঞ্জে পিটুনী পুলিশ ও আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-১৯৩২)

সাহানা খাতুন

আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ব বাংলার কোন কোন এলাকায় শক্তিশালীভাবে পরিচালিত হয়। এ সময় ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করে এবং এই অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর ব্যয়ভার ঐ এলাকার জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। বর্তমান প্রবন্ধটি বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে প্রাপ্ত নথিপত্র[১] ও সমকালীন সংবাদ পত্রের উপর ভিত্তি করে রচিত।

১৯২৮-১৯৩০ সালে মুনশিগঞ্জে সংঘটিত কালী মন্দির সত্যাগ্রহ ছিল সমকালীন হিন্দু জাতি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তথাকথিত নিম্ন জাতির হিন্দুদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এই সত্যাগ্রহ সামগ্রিকভাবে অহিংস হলেও এর মধ্য হতে হিন্দুদের নিম্নবর্ণের অসন্তোষ প্রকাশ পায়। স্থানীয় সমাজসেবা, রাজনৈতিক নেতা ও আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপ মুনশিগঞ্জের কালী মন্দির সত্যাগ্রহের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।[২] ঢাকার পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট কর্তৃক কলকাতায় পুলিশ আই.জি.কে জানান হয় যে, বিক্রমপুরে কংগ্রেস পার্টি, বিক্রমপুরের প্রশাসনকে স্থবির করে দেয়ার জন্য সরকার বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে। প্রায় দু'মাস যাবৎ পুলিশ কর্মকর্তারা যখনই কোন অনুসন্ধান পরিচালনা করতেন সে সময় স্থানীয় ভদ্রলোকেরা রাতের বেলা তাদের আশ্রয় দিতেন না। ফলে তাদেরকে থানা থেকে গিয়ে কাজ করতে হতো। প্রায়ই বেশ কিছু যুবকদল তাদের ঘিরে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে থাকে যার ফলে তদন্ত কাজের ব্যাঘাত ঘটে। পুলিশ অফিসারগণ থানা থেকে গাদা বন্দুক নিয়ে বের হতেন যার ফলে তাদের উপর হঠাৎ আক্রমণের কোন ঘটনা ঘটে নাই। পিকেটিং অব্যাহত থাকে এবং ট্যাক্স প্রদান না করার কার্যক্রমও কংগ্রেস এখানে শুরু করে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং সদস্যদেরকে পদত্যাগ করার জন্য ও সামাজিকভাবে বয়কট করার হুমকি দিয়ে চিঠি দেয়া হয়। মূলচর ও জৈনসরে দুজন ডাকপিয়নকে দিনে দুপুরে আক্রমণ করে তাদের মালামাল ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং এ দুটো ঘটনার একটিতে একজন রানারকে খুন করা হয় নৃশংসভাবে। ঢাকা-লৌহজং এর মধ্যকার টেলিগ্রাফ লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ১৯৩০ সালের ২৪শে জুন। অনেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে মুনশিগঞ্জে ব্রিটিশ সরকারের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়ার একটা সাধারণ ধারণা সকলের মনে সৃষ্টি হয়। ফলে এলাকায় অস্থির ও বিপদজ্জনক অবস্থা বিরাজ করে। আইন অমান্য

আন্দোলনের স্বপক্ষে কংগ্রেসের সদস্যদের নিম্নলিখিত তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য ঃ

১. স্কুলে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা যা টঙ্গীবাড়ি থানায় ঘটেছিল ১৯৩০ সনের ১০ই জুলাই তারিখে। এখানে একজন স্কুলের বালক শিক্ষকদের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করে।

২. বৈরাগদি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদেরকে পদত্যাগে বাধ্য করার ব্যাপারে সফল না হওয়ায় ১৯৩০ সনের ২৪শে জুলাই তারিখ রাতে বোর্ড অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়।

৩. শ্রীনগর থানায় একই বৎসরের ১৬ই জুলাই তারিখে বাবু জগদীশ চন্দ্র ব্যানার্জীকে নির্যাতন করা হয় তার বিদেশী কাপড় ও জুতা পুড়িয়ে ফেলতে অস্বীকার করার অপরাধে।

৪. পুলিশ বজ্রযোগিনী কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে গ্রেপ্তার করে আনার পথে স্বেচ্ছাসেবকরা তাদেরকে ধাওয়া এবং ইঁটপাটকেল নিক্ষেপ করে ১৯৩০ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে। পরে তাদেরকে লাঠি চার্জের মাধ্যমে সরিয়ে দেয়া হয়।

৫. সিরাজদি খান থানার একজন কনস্টেবল সাধারণ পোশাকে বের হলে তালতলা নামক স্থানে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা তাকে আক্রমণ করে এবং সে কোন রকমে নৌকায় করে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

৬. ৪০ জন যুবকের একটি দল লাঠি সজ্জিত হয়ে নিজেদেরকে তারা প্রতিরক্ষা দল হিসেবে বেরসরকারিভাবে ঘোষণা করে এবং পুলিশের একটি দলকে এস.ডি.পি.ও-এর লোকজন সহ ঘেরাও করে এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে ১৯৩০ সনের ১৪ই জুলাই রাতে আব্দুল্লাহপুর নামক স্থানে।

৭. টঙ্গীবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৯৩০ সনের ১১ই জুলাই তারিখে নৌকায় করে তার দুইজন কনস্টেবল সহ ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে একটা পথ দিয়ে চলার সময়ে তাকে ঘেরাও করা হয়।

৮. লৌহজং থানার ধানকুনিয়া বাজারে একজন সাব ইন্সপেক্টর তদন্তকাজে গেলে তার দারোয়ানকে হঠাৎ আক্রমণ করা হয় এবং তার চাকরকে বেঁধে রাখা হয়। কংগ্রেসের লোকজন এ ঘটনার তদন্ত কাজ ও ফলাফলকে বয়কট করে।

৯. ১৯৩০ সালের ১৭ই জুলাই দিঘিরপাঁড়ের সিদ্ধেশ্বরী স্কুল তছনছ ও ভাঙচুর করা হয় এবং এ সময়ে ছাত্র-শিক্ষকদের হাজিরা খাতা, হিসাবের খাতা ইত্যাদি চুরি হয়ে যায়। এই ঘটনায় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সন্দেহ করা হয়।

১০. ১৯৩০ সালের ২৬শে জুলাই কাজিরপাড়া স্কুল কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং এ ঘটনাটিতেও দায়ি করা হয় কংগ্রেসের কর্মীদেরকে।

১১. ১৯৩০ সালের ২৬শে জুলাই শ্রীনগর থানার ইন্সপেক্টর এবং সিরাজদি খানের পুলিশ অফিসার জৈনসর ও ইচ্ছাপুরার কংগ্রেস অফিস থেকে কংগ্রেসের পাঁচ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে নৌকাযোগে তালতলা নিয়ে আসেন। তারা যে খালের ভিতর দিয়ে আসছিল তারে পাশের জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে তিনশত কংগ্রেসকর্মী তাদের অনুসরণ করছিল। প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা জুড়ে তারা পুলিশ বাহিনীকে বিভিন্ন অপমানজনক কথা বার্তার মাধ্যমে উত্যক্ত করে। তালতলায় পৌঁছানোর পরে তারা এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তখন বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠি চার্জের মাধ্যমে তাদেরকে সরিয়ে দেয়।

১২. অতিরিক্ত এস.পি. যখন ১৯৩০ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখে শ্রীনগর পরিদর্শনে গিয়ে ফিরে আসেন, তখন গ্রামের মধ্য দিয়ে চলার সময়ে তিনি লোকজনের পুলিশ বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করেন। তার যাত্রাপথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জনগণের 'বন্দে মাতরম' এবং 'গান্ধী কি জয়' শ্লোগানে মুখরিত হতে থাকে এবং জনগণ তাদেরকে গালাগাল দিতে থাকে। জনগণের এই বিক্ষোভ ছিল স্বতস্ফূর্ত এবং বোঝা যাচ্ছিল যে, ছোটদেরকেও এগুলো শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। বড়রা ছোটদেরকে নিষেধ না করে বরং তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল।

১৩. ১৯৩০ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে মুনশিগঞ্জের ইন্সপেক্টর এবং টঙ্গীবাড়ী থানার সাব ইন্সপেক্টর কালী বাড়ি ঘাটে তাদের নৌকা থামলে প্রায় ৫০ জন ছাত্রের একটা দল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দিতে থাকে এবং ভারতীয় কুকুর বলে চিৎকার করে।

১৪. ১৯৩০ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে কর্মকর্তারা এজন্য তদন্ত কাজে বের হন যে, কেন বাবু বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য থেকে পদত্যাগ করেন। এর জবাবে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তাদেরকে জানান যে, ছাত্ররা বিনয়বাবুকে নিপীড়ন করে এবং ছেলেদের মাধ্যমে হুমকি দেয়। তবে পুলিশী নিরাপত্তা দেয়া হলে বিনয়বাবু পদত্যাগ পত্র তুলে নিতে রাজি আছেন।

১৫. রাজনগরে রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত হয় ১৯৩০ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে[৩]।

মুনশিগঞ্জে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকগণ বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পুলিশের বিরাজভাজন হয়। সমকালীন সরকারি নথিপত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত

ও মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৯৩১ সালের কেবলমাত্র জানুয়ারি মাসে সংঘটিত এসব ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তা। পুলিশ পরেশ মুখার্জী সাদা পোষাকে আইন অমান্য আন্দোলনের মিছিল পর্যবেক্ষণ করতে গেলে তাঁকে 'যমদূত' ও 'কলির' রাজা ইত্যাদি সম্বোধনের মাধ্যমে মিছিলকারীরা বিদ্রুপ করে। সিরাজদি খানের ছাত্ররা পুলিশ দেখলেই 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি প্রদান করে। স্বর্ণগ্রামের স্কুলের ছাত্রবৃন্দ পুলিশের কার্যক্রমকে কেবলমাত্র বাধা প্রদানই করেনি, কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তার উর্দি ও পোষাক খুলে নেবার চেষ্টা চালায়। পুলিশ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে সমবেত হিন্দু ও মুসলমান যুবকেরা পুলিশকে বাধা প্রদান করে। মুনশিগঞ্জের গ্রামের অভ্যন্তরে পুলিশ আশ্রয় গ্রহণ করলে সত্যাগ্রহীগণ সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' বলে নিয়ত ধ্বনি দিতে থাকে। পুলিশ দর্শন করেই তারা 'শালা পুলিশ যায়' এরূপ কটূক্তিও সর্বদা করে। শ্রীনগরের ষোলঘরে এক বিশাল মিছিল কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবি নিয়ে অগ্রসর হয় এবং মিছিলটি থানার নিকট পৌঁছালে জনতার মধ্য হতে এরূপ ধ্বনি দেয়া হয় যে 'বিদেশী থানা পুড়িয়ে ফেলা উচিৎ।' পুলিশের উপস্থিতি দেখা মাত্রই স্বেচ্ছাসেবকগণ কটূক্তি করে যে, পুলিশ হলো কুকুর এবং এসব কুকুরের বিশ্রাম নেই। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে এদের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।'

মুনশিগঞ্জে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পূর্বে সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন ও ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। ১৯৩০ সালে মুনশিগঞ্জের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কংগ্রেসের রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সাংখ্যিক রূপ হলো ঃ

১.	সভা ও সমাবেশ	১৮১ বার
২.	হরতাল	৫৯ বার
৩.	পিকেটিং	৪৩ বার
৪.	বিভিন্ন পর্যায়ে পদত্যাগ দাবির ঘটনা	২ বার
৫.	বিভিন্ন পর্যায়ে পদত্যাগে বাধ্যকরণ	২ বার
৬.	কর প্রদান না করার জন্য প্রচারকার্য	১১ বার
৭.	অবৈধ প্রচারপত্র বিতরণ	১২ বার
৮.	কোন্টাই এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণ	১ বার
৯.	পুলিশ নির্যাতন	২ বার
১০.	টেলিগ্রাফ লাইনের তার কেটে ফেলা	৮ বার
১১.	রাজনৈতিক ডাকাতি	২ বার
১২.	বিবিধ	২২ বার
	মোট	৩৪৫ বার

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে এই কার্যক্রমকে চারটি প্রধানভাবে ভাগ করে আলোচনা করা যায় যেমন ঃ

১। আইন অমান্য ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ।

২। পুলিশ নিগ্রহ।

৩। টেলিগ্রাফ লাইনের তার কেটে ফেলা।

৪। রাজনৈতিক ডাকাতি

এসব ঘটনাবলি সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে মুনশিগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক মতামত প্রকাশ করলেন যে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য এসব ঘটনা তিনি যথেষ্ট বলে বিবেচনা করেন না। তাঁর মতে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য কোন বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তিকে দোষারোপ করা যায় না। অনুরূপভাবে টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলা ও রাজনৈতিক ডাকাতির বিষয়ে এমন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় না, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের উপর অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য অর্থদাবি করা যায়।[৫]

শেষ পর্যন্ত ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে মুনশিগঞ্জে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের সরকারি ঘোষণা প্রদান করা হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে ঃ

"১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের পুলিশ আইনের ১৫ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সপরিষদ গভর্নর ঘোষণা করিতেছেন যে, ঢাকা জিলায় মুনশিগঞ্জ মহকুমায় মুনশিগঞ্জ, টঙ্গীবাড়ি, সিরাজদিখা, লৌহজঙ্গ ও শ্রীনগর থানার সমগ্র অঞ্চলে চাঞ্চল্য ও বিপ্লব দেখা দিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদিগের আচরণ যেরূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ঐ সকল অঞ্চলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা আবশ্যক হইয়াছে এবং এই পুলিশ দলের ব্যয়ভার ঐ অঞ্চলের লোকদিগকে বহন করিতে হইবে। তবে অবশ্য সরকার যদি কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে এই ব্যয়ভার হইতে মুক্তি দিতে চাহেন তাহা হইলে যথাকালে তদনুয়ারী আদেশ প্রচারিত হইবে।

৬মাস পর্যন্ত এই ঘোষণা স্থায়ী হইবে।"[৬]

মুনশিগঞ্জ মহকুমায় অনুমোদিত পুলিশ সংখ্যা হচ্ছে দুইজন ইন্সপেক্টর, ষোলজন সাব-ইন্সপেক্টর আঠারজন এ.এস.আই. একজন হেড কনস্টেবল, চুরাশিজন কনস্টেবল। যে এলাকাটি সে সময়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ যার অন্তর্ভুক্ত ৫৪৬টি মৌজা, ১৩৪, ৩০০টি ঘর এবং জনসংখ্যা ৬,৭৫,৮৭৯ জন এবং এখানকার অরাজক পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য পুলিশ সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। এরা স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করতে সক্ষম। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট অরাজক পরিস্থিতি মোকাবিলায় এ সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট নয়। বর্তমান পরিস্থিতি পুলিশের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন থেকে

সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাব করা হয় একজন ইন্সপেক্টর, একজন সাব-ইন্সপেক্টর, আটজন হেড কনস্টেবল ও একশত জন সশস্ত্র কনেষ্টবল দেয়ার জন্য যারা এখানকার জনগণের খরচে চলবে। প্রস্তাবে আরো বলা হয়, এই খরচ নির্বাহ করতে তেমন কোন কষ্ট হবে না। এছাড়া মুসলমানগণ, নমশূদ্র ও কিছু হিন্দু যারা এই আন্দোলনের সাথে জড়িত নয় এবং যারা পুলিশকে সাহায্য করছে তাদেরকে এই খরচ থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।

মুনশিগঞ্জে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হতে ১০০ জন অবসর গ্রহণকারী পুলিশ আনা হয়। কোলকাতা হাতে প্রকাশিত Voteranga পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, অবসরগ্রহণকারী এ সকল পুলিশ কি ট্যাক্স আদায়ের জন্য নিয়োগ করা হবে অথবা সমগ্র মহকুমায় প্যারেড করবে?[৭] কোলকাতা হতে প্রকাশিত Advance পত্রিকায় মুনশিগঞ্জে অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। এখানে বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকারের 'বিভেদ ও শাসন' নীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের ব্যয়ভার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়কে বহন করতে হবে। মুসলমান সম্প্রদায়, সরকারি কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ এই কর প্রদান হতে অব্যাহতি পাবে।[৮] অমৃত বাজার পত্রিকায় র‍্যামসে ম্যাগডোনাল্ডের একটি উক্তি উল্লেখ করে লেখা হয় যে, অত্যাচার ও নিপীড়ন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, বরং জিঘাংসা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।[৯]

মুনশিগঞ্জে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেও কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়া সম্ভব হয়নি। ঘটনা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। এর মধ্যে মুনশিগঞ্জের পোস্ট অফিসে ডাকাতি সংঘটিত হয়। ডাকাতদের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। ডাকাতদের সকলেই ছিল অল্পবয়সী এবং শিক্ষিত, কারণ তাদের কথার মধ্যে ইংরেজি শব্দ False Key, Well done, Finished প্রভৃতি ছিল। ডাকাতরা সাব পোস্টমাস্টার, তাঁর স্ত্রী, বড় পুত্র এবং একজন পোস্টম্যানের দিকে রিভলবার তাক করে সাব পোস্টমাস্টারের নিকট থেকে চাবি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি নীচতলায় চলে যায়। ডাকাতদের একজন পোস্টমাস্টারের পরিবারকে পাহারা দিতে থাকে। ডাকাতরা নিচে গিয়ে পোস্ট অফিসের দরজা খুলে ফেলে এবং আয়রনসেফ খোলার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টার পর একটি তালা খুলতে সক্ষম হলেও অন্য তালাগুলো খুলতে ব্যর্থ হয়। কারণ ঐ তালার চাবিগুলো ছিল আরেকজন পিয়নের কাছে যে বাস করত এক মাইল দূরের বাড়িতে। তারপর তাঁরা তালাগুলো হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে এবং আয়রনসেফ থেকে নগদ টাকাকড়ি নিয়ে নেয়। আয়রসেফের মধ্যে ছোট একটা বাক্সে সাব পোস্টমাস্টারের নিজের টাকা ৮০ বা ১০০ টাকা ছিল এবং এক জোড়া বালা ছিল।

ডাকাতরা বাক্সটি ভেঙ্গে ফেলে টাকাগুলো নিয়ে যায় এবং বালাগুলো ভুলক্রমে রেখে যায়। ডাকাতরা চলে যাওয়ার সময় টর্চ উপরের দিকে ফেললে পোস্টমাস্টারের স্ত্রীর গলার নেকলেসটি তাদের নজরে পড়ে এবং সেটি তারা তার দিকে রিভলবার তাক করে খুলে নেয়। নেকলেসটির ওজন ছিল ১০.৫ তোলা এবং নেকলেসটির দাম ছিল ২৭৫ রূপী। ডাকাতরা ডাকাতি করার পূর্বে টেলিগ্রাফের লাইনটি কেটে ফেলেছিল। এভাবে মুনশিগঞ্জে পিটুনি পুলিশ বা পিউনিটিভ পুলিশ মোতায়েন করা সত্ত্বেও কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে জড়িত কর্মীদের বিভিন্ন হিংসাত্মক কার্যকলাপ একটির পর একটি চলতে থাকে।

বাংলার অন্যান্য স্থানের মত মুনশিগঞ্জেও পিউনিটিতে পুলিশ বা পিটুনি পুলিশ মোতায়েন জনগণের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী প্রভাব ফেলে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা শক্তিশালী হয়। উল্লেখ্য এই আইন অমান্য আন্দোলন মুনশিগঞ্জের মহিলারাও স্বতস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। যেমন-শ্রীমতি বিধুমুখী সোম, লাবণ্য মুখুটি, সরযুবালা ঘোষ, সুখলতা চক্রবর্তী, পার্বতীর মাতা প্রমুখ মহিলাগণ যাদেরকে আইন অমান্য আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে গ্রেফতার ও কারাদণ্ড দেয়া হয়।[১০] এই আন্দোলনে মহিলা ছাড়াও ছোট ছোট বালিকাদের অংশগ্রহণের কথাও জানা যায়।

সূত্র নির্দেশ :

১। *Government of Bengal, B-proceedings, Police, Bangladesh National Archieves,* Bundle-6, November, 1931, Proceedings Nos 38-53.

২। Bubbhadeva Bhattacharyya et.al. Satyagrahas in Bengal, 1921-39, (Calcutta: Minerva Associates, 1977)

৩। Letter from the Superintendent of Police, Dhaka to the Inspector-General of Police Calcutta, 11 August, Government of Bengal, *B-Proceedings, Police, Bangladesh National Archives,* Bundle-6, November, 1931, Proceedings No. 30

৪। "On this date (30.01.1931) when some of the constables attached to the Additional Police force at Ichhapura, P.S. Sherajdikhan were returnning, after their patrol, they overhead some people talking "The Police are dogs and these dogs have no rest. We shall teach them a good Lesson on when we get Swaraj."

Letter from D. Bhattacharji, S.D P.O., Munshiganj to A. Classels,

Commissoner of Dhaka, 21 February, 1931, Government of Bengal, *B-Proceddings, Police, Bangladesh National Archives*, Bundle-6, November 1931, Proceedings No. 53

৫। "The conclusion at which I have arrived are that it is impossible to fine the whole subdivision or to select any portions of it. The sections of populace responsible cannot be defined. At best one, can only say that those responsible were local 'Congress' people working in secret, irresponsible youth influenced by 'Congress' people either beloging to or coming from outside the subdivision, the bad characters committing dacoities largely on account of their being more than usually hard up. I find it impossible either to tax the general public for this or to get at with strict justice those sections who were responsible."

Letter from Subdivisinal Officer of Munshiganj to the Commissioner of Dhaka, 16 January, 1931, Government of Bengal *B-Proceedings, Police, Bangladesh National Archives*, Bundle-6, November, 1931, Proceedings No 41.

৬। ঢাকা প্রকাশ, ৯ নভেম্বর, ১৯৩০।

৭। The Condition of the Munshiganj Subdivision has become extremely dangerous and disturbed. Everything, is done according to the will of the masters. When they have considered the upper class Hindus responsible for this they will raise the expenses from them. But why have 100 ex-sepoys been imported for this purpose from the North West frontiers? Will they help in the realisation of additinal taxes or will they simply be parading through the whole sub-division." *The Voteranga* (Calcutta), 29 November, 1930.

৮। The broad principal has already been laid down that the tax will imposed upon the upper class Hindus who alone, in the eyes of the secretariat, are showing active sympathy for the Civil Disobedience Movement. The Mohamendans, the officials of Government and members of the Union Boards will of course be excluded from the category of the tax-paying fraternitiy. The step taken recalls the

picture of Bardoili and the dark days of the anti-partition Movement in Bengal when large tracts were put under active scige of the armed Police and the military and lives and limbs of men and women placed at the mercy of the guardians of law and order." *Advance* (Calcutta) 30 November, 1930.

৯। "In the unregnorate days of Mr. Ramsay MacDonald, he uttered valuable turth about the fate of the policy of repression. 'The power and Policy of repression, be observed. 'do never make for tranquility but for further repression which only worsens the situation. 'How one wishes that in the interest of his own country more than anything else the labour Premier had not clean forgotten it and contenanced, if not himself initiated, the present repressive measure in dealing with the Indian situation. "*The Amrita Bazar Patrika* (Calcutta), 29 December, 1930.

১০। ঢাকা প্রকাশ, ৭ আগস্ট, ২৯ আগষ্ট, ১৯৩২।

লবণ সত্যাগ্রহে বারুইপুর-সোনারপুর

পুষ্পরঞ্জন সরকার

পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলা বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন হওয়ার বিশেষ ভৌগোলিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে হুগলী নদীর মোহনা অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার মধ্য দিয়ে সমুদ্র পথে বহির্ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

বাংলায় ইংরেজ বণিকদের প্রবেশদ্বার চব্বিশ পরগণা। ইংরেজদের সহায়তায় বাংলার নবাব হন মীর জাফর। সেই সুবাদে সুচতুর ইংরেজরা চব্বিশ পরগণার অধিকার আদায় করেন। এদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নির্মিত কলকাতা দ্রুত নগরায়ণে এগিয়ে চলেছে। সৈনিক ব্যারাক ফোর্ট উইলিয়ম, ইংরেজ পরিবার চাঁদপাল ঘাটে অবতরণ করে এসপ্লানেড, চৌরঙ্গী ধরে ইংরেজ কলোনি পার্ক স্ট্রীট, পার্ক সার্কাস-এ চলে আসত। ডালহৌসী অঞ্চলে গড়ে উঠল ইউরোপীয় বণিকদের বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত হুগলী নদীর তীরে তৈরি হল রপ্তানিজাত বস্তুর একাধিক গুদাম। ইংরেজ কলোনির জায়গা ছড়িয়ে উত্তরে মত দক্ষিণ কলকাতায় গড়ে উঠল নতুন নতুন বাঙালি জনবসতি। কলকাতা গোবিন্দপুর ও সূতানুটিতে প্রাচীন বাঙালি কৃষক, ধীবর বসতি থাকলেও চাকুরি সন্ধানে ও শহুরে আবহাওয়ায় থাকার জন্য পাশ্ববর্তী-বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি থেকে অনেকেই শহর কলকাতায় চলে এসেছেন। ভবানীপুর, আলিপুর, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর, বেহালা অঞ্চলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অনেকেই বসতি স্থাপন করেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে শোষণের ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত করেছে। বাণিজ্যিক স্বার্থেই তারা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করে। তৈরি হয়েছে বাঙালি বাবু সম্প্রদায়। চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত, এদের অনেকেরই আদিবাস ছিল কলকাতার নিকটবর্তী গ্রাম অঞ্চলে কলকাতার নিকটবর্তী বারুইপুর ও সোনারপুর এরকমই দুটি অঞ্চল বিশেষ।

কলকাতা শুধু বাংলার নয় ভারতের রেনেসাঁর-পীঠস্থান। কলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সমাজ সংস্কারও পুরোমাত্রায় আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের একাংশ ইংরেজদের মহিমাকীর্তন করে সরকারি খেতাব ও পদলাভে লালায়িত ছিল। অন্য অংশে পরাধীনতার গ্লানি প্রবেশ করেছে। সমাজ সংস্কারের ঢেউ কলকাতা ছাড়িয়ে অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বারুইপর, সোনারপরেও প্রবেশ করেছে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের

উদারনৈতিক চিন্তাধারা এসব অঞ্চলে শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারে আবদ্ধ না থেকে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ ঘটিয়েছে। বারুইপুর, সোনারপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীলচাষ শুরু হয়েছিল।[১] নীলকরদের সঙ্গে এসেছিল ধর্মান্তর করণে ব্যগ্র উগ্র খ্রিস্টান মিশনারি সম্প্রদায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে নীলকরদের তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের সাধারণ কৃষকদের অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। বারুইপুর ছিল লবণ তৈরির এক বড় কেন্দ্র।[২]

চলে আসি বারুইপুর, সোনারপুরের সাধারণ পরিবেশে, গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এ অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের একাংশ। এ অঞ্চলে কৃষির সঙ্গে মৎসচাষও অন্যতম জীবিকা। অসংখ্য খাল-বিল, ভেড়ি, কৃষক ও ধীবরদেরই সংখ্যাধিক্য। বাগদি, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, দলুই সম্প্রদায়। তথাকথিত সামাজিক মানদণ্ডে এরা অবহেলিত। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ হেতু রয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তাদের শিক্ষা ও বেকারিত্ব তাদের কাছে ইংরেজ অপশাসনের উন্মোচন করেছিল।

প্রসঙ্গ লবণ উৎপাদন। চবিশ গরগণার সমুদ্র উপকূল লবণ তৈরির এক আদর্শ স্থান।[৩] প্রাচীনকাল থেকেই। মধ্যযুগেও এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। দেওয়ানি লাভের পরে ইংরেজ বণিকেরা ব্যাপকভাবে লবণ কারবার শুরু করেন।[৪] সমুদ্র উপকূলে লবণ তৈরির চার (উৎপাদন কেন্দ্র) গড়ে উঠল। অন্ধ্রের 'মলুঙ্গী' নামক দক্ষ লবণ শ্রমিকদের এখানে নিয়ে আসা হয়। এছাড়া সাঁওতাল পরগণার পরিশ্রমী লোধা সাঁওতাল প্রভৃতি অদক্ষ লবণ শ্রমিকদেরও এখানে নিয়ে আসা হয়। কালক্রমে সমস্ত লবণ শ্রমিকরাই মলুঙ্গী নামে পরিচিত হয়। তাদের বেতন ছিল নামমাত্র। মরসুমে কাজ করতো ২৩ দিন রাত্রি। পড়ে থাকত লোকালয় থেকে দূরে নির্জন সমুদ্র উপকূলে। অহরহ অত্যাচারিত লবণ গোমস্তাদের হাতে দুর্বিসহ জীবন।[৫] মরসুমে প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং মরসুম শেষে বাড়ি ফিরে গেলে স্বল্প কয়েকদিনের মধ্যেই স্বল্প সঞ্চয় নিঃশেষ। প্রচণ্ড অভাব, সবকিছু মিলিয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে এদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারতে লবণ উৎপাদন বন্ধ হলে এদের মরসুমী (অস্থায়ী) চাকুরিও বন্ধ হলো। এদের অনেকেই রয়ে গেল সুন্দরবনে।[৬] বনাঞ্চলের জঙ্গল পরিস্কার করে তারা জমিদার-এর অধীনে চাষবাস শুরু করল। অনেকেই সুন্দরবনের নদী-নালা প্রচুর মাছ ধরার সুযোগ থাকায় ধীবর বৃত্তি গ্রহণ করল। কিছু মলুঙ্গী নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত লবণ উৎপাদন ও বিক্রয় শুরু করল। সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বারুইপুর ও সোনারপুরের অধিবাসী কৃষক, শ্রমিকের একাংশ এই মলুঙ্গী (লবণ শ্রমিক) দের বংশধর।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দ্রুত জাতীয়তাবাদের সহায়ক হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। বারুইপুর-

সোনারপুরের মধ্যবিত্ত, কৃষক, ধীবররাও এসব নিয়ে আলোচনা করতেন।

ফরাসি, ওয়াহরি বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহও এদের প্রভাবিত করেছিল। তথাকথিত 'এলিট' সমাজ স্বাধীনতা। আন্দোলন থেকে এদের দূরে সরিয়ে রাখলেও এদের স্পর্শকাতর মনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এক সুতীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এদের অনুভূতি পরিপক্কতা লাভ করল অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০)।

গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহ (১৯৩০)এর আহ্বানে এই অঞ্চলের অধিবাসীরাও এগিয়ে আসেন। এই অঞ্চলের খাল-বিলের নোনা জল থেকে লবণ তৈরির সুযোগ থাকায় লবণ সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষভাবে এদের ব্রিটিশ বিরোধিতার সুযোগ সৃষ্টি করে। রাজপুর, হরিণাভি, জয়নগর, বারুইপুর, সোনারপুর, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা, মথুরাপুর অঞ্চলের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহ তথা আইন অমান্য আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আর্থিকভাবে বিপন্ন এই গ্রামীণ সমাজে দ্রুত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রবেশ করে। লবণ আন্দোলনের সময়ে তা' এক ব্যাপক রূপ নেয়।

শহরবিভিত্তিক আন্দোলন গ্রামভিত্তিক আন্দোলনে পরিপূর্ণতা লাভ করে। গ্রামের চাষি, ধীবরদের লবণ সত্যাগ্রহ অংশ গ্রহণ নিশ্চয়ই গান্ধীজির লবণ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। গ্রামে গ্রামে গণসংগঠন গড়ে ওঠে।

বারুইপুর-সোনারপুরে লবণ আন্দোলনের শুরু হওয়ার দু'টি মুখ্য কারণ হল ঃ

১) এই অঞ্চলের ভেড়ি, খাল-বিলের নোনা (Salty) জল থেকে লবণ তৈরি করার সহজ সুযোগ।

২) এই অঞ্চল কলকাতার নিকটবর্তী হওয়ায় কলকাতার কংগ্রেসসেবীদের এখানে বে আইনীলব৭ তৈরি করতে আকর্ষণ করে।

ব্রিটিশ আই৻ে দেশীয় প্রথাতেও লবণ তৈরি করা ও বিক্রয় করা বন্ধ হলে, গরিব মানুষ আবার কর্মহীন হল। গরিব মানুষের ইংরেজ বিরোধী ক্ষোভ বৃদ্ধি পেল। তারা সরকারের বিরুদ্ধে র৻ে দাড়ালেন, গান্ধীজি সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য জানালেন, গরিব-মারা লবণ আইন চলবে না। তাঁর লবণ আইনভঙ্গে ডাক ছিল ১২ই মার্চ, ১৯৩০। লবণ আইনভঙ্গের জন্য তিনি ৫ই এপ্রিল ডাণ্ডির সমুদ্র উপকূলে পৌছান। সারা দেশেই এই আইনভঙ্গ শুরু হল।

লবণ আইনভঙ্গ দক্ষিণ চবিশ পরগণা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কালিকাপুর, মগরা হাট, নীলা, ডায়মণ্ডহারবার, কুলপি, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, সাগর প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ছিল দক্ষিণ চবিশ পরগণার এই আইনভঙ্গের বিশেষ কেন্দ্র।[৯] যথারীতি

বারুইপুর ও সোনারপুর (ডিহি) লবণ আইন ভঙ্গে সামিল হয়। স্থানীয় কিছু পত্র-পত্রিকা যথাক্রমে বিশ্ব (রাজপুর, ১৯২২) জাগরণ (হরিণাভি, ১৯২৪), বেপরোয়া হরিণাভি, ১৯২৬) প্রভৃতি আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করেছিল। এই পত্র-পত্রিকাগুলি এই সকল অঞ্চলের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রামাণিক দলিল।

বারুইপুর সোনারপুরের পিছিয়ে পড়া মানুষের বিরাট এক অংশ লবণ আইনভঙ্গে এগিয়ে আসেন। এদের অনেকেই ছিলেন মলুঙ্গীদের (নুনমারা) বংশধর।[১০]

বারুইপুর-সোনারপুরে খালের কাদাজল ফিল্টার করে বড় পাত্রে জাল দেওয়া হত। প্রথম দিনেই (৭ই এপ্রিল) বিপুল উদ্দীপনা দেখা গেল।[১১] শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণের মাধ্যমে বে-আইনি লবণ তৈরি শুরু হল। যথারীতি আরম্ভ হল পুলিশী অত্যাচার। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা ছিলেন অকুতোভয়। কিশোর, মহিলারাও এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন না। লবণ ক্যাম্পগুলি সকলের কাছেই হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়।[১২] ২৪শে এপ্রিল নীলা ক্যাম্পে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। নিহত হল কাঁকজোল গ্রামের কিশোর আশুতোষ দলুই। বাংলায় লবণ আইনভঙ্গে প্রথম শহীদ।[১৩] গুলিতে অনেকেই আহত হন। মেহের আলি শেখের দুটি পা কেটে বাদ দিতে হয়।

বারুইপুরে লবণ আইনভঙ্গে যারা গ্রেপ্তার বরণ করেন, তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন প্রফেসর রাসবিহারী চ্যাটার্জী, সতীশ দে ও তুলসী পাল। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মামুদপুরবাসী বঙ্কিম বৈদ্য, সতীশ সাঁফুই, নিহাটার বিষ্ণুপদ নস্কর, কল্যাণপুরের অনুকূল চন্দ্র মণ্ডল, টংলার ললিতমোহন সিংহ ও মাহীনগরের তুলসী পালের নাম বিশেষ উল্লেখ্য।[১৪]

সোনারপুর (ডিহি) অঞ্চলের প্রধান নেতা ছিলেন জিতেন মিস্ত্রী। অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের মধ্যে কুলবেড়ের রামহরি চাকী, গণেশ মণ্ডল, ঝাড়ুদার বুদ্ধিশ্বর মণ্ডল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।[১৫]

আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ভবানীপুর খিদিরপুর অঞ্চলে সত্যাগ্রহীরা ছোট ছোট প্যাকেটে সকল স্থানের উৎপাদিত লবণ বিক্রয় করতেন।[১৬] নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এলগিন রোডের বাড়িটি ছিল এই আইন অমান্য আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবীদের দক্ষিণ কলকাতার প্রধান কেন্দ্র। এখানে এই লবণ মজুত হত। কলকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে লবণ সত্যাগ্রহ তথা আইন অমান্য আন্দোলন এক বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। বাংলায় লবণ সত্যাগ্রহে মেদিনীপুরের অবদানও বার বার উচ্চারিত হয়েছে। উল্লেখ নেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর, সোনারপুরের

অবদান। এ অঞ্চলের দরিদ্র গ্রামবাসীরা যে সর্বতোভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, সেটা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, *দক্ষিণ চবিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়,* কলকাতা, ১৯৯৯; ১২৩ পৃ:

২। ঐ ১২৩ পৃ:

৩। S. C. Agarwal, *The Salt Industry in India;* Delhi, Ministry of Production. P-32

৪। Balai Barui, *The Salt Industry of Bengal,* Calcutta, 1985; P-9

৫। A M Serajuddin, The Condition of the salt Manufacturers of Bengal under the Rule of 'East-India Company' *(Journal of the Asiatic Soceity of Bangladesh)* Vol XVIII no. 1; Dacca April, 1973. P-6

৬। মনোরঞ্জন রায়, *পরায়ত্ত পরগণা কথা,* ১মখণ্ড; কলিকাতা, ১৯৯০; ১০৮ পৃ:

৭। পুষ্পরঞ্জন সরকার, 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে চব্বিশ পরগণার লবণ শ্রমিক' (১৭৬৫-১৮০০) *ইতিহাস অনুসন্ধান ১৫,* কলকাতা, ২০০১; ৩৪৮ পৃ:

৮। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, *দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়;* কলকাতা, ১৯৯৯; ১৩২ পৃ:

৯। *The Liberty,* April 9-11, 1930 P-6-10

১০। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, *দক্ষিণ চবিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়;* ১৩২ পৃ.:

১১। *The Mussalman,* April, 12-13, 1930;7-9P.

১২। *The Liberty,* 8 April 1930; 3P.

১৩। *The Liberty,* 23 April, 1930 5P.

১৪। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, *দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়;* ১৩৩ পৃ.:

১৫। ঐ ১৩৩ পৃ.

এছাড়াও সার্বিকভাবে —

১৬। R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India,* Vol. III

১৭। *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা,* প: ব: সরকার।

১৮। ভূপেশচন্দ্র প্রামাণিক, *লবণ হ্রদের উপকথা।*

১৯। বসন্তকুমার মণ্ডল, *অগ্নিগর্ভ মহিষ বাথান।*

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার

প্রদ্যোত কুমার মাইতি

ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনাধীন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় অধ্যায়ে যে তিনটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংঘটিত হয়েছিল সেই তিনটি আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীর ভূমিকার তুলনামূলক মূল্যায়ন বর্তমান নিবন্ধে করা হবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুর কিভাবে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকার দাবি করতে পারে তা আমরা বিচার করে দেখব।

অসহযোগ আন্দোলনের (১লা আগষ্ট, ১৯২০ ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১১/২২) কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলাতে যে ব্যাপক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব ঘটেছিল তেমনটি অবিভক্ত বাংলার অন্য কোথাও শুধু নয়, ভারতের অন্য কোথাও ঘটেছিল এমন তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। গান্ধীজির আহ্বানে যারা ভারতব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে মেদিনীপুরবাসী যে অনবদ্য ও অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলো তা জানা যায়।[১] এ ক্ষেত্রে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মূখ্য ভূমিকা ছিল।[২] আরও জানা যায় কংগ্রেসের অসহযোগের বাণী মেদিনীপুরে তিনিই বহন করে নিয়ে থাকেন।[৩] কংগ্রেস জেলা কমিটির সভাপতি রূপে তিনি বিশেষভাবে জেলাবাসীর কাছে কংগ্রেসের অহিংস আদর্শ ও নীতির কথা ঘোষণা করেন এবং সব রকম বিদেশী জিনিস বর্জন করে দেশে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার এবং দেশীয় জিনিস উৎপাদনের দিকে জোর দিতে ঐকান্তিক আহ্বান জানান। তাছাড়া মহকুমা ও থানা কংগ্রেসের সংগে নেতারাও অসহযোগের কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানান। ফলে কলেজ, স্কুল, ও আদালত ছেড়ে দলে দলে ছাত্র, শিক্ষক ও আইনজীবীরা আন্দোলনে অংশ নেন।[৪] আবার জেলার কংগ্রেস নেতাদের প্রধান অবলম্বন ছিলেন অসহযোগী ছাত্রসমাজ।[৫]

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত বর্জনের পাশাপাশি জেলায় নিজস্ব প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে উঠল। ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বা আন্দোলনের সহানুভূতিশীল ছাত্ররা যাতে করে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে সেই উদ্দেশে দেশে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস কর্মীরা উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। মেদিনীপুর জেলায় এমন ১২টি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং এই সব বিদ্যালয়গুলির মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে ছাত্রদের গড়ে

তোলা। পঠন পাঠনের সংগে সংগে চরিত্রগঠন, স্বাবলম্বনের শিক্ষা, গ্রাম সংগঠন, সমাজ সংস্কার ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের শিক্ষা এই মত বিদ্যালয়ে দেওয়া হত। এছাড়া বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচির মধ্যে ছিল চরকায় সূতা কাটা, পাঁজ তৈরি, গ্রামে গ্রামে চরকা প্রচার, খদ্দর ব্যবহার ও প্রচার ইত্যাদি।[৬]

সরকার পরিচালিত আদালত বর্জনের কর্মসূচিকে কার্যকরী করার উদ্দেশে কংগ্রেস পরিচালিত সালিশের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা চালু হয়। এর ফলে মেদিনীপুর জেলার প্রতি থানাতে একাধিক সালিশ আদালত গড়ে ওঠে। স্থানীয় গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে সালিশ আদালতের কার্যালয় স্থাপিত হয়। এরফলে সরকারি আদালতগুলি একপ্রকার অচল হয়ে যায়। অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার সবই আদালত বয়কট কর্মসূচি বিশেষভাবে সফল হয়েছিল।[৭]

মেদিনীপুরে অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য প্রসঙ্গে সরকারি রেজেস্ট্রী অফিসগুলির অচলাবস্থার কথাও স্মরণ করা যায়। এক্ষেত্রে কংগ্রেস কমিটির মধ্যস্থতায় পরস্পরের জমি ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে তমলুক মহকুমায় ময়না থানায় প্রায় পাঁচ বছরে (১৯২১-১৯২৫ খ্রিঃ) রেজেস্ট্রী অফিসে একটিও দলিল রেজেস্ট্রী হয়নি। এর ফলে সরকারি রেজেস্ট্রী অফিস বন্ধ থাকে।[৮] জন সমর্থনের এ এক বিরল দৃষ্টান্ত যা ঐ সময় অন্যত্র ঘটেছিল বলে জানা যায় না।

অসহযোগ কর্মসূচির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে গ্রামবাসীদের সংগে কংগ্রেস কর্মীদের এক সৌহার্দপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মূল্যবান উপাদানে পরিণত হয়। এমনকি এখানকার জনগণ অসহযোগ কর্মপন্থার মধ্যে তাঁদের সংগ্রামী মনের উপযোগী চিন্তা ও কর্মের খোরাক খুঁজে পেতে থাকেন।[৯] তাই ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে মেদিনীপুরবাসী — কি নারী, কি পুরুষ — এক ব্যতিক্রমী — ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন।

মোটকথা অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর যেভাবে কর্মচঞ্চল ছিল এবং অসহযোগ কর্মসূচিগুলিকে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করেছিল তা ভারতের অন্যত্র অনুসৃত হয়েছিল এমন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান আজও মেলেনি।

এছাড়া মেদিনীপুরবাসী ঐ সময় বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন তথা চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে (১৯২১ খ্রিঃ) যেভাবে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।[১০] ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভারতের অন্য যেকোনো অঞ্চলের জনগণের থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়েছিলেন। তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর Indian Struggle পুস্তকে লিখেছেন ঃ The succes of 'No-tax' campaign gained considerable strength and self-confidence to the people of Midnapore

and popularity to the leader Mr. B. N. Sasmal''.[১১]

আইন অমান্য বিশেষ করে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মেদিনপুরবাসী এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়। গান্ধীজির উপরে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব পড়লে তিনি প্রথমে লবণ আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথম থেকেই আন্দোলনকে গণমুখী করতে চেয়েছিলেন।

আন্দোলন শুরুর পূর্বে গান্ধীজির সংগে দেখা করে সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী জেলা মেদিনীপুরবাসী লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু করে দেন। গান্ধীজির অনুমোদন তাঁদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। জেলা, মহকুমা ও থানা স্তরে আইন অমান্য সমিতি বা পরিষদ গঠিত হয়।[১২]

এদিকে গান্ধীজি ১৯৩০ এর ১২ই মার্চ ৭৮ জন আশ্রমবাসীকে সংগে নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে ২৪ দিন পরে ডান্ডিতে উপস্থিত হয়ে ৬ই এপ্রিল সমুদ্রতীরে লবণ তৈরি করে লবণ আইন ভঙ্গ করলে আইন অমান্যের আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ভারতের বহুস্থানের ন্যায় মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় ঐ দিন লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন অত্যন্ত উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায়। কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় যথাক্রমে ৫৬ ও ৩০টি লবণ উৎপাদন কেন্দ্র ও সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হয়েছিল।[১৩] ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জে একটি উল্লেখযোগ্য লবণ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ৭ই এপ্রিল থেকে এই কেন্দ্রে লবণ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়।[১৪] কাঁথি ও অবিভক্ত তমলুক মহাকুমার যথাক্রমে পিছাবনী ও নরঘাট প্রধান লবণ উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভারতে অবাক লাগে প্রায় দেড় হাজার নারী পুরুষ ৬ই এপ্রিলের পূর্বে তমলুকে সত্যাগ্রহী হওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন।[১৫] পরে পরে তালিকাভুক্ত হয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৫ হাজার।[১৬] এমন উদ্দীপনার কথা ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল তা শোনা যায় না।

সরকারি দমন পীড়ন সত্যাগ্রহী নারী পুরুষদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখতে পারে নি। সরকারি প্রতিবেদন ও সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় এখানকার লবণ আইন অমান্যের তীব্রতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই আন্দোলন গণমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে জেলার কংগ্রেস সংগঠনের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। তাই বাংলা সরকারের সেক্রেটারী এইচ. ডব্লু. এমারসন। ১৬ই জুন, ১৯৩০ গভর্নরকে যে রিপোর্ট পাঠান তার অংশ বিশেষ হল : It is clear from the number of villages affected that the Congress Movement in this district had obtained a firm footing. As a result, the entire village population turned into Salt-Law breakers and

every house a Satyagraha Camp. This made the job of the police very difficult.[১৭]

সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বাংলার অন্যান্য জেলায় আইন অমান্য সংঘটিত হলেও মেদিনীপুরের ন্যায় তীব্রতা অন্য কোন জেলায় ঘটেনি।[১৮] এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যে অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়েছিল তা অকল্পনীয়। অত্যাচারের কাহিনী জেনে গান্ধীজি খুবই বিচলিত হন এবং নেহেরুকে লেখেন ঃ Measures in Midnapore have, however, dazed me. The measures appear to be worse than the panjub Massacares in 1919.''[১৯]

আবার ঐ সময়কার বাংলার অস্থায়ী গভর্নর মেদিনীপুরের এই আন্দোলনকে 'Practically a rising' বলে চিহ্নিত করেন।[২০] আরও লক্ষণীয় এই যে সমগ্র ভারতের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১২,২৫৬ জন কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তার মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই সংখ্যা হল ১৪২৬।[২১] এককথায় মেদিনীপুরের অধিবাসীরা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যথার্থ গণআন্দে'সনের মহিমা প্রকাশ করেছিলেন যা ভারতের অন্যত্র দেখা যায় না।

মেদিনীপুরে এই আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করে সরকার গ্রামাঞ্চলে পুলিশী অভিযান শুরু করে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গ্রামবাসীকে আন্দোলন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালান হয়। জেলা শাসক প্যাডীর নির্দেশে 'The mass scale atrocity and toture' শুরু হয় যা সমকালীন অমৃত বাজার পত্রিকা 'The Reign of Terror' সন্ত্রাসের রাজত্ব বলে চিহ্নিত করেছিল।[২২] ঐ সময় নারী ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনা যথেষ্ট ঘটেছিল। মেয়েদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হত। আসন্ন প্রসব মহিলারাও এই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি।[২৩]

লবণ সত্যাগ্রহ ছাড়াও ট্যাক্স- বন্ধ আন্দোলন শোভাযাত্রা, থানাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি আইন অমান্য কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রেও মেদিনীপুরের নারী পুরুষ বিশেষ তৎপর ছিলেন এবং এজন্য গুলিতে মৃত্যু বরণ থেকে শুরু করে দৈহিক অত্যাচার ও ভোগ করতে হয়েছিল। লুণ্ঠন ও গৃহে অগ্নিসংযোগ করে আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালান হয়! এখানকার আইন অমান্য বিশেষ করে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের গভীরতা ও তীব্রতার জন্য গান্ধীজি ও নেহরুজি জেলাবাসীকে যে অভিনন্দিত করেছিলেন তাও আমাদের অজানা নয়।[২৪] এই স্বীকৃতি মেদিনীপুরবাসীকে মহিমান্বিত করেছে। শুধু কি তাই? এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরবাসী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন।

১৯৪২ এর ভারতছাড়ো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জেলাবাসী শেষবারের মত তাঁদের স্বাধীনতা প্রিয়তার আকাঙ্খার তীব্রতা জানাতে ভোলেন নি। তৃণমূল স্তরে পৌঁছে সংগঠনকে দৃঢ় করে মেদিনীপুরের বিশেষ করে তমলুক ও কাঁথির, কংগ্রেস নেতারা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর জন্য তাঁরা কিছু সময় বেশি নিলেও আন্দোলনকে প্রকৃতপক্ষে গণ আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। এটি ছিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শেষ আন্দোলন যার চূড়ান্ত পরিণত হ'ল বিভিন্ন জায়গায় ইংরাজ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। এইসব জাতীয় সরকারগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশে বালিয়া (২০শে আগষ্ট, ১৯৪২ — ২২শে আগষ্ট, ১৯৪২), মহারাষ্ট্রের সাতারা (জুন, ১৯৪৩ —ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) এবং মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহাকুমার জাতীয় সরকারগুলি তাদের কর্মকান্ডের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। মেদিনীপুর জেলার চারটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১) খেজুরী থানায় (কাঁথি মহকুমা) (অক্টোবর, ১৯৪২—ডিসেম্বর, ১৯৪২), পটাশপুর থানায় (কাঁথি) (অক্টোবর,১৯৪২-ডিসেম্বর, ১৯৪২, ৩) মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র — তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ — ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪) এবং ৪) কাঁথি মহকুমায় স্বরাজ পঞ্চায়েত নামে জাতীয় সরকার (১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৩—ডিসেম্বর, ১৯৪৩)।[৭] এইসব জাতীয় সরকারগুলি জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে সমর্থ হয়েছিল।

এই সকল জাতীয় সরকারের মধ্যে নানা পাতিলের নেতৃত্বে সাতারার পত্রী (Patri) সরকার (স্থায়িত্ব ৩২ মাস) এবং তমলুকে অবস্থিত মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট — তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার (স্থায়িত্ব ২১ মাস) কেবল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণেও সফল হয়েছিল। উভয় সরকারের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল যেমন ১) জন সমর্থন পুষ্ট দীর্ঘস্থায়ী সরকার, ২) বিভিন্ন বিভাগে বিন্যস্ত সুষ্ঠ শাসক ব্যবস্থার প্রবর্তন। ৩) স্বেচ্ছাসেবকদের কৃচ্ছসাধন. ত্যাগ, সততা ও দক্ষতা সরকারকে দীর্ঘস্থায়ী করে উঠতে সহায়তা এবং ৪) সাতারা সরকারের ন্যায়দান মণ্ডল ও তাম্রলিপ্ত সরকারের বিচার বিভাগের জনপ্রিয়তা।

উভয় সরকারের বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে।

১) সাতারা সরকারের সূত্রপাত কেবল সাতারা জেলায় শুরু হলেও এর পরিধি পরে বেড়ে যায়। এর অধীনে আসে খান্দেশ, সোলাপুর ও পুনা জেলা। অপরদিকে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার অবিভক্ত তমলুক মহকুমার ৬টি থানার মধ্যে চারটি থানায় (তমলুক, মহিষাদল, সূতাহাটা ও নন্দীগ্রাম) সীমাবদ্ধ ছিল।

২) সাতারা সরকারের নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল; এমন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের ক্ষেত্রে ছিল না। এমনকি স্বেচ্ছাসেবকদের সাতারা সরকারের দ্বন্দ্ব

ছিল না।

৩) ছাত্রদের অংশ গ্রহণের পরিমাণ সাতারা সরকারের তুলনায় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অনেক বেশি ছিল।

৪) নারীদের অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রেও সাতারার জাতীয় সরকারের তুলনায় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার অনেক বেশি এগিয়েছিল। সাতারা সরকারের সংগে কয়েকজন মহিলামাত্র যুক্ত ছিলেন। এরা হলেন রাজমতী প্যাটেল, ইন্দুমতী নিকাম, লীলাবতী পাতিল প্রমুখ কয়েকজন মাত্র। অপরদিকে তমলুক মহকুমার মহিলারা নানাভাবে'৪২ এর আন্দোলনে তথা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারকে সাহায্য করেছিলেন যথা ক) সংগঠনের সংগে যুক্ত থেকে, খ) থানা, আইন-আদালত দখল অভিযানে অংশ নিয়ে, গ) 'ভগিনী সেনা' গঠন করে, ঘ) 'গরম দলে' অংশ নিয়ে ঙ) আন্দোলনকারীদের আহার, বাসস্থান ইত্যাদিতে সাহায্য করে এবং চ) স্বামীকে আন্দোলনে যোগদানে উৎসাহিত করে। এর ফলে নারীদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। ধর্ষিতা হয়েছিলেন ৭৩ জন; তার মধ্যে ১ জন মারা যান। আবার ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল ৩১ জনের উপর।[১৬] ৫) সাতারা পত্রী সবকার।[১৭] গান্ধীজির আবেদনে সাড়া না দিয়ে ১৩ই জুন, ১৯৪৬ পর্যন্ত সরকার চালিয়ে যান। অপরদিকে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৪৪এর ১লা সেপ্টেম্বর নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ৬) তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার সম্পর্কে সরকারি প্রশংসা পত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১৮] এমন প্রশংসাপত্র সাতারার সরকার সম্পর্কে করা হয় নি।

এই সব বিচার করলে ল ৪২ এর আন্দোলনের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে যে দুটি দীর্ঘস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারমধ্যে তমলুক মহকুমায় গড়ে ওঠা সরকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তাছাড়া এই আন্দোলনে উভয় স্থানের শহীদের সংখ্যা, নারী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের পরিমাণ, সরকার অত্যাচারের পরিমাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পত্রী সরকারের এলাকার তুলনায় তমলুক মহকুমায় তথা সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় অনেক বেশি ছিল।[১৯] সমগ্র ভারতে এই আন্দোলনে শহীদ হন ৯৪০ জন তার মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় ১৪০ জন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনটি পর্যায়ে মেদিনীপুর জেলাবাসীর ভূমিকার যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হল তার থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলাকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হিসাবে চিহ্নিত করা খুব অসঙ্গত হবে না। জেলা-ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি, নারী-পুরুষ শহীদের সংখ্যা, সরকারি অত্যাচার ও নির্যাতনের পরিমাণ, আন্দোলনগুলির তীব্রতা, ছাত্র-সমাজ ও মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, নারী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের সংখ্যা ইত্যাদি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের

যেকোন জেলার বা তমলুকের তুলনায় মেদিনীপুর জেলায় অধিক ছিল। এখানকার আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে যেসব কর্মপদ্ধতি ও ঐতিহ্য পশ্চাৎপট তৈরি করেছিল তাও এখানে উল্লেখ্য।

প্রথমত, এখানকার জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি সংগ্রামী ঐতিহ্য দীর্ঘকালব্যাপী প্রবহমান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাই এই জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বে বহু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এগুলি হল সন্ন্যাসী, চুয়াড়, মালঙ্গী, নায়েক, নীল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ। প্রসঙ্গত তমলুকে রানি কৃষ্ণপ্রিয়া (১৭৮২ খ্রিঃ) এবং কর্ণগড়ের রানি শিরোমণির ব্রিটিশ বিরোধিতার কথা স্মরণযোগ্য। এতগুলি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বোধকরি ভারতের অন্য কোন স্থানে — ভারতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বে সংঘটিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের গণসংযোগ পদ্ধতির স্বার্থক রূপায়ণের ফলে মেদিনীপুরবাসী অন্যান্য অঞ্চলের ভারতবাসীর তুলনায় অনেক বেশি অধিকার সচেতন ও আত্মপ্রত্যয়শীল হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয়ত, মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের আদর্শ, নিষ্ঠা, কলুষতাহীন সরল জীবন ও জনসেবায় উৎসর্গীকৃত মনোভাব জনগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তাঁদের আহ্বানে জনগণ সাড়া দিতে দ্বিধা করেন নি।

চতুর্থত, এই জেলায় কংগ্রেস সংগঠনের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির অনুসরণ এখানকার সব আন্দোলনের পথকে মসৃণ করে দিয়েছিল। "কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের" বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জেলার বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেস কমিটিগুলি অধিকতর শক্তিশালী, জনসাধারণের সংগে ঘনিষ্ঠতর যোগ সাধনে সক্ষম এবং কংগ্রেসের কর্মসূচিকে রূপায়ণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।[৩০]

পঞ্চমত, অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে জেলাবাসীর নারী পুরুষের সংগে কংগ্রেস সংগঠনের এখন নিবিড় যোগ সাধিত হয়েছিল যে জনগণ সুখে দুঃখে সব সময় কংগ্রেস কর্মীদের সংগে যোগাযোগ করতেন। বিশেষ করে কাঁথি ও তমলুক মহকুমার গ্রামাঞ্চলে এটি বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল। "সরকারি প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা থেকে কংগ্রেসের কার্যক্রমের ওপর লোকের ভরসা ও বিশ্বাস ছিল অনেক বেশি।"[৩১]

ষষ্ঠত, মেদিনীপুর গান্ধীজি, নেতাজী প্রমুখ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের বারবার আগমণ জেলাবাসীকে কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচি রূপায়ণে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। কংগ্রেসের অসহযোগ কর্মধারায় মধ্যে চরকা ও খদ্দর প্রচলন, সালিশ মীমাংসা, আবশ্যাতা বর্জন, জাতীয় শিক্ষা প্রচলন ইত্যাদি বহুবিধ গঠনমূলক কাজের যে নির্দেশ

ছিল তা এই জেলার কর্মীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে পালন করায় জনসংযোগ ও গণচেতনা যথেষ্ট বাড়ে। অসহযোগ আন্দোলনের সূত্র ধরে অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় মেদিনীপুর জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রচেষ্টা তীব্র হয়ে ওঠে এবং ১২টি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এতগুলি বিদ্যালয় অন্য কোন জেলায় স্থাপনের কথা শোনা যায় না। এখানকার এক একটি বিদ্যালয় হয়ে ওঠে জাতীয়তা উন্মেষের ও জাতীয়তাবাদ প্রচারের এক একটি সুদৃঢ় দুর্গ।[৩২]

সপ্তমত, মেদিনীপুর হল সাহিত্য প্রধান জেলা এই সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রবোধ ও একতা ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই সম্প্রদায়ের অনন্য ভূমিকায় কথা ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষ করেছে। ব্রিটিশ সরকারের নথিতে উল্লেখ রয়েছে....the bulk of the population was Mahishyas, a caste of particular solidarity with a lang record of hostility towards the government.''[৩৩]

এইভাবে মেদিনীপুরবাসীর সংগ্রামী মনোভাব দৃঢ়তর হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সবকটি পর্যায়ে তারা ভারত র্বে শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকা পালন করেন।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। গোস্বামী, গোপীনন্দন, বাংলার হলদিঘাট তমলুক, পৃ. ১৩-১৭; দাস, বসন্তকুমার, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর ১ম খণ্ড, পৃ ২৯৯-৩৩০।

২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ইতিহাস অনুসন্ধান-১৩, পৃ. ৪৩৬-৪৩৮

৩। ব্রহ্মচারী, বঙ্কিম, মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী, ১ম খণ্ড, সূতাহাটা, পৃ. ৩৪

৫। তদেব, পৃ. ২৬০

৬। ব্রহ্মচারী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৮; দাস, প্রা গুক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩

৭। দাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪-৩২৭; চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮২

৮। মাইতি, হরিপদ, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ময়না থানা, পৃ. ৩৪

৯। পাল, প্রমথনাথ, দেশপ্রাণ, শাসমল, পৃ. ৪০-৬৯; শীট, বিমলকুমার "দেশপ্রাণ শাসমল ও কাঁথি ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন" ইতিহাস অনুসন্ধান — ৫, পৃ. ৪৩০-৪৩৯; মাইতি প্রদ্যোত কুমার, "মেদিনীপুরের জনজাগরণ ও গণ আন্দোলনের পথিকৃৎ বীরেন্দ্রনাথ ঃ একটি সমীক্ষা," ইতিহাস অনুসন্ধান-১৩, পৃ. ৪৩৫-৪৪২

১১। বসু, সুভাষচন্দ্র, ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পৃ. ৭৬

১২। মাইতি, প্রদ্যোত কুমার 'লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মেদিনীপুর', ইতিহাস অনুসন্ধান — ১১ পৃ. ৪৮৭

১৩। পাল, রীণা, উইমেন অব মিডনাপুর ইন দ্যা ফ্রিডাম মুভমেন্ট, পৃ. ৭ (ফুঠনোট)

১৪। ইতিহাস অনুসন্ধান — ১১, পৃ. ৪৮৭

১৫। দাস, প্রগুক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫

১৬। গোস্বামী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০

১৭। ফাইল নং ২৪৮/৩০, সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ডিসটার বেনসেস ইন দ্যা ডিসট্রিক্ট এবং মিডনাপুর, ন্যাশানাল আরকাইভস।

১৮। বেঙ্গল ফর্ট নাইটলি রিপোর্ট, ১৯৩০, স্টেট আরকাইভস; এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯৩১ এর জানুয়ারির প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে সমগ্র বাংলায় ১৪৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে দন্ডদান করা হয়। তার মধ্যে শুধু মেদিনীপুরের ছিল ৬৩ জন (দ্রষ্টব্য ফাইল নং ৬৪৮/৩১, ড্রাফট সামারি ফর দ্যা জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট ফর ১৯৩০-৩১, স্টেষ্ট আরকাইভস্)।

১৯। ফাইল নং ৫০/৩০/৩৪, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, পলিটিক্যাল সেকসনস্, ন্যাশানাল আরকাইভস্।

২০। চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ, লোকাল পলিটিকস এ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশানেলিজম্ মিডনাপুর ১৯১৯-৪৪, পৃ. ১০৪

২১। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৩১ (কলিকাতা)।

২২। তদেব, ১৮ই জুন, ১৯৩০

২৩। ইতিহাস অনুসন্ধান — ৮, পৃ. আ: ২৭০-২৮৩

২৪। মাইতি, প্রদ্যোত কুমার, বিয়াল্লিশের তমলুক ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার, পৃ.৬

২৫। পাল, রাসবিহারী ও মাইতি, হরিপদ, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৫-১৪২

২৬। মাইতি, প্রদ্যোত কুমার "বিয়াল্লিশের আন্দোলনে তমলুকের মহিলাদের ভূমিকা", ইতিহাস অনুসন্ধান — ৪, পৃ. ৫২১-৫৩১

২৭। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে সম্পাদিত "দ্যা ইন্ডিয়ান নেশন ইন ১৯৪২" পুস্তকের অন্যতম লেখিকা গেল ওমভেট, (Gail Omvedt) সাতারা পত্রী সরকার (Prati Sarkar) বলেছেন। অন্যদিকে ড.এ.বি. সিন্দে (A B. Shinde) তাঁর সুবৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ 'দ্যা প্যার‍্যালাল গভর্নমেন্ট অব সাতারা" তে পত্রী সরকার (Prati Sarkar) বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা তাই পত্রী সরকার (পৃঃ ২৬৮) কথাটি গ্রহণ করেছি। সাতারা ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের তুলনা করতে গিয়ে আমরা উভয় সরকারের উপর আজ অবধি প্রকাশিত পুস্তকগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

২৮। মাইতি, প্রদ্যোত কুমার "প্রসঙ্গঃ তমলুকের বিয়াল্লিশের আন্দোলন", ইতিহাস অনুসন্ধান — ৭, পৃ. ৪৬৩, ৪৬৪; সামন্ত, এম ও অন্যান্য, আগষ্ট রেভলিউশন এ্যান্ড টুয়ার্স ন্যাশানাল গভর্নমেন্ট ইন মিডনাপুর, পার্ট-ওয়ান (তমলুক), পৃ. ৩৫, ৩৯

২৯। ইতিহাস অনুসন্ধান — ৭, পৃ. ৪৬১-৪৬৯

৩০। দাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩৩০

৩১। সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, "জনগণ, কংগ্রেস ও গান্ধীজি", দেশ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা - ১৯৮৫, পৃ. ৪০

৩২। দাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩

৩৩। হোম (পল্), ফাইল ২৭৭/১৯৩৪, এস ৯-২১, পৃ. ২১

তমলুক মহকুমার খাজনা বন্ধ আন্দোলন একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান

শ্যামল বেরা

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার খাজনা বন্ধ আন্দোলন নিয়ে অনুসন্ধানমূলক কোন আলোচনা তেমন নেই। শুধু মেদিনীপুরই নয়, আমাদের বাংলার নানা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তমলুক মহকুমার খাজনা বন্ধ আন্দোলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমেই আমরা মহকুমাটির অবস্থান জেনে নিই—উত্তরে ঘাটাল মহকুমা, দক্ষিণে হলদিয়া মহকুমা, পূর্বে রূপনারায়ণ নদ এবং দক্ষিণ পশ্চিমে কাঁথি মহকুমা।

তমলুক মহকুমার ভূমিরূপ মূলতঃ নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত সমভূমি। একটু বিস্তৃত করে বললে দাঁড়ায় মহকুমাটির উত্তরাংশ মূলত প্রাচীন পলিদ্বারা এবং দক্ষিণাংশ নবীন পলি দ্বারা গঠিত। রূপনারায়ণ, হলদি ও কংসাবতী—এই তিনটি নদ-নদী তমলুক মহকুমাকে নানা দিক থেকে বৈচিত্র্যময় ও তাৎপর্যময় করে তুলেছে। ভূমিরূপ এবং নদ-নদীর উপস্থিতিটি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, এই ভূখন্ড কৃষিকাজের পক্ষে খুবই অনুকূল। বহু অতীত থেকেই কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে এই ভূখন্ডের জনজীবন আলোড়িত। যে ভূমিকে কেন্দ্র করে মহকুমার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সমাজ নিজেদের আবেগ আনন্দ ও সুখ-দুঃখ নিয়ে কালাতিপাত করতেন, সেই ভূমিকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে দেখা দিল নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি। সামন্তপ্রভু তথা জমিদারদের শোষণ শাসন যন্ত্রে পীড়িত হতে থাকলেন আমাদের কৃষক সমাজ। এই পীড়ন দমনের বিরুদ্ধে এলাকার কৃষক সমাজ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রতিরোধ, প্রতিবাদ এবং সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে খাজনাবন্ধ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করেছিলেন। আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল রচনা করা দরকার। আপাতত, প্রাথমিক অনুসন্ধানের দিকটি তুলে ধরা যাক।

তমলুক মহকুমার যে ১৩৪ টি মৌজায় খাজনা বন্ধ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল—খারুই-গঠরা অঞ্চল, নীলকণ্ঠা অঞ্চল, কলাগেছিয়া-পুতপুতিয়া অঞ্চল এবং মহিষাদল অঞ্চল। ক্ষেত্র সমীক্ষায় জানা গেছে—এক একটি অঞ্চলের খাজনা বন্ধ আন্দোলনের উৎস মুখ ছিল এক এক রকম। ভিন্ন ভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই মহকুমার খাজনা বন্ধ আন্দোলন বিশিষ্টতা পেয়েছে।

বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব বিষয়ক আইনে বলা হয়েছে— প্রজা তথা কৃষক যেমন জমিদারকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকবে, জমিদারকেও অনুরূপ প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনতে হবে এবং তার সমাধানের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। বঙ্গদেশের অন্যান্য জমিদারদের মত তমলুক মহকুমার জমিদারেরা শুধু খাজনা আদায় এবং খাজনা বৃদ্ধি করেই নিজেদের

সম্পদ তৃষ্ণা চরিতার্থ করতেন, কিন্তু প্রজাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পথঘাটের উন্নয়নের দিকে আদৌ আমল দিতেন না। এই অসংগতির ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজ এই আন্দোলনের সামিল হতে বাধ্য হন। এই আন্দোলনের নেপথ্য নায়ক ছিলেন—কমিউনিষ্ট পার্টির ভূপাল পান্ডা, আদিনাথ দাস, নৃপেন চক্রবর্তী (ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। ১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে এঁরা এলাকার কৃষক সমাজকে বৈপ্লবিক আদর্শে দীক্ষিত করেন। খাজনা বন্ধ আন্দোলনের মূলে কৃষকদের দাবি ছিল—

(১) অবিলম্বে খাজনার হার কমিয়ে আইন বাধ্যতামূলক করা।

(২) হাজাসুখার খাজনা ছাড় আইন বাধ্যতামূলক করা।

(৩) এক বিঘা পর্যন্ত বাস্তু ভিটায় খাজনা ছাড়ের যে বিধি ভূমিসংস্কার আইনে আছে, তা বিনা শর্তে কার্যকর করা।

(৪) নিলাম ও খাস করা জমিতে প্রজাদের প্রজাসত্ব স্বীকার করা।

(৫) অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল—ফসল রক্ষার জন্য ভেড়ি বাঁধ, ঘেরী বাঁধ তৈরি করতে হবে, নিকাশী ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, এই সব দাবির ভিত্তিতে এলাকার কৃষকদের সংগ্রাম জমিদারবর্গ সহজে মেনে নেন নি। ফলে শুরু হয় জমিদারি সন্ত্রাস। স্বভাবতই, এ সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে কৃষকদের আন্দোলনকে অনেকবেশি জোরদার করতে হয়েছিল।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল তাঁর কৃষক সভার ইতিহাস গ্রন্থে এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'খাজনার দায়ে প্রজাদের জমি নিলামেরও আদেশ হয়েছিল বারবার, নিলামও হয়েছিল, কিন্তু কৃষকদের ঐক্য ও সংঘশক্তির জোরে কৃষকদেরই হাতে জমির দখল রাখা হয়েছিল। নানা রকম প্রলোভন ও পুলিশী সন্ত্রাস সত্ত্বেও তাদের দমন করতে পারা যায় নি।.....খাজনা বন্ধ ও অন্যান্য গণ আন্দোলনে বল্লুক গ্রামের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, তাই স্থানীয় লোকে তাকে আখ্যা দিয়ে ছিল বিদ্রোহী নগর।' এখন দেখা যাক, এক এক জায়গার আন্দোলনের উৎস-মুখ কেমন ছিল। প্রথমেই আসা যাক নীলকণ্ঠ্যা গ্রামের প্রসঙ্গ। এ অঞ্চলের আন্দোলনের মূলতঃ নেতা ছিলেন বিষ্ণুপদ বাগ (৭৪)। তিনি জানাচ্ছেন গ্রামে তখন মোড়লদের প্রতাপ। নানা সামাজিক বিধি নিষেধ। নিম্নবর্গের মানুষরা থাকতেন কোণঠাসা হয়ে। একদিন বিষ্ণুবাবুর পিতা নরেন্দ্রনাথ নিজের জমিতে লাঙ্গল করে ফিরছিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। নরেনবাবুর এক বন্ধু তার জমিতে লাঙ্গল করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে আর কাজ করতে পারছিলেন না। এমন সময় নরেনবাবু দয়া বশত তার কাজটি সম্পন্ন করে দেন। ঘটনাটি একজনের চোখে পড়তেই মোড়লদের কানে পৌঁছাতে বেশি দেরি হয় না। নরেন্দ্রনাথবাবু ছিলেন মাহিষ্য এবং বন্ধুটি ধীবর সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে, মোড়লদের বিচারে আদেশ হল—নরেন্দ্রনাথবাবুকে মাথা কামাতে হবে। তিন দিন ভাগবত পাঠ করতে হবে এবং বারো মালসা চিড়া ভোগ দিতে হবে। এই অবিচারের বিরুদ্ধে বিষ্ণুবাবু গর্জে উঠলেন এবং এলাকার সমস্ত নিম্নবর্গের মানুষদের একত্রিত করে সংগঠিত করলেন। এ সময়েই তারা খোঁজ পেলেন মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে রয়েছেন কমিউনিষ্ট

নেতা ভূপাল পান্ডা এবং নৃপেন চক্রবর্তী। তাদের কাছে গিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষদের অবর্ণনীয় শোষণ বঞ্চনা ও অত্যাচারের কথা জানালেন। পরের দিন এই নেতারা নীলকণ্ঠ্যা গ্রামের বারোয়ারি মাঠে এলেন কিন্তু মোড়লদের পরিকল্পিত সন্ত্রাসে তারা প্রচুর মার খেলেন, কিন্তু কেউ দমলেন না। এলাকার কৃষক সমাজ আরো বেশি সংগঠিত হয়ে মোড়ল ও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করলেন। এই প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ফল স্বরূপ দেখা দিল খাজনা বন্ধ আন্দোলন। এবং সেই সঙ্গে অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন। খাজনা বন্ধ আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

কলাগেছিয়া-পুতপুতিয়া অঞ্চলের খাজনা বন্ধ আন্দোলনের উৎসমুখ নীলকণ্ঠার মত নয়। দেশ তখন পরাধীন। ইংরেজ সরকারে অনুগ্রহ পুষ্ট জমিদার জোতদার ১৯৪১ সালে কৃষকদের উপর নানা কৌশলে শোষণ ও অত্যাচার শুরু করে। এ সময় পাটচাষিদের উপর আদেশ জারি হল — পাট চাষের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে এবং সরকারি অনুমোদন ছাড়া পাট চাষ চলবে না। এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে কৃষক সমাজ রুখে দাঁড়ান। পাশাপাশি, কৃষকদের দমন করার জন্য জমিদাদের গুণ্ডাবাহিনীও শুরু করল অমানুষিক অত্যাচার। এই পাট চাষ আন্দোলনই রূপ নিলো খাজনা বন্ধ আন্দোলনে। পরবর্তী পর্যায়ে এই আন্দোলনও তেভাগার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ১৯'৪৮ সালের ২৭শে নভেম্বর কমিউনিষ্ট পার্টির বেআইনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার নেতাদের বিনাবিচারে আটক করা শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে আন্দোলনও আরো বহুগুণ বর্ধিত হতে থাকে। খারুই-গঠরা অঞ্চলের খাজনা বন্ধ আন্দোলনের মূলে ছিল জমিদারি শোষণ ও বঞ্চনা। এ অঞ্চলের আন্দোলন প্রসঙ্গে শচীনন্দন রাউৎ বলেন ঃ "গঠরা মৌজার পোনান ছিল খাজনা বন্ধ আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। নেতা ছিলেন বংশীধর সামন্ত, সেখ জসীমউদ্দীন প্রমুখ। পূর্ববঙ্গের নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীরার জানকীনাথ রায়বাহাদুর ছিলেন এ অঞ্চলের জমিদার। জমিদারকে আমরা খাজনা দিই, খাজনার হার বাড়ে কিন্তু আমাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পথঘাটের কোন সুবিধা হয় না। বরং নানা জুলুম বাড়ে। তখন থেকেই শুরু হল জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম — তথা খাজনা বন্ধ আন্দোলন। আন্দোলনে এ অঞ্চলের মহিলাদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া আন্দোলন এতই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল সে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ রকম নজির খুব একটা নেই, যাইহোক ১৯৬২ সালে শ্যামাদাস ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ মুখার্জীর মধ্যস্থতার খাজনা বন্ধ আন্দোলন রহিত হয়। এতবড় আন্দোলনের অনুপুঙ্খ ইতিহাস আজও অলিখিত। এ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল রচনা করা দরকার।

পরিশেষে এ আন্দোলনের উৎসমুখ অন্বেষণে আর একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে চাই। প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকানোর প্রয়োজন হয়, তেমন ১৯৩৯ সালের বহু আগে ১৯১৭ সাল থেকেই যে কৃষকরা নিজেদেব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তার একটি পুরানো নথি বর্তমান প্রতিবেদক কর্তৃক সংগ্রহ করা গেছে।

মেদিনীপুরের অ্যাসিস্টান্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের কোর্ট, ক্যাম্প তমলুক-এ ২৭শে জুলাই ১৯১৮ সালে ২১৪ জন কৃষকের সঙ্গে স্থানীয় জমিদারের মামলার এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় — যে দশটি বিষয় নিয়ে কোর্টে মীমাংসা শুরু হয় -- তার মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল খাজনা বৃদ্ধি সংক্রান্ত। জমিদার নানা অছিলায় খাজনা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট, আর প্রজারা তথা কৃষকেরা সেখানে দেখাচ্ছেন তাদের নানা ক্ষতি স্বীকার করে অন্যায়ভাবে তারা কত বেশি খাজনা দিতে বাধ্য হচ্ছেনা যাইহোক, জমিদারদের অপকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। আজ উচ্ছেদ হয়েছে জমিদারি প্রথার। কিন্তু জন্ম নিয়েছে শোষণের নতুন কৌশল। তাই, এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিতে হয় — কিভাবে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। তবেই, খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সংগ্রামী কৃষককূলের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হবে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন - সতীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩১৭)
২। জমিদারি দর্পন - অন্নদাকুমার ঘোষ (১৩১৬)
৩। কৃষকসভার ইতিহাস--আবদুল্লাহ রসুল (১৩৭৬)

সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাসবিহারী মিশ্র

বিগত শতকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগণিত দেশপ্রেমিক মানুষ শ্যামলা বাংলা মায়ের কোল আলো করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের শুভ-সমাগমে উদ্ভাসিত হয়েছিল শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারত। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় মন্ত্র দেশবাসীর বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে গেছে। জাতীয় জীবনের চরম সংকটের দিনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি স্বাধীনতা আন্দোলনের দেশপ্রেমিকদের। মেদিনীপুরবাসীর অসীম সৌভাগ্য যে একজন দেশপ্রেমিক সত্যনিষ্ঠ মুক্তি সাধক অজাত শত্রু সতীশ চন্দ্র সামন্তের জন্মগ্রহণ আমাদের গৌরবের বিষয়। আজ শতবর্ষে গৌরবময় বীরচিত ইতিহাস সৃষ্টিকারী পরাধীন ভারতের বুকে জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্তকে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। ১৯৭০ সালে ১৫ই ডিসেম্বর সতীশ চন্দ্র সামন্তের ৭০ তম জন্মদিনে সর্বদলীয় রাজনৈতিক নেতারা সম্বর্ধনা জানালেন — সেই নীরব বিপ্লবী মানুষটিকে। জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন "সতীশবাবু রাজনৈতিকবিদ নন তিনি একজন মানুষ — এমন একজন মানুষ যাঁর মধ্যে সমস্ত মহৎ গুণগুলি বিদ্যমান" বিরোধীপক্ষের মণীষী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "রাজনীতিক্ষেত্রে অজাতশত্রু বলে যাদের মনে করা হয়, তাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য হলেন আমাদের সর্বজনপ্রিয় সতীশ চন্দ্র সামন্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ে মেদিনীপুর বাসীর সাহস, আর শৌর্য্য এবং সংগঠনশক্তি ইতিহাসে বন্দিত থাকবে। সেই ইতিহাসেরই এক প্রোজ্জল পরিচ্ছদ হল ১৯৪২-৪৪ এর "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সবকার" — যার সর্বাধিনায়ক রূপে সতীশ চন্দ্র সামন্ত দেশের গৌরব কিংবদন্তির অংশীভূত হয়ে রয়েছে। দেখলাম দেশের মানুষ সম্পর্কে তার মমতা, তাঁর বিনয়, তাঁর একান্তবোধ এমন মানুষ যেকোনো সময়ে বিরল"। স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিভক্ত তমলুক মহকুমা চিরদিন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, ডাঃ যাদুগোপাল, বাঘাযতীন এবং মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, তাঁদের কাজকর্ম্মের মধ্যে তমলুককে গৌরবের আসনে বসিয়েছেন। সেই তমলুকের খুব কাছে মহিষাদলের গোপালপুর গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯০০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সতীশচন্দ্র সামন্ত জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করে মহিষাদল রাজ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। তারপর বঙ্গবাসী কলেজ আই. এস. সি. পাশ করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ঐ সময় চরম বিপ্লবী প্রজ্ঞানানন্দজীকে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৬ সালে মহিষাদলে অন্তরীণ করেন। স্বামীজীর কাজে সতীশবাবু রাজনীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন — দেশের স্বাধীনতার জন্য সারাজীবন উৎসর্গ

করবেন এবং সারাজীবন অবিবাহিত থাকবেন।

গান্ধীজির আহ্বানে সতীশবাবু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজি ডান্ডি অভিযান সারাদেশে শুরু হলো লবণ সত্যাগ্রহ। হলদি নদীতীরে নরঘাটে হাজার হাজার অনুগামী মানুষের প্রচেষ্টায় অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করল — শ্রীমুখার্জীকে, বিচারে তাঁর দেড় বৎসর কারাদন্ড হল। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী হলেন সতীশ সামন্ত। গ্রেপ্তার হলেন এবং দু বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হলেন। ৯ই আগষ্ট — ১৯৪২ গান্ধীজি স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দিলেন। ইংরেজ তুমি "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"— এই মূলমন্ত্রে সারা ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনতা উদ্বেলিত। গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজিসহ বহু নেতৃবৃন্দ। সারা ভারতব্যাপী স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনতার উত্তাল আন্দোলনের পরিণতি — "আগষ্ট বিপ্লব"। বিপ্লবের পিঠস্থান মেদিনীপুর একটু থমকে দাঁড়াল। সতীশ সামন্ত ও অজয় মুখার্জী আত্মগোপন করে সংগঠনকে মজবুত করার মধ্যে সঠিক পরিকল্পনায় ব্রিটিশ সরকারকে চরম আঘাত হানার উদ্যোগী হলেন। জেলার কোথা থেকে শুরু হবে আন্দোলনের অগ্নিশিখা এই প্রশ্নের মাঝে হঠাৎ ৪২ এর ৮ই সেপ্টেম্বর স্বতঃস্ফূর্ত তমলুকের সন্নিকটে দনিপুরে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেলার প্রথম তিন শহীদের রক্তে প্রতিশোধের আগুন সারা দেশকে পথ দেখালেন,—তার পরিণতি "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।" ঘটনার কয়েক ঘণ্টার পর সতীশবাবু খবর পেয়ে আমাদেরকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানালেন। ২৯ শে সেপ্টেম্বর তমলুক ও কাঁথি মহকুমাকে মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার জন্য একসঙ্গে শুরু হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়। বহু শহীদের রক্তে মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য জীবনকে তুচ্ছ করে বহু শহীদের রক্তে মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠলো—তার পরিণতি "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৈন্য ও পুলিশের তান্ডব শুরু হয়ে গেল। জেলাব্যাপী লুণ্ঠন, অমানসিক অত্যাচার, পাইকারি হারে অগ্নিসংযোগ এবং নারী ধর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মনোবল খুন্ন হয়নি, ৪২ এর ১৬ই অক্টোবর অবিভক্ত তমলুক ও কাঁথি মহকুমার উপর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং ঘরবাড়ির ক্ষতি সত্ত্বেও মানুষের স্বাধীন হওয়ার মনোবল ভেঙ্গে পড়ল না। সেবা ও ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো সবাইকে, একদিকে সেবাকার্য অপরদিকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। ১৯৪২ এর ১৭ই ডিসেম্বর শুভ প্রতিষ্ঠা হলো "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার"। সুযোগ্য প্রথম সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হলেন সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়—অর্থমন্ত্রী, সুশীল কুমার ধাড়া— স্বরাষ্ট্র দপ্তর। প্রচার সচিব হলেন প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক। জাতীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য "পরামর্শ পরিষদ" গঠন করা হল।

আরও ঘোষণা করা হ'ল যে স্বেচ্ছাসেবক দল বিদ্যুৎ বাহিনীকে তাম্রলিপ্ত জাতীয়

সরকারের সৈন্যবাহিনী বলিয়া ঘোষণা করা হ'ল এবং প্রচার পত্রিকা 'বিপ্লবী' কে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপাত্র করা হয়। সীমিত ক্ষমতা ও অসীম ভালবাসা বুকে নিয়ে কর্মীদল, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষের সেবায় যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ঐ সময় কলিকাতার কয়েকটি বেসরকারি আর্তত্রাণ সংস্থা তমলুকের "মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি" কে বিধ্বংসী বন্যাকবলিত মানুষদের সাহায্যার্থে দানের হাত বাড়িয়ে দিলেন। পরে "মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি" জাতীয় সরকারের সহযোগীতায় খাদ্যসামগ্রী এবং মহামারি রোখার জন্য মেডিক্যাল ইউনিট প্রদান অসহায় মানুষের কাছে এক স্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় সরকার চলাকালীন সতীশ সামন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। গ্রেপ্তারের পর ব্রিটিশের আদালতে বিচার হল। আদালতে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী নায়ক সতীশচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"আমি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক, আমি সেই স্বাধীন "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের" সর্বাধিনায়ক। কাজেই এ আদালত— এ আইন আমি স্বীকার করি না।" সতীশবাবুর আদালতের রায়ে তিনবছর জেল হয়ে গেল। প্রথম সর্বাধিনায়ক দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং সমস্ত কংগ্রেস কর্মীকে আত্মপ্রকাশ করতে নির্দেশ দিলেন। একুশ মাসের "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের" সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে সকলেই গ্রেপ্তার বরণ করলেন এবং জাতীয় সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হল। সতীশ সামন্ত জেল থেকে মুক্তি পেলেন। "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের" হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের এই অভিযোগের ভিত্তিতে গান্ধীজি মেদিনীপুর আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গান্ধীজির আগমন উপলক্ষে সতীশ সামন্তকে সভাপতি করে এক অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হল। গান্ধীজি ১৯৪৪ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর মহিষাদল আগমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমস্ত অভিযোগ শুনে—গান্ধীজি আভা গান্ধী এবং ডাঃ সুশীলা নায়ারকে মাশুড়িয়া গ্রামে পাঠিয়ে ৪৯ জন ধর্ষিতা মহিলাদের সেই নৃশংস হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনলেন। গান্ধীজি শেষ রায় দিলেন জনতার দরবারে—"ব্রিটিশরা যা করেছে এখানে আমি হলে কি করতাম জানি না। তোমরা যা করেছ তা—বীরোচিত ও গৌরবময়।"

সতীশ সামন্তের—ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী জীবনের শেষ অধ্যায়—ইতিহাস চিরকাল সাক্ষ্য দেবে।

স্বাধীনোত্তর কালে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সতীশ চন্দ্র সামন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত হলেন। শুরু হল তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী (১৯৪৭-৭৬) সংসদীয় জীবন। লোকসভার মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অনাড়ম্বর সদস্য, তাঁর সাদাসিধে বেশভূষা, মার্জিত ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। গণপরিষদে তিনি এই মর্মে একপ্রস্তাব এনেছিলেন যে বাংলা ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

বাংলাভাষা একটি সমৃদ্ধশালী ভাষা এর ইতিহাস খুব প্রাচীন, এর সাহিত্য উৎকৃষ্ট এবং সুপ্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের নাম সকলের সুপরিচিত—কেবল ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই "বন্দেমাতরম্" গানটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এই

মন্ত্রের জন্য হাজার হাজার মানুষ আত্মদান করেছে। এই বলে আমার প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য পরিষদের সামনে রাখলাম। উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে—কলিকাতার জন্য একটি সহায়ক বন্দরের বিষয় নিয়ে সতীশ সামন্তের অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায় না থাকলে কোন দিন 'হলদিয়া বন্দর' হত না। তাই হলদিয়া বন্দরের জনক সতীশ চন্দ্র সামন্ত অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়-১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে সতীশ সামন্ত তাঁর প্রিয় শিষ্য সুশীল কুমার ধাড়ার নিকট পরাজিত হলেন। নির্বাচনে পরাজিত হয়েও সতীশ সামন্তের গৌরব ম্লান হয়নি। ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুন তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর এই জন্মশতবর্ষে পুনরায় আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে মর্যাদাসহকারে বাংলার সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন—হলদিয়া বন্দরের নাম রাখা হোক "সতীশ সামন্ত বন্দর"। তাঁর জীবন স্মৃতিকে স্মরণীয় রাখার জন্য এই প্রজন্মের কাছে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানাই।

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমায় বারম্বার।"

রবীন্দ্রনাথ

সূত্র নির্দেশ

(১) সর্বাধিনায়ক সতীশ সামন্ত—তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি
(২) আমাদের সতীশ দা—গোপীনন্দন গোস্বামী।

খড়রুই রাজবংশ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

জয়ন্ত দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার ২ নম্বর সমষ্টির অন্তর্গত তুরকা ৩নং অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত খড়রুইগড় বা বর্তমানের খড়রুই এক প্রাচীন রাজবংশের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। উক্ত রাজবংশ খড়রুই রাজবংশ বা খড়রুইগড় রাজবংশ নামে খ্যাত।

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চৌধুরী কৃষ্ণদাস গজেন্দ্র মহাপাত্র। তিনি উৎকলাধিপতি দেবরাজের সুযোগ্য এবং সুদক্ষ সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন। খড়রুই ছিল তৎকালীন সুবা উড়িষ্যা, সরকার জলেশ্বর এবং পরগণা তুরকাচৌরের মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র। এই তুরকাচৌরের বর্তমান নাম তুরকাগড় বা তুরকা। কোথাও কোথাও এই বংশের রাজাদের তুরকারাজ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। খড়রুই রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা কৃষ্ণদাসের আদিনিবাস ছিল উড়িষ্যার পুরীর নিকটবর্তী স্থানে। তুরকাচৌর পরগণাটি উড়িষ্যা রাজ্যের অধীনস্থ একটি করদ রাজ্য ছিল। ষোড়শ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত রাজ্যের শাসক ছিলেন তেলেঙ্গী দেশীয় এক রাজা। তিনি উৎকলাধিপতিকে নিয়মিত করপ্রদান করতেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি করপ্রদান বন্ধ করেন এবং উৎকলাধিপতির আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহী হন। উক্ত বিদ্রোহ দমনের প্রয়াসে তৎকালীন উৎকলাধিপতি দেবরাজ নিজ বিশ্বস্ত ও রণনিপুণ সেনাপতি চৌধুরী কৃষ্ণদাস গজেন্দ্র মহাপাত্রকে সসৈন্যে তথায় প্রেরণ করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে তেলেঙ্গী রাজকে পরাজিত করেন এবং বিদ্রোহের উপযুক্ত শাস্তি হিসেবে তাঁকে সবংশে নিধন করেন। উক্ত রাজ্য পুনরায় উৎকলাধিপতির করায়ত্ত হয়। পুরস্কারস্বরূপ পরে তিনি উক্ত রাজ্যের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি।

খড়রুইগড় রাজবংশ এভাবে উৎকলাধিপতি অধীনস্থ করদ রাজ্য হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেন। এই রাজবংশের রাজধানী ছিল খড়রুই। এখনও পরিখা, সিংহদ্বার, বিভিন্ন মন্দির এবং রাজবাড়ির কিয়দংশ বিদ্যমান। মন্দিরগুলিতে নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্গোৎসব, গাজন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তিতে রাজপ্রাঙ্গণে অদ্যাপি মেলা বসে এবং অনেক জনসমাগম হয়। রাজবংশধরগণ এতদুপলক্ষে খড়রুইতে উপস্থিত থাকেন। রাজবংশের উত্তরাধিকারীদের কেউ কেউ খড়রুইতে থাকেন, অন্যরা মেদিনীপুর শহরে বসবাস করেন। দীঘার সমুদ্রসন্নিকটস্থ অলঙ্কারপুর হতে উড়িষ্যার বালেশ্বর পর্যন্ত এই

রাজবংশের সীমানা বিস্তৃত ছিল। পাশ্ববর্তী অন্যান্য রাজন্যবর্গের তুলনায় খন্ডরুই রাজবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অনেক বেশি ছিল। সেজন্য তাঁরা এই বংশের রাজাদের সমীহ করে চলতেন এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বিশেষ উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও তাঁরা নিজ প্রজাদের ক্ষোভকে প্রশ্রয়দান না করে তার প্রমাণ রেখেছেন।

খন্ডরুইগড়ের রাজারা প্রজাহিতৈষী ছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হাটবাজার স্থাপন এবং দিঘি খনন করেছিলেন। গ্রন্থাগার নির্মাণ, নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা, অভিনয়, বাদ্যযন্ত্রের চর্চা, বিভিন্ন মণীষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভৃতি তাঁদের সাংস্কৃতিক দিক ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দেয়। নিজস্ব পশুশালাও ছিল। বিভিন্ন ধরণের পশুপাখি থাকত। কিন্তু সেখানে সবার প্রবেশাধিকার ছিল না। এই বংশের রাজারা সাহসী এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অতীব দক্ষ ছিলেন। নিয়মিত মৃগয়ায় যেতেন এবং ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি অনেক জন্তু এবং বিভিন্ন পাখিও শিকার করতেন। কেহ কেহ নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। পেশাদার হিন্দুস্থানি দারোয়ানকে পরাজিত করার অনন্য নজিরও বিদ্যমান। এবিষয়ে রাজা শরৎচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজাদের পশুশালায় ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, ময়ূর, পায়রা প্রভৃতি পশু-পাখি থাকত। পাহারাদারের সুব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন ধরণের বিদেশী পায়রা তাঁরা ক্রয় করতেন। রাজপুত্রদের শিক্ষা ও শরীরচর্চা এবং বিভিন্ন ধরণের ক্রিড়ার সুব্যবস্থা ছিল। রাজউদ্যানে বিভিন্ন স্থানের উন্নত ধরণের মূল্যবান বৃক্ষ ছিল। এখনো তার পরিচয় পাওয়া যায়।

নগদ অর্থে শুল্ক গ্রহণ করা হোত। শুল্ক অনাদায়ে সম্পত্তি অধিগৃহীত হোত। নগদ অর্থেই কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হোত। তবে বিভিন্ন পেশাজীবী কর্মচারীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূসম্পত্তি ও চাষযোগ্য জমিও প্রদান করা হয়েছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রভাতী ও সান্ধ্য নহবতের সুর খড়রুইগড়ের বাতাসে ভেসে বেড়াত। রাজবাটিতে অধিষ্ঠানকারী রাজকর্মচারীদের মাহিনা ব্যতীত খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। সম্পত্তি ও শুল্কবাবদ আয় থেকেই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হোত। ঘোড়া, হাতি ও পাল্কির প্রচলন ছিল। হাতির পিঠে করে মীরগোদা মহাল থেকে খাজনাবাবদ সংগৃহীত অর্থ খন্ডরুইতে আসত। সঙ্গে লাঠিয়ালরা থাকত। পুষ্করিণী খননের সময় তখন পারিশ্রমিক বাবদ কড়ি দিতেন। তখন ৫ কড়িতে ১ পয়সা হোত।

ভোগরাই, মীরগোদা, দেউলীহাট, অলঙ্কারপুর, মান্দার, কড় সোলেমানপুর, গঞ্জেরহাট প্রভৃতি ৫৩টি মৌজা ছিল। ১১টি মৌজার খাজনার টাকা তুরকাতে সংগৃহীত হোত। মীরগোদাতেও খাজনার টাকা সংগৃহীত হোত।

মহম্মদ শা গাজী বাহাদুর উমিদ জং তরফে সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ প্রদত্ত পারসি জামিননামা ও মুচলেকা নামা এবং হুকুমনামা বা সনদ অনুযায়ী চৌধুরী কৃষ্ণদাস গজেন্দ্র মহাপাত্রের মৃত্যুর পর উক্ত মৃতব্যক্তির পুত্র রাজবল্লভকে যেমন খেদমত খুদরায় (সংস্কার কার্যের জন্য) মীরগোদা মহালটিও অর্পিত হয়। ঐ মুচলেকটি ১৭ই মহরম সন ১৮ই

মোতাবেক ১১৪১ আসলি সনে লিখিত ও মোহরযুক্ত হয়। রাজা নলবিহারী ছিলেন রাজা কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রাজা রাজবল্লভ ছিলেন রাজা নলবিহারীর মধ্যম পুত্র।

রাজা কালীপ্রসন্নের প্রপৌত্র প্রবীরচন্দ্র যখন নাবালক তখন তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি নাবালক অবস্থায় রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেন। নাবালক রাজা প্রবীর সিংহের সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি এম.এ, বি.এল ছিলেন। ডেলভিন সাহেব ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্দেশ দেন প্রবীর সিংহকে রাজার দায়িত্ব পালন করার জন্য। প্রবীর রাজা ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুর শহরের কেবানিটোলার শেখপুরা মৌজায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে একটি সুদৃশ্য বাড়ি নির্মাণ করেন। এই বাড়িতে তাঁর পুত্রেরা বর্তমানে বসবাস করছেন। তাঁদের সন্তানসন্ততিরাও থাকেন।

ব্রিটিশ শাসনাধীন খড়্গরুই রাজবংশ ব্রিটিশের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশের সাথে এই রাজবংশের সুসম্পর্ক ছিল। এইজন্য ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র রাজা পঞ্চানন ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। এর ফলে ব্রিটিশের কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা পঞ্চাননের পুত্র রাজা কালীপ্রসন্ন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'দিল্লীদরবারে' প্রতিনিধিত্ব করেন। ব্রিটিশের সাথে সুসম্পর্ক হেতু এই বংশের রাজারা বিনা অনুমতিতে অস্ত্রশস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার ভোগ করতেন। রাজ্যের নিরাপত্তারক্ষার দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশের হাতে। অপরাধীদের আদালতে হাজির করা হোত। কালীপ্রসন্ন সিংহ গজেন্দ্র মহাপাত্র রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ঋষি অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর সমসাময়িক ছিলেন।

বেলদা থানার অন্তর্গত খাকুড়দার নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামনিবাসী 'অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু' হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর মাতা এই রাজপরিবারেই একজন রাজকন্যা। তিনি ছিলেন রাজা কালীপ্রসন্নের ভাগিনেয়, খালাসির ছদ্মবেশে হেমচন্দ্র জাহাজের ডেকে করে বোমা তৈরি শেখার জন্য ফ্রান্সে পাড়ি দেন।

তিনি ওখানে রাঁধুনীর কাজের অন্তরালে 'বইবোমা' বানানো শেখেন। বই-এর পাতা উল্টালেই বোমা ফেটে যাবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বইবোমাটি ফাটেনি অকেজো হয়ে যায়। কারণ তা অপঠিত অবস্থায় আলমারিতে স্থান পেয়েছিল। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য হেমচন্দ্রের দ্বীপান্তর হয়। তিনি আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দী হন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পাবার পর তিনি মেদিনীপুরে প্রবীর রাজার বাড়িতে বসবাস করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত তিনি ঐ বাড়িতেই থাকেন। তিনি রন্ধন পটিয়সী ছিলেন। শুভ্রকেশধারী প্রবীণ বিপ্লবীর দেখাশোনা করতেন গোপীনাথ নামক একজন ওড়িয়া। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ৮-ই এপ্রিল মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে এই মহান বিপ্লবীর জীবনাবসান।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো প্রবীর রাজার বাড়ির পেছনে অবস্থিত একটি বাগানে অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে মিলিত হতেন। শহীদ ক্ষুদিরামও সে সময় তাঁর কাছে উপদেশ নিতে

আসতেন। তাঁরা বোমা বানাতেন এবং ঐ বোমা তৈরির মালমশলা প্রবীর রাজার বাড়িতেই গোপনে মজুত রাখতেন। এ বিষয়ে প্রবীর রাজা তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, ব্রিটিশদের সাথে বাহ্যিক যোগাযোগ ও মেলামেশা হেতু তারা কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করত না।

রাজা প্রবীর সিংহ মেদিনীপুরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মে স্বনিয়োজিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি ডায়মন্ড ফুটবল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পুলিশ গ্রাউন্ডে ফুটবল খেলা ছিল। তখন প্রথা ছিল জেলাশাসকরাই প্রথমে গোল দিয়ে উদ্বোধন করতেন। মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলাশাসক বার্জ প্রথানুযায়ী গোল করতে যাবার মুহূর্তেই বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হন। ডায়মন্ড ক্লাবে বিপ্লবীরা নিয়মিত আসতেন। প্রবীর রাজা ব্রিটিশের সন্দেহ ভাজন হন। তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়। ফলস্বরূপ তিনি ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুরের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসে আত্মগোপন করেন। পাছে পুলিশ সংবাদ পায় সেজন্য তিনি কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে না থেকে রমেশ মিত্র স্ট্রীটে বাসা ভাড়া করে থাকেন। পরে মেদিনীপুরে চলে আসেন। স্বাধীনতার পরে রাজন্যভাতা প্রচলিত হলে তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত সরকার অধিগৃহীত অঞ্চলের জন্য কিছু অর্থ পান।

ব্রিটিশরা বিপ্লবীদের সাথে প্রবীর রাজার সুসম্পর্কের অজুহাতে পূর্বে প্রচলিত বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। পাছে সে অস্ত্র বিপ্লবীদের সাহায্যে আসে সেজন্য তারা ভীত হয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ২টি বন্দুক, ২টি রাইফেল, ১টি রিভলবার এবং ১টি পিস্তল ছিল। তিনি ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। এই সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবীদের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। তাঁর ব্যবহার, আতিথেয়তা এবং বিভিন্ন গুণাবলীর জন্য সাহেব এবং উচ্চপদস্থ ভারতীয় ব্রিটিশ কর্মচারীরা ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক এবং সদ্ভাব বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। মেদিনীপুরের বাঙ্গালি জেলাশাসক বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয় রাজবাটিতে টেনিস খেলতে আসতেন। বিশ্ব খাদ্য সংস্থায় যোগদান করে বিদেশে যাবার পরেও বিদেশ থেকে নিয়মিত পত্র দিতেন। হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাজ্যপাল হবার পূর্বে ও পরে এই রাজবাড়িতে এসেছেন।

ডঃ মেঘনাদ সাহাও এখানে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, কুমার চন্দ্র জানা, প্রফুল্ল ঘোষ, অনঙ্গমোহন দাশ, সুশীল ধাড়া, অজয় মুখোপাধ্যায়া, চারু মহান্তি প্রমুখ মণীষী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মেদিনীপুরের এই রাজবাটিতে পদচিহ্ন রেখে গেছে। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে খড়রুইগড় রাজবংশের অবদান অনস্বীকার্য।।

সূত্রনির্দেশ ঃ—

(১) স্বর্গত প্রবীর রাজার পুত্রদ্বয় শ্রী অজয় সিংহ গজেন্দ্র মহাপাত্র ও শ্রী দিলীপ সিংহ গজেন্দ্র মহাপাত্র কর্তৃক প্রদর্শিত দলিল ও তথ্যাদি।

(২) 'ভ্রান্তিবিজয়' — শ্রী হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী সঙ্কলিত। দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩২৫ বঙ্গাব্দ, ব্রাহ্মণকান্ড পৃষ্ঠা—৩৫২

(৩) 'সংবাদ দর্পণ' পত্রিকা—১০/১২/১৯৯৯

(৪) স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—(১ম খন্ড) বসন্তকুমার দাস

(৫) বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র দাস কানুনগো।

(৬) মেদিনীপুর—ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (১ম খন্ড) বিনোদশঙ্কর দাস, সম্পাদক।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে বন্দীমুক্তি আন্দোলন ঃ ১৯৩৭—১৯৪৬ সাল — একটি পর্যালোচনা।

ব্রততী হোড়

১৯৩৫-এর ভারতশাসন আইনানুযায়ী ১৯৩৭-এ বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন হয়। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে সমস্তরকম দমনপীড়ণ মূলক আইন রদ ও রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রতিশ্রুতি ছিল। ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৬টিতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং এই সমস্ত প্রদেশে অধিকাংশ রাজবন্দী মুক্তি পান। বাংলাদেশে মুসলিম্ লীগ ও কৃষকপ্রজাদলের মন্ত্রিসভা গঠিত হয় কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্নে তারা নীরব থাকে।

ইতিমধ্যে ১৯৩৭-র ২৪শে জুলাই সুদূর আন্দামানের জেলে আটক রাজবন্দীরা অনশন শুরু করেন। তাঁদের দাবি ছিল ক) সমস্ত রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি, এবং খ) অবিলম্বে আন্দামান থেকে দেশে তাঁদের ফিরিয়ে আনা।[১]

এই সংবাদে ২রা আগষ্ট কলকাতার টাউনহলের বিরাট জনসভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্দামান রাজবন্দীদের দাবি সমর্থন করেন।[২] ১৪ই আগষ্ট 'আন্দামান বন্দী মুক্তি দিবস'' রূপে পালিত হয়। ঐদিন সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘটও পালিত হয়।

ইতিমধ্যে ১০ আগষ্ট দেউলী বন্দী নিবাসে ও ১২ আগষ্ট আলিপুর জেলের বন্দীরাও মুক্তি ও রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম শ্রেণী বিভাগের দাবিতে অনশন করেন।[৩] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি বন্দীমুক্তি সাব-কমিটি গঠন করে। ২৮শে আগষ্ট ছাত্র ধর্মঘট হয় সমগ্র বাংলাদেশে। গান্ধীজি স্বয়ং উদ্যোগী হন বন্দীমুক্তির ব্যাপারে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আন্দামান বন্দীরা অনশন প্রত্যাহার করেন।

১৯৩৮-র সূচনাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রী ফেডারেশন বন্দীমুক্তি আন্দোলন শুরু করে। সুভাষচন্দ্র বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানান। ১৪ই মার্চ 'সারা বাংলা বন্দীমুক্তি দিবস' হিসাবে পালিত হয়। এই দিবস পালনের জন্য দেশবাসীর কাছে ঐক্যবদ্ধ আহ্বান জানান বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আসরাফুদ্দিন, সহ. সভাপতি বি.বি. গাঙ্গুলি, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা গুণদা মজুমদার, বঙ্গীয় লেবার পার্টির সম্পাদক কমল সরকার, কমিউনিষ্ট পার্টির মুজফা ফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জী, রায়পন্থী শ্রমিকনেতা রজনী মুখার্জী ও সিপিএমএফের সাধারণ-সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখার্জী। ঐদিন কলকাতার টাউন হলে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন — যতদিন একজনও রাজবন্দী কারারুদ্ধ থাকবেন, ততদিন আমাদের এই বন্দীমুক্তি আন্দোলন থামবে না।

অবশেষে ১৯৩৮-র জুলাই মাসে হক্-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নেয় যে একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিপ্লবী বন্দীরা ছাড়া আর সমস্ত বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের ও দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের বিনাশর্তে সরকার মুক্তি দেবে। সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হ'লেও

বাংলার ছাত্রসমাজ এই ঘোষণাকে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে ছাত্রদের এক বিরাট জয় বলেই অভিনন্দিত করলো। রাজবন্দীরা কারামুক্ত হয়ে অভিনন্দন জানালেন বাংলার ছাত্রসমাজকে।

বন্দীমুক্তি আন্দোলন কিন্তু স্তব্ধ হল না। গোটা ১৯৩৯ জুড়ে বন্দীমুক্তি আন্দোলন চললো। বস্তুতঃ এর পরেও কখনো এককভাবে কখনো অন্য আন্দোলনের সঙ্গে যৌথভাবে এই ইস্যুতে আন্দোলন চললো। যেমন ২৯শে আগষ্ট ১৯৪৫-এ 'কোচবিহার দিবস' পালনের সঙ্গে 'বন্দীমুক্তি দিবস'ও পালন করা হয় গোটা বাংলাদেশে।[৭] এরই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটলো ১৯৪৬-এর ২৪শে জুলাই যখন রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে উত্তাল হ'য়ে উঠলো গোটা বাংলা তথা কলকাতায় ছাত্রসমাজ। জুলাই-এর পিচগলা রাস্তায় ছাত্রছাত্রীদের দুর্জয় মিছিল বিধানসভায় ঢুকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দীর কাছ থেকে রাজবন্দীদের মুক্তির পাকা কথা আদায় করে নিল।[৮] এর মাত্র ২২ দিন পরই আরম্ভ হয় আগস্টের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। যদিও এর পরেও রাজবন্দী মুক্তি চলতে থাকে।

কিছু প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ঃ

যেহেতু এই আন্দোলন চলেছিল ১৯৩৭ থেকে শুরু করে ১৯৪৬ প্রায় ৯ বছর ধরে, কখনো এককভাবে কখনো অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে — তাই এর প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়েছে।

সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের ফলেই কিন্তু আগস্টের ভয়াবহ দাঙ্গার পরেও রাজবন্দীদের মুক্তি ঘটতে থাকে। বস্তুত ১৯৪৫-র ২৯শে আগষ্ট থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত যে যুদ্ধোত্তর গণজাগরণ দেখা গেছিল, তাতে পুরোভাগে ছিলেন ছাত্রসমাজই। আর ঐ আন্দোলনের ভিত্তি অনেকাংশেই কিন্তু তৈরি হ'য়ে গেছিল ১৯৩৭ থেকে শুরু হওয়া বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই। বিশেষতঃ ছাত্র ফেডারেশনের ভূমিকা ছিল সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্দীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম পর্বের কথা বলতে গিয়ে বিশ্বনাথ মুখার্জী লিখেছেন যে, 'এই আন্দোলনের ভিতর দিয়েই সর্বপ্রথম অসংখ্য স্কুল ও কলেজে ছাত্রদের আন্দোলন কমিটি গড়ে উঠলো। এগুলোই হ'য়েছিল ভবিষ্যতে ছাত্র ফেডারেশনের ব্যাপক ও শক্তিশালী সংগঠনের ভিত্তি।

বাংলাদেশে রাজনীতিতে ছাত্রী এবং মহিলাদের অংশগ্রহণের উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালের বন্দীমুক্তি আন্দোলনে, মহিলারা, বিশেষতঃ সর্বভারতীয় ছাত্রী সংগঠনের সূচনায় ফলে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল। ১৯৩৯-এ ডিসেম্বরে দিল্লীতে AISF-র জাতীয় সম্মেলন হয়। ছাত্রদের ডাকা মিটিং মিছিলে ছাত্রীরাও ব্যাপক সংখ্যায় যোগ দিতে লাগলো। এ চিত্র সারা ভারতব্যাপী। এ অবস্থায় ছাত্রীদের একটা পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়. কারণ ছাত্র ফেডারেশনে ছাত্র সংখ্যাই ছিল বেশি। ছাত্রীরা এতে যোগ দিতে একটু-দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। সুতরাং ছাত্রীদের জন্য পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯০৪-এ লক্ষ্মৌতে ভারতের সব প্রদেশে থেকে আগত ছাত্রী মেয়েদের এক সমাবেশ হ'ল। এইটি ছিল ছাত্রীদের প্রথম সারাভারত সম্মেলন।

অবশ্য এর আগেই বাংলা ১৯৩৭ এ BPSF-র রাজ্য কমিটির অনুমোদনে ছাত্রীদের

সংগঠিত করার জন্য গার্লস স্টুডেন্টস্ কমিটি তৈরি হ'য়েছিল। শান্তি সরকার, উমা ঘোষ, গীতা রায়চৌধুরী, অনিমা ব্যানার্জী, শোভা মজুমদার, কল্যাণী মুখার্জী, কণক মুখার্জী ছিলেন এই কমিটির সংগঠক। ১৯৩৮-এ গঠিত হয় Girls Students Association। (কণক মুখার্জী ছিলেন এর প্রথম সম্পাদিকা)[৯]

১৯৪০-এ লক্ষ্ণৌতে সারাভারত ছাত্রী সম্মেলন হওয়ার পর বিভিন্ন প্রদেশে এর শাখা গড়ে ওঠে। অতিদ্রুত বাংলাদেশে ছাত্রীদের মধ্যে এর বিস্তারলাভ ঘটে। তাদের নিজস্ব দাবি দাওয়ার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। সেইসময় এইসব ছাত্রী মেয়েরাই ছিল মহিলাদের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিত অংশ — যাঁরা বুঝেছিলেন যে নারী সমাজের অন্য সমস্ত সমস্যা থেকে তাদেরও রেহাই নেই — একমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগটুকু ছাড়া। অতএব এই বিশাল নারী সমাজকে সংগঠিত করার সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে তাদেরই। প্রায় সর্বত্রই মহিলা আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ছাত্রী নেত্রীরাই বহুল পরিমাণে দায়িত্ব নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে নানা রাজনৈতিক মতবাদের মেয়েরা একত্রে সমবেত হলেন। মেয়েদের প্রথম পথসভা হ'ল গড়িয়াহাটে।[১০] পথসভায় মেয়েদের দাঁড়িয়ে বক্তৃতা তখনকার দিনে খুবই বিরল ঘটনা। শ্রোতায় রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে মহিলাদের বক্তৃতা শুনলেন — এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। দাবিটা লোকের মনে দাগ কেটেছিল এবং সেই সঙ্গে আন্দোলনও বাড়তে থাকলো। ঐসময় ৯৮ নং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে অফিস খোলা হল, যেখান থেকে মহিলা রাজনৈতিক কর্মীরা তাঁদের আন্দোলন সংগঠিত করতেন। একত্র হ'য়ে সকলে মিলে গড়ে তুললেন কংগ্রেস মহিলা সংঘ। সদস্যা ছিলেন স্ত্রী সংঘের লীলা রায়, যুগান্তর গ্রুপের বীণা দাস ও কমলা চ্যাটার্জী পরে কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যা ও নানা মতের মেয়েরা। বাংলাদেশে সম্মিলিত মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার এই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। যদিও ইতিপূর্বেই নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন ততদিনে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রামী মহিলা কর্মীরা একে নারী সংগঠন হিসাবে তেমন মূল্য দিতেন না।

কেবলমাত্র মহিলা সংগঠনের আলোচনা পর্বেই নয়, পরবর্তীকালেও নারী সংগঠনের ক্ষেত্রে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, যার বাংলাদেশে সূত্রপাত হ'য়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে; কিন্তু অতিদ্রুত এটা মহিলাদের গণসংগঠন হিসাবে একটা নিজস্ব চরিত্র লাভ করেছিল। ১৯৪৩-র দুর্ভিক্ষে রিলিফের কাজ করতে করতে নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি শক্তিশালী হয়েছিল ও এবং এভাবে তার নিজস্ব চরিত্রায়ণও হ'য়ে গেছিল। তারই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যখন দেখি যে মণিকুন্তলা সেন, মহিলা আত্মরক্ষার অন্যতম নেত্রী, মন্বন্তরের সময় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে গিয়ে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার মুখোমুখি হন। তাঁরই ভাষায়, "ঘুরেছি ঘরে ঘরে, তাকানো যায় না কারো দিকে, বিশেষ করে মেয়েদের দিকে।

শিশুরা তো উলঙ্গই, মেয়েরাও প্রায় তাই। তাই ঘরে গেলেও মুখ তোলে না — তাকায় না। এদের আমি রাজনীতি, বন্দীমুক্তির কথা এসব কি বলবো। আমার মুখে কোন কথা আসে না।[১১]

সূত্রনির্দেশ ঃ

১) সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি। কলকাতা, ১৯৮৯ পৃ. ১২৩

২) আনন্দবাজার পত্রিকা, আগষ্ট ৩, ১৯৩৭

৩) সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩

৪) অমৃত বাজার পত্রিকা, ১৪ই মার্চ, ১৯৩৮

৫) অমৃত বাজার পত্রিকা, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

৬) গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ, মণীষা, ১৯৯০, পৃ.: ৮০, কলকাতা, Calcuttas' fighting youth leads mighty demonstration – Goutam Chattopadhyay- Peaples Age. August 4, 1946.

৭) বিশ্বনাথ মুখার্জী, কমিউনিষ্ট হলাম, ১৯৭৬

৮) রেণু চক্রবর্তী, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা-১৯৪০-১৯৫০, মণীষা কলিকাতা পৃ: - ১০.

৯) সুস্নাত দাশ — স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রীসমাজ : একটি সামগ্রিক রূপরেখা পৃ: ৫৮, প্রবন্ধটি সংকলিত হ'য়েছে বরুণ দে সম্পাদিত মুক্তিসংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা ১৯৯২

১০) মণিকুন্তলা সেন — সেদিনের কথা, নবপত্র প্রকাশন কলকাতা, পৃ.—৫১

১১) পূর্বোক্ত। পৃ: ৮৮

জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে বিপ্লবী সমাজতন্ত্র : আর এস পি-র সৃষ্টি : ভারতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের এক ভিন্ন প্রয়োগ

অমিতাভ চন্দ্র

বিশের দশকের শেষভাগে ও তিরিশের দশকের প্রথমভাগে যে-সমস্ত জাতীয় বিপ্লবী বন্দী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার কারণে দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদেরই ১৯৩২ সালের জুলাই মাস থেকে দলে দলে আন্দামানের সেলুলার জেলে নির্বাসনে পাঠানো শুরু হয়েছিল। তাঁরা ছাড়াও আরও বহু বিপ্লবী বন্দী বহরমপুর, বক্সা, হিজলি ও দেউলি বন্দীশিবিরে, এবং প্রেসিডেন্সি জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, দমদম সেন্ট্রাল জেল ও অন্যান্য বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। এই বিপ্লবী বন্দীদের অধিকাংশেরই মনে বারবার যে প্রশ্নটির নাড়া দেওয়া শুরু হয়, সেটি হল : যে-পথে এতদিন সংগ্রাম করে আসা হয়েছে, সে-পথে কি পূর্ণ স্বাধীনতা ও শোষিত জনগণের চূড়ান্ত মুক্তি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর পেতেই শুরু হয় বিপ্লবী বন্দীদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চর্চা ও নতুন পথের সন্ধান। বিভিন্ন জাতীয় বিপ্লবী দলের নির্বাসিত বন্দীদের একটা বড় অংশ নিজেদের অতীত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে সব সম্পর্ক খোলাখুলিভাবে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে শুরু করলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চর্চা। শুরু হল জাতীয় বিপ্লবী বন্দীদের কমিউনিজমে প্রথম পাঠ গ্রহণ। সেলুলার জেল হয়ে উঠল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষার বিদ্যাপীঠ। আরম্ভ হল জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের এক নতুন অধ্যায়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গভীর অনুশীলনের পরিণতিতে জাতীয় বিপ্লবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণকারী জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ ১৯৩৫ সালের ২৬ এপ্রিল আন্দামানের সেলুলার জেলে গোপনে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটি গঠন করেন। ১মে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। বাংলা-বিহার-যুক্তপ্রদেশ-পাঞ্জাব মিলিয়ে মোট ৩৯ জন বন্দী প্রাথমিকভাবে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটির সদস্য হন।[১] পরবর্তী দু'বছরে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণকারী আরও বহু বন্দী কনসলিডেশনের সদস্য হন। সেলুলার জেলে কনসলিডেশন গঠিত হওয়ার ঠিক পরেই অন্যান্য বিভিন্ন জেলে ও বন্দীশিবিরেও অনুরূপ কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটি গঠিত হয়। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ পর্বে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৫-৩৬ সালে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছাড়া পেলেও প্রধানতঃ ১৯৩৭ সাল থেকেই সাজাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি শুরু হয়। বন্দীমুক্তি চলে

১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। মুক্তিপ্রাপ্ত জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যেই অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জেলায় পূর্ণাঙ্গ পার্টি কমিটি অথবা নিদেনপক্ষে পার্টি সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। সদ্য গঠিত এই কমিটিগুলির অধিকাংশেরই দায়িত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানকারী এই জাতীয় বিপ্লবীরা।

তিরিশের দশকে আন্দামানের সেলুলার জেলে এবং অন্যান্য বিভিন্ন জেলে ও বন্দীশিবিরে অনুশীলন সমিতিভুক্ত যে-সমস্ত জাতীয় বিপ্লবীরা তাঁদের মতাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শগত মতপার্থক্যের কারণে জেলে ও বন্দীশিবিরে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটিতে যোগদান করেননি, এবং মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কর্মসূচি সংক্রান্ত মতপার্থক্যের কারণে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বা কমিন্টার্নের অনুবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দেন নি, তাঁরা অনুশীলন মার্কসবাদী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। এই অনুশীলন মার্কসবাদীরাই জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে উত্তরণের পথ ধরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রে, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের মতাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন রেভলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি বা আর এস পি-র। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী এক নতুন দল গঠনের মাধ্যমে তাঁরা ভারতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের এক ভিন্ন প্রয়োগের কাজে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এখানে ভিন্ন প্রয়োগ বলতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যেভাবে ভারতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব প্রয়োগের কাজে নিরত ছিল, তার থেকে ভিন্ন প্রকৃতির প্রয়োগের কথাই বোঝানো হয়েছে। আর এস পি নামক এক নতুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ ভিত্তিক দল সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এবং ভারতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ভিন্ন রূপ এই প্রয়োগের আলোচনাই বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

মতাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণকারী এই অনুশীলন মার্কসবাদীদের সামনে, মুক্তির পর, বিকল্প পথ খোলা ছিল দুটো। একটি ছিল তখনই নতুন এক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গঠন করা, এবং অপরটি ছিল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে (সি এস পি) যোগ দেওয়া। সি এস পি নেতৃত্বের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তার মার্কসবাদে বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত হয়ে ১৯৩৮ সালে অনুশীলন মার্কসবাদীরা যোগ দিয়েছিলেন সি এস পি-তে। সি এস পি-তে যোগ দিলেও তাঁরা তাঁদের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেননি। নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখেই অনুশীলন মার্কসবাদীরা সি এস পি-র মধ্যে একটি পৃথক্ গ্রুপ্ হিসাবে কাজ করতেন এবং সেই নামেই পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েশন-এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ সদস্যও সি এস পি-তে যোগ দিয়ে এই অনুশীলন মার্কসবাদী গ্রুপ্‌টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[৩]

প্রথম থেকেই নানা বিষয় নিয়ে সি এস পি নেতৃত্বের সঙ্গে অনুশীলন মার্কসবাদীদের মতপার্থক্য চলতে থাকে। তাঁরা ক্রমশঃই বুঝতে পারেন, সি এস পি-র মার্কসবাদ শুধুই কথার কথা। সি এস পি নেতৃত্ব মুখে মার্কসবাদে বিশ্বাসের কথা বললেও বাস্তবে কাজের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ অনুসরণ করে চলেন না। তাঁদের প্রাণের টান আছে গান্ধী ও গান্ধীবাদের দিকে, তাঁরা বাস্তবে সমর্থন করেন কংগ্রেসের গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে, অসহায় আত্মসমর্পণ করেন গান্ধীর কাছে, আপসহীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রয়োজনীয় সময়ে সমর্থন দিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। ফলে অনিবার্য হয়ে উঠল বিচ্ছেদ। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন চলার সময় অনুশীলন মার্কসবাদীরা সি এস পি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং রামগড়েই প্রতিষ্ঠা করেন এক নতুন সমাজতান্ত্রিক দল, যার ভিত্তি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।[১] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় এই দলের নাম ছিল রেভলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট)।[২] এই দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[৩] ১৯৪৬ সালের মে মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই দলের নাম পরিবর্তিত হয়ে রেভলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া বা আর এস পি আই হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে কুইলনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনে এই দলের নাম পুনর্বার পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান নাম রেভলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি গৃহীত হয়েছিল। এই দলের নাম তখন থেকেই সংক্ষেপে হল আর এস পি।[৪] যদিও ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত কুইলন সম্মেলনের সময় থেকে এই দলের নাম সংক্ষেপে আর এস পি হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে আলোচনার সুবিধার জন্য দলটিকে সাধারণভাবে আর এস পি হিসাবেই অভিহিত করা হয়েছে।

সি এস পি নেতৃত্বের সঙ্গে অনুশীলন মার্কসবাদীদের মতপার্থক্য প্রথম প্রকাশ্যে আসে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে। মতপার্থক্যটি ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে উত্থাপিত পন্থ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সমর্থন - বিরোধিতা - নিরপেক্ষতার প্রশ্নে। সাবজেক্টস্ কমিটিতে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রকাশ্য অধিবেশন সি এস পি নেতৃত্ব পন্থ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেন নি সি এস পি-র মধ্যে থাকা অনুশীলন মার্কসবাদীরা। তাঁরা নেতৃত্বের নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা ও সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন।[৫] এর পরিণতিতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অনুশীলন মার্কসবাদীদের ঘনিষ্ঠতা বিশেষ ভাবেই জোরদার হয়ে উঠেছিল।

অনুশীলন মার্কসবাদীরা ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রই প্রকৃত সংগ্রামপন্থী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি সমূহের সঠিক প্রতিনিধি। একমাত্র সুভাষচন্দ্রই কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্বের যাবতীয় দোদুল্যমানতার এবং আপসকামী নীতিসমূহের বলিষ্ঠ বিরোধিতা করে কংগ্রেস ও দেশের সামনে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের এক বিকল্প পথ উন্মুক্ত করে দিতে সক্ষম। এই প্রত্যাশা নিয়েই তাঁরা সমর্থন করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে।[৬]

কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন এবং ৩ মে গঠন করেন ফরওয়ার্ড ব্লক। অনুশীলন মার্কসবাদীরা সর্বতোভাবে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করলেও এবং তাঁর সহযোগী শক্তি হিসাবে থাকলেও তাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেননি। তার কারণ ছিল বহুবিধ। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রশ্নে ঐক্য থাকলেও তাঁর সঙ্গে অনুশীলন মার্কসবাদীদের মতাদর্শগত মতপার্থক্য ছিল। সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী হলেও তিনি ছিলেন মূলতঃ বামপন্থী জাতীয়তাবাদী। সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক স্লোগান 'জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা' প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সমূহকেই প্রতিফলিত করেছিল। কিন্তু অনুশীলন মার্কসবাদীদের কাছে শুধু এটুকুই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়নি। তাঁদের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ছিল আশু লক্ষ্য, কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শ্রেণীহীন সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তাই আশু লক্ষ্য পূরণ ছিল সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[১০]

এই প্রসঙ্গেই আর এস পি আই (আর এস পি)-এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক যোগেষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

> He (Bose) wanted to drag us into it (Forward Bloc), but we had firm faith in an ideology and we were unable to follow that loose path. We were definite that the objective must be crystal clear and the programme too must be commensurate with it. We had full sympathy with Bose but could not join hands with him only because of this fact. He, too, appreciated this.[১১]

প্রখ্যাত আর এস পি নেতা ত্রিদিব কুমার চৌধুরী জানিয়েছেন, সেই সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে এত বেশি রকমের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের এবং বিশেষতঃ অমার্কসবাদী শক্তির উপস্থিতি ছিল যে, তাঁদের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে একসঙ্গে থাকা ও কাজ করা আর এস পি-র পক্ষে তখন সম্ভবপর ছিল না।[১২] কেন অনুশীলন মার্কসবাদীরা সর্বতোভাবে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন নি, তার আরও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক David M Laushey. তিনি লিখেছেন ঃ

> An additional factor may have been that the Forward Bloc was supported mainly by ex-terrorists from Jugantar, Shree Sangha, and the Bengal Volunteers, whereas the RSP members came exclusively from the Anushilan Samiti and the H S R A.[১৩]

ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ না দিলেও অনুশীলন মার্কসবাদীরা সেই যুগে সম্পূর্ণভাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। ১৯৩৯ সালের ২২ ও ২৩ জুন ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম সম্মেলনের সময় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গড়ে উঠল বামপন্থী সমন্বয় কমিটি (এল সি সি)। এই এল সি সি-তে যোগ দিয়েছিলেন অনুশীলন মার্কসবাদীরা। প্রথমে 'রায়পন্থী'রা, তারপরে সি এস পি এবং সবশেষে সি পি আই একে একে এল সি সি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও অনুশীলন মার্কসবাদীরা শেষ পর্যন্তই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এল সি সি-তে ছিলেন, তাঁকে ছেড়ে যান নি।[১৪]

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে অনুশীলন মার্কসবাদীদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল আর এস পি আই (আর এস পি) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই রাজনৈতিক দলটির ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিল এবং তা আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় এই ঘনিষ্ঠতার রূপটি আরও স্পষ্ট ও আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।[১৫] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আর এস পি আই (আর এস পি)-এর পূর্ণ সমর্থন ও অনুমোদন পেয়েছিল। নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি ও যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে নিয়ে গঠিত অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার কোনও সমালোচনা আর এস পি করে নি, বরং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁর যাবতীয় প্রয়াস এই দলের চোখে সঠিক বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের এই সময়কার যাবতীয় কর্মকান্ডের সমর্থন এবং লেনিনের উদ্ধৃতি সহকারে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ অনুমোদন পাওয়া যায় প্রখ্যাত আর এস পি নেতা ত্রিদিব কুমার চৌধুরীর পুস্তিকায়।[১৬] ত্রিদিব চৌধুরী দ্ব্যর্থহীন ভাবে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন : 'লেনিনবাদী বিচারেও সুভাষচন্দ্র সুভাষচন্দ্র হিসাবেই সার্থক'।[১৭] তিনি লিখেছিলেন :

> পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার শত শত বৎসরের পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি-সংগ্রামের ভিতর দিয়া বিশ্বমুক্তি ও বিশ্ববিপ্লবের ভিত্তি-ভূমি আজ রচিত হইতেছে। নেতাজী সুভাষ এবং তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর বিপ্লবী সেনাদল এ যুগের ইতিহাসে দেখা দিয়েছেন সেই বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের এই বিশ্ববৈপ্লবিক তাৎপর্য্যের কথা আজিকার দিনে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই।[১৮]

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অনুশীলন মার্কসবাদীরা (তখনও আর এস পি গঠিত হয় নি) এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হিসাবে আখ্যায়িত করে সর্বতোভাবে এই যুদ্ধের বিরোধিতা করতে থাকেন এবং 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'কে 'গৃহযুদ্ধ'-এ রূপান্তরিত করার আহ্বান জানান। যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে জাতীয় সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলার কাজেও প্রয়াসী হয়েছিলেন অনুশীলন মার্কসবাদীরা। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে অনুশীলন মার্কসবাদীরা আর এস পি আই (আর এস পি) গঠন করার পর

তাঁদের এই অবস্থান দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক সূত্র অনুযায়ী 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'-এর পটভূমিকায় সুনির্দিষ্ট কর্তব্য বিবেচনায় এই দল সকল স্তরে সর্বাত্মক জাতীয় সংগ্রাম তীব্রতর করে তোলার প্রচেষ্টায় নিরত হয়েছিল। 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ' শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিক শ্রেণীর দল হিসাবে আর এস পি আই (আর এস পি) 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'কে 'গৃহযুদ্ধ'-এ রূপান্তরিত করার আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রোলেতারিয় লেনিনীয় পথনির্দেশের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ঘোষণা করেছিল।[১৯]

১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসি জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পর আর এস পি আই (আর এস পি)-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, রাশিয়ার ওপর নাৎসি জার্মান আগ্রাসন নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি নতুন ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করেছে, কিন্তু তার ফলে যুদ্ধের চরিত্রে কোনও গুণগত পরিবর্তন ঘটে নি। তীব্রতা, ব্যাপকতা ও গতিমুখের দিক থেকে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, এই দলের চোখে তা ছিল মাত্রাগত। এই দলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই যুদ্ধ, আগের মতোই এবং আরও বেশি মাত্রায় 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'ই থেকে গিয়েছিল। নাৎসি জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের পটভূমিকায় আর এস পি আই (আর এস পি) স্লোগান্ তুলেছিল ঃ

১) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর — সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্বে এইটেই হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কেন্দ্রীয় স্লোগান্।

২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম তীব্রতর কর।

৩) জাতীয় সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস না করে সোভিয়েতের প্রতি সর্বপ্রকার সাহায্য দান।

৪) একমাত্র স্বাধীন ও সোভিয়েত ভারতই সোভিয়েত রাশিয়াকে সাহায্য করতে পারে।

৫) সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রকৃত সাহায্য করার সুযোগ পাওয়ার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ কর।[২০]

১৯৪২ সালের অগস্ট মাসের ৯ তারিখ থেকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নামে দেশব্যাপী জাতীয় সংগ্রাম শুরু হলে আর এস পি আই (আর এস পি)-এর পক্ষ থেকে এই ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টির রাজনৈতিক অবস্থান বিবৃত করে একটি থিসিস্ রচনা করা হয়েছিল।[২১] এই থিসিস্-এ আর এস পি আই (আর এস পি)-এর অবস্থান বিশ্লেষণ করে লেখা হয়েছিল ঃ

> বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক জাতীয় সংগ্রামকে তীব্রতর করে জাতীয় বিপ্লব সাধন ও শ্রমজীবী জনতার ক্ষমতা দখল আর-এস-পি-আই-এর জাতীয় রাজনীতিক অবস্থানের মৌলিক স্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিক্স এবং তার মুখ্য রাজনীতিক কর্মসূচি হিসেবে সর্বদাই গণ্য করা হয়েছে। ভারতের প্রোলেতারিয়েতের

> অগ্রবাহিনী এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রোলেতারীয় ও সমাজবাদী আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে আর-এস-পি-আই উপযুক্ত শ্রেণী ও গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রামকে বিকশিত করা এবং তার ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি করার কাজে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।[২২]

ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তার সাধ্যমত ভূমিকা পালন করেছিল আর এস পি আই (আর এস পি)। এই সংগ্রাম সম্পর্কিত থিসিস্-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের সঙ্গেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা, ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করার কথা, এবং সমস্ত রকমের ফ্যাসিবাদী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন রোখার কথাও ঘোষণা করেছিল আর এস পি আই (আর এস পি) ঃ

> এই সংগ্রামে আর-এস-পি-আই-এর যোগদান নিছক আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার নয়। জাতীয় স্তরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং শ্রমজীবী জনতার শাসন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্য সামনে রেখে এই সংগ্রামকে বৈপ্লবিক পথে বিকশিত, ব্যাপকতর ও তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে পার্টি এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে। মনে রাখতে হবে যে ভারত ছাড়ো ধ্বনি আসলে জাতি তথা শ্রমজীবী জনতার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি। এই ধ্বনির ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা গণ-সংগ্রাম তাই একটি সামগ্রিক জাতীয় রাজনীতিক চরিত্র গ্রহণ করে চূড়ান্ত ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের পথে এগিয়ে যায়।.......
>
> এই সংগ্রাম শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই নয়, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধেও এটি একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। সব ধরনের ফ্যাসিবাদী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধে দৃঢ়সংকল্প জনগণের অনুমোদনের ভিত্তিতে এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এই সংগ্রাম জনগণের মধ্যে সংগ্রামী শক্তি গড়ে তুলছে যা দিয়ে ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করা যাবে।[২৩]

জোসেফ স্তালিন, স্তালিনীয় নেতৃত্ব ও স্তালিনবাদ, লেনিন পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃত্ব, এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লেনিন-পরবর্তী নেতৃত্ব ও তার ভূমিকা — এই সকল বিষয়েরই কঠোর সমালোচক ছিল আর এস পি আই (আর এস পি)। একই কারণে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরও কঠোর সমালোচনা করেছিল আর এস পি এবং ভারতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত পথের থেকে কিছুটা ভিন্ন এক পথ বেছে নিয়েছিল। এই ভিন্নতা প্রতিপন্ন করার জন্য এই দল স্বীয় মতাদর্শকে বিপ্লবী সমাজতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করেছিল এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল হিসাবেই নিজেকে চিহ্নিত করেছিল। ভারতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিকতাবাদকেই সবিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিল। অপরদিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল হিসাবে

আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী হলেও আর এস পি ভারতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের বিষয়টিকে যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব ও উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়েছিল।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১) নলিনী দাস, 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী', মণীষা, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৭৪, পৃ ১৪৭ ; বঙ্গেশ্বর রায়, 'মনে রেখো', প্রকাশক ঃ রাণী রায়, কলকাতা, জুন, ১৯৮৮, পৃ ১০৩। (বঙ্গেশ্বর রায় লিখেছেন, ৩৯ জন প্রাথমিকভাবে কনসলিডেশনের সদস্য হন, কিন্তু নলিনী দাস লিখেছেন, সর্বপ্রথমে কনসলিডেশনের সদস্য হন ৩৫ জন)।

২) এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ-বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্য দেখুন ঃ অমিতাভ চন্দ্র, "জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজম ঃ মধ্যবর্তী কয়েকটি স্তর", 'অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ সূচনা পর্ব', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯২, পৃপৃ ৭৩-৮৮, বিশেষতঃ পৃপৃ ৮০-৮২।

৩) Jogesh Chandra Chatterji, *In Search of Freedom*, Firma KL Mukhopadhyay, Calcutta, February, 1967, pp. 503, 513-15; David M Laushey, *Bengal Terrorism and the Marxist Left : Aspects of Regional Nationalism in India, 1905-42*, Firma KL Mukhopadhyay, Calcutta, 1975, pp. 124-25; Buddhadeva Bhattacharyya, *Origins of the RSP : From National Revolutionary Politics to Non-Conformist Marxism*, with a foreword by Tridib Chaudhuri, Publicity Concern, Calcutta, November, 1982, pp. 21-22, 37-38, 54.

৪) Chatterji, op. cit, pp. 533-34; Laushey, op. cit., p. 130; Bhattacharyya, op. cit., pp. 48-49.

৫) Bhattacharyya, op. cit., p 49.

৬) Chatterji, op. cit., p. 533, Laushey, op. cit, p 130.

৭) Bhattacharyya, op. cit., p 56.

৮) Chatterji, op. cit., pp. 523-25; Bhattacharyya, op. cit., pp. 39, 41, 43-45.

৯) Bhattacharyya, op. cit., p 46.

১০) Ibid, p 46.

১১) Chatterji, op. cit., p 513.

১২) Laushey, op. cit., p 130; Bhattacharyya, op. cit., p 47.

১৩) Laushey, op. cit., p 130.

১৪) Laushey, op. cit., pp 128-29; Bhattacharyya, op. cit., p 46.

১৫) Chatterji, op. cit., pp 531-32, 533-59, *passim*.

১৬) ত্রিদিব কুমার চৌধুরী, 'তেইশে জানুয়ারি', পেয়ারে বাছায়ৎ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৪৭, পৃপৃ ১-২০।

১৭) তদেব, পৃপৃ ১৯।

১৮) তদেব, পৃপৃ ১৯-২০।

১৯) *War Thesis of the R.S.P. : Thesis of the R.S.P.I. (Marxist-Leninist) on its Political and Organizational Tasks during the War Crisis*, (Adopted by the Central Committee in 1940) Appended to the 1938 Thesis, pp. 16-24, especially pp. 16-17.

২০) *On Russo - German War · Thesis of the Revolutionary Socialist Party of India (R.S.P.I.)*, Published by Nani Bhattacharjee from the Provincial office of the R.S.P.I., 356/2, Upper Chitpur Road, Calcutta, 1946, pp. 1-16, and in abbreviated form, pp 17-18.

২১) *On National Struggle of August 1942*, Thesis of the RSP, (Adopted by the Central Committee of the R.S.P.I. in 1942), edited and annotated by Buddhadeva Bhattacharyya, published by the Revolutionary Socialist Party, Calcutta, August, 1992, pp. i-iv + 1-37; বঙ্গানুবাদ : 'অগস্ট ১৯৪২-এর জাতীয় সংগ্রাম প্রসঙ্গে আর-এস-পি-র দলিল', বঙ্গানুবাদ ও টীকা ঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, 'ক্রান্তি', 'অগস্ট বিপ্লব সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন ঃ ৯ অগস্ট ১৯৯২', ক্রান্তি পরিষদ, কলকাতা, ৯ অগস্ট, ১৯৯২, পৃপৃ ৩৬-৫৪।

২২) *On National Struggle of August 1942, op. cit., p.l.*; 'ক্রান্তি', পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৬।

২৩) *On National Struggle of August 1942, op. cit., pp. 13-14*; 'ক্রান্তি', পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৪২-৪৩।

সুভাষচন্দ্র ও যুব আন্দোলন
(সংক্ষিপ্তসার)
রত্না ঘোষ

রাজনীতিতে প্রবেশের পর যুব আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের প্রথম পদক্ষেপ ১৯২২ সালে কলকাতায় 'নিখিলবঙ্গ যুব সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে। এই সম্মেলনের মূল সংগঠক ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এর পরই অসহযোগ আন্দোলনের সময় সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাগত যেসব কাজে মুখ্য অংশ নেন তা প্রধানত ছাত্র-যুবকদের সাহায্যে গঠিত।

মান্দালয় কারাবাস্কালে পরবর্তী কার্যক্রম সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনে নানা ভাবনা-চিন্তা জেগেছিল — তার মধ্যে অন্যতম ছিল যুবশ্রেণীর মধ্যে নূতন ভাবচেতনা সৃষ্টির বাসনা। যুব আন্দোলনের মৌল দর্শনকে তিনি তাঁর নানা ভাষণে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই দর্শনের মূল কথা প্রচলিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ বিদ্রোহ ও নবসৃষ্টির স্বপ্ন ও স্বপ্নসিদ্ধির জন্য আত্মদান। তিনি যুব সম্প্রদায়কে সচেতন করে দিয়েছেন জাতীয় সংগ্রামের উদ্দেশের অপেক্ষা বৃহত্তর হল যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন যুব সম্মেলনে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভারান্দোলনের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। তরুণের স্বপ্নতে লিখেছেন "যে স্বাধীনতা আমরা চাই .... সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী।"

যথার্থ সৃষ্টি সম্ভব নয় ধ্বংশের মুক্তিভূমি ছাড়া। সুতরাং ধ্বংস ও সৃষ্টি এই দুটি শব্দ সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যে, অঙ্গাঙ্গি। 'বিস্তারই জীবন সংকোচনই মৃত্যু' বিবেকানন্দের এই কথাটিকে তিনি যৌবনের আদর্শ নীতি বলে গ্রহণ করেছেন। আবার এই প্রসঙ্গেই এসেছে বিপ্লবের কথা যাকে, তিনি বিবেকানন্দের মতো করে 'আমূল পরিবর্তন' বলেছেন এবং এই বিপ্লবের অগ্রপথিক যুবসম্প্রদায়। কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্যে সার্বিক স্বাধীনতার প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র মনে করতেন সার্বিক স্বাধীনতার প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র মনে করতেন সার্বিক স্বাধীনতা-চেতনা না থাকলে কোনভাবেই দেশের সর্বাঙ্গীন মুক্তি আসবে না।

যুবসমাজকে উদ্দীপ্ত করতে সুভাষচন্দ্র বিশ্বের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। বলেছেন — আধুনিক চীনের নবজাগবণ সম্পূর্ণভাবে চীনেব ছাত্র-ছাত্রীদের সৃষ্টি। আবার নব্য তুরস্ক গঠনে 'তরুণ তুর্কী'র সমর্থন ও সাহায্যই ছিল কামাল পাশার প্রধান শক্তি। সুভাষচন্দ্র জোর দিয়েছেন সংগঠনের উপর। দৃষ্টান্ত হিসাবে অন্য দেশের স্বেচ্ছাসেবক দলের কথা এনেছেন যুবকদের সামনে ঐতিহাসিক আদর্শ তুলে ধরতে।

একটি আঞ্চলিক গণআন্দোলন ঃ নবতরভাবনার অনুশীলন

তাপস্ সিনহা রায়

আমার পি এইচ. ডি থিসিস্ 'Quit India Movement in Midnapur : A Micro-Level Study' —তে তৃণমূল স্তর থেকে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুরের ভূমিকা যে নতুন আলোকে উপস্থাপিত করেছি তার মূল সিদ্ধান্তগুলি উক্ত শিরোণামে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের আসন্ন সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলনে পেশ করতে চাই। প্রস্তাবিত প্রবন্ধে আমি যে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই তার কয়েকটি বক্তব্য অতি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ মেদিনীপুরের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপের প্রকাশ। সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে আন্দোলন ছিল দৃঢ়ভাবে স্থানীয় নেতৃত্বে অবিসংবাদী পরিচালনায় যদিও তাঁদের উপর গান্ধীজির পরোক্ষ প্রভাব ছিল। মেদিনীপুরের আগস্ট আন্দোলন যে প্রকৃতই গণ-আন্দোলন ছিল তা সাধারণ জনতা, জমিদার-জোতদার, মহিলা, ছাত্র, মুসলিম—বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ভিত্তির পরিসংখ্যান ও তথ্যসহ তুলে ধরব। মহকুমা ও থানা স্তরের নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্রগত পার্থক্য উদ্ঘাটন করব পরিসংখ্যানের মাধ্যমে। দেখাতে চেষ্টা করব এই আন্দোলন শেষ হয়ে গেলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে তার প্রভাব অব্যাহত থেকেছে। আশা রাখি, আমার এই সমস্ত কৃতসিদ্ধান্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুরের ভূমিকা সম্পর্কে চিরাচরিত জ্ঞানকে অতিক্রম করে নতুন চিন্তাভাবনা ও আলোচনার সহায়ক হয়ে উঠবে।

অবিভক্ত বঙ্গের কৃষক আন্দোলনে বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়—এক অবিস্মরণীয় নাম

সতী দত্ত

এই প্রবন্ধে খুলনা জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় অবিভক্ত বঙ্গের কৃষক আন্দোলনে কি ধরণের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তা নির্ণয় করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও ঢাকার লেখ্যাগারে সংরক্ষিত দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে। আলোচিত বিষয়ের সময়সীমা দুটি পর্বে ভাগ করা হয়েছেঃ প্রস্তুতিপর্ব (১৯২৩-৩৮) ও কর্মী এবং নেতারূপে (১৯৩৮-৪৭)।

নদী প্রধান সুন্দরবন সংলগ্ন কৃষিপ্রধান খুলনাজেলায় বেশির ভাগ অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজের সূচনা করে নিম্নবর্ণের অধিবাসীরা। কিন্তু বিংশশতাব্দীর গোড়ায় জোতদার-বর্গাদার প্রথা প্রাধান্য পাওয়ায় জমির আদি মালিকেরা বর্গাদার বা ভাগচাষিতে পরিণত হয় (প্রায় ৭০ শতাংশ ফ্লাড কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী)। এদের এই দুর্বিষহ জীবনের কল্যাণ বাসনায় তাদেরকে আত্মসচেতন করে তোলার কাজে বিষ্ণুপদ তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। জন্ম ১৯১০ সালে, মৃত্যু হয় ১৯৭১ সালের ১১ই আগস্ট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধপর্বে পাকসেনা কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে। ১৯২৩ সালে ছাত্রহিসাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু এবং পুলিশের বিবরণ অনুযায়ী ১৯৩০ পর্যন্ত বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধরে তাঁকে আত্মগোপন করতে দেখা যায় — কখনও ব্রহ্মচারি, কখনও শিক্ষক, কখনও হাট বাজারের ব্যাপারী, কখনও যুবগোষ্ঠীর কর্মীরূপে।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে ধৃত হয়ে কারান্তরালে দীর্ঘ আট বছর অতিবাহিত করার সময়ে সাম্যবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত হন এবং ১৯৩৮ সালে মুক্তির পর পুনরায় নিজ জেলার কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। উক্ত সময়ে সমুদ্রের নোনাজল ঢুকে জেলার হাজার হাজাব একর উর্বর জমিকে পতিত জমিতে পরিণত করে — চাষি হয় সর্বহারা। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪০-৪৪ সালের মধ্যে শোভনা এবং উত্তর খুলনার মৌভোগ ও বাগের হাটে নদীতে বাঁধ বেধে ও খালকেটে অনাবাদী প্রায় ৪০ হাজার বিঘে জমিতে আবাদী করে তুলে কয়েক সহস্র জমিহীন কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাঁর এই সাফল্য পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির কৃষকসম্প্রদায়কে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ও তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করার উদ্দেশে এতটাই সকলকাম হয়েছিল যে পরবর্তী সব আন্দোলনেই (বিশেষত তেভাগা আন্দোলনে) নারীপুরুষ নির্বিশেষে কৃষককুল একত্রে যোগদান করেছিল।

মহম্মদ রসুলের মতে ১৯৪০ এর পর এই জেলার কাজ ছিল খুবই সন্তোষজনক। তাঁর এই সাফল্য সম্পর্কে তদানীন্তন বঙ্গীয় কৃষকসভার যুগ্মসম্পাদক অবনী লাহিড়ীর মতে এককথায় "বিরল ব্যক্তিত্বের নেতা—"।

বলা যায়, তাঁর এই সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল — শুধু বক্তৃতা নয়, নিজ কর্মের দ্বারা কৃষকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা।

সেই ১৯২৩ সাল থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি স্তরের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১) I. B. File No. 232/29

২) I. B File No. 217/30

৩) Land Revenue File No. 6M/28, 1940 November

৪) Land Revenue File No Bundle No. 20, Feby. 1940

৫) সতীশ চন্দ্র মৈত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস ১ম খণ্ড, কলকাতা ১৯৯৩

৬) B. B. Choudhury, Agrarian Relation, Eastern India, The Cambridge Economic History of India, Vol. 2C1757-C 1970, edited by Dharmakumar, Delhi, July, 1984

৭) সতী দত্ত, ঔপনিবেশিক ভারতের মুক্তিসংগ্রামে খুলনা জেলা — ১৯০৫-৪৭ (অপ্রকাশিত গবেষণানিবন্ধ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭) ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ১৫৯ ও ১৭১-১৮৬।

নারায়ণগড় বোমা বিস্ফোরণ ও কিছু ভাবনা

শ্যামাপদ ভৌমিক

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এই দলগুলির অন্যতম হল 'অনুশীলন'দল। ১৯০৬ সালের আগে কলকাতার 'অনুশীলন' তার ঘোষিত লক্ষ্যে কখনও সশস্ত্র আন্দোলনের কথা বলেনি। বলা বাহুল্য 'অনুশীলনের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। এরাই ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে প্রকাশ করে যুগান্তর পত্রিকা। উদ্দেশ্য, খোলাখুলিভাবে বিপ্লবের কথা বলা। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রমুখ। আর নামে না যুক্ত থাকলেও প্রধান প্রেরণা হিসেবে যুক্ত ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

পরপর দুবার মামলার ফলে যুগান্তরের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। অত্যুৎসাহী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বিপ্লবকে আর পত্রিকার পাতায় ধরে না রেখে হাতে হাতে প্রয়োগের কথা ভাবতে শুরু করলেন। সিডিসন কমিটির ভাষায়, তাদের লক্ষ্য হল সরকারি অফিসারদের হত্যা করে ভারত থেকে ব্রিটিশশাসনের উচ্ছেদ।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টার পর বিদ্রোহী তরুণদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল বাংলার ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজার। তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার জন্য নারায়ণগড়ের অনতিদূরে ছোটলাটের গাড়িকে লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে সাধারণভাবে জানা যায়। উল্লেখ্য, এটাই ভারতের ব্রিটিশ বিতাড়ণের প্রথম বোমা বিস্ফোরণ। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে কেন এই বিস্ফোরণ, কাদের দ্বারাই বা এই বিস্ফোরণ, এটি সত্যিই বিপ্লবীদের কাজ কিনা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই বোমা বিস্ফোরণের প্রভাব কতখানি।

বাংলাদেশে বিষয় হিসেবে ইতিহাস

রোজিনা কাদের

জ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবে ইতিহাস সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত, সমাদৃত। বাংলাদেশেও বিষয় হিসেবে ইতিহাস একসময় জনপ্রিয় ছিল। "কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে বিশেষত অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে ইতিহাস পঠন-পাঠন এক চরম সংকটের সম্মুখীন। এ থেকে উত্তরণের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ সমস্যা একেবারে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপৃত। প্রতিটি পর্যায়ে পাঠদান পদ্ধতি, পাঠক্রম, রেফারেন্স ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ - সব পর্যায়েই কিছু না কিছু সমস্যা বর্তমান এবং এ সমস্যা ক্রমে ক্রমে পুঞ্জিভূত হয়ে সৃষ্টি করছে সংকটময় পরিস্থিতির।"[১] এ পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাকাডেমিক শিক্ষার প্রথম ধাপ অর্থাৎ স্কুল (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম) থেকে সর্বোচ্চ ধাপ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং কিভাবে সেগুলো থেকে উত্তরিত হওয়া যায়, সে সম্পর্কে কিছু অভিমত বা সুপারিশ প্রদানের প্রচেষ্টা করা।

এবার দেখা যাক অ্যাকাডেমিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বিষয় হিসেবে ইতিহাস পঠন-পাঠনের অবস্থা কিরূপ। প্রথমে দেখা যাক অ্যাকাডেমিক শিক্ষার প্রথম ধাপ স্কুল পর্যায়ে(বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম) ইতিহাস কি অবস্থায় রয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে স্কুল পর্যায়কে দুটি ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমত, ৮ম শ্রেণী অর্থাৎ নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় এবং দ্বিতীয়ত, ৯ম-১০ম শ্রেণী অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যায় (ইংরেজি মাধ্যমে 'O' Level)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩য়-৫ম শ্রেণী এবং ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য যথাক্রমে 'পরিবেশ পরিচিতি(সমাজ)' এবং 'সামাজিক বিজ্ঞান।' এই বইগুলোতে সমন্বিত বিষয় হিসেবে ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত। এসব বই-এর টেক্সট আলোচনায় যাবার প্রয়োজন নেই। সেটি নিয়ে আলাদা আলোচনা হতে পারে। যেটি বিবেচ্য সেটি হচ্ছে, ৩য়-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস খণ্ডিত বিষয় হিসেবে পাঠ্য। এভাবে প্রাথমিক থেকে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে সমন্বিত বিষয় হিসেবে ইতিহাসের অপর্যাপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যসূচির কারণে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পক্ষে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়না। এরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পরবর্তী শিক্ষা পর্যায়গুলোতে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি পড়তে উৎসাহবোধ করেনা।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থানুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ের (৯ম-১০ম শ্রেণী) শুরুতে অর্থাৎ ৯ম শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হতে হয়। এক্ষেত্রে মানবিক শাখার নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহের মধ্যে 'বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস' এবং বিজ্ঞান শাখার জন্য 'সামাজিক বিজ্ঞান'কে আবশ্যিক করা হয়েছে। শেষোক্ত বইটিতে ভূগোল, অর্থনীতি পৌরনীতির সাথে সমন্বিত বিষয় হিসেবে ইতিহাস (দ্বিতীয় অধ্যায়)কে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত বিভিন্ন বিষয় যেমন বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল, ইত্যাদির মতো বাংলা মাধ্যম স্কুলে শুধুমাত্র ৯ম-১০ম শ্রেণীর মানবিক শাখা ব্যতীত অন্যকোন পর্যায়েই স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ইতিহাস পাঠ আবশ্যিক নয়। কিন্তু মানব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, অঙ্গীভূত বিষয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। কেননা, এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকবে না।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে সাধারণত ৩য়-৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস পড়ানো হয়। কিছু স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস পাঠ্য বিষয় হিসাবে রয়েছে। আবার কিছু স্কুলে ইতিহাস পড়ানোও হয়না। আর 'O' এবং 'A' Level-এ মানবিক শাখার জন্য ইতিহাস বিষয় রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অধিকাংশ স্কুলে ইতিহাস পড়ানো হয় না অথবা শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিতে আগ্রহ বোধ করে না। যাই হোক, এসব স্কুলে ৩য় শ্রেণী থেকে 'A' Level পর্যন্ত মূলত বাইরের (পাশ্চাত্যের) ইতিহাস পড়ানো হয়। এসব জানার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে প্রথমেই জানতে হবে আত্মপরিচয়। এজন্যই নিজস্ব, জাতীয় ইতিহাস পড়া একান্ত দরকার। জাতীয়তাবোধ দেশপ্রেম সুপ্তভাবে সবার মধ্যেই থাকে। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে এগুলো জাগ্রত হয়। কিন্তু যখন আমাদের শিশু কিশোরদের মনে এসব বোধ জাগ্রত করা দরকার তখনই তাকে ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে বিদেশী/বাইরের ইতিহাস। ফলে মনোজগতে পাশ্চাত্য প্রভাবে এক ধরণের আধিপত্য/প্রভাব বিস্তার করছে। তাছাড়া ৩য়-৮ম শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। বস্তুত. 'O Level'-এর নিম্নপর্যায় পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে যা পড়ানো হচ্ছে তা ইতিহাস কিনা সে বিষয়েও আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গল্প শিরোনাম দিলে আপত্তি ছিলনা।[২]

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মানবিক শাখার জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী শিক্ষা স্তরগুলোতে বিষয় হিসেবে ইতিহাস মনোগ্রাহীতা হারিয়ে ফেলায় এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের পরিবর্তে অন্য বিষয় পাঠ্য হিসেবে বেছে নেয়। এক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার দেয় যেসব বিষয়ে বেশি নম্বর পাওয়া যায় সেসব বিষয়কে। কেননা বেশি নম্বর তথা ভালো রেজাল্টের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যত ক্যারিয়ার। "কী শিখছে, কী শেখা প্রয়োজন, কেন প্রয়োজন ইত্যাদি এখন আর তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।"[৩] এ পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যায়ে ইতিহাসের পরিবর্তে ইসলামের ইতিহাস বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীদের অতিমাত্রায় ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাব কিছুটা যে সক্রিয় তা অস্বীকার করা

যায় না। কিন্তু সে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, শুধুমাত্র মুসলমান শিক্ষার্থীরাই যে ধর্মীয় কারণে বিষয়টি নিতে আগ্রহী তা নয়। বরং বাস্তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরাও ইসলামের ইতিহাস পাঠ্য হিসেবে বেছে নেয়। শিক্ষার্থীদের অপ্রতুলতার কারণে অনেক কলেজে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ইতিহাসকে রাখা হচ্ছেনা। সেস্থলে ইসলামের ইতিহাসকে অনুমোদিত বিষয় হিসেবে রাখা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রায় প্রতিটি কলেজেই এরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এভাবে 'ইতিহাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে বা হচ্ছে ইসলামের ইতিহাসকে।''[৪] স্বভাবতই এরফলে ইতিহাস চর্চা হয়ে পড়ছে সীমিত। 'ইসলামের ইতিহাস ইতিহাসেরই অন্তর্গত। কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থাটা হয়েছে এমন যে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুললেই 'ইসলাম বিপন্ন' বলে চিৎকার শুরু হবে।''[৫] একই পরিস্থিতি স্নাতক(পাস) পর্যায়ে ও বিদ্যমান। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘ শিক্ষা বছরের কোন স্তরেই ইতিহাস বিষয়ক পাঠক্রম/পাঠ্যসূচি নির্ধারণে কোনরূপ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। অনেকক্ষেত্রে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তায়নও লক্ষণীয়। পরিকল্পনাবিহীন, যুগোপযোগী, বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রমের অভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।[৬]

এবার দেখা যাক এখানকার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয় হিসেবে ইতিহাস পঠন পাঠনের অভাব কিরূপ। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রথমে যে কয়টি বিভাগ চালু করা হয় তন্মধ্যে ইতিহাস অন্যতম ছিল। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (যেমন-রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বশেষ পছন্দের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ইতিহাস। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির/বিশ্বায়নের ফলে মানবিক শাখার বিষয়গুলো সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা এখন মূলত পেশাভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে যুগের প্রয়োজনে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শিক্ষার্থীরা ইতিহাস পড়তে অনাগ্রহী রিধায় বিষয়টি নিম্নপর্যায়ে চলে এসেছে। যেসব শিক্ষার্থী কোথাও সুযোগ পাচ্ছেনা, তারাই ইতিহাস পড়তে আসে। অর্থাৎ তারাও বিষয়টির প্রতি আগ্রহী নয়। তাছাড়া, প্রচলিত একটি ধ্যান-ধারণা থেকে ইতিহাস পড়ানো বা শেখানো হয়। ফলে যারা ইতিহাস পড়ে পাস করে বেরুচ্ছে স্বদেশে বা অন্যত্র তা কাজে লাগাতে পারছেনা। বস্তুত, বিষয়টির পেশাগত সংশ্লিষ্টতা নেই। তাই ইতিহাস চর্চা ততটা মনোগ্রাহী হচ্ছেনা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রম সামঞ্জস্যহীন এবং শিক্ষা বছরের মেয়াদও এক নয় [স্নাতক (সম্মান) শ্রেণী]। এক্ষেত্রে যুগোপযোগী পাঠক্রম নির্ধারণসহ শিক্ষা বছরের মেয়াদ অভিন্ন করা হলে ভালো হয়। অন্ততপক্ষে কয়েকটি পত্র প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিক করলে ইতিহাস শিক্ষায় একটি সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অ্যাকাডেমিক শিক্ষার কোন পর্যায়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ও অনেক ত্যাগ-বেদনার বিনিময়ে প্রাপ্ত গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ আবশ্যিক নয়।[৭] নিজের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু না জেনেই শিক্ষার্থীরা ডিগ্রী লাভ করে

বেরিয়ে আসছে। এটি যে জাতির জন্যে শুভ ফলদায়ক হবেনা তা সহজে অনুমেয়। আমাদের ইতিহাস অনেক গৌরবের, সমৃদ্ধশালী। একটি গৌরবময় পথ অতিক্রম করে এসেছি আমরা, আমাদের শিক্ষার্থীদের এসব জানাতে হবে। "এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়, আমাদের দেশে যখন ইতিহাসের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়, তখন তা বিস্তৃত হলেও এক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির বিষয় কম গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাঠ্যসূচিতে (উদাহরণস্বরূপ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি) দেখেছি তারা নিজেদের ইতিহাসের ওপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এদিকটা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। আমরা বিশ্বকে সামগ্রিকভাবে যেভাবে পরিমাপ করতে চাই, তারা সেভাবে করছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে এটুকু বলা যায়, আমরা সামগ্রিক ভাবে বিশ্বকে পরিমাপ করব তবে এক্ষেত্রে আমাদের অঞ্চলকে, ইতিহাসকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা অধিক শ্রেয়।"[৮] এসমস্ত বাস্তব কারণে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ইতিহাস পাঠ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, প্রত্যেক সরকারই ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। অবশ্য বর্তমান সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তকসমূহের সংশোধন ও পরিমার্জনের ফলে বিশেষত বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপযুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশে ইতিহাস পঠন-পাঠন এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। যারফলে অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে ইতিহাস চর্চায় বিরাজ করছে স্থবিরতা। ইতিহাস হচ্ছে জীবনচর্যার একটি বিষয়। সুতরাং একে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। তাই ইতিহাস পাঠ আবশ্যিক করা জরুরি। বিশেষত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মাধ্যমিক পর্যায়ে সব বিভাগ/ডিসিপ্লিনের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে।[৯] দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের হীনমন্যতাবোধ কাটিয়ে গৌরবময় পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এটি দরকার। নতুবা, নিজস্ব ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞানতা, অসচেতনার ফলে অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্তি জন্মাতে পারে।[১০] পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যখন আন্তর্জাতিক ইতিহাস পড়বে তখন তারা জাতীয় চেতনাবোধের আলোকে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।[১১] আর পরবর্তী পর্যায়ে যদি ইতিহাস নাও পড়ে, তথাপি এ পর্যায়ের (মাধ্যমিক পর্যায়) নিজস্ব ইতিহাস(বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ) বিষয়ক জ্ঞান নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনা, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেমের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও একথারই উল্লেখ রয়েছে। এতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রতি সচেতনা সৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত করা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।[১২] সুতরাং শিক্ষার এই উদ্দেশের দিকে লক্ষ্য রেখে ইতিহাস বিষয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস একটি ব্যাপক বিষয়। সুতরাং শিক্ষার্থীরা যাতে এর ব্যাপকতায় ভারাক্রান্ত হয়ে না পড়ে পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময় এদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষার্থীদের

মধ্যে এ ধারণাটি প্রচলিত রয়েছে যে ইতিহাসের তুলনায় বিষয়ের পাঠ্যসূচি সংক্ষিপ্ত, সহজ। ফলে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেতে উক্ত বিষয়গুলো অধিক সহায়ক। এরফলে শিক্ষার্থীদের কাছে ইতিহাস বিষয়টি অপ্রিয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।[১৩] অতএব ইতিহাসের পাঠক্রম/পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করে সময়োপযোগী, বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে। এভাবে বিষয়টির পেশাগত সংশ্লিষ্টতাও বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়। বস্তুত, একটি শিক্ষা স্তরেই সব পড়তে হবে এটি ভাবা অযৌক্তিক। বরং প্রতিটি শিক্ষা স্তরেব পাঠ্যসূচিতে পাঠ নির্বাচন/নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে নিঃসন্দেহে। তৃতীয়ত, বাংলায় রচিত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট বই নেই। প্রয়োজনীয় বই যদি না থাকে তবে কিভাবে শিক্ষার্থীরা পড়বে। বাজারে প্রাপ্ত নিম্নমানের বই পড়ে হয়তো তারা পাস করছে, কিন্তু ইতিহাস চর্চার মান কমে যাচ্ছে। সুতরাং মাতৃভাষায় প্রচুর পাঠ্যবই রচনা করতে হবে। যেগুলোর রচনা পদ্ধতি হবে সহজবোধ্য, আকর্ষণীয়।

পরিশেষে বলা যায়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির/বিশ্বায়নের ফলে সবাই এদিকেই ঝুঁকছে। ফলে মানবিক বিষয়গুলো বিপাকে পড়ছে। পাশ্চাত্য ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের কারণে ভাবিত। কারণ, মানবিক বিদ্যা না পড়লেতো মানুষ হৃদয়বান থাকবেনা। কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য, অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে নিজ দেশের ইতিহাস পড়ছে। বাংলাদেশে এক্ষেত্রে ভিন্ন পরিস্থিতি বিরাজমান। তাই এই সমস্যা সমূহ সমাধান করা অতীব জরুরি।

সূত্র নির্দেশ

১) রোজিনা কাদের, 'ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ', *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০(প্রথম সংখ্যা), পৃষ্ঠা ১১৯।

২) বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, প্রাগুক্ত।

৩) মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, *বাংলাদেশে ইতিহাস পঠনপাঠন*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৪৮।

৪) মুনতাসীর মামুন, 'সংকটের মুখোমুখি ইতিহাস', ভোরের কাগজ, ঢাকা, ৫ নভেম্বর, ১৯৯৯।

৫) ঐ, ৫ নভেম্বর, ১৯৯৯।

৬) বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫।

৭) শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পাঠ্য তালিকায় আবশ্যিক পত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, 'বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা', *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০ (প্রথম সংখ্যা)।

৮) রোজিনা কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ১২২।

৯) ইংরেজি মাধ্যমে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কৃত পাঠ্যসূচিতে (O এবং A Level) মুক্তিযুদ্ধের

ইতিহাস অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। 'তবে এক্ষেত্রে কিছুটা উদ্যোগ কি আদৌ নেয়া সম্ভব নয়? GCE সিলেবাস অনুযায়ী ব্রিটিশ ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাস, আধুনিক ইতিহাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা যদি পড়তে পারে, তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কি সংক্ষিপ্ত করে হলেও "আধুনিক ইতিহাস" এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না? এক্ষেত্রে আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার ঘটনায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখকরা যায় যে, GCE সিলেবাসে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। বাংলাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি কমনওয়েলথ-এরও একটি বিষয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এতে আসতে পারে গুরুত্ব সহকারে।' রোজিনা কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ১২৭।

১০) ঐ, পৃষ্ঠা ১২৮।

১১) ঐ, পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮।

১২) *National Committe On Education Policy*, Dhaka, 1997, Point 1 & 2, Page 1.

১৩) মানবিক বিষয়গুলোর তুলনায় বিশেষত বিজ্ঞান বিষয়গুলোতে বেশি নম্বর ওঠে। বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়গুলোতে ১০-এ ১০ পাওয়া যত সহজ, মানবিক বিভাগের বিষয়গুলোতে অনুরূপ নম্বর পাওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু চাকুরি প্রাপ্তি ভালো রেজাল্টের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। ফলে ক্যারিয়ার গড়ার প্রতিযোগিতায় মানবিক বিষয়ের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে। আশার কথা যে, চলতি বছর থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা এবং পরের বছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার রেজাল্ট গ্রেডিং প্রথা নির্ধারণের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

বিবর্তনের ধারায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ; (১৯৪৭-২০০০)

মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান

দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচীতে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৬-১১ বছর বয়সীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক এবং সর্বজনীন করার সুপারিশ করা হয়।

১৯৪৯ সালের ১৬ মার্চ নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যাকে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্যে তৎকালীন দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খানের সভাপতিত্বে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় এই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ১৯৫২ সালের জানুয়ারি হতে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৪ বছর হতে বৃদ্ধি করে ৫ বছর হয়।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খানকে চেয়ারম্যান করে সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের রিপোর্টে ১০ বছরের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়।

এরপর ১৯৫৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব এস. এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই শরীফ কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৯ সালের ৫ই জানুয়ারি। কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল ১০ বছরের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সর্বমোট ১৫ বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর পর্যন্ত উন্নীতকরণ এবং বয়োঃক্রমিক ভিত্তিক নমনীয় প্রমোশন প্রদান। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা হবে নবম হ'তে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

১৯৫৯ সালের ২৬শে আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্ট পেশ করা হলে ১৯৬০ সালের ৬ই এপ্রিল সরকার এটি অনুমোদন করেন এবং ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষের সুপারিশমালার আলোকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কাজ শুরু করেন। ১৯৬১ সালে কমিশনের সুপারিশকৃত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সরকারিভাবে ঘোষিত হওয়ার পর ১৯৬২ সালে এক ব্যাপক ও দুর্বার ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার

বাধ্য হয়ে প্রস্তাবিত ৩ বছর মেয়াদী ডিগ্রী পাসকোর্সের পরিকল্পনা বাতিল করে পূর্বের ন্যায় ২ বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সের প্রথা বহাল রাখে। উল্লেখ্য এই বছর যারা দুই বছর ডিগ্রী অধ্যয়ন করেছিল তাদের অটো ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এই শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখতে এদেশের ছাত্র সমাজ আজও ১৭ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস হিসেবে পালন করে। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে দেশের সংকটাপন্ন পরিস্থিতি নিরসনের জন্য সরকার ১৯৬৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এক আদেশে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করেন। ৬ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জাসটিস হামিদুর রহমান। এই কমিশনের সুপারিশের মধ্যেও উল্লেখ্যযোগ্য দিক ছিল সকল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা, যথা শীঘ্র সম্ভব জরুরি ভিত্তিতে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার বই পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করতে হবে, সহশিক্ষার জন্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের অধ্যয়নের উপযোগী সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে এবং মেয়েদের জন্য ভিন্ন ছাত্রী আবাস নির্মাণ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকিকরণ বৈজ্ঞানিক যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতিসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এয়ার মার্শাল এম. নূর খানের নেতৃত্বে 'নিউ এডুকেশন পলিসি' প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নতুন শিক্ষানীতির জন্যে সুপারিশ প্রণয়ন করেন। যার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল শিক্ষা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ, অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যাক্তিদের বেতনের সমপর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন উন্নীত করা, শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকতর বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিকরণের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষকদের সংখ্যা উন্নীতকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মান উন্নয়ন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিত করা ও যুগের চাহিদা মোতাবেক এর সিলেবাস প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ ৩টি স্তরে। যেমন — প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা। আবার অন্যভাবে শিক্ষা ৩টি ধারায়. প্রবাহিত। যেমন— সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই ১৯৭২ সালের ২৫শে জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ডঃ কুদরতে খুদা এবং এর মূল কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯জন। এই কমিটি একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সবদিক পর্যালোচনা করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দেয় ১৯৭৩ সালের ৮ই

জুন। এই কমিশনের প্রতিবেদনে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষারূপে গণ্য করার কথা বলা হয় এবং পর্যায়ক্রমে ১৯৮৩ সালের মধ্যে এই শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার সুস্পষ্ট সুপারিশ করা হয়। আবার প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও সুপারিশে উল্লেখ করা হয় যদিও এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। তবে তৎকালীন সরকারের ১৯৭৪ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয়(অধিগ্রহণ) আইনের আওতায় এক আদেশে ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে পর্যায়ক্রমে ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এক নতুন ধারার দ্বার উন্মোচিত হয়।

১৯৭৯ সালে এই উপদেষ্টা পরিষদের প্রকাশিত রিপোর্টে প্রচলিত ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করা সুপারিশ করে। এই কমিটির সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ৩টি স্তরে রাখার প্রস্তাব করা হয়। যেমন - নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগ-উপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করা হয়।

দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যথাপোযুক্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য ১৯৮৭সালের ২৩শে এপ্রিল এর সরকারি নির্দেশে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমদ। কমিটির সর্বমোট সদস্য ছিল ৩০জন। এই কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল ৩/৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার স্তর খোলা, ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা। আরও সুপারিশ করা হয় বর্তমানে ডিগ্রী কলেজগুলো থেকে ক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে বিমুক্ত করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে তদারকি ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা জোরদার করা। সব শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রেও বেশকিছু সুপারিশ করা হয়।

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সকল স্তরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য সরকার ১৯৮৯ সালের ২৪শে জুলাই ডঃ এম. এ. বারীকে চেয়ারম্যান করে মোট ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে ছিল ইবতেদায়ী শিক্ষা ৫ বছর মেয়াদী হবে এবং ইবতেদায়ী স্তরে স্বাতন্ত্র গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রেখে এর শিক্ষাক্রম যতদূর সম্ভব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের ও অনুরূপ হতে হবে। দাখিল স্তরে হবে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদী এবং এই স্তরটি হবে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের অনুরূপ। আলিম স্তর হবে একাদশ ও দ্বাদশ, ফাজিল স্তর হবে ২ বছর মেয়াদী ডিগ্রী সাধারণ শিক্ষার স্নাতক স্তরের সমান এবং কামিল স্তর হবে ২ বছর মেয়াদী যা সাধারণ শিক্ষার মাষ্টার্স স্তরের অনুরূপ যদিও মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগ উপযোগী ও আধুনিকিকরণ করার সুপারিশ করা

হয়। তবে উল্লেখিত সব পর্যায়েই মাদ্রাসা শিক্ষা নিজস্ব গুণগত মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। আরও সুপারিশ করা হয় যে কামিল উত্তীর্ণ মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য এম. ফিল; এম.এস.ও; পি.এইচ.ডি. সহ মৌলিক গবেষণার জন্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশেন, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাদ্রাসার সংখ্যা নিম্নরূপঃ ইবতেদায়ী ৫১৫১, দাখিল - ৪৮০৬, আলিম-৯৯৬, ফাজিল-৯৫৮, কামিল-১২৩(৩টি সরকারি)।

১৯৯৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি বর্তমান সরকারের আমলে এই শতাব্দীর সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ৫৬ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির সভাপতি সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর সামসুল হক। এই কমিটি অতীতের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিত ও সময় উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করার জন্য একটি বিস্তারিত সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করে।

১৯৯৫ সালে বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হায়ার সেকেন্ডারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এইচ এস টি টি আই) গঠন করে প্রশিক্ষণ দান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

১৯৪৭- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৯ সালের স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক ১৯৫৩ সালে উত্তরবঙ্গে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় যা রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জুবেরী।

১৯৬১ সালে ময়মনসিংহ জেলা শহরের অদূরে পূর্বপাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কৃষি প্রধান এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা উন্নয়নে ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ঢাকার আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এর নাম হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়(বুয়েট) বর্তমানে এটি দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে।

১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বলে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৬ সাল হতে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৭০ সালের জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী ঢাকা থেকে ১৮ মাইল দূরে সাভারে স্থাপিত জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় নামে একক শিক্ষাদানকারী ও সম্পূর্ণ আবাসিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

১৯৮০ সালে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মোতাবেক ১৯৮২ সালে ঢাকার অদূরে

গাজীপুরে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯০ সালে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পূর্ব নির্ধারিত স্থান কুষ্টিয়া জেলা শহর হতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে শান্তিডাঙ্গা দুলালপুর নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৫ সালে।

১৯৮৬ সালের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মোতাবেক সিলেট শহরের ৮ কিলোমিটার দূরে কুমারগাঁও নামক স্থানে ১৯৯১ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অনন্য সংযোজন। কেননা এখনও সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ অত্যন্ত নিয়মিতভাবে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পূর্বে ডিগ্রী ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজগুলির অনুমোদন(এ্যাফিলিয়েশন) শিক্ষাকার্যক্রম, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিগ্রী-ডিপ্লোমা প্রদান করতো ঢাকা অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-খুলনা অঞ্চলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন (৭২-৭৪) বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ সমূহের অবস্থার পবিবর্তন, লেখাপড়ার মান উন্নয়ন ও পর্যায়ক্রমে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুমোদনদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ বিবেচনা করে ১৯৮৫ সালের ৫ই নভেম্বর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজ অনুমোদনদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য প্রফেসর কাজি লতিফের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ১৯৯২ সালে ৩৭ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঢাকা হতে ২৩ মাইল দূরে গাজিপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সকল ডিগ্রী কলেজ ও বৃত্তিমূলক কলেজের অনুমোদন দান, শিক্ষাকার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালনা, ডিগ্রী ডিপ্লোমাপ্রদান করে। পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণও নিজের হাতে গ্রহণ করেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ডিগ্রী (পাশ) কলেজ	১০২৬
ডিগ্রী (অনার্স) কলেজ	১৪০
মাষ্টার্স কলেজ	৭৩
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	৫৩
সামরিক শিক্ষা কলেজ	০৭
আইন কলেজ	৫৯
চারুকলা কলেজ	০৫

সংগীত কলেজ	০১
অন্যান্য	২০

এই শতাব্দীর শেষ দশকে এদেশের উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান ও গতিময় করার লক্ষ্যে সরকার দুটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের প্রথমত উচ্চ শিক্ষা বৃদ্ধি ও কর্মজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাইড' কে সমন্বিত করে ১৯৯২ গাজিপুর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে অনেক সুযোগ বঞ্চিত মানুষের নতুন করে শিক্ষা লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

দ্বিতীয়ত দেশে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা মেটাতে ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সীমিত সংখ্যক আসন থাকায় ভর্তি ইচ্ছু শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

যার ফলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ

১) নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, বনানী, ঢাকা-১৯৯২
২) ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী, চট্টগ্রাম-১৯৯২
৩) ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩
৪) সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-১৯৯৩
৫) দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১৯৯৩
৬) ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা-১৯৯৩
৭) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-১৯৯৫
৮) আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১৯৯৫
৯) এ.এম.এ.ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-১৯৯৫
১০) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা-১৯৯৫
১১) এশিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ উত্তরা, ঢাকা-১৯৯৬
১২) ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি-৯৯৬
১৩) ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ধানমন্ডি, ঢাকা-১৯৯৬
১৪) কুইন্স ইউনিভার্সিটি, বনানী, ঢাকা-১৯৯৬
১৫) গণশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৯৬
১৬) পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-১৯৯৬

১৯৪৬ সালে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ঢাকায় 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশের চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে নবদিগন্ত সূচিত হয়। এরপর ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, ১৯৫৮ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, ১৯৬২ সালে ঢাকা মিডফোর্ট মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও সিলেট মেডিকেল কলেজ, ১৯৬৮ সালে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, ১৯৭০ সালে রংপুর মেডিকেল কলেজ, ১৯৯২ সালে খুলনা, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা ও ফরিদপুরে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মেডিকেল শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে শাহাবাগস্থ পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালকে অতিসম্প্রতি বঙ্গবন্ধু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হল, পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে উপনিবেশিক চিন্তাকে দূরে সরিয়ে উদার প্রগতিশীল চিন্তার উন্মেষ ঘটতে শুরু হল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় একটি স্বাধীন দেশের নারী শিক্ষার কাঙ্খিত লক্ষ্য আজও আমরা অর্জন করতে পারিনি। কেননা ১৯৯৬ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় আমাদের নারী শিক্ষার হার ৩১% যেখানে পুরুষ শিক্ষার হার ৫৫.৬%। আশার কথা সাম্প্রতিককালে পল্লী অঞ্চলে নারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার বিধান করা হয়েছে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখিত আলোচনা ও তথ্যের মাধ্যমে বিগত কালের শিক্ষার অগ্রগতি ও ব্যবস্থাপনার সামান্য কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

সূত্র নির্দেশ

১) যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ -— মোহাম্মদ ইলিয়াস আলি।

২) বাঙালির শিক্ষা ভাবনা ও ব্যবস্থাপনা — (জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -'৯৭ এ প্রকাশিত সংকলণ)— ডঃ মোম্মহাদ হান্নান

৩) শিক্ষাক্রম বিস্তরণ — জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত ম্যানুয়েল।

৪) Education system of Bangaladesh - Bangladesh Bureau of Educational Information and Ststistics, Ministry of Education.

৫) বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪ — শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬) জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭) প্রতিবেদন — শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদন (২০০০-২০০১) —জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজিপুর

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলাদেশ

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল অবধি পূর্ব বাংলা তথা আজকের বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থেই পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। এ উপনিবেশ ছিল একই রাষ্ট্রিক কাঠামোর ভিতর অভ্যান্তরীণ উপনিবেশ। অগণতান্ত্রিক শাসনাব্যবস্থা, অঞ্চলগত এবং শ্রেণীগত শোষণ, সামাজিক বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা এ সবই ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ফসল। পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তানকে একটি কলোনি হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে।[১] ঐতিহাসিক ভাবে এই অঞ্চলের জনগণের জন্য চরম জাতিগত শোষণ আর বঞ্চনা, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ হতে থাকে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে। যার ফলে পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ব্যাপক উন্নয়ন বৈষম্য।[২] "পাকিস্তানের ইতিহাসের গোটা সময়টাই বাঙালিরা অনুভব করেছে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্ব এই বঞ্চনাবোধকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানিদের ব্যাপক বিশ্বাস জন্মেছিল যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষ্যমের মূলে ছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি ও বরাদ্দমূলক সিদ্ধান্তসমূহ।"[৩]

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাধারণভাবে পূর্ব বাংলায় জনগণ বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানরা কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তুলনায় নিজেদের বঞ্চিতবোধ করত। পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা অনুভব করত যে অর্থনৈতিক জীবনে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য নেই। ভূমির মালিকানা ছিল প্রধানত হিন্দু জমিদারদের হাতে। মুসলিমরা ছিল হিন্দু জমিদারদের রায়ত কিংবা ক্ষুদ্র চাষি। মধ্যবর্তী আর্থিক কায়-কারবার ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রামীণ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের হাতে। শহরাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য তারাই নিয়ন্ত্রণ করত। আমলাতন্ত্র, শিক্ষকতা ও আইন ব্যবসাতেও তাদের প্রাধান্য ছিল।[৫] মুসলমানরা ভেবেছিলেন পাকিস্তান হবে এমন একটি দেশ যেখানে হিন্দুদের প্রতিযোগিতার হুমকি থাকবে না এবং তাদের বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালে যখন মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ওঠে তখন পূর্ব-বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে মুক্তির আশা নিয়ে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে

বাংলাদেশে শতকরা ৯৭টি আসনে জয়লাভ করেছিল।[৬] বাঙালি মুসলমানরা এমন একটি শাসন ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলো যেখানে তারা রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আধিপত্য বিস্তার করল পাঞ্জাবি শাসকচক্র এবং ভারত থেকে আগত ধনিক মুসলমানগোষ্ঠী। সামরিক বাহিনী বেসামরিক আমলার সক্রিয় সমর্থনে তাদের আসনকে পাকাপোক্ত করতে থাকে দিনের পর দিন। অর্থনীতিবিদ্ প্রফেসর আখলাকুর রহমান মনে করেন, "ভারত বিভাগ বাংলাদেশের উপর আরোপ করেছিল প্রতিকূল অর্থনৈতিক প্রভাব"।[৭]

পাকিস্তানের সুবিধাবাদী শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রথম থেকেই শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক পাকিস্তানের শ্লোগান তুলে পূর্ব বাংলাকে কাঁচামালের যোগানদার ও পণ্য সামগ্রীর বাজার হিসাবে ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করে। এই মনোভাব এবং কৌশল ছিল ভারতীয় ঔপনিবেশে ব্রিটিশদের অনুসৃত নীতির অনুরূপ।[৮] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা বাংলাকে কাঁচামাল উৎপাদেনের জন্য উৎকৃষ্ট জায়গা বলে মনে করত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও ঐ ধারণার কোন পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তিত হয়েছিল কেবল তার রুপ ও ধারা। নিজের স্বার্থে পাকিস্তান শুরু থেকেই সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিল একটা সচতুর নীতি ও কর্ম কৌশল, সেটা ছিল অসামঞ্জস্য প্রবৃত্তির নীতি কৌশল। এটাকে যুগপৎ ব্যবহার করা হয়েছিল অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ও সামরিক বিকাশের ক্ষেত্রে।[৯]

মূলত ঔপনিবেশিক শোষণের ফলেই পূর্ব বাংলা রিক্ত হয়েছে দিনের পর দিন। লক্ষণীয় উপনিবেশ থাকাকালে এই অঞ্চলের জনগণের আর্থিক অবস্থা যতটা খারাপ ছিল, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির মাত্র এক দশকের মধ্যে তাদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক নীচে নেমে যায়। পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল দুই শতাংশের নীচে এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের মাত্র তিন শতাংশ। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় হ্রাস পেয়েছিল প্রায় এক শতাংশ হারে।[১০] যার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য। একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার মাধ্যমে পূর্ব বাঙলার ন্যায্য অধিকার কায়েম সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আইয়ুব খান "মৌলিক গণতন্ত্রের" প্রচলন করে সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেন।

১৯৪৯-৫০ সালে জি.ডি.পি -এর পশ্চিম পাকিস্তানি হিস্যা ছিল ৫০.৫%। ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা বেড়ে ৫২.৫% শতাংশে দাঁড়ায়। এ ব্যবধান ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ আরও প্রসারিত হয়ে দাঁড়ায় ৫৭.৪%। এসব আঞ্চলিক বৈষম্য দেখিয়ে দেয় যে, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০ এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জি.ডি.পি. পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় লক্ষ্যণীয় ভাবে দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ শিল্পের হিস্যা দাঁড়ায় ৪১% থেকে ৭২%। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫% থেকে ৪৩%।[১১] পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের

তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতির বিকাশ দ্রুততর উন্নতি ও কাঠামোগত বৈচিত্র সৃষ্টি ৬০ দশকেও অনুরূপ বৈষম্যকে স্থায়ী রাখার পরিবেশ তৈরি করে।[১২]

পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আয় হত পূর্ব বাংলা থেকে কিন্তু বাঙালিরা আয়ের যথোপযুক্ত অংশ ভোগ করতে পারে নি। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার অজুহাতে পূর্ব বাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হত। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের রপ্তানির বিরাট অংশের যোগানদার হলেও আমদানির বেলায় একটা ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তেইশ বছরের মধ্যেও মাত্র ৬ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানি আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ছিল। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৯-৭০ এর রপ্তানি আয়ের ৫৫ শতাংশ অর্জন করে পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৬১-৬২ সালে পাকিস্তানের রপ্তানির ৭০.৫% ছিল। ঐ বছর আমদানিতে পূর্ব-বাংলার অংশ ছিল মাত্র ২৮.১% ভাগ।[১৪] এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মূদ্রা ব্যয় করা হত পশ্চিম পাকিস্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য। এছাড়া বিদেশী ঋণের ৮০% ব্যয় করা হত পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৫০ এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত থাকার কারণে পূর্ব বাংলা কোন বৈদেশিক সাহায্য পায়নি। ১৯৬০ এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য ও পেমেন্টের উদ্বৃত্তসহ সকল বৈদেশিক সাহায্য আত্মসাৎ করে।[১৫] পাকিস্তানের ক্রমবর্দ্ধমান বৈষমের প্রেক্ষাপটে দু'অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠে এবং বাঙালিদের মধ্যকার জাতীয়তাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে এবং শাসক দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনগণের রায় ঘোষিত হয়।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অবাঙালি আমলাদের দ্বারা পূর্ব বাংলা শাসন করাই ছিল পাকিস্তানের প্রাথমিক নীতি। পাকিস্তানের ইতিহাসে কোন বাঙালি অর্থমন্ত্রী হননি। বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা নিয়ন্ত্রণকারীর পদে কোন বাঙালি কখনো নিযুক্ত হননি। কোন বাঙালি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হননি এবং কোন বাঙালি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে সেক্রেটারী হননি। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কোন বাঙালি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হননি। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কোন বাঙালি যুগ্ম সচিবের পদ পর্যন্ত উঠতে পারেননি। নিয়ম পরিহাস ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বাঙালিদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের উচ্চতর, এমনকি মাঝারি পদ থেকে বিশেষ করে অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।[১৬] বাণিজ্য খাতে বড় আমদানি ক্যাটাগরি হোল্ডারদের শতকরা ৯৩ ভাগ অবাঙালি। পাকিস্তানের দু'অংশের আন্তঃবাণিজ্যও নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল অবাঙালিদের। রপ্তানি বাণিজ্য অনুরূপভাবে অবাঙালি কবলিত ছিল। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক অবাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক অর্থনৈতিক খাতও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করত। ব্যাংকিং এর ডিপোজিটর শতকরা ৭০ ভাগই

যেত অবাঙালি ব্যাংকগুলোতে। বীমা ব্যবসার বেশির ভাগই চালাতো অবাঙালি বীমা কোম্পানিগুলো।[১৭] বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাকমুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের শহরাঞ্চলীয় অর্থনীতি অবাঙালিদের কব্জায় ছিল।[১৮]

১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব বাঙলায় যেখানে শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা বেশি ছিল, সেখানে মাত্র দু'দশক সময়ের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষার হার অনেক বেড়ে যায়। ১৯৪৭ সালে থেকে তেইশ বছরে পূর্ব বাঙলায় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৪ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৭২ ভাগ। সরকারি স্কুলের সংখ্যা পূর্ব বাংলায় ৯০টি, পশ্চিম পাকিস্তানে ৬৫৩টি। সরকারি কলেজ পূর্ব বাংলায় ৩১টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১১৪টি।[১৯] শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে মাথাপিছু প্রায় ৫ টাকা। আর বাংলাদেশের মানুষের জন্য মাথাপিছু মাত্র কয়েক পয়সা। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা, আর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়া কলম্বো প্ল্যান, ফোর্ড-ফাউন্ডেশন, কমনওয়েলথ সাহায্য প্রভৃতি পরিকল্পনাধীনে বিদেশে অধ্যয়নের জন্য স্কলারশিপ ও ট্রেনিং গ্রান্ট পশ্চিম পাকিস্তান ব্যাপকভাবে ভোগ করেছে। কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পেয়েছে ১কোটি ৯১ লক্ষ টাকা, ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা।[২০] শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালিদের পেছনে রাখার যে সুচিন্তিত প্রয়াস চাকুরির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে একই ধরণের অবিচার। সরকারের উচু পদগুলোতে অবাঙালিরাই আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে দু'টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছিল। গর্ব করে এই দশকের নাম দেওয়া হয়েছিল 'উন্নয়ন দশক'। কিন্তু উন্নয়নের প্রায় সবটুকুই হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।[২১] কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের ৭০ শতাংশ ব্যয় হত সামরিক খাতে। সামরিক বাহিনীর তিনটি হেড কোয়ার্টারই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সেনাবাহিনীর শতকরা ৯৫ জনই ছিল ঐ অঞ্চলের। যার ফলে সামরিক বাহিনীর বরাদ্দকৃত খরচের সবটাই পেত পশ্চিম পাকিস্তান। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য যে ব্যয় হত মূলতঃ তা পশ্চিম পাকিস্তানেই হত, কারণ রাজধানী ছিল সেখানে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটের ৮৫% ভাগই গ্রাস করত পশ্চিম পাকিস্তান। আইয়ুব খান বৈষম্য অবসানের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে বৈষম্য আরও বেড়ে গেল। এ ভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে উদ্ভব ঘটেছিল পাকিস্তানের সুবিদিত ২২ পরিবারের। জাতির সমগ্র শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগ, বীমা সম্পদের ৭৫ভাগ এবং ব্যাংকিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এদের দখলে ছিল।[২২] পাকিস্তান বাংলাদেশের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে সম্ভাব্য সব প্রক্রিয়াতেই। ইসলামাবাদকে নতুন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যয় করা হল কয়েক'শ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ

লোকের বাস, সেখানে ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণের জন্য মাত্র ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।[২৩] রাজধানীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল সকল নাগরিক সুবিধা আর পূর্বাঞ্চল রয়ে গেল গ্রামীণ অর্থনীতি হিসেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দফতরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের মোট পাট উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ পূর্ব-বাঙলায় উৎপাদিত হতো। ব্যবসায়িক বিচার করে তাই পূর্ব বাংলায় পাটকল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু স্থাপিত ২৬টি পাটকলের প্রায় সবগুলোর মালিকানা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক পুঁজিপতিদের হাতে। ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা যায়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে ইস্পাত কারখানার জন্য ব্যয় করা হয় ৫৬কোটি পাউন্ড কিন্তু পূর্ব বাঙলায় এই ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ১১কোটি পাউন্ড। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অর্ধেক।[২৪] এইভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ হতে ৩০৫১ কোটি টাকা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রক্রিয়ায় দুই অংশের লোকদের আয়ের ব্যবধান ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায়।[২৫] এর ফলশ্রুতি হিসাবে পূর্ব-বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মধ্যে দেখা দিল হতাশা ও ক্ষোভ। আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চললো প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের আকাঙ্খা। এ, এফ, সালাহউদ্দিন আহমদ যথার্থই বলেছেন; "The Colonial attitide of West Pakistani Politicians bureaucrats, capitalists and military leaders, greatly strengthened regionalist feeling in East-Pakistan"[২৬]

পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব-বাংলার উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়। উৎপাদিত পণ্যের একচেটিয়া বাজার হিসেবে পূর্ব বাঙলাকে পাবার স্বার্থে এখানকার শিল্প বিকাশের পথকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছিল। যারফলে পূর্ব-বাঙলার উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষোভ ক্রমশ দানা বেঁধে উঠে। তারা আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় সমবেত হয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে শুরু করে। অর্থনৈতিক বিরাজমান বৈষম্য একদিকে যেমন এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহকে কঠিনতর করে তুলেছিল অন্যদিকে বাংলাদেশের বিকাশ আকাঙ্খা পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্তরায় হিসাবেও কাজ করছিল। ঐ পটভূমিতে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্বশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি করে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মধ্যে বিদ্যামান অর্থনৈতিক বৈষম্যকে পুঁজি করে আওয়ামী লীগের প্রদত্ত কর্মসূচি ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি মূলতঃ আঞ্চলিক অসমতাকে ভিত্তি করেই রচিত হয়।

১৯৬০ দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চাপ অধিকতর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল। পরিবর্তন এসেছিল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বর্ধিষ্ণু উন্নয়ণ বৈষম্য উচ্ছেদ করাটাকে পাকিস্তান

ফলাও করে গ্রহণ করেছিল একটা সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে। পাকিস্তান করকারের উচ্চস্তরে কিছু কিছু বাঙালি আমলা অধিষ্ঠিত হয়। সামরিক বাহিনীতেও বাঙালিদের অংশ সামান্য বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বাঙালি উদ্যোগের যৎসামান্য বিকাশ ঘটে। এসব সত্ত্বেও ৬০ দশকে পূর্ব বাংলার প্রবৃদ্ধির হার থেকে যায় ৪ শতাংশের নীচে। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ থেকে যায় জাতীয় আয়ের ৮ শতাংশের কাছাকাছি। ঐ সময়ে উন্নয়ন বৈষম্য বৃদ্ধি পায় বার্ষিক ৭.৪ শতাংশ হারে।[২৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন'[২৮] শ্লোগান তুলে আওয়ামী লীগ দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, স্বায়ত্বশাসন অর্জনের মাধ্যমেই বাংলার মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আসবে। আওয়ামী লীগের এই হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

৬০ দশকের শেষভাগে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে আসে বিরাট পরিবর্তন। ১৯৬৮-৬৯ এ স্বাধিকার আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রুপ ধারণ করতে থাকে। গণআন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সামরিক সরকার। সেনাবাহিনী প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নতুন সামরিক সরকার ১৯৭০ সালে প্রণয়ন করে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় মোট পরিকল্পিত, বিনিয়োগের মাত্র ৩৬ শতাংশ। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতি ও চাপের কারণে পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব বাঙলার অংশকে ৫২.৯ শতাংশে উন্নতি করতে বাধ্য হলেও তা কার্যকরী হয়নি।[২৯] পূর্ব-বাংলার জনমন থেকে আপেক্ষিক বঞ্চনার অনুভূতি দূর করতে পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা ১৮৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তিগুলোকে জোরদার করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে সহায়তা করে। এ কথা সত্য যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি।

অর্থমন্ত্রণালয়ের বাৎসরিক বাজেট রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, যে দেশের বাজেটের ষাট থেকে সত্তর ভাগ দেশরক্ষা বিভাগের জন্য ব্যয় করতে হয়েছে এবং বাজেটের এই বিরাট অংশ ভোগ করার পর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পক্ষে কোনক্রমেই ক্ষমতার দূরে থেকে শুধুমাত্র পেশাদার বাহিনী হিসেবে কাজ সম্ভব ছিল না। পরিসংখ্যানসমুহ অধিকাংশ বাঙালির এ বিশ্বাসকেই বদ্ধমূল করে যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভালো খায়, ভালো পরে। উন্নততর স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিক্ষালাভ করে এবং উন্নত পরিবেশে বসবাস করে। এই বিশ্বাস তাদের বঞ্চনার ধারণাকে তীব্র করে।

বৈষম্যগুলো অপসারণের জন্য প্রয়োজন ছিল সবকটি অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্যময় উন্নয়ন। ফেডারেল ব্যবস্থার সাফল্যের পূর্বশর্ত হল পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমানুপাতিক আচরণ। কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং অংশীদারী মনোভাব না থাকলে

কোন ফেডারেল ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারেনা। পাকিস্তানের ভাঙ্গনের মধ্যদিয়ে স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক জলন্ত উদাহরণ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এর মধ্যে পাকিস্তান একটি সম্মিলিত জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠেনি। তার কারণ ছিল বাঙালিদেরকে স্বায়ত্তশাসন দানে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর অস্বীকৃতি। মূলত, যে কোন ধরণের নির্বাচন কিংবা সাংবিধানিক সরকারের উপস্থিতিতেই ক্ষমতাসীন এলিটবর্গের শ্রেণী স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। একারণেই পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক নীতিমালার উপর ভিত্তিকরে কোন সুষ্ঠ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করেনি। বস্তুত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শক্তির ইতিহাস। ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় এক রক্তক্ষয়ী গৌরবদীপ্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের ও শোষণের অবসান ঘটে।

সূত্র নির্দেশ

১) Harun-al Rashid, The Ayub Regime and the Alienation of East Bangal, Indo-British Review - A Journal of History, Vol - Madras India 1989 177, - 188

২) আখলাকুর রহমান, যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, ২২

৩) রেহমান, সোবহান, বাংলাদেশের অভ্যুদয়- একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, (ঢাকা ১৯৯৪)৩০

৪) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র(ত্রয়োদশ খন্ড) বাংলাদেশ সরকার - ১৯৮২, ৩২৩

৫) প্রগুক্ত - ২০-২১

৬) বাংলার বাণী, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, মার্চ ১৯৭২

৭) আখলাকুর রহমান, প্রাগুক্ত ২০

৮) মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা, ঢাকা ইউপিএল, ১৯৯২) ৮

৯) আখলাকুর রহমান, প্রাগুক্ত ২০-২১

১০) ঐ ২২

১১) Reports of Economists on the fourth Five years Plan, Government of Pakistan.

১২) Vide Bangladesh, Documents, Ministry of External Affairs, New Delhi, -16

১৩) রেহমান, সোবহান, প্রাগুক্ত ৬০

১৪) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, ঢাকা সিটি লাইব্রেরি ১৯৯১, ২৭

১৫) প্রাগুক্ত ৬২

১৬) প্রাগুক্ত ৬৬

১৭) প্রাগুক্ত ৫২-৫৩, আরও দেখুন, Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, Public Enterprise in an Intermediate Regime : A study in the Political Economy of Bangladesh (Dhaka 1980)

১৮) Bangladesh Documents, -16

১৯) হাসান মুরশিদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাংস্কৃতিক পটভূমি, কোলকাতা, ১৩৭৮, ৫৪

২০) হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, ২৮

২১) আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তিসংগ্রাম, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭২ ৩৫-২৬ আরও দেখুন ঃ মেজবাহ কামাল, শ্রেণী দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, ১৯৮৪

২২) হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, ৩১

২৩) ঐ ২৯, আরও দেখুন মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে ঢাকা. ১৯৮১, ১২

২৪) Bangladesh Documents - 16

২৫) হাবিবুর রহমান - প্রাগুক্ত, ২৯-৩০

২৬) A. F. Salauddin Ahamed, Bangladesh Tradition and Transformation , Dhaka, UPL, 1987-80

২৭) আখলাকুর রহমান, প্রাগুক্ত, ২২

২৮) আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারপত্র, ১৯৭০

পূর্ববঙ্গে বিহারিদের অভিবাসন এবং রাজনীতিতে এর প্রভাব

আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন

চল্লিশের দশক থেকে ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রকট রূপ লাভ করতে থাকে। বিশেষত ১৯৪৬ সালে কলকাতা ও বিহারে সংঘটিত দাঙ্গা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পরের বছর পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর স্বেচ্ছা অভিবাসী হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও আসামসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশ) চলে আসে। ১৯৫০ সালের মধ্যে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১লক্ষ। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এদের মধ্যে ৩,২৮,৪৩৩ জন ছিল বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে আগত উর্দুভাষী। পূর্ববঙ্গে উর্দুভাষীরা 'বিহারি' নামে পরিচিত এবং ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় আদমসুমারিতে এদের সংখ্যা ৬,৭১,৮৪৪ জনে উন্নীত হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১০ লক্ষে। ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই বিহারি সম্প্রদায় পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল ও শাসক গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনধারা অনুসরণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিভূতে পরিণত হয়। পাকিস্তান সরকার তাদের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা করে এবং এর মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের মূল স্রোতধারা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। বিহারি সম্প্রদায় চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষে অবস্থান, ষাটের দশকে সামরিক শাসকের পক্ষে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বিরোধী কর্মকান্ডে অংশ নেয়। এসব ভূমিকা বিহারিদের প্রতি বাঙালিদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাই স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি বাহিনীর পাশাপাশি বাঙালির ক্ষোভ তাদের ওপরও গিয়ে পড়ে।

বিহারিদের অভিবাসন ঃ

মূলত ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতা দাঙ্গা[১] এবং ওই একই বছরের অক্টোবর - নভেম্বর মাসে বিহারে সংঘটিত ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার[২] ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। সে যাত্রা বিহারের ৩ লক্ষ মুসলমান কলকাতা মহানগরীসহ পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেয়।[৩] সে সময় কতজন মুসলমান পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করেছিল তার সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও দাঙ্গাপীড়িত বিহার ও কলকাতার বেকার মুসলমানদের বেশ কয়েকহাজার পূর্ববঙ্গে বসতি গড়ে তোলে। এদের মধ্যে ভারতের বিহার

ও উত্তর প্রদেশ থেকে আগতদের অনেকে দেশের উত্তরাঞ্চলে রেল বিভাগে শ্রমিকের চাকরি নেয়।[৪] ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান হবে বলে শান্তিপ্রিয় মানুষ আশা করেছিল। কিন্তু ভারত বিভক্তির দিন অর্থাৎ ১৪ আগস্টেই পাঞ্জাবে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় দাঙ্গার সূচনা হয় এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত দুটি দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দেশত্যাগ করে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়। ফলে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পাঞ্জাবের ৪০ লক্ষ ৬০ হাজার মুসলমান তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়।[৫] যদিও ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় চাইতে ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার প্রকোপ বিহার ও কলকাতায় কম হওয়ায় পূর্ববঙ্গে এ পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে কম লোকই আসে। তবে এ বছরই ভারত ও পাকিস্তান সরকার স্বেচ্ছায় অপশন নিয়ে দুটি অংশে চলে যাওয়ার আইনগত স্বীকৃতি দেয়ায় ভারত থেকে মুসলমান ও পাকিস্তান থেকে হিন্দু এবং শিখদের ভারতে গমন শুরু হয়। ফলে ১৯৪৭ সালের মধ্যেই ৭২ লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানে চলে আসে এবং পাকিস্তান থেকে ৫৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ ভারতে চলে যায়।[৬] এ পর্যায়ে ঠিক কতজন মুসলমান পূর্ববঙ্গে আসে তার হিসেব পাওয়া না গেলেও যোগাযোগের সুবিধার কারণে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশের কিছু সংখ্যক শরণার্থী এখানে এসে আশ্রয় নেয়। তবে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৫,০০০ রেল শ্রমিক ও কর্মী ১৯৪৭ সালের পর পর পূর্ববঙ্গে আসে এবং তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরের মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের রেলওয়েতে প্রায় ৭০,০০০ শরণার্থী[৭] পুনর্বাসিত হয়। এরপর স্বেচ্ছায় ও দাঙ্গাজনিত কারণে মুসলমানদের আগমন অব্যাহত থাকে এবং ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাদের সংখ্যা সরকারি হিসেবে ১১লক্ষে উন্নীত হয়।[৮] যদিও পাকিস্তানের প্রথম আদমসুমারিতে শরণার্থীদের সংখ্যা ৬,৯৯,৯৭৯ জন বলে উল্লেখ করা হয়(সারণি ১)।[৯] অবশ্য সরকারি ঘোষণা ও আদমসুমারির মধ্যকার এই বিস্তর ব্যবধানের মূলে কাজ করেছে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির প্রভাব, বিপুল সংখ্যক শরণার্থী তাদের স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন এবং তালিকাভুক্ত না হওয়া। এই শরণার্থীদের মধ্যে, আদমসুমারির হিসেব মতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪,৬৬,৮১৫ জন আসে এবং তারা ছিল মোট শরণার্থীর ৬৬,৬৯%।[১০]

১৯৫০ সাল পর্যন্ত আগত মোহাজেরদের বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান। মূলত ১৯৪৯-৫০ এর কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে এসময় কলকাতার ২ লক্ষ মুসলমান পূর্ববঙ্গে চলে আসে।[১১] বিহারিরা সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে ছিল এবং এদের বড় অংশ মূলত রাজশাহী বিভাগে তাদের আবাস গড়ে তোলে। আসামের মুসলমানরা ঢাকায় বসতি গড়ে তোলে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম থেকে আসা মোহাজেরদের বড় অংশ বাঙালি হলেও বিহার ও উত্তপ্রদেশের প্রত্যেকেই ছিল উর্দুভাষী। এদের সংখ্যা ছিল ৩,২৮,৪৩৩ জন। এদের মধ্য থেকে ১,১৮,১৮১জন এবং দিল্লি ও পাঞ্জাব থেকে আগত ২,০১৩ জনের সবাই ছিল

উর্দুভাষী।[১২] এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, উর্দুভাষীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বিহারি। এই মোহাজেরদের মধ্যে সরকার ঢাকা বিভাগে ১,৬২,৮৫৫ জনকে, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪১,৯৩৫ জনকে এবং রাজশাহী বিভাগে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪,৯৪,২৮৯ জনকে পুনর্বাসিত করেন।[১৩] অবশ্য এই তালিকায় উর্দুভাষীদের আলাদা করে দেখানো হয়নি। তবে এই তালিকা (Statement No 8.2)থেকে ভাষাভিত্তিক ও জেলাওয়ারি পুনর্বাসনের হিসেব থেকে দেখা যায় যে, উর্দুভাষীদের প্রধানত ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, হাওড়া, বগুড়া, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুরে পুনর্বাসিত করা হয়।

সারণি - ১

উর্দুভাষী মোহাজেরদের জেলাওয়ারি পুনর্বাসন

জেলার নাম	মোহাজের সংখ্যা
১. চট্টগ্রাম	১৯,৭১৪
২. ঢাকা	৮৯,৪৪৮
৩. ময়মনসিংহ	৩১,৬৪১
৪. দিনাজপুর	৪৭,৮৭২
৫. বগুড়া	২২,৩৮২
৬. যশোর	৫,৩০৫
৭. কুষ্টিয়া	৫,৫০৪
৮. পাবনা	১০,৫৪১
৯. রাজশাহী	১৩,২৭১
১০. রংপুর	৮২,৭৫৫
মোট	**৩,২৮,৪৩৩ জন**

Source : Census of Pakistan 195 Vol 3 P. 114.

সারণি-১ থেকে দেখা যায়, শুধু রাজশাহী বিভাগে ১,৮৭,৬৩০ জন উর্দুভাষী পুনর্বাসিত হয়। এর ফলে পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে সবচেয়ে অধিক উর্দুভাষীর যেখানে বসবাস, সেই রংপুরকে কেন্দ্র করে তাদের মূল ঘাঁটি গড়ে ওঠে।

১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী, ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আগত[১৪] মোহাজেরদের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দেয়া হয় এবং এদের মধ্যে ৭ লক্ষ তৎকালীন পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ তথা পাকিস্তানের নাগরিকত্ব লাভ করে।[১৫] এদের ভাষাভিত্তিক তালিকা থেকে দেখা যায়, উর্দু ভাষীরা ছিল মোট জনসংখ্যার ১.১০%। তবে

১৯৬১ সালের আদমসুমারিতে এদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৩২%-এ। অর্থাৎ এসময় উর্দুভাষী জনসংখ্যা বেড়ে ৬,৭১,৮৪৪ জনে উন্নীত হয়। ১৯৫২ সালে নাগরিকত্ব দেয়ায় মোহাজেরদের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ হয়। ১৯৫১ সালের চেয়ে প্রায় ১০০% -এরও বেশি। মূলত ভারতের দাঙ্গাজনিত কারণ ও স্বাভাবিক জন্মহারের কারণেই এই বৃদ্ধি ঘটেছে।[১৬] উর্দুভাষীদের সংখ্যা ১৯৭১ সালের মধ্যে ১০ লাখে উন্নীত হয় বলে কোনো কোনো গবেষক মত প্রকাশ করেন।[১৭] এই বিপুল সংখ্যক অবাঙালির অধিকাংশই বিহার প্রদেশ থেকে আগত এবং একারণে বাংলাদেশের উর্দুভাষীরা 'বিহারি' নামেই পরিচিত।

পুনর্বাসন ঃ

পূর্ববঙ্গে এই বিহারি সম্প্রদায় যারা মোহাজের নামে পরিচিত ছিল তারা প্রথম থেকেই পাকিস্তান সরকারের আনুকূল্য পায়। এর মধ্যে উর্দুভাষীদের মুসলিম লীগ প্রথম থেকেই তাদের এদেশীয় প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে। এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বড় অংশের ভাষা ছিল উর্দু এবং বিহারিদের ভাষাও উর্দু। পাকিস্তান সরকার মোহাজেরদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থানের জন্য সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দেয়। এর ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই উর্দুভাষী বিহারিরা পূর্ববঙ্গের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে।

রাজনীতিতে ভূমিকা ঃ

মোহাজেরদের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষীরা ভাষা, জীবনধারা, সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে স্থানীয় বাঙালিদের সঙ্গে একাত্ম হলেও উর্দুভাষীরা ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অনুসরণ করায় পূর্ববঙ্গে তারা একটি পৃথক শিবিরভুক্ত হয়ে পড়ে। তারা স্থানীয় মুসলমানদের চেয়ে নিজদেরকে খাঁটি মুসলমান ও পাকিস্তানি হিসেবে দাবি এবং স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নীতিকে একনিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শুরু করে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে প্রথম থেকেই তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে একাত্ম হয়। ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা, কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুর, নীলফামারী, দিনাজপুর, যশোর, খুলনাসহ, বিভিন্ন এলাকার উর্দুভাষী মোহাজেরদের সঙ্গে বাঙালিদের সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও মুসলিম লীগের ছত্রছায়ায় বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর তারা আক্রমণ চালায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের পর পাকিস্তান সরকার বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিহারিদের ব্যবহার করে। নির্বাচনের পর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী আওয়ামী লীগকে পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি এবং ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার আসন্ন ৩ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া হিসেবে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ যেসব

এলাকায় বিহারি বসতি ছিল, সেসব এলাকায় অবস্থিত তাদের দোকানপাট ও প্রতিষ্ঠানাদি বাঙালি বিক্ষোভকারীদের শিকার হয়। কোথাও কোথাও বিহারি কলোনিগুলোও আক্রান্ত হয়। যেসব এলাকায় আবার অবাঙালিদের প্রাধান্য ছিল সেখানে তারা বাঙালিদের ওপরও অনুরূপ আক্রমণ চালায়। ঢাকার মোহাম্মদপুর, মীরপুর, উত্তরবঙ্গের সৈয়দপুর, চট্টগ্রামের কয়েকটি বিহারি অধ্যুষিত এলাকাতেও বাঙালিরা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। চট্টগ্রামে ২-৪ মার্চের দাঙ্গায় উভয় পক্ষের ১২০ জন নিহত হয়।[২০] ৬মার্চের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিহতেব সংখ্যা ১০০০জনে উন্নীত হয়।[২১] ২৫ মার্চ পর্যন্ত কতজন বাঙালি বিহারিদের হাতে মারা যায়, তার সরকারি হিসেব না পাওয়া গেলেও ২৫ মার্চে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে বরাবরের মতো নিজেদের আক্রমণকে যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন করার জন্য বাঙালি কর্তৃক বিহারিদের ব্যাপক গণহত্যাকে দায়ি করা হয়। সরকারি নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা, ১৯৭১ সালের ৫ আগষ্ট পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে সরকার অবাঙালিদের রক্ষা করার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে এবং এর জন্য সরাসরি আওয়ামী লীগকে তারা দায়ি করে। অথচ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনসহ বাঙালি নেতৃবৃন্দ মার্চ মাসের প্রথম থেকে দাঙ্গা বন্ধ করার আহ্বান সংবলিত বিবৃতি প্রচার এবং এই লক্ষ্যে তারা সমাবেশও করেন।[২২] তাদের তৎপরতার ফলেই ৭থেকে ২৫ মার্চ সময় পরিসরে অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ কবা সত্ত্বেও সহিংসতা অনেকাংশে কমে আসে।[২৩]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিহারি সম্প্রদায়ভুক্ত সবাই পাকিস্তানিদের সহযোগীতে পরিণত হয় এবং রাজাকার, আলবদর, আল শামস, পাক মিলিশিয়াসহ সব ধরণের ঘাতক বাহিনীতে যোগ দেয়। এসব বাহিনীতে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ লক্ষ।[২৪] জেনারেল নিয়াজি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, বাঙালিরা এসব বাহিনীতে যোগ দিলেও তাদের বিশ্বাস না করায় ভাবি অস্ত্র বাঙালিদের না দিয়ে বিহারিদের দেয়া হয়।[২৬] এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত স্থানে, যেমন শিল্প কেন্দ্র, বিমান বন্দর ও সমুদ্র বন্দর ইত্যাদি প্রহরার দায়িত্বও বিহারিদের দেয়া হয়। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে হত্যা, লুট, নির্যাতন নারী ধর্ষণ এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডে এরা সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মারফত উর্দু অনুষ্ঠান প্রচার ও অবাঙালিদের মুক্তি যুদ্ধে যোগদান বা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হলেও তাদের মধ্যে এর কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি।[২৭] বরং পাকিস্তান সরকার বিশ্ববাসীর কাছে আওয়ামী লীগকে যতো রকম ভাবে পারা যায় হেয় করা এবং বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ও গৃহযুদ্ধ হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করে যুদ্ধের পাঁচ মাস পর ৫ আগষ্ট প্রকাশিত শ্বেতপত্রে বাঙালিদের হাতে প্রায় ৬০,০০০ বিহারির মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করে।[২৮] এই হিসাবে ২৫মার্চ-এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি রাজাকার বাহিনী গঠনের আগে পর্যন্ত নিহতের সংখ্যাকেও ধরা হয়েছে। যদিও প্রবাসী

বাংলাদেশ সরকার শ্বেতপত্রকে Bunch of white lies বলে মন্তব্য করে।[২৯] বাঙালি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জিল্লুর আর খান মনে করেন, একাত্তরে বিহারিদের মৃত্যুর সংখ্যা ৫০০০-এর বেশি হবে না।[৩০] এই হিসেবকেই সঠিক বলে ধরে নেয়া যায়।

অবশ্য পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক হস্তক্ষেপকে বিধিসম্মত করতে বিহারিদের হত্যাকান্ড সংক্রান্ত বিবরণাদি ফলাও করে প্রচার করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার রূপকার জেনারেল আকবরের একটি মন্তব্য থেকে এটা পরিস্কার হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগের বিহারি নিধন সংক্রান্ত মহাপরিকল্পনার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতেই ২৫ মার্চ সেনা অভিযানের প্রয়োজন দেখা দেয়।[৩১] অথচ বিহারিদের হাতে কতজন বাঙালির মৃত্যু হয়েছে, তিনি তার উল্লেখ করেননি। শ্বেতপত্র দেখলে মনে হয় বাঙালিরা বিহারি ও পাকিস্তানি সৈন্যদের মারলেও একজন বাঙালিও পাকিস্তানিদের হাতে মারা যায়নি। অথচ নিউইয়র্ক টাইমসের ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের এক রিপোর্টে বলা হয়, বিহারিরা একাত্তরে শুধু আদমজি জুট মিলেই ৩০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করে। সৈয়দপুরে দেড় হাজার বাঙালি বিহারিদের হত্যাকান্ডের শিকার হয়।[৩২] প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান উল্লেখ করেন ২৮ এপ্রিল ঢাকা-আরিচা রোডের কয়েকটি বাস আটক করে বিহারিরা ৫০০ বাঙালিকে হত্যা করে।[৩৩] বাঙালিদের ওপর পরিচালিত বিহারিদের হত্যাযজ্ঞের সাক্ষ্য নিজদের অবচেতন মনে বহির্প্রকাশস্বরূপ পাকিস্তানি জেনারেলরাই দিয়েছেন। রাও ফরমানের ভাষায়ঃ 'নিজেদের সঙ্গীদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ ভাবাবেগের কাছে তারা (বিহারি) পরাভূত হয়ে পড়ে। এর সদস্যদের কেউ কেউ তাদের কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করে এবং যথাযথ বিচার ছাড়াই অসংখ্য অসামরিক ও পুলিশ অফিসিয়ালকে হত্যা করে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো মুক্ত করার পর বিহারিরা যখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করছিল আর্মি তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়নি'।[৩৪] অবশ্য তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ না হলেও জেনারেল নিয়াজির ভাষায়, তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় ভারি অস্ত্র এবং এতে করে অধিক হারে বাঙালি হত্যাযজ্ঞে তারা উৎসাহিত হয়। ফলে বিহারি -অধ্যুষিত এলাকা, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে, বিহারিদের হাতে বিপুল সংখ্যক বাঙালি প্রাণ হারায়।

একাত্তরে নয় মাস জুড়ে বাঙালির ওপর বিহারিদের নিষ্ঠুরতম অত্যাচার বিহারিদের প্রতি বাঙালিদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং এরই পরিণতিতে স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি হানাদারদের পাশাপাশি বিহারিদের ওপর বাঙালিদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার, সচেতন বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা বিহারিদেরকে এই প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে বাঁচানোর জন্য সচেতন হয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছু কিছু সুযোগ সন্ধানী বাঙালি যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে চলে। *যদিও ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় বিহারি ও পাকিস্তানি বাহিনীকে বাঙালিদের গণরোষ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।*

উপসংহারে বলা যায় যে, বিহারি সম্প্রদায়ের পাকিস্তানপন্থী ভূমিকা তাদের বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে দেয়। পাকিস্তানি শাসক, সামরিক চক্রের পক্ষে অবস্থান এবং বাঙালি স্বার্থ বিরোধী ভূমিকার কারণে তারা পূর্ববঙ্গে পরজীবী হিসেবে বেড়ে ওঠে। বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলন বিমুখ ভূমিকা, কখনো কখনো ষড়যন্ত্র তাদের বাঙালিদের কাছ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যা, ধ্বংস যজ্ঞে সক্রিয় অংশ গ্রহণ, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা তাদের বাঙালির কাছে ঘৃণিত করে তোলে। যদিও ক্ষমাশীল বাঙালি জাতি স্বাধীনতার পর তাদের নিরপত্তা ও আশ্রয় দেয় এবং এক তৃতীয়াংশ বিহারিকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। পাকিস্তান গমনের জন্য বাকিদের ইচ্ছে শর্তেও সীমিত সংখ্যক ফেরত নিয়ে পাকিস্তান কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে প্রত্যাবাসন বন্ধ করে দেয়। এভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এ সম্প্রদায়কে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করলেও পাকিস্তান তাদের স্বদেশ ফেরত নেয়নি। যা আন্তর্জাতিক আইনেরও পরিপন্থী। অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থী মানসিকতার জন্য বিহারিরা বাঙালির জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ও মিশে যেতে পারেনি।

সূত্র নির্দেশ

১) কলকাতা দাঙ্গায় প্রথম ৫ দিনে ৫ হাজার ও মতান্তরে ১০ হাজার লোক নিহত হয়। কলকাতা দাঙ্গা আগস্ট মাসে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বে ও পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা দাঙ্গার সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য H.V.Hardson, *The Great Divide* (Karachi : Oxford University Press, 1988) p.66-67; Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman* (New York : Cambridge University Press, 1994), p.215; Lord Wavells, 'Indian Acheivement' The Round Table, No. 145, December 1946 p. 64-66; *দৈনিক আজাদ*, (কলকাতা). ২৫, ২৮ আগস্ট, ২, ৪, ৫, ১৯, ২৪, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬।

২) মুসলিম লীগ ও মুসলিম নেতাদের দাবি বিহারের দাঙ্গায় ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ মুসলমান নিহত হয়। যদিও কংগ্রেস দাবি করে, এদের মৃত্যু সংখ্যা ২০০০ থেকে ৫৪০০ জন। ব্রিটিশ সরকারের মতে, মৃত্যু সংখ্যা ৭ থেকে ৮ হাজার। বিহারের দাঙ্গা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Papiya Ghosh, 'Bihari Muslims in Dhaka : A Background Study of the 1946 Riots', in Sharifuddin Ahamed *(Ed.) Dhaka : Past, Present and Future* (Dhaka : Bangladesh Asiatic Society, 1991), *p.91; Reports on Disturbances in Bihar and UP* (Muslim Information Centre : 1946), P/T. 3363, IOL; N.N.Mitra(ed), *The Indian Annual Register,* July-December 1946; (Calcutta : 1947, p. 255 and 208; Mohammad Ibrahim Wali, 'Annotation of the sad Plight of the Biharis'; in *Tragedy of Pakistan and Nation*) (Dhaka; SPGRC, n.d.) p.5. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: *নওরোজ*, ১৯৭৫, পৃ.২৫৬-২৫৮ *সাপ্তাহিক*

মিল্লাত (কলকাতা) ১৫,২২ নভেম্বর; শৈলেন কুমার বন্দোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১৩৯৯, পৃ. ৫৭-৫৯।

৩) সাপ্তাহিক মিল্লাত, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭।

৪) আটকে পড়া পাকিস্তানি প্রত্যাবাসন কমিটির (SPRGC) প্রধান পৃষ্ঠপোষক নাসিম খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭। এই সংগঠনের অপর অংশের সভাপতি এজাজ আহমদও এমত প্রকাশ করেন। নাসিম খান নিজেও এসময় পূর্ববঙ্গে আসেন ও রেলওয়ে গার্ডের চাকরি নেন।

৫) Ian Talbot, *Freedoms Cry : The Popular dimension in the Pakistan Movement and Partition Experence in North West India* (Oxford; Oxford University Press 1996), p. 161.

৬) R. Symonds, *The Making of Pakistan* (London : Faber 1951), p. 83; আরো দ্রষ্টব্য ঢাকা প্রকাশ (ঢাকা), ২২ আগস্ট ১৯৪৮।

৭) *Quaid-I-Azam Mohammad Ali Jinnah Speeches as Governor-General of Pakistan 1947-1948* (Islamabad : Ministry of Information and Broadcasting, n.d.), p.83। রেলওয়ে সেক্টরে পূর্ববঙ্গের উন্নয়নের জন্য ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার আগে থেকেই ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে পার্বতীপুর ও দিনাজপুর রেলওয়ে কারখানায় উর্দুভাষী বিহার ও উত্তর প্রদেশের শ্রমিকদের নিয়োগ দেয়া হয়। সেই সূত্রে এখানে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এ দুটি অঞ্চলের উর্দুভাষীরা আসে এবং রেলওয়েতে যোগ দেয়।

৮) *দৈনিক আজাদ*, ২৫ জুন ১৯৫০ আরো দ্রষ্টব্য Five Years of Pakistan 1947-52 (Karachi : Pakistan, n.d.) p.144-145

৯) *Census of Pakistan 1951, Vol. 3, East Bengal,* (Karachi : Manager of Publications, Government of Pakistan, n.d.),p.34. ভারতে শরণার্থীরা বাস্তুত্যাগী, শরণার্থী হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচিত হলেও পাকিস্তানে তারা মোহাজের নামে পরিচিত ছিল। মূলত দেশত্যাগকে ধর্মীয় আবরণ দেয়ার জন্য ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ (স.:) মক্কা থেকে মদিনা হজরতের অপর সাথীদের মোহাজের বলা হতো। ওই নামকরণের সঙ্গে এই দেশত্যাগের তুলনা করে দেশত্যাগে উৎসাহিত করা হয়। পাকিস্তানের স্থানীয় মুসলমানরা ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের আশ্রয়, খাদ্য ও পুনর্বাসনে সহযোগিতা দেয়।

১০) *Ibid,* p.80.

১১) *Economy of Pakistan* (karachi : Ministry of Economic Affairs, 1961), p.387.

১২) *Census of Pakistan, op. cit.,* p. 114.

১৩) *First Census of Pakistan,* Vol. 8, p. 1-13, 1-14, 1-5.

১৪) সরকারি হিসেবে এসময় আগত মোট শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪,০৩২০৮ জন। দ্রষ্টব্য দৈনিক আজাদ, ৮ এপ্রিল ১৯৫২।

১৫) ঐ, ৪ মে ১৯৫২। নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ১৯৪৭ সালে গৃহীত ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেখাতে হতো। তবে সরকারি কর্মচারীদের জন্য এটি শিথিল করা হয়।

১৬) *Census of Pakistan Population 1961,* Vol II (karachi : Home Affairs Division and Ministry of Home and Kashmir Affairs, 1964), p. IV-21.

১৭) Mohammad Tajuddin, "The Stateless People in Bangladesh : A Study'; in Barun De and Ranabir Samaddar (Eds.) *State, Development and Political Culture Bangladesh and India* (Calcutta : 1997), p.216.

১৮) দৈনিক আজাদ, ১৫ অক্টোবর ১৯৬৯। অবাঙ্গালি প্রত্যাবাসন কমিটির নেতা এজাজ আহমদ সিদ্দিকী মনে করেন এই দাবিটি ছিল বিহারিদের স্বার্থ-বিরোধী। আঞ্জুমানে মোহাজেরিকে তিনি একটি কোটারি সমিতি বলে মন্তব্য করেন। দ্রষ্টব্য, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২ জুন ১৯৯৭।

১৯) এজাজ আহমদ সিদ্দিকী অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

২০) দৈনিক আজাদী (চট্টগ্রাম), ৫ মার্চ ১৯৭১।

২১) A. M. A. Muhith, *Bangladesh Emergence of a Nation* (Dacca : Bangladesh Book International, 1978), p. 202.

২২) দ্রষ্টব্য নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলো(ডাকা : ওয়ারী বুক সেন্টার, ১৯৯২), পৃ. ২৮; দৈনিক ইত্তেফাক, ৮, ২০ মার্চ ১৯৭১।

২৩) Mohammad Tajuddin, *op. cit p. 207.*

২৪) নাসিম খান একথা বলেন। দ্রষ্টব্য *Sunday (India), 12-18 January 1986.*

২৫) Kessing's, Vol. XVIII, 1971-72, p. 25114.

২৬) A. A. K.Niazi, The Betrayal of East Pakistan (Oxford, Oxford University Press, 1988, p. 75-79.

২৭) Mohammad Tajuddin, *op.cit.*, p. 208.

২৮) হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ৭ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২-৪৭১, নাসিম খান দাবি করেন, ১ লক্ষ বিহারি যুদ্ধের সময় মারা গিয়েছে।

২৯) *Times of India,* 8 August 1971.

৩০) *Zillur R. Khan, Martial Law to Maritial Law Leadership Crisis in Bangladesh* (Dhaka : UPL 1984), p. 88.

৩১) *Pakistan Affairs* Embassy of Pakistan, Warshington DC, 11 May 1971; AMA Mutith, *op.cit.*

৩২) সৈয়দপুরের মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক আফসার আলি আহমদের ভাষ্য, দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ২২।

৩৩) আতাউর রহমান খান, অবরুদ্ধ নয় মাস (ঢাকা : মোহনা প্রকাশনী ১৯৯১), পৃ. ৪৬

৩৪) রাও ফরমান আলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯

৩৫) A. M. K. Muswani, *Subversion in East Pakistan*, (London : 1974), p.258.

ভারতের ছিট্‌মহল সমস্যা ঃ বেরুবাড়ী থেকে তিনবিঘা

মাধুরী পাল

ছিট্‌মহলের সংজ্ঞা ও সীমানা ঃ

ছিট্‌মহলের আভিধানিক অর্থ খণ্ডিত অথবা বিচ্ছিন্ন ভূমি। কিন্তু শুধুমাত্র খণ্ডিত অথবা বিচ্ছিন্ন ভূমি বললে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না। ছিট্‌মহলগুলি সাধারণতঃ ভিন্ন রাষ্ট্রের স্থলভাগ দিয়ে বন্দী দ্বীপ বিশেষত অর্থাৎ ভারতের বিচ্ছিন্ন কিছু ভূমিভাগ যা প্রতিবেশ রাষ্ট্র প্রথমে পাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে তাদেরকেই ভারতের ছিট্‌মহল বলে আমরা উল্লেখ করছি। ভারতের অধিকাংশ ছিট্‌মহলই কুচবিহার জেলার অন্তর্গত তথা পশ্চিমবঙ্গের অংশ বিশেষ।

ছিট্‌মহল উদ্ভবের ইতিহাস ঃ

জানা যায় ১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মোগল ফৌজদার আলিকুলি খাঁ কোচবিহারের রাজা রূপনারায়ণের সাথে সন্ধি করেন। এই সন্ধির দ্বারা ফলেপুর, কাকিনা ও কাজির হাট চাকলা মোগল সাম্রাজ্যের এবং বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ চাকলা কোচবিহার রাজ্যের সীমানা নিৰ্দ্ধারিত হয়। কিন্তু এই সন্ধি বাংলার নবাব নাজিম অনুমোদন করেন নি। এরপর মোগল ফৌজদার নিজামত উল্লা কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত চাকলা করদ কর দাবি করলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পরে। ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার নাজিম জাহান খাঁ তিনটি চাকলা দখল করেন কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সকল চাকলা বেশিদিন নিজ দখলে রাখা সম্ভব নয়। তাই তিনি ঐ সকল চাকলা কোচবিহার রাজাকে ইজারা দিতে চাইলে, রাজা এ ধরণের ইজারা গ্রহণে অপমানিত বোধ করলে, ছত্র নাজির (সেনাধ্যক্ষ) শান্তনু নারায়ণ মহারাজের পক্ষে ঐ সব চাকলা ইজারা নেন।'[১]

কোচবিহার রাজ্যের সীমান্তের বেশ কিছু খণ্ড খণ্ড এলাকা মোগল সৈন্যরা দখল করে নেয়। নবারের প্রতি এদের আনুগত্য ছিল অটুট। এই খণ্ড খণ্ড গ্রামগুলিই পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) ছিট্‌মহল। স্থানীয় অধিবাসীরা যাকে মোগলম (MOGLAM) বলেন। আবার পাটগ্রাম, বোদা, পূর্বভাগ ছিট্‌মহলগুলিতে এমন অনেক প্রজা বাস করতেন যারা কোচবিহারের মহারাজের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করতেন। এই প্রজাদের রাজগির (RAJGIRS) বলা হত। যেমন, হলদি বাড়ির সাকালু প্রধান এবং টেপার মাধব রায়।[২]

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে ফরমান লাভ করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে বড়ই আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৭৮৭ থেকে ১৮০০ মধ্যে পাটগ্রাম, বোদা ও পূর্বভাগ

ছিট্‌মহল তিনটিতে কোম্পানি নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। অবশ্য ছিট্‌মহলগুলির প্রজাদের কোম্পানির 'হস্ত-ও-বুদ'-এর (HAST-O-BUD) আওতার বাইরে রাখা হয়। এর মধ্যে দিয়ে চিট্‌মহলগুলির উপর কোচবিহারের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।[৩]

ইংরেজ শাসনকালে ছিটের অধিবাসীরা নিজ নিজ রাজ্যে যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধার সমুখীন হননি।[৪] কিন্তু ১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার (Radcliffe Award) মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের। যার ফলে ছিট্‌মহলগুলি নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী ভারত ও বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে রয়ে যায়।

ঐ সময় দেখা যায় যে, ভারতের মধ্যে তদানীন্তন পাকিস্তানের ৯৫টি ছিট্‌মহল ঢুকে পড়েছে। যার আয়তন প্রায় ১২,২৮৯,৩৭ একর।

অনুরূপ ১৩০টি ভারতীয় ছিট্‌মহল পাকিস্তানের মধ্যে রয়েছে. যার আয়তন প্রায় ২০,৯৫৭,০৭ একর। পরবর্তীকালে ২৭।৬।৫২ তাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নোটিশ নং ২৪২৭-PL/PIJ-৪/৫২ অনুযায়ী চারটি ছিট্‌মহল কোচবিহার জেলার থেকে জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে আনা হয়।[৫]

মূলত: ভারত বিভাজনের পর থেকেই ছিট্‌মহল সমস্যার উদ্ভব। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষতঃ ত্রিস্রোতা, জনমত, ছিট্‌মহল সমস্যা নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয়। ভারতের সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ জলপাইগুড়ি এলে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ছিট্‌মহল সমস্যা সম্পর্কে রাজেন্দ্র প্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছবি এঁকে দেখাবার পর সভাপতি বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন।[৬]

ভারত পাকিস্তান সীমান্ত সমস্যা যা র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার থেকে শুরু Bagge Awards ও তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ যখন বিভাজন রেখা টানেন তখন তিনি থানার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু বেগ যখন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সীমানা নির্ধারণে এলেন তখন তিনি সমস্যার সম্মুখীন হন।[৭] কারণ তিনি লক্ষ্য করেন র‍্যাডক্লিফ দাগ টানার সময় তেঁতুলিয়া, পচাগড়, পাটগ্রাম, দেবীগঞ্জকে খেয়াল রাখলেও বোদা থানাটিকে উপেক্ষা করে গেছেন।[৮] যার ফলে দাগ ও বিবরণের মধ্যে জটিলতা দেখা যায়। এদিকে বেরুবাড়ী ইউনিয়ন নং ১২ জলপাইগুড়ির। ফলে বেগ যে সমস্যার সম্মুখীন হলেন তার সমাধান করতে পারলেন না।[৯]

নেহেরু-নুন চুক্তি (১৯৫৮) এবং বেরুবাড়ী আন্দোলনের উদ্ভব ঃ

উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ তারিখে দিল্লীতে ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথ সচিব শ্রী এম. কে. দেশাই এবং পাকিস্তানের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব শ্রী এম. এস. এ. বেগ একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১২ ই সেপ্টেম্বর দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহেরু ও শ্রী ফিরোজ খাঁ নুন এক যুক্ত বিবৃতিতে এই চুক্তির কথা প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা

করেন, বেরুবাড়ীর অর্ধাংশ পাকিস্তানকে দেওয়া হবে।[১০] এছাড়া এই চুক্তির অন্যতম ১০ নং ধারার মূল কথা হল—"(10) Exchange of old Cooch-behar enclaves in Pakistan and Pakistani enclaves in India without Claim to Compensation for extra area going to pakistan is agreed to."[১১]

১৩ই সেপ্টেম্বর বিভিন্ন সংবাদপত্র যখন এই নেহেরু নুন চুক্তির সংবাদ প্রকাশিত হল, তখন এর প্রকৃত তাৎপর্য অনেকেই বুঝতে পারেন নি। বেরুবাড়ী সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাদেশিক ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক রূপে অধ্যাপক শ্রী নির্মল বসু চিঠি পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কমনওয়েলথ সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবের নামে। এছাড়া সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে ৩রা অক্টোবর নির্মল বসুর নামে ব্যবহারজীবী শ্রী অমর চক্রবর্তী মামলা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য সচিবের বিরুদ্ধে। কলিকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বিচারপতি নেহেরু-নুন চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের নিকট বেরুবাড়ী অর্পণ করার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের সচিব এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের ওপর 'রুল' জারি করেন।[১২]

১৯৫৯ - ৮ই এপ্রিল বিচারপতি শ্রী ডি. এন. সিংহ এই মামলা খারিজ করে দেন।[১৩] এরপর শ্রী বসু সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন।

অপরদিকে নেহেরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী ভারতের ভূখন্ড বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অর্ধাংশ পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় গণ বিক্ষোভ। ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে "বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটি" গঠিত হয় মাণিকগঞ্জে। বেরুবাড়ী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটি মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর '৫৮ বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির প্রতিনিধিরা রমাপ্রসন্ন রায় (দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়নের সভাপতি), অমর রায় প্রধান, সত্যজ্যোতি সেন, নিরঞ্জন দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের সাথে দেখা করেন[১৪] শ্রী প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে। শ্রী ত্রিপাঠীর সঙ্গে ছিলেন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল।[১৫] বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট জননেতা ও আইনজীবী শ্রী নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, নেহেরু-নুন চুক্তি দ্বারা জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নের অর্দ্ধাংশ পাকিস্তানকে দেওয়ার যে মতলব হইয়াছে, তাহার ফলে সমগ্র জাতীয় চেতনায় একটা অনুরণন দেখা দিয়াছে।[১৬] এই চুক্তির বিরুদ্ধে শ্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিবৃতিতে আরও বলেন যে, সমগ্র ভারতের লোক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।[১৭] তিনি বলেন, তৎসত্ত্বেও একটা ভূয়া আত্ম মর্যাদা বোধকে ভিত্তি করিয়া যদি এই বেআইনী চুক্তিটি কার্যকরী করা হয়, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণের উপর চরম অন্যায় করা হইবে।[১৮] নেহেরু-নুন চুক্তির প্রতিবাদ আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার বিবৃতিতে শ্রী সত্যেন বসু, শ্রী অপূর্ব্বলাল মজুমদার, এম. এল. এ. শ্রী ধীরেন ভৌমিক, শ্রী সুধাংশু গাঙ্গুলি ও শ্রী নির্মল বসুর কথা উল্লেখ করেন। তাহারা পার্লামেন্টের বিভিন্ন সদস্যের সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ফলে

পার্লামেন্টের বহু সদস্য এই ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।[১৯] সংবিধানের ১৪৩ নং ধারা অনুসারে ইহা সংবিধান সম্মত কিনা তাহা বিচারের জন্য এই ব্যাপারটি যাহাতে সুপ্রীম কোর্টে যায় সেই জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট অনুরোধ জানান।[২০] বেরুবাড়ী হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে ২২শে মার্চ '৫৯ বেরুবাড়ীতে ইহার প্রতিবাদে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[২১] এছাড়া জনসঙেঘর সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীন দয়াল উপাধ্যায় ২১শে মার্চ ১৯৫৯ লক্ষ্ণৌতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলা হইবে।[২২]

১লা এপ্রিল, ১৯৫৯ রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সংবিধানের ১৪৩(১) ধারা অনুসারে বেরুবাড়ী হস্তান্তরের সংবিধানগত প্রশ্ন বিবেচনার জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করেন।[২৩]

১৯৫৯ সালের ৮ই থেকে ১১ই ডিসেম্বর, এই চার দিন সুপ্রীম কোর্টে শুনানি হয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রী ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ ছাড়াও এই উপলক্ষ্যে গঠিত 'ফুল বেঞ্চে' বিচারপতি শ্রী এস.কে.দাস, শ্রী গজেন্দ্র গদকার, শ্রী এ.কে.সরকার, শ্রী সুব্বা রাও, শ্রী হিদায়েতুল্লা, শ্রী কে.সি.দাশগুপ্ত, শ্রী জে.সি.শাহ ছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষে এটর্ণী জেনারেল শ্রী এম.সি.শীতলবাদ বক্তব্য পেশ করেন। সলিসিটর জেনারেল শ্রী দফ্‌তরি তাঁকে সাহায্য করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে (আইনজীবী) এডভোকেট জেনারেল শ্রী এস.এম.বসু সওয়াল করেন। সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট ও জলপাইগুড়ির লোকসভা সদস্য শ্রী নলিনীরঞ্জন ঘোষ এবং লোকসভা সদস্য শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী ও শ্রী অরবিন্দ ঘোষাল মামলার কাজ তদারক করেন।[২৪]

শুনানি শেষ হবার তিন মাস দু'দিন পরে ১৪ই মার্চ, ১৯৬০ সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। সুপ্রীম কোর্ট বলেছেন, বেরুবাড়ী নিঃসন্দেহে ভারতীয় অঞ্চল এবং এই হস্তান্তরের অর্থ ভারতীয় ভূমি বিদেশী রাষ্ট্রকে অর্পণ করা। ৩ ধারা অনুসারে পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা এই হস্তান্তর করা যায় না। সুতরাং চুক্তিকে কার্যকরী করতে হলে ৩৬৮ ধারা অথবা ৩ ধারাকে সংশোধন করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী এই হস্তান্তর সম্ভব নয়।[২৫]

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬০, ৩৩ জন প্রতিনিধি দিল্লীতে যান, কলকাতা হয়ে। এই প্রতিনিধি দলটির নেতৃত্ব দেন শ্রী নির্মল বসু। ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই ডিসেম্বর সভা হয় কলকাতায় ৫ই ডিসেম্বর একটি প্রতিনিধি দল ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সাথে দেখা করেন। ১০ই ডিসেম্বর দিল্লীতে সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়, সে সম্মেলনে শ্রী নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ১১ই ডিসেম্বর '৬০ প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সাথে বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির প্রতিনিধিরা শ্রী নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেখা করেন।[২৬]

কিন্তু সকল প্রকার জনবিক্ষোভকে উপেক্ষা করে ১৯৬০ সালের মধ্যেই সংবিধানের নবম

সংশোধন হয়ে যায়। এই সংশোধন অনুযায়ী বেরুবাড়ী পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি আইনতঃ সিদ্ধ হয়। ঐ সময় কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মন্ত্রী ছিলেন শ্রী অশোক কুমার সেন।[২৭]

২৩শে জানুয়ারি ১৯৬১ সালে শ্রী হেমন্ত কুমার বোসের নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ সভা করা হয় মাণিকগঞ্জে। এবং ২৬শে জানুয়ারি রক্ত দিয়ে সংকল্প পত্র রচনা করা হয়, "বেরুবাড়ী পাকিস্তানে যেতে দেব না"— যা বেরুবাড়ী আন্দোলনকে নবরূপে দান করে। ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ রক্ত লেখা সংকল্প পত্রটি নিয়ে সতীশ রায় প্রধান ও ডি. রায়, জনসংঘের নেতা Vao Rao Jugade-র সহায়তায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সাথে দেখা করেন। ফেব্রুয়ারি মাসেই সংবিধানের নবম সংশোধনের (১৯৬০) বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা রুজু করা হয়।[২৮]

১৪ই এপ্রিল ১৯৬১তে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু শিলিগুড়ি এলে তাঁকে কালো পতাকা দেখিয়ে ধিক্কার জানান হয় এবং ১২৮ জন গ্রেপ্তার হন।[২৯]

৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ পাকিস্তান(অধুনা বাংলাদেশ) পাঙ্গা দখলে এলে সেখানকার সাধারণ মানুষ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সর্বস্ব দিয়ে প্রতিরোধ করে। যার ফলে পাঙ্গা ভারতেই রয়ে যায়। মার্চ মাসে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয় Benoba Bhabe কে জলপাইগুড়িতে। তাঁকে বেরুবাড়ী সম্পর্কিত মন্তব্য, "বেরুবাড়ী মক্ষি গিরা হুয়া দুধ হ্যায়" যা তিনি পাটনায় বলেছিলেন, প্রত্যাহার করে নিতে বলা হয়। ৪ঠা নভেম্বর ১৯৬২ Survey Resistance Movement শুরু হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী সুধাংশু মজুমদার, সতীশ রায় প্রধান, ডি. রায়, রমাপ্রসন্ন রায় এবং দেবী রায়। যে জন্য এই পাঁচ নেতা সহ শতাধিক মানুষ গ্রেপ্তার হন। Survey Resistance Movement চলতে থাকে। ১৯৬৩-র ৬ই নভেম্বর শ্রী নির্মল বসু, অমর রায় প্রধান, সতীশ রায় প্রধান, সুধাংশু মজুমদার ছাড়াও প্রায় সাতশো মানুষ গ্রেপ্তার হন। এই একই কারণে পরবর্তীতে শ্রী অশোক ঘোষ গ্রেপ্তার হন।[৩০]

১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে তিনবিঘা এলাকায় ভারত ও পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) মধ্যে যুদ্ধ ও গোলাগুলির বিনিময় হয়েছিল। সে সময়ে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু তিনবিঘা পরিদর্শনে এসেছিলেন।[৩১]

বেরুবাড়ী আন্দোলনের গতি মাঝে মাঝে শ্লথ হয়ে গেলেও ফল্গু ধারার মতো ভিতরে ভিতরে বয়ে চলেছিল। যার চিত্র পরবর্তী বছর গুলোতে ফুটে ওঠে।

১৯৬৬-র ৩রা জুন শ্রী সুধাংশু মজুমদার একটি ডেপুটেশন দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের কাছে বন্ধ Demarcation Survey করার জন্য এবং ৫ই জুন ১৯৬৬-তে শ্রী সুধাংশু মজুমদার একটি মামলা করেন কলিকাতা হাইকোর্টে Demarcation Survey কে বন্ধ করার জন্য। ৬ই জুন '৬৬ হাইকোর্ট রায় দেন যে, Survey বন্ধ হবে না, তবে কোন পিলার তৈরি করা যাবে না। কোন ভূমিখণ্ড পাকিস্তানকে হস্তান্তর করা যায় না, সঠিক

ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত। ২৪শে জুলাই ১৯৬৬তে সুধাংশু মজুমদার আদালত অবমাননার জন্য ইন্দিরা গান্ধী, অন্যান্য ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। কিছু দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মামলা থেকে নিজের নাম তুলে নেয়। বিচারক ডি. বাসু ২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, আদালতের আদেশেই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে সরকার অ্যাপীল করেন সুপ্রীম কোর্টে।[৩২]

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ছিট্‌মহল বিনিময়ের দাবি জানান হয়। যার নেতৃত্ব দেন এম. এল. এস. শ্রী নির্মল বসু, প্রতিনিধি দলের ডেপুটি লীডার প্রাক্তন এম. এল. এ. শ্রী অমর রায় প্রধান এবং দলের অন্যান্য সদস্য শ্রী বিমল চক্রবর্ত্তী, শ্রী সত্যেন মজুমদার, শ্রী উপেন রায় সরকার, শ্রী হিমাদ্রি বল্লভ রায় প্রামাণিক, শ্রী মাওতুরাম রায় ও শ্রী দিগেন দেব সিংহ।[৩৩]

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভারতের রাজনৈতিক ও স্বাভাবিক জনজীবনেও এই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব এসে পড়ে। কিন্তু বেরুবাড়ী পাকিস্তানের হাতে সঁপে না দেবার আন্দোলন চলতে থাকে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পরেও আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে। ২৮শে মার্চ ১৯৭৩-এ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন। ২৮শে মে '৭৩ এই রায়ের বিরুদ্ধে সভা হয় মাণিকগঞ্জে।[৩৪]

১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির তিন প্রতিনিধি সতীশ রায় প্রধান, সুধাংশু মজুমদার এবং হেমন্ত রায় প্রধান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে দেখা করেন এবং একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।[৩৫]

১৭ই ডিসেম্বর '৭৩-এ আটজন প্রতিনিধি নির্মল বসু, অমর রায় প্রধান, সুধাংশু মজুমদার, বসন্ত রায়, ভবন অধিকারী, সতীশ রায় প্রধান, পরিমল রায়, এস অধিকারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উমাশঙ্কর দিক্ষীত, অন্যান্য মন্ত্রী, সংসদের সদস্য এবং বিভিন্ন নেতাদের সাথে দেখা করেন ছিট্‌মহল বিনিময়কে ও অতিরিক্ত ভূমিখণ্ডকে হস্তান্তরের বিষয়কে সামনে রেখে।[৩৬]

ইন্দিরা গান্ধী কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি অফিসারদের বেরুবাড়ী পাঠাবেন। ২৮শে মার্চ '৭৪-এ কর্ণেল চৌধুরী দিল্লী থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব বিভাগের সহঃ সচিব মিষ্টার পান্ডে বেরুবাড়ী আসেন।[৩৭]

ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি (১৯৭৪) ঃ

১০ই মে '৭৪-এ দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান পরস্পর পরস্পরের সাথে দেখা করেন। এর পাঁচ দিন পরে অর্থাৎ ১৬ই মে '৭৪-এ ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মূল বক্তব্য ছিল — দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অর্ধাংশের ১২ নং ইউনিয়ন প্রায় ২.৬৪ বর্গমাইল জমি ভারতে রয়ে যাবে এবং তার

পরিবর্তে দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতা ছিট্‌মহল গুলি বাংলাদেশের রয়ে গেল। এছাড়া প্রায় ১৭৮ মিটার ৮৫ মিটার অর্থাৎ "তিনবিঘা" (প্রায় দশ বিঘা) বাংলাদেশকে ভারত ৯৯৯ বছরের জন্য 'লিজ' দিল দহগ্রামের সাথে পানবাড়ী মৌজার (P.S.Patgram) যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। এ সংবাদ উভয় দেশের বেতার মাধ্যমেই ঘোষণা করেছিল।[৩৮]

কোচবিহারের মানুষ ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই বিক্ষোভের কারণ, "তিনবিঘা" নামের ছোট্ট ভূখণ্ডটির কাছে কুচলিবাড়ি মৌজার বাঁচামরার চাবিকাঠি লুকানো কোচবিহার জেলার মানচিত্রে এক নজর চোখ বুলালেই সকলে সে বিষয়টি বুঝতে পারবেন। কুচলিবাড়ি থেকে সরাসরি ভারতীয় মূল ভূখণ্ড মেখলিগঞ্জে যাবার সড়ক পথটি 'তিনবিঘা'র উপর দিয়েই গেছে। যে মুহূর্তে 'তিনবিঘা'র ইজারা বাংলাদেশ পেয়ে যাবে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই কুচলিবাড়ির মানুষ মেখলিগঞ্জে যাতায়াতের অবাধ অধিকার হারাবে। তিনদিকে বাংলাদেশ পরিবৃত কুচলিবাড়ি 'তিনবিঘা' হারিয়ে প্রকৃত অর্থেই বাংলাদেশ পরিবৃত স্থলবন্দী একটা ছিট্‌মহলের এলাকা বলে চিহ্নিত হবে। ছিট্‌মহলের অধিবাসীরা যে নাগরিকত্বহীন, নিরাপত্তাহীন যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করে থাকে কুচলিবাড়ির মানুষজনের জন্যও সেই একই দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে।[৩৯]

প্রধানতঃ 'তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি' (১৯৭৪ সালে গঠিত), 'আমরা বাঙালি', 'কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি' (১৯৭৪ সালে গঠিত), এবং অন্যান্য আরো কিছু সংগঠন কুচলিবাড়ির প্রশ্নে আন্দোলন সংগঠন করে। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির বিরুদ্ধে ১৯৭৪ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর প্রবল আন্দোলন হয়। হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টে মোকদ্দমা চলে। ১৯৮১ সালের ৬ই জুলাই করিডর অবরোধ করে জনগণ সরকারকে বাঁধা দিলে সুধীর রায় গুলিতে নিহত হন। জলপাইগুড়ি জেলার বাইরে হলেও এই আন্দোলনের কৈন্দ্র বিন্দু ছিল জলপাইগুড়ি।[৪০]

ইন্দিরা-এরশাদ চুক্তি (১৯৮২) ঃ

১৯৮১ সালে তিনবিঘা আন্দোলন প্রবল হলে কেন্দ্র সরকার বুঝতে পারলেন কোথাও একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে। এত বিশাল আকারের জনপ্রতিরোধ অকারণ হয় নাই। ফলে ১৯৮২ সালের ৭ই অক্টোবর আর একটি চুক্তি হলো ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হোসেন মহম্মদ এরশাদের সঙ্গে। এই চুক্তি ইন্দিরা-এরশাদ চুক্তি, ১৯৮২ নামে খ্যাত। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ভারতের বিদেশমন্ত্রী পি. ভি. নরসিমা রাও এবং বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষরদাতা বিদেশমন্ত্রী এ. আর. সামসুদ দোহা।[৪১]

এই চুক্তির কয়েকটি ধারা ছিল বিতর্কিত।[৪২] তবে আন্দোলনের চাপে ভারত সরকার ইন্দিরা এরশাদ চুক্তির মধ্যে একটা নয়া সমাধান জুড়ে দিলেন। চুক্তিতে বলা হল, কুচলিবাড়ির মানুষজনের মেখলিগঞ্জে যাবার জন্য একটি উড়াল পুল (Flyover) অথবা একটি সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা হবে। পরবর্তীতে কেন্দ্রের নরসীমা রাও-এর সরকার চুক্তি আবার সংশোধন

করেন। এতে বলা হয় উড়াল পুল নয়, মাটির ওপর দিয়েই সড়কপথে যাতায়াত করতে পারবে কুচলিবাড়ির মানুষজন।[৪৩]

কিন্তু লক্ষ্য করার মতন বিষয় যে, তিনটি চুক্তি অর্থাৎ ১৯৫৮, ১৯৭৪ এবং ১৯৮২-র মূলসুর ছিট্‌মহলগুলির বিনিময়, তা কার্যকর হয়নি। পরবর্তীতে নরসীমা রাও এবং খালেদা জিয়ার আলাপ আলোচনা '৯১ বাংলাদেশের ভারতীয় ছিট্‌মহলগুলির দরিদ্রমানুষ গুলির কষ্ট মোচন করতে সক্ষম হয়নি।

তিনবিঘা করিডর চুক্তি (১৯৯২) ঃ

১৯৯২-এর ২৬শে জুন 'তিনবিঘা' পাকাপাকিভাবে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেবার দিন স্থির হয়। চুক্তিতে এও স্থির হয় যে, কুচলিবাড়ির মানুষ 'তিনবিঘা'র ওপর দিয়ে অবাধে (free and unfettered) যাতায়াত করতে পারবে।[৪৪] 'তিনবিঘা চুক্তিতে' এও বলা হয় যে, The corridor is presently open from sunrise to sunset every alternate hour[৪৫] অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতি একঘন্টা অন্তর অন্তর ভারতের কুচলিবাড়ির মানুষেরা এবং বাংলাদেশের দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতা ছিট্‌মহল গুলির মানুষ তাদের মূলভূখণ্ডে যাতায়াত করতে পারবেন। রাত্রের ১২ ঘন্টা করিডর খোলা থাকবে। তবে এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে কিছু উল্লেখ করা নেই।[৪৬]

ANNEXURE – VIII
SKETCH MAP
OF
TIN BIGHA CORRIDOR AND THE VICINITY
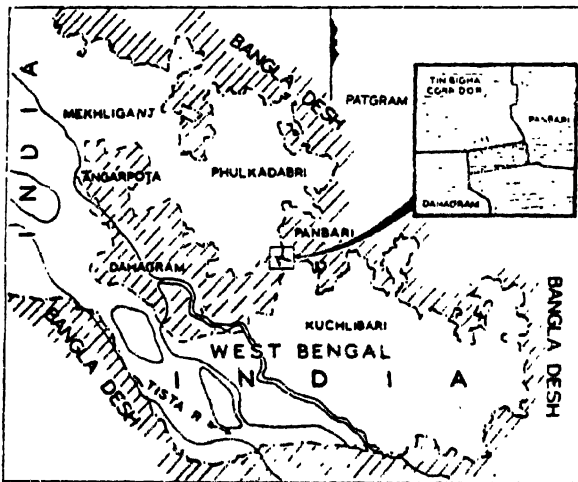
সূত্র নির্দেশ

১) সাপ্তাহিক পৌন্ড্রদর্পণ ঃ বিষয় ঃ "সমস্যা—তিনবিঘা ও কুচলিবাড়ি" কোচবিহার, (৩০শে জানুয়ারি ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সন)।

২) মধুপর্ণী ঃ বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬ তে পবিত্র কুমার গুপ্তের লেখা প্রবন্ধ "কোচবিহারের ছিট্‌মহল" সম্পাদক - অজিতেশ ভট্টচার্য, (পৃ. ৪২৮)।

৩) মধুপর্ণী ঃ তদৈব (পৃ. ৪২৮)।

৪) সাপ্তাহিক পৌন্ডদর্পণ ঃ পূর্বোক্ত।

৫) মধুপর্ণী ঃ পূর্বোক্ত (পৃ.৪২৪ থেকে ৪২৫)।

৬) ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের "বিচিত্র প্রবন্ধ" -এর 'জনমত এর পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। যা তিনি ১৯৭৪ সনে শারদীয়া জনমতে লিখেছিলেন। (পৃ. ১৫৮)

৭) সাক্ষাৎকার ঃ অমর রায় প্রধান (৩১.১২.২০০০)।

৮) উত্তরবঙ্গ সংবাদ ঃ ফজলুল হকের লেখা "তিনবিঘা করিডরের বদলে আড়াই বিঘা দাবি", শিলিগুড়ি, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৯৮।

৯) সাক্ষাৎকার ঃ অমর রায় প্রধান (৩১.১২.২০০০)।

১০) আনন্দ বাজার পত্রিকায় অধ্যাপক নির্মল বসুর লেখা — "বেরুবাড়ী মামলার ইতিবৃত্ত", কলিকাতা,(১৫.৩.৬০)।

১১) রুল অব্ জঙ্গল ঃ অমর রায় প্রধান (পৃ. ১১ থেকে ১২)

১২) আনন্দ বাজার পত্রিকায় অধ্যাপক নির্মল বসুর লেখা ঃ পূর্বোক্ত।

১৩) দৈনিক বসুমতী ঃ হাইকোর্টের রায় ঃ অতীতের পাতা থেকে (১০.৪.৫৯), কলিকাতা।

১৪) সাক্ষাৎকার ঃ অমর রায় প্রধান (৩১.১২.২০০০)।

১৫) সাক্ষাৎকার ঃ সুধাংশু মজুমদার (৩০.১২.২০০০)।

১৬) দৈনিক বসুমতীর অতীতের পাতা থেকে ঃ বেরুবাড়ী হস্তান্তর সম্পর্কে শ্রী এন. সি. চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি (২১শে মার্চ '৫৯)

১৭) ত্রিস্রোতা ঃ বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা, সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র পাল, জলপাইগুড়ি, ২২.৩.৫৯।

১৮) ত্রিস্রোতা ঃ স্থানীয় সংবাদ — বেরুবাড়ীতে জাতীয় সম্মেলন এবং বেরুবাড়ী প্রসঙ্গ। ২৯.৩.৫৯, পূর্বোক্ত।

১৯) দৈনিক বসুমতী ঃ পূর্বোক্ত।

২০) দৈনিক বসুমতী ঃ তদৈব।

২১) ত্রিস্রোতা ঃ স্থানীয় সংবাদ — বেরুবাড়ীতে জাতীয় সম্মেলন পূর্বোক্ত।

২২) দৈনিক বসুমতী ঃ পূর্বোক্ত।

২৩) আনন্দ বাজার পত্রিকায় নির্মল বসুর লেখা ঃ পূর্বোক্ত।

২৪) আনন্দ বাজার পত্রিকা ঃ তদৈব।

২৫) আনন্দ বাজার পত্রিকা ঃ তদৈব।

২৬) সাক্ষাৎকার ঃ সুধাংশু মজুমদার (৩০.১২.২০০০)।

২৭) মধুপর্ণী ঃ পূর্বোক্ত।

২৮) সাক্ষাৎকার ঃ সুধাংশু মজুমদার (৩০.১২.২০০০)।

২৯) তদৈব।

৩০) তদৈব।

৩১) বেসরকারি সমবায় আন্দোলনের সাপ্তাহিক পত্রিকা ঃ 'সহযোগী'ঃ"তিনবিঘা প্রসঙ্গে" থেকে নেওয়া, জলপাইগুড়ি, (পৃ. ৩)

৩২) সাক্ষাৎকার ঃ সুধাংশু মজুমদার (৩০.১২.২০০০)।

৩৩) দৈনিক বসুমতী ঃ "প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছিট্‌মহল বিনিময়ের দাবী" কলিকাতা সংস্করণ (১৬ই চৈত্র ১৩৭৪)।

৩৪) সাক্ষাৎকার ঃ সুধাংশু মজুমদার (৩০.১২.২০০০)।

৩৫) তদৈব।

৩৬) তদৈব।

৩৭) তদৈব।

৩৮) রুল অব্ জঙ্গল ঃ পূর্বোক্ত (পৃ. ১২)।

৩৯) তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটির পুস্তিকা, দিনহাটা, কোচবিহার।

৪০) ১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কিরাতভূমির জলপাইগুড়ি জেলা সংকলনে মনোমোহন রায়ের লেখা "জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্ত সমস্যা ও কিছু কথা", সম্পাদক ঃ অরবিন্দ কর, (পৃ. ৪২০-৪২১)।

৪১) তদৈব।

৪২) তদৈব।

৪৩) তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটির পুস্তিকা ঃ পূর্বোক্ত।

৪৪) তদৈব।

৪৫) দি স্টেটস্‌ম্যান— ১৯.৬.৯৯ শিলিগুড়ি সংস্করণ।

৪৬) তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটির পুস্তিকা ঃ পূর্বোক্ত।

এই প্রবন্ধের কাটামো নির্মাণ, তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ। তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন আমার পিতৃদেব শ্রী অনিল কুমার পাল, শ্রী অমর রায় প্রধান— সাংসদ এবং শ্রী সত্যজিৎ বসু।

সাক্ষাৎকার ব্যাক্তি দ্বয়ের পরিচয় ঃ

১) .শ্রী সুধাংশু মজুমদার, সেক্রেটারী, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, জলপাইগুড়ি জেলা শাখা, এখন বয়স - ৮৪।

২) শ্রী অমর রায় প্রধান, সাংসদ, কোচবিহার ও ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষস্থানীয় জননেতা।

ভাষা আন্দোলন ও পূর্ব বাংলার সংবাদপত্র (১৯৪৮-৫২)

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম

যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংবাদপত্রের একটা ভূমিকা থাকে। ১৯৪৮-৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে পূর্ব বাংলার পত্র-পত্রিকাগুলি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের স্বপক্ষে লড়াই করতে থাকে। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতিদানের দাবিতে সংবাদগুলির মধ্যে শুধুমাত্র মুসলিম লীগ সরকার সমর্থক পত্রিকা *মর্ণিং নিউজ* ও *সংবাদকে* বাদ দিলে বলা যায়, সবগুলো পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলা ভাষার ন্যায্য দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্নমুখী ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পত্র পত্রিকাগুলি জনগণকে সচেতন ও সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছে। বস্তুতঃ পত্র পত্রিকাগুলি ভাষা আন্দোলনে শুধু জনমতকেই সংগঠিত করেনি, ভাষা আন্দোলনেও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

১. *দৈনিক আজাদ* ঃ

দৈনিক আজাদ[১] ভাষা আন্দোলন কালে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা ছিল। যে কারণে এই পত্রিকার সংবাদগুলো দ্রুত জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করত। তাছাড়া *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদে ইস্তফা দেয়ার ঘটনা পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মুসলিম লীগের পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকাতে বাংলা ভাষাকে সমর্থন করে প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে। দৈনিক আজাদে বাংলা ভাষাকে সমর্থন করে বেশ কিছু প্রবন্ধ ছাপা হলেও আজাদের কোন স্থির মনোভাব ছিল না। দৈনিক আজাদের ভূমিকা প্রসংঙ্গে বশীর আল হেলাল তাঁর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ

> ... *দৈনিক আজাদ* ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাবলীর, এবং অন্যান্য সময়ের ঘটনাবলীরও বিবরণ ইত্যাদি জনসমাজে তুলে ধরার মাধ্যমে এই পত্রিকা যে সাংবাদিক দায়িত্ব পালন করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মুসলিম লীগ মহলের পত্রিকা হওয়া সত্বেও বাংলা ভাষার প্রতি আনুগত্য ছিল বলে এই পত্রিকা করেছিলেন।[২]

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে এক প্রকাশ্য বিবৃতি দেন। তাঁর অভিমত ছিল, 'ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে।'[৩] এর প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই তারিখে *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত হয় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি। তাতে বলা হয়েছিল ঃ

... ভারতীয় গণপরিষদের কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দ দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষাকে ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং আরও কতিপয় কংগ্রেসী নেতা উর্দু ও দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দুস্থানি ভাষাকে চালু করিরার পক্ষপাতী। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে সে বিষয়ে সুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বিবেচনা করিতেছেন।... ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার স্বপক্ষে অভিমত দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় একথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পাকিস্তানে মুসলমান ব্যতীত বহুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ নাগরিক আছে।... কংগ্রেসের অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে।...।[৪]

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ভাষা প্রশ্নে সরকারি প্রস্তাবের ওপর একটি সংশোধনী পেশ করেন।[৫] ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবটি ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নেতাদের বিরোধিতার ফলে অগ্রাহ্য করা হয়। গণপরিষদে 'বাংলা' ভাষা কে কটাক্ষ করে ওই সকল নেতৃবৃন্দ যে বক্তব্য প্রদান করে তার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় অনেক বিবৃতি ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। *দৈনিক আজাদ* তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছিল ঃ

... খাওয়াজা সাহেব কবে রাষ্ট্র ভাষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের গণভোট গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা জানিনা, আমাদের মতে উপরোক্ত মন্তব্য মোটেই সত্য নয়। ... তিনি এইরূপ একটি দায়িত্বহীন উক্তি করিয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থেরই ক্ষতি করেন নাই, এদেশবাসীর পক্ষে আপন প্রতিনিধিত্বের অধিকারের মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থকে এভাবে বিকাইয়া দেওয়া কি এতই সহজ?[৬]

১৯৪৮ সালের মত *দৈনিক আজাদ* পত্রিকাকে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় সাহসিকতার ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রয়ারি সংখ্যায় তার গুরুত্বের প্রমাণ মেলে। এই সংখ্যায় *দৈনিক আজাদ* প্রথম পৃষ্টায় বড় বড় টাইপে 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি নিহত ও সতেরো ব্যক্তি আহত, স্কুলের ছাত্রসহ ৬২ জন গ্রেফতার ঃ গুলিবর্ষণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তদন্তে আশ্বাসদান' ইত্যাদি শিরোনামসহ প্রতিবেদনগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও মন্ত্রী

সভার পদত্যাগ দাবি করে ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় 'পদত্যাগ করুন' শীর্ষক শিরোনামে প্রথম পাতায় প্রকাশিত এক বিশেষ সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছিল ঃ

... ঢাকা শহরের বুকে যেসব কান্ড ঘটিতেছে, সে সমস্ত শুধু শোকাবহ নয়, বর্বরোচিতও বলা চলে। জনাব নুরুল আমিন পুলিশ সম্বন্ধে তদন্তের কথা বলিয়াছিলেন এবং ১৪৪ ধারা জারির যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও ইতস্ততার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তদন্তের কোনো ব্যবস্থা হইল না এবং ১৪৪ ধারাও বলবৎ রহিয়াছে। ফলে গুলিতে মানুষ হতাহত হইতেছে এবং মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হইতেছে। নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা চরমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবি করিতেছি।[৯]

২. *নওবেলাল* ঃ

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শুরু হবার সামান্য আগে নওবেলাল পত্রিকাটি সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রধান সম্পাদক জনাব মাহমুদ আলি যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। যুবলীগ ভাষা আন্দোলেন সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। এজন্য নওবেলাল ছিল ভাষা আন্দোলনের সোচ্চার সমর্থক একটি পত্রিকা।[১০] নওবেলাল পত্রিকার এই ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর মন্তব্য করেছেন, 'নও বেলাল পূর্ব বাংলার তৎকালীন পত্র পত্রিকার মধ্যে রাজনীতিগত ভাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'[১১]

নওবেলাল সিলেট ও পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা ছাড়াও মৌলভি বাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও আশেপাশের এলাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের খবর প্রকাশ করে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লক্ষণীয় যে, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদেই নওবেলাল সম্পাদক মুসলিম লীগ কাউন্সিল ও লীগের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে *নওবেলাল* সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভাষা আন্দোলনের খবরাখবর প্রচার করতে থাকে। অবশ্য আগের সংখ্যাগুলোতে মর্যাদাসহ ভাষা আন্দোলনের সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব এবং তার সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত *সাপ্তাহিক নওবেলাল*। ৪ঠা মার্চ (৪৮) তারিখের "রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের সাথে পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে তাতে বলা হয় ঃ

... পাকিস্তান লাভ করিবার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের ধারণা ছিল যে তাহাদের সংস্কৃতি, তাহজিব, তমদ্দুন সকল অবস্থায়ই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এলাকাধীন বিভিন্ন প্রদেশের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান গতিকে..., তাহাদের মধ্যে মজহাবী একতা ছাড়া ভাষাগত বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের নানাবিধ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি

একভাষার আধিপত্য অন্য ভাষার প্রসার সংকুচিত হয় অথবা অন্য প্রদেশের সংস্কৃতি বিনষ্ট হইবার সূচনা দেখা যায় তাহা হইলে যে প্রদেশের মর্যাদা হানি হইয়াছে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।[১২] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের তুলনা করে পত্রিকাটি উল্লেখ করেছিল ঃ

... সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আমলেও গভর্নমেন্টের কারেন্সি নোটেও বাংলা ভাষার স্থান ছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাকে তুলিয়া ফেলিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের মনিঅর্ডারের ফরম, ডাকটিকিট, পোস্টকার্ড ইত্যাদিতে স্থান নাই।[১৩]

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের পল্টন ময়দানে জনসভায় এক ভাষণ দেবার পর। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি তারিখে খাজা নাজিম উদ্দিন তাঁর ওই বক্তৃতায় বলেন যে, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।'[১৬] এর ফলে সর্বত্র পুনরায় বিক্ষোভ দেখা দেয়। 'সাপ্তাহিক নওবেলাল''খওয়াজা নাজিমউদ্দীন ও রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি প্রতিবাদ করে এক মন্তব্য উল্লেখ করেছিল ঃ

... খাজা নাজিমউদ্দীন ...পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজধানী ঢাকায় তাঁহার প্রথম আগমণ উপলক্ষ্যে তাঁহার নিকট হইতে জনসাধারণ কিছুটা আশার বাণীই শুনিতে বাসনা করিয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি তাহাদের আশা আকাঙ্খায় কুঠারাঘাত হানিবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।[১৭]

নাজিম উদ্দিনের বক্তৃতার পর ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ৪ঠা ফেব্রুয়ারির জন্য এক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। ফলে নির্দিষ্ট তারিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালনের প্রচেষ্টা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন।[১৮] এ প্রসংগে *নওবেলাল* 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় দশ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর শোভাযাত্রা' শীর্ষক শিরোনাম দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ

... উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষা প্রচলন করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ স্বরূপ গত সোমবার (৪ঠা ফেব্রুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের সকল স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মঘট করে শোভা যাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে।[১৯]

একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে *নওবেলাল* বিশেষ সংখ্যা বের হয় ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। উক্ত সংখ্যায় 'বুলেটের মুখে গেয়ে গেল যারা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল ঃ

... জুমেরাত আর জুমা পরে পরে দুইদিন মাশরেকী পাকিস্তানের পাক মাটি পাকিস্তানি শিশু আর তরুণের মা'সুম রক্তে রঞ্জিত হইল। শহীদদানের স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। যাহারা আহত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যে সকল পরিবার হারাইয়াছে তাহাদের নয়নমণি আমরা তাহাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ...বুলেটের মুখে যারা জীবনের জয়গান গাহিয়া গেলেন তাদের আত্মা চির শান্তি লাভ করুক - সমগ্র জাতির সহিত অশ্রুসিক্ত নয়নে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।[২০]

৩. *সাপ্তাহিক সৈনিক* ঃ

তমদ্দুন মজলিস পরবর্তী সময় বিতর্কিত হলেও ভাষা আন্দোলন প্রশ্নে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তমদ্দুন মজলিসের পত্রিকা ছিল *সাপ্তাহিক সৈনিক*। এই পত্রিকাটি শুরু থেকেই বাংলা ভাষা প্রশ্নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। বয়সের দিক থেকে *সাপ্তাহিক সৈনিক নওবেলাল* থেকে এগারো মাস ছোট। বয়সে ছোট হলেও এ পত্রিকাটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করার কারণে। ১৯৪৮ সাল থেকেই এই পত্রিকার সংবাদ প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কার্টুন প্রভৃতি শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সাপ্তাহিক ইত্তেফাক এর মত *সৈনিক পত্রিকার* কার্টুন গুলোও পাঠক সমাদৃত হয়েছে। দো পেয়াঁজার আঁকা এরকম একটি কার্টুর্ন (কার্টুনটিতে দেখানো হয়েছিল, কয়েকজন পাগড়ি পরা ও টুপি মাথায় দেয়া লোক ছুরি হাতে বাংলা অক্ষর আক্রমণ করছে) সচেতন মহলকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করে। বাংলার বদলে উর্দু হরফ প্রবর্তনের সরকারি প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে সৈনিকের কার্টুনের ক্যাপশন ছিল "হরফ খেদা অভিযান" এই দো পেয়াঁজা ছিলেন শিল্পী কাজি আবুল কাসেম।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে এবং কয়েকজনের শহীদ হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় *সাপ্তাহিক সৈনিক* এর শহীদ সংখ্যা। লাল কালিতে ও লাল বর্ডার দিয়ে প্রকাশিত এই সংখ্যায় খবরের উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলি ছিল ঃ

শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত।। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে নির্বিচারে পুলিশের গুলিবর্ষণ। বৃহস্পতিবারেই ৭জন নিহত, ৩ শতাধিক আহত, ৬২ জন গ্রেফতার শুক্রবারেও বহু সংখ্যক লোক হতাহত, রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা করার শপথ বিঘোষিত ।[২৫]

সাপ্তাহিক সৈনিকের শহীদ সংখ্যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফলে সংখ্যাটি প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায়, তৃতীয় পর্যায় হিসাবে তিনবার মুদ্রিত হয় এবং প্রতি পর্যায়েই সংযোজিত হয় নতুন নতুন খবর ও প্রতিবেদনে। *সৈনিকের* বিপুল কাটতি ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে শহীদ সংখ্যার তৃতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছিল ঃ

...২৩শে ফেব্রুয়ারি সকালে *সৈনিকের* বিশেষ সংখ্যা বাহির হইলে মাত্র ২ঘন্টার মধ্যে ঢাকাতেই *সৈনিকের* হাজার হাজার কপি নিঃশেষ হইয়া যায়। জনতার উপুর্যপরি অনুরোধে

আমরা দুপুরে 'বিশেষ সংখ্যার ২য় পর্যায় প্রকাশ করি। কিন্তু তাহাও নিঃশেষ হইয়া যায়। জনতা এবং হকাররা আবারও অফিসে হামলা করিতে শুরু করায় আমরা একই দিনে আবার তৃতীয় পর্যায় বাহির করিতে বাধ্য হইলাম।[২৬]

৪. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ঃ

সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ভাষা আন্দোলনের পক্ষের অন্যতম প্রচার মাধ্যম হিসেবে পরিচিত লাভে সক্ষম হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* একুশের ঘটনাবলীকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহ প্রকাশ করে। *ইত্তেফাক* প্রথম পৃষ্টায় ২১ ও২২ ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলীর সংবাদ শিরোনামে যা দিয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ

'দেশের কাছে লাল ফেব্রুয়ারির শহীদদের ডাক আসিয়াছে।।' 'বাংলা ভাষা সংগ্রামকে সফল করিয়া রক্তের প্রতিশোধ নাও।' 'নূরুল আমীন ও প্রতিশ্রুতির পিচ্ছিল পথে পা বাড়াইয়াছে।' 'জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন সরকার আজ মিলিটারির জোরে বাঁচিয়া আছে।'

ইত্তেফাকের ঐ সংখ্যাটিতে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও আবুল হাশিমের দুটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। মওলানা ভাসানী এই জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচার দাবি করেছেন। তাঁর বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি ছিল। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* শুধু ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলী নয়, পরেও ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ১৭ই মার্চ তারিখে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে* শহীদ দিবস পালিত হওয়ার বিস্তারিত ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। একটি শিরোনাম ছিল এরকম ঃ 'লীগ শাহির ফরমান ভেস্তে দিয়ে সর্বত্র শহীদ দিবস পালিত। জালেম সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের বলিষ্ঠ আওয়াজ। ছাত্র যুবক ও জনসাধারণের ঐক্য বদ্ধ দৃঢ় পদক্ষেপ।' *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগ ও ভাষা আন্দোলনের খবরাখবর অত্যন্ত গুরুত্ব সহ প্রকাশ করে। *দৈনিক আজাদ* এর নিরপেক্ষতা বর্জনেব পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* সেই দাবি পুরণে সচেষ্ট হয়।

১৯৫২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখের *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশ্য গণআদালতে প্রাদেশিক সরকারের বিচার দাবি করে সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ

... মুসলিম লীগ সরকার তার অতীতের সব কুকীর্তিকে ম্লান করিয়াছে, ... আহত ছাত্র ও শিশুর ক্রন্দন ঢাকার আকাশ বাতাস মুখরিত। ছেলেহারা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদে জনতাকে আকুল করিয়াছে। আজ পাকভূমির পাক রাজধানী এক মহাশ্মশানে পরিণত। ...তাই সরকারের এই বর্বরতার ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতায় সর্বত্রই আজ বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। ...কেন তারা নিরীহ ছাত্র ও পথচারীদের উপর বেপরোয়া গুলি চালাইয়া কতগুলি মূল্যবান জীবন নাশ করিল। ...তাই দেশের অযুত কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া আমাদের ঘোষণা শুধু ছাত্র জনতা ঘাতক সরকারি কর্মচারীদের নয়, এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে হোতা সরকারের বিচার চাই প্রকাশ্য গণ আদালতে।[২৭]

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির তার পরের দুই একদিনের ঘটনার মধ্য দিয়েই সংবাদপত্রগুলি ভাষা আন্দোলন এর সমর্থন সমাপ্ত করেনি। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংবাদপত্রগুলো ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি প্রতিকী অর্থ হলেও ধরে রাখে। এজন্য ২১শে ফেব্রুয়ারির পরবর্তী সময়ে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের* সংবাদ শিরোনাম ছিল ঃ 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে জনগণ শেষ রক্ত বিন্দু দিবে।'[২৮] এ বিষয়ে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* আরো মন্তব্য করেছিল ঃ

...পূর্ব পাকিস্তানিরা তাদের মনোবল, সৎ সাহস ও দৃঢ়তার যে গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে, তাহা শুধু জাতীয় ইতিহাসের বিষয়বস্তু হইয়া থাকিবে না, যুগ যুগ ধরিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনে জাগাইবে প্রেরণা।[২৯]

৫. পাকিস্তান অবজার্ভার ঃ

পাকিস্তান অবজার্ভার ছিল ভাষা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মুসলিম লীগ সরকারের কড়া সমালোচক এবং ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী পত্রিকা। ১৯৫২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটিতে খাজা নাজিমউদ্দিন সম্পর্কে 'ছদ্ম ফ্যাসিজম' শীর্ষক সম্পাদকীয় লেখার কারণে পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সম্পাদক আবদুস সালাম ও প্রকাশক হামিদুল হক চৌধুরীকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়। *পাকিস্তান অবজার্ভারের* বন্ধ হওয়ার সরকারি আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সভা করে এর প্রতিবাদ ও নিন্দা করেন। সভাতে সরকারের সমালোচনা করে বলা হয় যে, 'ভাষা আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্যেই আন্দোলনের সমর্থক একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্রটিকে বন্ধ করে দেয়া হল।'

ভাষা আন্দোলনের বিপরীত চিন্তাধারা ঃ

১. মর্ণিং নিউজ ঃ

বস্তুতঃ শুরু থেকেই *মর্ণিং নিউজ*[৩০] পত্রিকাটি ছিল বাংলাভাষার বিরোধী। ভাষা আন্দোলনে *মর্ণিং নিউজ* পত্রিকার ভূমিকা প্রসংগে আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক '*ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য*' গ্রন্থে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"...অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি এবং মূলত পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি *মর্ণিং নিউজ* ভাষা আন্দোলনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং তার চরিত্র হননের জন্য যত ধরণের সম্ভব মিথ্যা, মনগড়া সংবাদ পরিবেশন করেছিল এবং জঘন্য কুৎসামূলক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে বাংলা ও বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে বিষোদগার করেই কর্তব্য শেষ করেনি, সাম্প্রদায়িকতার উদ্দেশ্যমূলক উস্কানিও দিয়েছে।"[৩১]

ইংরেজি *দৈনিক মর্ণিং নিউজ* প্রথম থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরণের

মিথ্যা এবং উগ্র প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল। যার ফলশ্রুতিতে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করায় ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জনগণ পত্রিকাটির অফিস পুড়িয়ে দেয়।[৩৪] *মর্ণিং নিউজ* পত্রিকার প্রতি জনরোষের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকা বার এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'মুসলিম লীগ, লীগ সরকার, আর *মর্ণিং নিউজ* ছাড়া প্রত্যেকেই বাংলা ভাষা চায়।' *মর্ণিং নিউজকে* বাংলা ভাষা বিরোধী পক্ষ হিসেবে তখন বর্জনীয় বলে মনে করা হত। আন্দোলনরত সকল পক্ষই এই পত্রিকা বর্জনের জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে।

উপসংহার ঃ

সংবাদপত্রগুলিতে ভাষা আন্দোলনের রেখাচিত্রে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ভিত্তি শিথিল করে দেয়। অর্থাৎ তাদের জন বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটায় এবং তাতে যে গতিবেগ সঞ্চার করে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে। এমনকি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও তার প্রত্যক্ষ ফল দেখা দেয় বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতিদানের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদগুলির মধ্যে শুধুমাত্র মুসলিম লীগ সরকার সমর্থক পত্রিকা *মর্ণিং নিউজ ও সংবাদকে* বাদ দিলে বলা যায়, সবগুলো পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলা ভাষার ন্যায্য দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্নমুখী ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এ সকল পত্র পত্রিকা জনগণকে সচেতন ও সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছে। যার ফলে এই আন্দোলন দেশের প্রতিটি অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে এক বিরাট বিপ্লবী চেতনার পরিচয় দিয়েছে। বস্তুতঃ ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের কাছে সংবাদপত্র ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ।

সূত্র নির্দেশ

১) *দৈনিক আজাদ* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের ৩১ শে অক্টোবর।

২) মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *ভাষা আন্দোলনে আবুল কালাম শামসুদ্দিন আহমদ*, ঢাকা ঃ মাহফুজউল্লাহ, ১৯৮৯, পৃ. ৫৯।

৩) আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৪) *দৈনিক আজাদ*, 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' (সম্পাদকীয়) ২৯ জুলাই, ১৯৪৭।

৫) *দৈনিক আজাদ*, অহেতুক উত্তেজনা (সম্পাদকীয়), ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।

৬) সংশোধনীটি ছিল খসড়া-নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর ২৯ নং ধারা সম্পর্কে, ওই ধারায় বলা হয়েছিল পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে হবে।

৭) *দৈনিক আজাদ*, বাংলা ভাষা ও পাকিস্তান, (সম্পাদকীয়)২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮।

৮) *দৈনিক আজাদ*, বাংলা ভাষার অপমান, (সম্পাদকীয়), ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮।

৯) *দৈনিক আজাদ*, 'পদত্যাগ করুন' (সম্পাদকীয়), ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

১০) মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, 'সিলেট ভাষা আন্দোলন ঃ *'নওবেলাল'* এর পাতায়', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

১১) বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন* ও *তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪।

১২) *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, (সম্পাদকীয়), ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮।

১৩) ঐ।

১৪) ঐ।

১৫) ঐ।

১৬) ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত আলি খাঁন রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তারপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন খাজা নাজিম উদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা সফরে এসে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে একথা বলেন। দেখুন. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩।

১৭) *সাপ্তাহিক নওবেলাল* (সম্পাদকীয়), ৩১শে জানুয়ারি ১৯৫২।

১৮) হায়াৎ মামুদ, *অমর একুশে*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১০।

১৯) *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

২০) *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

২১) *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

২২) *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ঐ।

২৩) হায়াৎ মামুদ, অমর একুশে, পৃ. ১০১।

২৪) সাপ্তাহিক সৈনিক, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

২৫) *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

২৬) মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, 'ভাষা আন্দোলনে সৈনিক', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩।

২৭) *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

২৮) *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

২৯) *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ২৫ই মে, ১৯৫২।

৩০) সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র* পৃ. ৩৯-৪০।

৩১) আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩।

৩২) বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০।

৩৩) সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৫-৪৬।

৩৪) বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩৭০।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঃ গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলিল

মাহবুবুল হক

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল গাতধারায় প্রকৃত ইতিহাস রচনা কাম্য হলেও নানা কারণে স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস লেখা হয়নি। অন্যদিকে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ইন্ধন, প্ররোচনা কিংবা সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসতত্ত্ব অনুসারী দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব লাভ করার চেয়ে সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে ইতিহাস-বিকৃতির কারণ ঘটেছে।

সঠিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উপাদান উপকরণ সংগ্রহের নানা উদ্যোগ সম্প্রতি দেখা গেলেও স্বাধীনতার অব্যবহিত প্রথম দশকে তেমন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। সে সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের নানা উপকরণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালায়।[১] এই প্রচেষ্টার ফলে দেশী-বিদেশী নানা উৎস থেকে কিছু মূল্যবান দলিল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ব্যাপক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে এ সংগ্রহ হয়ত অপর্যাপ্ত কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এগুলোর যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

সংগ্রহগুলো সংখ্যাগত পরিমাণে সামান্য হলেও মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক নানা দিকের ওপর কিছু না কিছু আলোকপাত করে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে সব কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে জাতি অগ্রসর হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র সংক্রান্ত দলিল ঃ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে মুক্তিকামী দেশবাসী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭১-এর ২৫শে মার্চের কালো রাত্রে পাকিস্তানি বাহিনী 'রেডিও পাকিস্তান'-এর ঢাকা কেন্দ্র দখল করে নেয়। এই অবস্থায় চট্টগ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী ও ই.পি.আর.(ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)-এর বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই অবস্থায় বেতারের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রকৌশলী, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও আওয়ামী নেতৃত্ব চট্টগ্রামের কালুরঘাটে অবস্থিত বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রটি দখল করে নেয়। এর নাম দেওয়া হয় 'স্বাধীন

বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'।[২] এই বেতার কেন্দ্র থেকেই ২৬শে মার্চ প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান। কিন্তু তা ভালোভাবে শ্রুত হয়নি। পরদিন ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের সেনাসদস্যদের অন্যতম নেতা মেজর জিয়াউর রহমান (পরে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট) বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি সৈন্যদের যুদ্ধে যোগদানের জন্য একটি লিখিত ঘোষণা পাঠ করেন। এ ঘোষণা দেশের অধিকাংশ এলাকায় শ্রুত হলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধে মেজর জিয়ার এই ঘোষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে নির্মম ভাবে হত্যা করার মাধ্যমে বাংলদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটলে মেজর জিয়ার এই ঘোষণাটিকেই অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে তৎকালীন শাসকদল তাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। এভাবে প্রকৃত ইতিহাস খণ্ডিত কিংবা আচ্ছন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কিছু দলিল পত্র সংরক্ষিত আছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ—

১. স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর জিয়ার ঘোষণা;

২. স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে পঠিত একটি আবেদন;

৩. স্বাধীন বাংলা বেতারে কথিকা প্রচারের চুক্তিপত্র;

৪. আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, বেগম মুশতারী শফি, বেলাল মোহাম্মদ, সুব্রত বড়ুয়া, অধ্যাপক সৈয়দ আলি আহসান পঠিত কথিকা;

৫. জনাব আবুল কাশেম সন্দ্বীপকে একশত টাকা রিলিফ প্রদানের জন্য ২৮ অক্টোবর তারিখে জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ কর্তৃক কলকাতায় ভুটান ট্রেডিং কর্পোরেশনের পরিচালককে লিখিত পত্র;

৬. অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণ ইত্যাদি।

এসব দলিলপত্র মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করে।

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম সংক্রান্ত দলিলপত্র ঃ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে ১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়ার (বৈদ্যনাথ তলা) আমবাগানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা করে বলা হয় যে, বাংলাদেশ ভূখণ্ড ২৬শে মার্চ ১৯৭১ থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। ১৭ এপ্রিল শনিবার (৩ বৈশাখ ১৩৭৮) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য এখানে এক জনসেবার মাধ্যমে

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘটে। পাকিস্তানে কারাগার বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক ঘোষণার মাধ্যমে বৈদ্যনাথ তলার নাম মুজিবনগর রাখেন এবং সেখান থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার ঘোষণা দেন। বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়।[৩]

মুক্তিযুদ্ধে প্রথম থেকেই সহায়তা করেছে ভারত। প্রায় এক কোটি শরণার্থী আশ্রয় নেয় ভারতে। সেখানেই হয় মুক্তি বাহিনীর ট্রেনিং। বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রমও চলে ভারতে।[৪]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে বিপ্লবী সরকারের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের প্রামাণ্য দলিলপত্র রয়েছে। এগুলোকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত করা চলে;

ক) প্রশাসনিক চিঠিপত্র ঃ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: ফাইল নং ২-৭/৭১;

২. রিলিফ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান কর্তৃক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে লেখা ২০ জুলাই ১৯৭১ তারিখে পুনর্বাসন খাতে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুরি সংক্রান্ত একটি পত্র।

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক আলহাজ্ব জহুর আহমদ চৌধুরীকে ৫ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে লিখিত একটি পত্র।

এসব দলিলপত্রে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়। এসব দলিল পত্র থেকে বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মতৎপরতা, গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ, পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষয় ক্ষতি, পাকবাহিনীর দালালদের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়।

খ) হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত দলিলপত্র ঃ

১. সরকারের সরবরাহ বিভাগের ফরম: আগরতলার দাশগুপ্ত অ্যান্ড সন্স কর্তৃক সরবরাহকৃত রন্ধন সামগ্রীর তালিকা (১৭জুলাই ১৯৭১);

২. বাংলাদেশের কোনো অফিস থেকে অর্থ সাহায্য পান নি এই ফর্মে প্রত্যয়ন করে প্রিয়দারঞ্জন সেনগুপ্তকে ৫০ টাকা সাহায্য প্রদানের অনুরোধপত্র।

৩. দৈনিক সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্স পরিশোধের ফরম (৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১);

৪. কুমিল্লার এমএনএ প্রফেসর খোরশেদ আলমকে প্রদত্ত আগস্ট ১৯৭১-এর মাসিক ভাতা ২০০ টাকা প্রদানের ভাউচার (৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১) ইত্যাদি।

গ) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দলিলপত্র ঃ

১. বঙ্গবন্ধু ইউথ ক্যাম্পের জন্য আগরতলার জনপ্রিয় ফ্যার্মেসিকে প্রদত্ত চাহিদাপত্র (১৬.১০.১৯৭১);

২. একিনপুর ইউথ ক্যাম্পের জন্য গীতা মেডিসিন ডিস্ট্রিবিউটরসকে প্রদত্ত চাহিদাপত্র (৬.১১.১৯৭১)

৩. মুক্ত অঞ্চল এবং বর্ডার কলোনি ক্যাম্পে সহকারী মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত পত্র (২৯.১১.১৯৭১) ইত্যাদি।

এসব দলিলপত্রে মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধাহত ও অসুস্থদের নার্সিং ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়।

নিউজ বুলেটিন ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ

১. তথ্য ব্যুরো নিউজ বুলেটিন: কুমিল্লা সেক্টরে বাংলাদেশ বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান অব্যাহত (৯ জুলাই ১৯৭১ ও ১০ জুলাই ১৯৭১);

২. নারায়ণগঞ্জে গেরিলা হামলায় ডক-ইয়ার্ড বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ(১০জুলাই ১৯৭১);

৩. ফকিরহাট রেলস্টেশনে ৭জন পাকিস্তানি সৈন্য হত্যা ও ৭টি বাংকার ধ্বংসের সংবাদ (১২ জুলাই ১৯৭১);

৪. সালদা নদীতে পাকিস্তান বাহিনীর স্পিড বোট বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ (১২ জুলাই ১৯৭১);

৫. পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ভারতীয় ভূখণ্ড হরিহরদুল্লা ও কাট্টমারা আক্রমণ এবং বেসামরিক নাগরিক ও শরণার্থী হত্যার সংবাদ (১৩ জুলাই ১৯৭১);

৬. চট্টগ্রাম রণাঙ্গনে বাংলাদেশের বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান, ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া ও ঢাকা শহরে গেরিলা তৎপরতার সংবাদ (১৩ জুলাই ১৯৭১);

৭. বিভিন্ন সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর জোয়ানদের হত্যা ও আহত করার খবরাখবর (১৬ জুলাই ১৯৭১);

৮. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ এবং গেরিলা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কিছু সাফল্য অর্জনের সংবাদ (২১ জুলাই ১৯৭১);

নিউজ বুলেটিন ও প্রেসবিজ্ঞপ্তি থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাবে।

সংবাদপত্র ও সাময়িকী ঃ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত তথ্যের ভূমিকা এই যে, এগুলো প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে সংরক্ষিত এ ধরণের প্রাথমিক উৎস-উপাদানগুলোকে মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:

ক) বিদেশী সংবাদপত্রের কর্তনী ঃ

১. ব্যাকগ্রাউন্ড টু দ্য ফেইলইউর অব দি নিগোসিয়েশন বিটুইন শেখ মুজিব অ্যান্ড দ্য লিডার্স অব ওয়েস্ট পাকিস্তান: সিক্রেট ক্যাটালগ অব গিলট্ অ্যান্ড ডিজেস্টার ওভার ইস্ট পাকিস্তান, 'দি টাইমস' ৪ জুন ১৯৭১।

২. ওয়েস্ট পাকিস্তান কিপস্ গ্রিপ ইন ইস্ট, ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান উইকলি, ১০ জুন ১৯৭১।

৩. অ্যান আই উইটনেস টু জেনোসাইড : সিক্স স্পাইন-চিলিং ডেজ: অ্যান্থনি ম্যাসকারানহাস, শিকাগো সানটাইমস, ২০ জুন ১০৭১।

৪. দ্য টেরিবল ব্লাড অব টিক্কা খান: ভিলেজারস ম্যাসাকার্ড বাই পাকিস্তানি ট্রুপস, নিউজ উইক, ২৮ জুন ১৯৭১।

৫. দ্য ব্যাভেজড্ পিপল অব ইস্ট পাকিস্তান, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্, ৫ আগস্ট ১৯৭১।

খ) বিদেশী সাময়িকীতে প্রচ্ছদ কাহিনী ঃ

১. সিভিল ওয়ার ইন পাকিস্তান, নিউজ উইক, ৫ এপ্রিল ১৯৭১;

২. শেখ মুজিব/বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য জেনারেলস, ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ১০ এপ্রিল ১৯৭১;

৩. দি ওয়র অব এশিয়া, দি ইকনমিস্ট, ১৪ মে ১৯৭১;

৪. পাকিস্তান্স্ অ্যাগোনি, টাইম, ২ আগস্ট ১৯৭১;

৫. বেঙ্গল: দ্য মার্ডার অব এ পিপল, নিইজউইক, ২২ আগস্ট ১৯৭১;

৬. কনফ্লিক্ট ইন এশিয়া/ইন্ডিয়া ভার্সাস পাকিস্তান, টাইম, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১;

৭. ইন্ডিয়া অ্যাটাক্স/দ্য ব্যাটল ফর বেঙ্গল, নিউজ উইক, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১;

৮. ফ্রম জেল টু পাওয়ার, টাইম, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২।

গ) মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ঃ

১. বাংলাদেশ নিউজ লেটার, ৯ আগস্ট ১৯৭১;

২. পাক্ষিক গণযুদ্ধ, বাংলাদেশের গণমুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবী মুখপত্র, ৭ম সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ ভাদ্র ১৩৭৮ (২০ আগস্ট ১৯৭১);

৩. সাপ্তাহিক জনমত, ২৭ সংখ্যা, লন্ডন, রবিবার, ৫ ভাদ্র ১৩৭৮ (২২ আগস্ট ১৯৭১) [শিরোনাম: পি আই এ (পাকিস্তান এয়ার লাইন্‌স) এখনো বাংলাদেশ সৈন্য বয়ে নিচ্ছে];

৪. দ্য পিপলস্ ওয়ার: ভয়েস অব দ্য পিপলস্ ওয়ার আনফোল্ডিং ইন বাংলাদেশ, নম্বর ৭, শুক্রবার, ২৭ আগস্ট ১৯৭১.

৫. বাংলাদেশ, ভ্যলুম ১, নম্বর ১: এ উইকলি নিউজ বুলেটিন, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ (শিরোনাম: ওয়ার্ল্ড কনসার্ন ওভার মুজিবুর রহমান্‌স্ ট্রায়াল);

৬. বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা, ২৭ সংখ্যা, শুক্রবার ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ (শিরোনাম: চট্টগ্রাম শহর অন্ধকারাচ্ছন্ন: মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ শাসন ব্যবস্থা চালু) ইত্যাদি।

মার্কিন কংগ্রেসের কার্যবিবরণী দলিল ঃ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মার্কিন সরকার পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিলেও কিছু মার্কিন সিনেটর তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি দলিল রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে। যেমন:

১. কংগ্রাশনাল রেকর্ড : প্রসিডিং অ্যান্ড ডিবেটস্ অব দ্য নাইন্টি সেকেন্ড কংগ্রেস, ফার্স্ট সেশন, ভল্যুম ১১৭, ওয়াশিংটন ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, নম্বর ১৯০;

২. কংগ্রাশনাল রেকর্ড : প্রসিডিং অ্যান্ড ডিবেটস্ অব দ্য নাইন্টি সেকেন্ড কংগ্রেস, ফার্স্ট সেশন, ভল্যুম ১১৭, ওয়াশিংটন ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, নম্বর ১৯০।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের প্রকাশনা ঃ

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সরকার এর বিরোধিতা করে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন চালায় এবং জনমত গঠনের উদ্যোগ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এসব প্রকাশনার গুরুত্ব তাই কম নয়। এ ধরণের সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. প্রেসিডেন্টস ব্রডকাস্ট টু দ্য নেশন, জেনারেল এম ইয়াহিয়া খান, প্রেসিডেন্ট অব পাকিস্তান, ২৬ মার্চ ১৯৭১;

২. ইন্ডিয়াজ রোল ইন ইস্ট পাকিস্তান ক্রাইসিস; ইস্ট পাকিস্তান ডকুমেন্ট সিরিজ: মুজিব ফাইটিং ইন্ডিয়াজ ওয়ার, ৪ এপ্রিল ১৯৭১;

৩. দ্য গ্রেট ট্র্যাজেডি, জুলফিকার আলি ভুট্টো, করাচি. ২০ আগস্ট ১৯৭১;

৪. দ্য প্রেজেন্ট ক্রাইসিস ইন ইস্ট পাকিস্তান: এ স্টেটমেন্ট বাই অ্যান অফিসিয়াল স্পোকসম্যান অব দ্য গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান, ৫ মে ১৯৭১;

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইপত্র ঃ

মুক্তিযুদ্ধকালে ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশনা এবং বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বইপত্র। এদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে বাংলা বই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে এসব বইয়েরও উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ রয়েছে এবং এগুলি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণও উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা সরাসরি বাংলাদেশের ন্যায্য সংগ্রামের বিরোধিতা করলে মার্কিন জনগণকে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার ওয়াশিংটনে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টারে বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ সম্পর্কিত তথ্য ও প্রচারণা প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত এ রকম কয়েকটি প্রকাশনা হচ্ছে:

১. ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল, দ্য ক্রুশিয়াল রোল অব ইনফরমেশন, দি বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার;

২. বাংলাদেশ: সিটিউশান অ্যান্ড অপশ্যানস, রেহমান সোবহান, ১০ মে ১৯৭১;

৩. এ ক্রাইসিস অব পিপল: বাংলাদেশ ইমার্জেন্সি ওয়েলফেয়ার অ্যাপিল, শিকাগো, ইলনয়;

৪. দ্য স্ট্রাগল ইন বাংলাদেশ, ফিরোজ আহমদ;

৫. রিজিওন্যাল ডিজপ্যারিটিস ইন পাকিস্তান: এ ফ্যাক্ট সিট, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি;

৬. কনফ্লিক্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান: ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড প্রোসপেক্টস;

৭. বাংলাদেশ: এ ওয়ার্ল্ড কমেন্ট্রি ফ্রম অটোনমি টু ইনডিপেনডেন্স;

৮. ব্লাডবাথ ইন বাংলাদেশ: ইউ কে প্রেস কমেন্টস;

৯. বাংলাদেশ কনটেম্পোরারি ইভেন্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস;

১০. রিকগনিশন অব বাংলাদেশ - এ কোয়েশ্চেন টু দ্য কনশান্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড;

১১. আওয়ার স্ট্রাগল মাস্ট গো অন - শেখ মুজিবুর রহমানস্ প্রিইলেকশান স্পিচ;

১২. নিউ নেশন নিউ প্লেজ - সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট;

১৩. বাংলাদেশ - কোর্স অব দ্য স্ট্রাগল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম. এন. এ.;

১৪. টেরর অ্যান্ড ব্রুটালিটি ইন বাংলাদেশ: ইউ এস সিনেটর স্পিক;

১৫. জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ, সৈয়দ আবদুস সুলতান, মেম্বার অব দ্য ন্যাশানাল অ্যাসেম্বলি, বাংলাদেশ;

১৬. টেরর ইন বাংলাদেশ;

১৭. বাংলাদেশ - গোলস অ্যান্ড অবজেকটিভ্স্;

১৮. এক্সপ্লয়টেশন ইন বাংলাদেশ অ্যাট এ গ্ল্যান্স: দ্য নেম অব ফ্রিডম;

১৯. কনফ্লিক্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান;

২০. বাংলাদেশ: এ স্টেটমেন্ট, তাজউদ্দীন আহমেদ, দ্য প্রাইম মিনিস্টার;

২১. থাউজেন্ড মাইলাইজ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক স্টাডি অন বাংলাদেশ;

২২. বাংলাদেশ: দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড, ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিশেন, ক্যালকাটা;

২৩. 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস', পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লি, ১ম খন্ড, সেপ্টেম্বর ১৯৭১; দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৭২।

দেয়ালচিত্র (Poster)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু পোস্টার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সংরক্ষিত আছে। যেমন:

১. ডেথ-স্টুডেন্টস ওয়ার্ল্ড কনসার্ন/ইউনিভার্সিটি অফ নটারডম, ইন্ডিয়া;

২. পাকিস্তান: মেনমেইড ডিজাস্টার ইন ইস্ট বেঙ্গল/ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল;

৩. দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ/তারিক আলি ইয়ং সোসাইটিজ, টরেনটো;

৪. ওয়ানটেড - টেন মিলিয়ন অ্যামেরিকান ফ্যামেলিজ হু উইল বি গুড সামারিটানস্ ফর টেন মিলিয়ন বেঙ্গলি রিফিউজিস, ইস্ট পাকিস্তান ইমার্জেন্সি রিফিউজি ফান্ড, ওয়াশিংটন;

৫. দি নভেম্বর - থার্ড ফাস্ট টু সেভ পিপল;

৬. বেঙ্গল: দি মার্ডার অব এ পিপল, বাংলাদেশ ইমার্জেন্সি ওয়েলফেয়ার, এপ্রিল, শিকাগো, ইউ.এস.এ.;

৭. হেলপ বাংলাদেশ, শিকাগো, ইউ.এস.এ.;

৮. অক্সফাম রিকগনাইজেস বাংলাদেশ, অক্সফাম, আমেরিকা;

৯. এনিহিলেট দিজ ডেমনস, কামরুল হাসান, ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ ইত্যাদি।

অন্যান্য দলিলপত্র :

প্রত্যেক শ্রেণী অনুযায়ী এখানে যে সব নমুনা উপকরণের কথা বলা হয়েছে তার বাইরেও প্রচুর উপাদান, উপকরণ, বস্তু নিদর্শন এই জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে।[৫]

উপসংহার ঃ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এসব প্রামাণ্য দলিলপত্র নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান।

এই উপাদানগুলো কেবল যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের প্রকৃত তথ্য প্রদান করে তা নয়, ইতিহাসকে বিকৃত ও আচ্ছন্ন করার যে কোনো প্রবণতা বা অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রকৃত ইতিহাসবিদকে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

আমাদের দেশে এবং দেশের বাইরে এখনও এ ধরণের অনেক উপাদান উপকরণ ও বস্তু নির্দশন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনে সেগুলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, শ্রেণীকরণ, প্রয়োজন। সে সবের ভিত্তিতে গবেষণা-কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমেই আমরা মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি এবং প্রকৃত ইতিহাস রচনা করার পথে অগ্রসর হতে পারি।

টীকা ঃ

১) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিসার্চ ফেলো জনাব শামসুল হোসাইন ব্যক্তিগত ভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যুদ্ধশেষে তার সংগ্রহের একটি প্রদর্শনী তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্যে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৭৩-এ তিনি এই সংগ্রহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করেন। দ্র. পঁচিশ বছর পূর্তি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর মাহবুবুল হক (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১২

২) ৩০ মার্চ পাকিস্তানবাহিনী বোমাবর্ষণ করলে বেতার কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। ৩১ মার্চ ট্রান্সমিটার ভবন থেকে ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি প্রথমে পটিয়ায় ও পরে আগরতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। ৩ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে এই ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের সাহায্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়। নবপর্যায়ে এই বেতারকেন্দ্র আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে ২৫ মে থেকে। তখন তার নামকরণ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র।

৩) মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. হোসেন তওফিক ইমাম, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার', *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস* ১৯৪৭-১৯৭১, প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ. ২৬৬-২৮৮।

৪) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য দ্র. শাহরিয়ার কবির, '*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত*', *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯-৩০৮।

৫) বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

'৭১-এ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ঘোষণা ঃ ভারতীয় লোকসভায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

সুনীল কান্তি দে

২৫ মার্চ, ১৯৭১ রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঐ দিন মধ্য রাতে বঙ্গ বন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নং তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে মীয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দী করে রাখে। ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা বিশেষত গেরিলা বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণে জুলাই মাসের মধ্যে পাকবাহিনী অনেকটা বিপর্যস্ত ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনি পরিস্থিতিতে ৩ আগস্ট ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেন যে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দেশে প্রচলিত আইনে তাঁর বিচার করা হবে।[১] ৯ আগস্ট পাকিস্তান সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগের সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার এক নতুন অভিযোগ আনয়ন করে বলা হয় যে "পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা" এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য বিশেষ সামরিক আদালতে অধুনা বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হবে। আগস্ট মাসের ১১ তারিখ থেকে গোপনে বিচার শুরু হবে এবং বিচারের কার্যবিবরণী গোপন রাখা হবে।[২] এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতসহ সারার বিশ্বের গণতান্ত্রিক, স্বাধীনতাকামী ও মানবতাবাদী মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। ভারতীয় লোকসভার সরকার ও বিরোধী দলীয় সাংসদগণ বাংলাদেশ তথা সমগ্র পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের সামরিক আদালতে বিচার প্রহসনের কঠোর সমালোচনা, অবিলম্বে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি এবং শেখ মুজিবের প্রাণরক্ষা ও মুক্তির ব্যাপারে ভারত সরকারের করণীয় ইত্যাদি পর্যালোচনা করে যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন আলোচ্য প্রবন্ধে তা উপস্থাপন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ভারতীয় লোকসভায় ৪, ৯, এবং ১২ আগস্ট ১৯৭১ শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ঘোষণার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ আগস্ট ৬ জন, ৯ আগস্ট ৯ জন এবং ১২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ ৪ জন সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্য অংশ নেন।

তন্মধ্যে বিরোধী দলীয় সাংসদ পি এস পি-র সমর গুহ, সি পি আই এর এস এম ব্যানার্জী, নির্দলীয় সদস্য শামিম আহমদ্ শামিম, জনসংঘের অটল বিহারী বাজপেয়ী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৪ আগস্ট বিরোধী দলীয় পি এস পি-এর প্রভাবশালী সদস্য সমর গুহ পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ঘোষণা এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত না থাকতে পারেন এই মর্মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ উল্লেখ করে এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে লোকসভায় আলোচনার জন্য কয়েকবার স্পীকার জি এস ধীলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৩] কিন্তু স্পীকার সংসদের আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি না থাকায় এ ব্যাপারে আলোচনার অনুমতি দিতে অস্বীকার করলে সংসদে তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে স্পীকারের সঙ্গে সমর গুহ (পি এস পি), অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী (সি পি আই), অটল বিহারী বাজপেয়ী (জনসংঘ), শামিম আহমেদ শামিমের (নির্দলীয়) প্রবল বাদানুবাদ হয়।[৪] কানপুর থেকে নির্বাচিত সাংসদ এস এম ব্যানার্জী (সি পি আই) সংসদে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পাশ এবং সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে একটি বিবৃতি প্রদানের দাবি জানান।[৫] সমর গুহ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের প্রতি অনমনীয় থেকে বলেন, "Unless and until you throw me out of this House I will go on continuing to raise a matter about Bangladesh and bring it to the attention to this House and through this House to the country at large, especially, when the Military regime there is threatening the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, that he would be executed before october next."[৬] শ্রীনগর থেকে নির্বাচিত নির্দলীয় সদস্য শামিম আহমেদ শামিম সমর গুহ কর্তৃক আনীত শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রসঙ্গে সংসদে আলোচনার প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে এবং এ ব্যাপারে সরকারি দলের নীরবতার অভিযোগ এনে মন্তব্য করেন, "He is not standing alone, I am sure the entire House is in sympathy with him. The question is not of shri Samar Guha. The entire House. I do not know why the entire ruling party is sileant on this issue."[৭] এ অভিযোগ অস্বীকার করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের বিচার ঘোষণায় হাউসের মত সরকারও উদ্বিগ্ন। পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন জানিয়েছে যে শেখ মুজিবুর রহমানের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে যেন তারা লক্ষ্য রাখেন। এসব রাষ্ট্রের কাছে ভারত সরকার আরো আবেদন করেছে যে শেখ মুজিবুর রহমান যাতে সুবিচার পান সেদিকেও যেন দৃষ্টি রাখে।[৮] তিনি সংসদকে জানান, পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং ভারত সরকারের পক্ষে কূটনৈতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের সরকারের

সঙ্গে শেখ মুজিবের প্রতি সুবিচারের ব্যাপারে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে পাকিস্তান সরকার যাতে একটা রাজনৈতিক মীসাংসায় উপনীত হন তা নিয়ে কথা বলেছেন।[৯] স্পীকার শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রসঙ্গে বিরোধী দলীয় সাংসদের আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব ৪ আগস্ট গ্রহণ না করলেও ৯ আগস্ট প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। ৯ আগস্ট সমর গুহ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেওয়ার হুমকী প্রসঙ্গে জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি দানের অনুরোধ করলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং ২৫ মার্চ-পূর্ব ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী আখ্যায়িত করার কথা, জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, শেখ মুজিবকে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের নয় সারা পাকিস্তানের স্বীকৃত নেতা এবং ২৫ মার্চ পরবর্তী বাংলাদেশ গণহত্যা প্রভৃতি ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেন, শেখ মুজিবের এই বিচার প্রহসন মানবাধিকার লংঘন। আমরা বিশ্বের সরকারগুলিকে পাকিস্তান সরকারের উপর প্রভাব খাটিয়ে এই বিচার বন্ধ করতে অনুরোধ করেছি।[১০] তিনি আরো বলেন যদি শেখ মুজিব, তার পরিবার এবং তাঁর সহকর্মীদের কোন ক্ষতি করা হয় তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি গুরুতর আকার ধারণ করবে এবং বর্তমান পাকিস্তানি শাসকগণকে এজন্য পুরোপুরি দায়ি করা রবে।[১১] সর্বশেষে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বলেন, "We share the concern expressed by about 500 Members of Parliament in this regard. . . We express our condemnation of the proposed action and warn the Government of Pakistan of its serious consequences."[১২] লোকসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সরকারি বক্তব্য বিরোধী দলীয় সদস্যদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বিরোধী দলীয় সি পি আই সদস্য এস এম ব্যানার্জী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উল্লেখিত শেষ বাক্যটি উদ্ধৃত করে বলেন, পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের কার্যকলাপের জন্য আমাদের বিস্ময় এবং আক্ষেপ অথবা নিন্দা প্রকাশ এই প্রথম নয়। আমরা সামরিক একনায়ক এবং তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আমরা ইহাও জানি ইয়াহিয়া খান বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের হাতের প্রধান পুতুল। কাজেই, "the question is when we appealed to the conscience of other nations we should have the sad experience of the past. Some of the organisations of the entire world demanded execution of Rosenberg should be stopped, But what happened? They were executed, I know what happened to patrice Lumumba. How he was Murdered, we are also aware as to what happened to Martin Luther King.When he was murdered. I am not surprised when The People fight against the military tyranny sometimes They are murdered, sometimes they are butchered and that is why we

say paths of glory lead to the grave. But my only anxiety is that it is not only a question of execution of Mujibur Rahman by the military court after the farcical trial but this will be the crucifixion of humanity, parliamentary democracy and, last but nor the least, secularism in Bangladesh. I know, as long as even a child is alive in Bangladesh Mujibur Rahman cannot be executed by this military power. I still have faith in the people who have fought. Six lakhs of them become victims of military bullets. They are still fighting. The Mukti Fouj is gaining ground and they are growing stronger"[১৩] বিরোধী দলীয় সাংসদ সমর গুহ ইতিপূর্বে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের জাতিসংঘের মহাসচিব-এর নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিতে উল্লেখিত শেখ মুজিবের বিচার বন্ধ, অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির জন্য বিশ্ব বিবেক জাগ্রত করার প্রশ্ন নয়, একা কেউ বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষা করতে পারবে না। আমি মনে করি সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্বীকার করা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, শেখ মুজিবের নিরাপত্তা এবং অবিলম্বে মুক্তি প্রধান এবং আবশ্যিক করণীয় হল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান, এ ব্যাপারে আমাদের সরকারের এখনই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তিনি জানতে চান, ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক শেখ মুজিবুর রহমানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন কিনা এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানিয়ে সংসদে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করবে কিনা।[১৪] সি পি আই সদস্য এস এম ব্যানার্জী সমর গুহের বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, আমি নিশ্চিত যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে শেখ মুজিবের যেমন জীবন রক্ষা হবে তেমনি বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাও রক্ষা পাবে।[১৫] এর জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং বলেন, স্বীকৃতির প্রশ্নে সরকার সময়ে সময়ে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে এবং ইহা বারবার বলার কোন কারণ নেই। সুতরাং আমি স্বীকৃতির ব্যাপারে কোন বিস্তারিত বিবৃতি দিতে চাই না।[১৬] নব কংগ্রেসের তরুণ সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বলেন, ইয়াহিয়া যদি সেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করেন তাহলে ভারত সরকারের ভারতীয় যুবকদের মুক্তিফৌজে যোগদানের ব্যাপারটি রাজনৈতিক। এটা সরকারের করণীয় বিষয় নয়।[১৭] শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের কাছে ভারত সরকারের আবেদনের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে জনসংঘ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, বেশির ভাগ রাষ্ট্রের সরকার এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তারা বিষয়টি নিয়ে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কথা বলবেন। এসঙ্গে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট সাংসদদের প্রেরিত স্মারকলিপির কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন,

"I am sure that this will have effect not only in the united Nations circles but also in others countries of the world."[১৮] ঐ দিন (৪ আগস্ট ১৯৭১) লোকসভায় পর্যটন মন্ত্রী ড. করণ সিং, সাংসদ ভেনকইয়া সুববাইয়া, এ এইচ এম প্যাটেল এবং পিলো মোডি সেখ মুজিবের অবৈধ বিচার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ১২ আগস্ট বিকালবেলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে পুনরায় লোকসভায় শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন ও তাঁর জীবন রক্ষার ব্যাপারে ভারত সরকারের করণীয় সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই বিরোধী দলীয় সদস্য এস এম ব্যানার্জী (সি পি আই) সেখ মুজিবের বিচার বন্ধ এবং তাঁর জীবন রক্ষার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রচেষ্টার উল্লেখ করে তাঁকে এ সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করেন; যাতে বিশ্ববাসী জানতে পারে এই সংসদ শেখ মুজিবের ব্যাপারে সমভাবে উদ্বিগ্ন।[১৯] একইভাবে সাংসদ শ্যাম নন্দন মিশ্র শেখ মুজিবের বিচার বন্ধের ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া জানতে চান।[২০] প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বিরোধী দলীয় সদস্যদের প্রতিক্রিয়া এবং সরকারি সদস্যদের বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনে বলেন, "I can understand the desire of the Members for greater effort on our part. Many Members have sent telegrams to various organisations and Parliaments abroad.. The Government of India also has approached the Secretary-General of the U.N., W-Thant. I myself have written on more than one occasion the Heads of states and Prime Ministers to try their best to save the life of Sheikh Mujibur Rahman.[২১] Servel have written to us that they are taking up this matter or that they have taken up the matter.[২২] I know that there is a feeling in parliament that Parliament itself should move a resolution. I have no objection to such a resolution, but I feel that it would not serve much purpose except to reiterate our own strong feelings. We Know that sort of military regime which exists in Pakistan is not going to pay any heed our resolution or even the opinion of other peoples of the world, Perhaps it could be pressurised by certain Governments and we are doing our best that such pressure should be exercised."[২৩] পরিশেষে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ একটি ব্যাপারে সর্বদাই অগ্রণী। ভারতের যে কোন জায়গার চেয়ে তাঁরাই ভারতকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বিপ্লবী উপহার দিয়েছেন। তিনি হুঁশিয়ার করে দেন যে, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসক কোন ব্যবস্থা নিলে শুধু বাংলাদেশে ও ভারতে নয়, তাঁর প্রতিক্রিয়া সারা পৃথিবীতে দেখা দেবে।[২৪]

উপসংহার ঃ

৭১-এ পাকিস্তানি সামরিক শাসক কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ঘোষণার প্রতিবাদে ভারতীয় লোকসভায় সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তাতে দেখা যায় বিষয়টি নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল সমভাবে উদ্বিগ্ন ছিল। তাঁরা এই বিচার প্রহসনকে মানবাধিকার পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করে পাকিস্তানি সামরিক শাসকের কঠোর সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য, তাঁদের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার তাঁর মুক্তি এবং তাঁর জীবনের নিরাপত্তার জন্য কার্যকরী পন্থা নির্ণয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এরসঙ্গে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বীকৃতি প্রদান, ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলাদেশে তাঁর নেতৃত্ব ও আন্দোলনের কৌশলের প্রশংসা, শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি ইয়াহিয়া খানের অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের নিন্দা, এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার সমালোচনা, বিরোধীদলীয় সাংসদ কর্তৃক ভারত সরকারকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগ, সর্বোপরি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের কোন প্রকার অশুভ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ প্রভৃতি বিষয় তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় স্থান পেয়েছে। এতে একদিকে পাকিস্তানি সামরিক শাসক কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের চরম প্রতিবাদ করা হয়েছে অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১) **The Dawn** (Karachi), 5 August 1971.উদ্ধৃত **Bangladesh Documents**, Vol.II, Ministry of External affairs, Government of India, New Delhi, 1972, p. 21.

২) **The Dawn** (Karachi), 10 August 1971. **Bangladesh Documents**, Vol. II, p. 22

৩) **Lok Sabha Debates** , 4 August 1971, Fifth series Vol. VII, no. 54, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, p. 187-188.

৪) **Ibid** , p. 187-190 আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৫ আগস্ট ১৯৭১।

৫) **Lok Sabha Debates** , 4 August 1971, Fifth series Vol. VII, no. 54, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, p. 190

৬) **Ibid** , p.188

৭) **Ibid** , p. 189

৮) **Ibid** , p. 190

৯) **Ibid**

১০) **Lok Sabha Debates** , 9 August 1971, Fifth series no. 56, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, Vol. VII, p. 233.

১১) **Ibid** , p. 233-234.

১২) **Ibid** , p. 234.

১৩) **Ibid** , p. 240-241.

১৪) **Ibid** , p. 234-237 এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি সংসদকে জানান, "I want to remind the House that nowhere and at no time in the annals of the world history no leader commanded the total loyalty of the total population of a country as sheikh Mujibur Rahaman does today. In no democratic multi-party system of elections ever held in any part of the world has emerged a leader like him who could secure with his party 98.9 percent of the representation the people ... We are proud of our Gandhian legacy. Mahatma Gandhi is the father of the technique of non-violent non-co-operation movement. I should humbly say That Sheikh Mujibur Rahman excelled in applying the technique of mational liberation much more than Gandhiji himself. The total people of Bangladesh had complete faith in him and before the 25th of March no writ of Yahya Khan had any sway either in the public life or in public administration. It is record that it had never happened in any part of the world that the chief Justice of the High Court refused to administer the oath of the office to the Governor-designate Mr. Tikka Khan." (**Ibid** , p. 235)

১৫) **Ibid** , p. 242

১৬) **Ibid** , p. 243

১৭) **Ibid** , p. 245

১৮) **Ibid** , p. 239

১৯) **Lok Sabha Debates** , 12 August 1971, Fifth series Vol. VII, no. 59, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, p. 367-368.

২০) **Ibid** , p. 370

২১) **Ibid** , p. 369

২২) **Ibid** , p. 370

২৩) **Ibid** , p. 369

২৪) **Ibid** , p. 370-371

পূর্ববঙ্গের ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের নীতি ঃ সমাজ মানসে এর সাধারণ প্রতিক্রিয়া (১৯৪৭-১৯৭১)

মোঃ আবুল কাসেম

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হবার পর মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র 'পাকিস্তান'-এর দুই অংশেই সরকার পরিচালনার দায়িত্বে গ্রহণ করে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা জনপ্রিয় মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ। একমাত্র ধর্ম ব্যতীত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি ও জাতি ভৌগলিক ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিক দিক থেকে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই দুই অংশের জনগণের মধ্যে রয়েছে সীমাহীন বৈপরীত্য। অপর পক্ষে প্রাকৃতিক কারণে উপযুক্ত সকল ক্ষেত্রেই ভারতের বাংলাভাষাভাষী পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ঘনিষ্ট ঐক্য বিদ্যমান। ঐতিহাসিক কারণে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ায় পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত জনসাধারণের মানসিক চাহিদা অনেকখানি মেটাতো কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম ও পত্রপত্রিকা। উনিশ শতকের প্রধানতঃ হিন্দু লেখকেদের রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছিল এবং হিন্দু মুসলমানের সাধারণ ঐতিহ্য হিসেবে নতুন প্রজন্মের মুসলিম মধ্যবিত্তের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। এই বাস্তব পরিস্থিতির পরিণামে পূর্ববঙ্গে পরিকল্পিত 'পাকিস্তানি' জাতিসত্তার বিকাশে বাধা হয়ে উঠতে পারে, সম্ভবতঃ এ আশঙ্কায় মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববঙ্গের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এমন একটি কার্যকর নীতি গ্রহণ করতে চাইল, যা পূর্ববঙ্গবাসী মুসলমান নাগরিকদেরকে সাধারণভাবে হিন্দু ও বিশেষভাবে কোলকাতার সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক মননধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং পরিণামে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। প্রধানত রাষ্ট্রভাষা, লিপি পরিবর্তন, বাংলা ভাষার সংস্কার এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার-এই চারটে বিষয়ে পাকিস্তান সরকার আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিকভাবে এর নীতি ব্যক্ত করে।

১. ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার প্রতিবাদে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় মত প্রকাশ করেন - 'বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই'। (বদরুদ্দিন উমর: ১৯৭০:৩-৬) ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের বৈঠকে উত্থাপিত

৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে অন্যতম প্রস্তাব ছিল পাকিস্তান গণপরিষদের আলোচনায় উর্দু বা ইংরেজি ব্যতীত কোন ভাষা ব্যবহৃত হতে পারবে না। কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সংশোধনী প্রস্তাব হিসেবে বাংলা অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানালে পাকিস্তানের তদানীন্তন মন্ত্রী লিয়াকত আলি খান শুধু বিরোধিতাই করলেন না, বরং প্রস্তাবকের উদ্দেশের সততার প্রতিও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। মোহাজের ও পুনর্বাসনমন্ত্রী গজনফর আলি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বললেন - 'পাকিস্তানে একটি মাত্র সাধারণ ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হচ্ছে উর্দু। প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খাঁ এ বিষয়ে কোন বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকেন। প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন মত প্রকাশ করেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের মত হচ্ছে এই যে, উর্দুই একমাত্র ভাষা, যা পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা হিসেবে গৃহীত হতে পারে।' তাঁর মতে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।(৫০-৫২)

১.১ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সরকারি মনোভাবের বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। গণপরিষদের এই সিদ্ধান্তে ছাত্ররা বিক্ষোভমুখর হয়ে ওঠে। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল কাসেমের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ জন্ম নেয়। অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের শেষ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসে (বর্তমান বাংলা একাডেমি ভবন) বহু সংখ্যক ছাত্র এবং শিক্ষক রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সৈনিক পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্টানাদির আয়োজন করে। (রেজোয়ান:১৩৮২:৫৫-৭০) নবগঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এর তৎপরতার প্রতিবাদে ১১মার্চ. ১৯৪৮ তারিখে সফল ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের দিন পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সবার অধিবেশনের দিন ১৫ মার্চ তারিখ পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১.২ ছাত্র আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে চাপের মুখে মুখ্যমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে ছাত্রদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। চুক্তির একটি প্রধান শর্তানুযায়ী বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ সরকারের ভূমিকা রাখার অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।(৮১-৮২) কিন্তু ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের তদানীন্তন বড়লাট মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ পূর্ববাংলা সফরে ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বক্তব্যে বলেন- 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তিনি ছাত্রদেরকে 'পঞ্চম বাহিনী' ও 'জাতীয় শত্রু' বলে অভিহিত করেন এবং প্রাদেশিকতার মনোভাব পরিহার করার জন্য উপদেশ দেন।(১০৪-১১১)

১.৩ ৬ এপ্রিল, ১৯৪৮ তারিখে পূর্ববঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী নাজিম

উদ্দিন বাংলাকে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি ৮ এপ্রিল সামান্য সংশোধনের পর নিম্নোক্তরূপে গৃহীত হয়।

ক. পূর্ববাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব বাস্তব অসুবিধাগুলি দূর করা যায়, তত শীঘ্র তা কার্যকর করা হবে।

খ. পূর্ববাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হবে 'যথাসম্ভব' বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রদের ভাষা।

স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যাবে, এই প্রস্তাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীদের দাবির যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী ছাত্র প্রতিনিধিদলের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছেন, পরিষদে এই ধরণের অভিযোগের জবাবে নাজিম উদ্দিন বলেন,-

'যে সময় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তখনকার অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার পার্থক্য রয়েছে। (১২৭)

১.৪ আন্দোলনকারীদের দমনপ্রচেষ্টার সমান্তরাল উর্দুভাষার উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকার তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পেশোয়ারে পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক প্রস্তাবে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে উর্দু ভাষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করা হয়। (দৈনিক আজাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুভাষার বি এ অনার্স, এম. এ. এবং উর্দু ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়। ইতিমধ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উর্দু ভাষার উন্নতির জন্য 'আঞ্জুমানে তরক্কিয়ে উর্দু' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। 'বাবায়ে উর্দু' নামে কথিত ড. আবদুল হককে এক কেন্দ্রীয় শাখার সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। মোলানা আকারাম খাঁকে এক পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক শাখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ড. আবদুল হক ১৯৪৯ সালে মার্চ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি শাখা গঠনের জন্য পূর্ব বঙ্গ সফরে আসেন। এই দফায় তিনি সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং সৈয়দপুর সফর করেন। চট্টগ্রামে অধ্যক্ষ আবু হেনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বলেন, জাতীয় ঐক্য দৃঢ় করার জন্য উভয় অংশের একটি জাতীয় ভাষা থাকা উচিত এবং তার মতে একমাত্র উর্দুই সে ভাষা হতে পারে। চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে অনুষ্ঠিত আনসার বাহিনীর এক সভায় তদানীন্তন প্রদেশপাল আবদুর রহমান সিদ্দিকী মুসলিম জাহান সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভায় সকলেই উর্দু প্রচারের প্রতিশ্রুতি দেন বলে পত্রিকার খবরে উল্লেখ করা হয়। চট্টগ্রামে 'আঞ্জুমানে তরক্কিয়ে উর্দু'র একটি শাখার উদ্বোধন করা হয় (৩০ মার্চ, ১৯৪৯)। ৮ এপ্রিল, ১৯৪৯ তারিখে মৌলানা আকরাম খাঁ ঢাকা বাহক ক্লাবে ড. আবদুল হকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ড. আবদুল হক বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনমত উর্দুর সপক্ষে (৯ এপ্রিল, ১৯৪৯)। পূর্ব বঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ইব্রাহিম খাঁর 'আজাদ' পত্রিকায় প্রদত্ত একটি বিবৃতি থেকে

জানা যায়, ১৯৪৮ সালের ২০ জুলাই তারিখে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে মাধ্যমিক পর্যায়ে উর্দু অবশ্য পঠনীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১.৫ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ডামাডোলে আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে নতুন একটি উপদল জন্ম নিয়েছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর একাধিক প্রবন্ধে (আবুল কাসেম:১৯৯৭:১৬৯-৭০) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা না হলে পাকিস্তানের মত ইসলামি রাষ্ট্রে উর্দুর চাইতে বরং আরবির দাবি বেশি অগ্রগণ্য বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। ড. শহীদুল্লাহের এই বক্তব্যের দ্বারাই সম্ভবতঃ আরবিবাদীরা অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলেন। পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের গভর্নর জাহিদ হোসেন ছিলেন আরবিবাদী উপদলের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক। এঁদের উদ্যোগে 'পূর্ব পাক আরবি সমিতি' ১৯৫০ সালের মে মাসে আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গণপরিষদে একটি স্মারকলিপি পেশ করে।

১.৬ এরপরে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গটি কিছুকাল চাপা পড়েছিল। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিনের রাষ্ট্রভাষাসম্পর্কিত একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে তা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালের মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর উক্তির প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে চান, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হোক, এটিই ছিল 'কায়েদে আজম'(মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ; ইতোমধ্যে পরলোকগত) এর কাম্য। যারা রাষ্ট্রভাষার উর্দু ব্যতীত অন্য কোন ভাষার কথা বলে, তারা পাকিস্তানের শত্রু। এই বক্তৃতায় ছাত্রসহ সচেতন সকল মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ, গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। লাগাতার ধর্মঘটে, মিছিলে, শ্লোগানে পূর্ববঙ্গ উন্মুখর হয়ে ওঠে। ৪ফেব্রুয়ারির এক সভায় ২১ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এই ধর্মঘট সফল করার জোর তৎপরতা লক্ষ্য করে ২০ ফেব্রুয়ারি বুধবার ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা শহরে পরবর্তী তিনদিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে একটি নির্দেশ দেন। এদিকে পূর্ববর্তী রাতে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন (২৬২-৬৩)। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের চেষ্টায় বাধা দিলে পুলিশ বাহিনীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ এলাকায় ছাত্রদের সঙ্গে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। বিকেলে মেডিকেল কলেজে অবস্থান নেওয়া ছাত্রদের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। এতে এই দিন ছাত্র অছাত্র মোট ৪জন নিহত ও অনেকে আহত হন। নিহতরা হচ্ছেন— (১) সালাহউদ্দিন (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), (২) আবদুল জব্বার (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), (৩) আবুল বরকত (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), (৪) শফিউর রহমান (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) এবং রফিক উদ্দিন। আহতদের মধ্যে আবদুস সালাম (সেক্রেটারিয়েটের পিয়ন), পরে (৭এপ্রিল) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন(২৯৫)।

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে পূর্ব বাংলা

সরকারের প্রধানমন্ত্রী বাংলাভাষা সম্পর্কে একটি 'স্পেশাল মোশন' আনয়ন করেন। তাতে বলা হয়।

এই পরিষদে গণপরিষদের কাছে এই সুপারিশ করছে যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হোক।

১.৬ ভাষা আন্দোলনে সরকারের নৃশংস দমন নীতি এবং তজ্জনিত এই শোকাবহ পরিণতিতে পূর্ববাংলার সর্বস্তরের মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য পদে উস্তফা দেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ মুসলিম লিগ পরিষদ দল থেকে পদত্যাগ করেন (রফিকুল ইসলাম: ১৩৯২·৪৭)। ভাষা শহীদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য প্রথম শহীদের রক্ত যেখানে ঝরেছিল, সেই স্থানে ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাত্রের মধ্যে ছাত্ররা একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। শহীদ শফিউর রহমানের পিতাকে দিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি মিনারটি উদ্বোধন করা হয়েছিল, ২৬ ফেব্রুয়ারি আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে দিয়ে পুনরায় এটি উদ্বোধন করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই শহীদ মিনারটি সরকারি বাহিনী নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

১.৭ একুশে ফেব্রুয়ারির এই চাঞ্চল্যকর শোকাবহ ঘটনার পর পূর্ব বঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপের বিষয়ে পাকিস্তানি সকল নেতার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল এমন কথা বলা যাবেনা। পূর্ব বঙ্গ সরকারের গভর্নর ফিরোজ খান নুন পদত্যাগ করার পরে লাহোরে বলেছিলেন, ''বাঙালিরা যদি আরবি হরফে বাংলা লিখতে রাজি থাকেন, তাহা হইলে বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইলেও তাঁহার আপত্তি থাকিবেনা।'' তিনি আরও বলেন, ''বাংলা ভাষায় প্রায় শতকরা ৯০টি শব্দ ফারসি, উর্দু, আরবি এমন কি পাঞ্জাবি হইতে উদ্ভুত।'' (দৈনিক আজাদ:১৬ চৈত্র, ১৩৫৯)।

২. অভিন্ন উদ্দেশে বাংলা ভাষার লিপি পরিবর্তনের নীতিও গ্রহণ করে পাকিস্তান সরকার। এ বিষয়ে প্রথম বক্তব্য রেখেছিলেন পূর্ববঙ্গ মন্ত্রীসভার সদস্য হবীবুল্লাহ বাহার। ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে পূর্ববাংলা বিধান পরিষদে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বিতর্ক চলাকালে লিপি পরিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেন। লিপি প্রবর্তন করা যায় কিনা, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আবেদন জানান, রোমান লিপি প্রস্তাবের কথাও উল্লেখ করেন (বশীর: ১৯৮৫:৬১৯-২০)। ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করেন। এ ছাড়া আরবি বর্ণমালা পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে শিক্ষাগত সামঞ্জস্য বিধানেও সহায়তা করবে (বদরুদ্দিন উমর: ১৯৮৫:২৫৭)। শিক্ষামন্ত্রী ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে পেশোয়ারের অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সম্মেলনে 'জাতীয় ঐক্য, সংহতি, ও পাকিস্তান শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি'র

প্রয়োজনে আরবি 'নাসক' হরফে (যা কলিকাতার ছাপা বলে পরিচিত) বাংলা লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন (তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ—

- যে হরফের মাধ্যমে যত সহজে ও তাড়াতাড়ি পড়া যায়, সে হরফ তত ভলো।
- বাংলায় বহু সংযুক্ত অক্ষর ইত্যাদি থাকায় টাইপরাইটিং এবং শর্ট হ্যান্ডের কাজে তা ব্যবহারের অসুবিধা।
- এসব দিক দিয়ে আরবি হরফ সর্বাপেক্ষা সহজ ও উপযোগী।
- আমাদের শতকরা ৭০ ভাগ নিরক্ষর। কাজেই তাদেরকে আরবি হরফে শিক্ষা দিলে জনগণের নিরক্ষরতা দূর করা বহুলাংশে সহজ হবে। (২৫৬-৫৭))

এই সভায় হরফ পরীক্ষা এবং তাকে পাকিস্তানের সমুদয় আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য সম্ভাব্য পরিবর্তনাদি সম্পর্কে বিবেচনা করার উদ্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করা হয় (দৈনিক আজাদ: ১৮ ফেব্রুযারি, ১৯৪৯) এর সূত্র ধরে বাংলাভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনার জন্য পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা মাহমুদ হাসানকে চেয়ারম্যান করে বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয়। যার অন্যতম সদস্য হন মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৭এপ্রিল, ১৯৪৯) পূর্ববাংলা সরকারের অবাঙালি শিক্ষা সেক্রেটারী ফজলে আহমদ করিম ফজলও ছিলেন বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী। এই সময় জনশিক্ষা পরিচালক ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী উর্দুভাষী ফজলুর রহমান। তাঁরই উত্তরসূরি আবদুল হাকিমের এক স্মৃতিকথামূলক রচনা থেকে জানা যায়, ফজলুর রহমান তাঁর ফাইলে নাকি লিখেছিলেন - 'বাঙালি মুসলমানের ভাষা উর্দুরই একটি রূপান্তর মাত্র এবং উর্দু হরফে লিখলে ইহা উর্দু বলেই মনে হবে'(ফিরোজা:১৯৬৭:৭৯)।

২.১ আরবি হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধেও পূর্ববাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ৪মার্চ, ১৯৪৯ তারিখে তমদ্দুন মজলিশ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনা হয় এবং বাংলা হরফ নির্ধারণের দায়িত্ব প্রকৃত ভাষাবিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এই সভায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুর রহমান খান, কাজি মোতাহার হোসেন, শাহেদ আলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন (সৈনিক:১১ মার্চ, ১৯৪৯)। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভাষা কমিটির পক্ষ থেকে নঈমুদ্দিন সংবাদ পত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে একে চক্রান্তমূলক বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে পরিষদ উর্দুর প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় 'আরবি বর্ণমালার জিগির তুলে পশ্চাৎ দুয়ার দিয়ে উর্দু প্রবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে এবং পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব ও বাংলা ভাষাকে খতম করার ষড়যন্ত্র চলছে। বিবৃতি আরও উল্লেখ করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিত লোকের হার শতকরা ১২ থেকে ১৫ জন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৫ জনেরও কম।' আরবি বর্ণমালার দোহাই দিয়ে শতকরা এই ১৫ জন শিক্ষিতকে কলমের খোঁচায় অশিক্ষিততে পরিণত করার

এই সিদ্ধান্তকে 'তোঘলকী'আখ্যা দিয়ে তিনি একে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের রাতারাতি ইংরেজি প্রবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেন (৮এপ্রিল, ১৯৪৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের পক্ষ থেকে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এবং বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে অনুরূপ জোরালো ভাষায় এই প্রস্তাবের নিন্দা করে আরবি হরফে প্রবর্তনের ব্যাপারটিকে পাক বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর 'কসাইয়ের মত ছুরি চালনা'র সামিল বলে উল্লেখ করা হয় (বদরুদ্দিন: ১৯৮৫:২৬৭-৬৮)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবং ছাত্রছাত্রী সংসদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে আরবি হরফ প্রবর্তনের নিন্দা করে (দৈনিক আজাদ:১১ ডিসেম্বর, ১৯৪৯)। শিক্ষা ও বাণিজ্য সচিব ফজলুর রহমান ডিসেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ সফরে ঢাকা শহর সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরবি হরফে লিপি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সভা সমিতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৯)। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে ঢাকায় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের তৃতীয় অধিবেশনে বসার কথা ছিল। গুজব রটে, এই অধিবেশনে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। এইসময়ে আরবি হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে 'সৈনিক' পত্রিকা কড়া ভাষায় রচিত সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে হরফ পরিবর্তনের উদ্যোগীদেরকে 'ভন্ড মোনাফেক' বলে উল্লেখ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়াও ১১ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলা হরফের পক্ষ সমর্থনের আহ্বান জানান এবং এই বিষয়ে একটি স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানও শুরু করেন।

২.২ এত সমস্ত আপত্তি প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮ এপ্রিল ১৯৫০ তারিখ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টি কেন্দ্রে আরবি হরফে লিখিত বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রাথামিক শিক্ষা প্রদানের কাজ শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে আরবি হরফে বাংলা ছাপিয়ে সে সমস্ত বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পুস্তিকার মাধ্যমে আরবি হরফে বাংলা লেখার সমর্থনে প্রচার কাজও চালানো হয়। 'দুরদর্শী' ছদ্মনামের কোন একজন লেখকের লিখিত 'হরফ সমস্যা' এবং Farsight ছদ্মনামের আর একজন লেখকের লিখিত The Script Question এ ধরণের দু'টো উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা। কেন্দ্রীয় এডুকেশন সার্ভিসের একজন স্থায়ী অফিসারকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়; কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্ট্যান্ডিং কমিটিও গঠন করে। ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ মৌলানা আকরাম খাঁকে সভাপতি করে পূর্ববঙ্গ ভাষা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই ভাষা কমিটির রিপোর্টে অবশ্য আরবি হরফ প্রবর্তন অন্ততঃত বিশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ সত্ত্বেও কিন্তু সরকারের আরবি হরফ প্রবর্তনের অভিযান অব্যাহত থাকে (বদরুদ্দিন:১৯৮৫:২৬৮)। পূর্ব বঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালে আবার মৌলানা আকরাম খাঁকে সভাপতি করে ২৩ জন শিক্ষাবিদ্‌কে নিয়ে 'পূর্ব বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি' নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। দেশের পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুর্নগঠন করে ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে রূপ দেবার দায়িত্ব এই কমিটির উপর

ন্যস্ত করা হয়েছিল। এই কমিটিও প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে হাতে খড়ি দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এতদ্বিষয়কে উপদেষ্টা কমিটিও একই রকম প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু পূর্ব বঙ্গ সরকার এ সমস্ত প্রস্তাবের প্রতি কোন রূপ ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে চতুর্থ ও তার উপরের শ্রেণীসমূহে উর্দু বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশে মাতৃভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষার মাধ্যমে হাতে খড়ি দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলা সরকারের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা ও সমালোচনা করে মৌলানা আকরাম খাঁ পত্রিকায় একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, বাংলা ভাষায় আরবি লিপি প্রবর্তনের পথ সুগম করাই ছিল সরকারের উপরোল্লিখিত কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য (১০৩-৪)

২.৩ দ্বিতীয়বার বাংলা ভাষার লিপি পরিবর্তনের চেষ্টা হয় ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে প্রদত্ত এক নির্দেশে তিনি উর্দু ও বাংলার জন্য রোমান হরফ বাঞ্ছনীয় কিনা, সে সম্পর্কে সুপারিশ করতে বলেন। (সাঈদ:১৯৭৪:১৮৫) হরফ পরিবর্তনের নির্দেশের পেছনে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা যায় পরবর্তী কালের ১৯৬২ সালে নতুন শাসনতন্ত্র জারির সময়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে

কলকাতার সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে পূর্ব পাকিস্তানিদের তাদের হরফ বদলানো দরকার (দৈনিক আজাদ:২ এপ্রিল,১৯৬২)।

কমিশন এ বিষয়ে জনমত সংগ্রহের উদ্দেশে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে তা বিতরণ করেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, ফেরদৌস খান প্রমুখ বিভিন্ন উপায়ে রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন (এনামুল:১৯৭৬:২১০-২১৩; ফেরদৌস:বা এপ-পৌষচৈত্র, ১৩৭৪;হাই:সাপ-শীত, ১৩৬৮)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ অন্যান্য হলগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা কল্পে কার্জন হলে সভার আয়োজন করে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এতে সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যদের সঙ্গে বক্তৃতা করেন ড. কাজি মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অজিত কুমার গুহ প্রমুখ (সাঈদ:১৯৭৪:১৮৮)।

১৯৬৪ সালের ১২মে তারিখে আয়ুব খান করাচিতে উর্দু কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে আরবি হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন, এর মাধ্যমে ভারতীয় সংহতি দৃঢ়তর হবে। ২২মে তারিখে গভর্নর সম্মেলনে বিষয়টি তিনি পুনরায় উত্থাপন করেছিলেন তবে সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। লিপি পরিবর্তনের বিষয়টি এর পরে চাপা পড়ে যায় (দৈনিক আজাদ:২৩ মে, ১৯৬৪)।

৩. পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে বাংলা ভাষার সংস্কার মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের নিকট একটি জনপ্রিয় প্রসঙ্গে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪১ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য

সম্মেলনে হবীবুল্লাহ বাহারের উত্থাপিত বাংলা ব্যাকরণ সরলীকরণের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনেও সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা প্রস্তাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবমুক্ত খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা এবং যুক্তাক্ষরের অসুবিধা দূরীকরণার্থে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এই প্রস্তাবের উত্থাপক ও সমর্থক ছিলেন যথাক্রমে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং জহুরুল ইসলাম (দৈনিক আজাদ: ২৮ বৈশাখ, ১৩৫০)। শহীদুল্লাহ্ পাকিস্তান সরকারের ভাষানীতি বাস্তবায়নের প্রয়াস প্রতিহত করার জন্য তিনি ভাষা ও বর্ণমালা সংস্কারকে অন্যতম রণকৌশল হিসেবে নিয়েছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের একটি প্রস্তাব'' বাংলা বানান সংস্কার পরিভাষা সংকলন, বাংলা অভিধান রচনা এবং বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য পূর্ববঙ্গ সরকারকে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের অনুরোধ' জানানো হয়েছিল (আজাদ:৩ জানুয়ারি, ১৯৪৯)।

৩.১ ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ পূর্ব বাংলা সরকারের এক প্রেসনোটের মাধ্যমে 'পূর্ব বঙ্গ ভাষা কমিটি' (East Bengal Language Committee) নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয় (EBLC: 1958:1)। কমিটির বিচার্য বিষয় ছিল—

১. পূর্ব বাংলা জনসাধারণের ভাষার (তার ব্যাকরণ, বানান পদ্ধতি ইত্যাদিসহ) সরলীকরণ, সংস্কার সাধন ও সর্বজনগ্রাহ্যরূপ নির্ণয়।

২. বাংলায় নতুন শব্দ ও বাক্যাংশ সৃষ্টির এবং যে সমস্ত আধুনিক পরিভাষামূলক শব্দের প্রতিরূপ বাংলায় অনুপস্থিত, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সে সমস্ত শব্দের অনুবাদের নিয়মাদর্শ ও পদ্ধতি নির্দেশ এবং

৩. বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের এবং সাধারণভাবে পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতিভা ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশে কমিটির বিবেচনানুসারে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সোপারেশ করা। (২)

মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটিতে মন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধাপক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তাসহ সমকালীন খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মূলকমিটি ছাড়া ভাষা সংস্কার প্রত্যক্ষরীকরণ এবং উর্দু লিপিতে প্রত্যক্ষরীকরণের বিষয়ে বিবেচনার জন্য তিনটি পৃথক পৃথক উপকমিটিও গঠন করা হয়। ভাষা কমিটি নিয়োগের কথা ঘোষণার পর এ ব্যাপারে পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু প্রতিক্রয়া প্রকাশিত হয়। 'আজাদ' পত্রিকা এর ১০ মার্চ ১৯৪৯ তারিখের এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে বাংলা জবানকে পাকিস্তানিকরণ, গণতান্ত্রিককরণ এবং কার্যকরীকরণের ব্যাপারে' কমিটিকে সচেতন থাকার উপদেশ দেন। কমিটি এই তিনটি পারিভাষিক শব্দের

নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করে। পত্রিকার মতে, পাকিস্তানিকরণের অর্থ বাংলাভাষার সরলীকরণ এবং কার্যকরীকরণের অর্থ বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার মানুষের ধর্মের ও কর্মের উপযোগী করা। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের 'ভাষা কমিটি'র পক্ষ থেকে নঈমুদ্দিন আহমদ সদস্য নির্বাচনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নিম্নোক্ত ভাষায়-সত্যিকার ভাষাবিদদের বাদ দিয়া যিনি বাংলা ভাষার জন্য জেহাদ করিতে চাহিয়া পরে চুপ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই সভাপতি এবং জনৈক উর্দু সমর্থককে কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে (সৈনিক:৮ এপ্রিল, ১৯৪৯)। বাংলাভাষার আকৃতিপ্রকৃতি, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা বর্ণমালা ও বানান পদ্ধতি ও লিপি, বিদেশি ভাষা থেকে নতুন শব্দ তৈরি ও পরিভাষা প্রণয়নের পদ্ধতি , বিদেশি শব্দের বাংলায় প্রত্যক্ষরীকরণের নীতিমালা ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিধি প্রস্তাব সম্বলিত একটি রিপোর্ট কমিটি ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর সরকারের নিকট পেশ করে। এই রিপোর্টে বাংলা ভাষার সংস্কারের নামে 'সহজ বাংলা' নামে সর্বাংশে এমন এক উদ্ভট বাংলার প্রস্তাব করেছিল, যা ছিল অতিহ্যবাহী বৃহত্তর বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ জগত থেকে পূর্ব বাংলার বাঙালিদেরকে সত্যসত্যই বিচ্ছিন্ন করতো। উল্লেখ্য যে, কমিটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল আরবি উর্দু কিংবা রোমান লিপি নয়, সরলীকৃত বাংলা লিপিই হবে এই বাংলা একমাত্র লিপি। বিদ্যমান গণঅসন্তোষের মুখে পূর্ব বঙ্গ ভাষা কমিটির রিপোর্টে সরকার গ্রহণ করেননি, ১৯৫৮ সালের আগে তা জনসমক্ষে প্রকাশও করা হয়নি (বিস্তারিত আবুল কাসেম: ১০৮৯:১০৮-১১৬)।

৩.২ বাংলা ভাষার রূপ পরিবর্তনের একটা ভিন্নতর প্রয়াসের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। দেদার আরবি ফারসি উর্দু শব্দ মিশিয়ে বাংলা ভাষাকে উর্দু ভাষার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া এবং পরিশেষে উর্দুর মধ্যে বিলীন করে দেওয়াই হয়ত এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট সরকারি ঘোষণা না থাকলেও সরকার যে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষার মধ্যে এক প্রকারের fusion কামনা করেছিলেন, ১৯৫২ সালে প্রদত্ত তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের এক ভাষণে সে ব্যাপারে স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়।(উর্দুভাষী ও বাংলাভাষী লোকদের মিলনের ফলে দুইটি ভাষারই উন্নতি হইতেছে এবং একভাষার শব্দ অন্য ভাষার সঙ্গে মিশিয়া দুই ভাষাভাষিদের মধ্যস্থিত ব্যবধান দ্রুত কমাইয়া আনিতেছে, ইহার জন্য মরহুম কায়েদে আজম বা কায়েদে মিল্লাত কেহই অপরিণত সময়ে এ সম্পর্কে গণপরিষদের নিকট হইতে কোন সিদ্ধান্তকরণের প্রয়োজন মনে করেন নাই।(১৯৫২ সালের ৩ মার্চ তারিখে ভাষা আন্দোলন পরিস্থিতির উপরমুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের ভাষণ। 'ভাষা আন্দোলনের অন্তরালে' মাহে নও[১]: এপ্রিল, ১৯৫২)সরকারি সাময়িক পত্রিকা 'মাহে নও' এ ব্যাপারে সর্বাধিক তৎপরতা দেখায়। প্রথম কয়েটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামের শিরোনাম ছিল 'আমাদের কথা'। পরবর্তীকালে তা পাল্টে 'আমাদের গোজারেশ' রাখা হয়। সম্পাদকীয়ের ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ –

গোজাশতা এশায়াতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানামোড় পরিবর্তনের কথা মোখতাসার ভাব উল্লেখ করেছিলাম।

১. উর্দু ও বাংলায় প্রকাশিত সচিত্র মাসিক। সরকারি মুখপত্র, ১ম সংখ্যা চৈত্র ১৩৫৫। প্রথম সম্পাদক আবদুর রশীদ। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়—

পাকিস্তান এখন আলাদা রাষ্ট্র। হিন্দুস্থানের কলিকাতা নগরী হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা সমুহে পাকিস্তানি তার নিজের আদর্শের তাহজীব ও তামাদ্দুনের কোন কিছুরই সাক্ষাৎ পায় না।— ইহার আদর্শ পাকিস্তানের তাহজীব ও তামাদ্দুন। ইহার উদ্দেশ্য দেশের প্রধান সাহিত্যিকদিগকে কদর দেওয়া ও নয়া আজাদীর আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট লেখক লেখিকা সৃষ্টি করা।

মীজানুর রহমান, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, আবদুল কাদির এবং তালিম হোসেন বিভিন্ন সময়ে এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। .....মাহে নও (চৈত্র,১৩৫৬); শামসুল হক, বাংলা সাময়িক পত্র, ঢাকা:গ্রন্থায়ন, ১৯৭৩) পৃ. ২২-২৩

মুসলমানদের মৌখিক বাংলা ভাষা এবং উর্দু ভাষার মধ্যে শতকরা ৬০টি সাধারণ শব্দ রয়েছে, যার ফলে বাংলা ও উর্দু ভাষীর পক্ষে পরস্পরের ভাষা বোঝা কঠিন হয় না। বাঙালি দেখকদের সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে এই প্রভেদ ঘুচিয়া দেয়া মোটেই কঠিন হবে না।

জানা যায়, তদানীন্তন সরকারি প্রচার মাধ্যম 'রেডিও পাকিস্তান' এ উপরোক্ত ধরণের ভাষায় সংবাদ প্রচারের চেষ্টা হলে পত্র পত্রিকায় তার ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল। এই ধরণের ভাষারীতির ব্যাপারে সবচাইতে উৎসাহী সমর্থক একজন বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা মীজানুর রহমান বিশ্বাস করতেন—

৪. ১৯৬৫ সালের পাকভারত সংঘর্ষের পর রবীন্দ্র সঙ্গীতকে উপলক্ষ্য করে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নীতি ব্যক্ত করে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের তদানীন্তন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের বেতার ও টেলিভিশনে পাকিস্তান বিরোধী রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি আরও আভাস দেন, ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যের প্রচারও বন্ধ করা হবে। এই সংবাদ ২৩ জুন তারিখে Pakistan Observer ও Morning News এবং 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৪ জুন। এদিন সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকার উনিশজন কবি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও শিক্ষাবিদ্ পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথকে 'বাংলাভাষী পাকিস্তানির সাংস্কৃতিক সত্তার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ'রূপে উল্লেখ করে উক্ত সরকারি সিদ্ধান্তকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' বলে মত প্রকাশ করা হয়। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, কাজি মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক, কবি সাংবাদিক (গোলাম মুরশিদ: ১৩৮৮:২৩৭) কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ব্যাপকতর আন্দোলন সংগঠিত করার

জন্য কমিটি গঠিত হয়। নিন্দাবাদে শরিক হন আবুল হাশিম, মৌলানা ভাসানীসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও। এমন কি ঢাকায় বসবাসরত উর্দু ভাষার কয়েকজন কবিসাহিত্যিকও সরকারি সিদ্ধান্তের নিন্দা করেন।

রচনাপঞ্জী

গ্রন্থ ঃ

আবুল কাসেম, মোঃ, বাঙালি গ্রন্থ ঃ

আবুল কাসেম, মোঃ, বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা: বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চায় তার প্রতিফলন (১৯৪২-১৯৭২), অপ্রকাশিত অভসন্দর্ভ, আই. বি. এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্রবিশ্বে, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী: ১৩৮৮।

ফিরোজা খাতুন, সম্পা, কবি গোলাম মোস্তফা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী: ১৯৬৭।

বদরুদ্দিন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খন্ড, ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০।

পূব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ৩য় খন্ড, চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৮৫।

বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

ফিরোজা খাতুন, সম্পা, কবি গোলাম মোস্তফা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী: ১৯৬৭।

রফিকুল ইসলাম, শহীদ মিনার, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৯২।

প্রবন্ধ

আবুল কাসেম, মোঃ, "বাঙালি মুসলমানদের ভাষা সচেতনতার ধারা", রাজশাহী: আই. বি. এস. জার্নাল, ১৪০২-০৩।

মোফাজ্জাল হায়দার চৌধুরী, "বাংলা ভাষা ও জনাব ফিরোজ খান নুন", মোফাজ্জাল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

সাঈদ-উর-রহমান, "আইউব আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর,, ১৯৭৪।

দৈনিক ও সাময়িকী

দৈনিক আজাদ।

মাসিক মোহাম্মদী।

পরিক্রম।

রেজোয়ান হেসেন সিদ্দিকী, "পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক উদ্যোগ : তমদ্দুন মজলিস", পাণ্ডুলিপি, ৫ম খণ্ড, ১৩৮২।

সারাংশ

মৈমনসিংহ গীতিকা ঃ রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে সমকালীন সমাজ জীবন

নীপা কর

মৈমনসিংহ গীতিকার অভ্যন্তরীণ রসটি পরিপূর্ণভাবে আস্বাদনের জন্য সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ একান্ত অপরিহার্য। সেই সঙ্গে শিল্পের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কটিও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই, গীতিকার জন্মস্থল পূর্ব মৈমনসিংহ সেন বংশের কঠিন ধর্মীয় অনুশাসন ও মুসলিম শাসনের প্রাথমিক উগ্রতা থেকে মুক্ত ছিল। এই সাহিত্য কর্মে যে দূর্বার প্রণয়াবেগ, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং মানবিকতার পরিচয় লাভ করা যায় তা যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক উগ্রতামুক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত তা সহজেই অনুমেয়।

এই গীতিকাগুলিতে প্রাপ্ত সামাজিক বর্গাদির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে আমরা তৎকালীন সমাজ-জীবনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি। গাথায় সমকালীন সমাজ জীবনে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ প্রজাদের দ্বন্দ্বের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে। সমাজে বণিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধিষ্ণু চিত্রটিও গীতিকায় লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় সমাজে কৃষক শ্রেণীর ক্রম ক্ষয়িষ্ণু চিত্রটি। তৎকালীন সমাজ জীবনে ঘটক, গণক, বেদে, ওঝা, ডাকাত, সন্ন্যাসী, জল্লাদ, গণিকা, ডোম, ধোপা প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের সরব উপস্থিতি বিদ্যমান। কুসীদজীবী মহাজনেরা কিভাবে কৃষকদের জীবনে হাহাকার তুলতো তারও বর্ণনা আমরা গীতিকায় পাই। তৎকালীন সমাজ-জীবনে কুসীদজীবীদের যথেষ্ট প্রভাব বিভিন্ন পালায় লক্ষণীয়। আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় রাজা-জমিদারগণ হিন্দু ধর্মের অনুযায়ী, কিন্তু নবাব-দেওয়ান কাজি এরা সকলেই ইসলাম ধর্মালম্বি।

ইত্যকার সামাজিক তথ্য থেকে সুস্পষ্ট যে সুদীর্ঘ কালের ব্যাপ্তিতে রচিত হয়েছে গীতিকা। অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই মুসলমান শাসনযুগকে স্মবণ করিয়ে দেয়। সমাজে বল্লালি কৌলীন্যপ্রথা অনুযায়ী জাত-পাত বৈষম্য তেমন ভাবে পরিলক্ষিত না হওয়ায় সুস্পষ্ট যে গীতিকা সমূহের উদ্ভবের অঞ্চলটি পূর্ণভাবে নব্য ব্রাহ্মণ্য শাসন থেকে মুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ্যদের উপস্থিতি সমাজে বিচ্ছিন্ন ভাবে লক্ষ্য করা গেলেও তা ব্রাহ্মণ্য শাসনের ইঙ্গিত বহন করে না। কৃষক সমাজে স্বল্প উপস্থিতি ও বণিক সমাজের অবাধ বিকাশমুখীতা পালযুগ পূর্ব সময়কে নির্দেশ করে। মুসলিম নবাব-দেওয়ান-কাজির বিরংসাবৃত্তি মধ্যযুগীয় শাসন বৈশিষ্ট্যেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী। মহাজনের উপস্থিতি মুগল আমলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বোপরি গীতিকা সমূহে বিধৃত সমাজ-শাসকের পীড়ণ, বণিকের লুণ্ঠন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মহাজনি ঋণে নিঃস্ব কৃষক ও নিপীড়িত সাধারণ প্রজার হাহাকারকে অভিব্যক্ত করার পাশাপাশি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় নিস্তরঙ্গ বৈচিত্র্যবর্জিত জীবন বৈশিষ্ট্যকেও যথার্থভাবে প্রকাশ করেছে।

সূত্র নির্দেশ

১) *স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার* — ক্রিস্টোফার কর্ডওয়েল, অনুবাদ : রনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, এপ্রিল-১৯৮৫, পৃঃ ৬৭।

২) *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৭।

৩) *বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খন্ড : আলোচনা)* — শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩৬৯।

৪) *ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ* — কেদারনাথ মজুমদার, জেলাপরিষদ, ময়মনসিংহ, জানুয়ারি ১৯৮৭।

৫) *বাংলার লোক-সাহিত্য* (প্রথমখন্ড : আলোচনা) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৫।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১) *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য* — ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী।

২) *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (প্রথমখন্ড : দ্বিতীয় সংখ্যা) — শ্রী দিনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৩) *ময়মনসিংহ গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য* — সৈয়দ আজিজুল হক।

পদ্মা তীরের শহর ঃ গোদাগাড়ীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মোঃ আতাউর রহমান

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন জনপদ গোদাগাড়ী। এই স্থানে তথা গোটা বরেন্দ্র অঞ্চলে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন এবং মুসলিম যুগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অনেক স্থান বিদ্যমান। এই সব স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ এবং স্থাপত্যিক নির্দশন আমাদিগকে সুদূর অতীতের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। রাজশাহী জেলার ১৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পদ্মানদীর তীরে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ও থানা-র প্রধান কেন্দ্র। এই স্থানের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে মুদ্রা, শিলালিপি ও পুরাকীর্তির আকারে এমন অনেক তথ্য অদ্যাবধিও উৎঘাটিত হইতেছে। যাহা ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিতেছে।

উপসংহার ঃ বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অংশে গোদাগাড়ীর অবস্থান। প্রাচীনকাল হইতে বাংলার ইতিহাসে এই অঞ্চলটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মুসলিম বিজয়ের পূর্বেও এই অঞ্চলটি মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন বংশীয় শাসকদের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিকস্থল অনুসন্ধান করলে এর সত্যতা পাওয়া যায়। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে আমরা গোদাগাড়ীর শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও লোকাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করিতে পারি এবং গোদাগাড়ীর সাহিত্য ও ইতিহাসের ধারা পুনর্গঠনের জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তা অনুসন্ধিৎসু মন ও গবেষকদের আরো নতুন তথ্য উদ্ঘাটনে উৎসাহিত করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

সূত্র নির্দেশ

ইতিহাস অনুসন্ধান-৩, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৯৪।

ডঃ এ, কে, এম, ইয়াকুব আলি ঃ রাজশাহীতে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৭।

নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ২৯৩-২৯৪।

কালীনাথ চৌধুরী ঃ রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, হুগলী, ১৯০১, পৃঃ ৬।

কপিল ভট্টাচার্য ঃ বাংলাদেশের নদ-নদী ও পবিকল্পনা. কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃঃ ১।

প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

শ, ম, শওকত আলিঃ কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ২৬।

Imperial Gazetteer of India- Eastern Bengal and Assam, 1919, p. 208.

কাজি রওশন আলি (সম্পা)ঃ বিভাগ গাইড-রাজশাহী, নওগাঁ, ১৯৯৫, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯।

প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

পাবনা জেলা গেজেটিয়ার, ঢাকা, ১৯৯০, পৃঃ ৪।

ইসলামি বিশ্বকোষ, ১০ম খন্ড, ইফাবা, ১৯৯১, পৃঃ ৫৮৭।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান রিপোর্ট, (রাজশাহী জেলা), ১৯৯৮।

ইসলামি বিশ্বকোষ. ঐ, পৃঃ ৫৮৬।

প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮৭।

রাজশাহী পরিচিতি (রাজশাহী ঃ বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০), পৃঃ ২৩২।

ইসলামি বিশ্বকোষ, ঐ, পৃঃ ৫৮৭।

প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮৭।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান রির্পোট, ১৯৯৮ (রাজশাহী জেলা)।

ইসলামি বিশ্বকোষ, ঐ, পৃঃ ৫৮৮।

বরেন্দ্রী (গোদাগাড়ী ঃ কাকান হাট উন্মুক্ত পাঠাগার, ২০০০), পৃঃ ৭০।

ইসলামি বিশ্বকোষ, ঐ, পৃঃ ৫৮৮।

রমা প্রসাদ চন্দ্র ঃ গৌড় রাজমালা, রাজশাহী, ১৯২২, পৃঃ ৭৫।

কাজি রওশম আলি (সম্পা)ঃ বিভাগ গাইড-রাজশাহী, নওগাঁ, ১৯৯৫, পৃঃ ১৭।

ডঃ এ, কে. এম. ইয়াকুব আলি ঃ রাজশাহীতে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৯।

মুহম্মদ আব্দুস সামাদ ঃ সুবর্ণ দিনের বিবর্ণ স্মৃতি, রাজশাহী ১৯৮৭, পৃঃ ১০৫।

কালীনাথ চৌধুরী ঃ রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, হুগলী, ১৯০১. পৃঃ ৩৩২।

কে. এম. মিসির আলি ঃ রাজশাহীর ইতিহাস, ২য় খন্ড. ১৯৬০, পৃঃ ২৪১।

কাজি রওশন আলি (সম্পা)ঃ বিভাগ গাইড-রাজশাহী নওগাঁ, ১৯৯৫, পৃঃ ১৭।

Minhaj Siraj, Tabaqat-e-Nasiri, Vol.-I, ed. Abdul Hai Habibi (Kabul : Historical Society of Afghanistan, 1963), p. 426.

Journal of the Varendra Research Museum, Vol.-6, Rajshahi University, 1980-81, pp. 68 ff. (JVRM).

ইসলামি বিশ্বকোষ, ঐ, পৃঃ ৫৮৮।

রাজশাহী পরিচিতি (রাজশাহী ঃ বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০), পৃঃ ২৩৩।

এবনে গোলাম সামাদ ঃ রাজশাহীর ইতিবৃত্ত, রাজশাহী, ১৯৯৯, পৃঃ ৬৯।

L.S.S. O'Malley Gazetteer Rajshahi, 1919.

মুহম্মদ আব্দুস সামাদ ঃ সুবর্ণ দিনের বিবর্ণ স্মৃতি, রাজশাহী, ১৯৮৭, পৃঃ ১০২।

কালীনাথ চৌধুরী ঃ রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, হুগলী, ১৯০১, পৃঃ ১৪।

মুহম্মদ আব্দুস সামাদ ঃ সুবর্ণ দিনের বিবর্ণ স্মৃতি, রাজশাহী, ১৯৮৭, পৃঃ ১০৪।

Shamsud-din-Ahmed : Inscription of Bengal, Vol.-IV, (Rajshahi : Varendra Research Museum), p. 94-96.

রাজশাহী পরিচিত (রাজশাহী ঃ বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০), পৃঃ ২০৫-২০৬।

Shamsud-din-Abmed : Inscription of Bengal, Vol.-IV, (Rajshahi : Varendra Research Museum), p. 244.

রাজশাহী পরিচিত (রাজশাহী ঃ বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০), পৃঃ ২০৪-২০৫।

নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ৩৭৭।

বরেন্দ্রী (গোদাগাড়ী ঃ কাকান হাট উন্মুক্ত পাঠাগাব, ২০০১), পৃঃ ২৬-২৭।

রাজশাহী পরিচিতি (রাজশাহী ঃ বরেন্দ্র একাডেমী, ১৯৮০), পৃঃ ২১১-২১২।

বাংলাদেশের সমকালীন দর্শন চর্চার ইতিহাস (১৯৭১-১৯৯০) ঃ একটি পদ্ধতি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এন এইচ এম আবু বকর

গবেষণা বিষয়টির গুরুত্ব ঃ

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ, অর্থনৈতিক অরাজকতা, অস্থিতিশীল রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, মৌলবাদ, সমাজতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্র বিষয়ক যেসব ধারণা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনগণের জীবন ও কর্মপরিসরকে আলোড়িত করেছে দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনায় তা তেমন গুরুত্ব পায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের দর্শন চর্চা পুরো প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনের পেশাগত বিকাশের মূল শ্রোতধারার মধ্যেই সীমিত অথবা নির্ভরশীল থেকে গেছে। ফলে দেশজ সমাজ চেতনার পরিবর্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উপজাত সামাজিক চেতনাই এতে প্রতিফলিত হয়েছে বেশি। সে তুলনায় সমাজের অগ্রগতিকে সামনে রেখে সমাজ বাস্তবতার আলোকে দেশীয় প্রেক্ষাপটে দর্শনের বিকাশ কিংবা বিকাশের লক্ষ্যে একক বা বহুমাত্রিক দার্শনিক পদ্ধতি অনুসরণ বা যৌথভাবে সমীক্ষার প্রচেষ্টা বাংলাদেশের দর্শন চর্চায় বিশেষ লক্ষণীয় নয়। এক পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ বা অসম্পূর্ণ রয়েছে যা আলোচ্য গবেষণায় বিদ্যামান দর্শন চর্চার বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করে চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশও প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ঃ

(ক) স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে দর্শন চর্চার বিকাশ, অবস্থান ও বিকাশের সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং সমাধান বের করা;

(খ) নিজস্ব স্বাধীন দর্শন গড়ে উঠার সম্ভাব্যতা বিচার করা;

(গ) একটি পথ নির্দেশনা সুপারিশ কবা।

বিভাগ পূর্বকালে মূলত প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, সীমিত পর্যায়ে মুসলিম দর্শন, মার্কসীয় দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন ও সৃজনধর্মী দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিভাগ উত্তরকালে দার্শনিক গ্রন্থ রচনার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এই স্থবিরতা থাকেনি। এই পর্বে ভারতীয় দর্শনের স্থলে পাশ্চাত্য দর্শনের গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের গ্রন্থগুলোর মধ্যে পাঠক্রম কেন্দ্রিক নৈতিক দর্শন, ধর্মদর্শন, দর্শনের ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞানের দর্শন, শিক্ষাদর্শন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভারতীয় দর্শন, মুসলিম দর্শন, মার্কসীয় দর্শন এবং দর্শন কোষ বিষয়ক গ্রন্থও রয়েছে। এতদ্ব্যতীত রাসেল, হিউম, সক্রেটিস, গায্যালী, ইবনে সীনা, জালালদ্দিন রুমী, ইবনুল আরাবি প্রমূখ দার্শনিকদের উপর পৃথক পৃথক গ্রন্থও দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন বিষয়ে উন্নত গবেষণার পরিচয় পাওয়া গেলেও জাতীয় চেতনার উজ্জীবিত দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন তুলনামুলকভাবে কম। স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থসমূহ পৃথক কোন দার্শনিক ধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি।

বিভাগপূর্ব (১৯৪৭) কালে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠা করার মুখ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই অনূদিত দর্শনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই সময়কার অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ছিল ধর্ম দর্শন বিষয়ক। তবে পাশ্চাত্য দর্শনের উপরও কয়েকটি গ্রন্থ অনূদিত হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাশ্চাত্য বিষয়ক গ্রন্থ কয়টি বাদ দিলে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুবাদকর্ম মূলত মুসলিম দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সত্তর ও আশির দশকে এধারার পরিবর্তন আসে। এ সময় মুসলিম দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব শাখার অনেক গ্রন্থও বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনূদিত হয়। এসব গ্রন্থ প্রাচীন গ্রিক, আধুনিক ও সমসাময়িক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচিত। এক্ষেত্রে প্লেটো, বার্কলে, হিউম ও রাসেলের গ্রন্থ অধিকতর গুরুত্ব পায়। ফলে এই দু'দশকে বাংলাদেশে দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ কর্মের পরিধি পূর্বের চেয়ে আরো বিস্তৃত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এসব গ্রন্থের অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল ভাষার (ফরাসি, জার্মান, রুশ ও আরবি) পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা করা হয়েছে। ফলে মধ্যবর্তী ভাষার দূরত্ব অতিক্রম করা সরাসরি মূল ভাষা থেকে অনুবাদের প্রাঞ্জলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

দর্শন বিষয়ক পাঠক্রম, গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন চর্চার পাশাপাশি জাতীয় চিন্তা-চেতনার প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশে দর্শন চর্চার একটি ক্ষীণ ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ধারার অন্যতম প্রবণতা হচ্ছে বাংলাদেশের অতীত দার্শনিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান এবং সমকালীন

সমাজ বাস্তবতার আলোকে একটি উপযোগী স্বাদেশিক দর্শন উপস্থাপন। কিন্তু দর্শন চর্চার ঐতিহ্য অনুসন্ধান বিষয়ে যে সব প্রবন্ধ ও স্বল্প সংখ্যক গ্রন্থ স্বাধীনতা উত্তর দু'দশকে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের দর্শন চর্চার ইতিহাস সার্বিকভাবে ধরা পড়েনি। একইভাবে সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ও জাতীয় চিন্তা-চেতনার আলোকে যে সব দার্শনিক আলোচনা হয়েছে তাও স্বতন্ত্র কোন দার্শনিক ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মদর্শন, ইহজাগতিকতা, মানব কল্যাণ, জীবন দর্শন, নৈতিক দর্শন, আর্থ-সামাজিক দর্শন ইত্যাদি যে সব চিন্তা ভাবনা রয়েছে তা থেকে স্বাদেশিক চিন্তার একটা খণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। তাতে ক্ষীণভাবে হলেও অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামীর স্থলে ক্রমশ যুক্তিবাদের প্রাধান্য এবং যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে ধর্মবিশ্বাসকে নিরীক্ষণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তান সরকারের ভাষা নীতি ১৯৪৭-৫২

অবন্তী অধিকারী

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাগুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে, ইসলামকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি করা হয়েছিল, তা ক্রমশঃ ভেঙে পড়েছিল। পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অত্যাচার করে চলেছিল।

পাকিস্তানে সরকার গঠনের পরেই দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোকে আঘাত করছে। তারা জানিয়ে দেয় যে উর্দু হবে একমাত্র জাতীয় ভাষা এবং বাংলা ভাষা লেখা হবে আরবি অক্ষরে। উর্দুকে জাতীয় ভাষা ঘোষণা করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম বিক্ষোভ দেখা যায়। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে তর্ক-বিতর্কগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, ভাষাকে কেন্দ্র করে কি ধরণের সমস্যা দানা বাঁধছিল, এবং তা কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামিকরণ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরবিকরণের ফলে ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে জন্মলাভ করে। ১৯৪৭-৫২ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন রাষ্ট্র গঠনের এক প্রচেষ্টা চলছিল, যদিও এক অধীনস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে।

পাকিস্তানের উর্দু-ভাষী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর প্রধান অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল ১৯৩০ সাল থেকে উদ্ভূত ইসলামি চিন্তাধারা, যার একটি প্রধান উপাদান ছিল যে, বাংলা ভাষা লেখা হবে আরবি অক্ষরে। কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল এই ব্যাপারে নতুন রাজ্য পাকিস্তানের পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে একটি মৌলিক ব্যবধান গড়ে ওঠে, যার ফলে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার তাগিদে একটি ভাষাভিত্তিক চেতনাবোধ জন্ম নেয়। ১৯৫০-এর দশকে এই ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, ১৯৫২ সালে বিশালভাবে ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং কয়েকটি বাঙালি ছাত্র এতে শহীদ হন। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধানের শিকড় কতদূর পর্যন্ত এই আন্দোলনের ফলে ছড়িয়ে পড়েছিল

এবং এই সমস্যা সম্বন্ধে পশ্চিম পাকিস্তান কি ধরণের নীতি গ্রহণ করেছিল, যোগসূত্র থেকে গেছে স্বীকার করলেন না যে তিনি কোনো স্মারকগ্রন্থ পেয়েছেন এবং 'state-language working committee'র সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎকার নিলেন না। ছাত্রদের স্মারকগ্রন্থ পেশ করবার সময়তে যেরকম, তেমনই তিনি রাষ্ট্রীয় ভাষার দাবির সম্বন্ধে কোনোপ্রকার আলোচনা বা সভা থেকে বিরত থাকলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার আরো তৎপর হলেন। নতুনভাবে বাংলার উপর আক্রমণ শুরু হল। ১৯৪৭ থেকে সরকার চেষ্টা কবল বাংলা ভাষায় আরবি অক্ষর ব্যবহার করতে। মন্ত্রী ফজলুর রহমান, যিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন, অক্ষর পরিবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর মতে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করবার জন্য, এবং জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য, পাকিস্তানের সমস্ত ভাষার সব অক্ষর সদৃশ হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলা নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে যে, বাংলা ভাষা উদ্ভূত হয়েছে দেবনাগরী থেকে। আরবি ভাষার সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। সুতরাং ওই ভাষাব ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলার জন্য আরবি অক্ষর প্রবর্তন করে এটি করা সম্ভব হবে। এছাড়া, বাংলাভাষী এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ঐক্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। ১৯৪৭ থেকে আরবি হরফ প্রবর্তনের পরিকল্পনা শুরু হয়, এবং শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছয় ১৯৪৯ সালে।

১৯৪৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর করাচিতে সর্ব-পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের প্রথম ভাষণে পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব ফজলুর রহমান জানালেন যে, ইসলামি ধারায় পাকিস্তানে শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় আরবি অক্ষর প্রর্বতন আঞ্চলিক ভাষাগুলি রক্ষা করার একটি উপায় হবে। এছাড়াও আরবি ভাষা চেষ্টা করবে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে সদৃশ ধরণের শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করতে।

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ সালে পেশোয়ারে একটি সমাবেশে ফজলুর রহমান জানালেন যে, আরবি হরফ ব্যবহারে, কতগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। তিনি বললেন যে, পূর্ব বাংলার ভাষা ও হরফ উভয়ই হচ্ছে বাংলা। কিন্তু বালুচিস্তানের ভাষা হচ্ছে পুস্তু, যার প্রচুর সাদৃশ্য হচ্ছে আরবির সঙ্গে। যুক্তাক্ষরের ব্যবহারের ফলে বাংলা, হরফ টাইপ্‌রাইটিং বা shorthand-এ ব্যবহার করা শক্ত। আরবির হরফ সহজ এবং মুদ্রণ-এর জন্য ব্যবহার করা যায়। রোমান হরফের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে এবং সেজন্যই দ্রুত লেখা ও পড়বার সুবিধার জন্য আরবিকে পাকিস্তানের হরফ করা উচিত।

১৯৪৮-এ আরবি অক্ষর পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত করবার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা মাহমুদ হাসান শহীদদুল্লাকে জানান যে, পাকিস্তান সরকার ইসলামিকরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং এই কারণে বাংলা ভাষায় আরবি অক্ষর প্রচলিত করবার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত হয়েছে। মাহমুদ হাসানের ডঃ শহীদুল্লাহকে লেখা এই চিঠিতেই পাকিস্তানের ভাষা নীতির উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নীতিকে কার্যকরী করবার পিছনে অন্যান্য যাদের নাম জড়িত, তাঁরা হলেন, ফজলে আহমেদ করিম ফজলী, চট্টগ্রামের মৌলানা আলি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের ওসমান গণি এবং মৌলানা আবদুল রহমান

রেখুদ, আড়মারিটোলা স্কুলের শিক্ষক। এঁরা 'হুরুফুল কোরান' সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এক বৎসর পর পূর্ব পাকিস্তানে শিশুদের জন্য আরবি অক্ষরে লেখা পুস্তক প্রচলিত করবার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৫১-র ১৯শে সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হল যে, মুসলমান শিশুদের প্রাথমিক স্তরে আরবি অক্ষরে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের আরবি অক্ষরের মাধ্যমে শিক্ষিত করবার পর, তৃতীয় শ্রেণীতে তাদের কোরানের সঙ্গে-পরিচিত করা হবে। প্রাদেশিক সরকার এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কমিটি স্থাপন করেছিল এবং ওই কমিটির কর্তব্য ছিল প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া। অবশ্যই এই শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যে কোনো প্রকারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছিল। উপরন্তু, আরবি ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওযার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। বদরুদ্দীন উমরের মতে, ডঃ শাহীদুল্লাহ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বেই ১৯৪৯-এ পাকিস্তান সংবিধান সভার কাছে 'পূর্ব পাকিস্তান আরবি সংস্থা,' একটি স্মারকপত্রের মাধ্যমে আরবি ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, আরবি ভাষা গ্রহণ করলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিকতা দূরীভূত হবে। বেশ কিছু উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি, যথা, 'স্টেট্ ব্যাংক'-এর গভর্নর এবং সিন্ধআরব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওই নীতি সমর্থন করেছিলেন। সর্বোপরি, ১৯৫১-র ফেব্রুয়ারি ৯ তারিখে আগা খাঁ করাচিতে বিশ্ব মুসলমান সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে, আরবি ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিলে আরব দুনিয়ার মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকা এবং ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের সঙ্গে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তিনি বলেন যে, যদিও অনেকেই হয়তো তাঁর এই বক্তব্যকে পছন্দ করে না, কিন্তু ইসলামের প্রতি আনুগত্যবশতঃ এই বক্তব্য খোলাখুলি বলতেই হবে।

উপসংহার ঃ

উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ১৯৫৪ তে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, যেহেতু বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের দিক থেকে তীব্র আপত্তি এসেছিল। বাংলা ভাষার সম্পর্কে এই ভাষা আন্দোলন গ্রামবাসীদের মধ্যেও আলোড়ন তুলেছিল এবং তাঁরা একে তীব্রভাবে সমর্থন করেছিলেন। বাঙালি ছাত্ররা বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চল থেকে আসতেন, তাই ভাষা আন্দোলনের তাঁরা ধারক ও বাহক ছিলেন। কৃষকরা যদিও সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলন যোগদান করেননি, তাঁদের সমর্থন স্পষ্ট হয়েছিল যখন ১৯৫৪-র নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানে পরাজিত হল এবং এই পরাজয় এসেছিল গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মাধ্যমে।

রৌনক জাহানের মতে, ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত বাঙালি গোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং অভিমানী; সুতরাং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ তাঁদের মধ্যে সহজেই গড়ে উঠেছিল। যদিও অবিভক্ত ভারতে বাংলা ভাষা অনেক সময়তেই মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, এবং ইসলামি চিন্তাধারা ভাষার উপর প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতকের যে ধর্মনিরপেক্ষ 'Bengal Renaissance' বঙ্গদেশের মাটিতে

শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে হিন্দু চিন্তাবিদদের প্রচুর অবদান ছিল। সেই কারণেই পাকিস্তানের নেতারা বলেছিলেন যে, বাংলা ভাষায় প্রচুর হিন্দু ভাবাদর্শ উপস্থিত আছে, যেগুলিকে অস্বীকার করা উচিত। এই ধারণা থেকেই তাঁরা বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলায় উৎখাত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, ভাষা আন্দোলনের সাফল্যের মধ্য দিয়ে আরবিপন্থীদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১) *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ দলিল পত্র ঃ প্রথম খন্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়।

২) বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি প্রথম খন্ড*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা

৩) Raunaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration*, University Prees Limited, Dhaka

১৯৬৬ সালের ৭ জুন ঃ ৬-দফা কেন্দ্রিক একটি হরতাল

মোঃ রেজাউল করিম

১৯৬৬ সালের ৭ জুন বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬-দফা আন্দোলনের এক রক্তঝরা দিন। ঐদিন ঢাকাসহ প্রদেশব্যাপী আওয়ামী লীগ এককভাবে ৬-দফা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে হরতাল আহবান করে। এই হরতালে শ্রমিক-জনতা রক্ত দিয়ে সৃষ্টি করে ইতিহাস। ইহাই '৭ জুন আন্দোলন'। যা ৬-দফা ও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতীক দিবস।[১]

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন পূর্ব পাকিস্তান ছিল বিভিন্নভাবে ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত। এ অঞ্চল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক শোষণ ও নিপীড়নের শিকার। ১৯৪৭ সাল থেকে বিভিন্ন কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তথা বাঙালি ও অবাঙালির মধ্যে যে মানসিক দুরত্ব জন্ম নেয় তা থেকেই সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতার আবহাওয়া।[২] স্বোচ্চার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে স্বায়ত্তশাসনের দাবি।

দেশের এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিকগণ ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি 'জাতীয় সম্মেলন' (National Conference) আহবান করেন। এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সহ ৫ জন নেতা[৩] যোগদান এবং ঐতিহাসিক '৬-দফা কর্মসূচি' উপস্থাপন করেন। কিন্তু সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটি তাৎক্ষণিক এ ৬-দফা দাবি প্রত্যাখান করে। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলসহ সম্মেলন বর্জন করেন। পরবর্তীতে ঢাকা ফিরে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ৬-দফা দাবি জনগণের সামনে উপস্থাপন করেন।

৬-দফা সম্মেলনে উপস্থাপনের পূর্বে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির কোন অনুমোদন

ছিলনা। পরবর্তীতে ১৩ মার্চ তা ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৮ ও ১৯ মার্চ ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ৬-দফাকে চুড়ান্তভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়।[৪] এ কাউন্সিল শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি ও তাজউদ্দিন আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

৬-দফা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম স্মারক। অথচ ৬-দফা রচয়িতা কে? - এ নিয়ে বিতর্ক আজও বর্তমান। আওয়ামী লীগের কোন পর্যায়ের কোন সভায় বা অধিবেশনে ৬-দফা উপস্থাপনের পূর্বে আলোচিত বা অনুমোদিত না হওয়ায় এ ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়। জাতীয় সম্মেলনে যোগদানকারী শেখ মুজিবের সহযাত্রীগণ ৬-দফা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।[৫] ৬-দফা উৎপত্তি সংক্রান্ত বেশ ক'টি তত্ত্ব প্রচলিত আছে।[৬]

৬-দফা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বাঙালি সি.এস.সি অফিসার দ্বারা সৃষ্ট। অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আমলাদের দ্বারা যৌথভাবে সৃষ্ট।

৬-দফা আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা (C.I.A.) দ্বারা সৃষ্ট।

আবার কারো মতে, ৬-দফা স্বয়ং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক সৃষ্ট।

কেউ কেউ দাবি করেন, ৬-দফার রচয়িতা ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি।

৬-দফার উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও এই ৬-দফাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয় - এ ব্যাপারে দ্বি-মতের অবকাশ নেই।

ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা পর শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের ব্যানারে স্বনামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি'' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[৭] আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য বিলি করা হয়। নিম্নে সংক্ষেপিত ৬-দফা উপস্থাপন করা হল ঃ[৮]

১নং দফা ঃ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতি থাকবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২নং দফা ঃ ফেডারেশন সরকারের একতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট বিষয় ষ্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকবে।

৩নং দফা ঃ এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব করা হয় এবং এর যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলা হয় ঃ

ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র 'ষ্টেট' ব্যাংক থাকবে।

খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে; দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪নং দফা ঃ সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের এ ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হয়ে যাবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামুলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

৫নং দফা ঃ এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ হয় ঃ

১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের একতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের একতিয়ারে থাকবে।

৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হবে।

৪) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

৬নং দফা ঃ পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

৬-দফার প্রবক্তা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশে আওয়ামী লীগের নেতা/কর্মীরা দেশের সর্বত্র ৬-দফার প্রচারণা শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচি সমর্থন করে। ৬-দফা ঘোষণার পর ২০ মার্চ থেকে ৮ মে (শেখ মুজিব গ্রেফতারের দিন) পর্যন্ত ৫০ দিনে বঙ্গবন্ধু ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে ৬-দফার পক্ষে এক অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি হয়।[৯] তবে পশ্চিম পাকিস্তানে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। এ কর্মসূচি ঘোষণার পর থেকে বিশেষ করে মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য মে ১৯৬৬ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলিতে এক রকম 'গণ বিপ্লব' চলতে থাকে।[১০]

শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের পাশাপাশি ৬-দফার প্রচারকার্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে অংশ নেয় *দৈনিক ইত্তেফাক*[১১] ৬-দফার জনপ্রিয়তায় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আইউব খান এ কর্মসূচিকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্ত' বলে আখ্যা দেন এবং 'অস্ত্রের ভাষা' ব্যবহারের হুমকী দেন।[১২] সেইসাথে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলিও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।[১৩]

৬-দফা প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮ মে রাতে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ক'জন বিশিষ্ট সহকর্মীসহ পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে ঢাকায় নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার হন। শেখ মুজিবের পাশাপাশি ১০ মে ১৯৬৬ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রায় ৩৫০০ নেতা/কর্মী গ্রেফতার হন।[১৪]

শেখ মুজিবুর রহমান সহ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের সংবাদ ঢাকাসহ সারা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ এই গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করেন।[১৫] ১৩ মে আওয়ামী লীগ 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে পল্টনে জনসভা করে। অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগ এককভাবে ৭ জুন ৬-দফা ও শেখ মুজিব সব সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে সমগ্র প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল আহবান করে। জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলে গভর্নর মোমেন খান অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হন এবং গ্রেফতারের পাশাপাশি 'অশুভ প্রচেষ্টা মোকাবিলার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন' বলে ঘোষণা করেন।[১৬] একদিকে একটা একক নেতৃত্ববিহীন প্রায় রাজনৈতিক দলের ঘোষিত কর্মসূচি অন্যদিকে সরকারের ষড়যন্ত্র। দেশের এমনি এক অস্থিতিশীল পরিবেশে ৬ জুন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র গ্রুপের সদস্যরা প্রদেশব্যাপী ত্রাসের রাজত্বের প্রতিবাদে গভর্নর মোনেম খানের বক্তৃতা বর্জন করেন।[১৭]

সরকারের হুশিয়ারী ও নির্যাতন উপেক্ষা করে ৭ জুন সমগ্র সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এই হরতালের খবর সংবাদপত্রে ছাপানোর ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় ৮ জুন প্রকাশিত সকল সংবাদ পত্র কেবলমাত্র সরকারি প্রেসনোট ছাপা হয়। তাই হরতালের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায়না।[১৮]

৭ জুনের পর সরকারের দমননীতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ববিহীন হয়ে পড়ে। এসময় আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সারির নেতারাও কারারুদ্ধ হন। এমনঅবস্থায় দলের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগমকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়।[১৯] এ আন্দোলনে কেবলমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই আওয়ামী লীগের ৯,৩৩০ জন নেতা/কর্মী গ্রেফতার হয়।[২০]

৬-দফা কর্মসূচির প্রতি জোর সমর্থন জ্ঞাপন ও এই কর্মসূচি প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় *দৈনিক ইত্তেফাক* ও ইহার সম্পাদকের প্রতি বিরাগভাজন হয় সরকার। আর তাই ১৬ জুন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের (রাজনৈতিক) এক নির্দেশনায় (৯৮৫ নং রাজনৈতিক - ২) ইত্তেফাকের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক জনাব তফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে ৫২(২) উপধারা লংঘন ও সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ সংবাদ ও মতামত প্রকাশের অভিযোগে ১৬ জুন গ্রেফতার করা হয় এবং একই অভিযোগে ১৭ জুন তারিখে ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থ 'দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস' বাজেয়াপ্ত করা হয়।[২১] এ ঘোষণার ফলে এখান থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেফাক* সহ ইংরেজি সাপ্তাহিক *ঢাকা টাইমস্* ও বাংলা চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক *পূর্বানী* প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ৭ জুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। অর্থাৎ বাঙালির অধিকার সচেতনতার দিন ৭ জুন। পাকিস্তানের জনলগ্ন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের

গণতন্ত্র বিরোধী, প্রভুসুলভ মনোভাব ও বাঙালি বিদ্বেষী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণের সমস্ত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে শাসকচক্রের অজান্তে ধীরে ধীরে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এই ক্ষোভের অসংগঠিত অথচ স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৭ জুন। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু ও দম্ভের শোচনীয় পরাজয় ঘটে ৭ জুনের হরতালের মধ্য দিয়ে। মনু মিয়া, আবুল হোসেন সহ ১১ জন শ্রমিক-জনতার[২২] রক্তাক্ত পথ বেয়ে পরবর্তীতে শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। যার ফলশ্রুতি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

সূত্র নির্দেশ

১) ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২), পৃ. ৫৪৫।

২) আলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি* ১৯৪৫-৭৫ (ঢাকা ঃ বি.সি.বি.এস.তা/বি) পৃ. ৩০০।

৩) ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১ (ঢাকা ঃ সময় ১৯৯৯) পৃ. ১৮৬।

৪) আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬) পৃ. ১৩৪।

৫) আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা* ২১-*দফা থেকে ৫-দফা* (ঢাকা ঃ সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭) পৃ. ১৫।

৬) এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫; ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২), পৃ. ১৩৩-১৩৪।

৭) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৮-৭১ (ঢাকা ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২) পৃ. ২৫৯-২৬৯।

৮) *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৬০-২৬৯।

৯) আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

১০) ডঃ এম. এ ওয়াদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন* (ঢাকা ঃ রয়েল লাইব্রেরি, ১৯৮৯) পৃ. ২৯২।

১১) আলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০।

১২) আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি* (রংপুর ঃ টাউন স্টোর্স, ১৯৯২), পৃ. ৮৫।

১৩) ড. আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৫৪৪।

১৪) আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।

১৫) ড. আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৪।

১৬) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৫।

১৭) *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জুন. ১৯৬৬।

১৮) আলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪।

১৯) আলি আহাদ, পৃ. ৩২১-২৩।

২০) আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।

২১) *সংবাদ*, ১৭, ১৮ জুন, ১৯৬৬।

২২) ঐ, ৯ জুন, ১৯৬৬।

ইতিহাসে বিশ্বায়ন ঃ বিশ্বায়নে ইতিহাস

কুমকুম চট্টোপাধ্যায়

মানবসভ্যতার সূচনা থেকে শুরু হয় ইতিহাসের পরিক্রমা। ইতিহাস বাদ দেয় না কোন ঘটনা। যে কোন ঘটনা বিশ্লেষণ করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটি খুঁজে বার করা।

আধুনিককালে বহু আলোচিত 'বিশ্বায়ন' এই ধারণাটিরও প্রেক্ষিত খুঁজতে আমাদের ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের ধারায়— মধ্যযুগের শেষে, যখন ইউরোপে অর্থনৈতিক বিস্তৃতির জোয়ার এসেছিল বহির্বাণিজ্যের হাত ধরে। ধীরে ধীরে ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পশ্চাদপদ দেশগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে পৃথিবীর এক বিশাল ভূখন্ডের উপর অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে এতদিন পর্যন্ত যে ভূখন্ডগুলি স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক একক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই অঞ্চলগুলি ইউরোপীয় অর্থনীতির অধীনস্থ হয়ে রেনেসাঁর পরে ইউরোপের জ্ঞান, সম্পদ ও শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে এবং গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ধারণার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রাচ্যের উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা শুরু করল। পাশ্চাত্যের এই অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিংশ শতকের শেষ দুই দশকে বিশ্বায়নের যে দ্রুত বিস্তার আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার মূল নিহিত ছিল ইউরোপের এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানের মধ্যে। এই পদ্ধতি আরও ত্বরান্বিত হয় দ্রুত শিল্পায়নের পথ বেয়ে।[১]

মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থান ঃ

ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে বোঝায় প্রায় এক হাজার বছর সময়কালকে (৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দ - ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) যার সূচনা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যে ও অবসান রেনেসাঁর সূচনায়। এই মধ্যযুগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই মধ্যযুগ প্রাচীন যুগ আধুনিক যুগের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মধ্যযুগকে পুনরায় তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়— প্রথম পর্যায় (৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ - ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দ), দ্বিতীয় পর্যায় (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ - ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দ), এর মধ্যে প্রথম পর্যায়টি ছিল গঠনমূলক, দ্বিতীয় পর্যায়টি প্রগতির পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায়টি ক্ষয়িষ্ণু পর্যায় যদিও এই তৃতীয় বা শেষ পর্যায়টি মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিকতার দরজা খুলে দিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলছিল।

মধ্যযুগের অবসানে শিল্প বিপ্লব ও রেনেসাঁর উত্থানে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ধ্বজা উড়িয়ে পৃথিবীব্যাপী পাশ্চাত্যের জয় ঘোষিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে ১৪৫৩ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বছর কারণ এই বছরটিকে রেনেসাঁর সূচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রেনেসাঁ শুধু শিল্পেই যুগান্তর আনেনি সেই সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিয়েছে এবং পাশাপাশি জাতি ও জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলেছে। মধ্যযুগে জাতি সম্পর্কের কোন ধারণা ছিল না। জাতীয় রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আধুনিক সৃজন এবং এই জাতীয় রাষ্ট্রের পরিক্রমা শুরু হয় আধুনিক যুগের সূচনায় — ষষ্ঠ শতাব্দীতে, ইউরোপে।

১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার ও মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে চিহ্নিত হয়।[২]

ওয়েস্টফ্যার্লিয়া চুক্তি (১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)ঃ

ইউরোপে রক্তক্ষয়ী ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয় ওয়েস্টফ্যার্লিয়া চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তিটিকে ইউরোপের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈঠক বলা হয়। এই চুক্তি ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে।

দ্বিতীয়তঃ এই চুক্তি প্রথম আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা নিয়ে আসে। Hayes বলেন যে এই চুক্তি সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা ঘোষণা করে।

তৃতীয়তঃ এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য শক্তিব ভারসাম্য ব্যবস্থার উদ্ভব হয় যে ব্যবস্থাকে নতুন উদ্ভূত রাষ্ট্রগুলি প্রায় তিন শতাব্দীকাল ধরে অলিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের মত মেনে চলেছিল।[৩]

শক্তির ভারসাম্য (১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ - ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ)ঃ

আন্তর্জাতিক ইতিহাসে শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থা একটি অনন্য সৃষ্টি। এই ব্যবস্থা ছিল দীর্ঘস্থায়ী। এক অর্থে এই সময় আন্তর্জাতিক সমাজ বহুত্ববাদী হয়ে ওঠে কারণ এই সময় জাতীয় রাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্ম হয়। তবে তার মানে এই নয় যে রাষ্ট্রগুলি জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। বরং ব্যাপারটা ছিল ঠিক বিপরীত। তাদেব মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সন্দেহপ্রবণতা ছিল পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। যে কোন সময় তাবা ব্যবস্থা ভেঙে বেড়িয়ে আসতে পারত। তবে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই এই ব্যবস্থার উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন ছিল।

তত্ত্বগতভাবে এই ব্যবস্থা ছিল সাম্য এবং সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই ব্যবস্থার স্থায়িত্বের পিছনে কতকগুলি কারণ কাজ করেছিল। প্রথমতঃ তখনও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ততটা উন্নতি হয়নি। ফলে যোগাযোগ মাধ্যম তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ছিল। দ্বিতীয়তঃ পারমাণবিক অস্ত্র তখনও উদ্ভাবিত হয় নি। ফলে তখন আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের অন্য মাত্রা ছিল। তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ তখনও ছিল পর্যাপ্ত। চতুর্থতঃ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এই সুযোগে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন

আমেরিকার পশ্চাদপদ দেশগুলিকে অধিকার করে সেখানে অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক শাসন কায়েম করার প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশেই নতুন উদ্ভূত জাতীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয় নি।[8]

রেনেসাঁ, রিফর্মেশন ও ভৌগলিক আবিষ্কার শুধু আধুনিক ইউরোপ নয়, আধুনিক পৃথিবীর জন্ম দেয়। ইউরোপীয় জাতীয় রাষ্ট্র ও তাদের গড়া উপনিবেশ মধ্যযুগীয় পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিল। প্রথম আধুনিক রাষ্ট্র ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, স্পেন এবং পোর্তুগাল। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐক্যকরণের মাধ্যমে মধ্য ইউরোপের দেশগুলি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই পর্যায়ে ধীরে ধীরে আধুনিক সমাজ ও আধুনিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে শুরু করে, অবশ্যই ইউরোপীয় ধাঁচে।

বলা যায় এই প্রক্রিয়াটির মধ্যেই বিশ্বায়নের বীজ লুকিয়ে ছিল। উপনিবেশ দখলের লড়াইতে ব্যস্ত থাকার দরুণ ইউরোপের তৎকালীন বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নি। কিন্তু উপনিবেশ বিস্তারের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীব্যাপী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমীধাঁচের আমলাতন্ত্র, সৈন্যবাহিনী ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিশ্বব্যাপী এক বিশেষ রূপ লাভ করে। ইতিমধ্যে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব হয়। যেখান থেকে আধুনিক ধনতান্ত্রিক জাতীয়রাষ্ট্র সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের শ্লোগান দিতে দিতে মাথা তুলে দাঁড়ায়। R. R. Palmar-এর মতে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক ধাঁচ ১৯১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শিল্পায়ন ও বিশ্বায়ন ঃ

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে শিল্প বিপ্লব বিশ্বায়নের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে ইংল্যান্ডের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত শিল্পায়নের পরে ইংল্যান্ডই ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদারনীতিবাদের দিকে অগ্রসর হয়। তখন এই মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে পরিচিত হয়। ইংল্যান্ডের পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপেও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ধনতন্ত্রবাদের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে এই মতবাদ সূচিত হলেও ধীরে ধীরে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদে রূপান্তরিত হয়। অনেকে এই মতবাদকে অবাধনীতি বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি বলে অভিহিত করেছেন। এই নীতি প্রচলন করার মাধ্যমে অবাধ বাণিজ্যিকে শিল্প গঠনের পথে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

ঔপনিবেশিকতাবাদ ও নয়াঔপনিবেশিকতাবাদ ঃ

ঔপনিবেশিকতাবাদের যুগে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশে অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েছে। প্রথমতঃ উপনিবেশটিকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং দ্বিতীয়তঃ উপনিবেশের মানুষের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে। প্রকৃতপক্ষে এই উপনিবেশগুলিতে তারা অত্যন্ত সস্তায় জমি, শ্রম ও প্রাকৃতিক

সম্পদ (কাঁচামাল) পেত। এই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি উপনিবেশগুলি থেকে কৃষিজাত পণ্য সুলভে রপ্তানি করত এবং তাদের নিজেদের তৈরি দ্রব্যগুলি একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উপনিবেশের বাজারগুলিতে বিক্রি করত। এর ফলে উপনিবেশের মানুষরা তাঁদের শ্রম ও উৎপাদিত দ্রব্য স্বস্তায় বিক্রী করতে বাধ্য হ'তেন এবং অন্যদিকে চড়া দামে এই ঔপনিবেশিকদের উৎপাদিত দ্রব্য কিনতে বাধ্য হতেন।

উপনিবেশের যুগ শেষ হ'ল মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির দিকে তাকিয়ে আমরা দেখলাম যে তাদের অর্থনীতি শুধু অনুন্নত নয়, বিকৃতও। দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক একচেটিয়া ধনতন্ত্র একবারে উপনিবেশগুলি থেকে মুনাফা লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। আর উপনিবেশের মানুষরা শ্রমিক হিসেবে, কৃষক হিসেবে, ক্রেতা হিসেবে বঞ্চিত ও শোষিত হয়েছেন। উপনিবেশের অধিকাংশ মানুষের কাছেই উপনিবেশের অর্থ চরম দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অযোগ্য বাসস্থান, অশিক্ষা ও নিরক্ষতা, রাজনৈতিক অত্যাচার ও অসহনীয় উপবাস। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এই ভুখন্ডগুলির প্রাক ধনতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে দিয়েছিল এবং একটি দুর্বল পরজীবী কাঠামো জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার পত্তন হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে। প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতা ধাক্কা খায়। সেই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে, শ্রমিক সংগঠন তৈরি হয়। প্রত্যক্ষ উপনিবেশের দিন শেষ হয়ে আসে।

উপনিবেশগুলিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির তেমন আপত্তি ছিল না যদিও তা একধরণের পরাজয়। তবে একটা বিষয়ে তারা সচেতন ছিল যে কোনও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক কৃষক বাহিনী যেন ক্ষমতায় চলে না আসে। কারণ এরপর তাদের পরিকল্পনা ছিল অর্থনৈতিক শোষণের নতুন উপায় খুঁজে বার করা যা পরে নয়া ঔপনিবেশিকতার বেশে আবার শোষণের রাস্তা খুঁজে নিতে পারে। শ্রমিক ঔপনিবেশিকতাকে কার্যকরী করতে পারতো না। তবে তখনকার মত চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম এবং আরও কয়েকবছর পরে কিউবা এই নয়া ঔপনিবেশিকতার জালকে ছিন্ন করতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ হ'ল নয়া ঔপনিবেশিকতার যুগ। বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি আর এতদিনের প্রচলিত পথে শোষণ চালাতে পারে নি। অতএব তারা প্রায় মরিয়া হয়ে শোষণের নতুন উপায় খুঁজে বার করে। তাই আমরা বলতে পারি যে ইতিহাসই চলার পথে নয়া ঔপনিবেশকতার দুর্গ তৈরি করে দেয়। তদুপরি সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি যাতে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে না পারে সেই উদ্দেশেও প্রতিপত্তিশালী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আনতে শুরু করে। এই উদ্দেশে এই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলিতে উদীয়মান ক্ষমতাশালী শ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করে। যেমন — পেটি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী, প্রশাসক, প্রযুক্তিবিদ্, সামরিক বাহিনী ও দেশীয় মালিকশ্রেণী। ঔপনিবেশিক স্তরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আঞ্চলিক প্রাক-ধনতান্ত্রিক শক্তির সমঝোতা ছিল। নয়া-ঔপনিবেশিক স্তরে এসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আঁতাত হ'ল আঞ্চলিক বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর। বর্তমান অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের পদযাত্রা শুরু সেখান থেকেই।[৫]

বিশ্বায়ন ঃ

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নে গ্যাট (GATT)-এর ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে Bretton Woods Conference একটি নতুন বিশ্ব অর্থনীতির সূচনা করে। এর প্রধান রূপকার ছিলেন Arther Dunkel। এরই হাত ধরে জন্ম হয় গ্যাট -এর (General Agreement on Tariffs and Trade, 1948)।

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০সেপ্টেম্বর তারিখে উরুগুয়েতে গ্যাট-এর একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি বাণিজ্যিক পণ্যের পাশাপাশি পরিষেবা, বৌদ্ধিক সম্পত্তি ও বিনিয়োগকেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। এর ফলে জাতীয় রাষ্ট্রের হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে চলে আসে বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম হয় একটি নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New Economic Order) উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের হাত ধরে। যখন বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের কারখানাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক উৎপাদনেব বিশ্বায়ন শুরু হয়।[৬]

আমরা এই বিশ্বায়নের মোটামুটি তিনটি প্রক্রিয়া দেখতে পাই।

(১) এই বিশ্বায়িত ব্যবস্থা অর্থনৈতিক। বিংশ শতকের শেষে ধনতন্ত্রের প্রসার ও রূপান্তর একটি বহুজাতিক সংস্থাভিত্তিক বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে যেখানে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলিই মূলকর্মী বা কারক। গত দুই দশক ধরে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলি এত শক্তিশালী হয়েছে যে তারা জাতীয় অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উৎপাদনের বিশ্বায়ন সম্ভব করেছে। কোন কোন বহুজাতিক সংস্থা এত শক্তিশালী হয়েছে তাদের আয় কোন কোন জাতীয় রাষ্ট্রের আয়ের থেকেও বেশি এবং তাদের কাজকর্ম এমন একটা বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যেখানে কোন জাতীয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণই পৌঁছায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এই বিশ্বায়ন একটি ভোগবাদের (Consumerism) জন্ম দিয়েছে যা জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে তার প্রভাব ছড়াচ্ছে সারা পৃথিবীতে— এমন কি খোদ আঞ্চলিক সংস্কৃতিও বাদ যাচ্ছে না। এই বহুজাতিক সংস্থাগুলির বাজারিকরণ প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তিগত

উন্নতির ফলে অতিরিক্ত শক্তিশালী গণ মাধ্যম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সমরূপ পণ্য সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিশ্বায়নের ফলশ্রুতি হ'ল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপক শ্রেণী (International Managerial Class) অথবা রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রমকারী মালিক শ্রেণী। তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলিকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যাদের স্বার্থ বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত এবং যাদের ধারণা এই বহুজাতিক সংস্থাগুলির তাদের পক্ষে উপযোগী। এই গোষ্ঠী বা শ্রেণীগুলি বহুজাতিক সংস্থাগুলির সুবিধা করে দেয় এবং একটি ভোগবাদী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে এই শ্রেণীগুলির গঠন এখনও অসম্পূর্ণ।[৭]

অতএব ধারাবাহিক আলোচনার পর উপসংহারে বলা যায় যে বিশ্বায়ন এসেছে ইতিহাসের পরিক্রমায় তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক যুগের সূচনা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রথম পর্যায় - প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতার যুগ। এই পর্যায়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ (মূলতঃ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা) ভূখন্ডগুলিতে শক্তিশালী ইউরোপীয় জাতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে শোষণ চালিয়েছে,— কাঁচামাল সংগ্রহ, উদ্বৃত পণ্য বিক্রি ও উদ্বৃত্ত মূলধন বিনিয়োগ। এই পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল ব্রিটেন।

দ্বিতীয় পর্যায় — নয়া ঔপনিবেশিকতার যুগ এই সময় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দিকে ঝুঁকেছিল এবং সমাজতন্ত্রের গতিকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। এই পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই পর্যায়ে ঠান্ডা লড়াই চলেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে —ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে।

বিশ্বায়নের তৃতীয় পর্যায়ে শুরু হয় ১৯৯০-১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে। এর ফলে সমাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। নয়া উপনিবেশবাদ তখন একছত্র অধিকার পায় পৃথিবীর অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার। সেই পথ বেয়ে আসে বিশ্বায়ন। শোষণের তৃতীয় বা শেষ পর্যায়।[৮]

প্রতিটি ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা ধনতন্ত্রের অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই দেখতে পাই। তাই পরিশেষে বলা যায় যে, উদারনীতির ধ্বজা উড়িয়ে ধনতন্ত্রের যে জয়, তার মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বায়নের উত্থান, তার বিকাশ ও তার অগ্রগতি।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) Joseph Frankel : International Relations in a Changing world, Oxford University Press (Reprinted in 1985) - PP - 152-157.

২) Ian Clark : Globalization and International Relations Theory, Oxford University Press, First Publication (1999), PP 1-14
৩) Rod Hague and Martin Harrop : Comparative Government and Politics - An Introduction, MACMILLAN EDUCATION LTD, Second edition, 1987, PP 29-31.
৪) Arun Bhattacharya : A History of Europe (1453-1789), Arnold Publishers, Second edition 1991, PP 2, 3, 6, 13-15.
৫) Jack Woddis : Introduction to Neo-Colonialisim, International Publishers, New York, 1976, PP 15-27.
৬) Nicholas Abercrombie, Stephen Hill and Bryan S. Turner : The Penguin Dictionary of Sociology, Penguin Books, 3rd edition, 1984, PP 184-184.
৭) Haward V. Perlmutter . On the Rocky Road to the First Global Civilization, Human Relations, Volume 44, no, 9, September, 1991, PP, 898, 902-6.
৮) Report : Peolples' Commission on GATT, V.R Krishna Iyer, O Chinnappa Reddy, D. A. Desai, Rajinder Sachar, Centre for Study of Global Trade Systems and Development, New Delli, 1996, PP 1-3.
৯) Baldev Raj Nayar . Globalization, Nationalism and Economic Policy Reform · Economic and Political Weekly, July 26, 1997, Vol XXXII, no 30, July 26-August 1, 1997, PP 93-99.
১০) Rebert Varickayil : Social Origins of Protestant Reformation, Social scientist, June 1980, no-95, Monthly Journal of the Indian School of Social Sciences, PP 29-30

সূত্র নির্দেশ :

১) Baldev Raj Nayar : Globalization, Nationalism and Economic Policy Reform : Economic and Political Weekly, July 26, 1997, Vol XXXII, no 30, July 26-August 1, 1997, PP 93-99.
২) Arun Bhattacharya : A History of Europe (1453-1789), Arnold Publishers, Second edition 1991, PP 2, 3, 6, 13-15.
৩) Ibid, PP 125-127.
৪) Joseph Frankel · International Relations in a Changing world, Oxford University Press (Reprinted in 1985) - PP - 152-157.
৫) Jack Woddis : Introduction to Neo-Colonialisim, International Publishers, New York, 1976, PP 15-27.
৬) Report : Peolples' Commission on GATT, V.R.Krishna Iyer, O Chinnappa Reddy, D A. Desai, Rajinder Sachar, Centre for Study of Global Trade Systems and Development, New Delli, 1996, PP 1-3.
৭) Nicholas Abercrombie, Stephen Hill and Bryan S. Turner : The Penguin Dictionary of Sociology, Penguin Books, 3rd edirtion, 1984, PP 184-186.
৮) Howard V. Perlmutter : On the Rocky Road to the First Global Civilization, Human Relations, Volume 44, no, 9, September, 1991, PP, 898, 902-6.

হারিয়ে যাওয়া ইনকা সভ্যতা ঃ একটু ফিরে দেখা

দোয়েল দে

ইনকা সভ্যতা হল পৃথিবীর প্রাচীনতম উল্লেখ্যযোগ্য একটি সভ্যতা। এই সভ্যতার সন্ধান স্পেনীয়রা পেরু দখলের সময় পান। ১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনীয়রা দক্ষিণ আমেরিকার বাহামা, কিউবা, হাইতি, আন্টিলেস এবং পানামার অংশ বিশেষ দখল করে মহাদেশের বাকি অংশ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। ফলে মহাদেশের অন্যতম দুই সভ্যতা, উত্তরে আজটেক ও দক্ষিণে ইনকার ইস্তত্ব সম্পর্কেও তাঁদের কোন ধারণা ছিল না। বালবোই প্রথম ইউরোপীয় যিনি পেরুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হন এবং মূলতঃ সোনার সন্ধান করতে করতেই হারিয়ে যাওয়া এক জগতের সন্ধান তিনি পান, যা ছিল ইনকাদের জগত।

সমসাময়িক মেক্সিকোর আজটেকদের মতন ইনকারাও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিলম্বে আবির্ভূত হন।[১] ইনকাদের সমগ্র সভ্যতার কাঠামো নির্ভর করত এমন এক ভিত্তি স্তরের উপর, যার অপসারণ সমগ্র রাজতন্ত্রের ধ্বংস সাধনের সূচক। এই কাহিনীসূত্রই তাদের ঐশ্বরিক আধিপত্যের বশ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করে। এই দৈব নির্ভরতাই তাদের রাজধানী কুজকোর প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে, যা ছিল তাদের পুরাণ কথিত চূড়ান্ত গন্তব্য স্থান।[২]

কুজকো শহর থেকে আঠারো মাইল দক্ষিণ পূর্বে "প্যাকারী টাম্বো" এমনই এক ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল যেখানে শেষ ইনকা সম্রাটদের ঐতিহ্যের নিদর্শন আজও আকৃষ্ট করে। এখানকার এক পর্বতের তিনটি গুহাকে "Place of Appearing" হিসাবে বিবেচনা করা হয়।[৩]

এই পরিপ্রেক্ষিতে একথা উল্লেখ্য যে, মিশরীয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় ধ্রুপদি সভ্যতার ঐতিহাসিক কালানুক্রম সৌভাগ্যক্রমে সারণী, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদিতেই উৎকীর্ণ ছিল, কিন্তু ইনকাদের ক্ষেত্রে সেরকম কোন কিছুই পাওয়া যায় না। যার উপর নির্ভর করে অনুসন্ধান কার্য চালানো যেতে পারে। এই সভ্যতা সম্পর্কে জানতে হলে মূলতঃ কিছু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও মৃৎপাত্রের টুকরোর উপর নির্ভর করতে হয়, যার প্রত্নতাত্ত্বিক তথা ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিতান্ত সীমিত।

প্রথমে ইনকা বলতে রাজা বা সম্রাটদের বোঝাত, যাদের সাংগঠনিক প্রতিভা এবং অপরিসীম সাহস, তাঁদের পেরু, ইকুয়েডর, বলিভিয়া এবং চিলির উত্তরাংশ ও আর্জেন্টিনা অধিকার করতে সাহায্য করেছিল। অতঃপর ষোড়শ শতকে স্পেনীয়দের আগমণের সময় থেকে এই শব্দটি শুধু রাজা বা সম্রাটই নয়, সমগ্র শাসক শ্রেণী, রাজপরিবারের সদস্য এবং অভিজাত ও পুরোহিতদের উদ্দেশে ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমানে আমরা ইনকা বলতে সেই জাতিকেই বুঝি যারা সহস্র বছর ধরে পেরু এবং বলিভিয়ার উচ্চতর ভূমিতে এক সুমহান সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, যার রাজধানী কুজকো শতশত বছর ধরে বিশ্বের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে পরিগণিত হত।[8]

ইনকা রাজবংশের উৎপত্তির ইতিহাস উপকথার জটিলতায় ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। প্রথম সূর্য সম্রাট (Sun Emperor) Manco Copac সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত একজন যুদ্ধ প্রিয় শাসক হিসাবে রাজত্ব করেছেন। তিনি সূর্যের সন্তান (Demi God) হিসাবে পূজিত হতেন।[৫] প্রথম ইনকাদের রাজত্ব মূলতঃ প্রশান্ত মহাসাগর এবং ক্রান্তীয় অরণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ক্রমশঃ খ্রিষ্টীয় নব ম শতকের মধ্যেই এই সাম্রাজ্য উত্তরে ইকুয়েডর ও দক্ষিণে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। বস্তুতঃ স্পেনীয়দের আগমণের সময় ইনকা সাম্রাজ্য তার সমৃদ্ধির শীর্ষে আরোহণ করেছিল এবং এরপরই শুরু হয়েছিল এর পতন। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের দ্বিমুখী আঘাতে সম্পূর্ণ পতনের পূর্বেও এই সাম্রাজ্য আরও প্রায় একশ বছর নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল।[৬]

১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নদী উপত্যকা ও উচ্চ অঞ্চলের অধিবাসীরা এক কেন্দ্রীভূত আর্থরাজনৈতিক পরিকাঠামোয় এক সাধারণ ধর্ম এবং ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। শতশত বছর ধরে এই বিস্ময়কর সভ্যতা সম্মান ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল এবং এর ধ্বংসকারীদের উপরও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল। Mancio Sierra lajesema, ১৫৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কুজকোতে এই বক্তব্য পেশ করেন —"Let it be Known to his Catholic Majesty that the Incas governed in such a manner that among the Indians there was not a single robber or Vicious man or lazy man, nor a perverse or adulterous woman .... The mountains, mines, pastures, game, wood lands and resources of all kinds were duly administered ..... That The Incas were obeyed and Looked up by their subjects as most capable beings and experts in the matter of government ...." কিন্তু W.H.Prescott এর মতে ইনকাদের সরকারি ব্যবস্থা ছিল "The most oppressive, Though the Mildest of despotism."

মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার অধিবাসীদের মতন পেরুর অধিবাসীরাও তাদের সভ্যতার পূর্ব অধ্যায়ে চারটি যুগের অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করত, তাদের মতে প্রতিটি যুগের অবসান ঘটত মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে। পঞ্চম যুগটি হল ইনকাদের যুগ।[৯]

ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান কালে ইনকা সভ্যতায় বিভিন্ন মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, যাদের উপর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, রাষ্ট্রীয় ধর্ম ও একটি সাধারণ ভাষা আরোপ করা হয়েছিল। সভ্যতার মূল একক ছিল ক্ষুদ্র গ্রাম্য সম্প্রদায় যার সদস্যরা 'মার্কা' (marka) নামক ভূমির অধিকারী ছিলেন।[১০] এদের উপাস্য ছিলেন এক বা একাধিক সুরক্ষা দানকারী দেবতা। অঞ্চল বিশেষ এই সম্প্রদায় গুলি হয় স্বাধীনতা বজায় রাখত নতুবা একত্রিত হয়ে মৈত্রী সংঘ (Confederation) গঠন করত। এরা সামরিক নেতা বা বংশানুক্রমিক শাসকদের দ্বারা শাসিত হত।

শতাব্দী ব্যাপী ইনকা কৃষকদের পরিশ্রমের ফলেই বিশ্বের অন্যতম অনুর্বর অঞ্চল কৃষি ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। তদুপরি আমেরিকা মহাদেশে তারাই একমাত্র যারা "Llama" এবং "Alpaca" নামক পশু পালন করেছিল, যেগুলো থেকে পশম ও মাংস দুটোই পাওয়া যেত।

বয়েসের ভিত্তিতে সমগ্র জনসাধারণকে ১০টি শ্রেণীতে ভাগ করা হত। ২০ থেকে ৫০ বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষকেই বাধ্যতা মূলক শ্রমদান করতে হত। নারীরা বুননের কাজে এবং শিশু এবং বয়োজ্যেষ্ঠোরা হাল্কা কাজে অংশ নিত। এইরকম একটি পদ্ধতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বস্তু ও মানব সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন অতীব প্রয়োজন ছিল।

সমগ্র জনসমাজ একটি ক্রমোচ্চশীল আমলাতান্ত্রিক কার্যক্রমের অধীন ছিল। যা তাদের সকল কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত। এক্ষেত্রে সর্বনিম্নে অবস্থান ছিল প্রাদেশিক প্রধানের, যার উপর থাকতেন একজন অভিজাত বংশীয় শাসক, তাঁর উপর ছিলেন চারজন ভাইসরয় যারা "Apos" নামে পরিচিত।[১১]

ইনকা সাম্রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাষ্টীয় ধর্ম এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিল। এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সূর্য দেবতা Inti-র উপাসনা যাকে শাসক বংশের পূর্বপুরুষ হিসাবে গণ্য করা হত। প্রধান Inca বা Sapa Inca হিসাবে তিনি স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়েরই শাসক হিসাবে পরিগণিত হতেন।[১২] কিন্তু একথা উল্লেখ্য যে, সূর্যের উপাসক হওয়া সত্ত্বেও ইনকাদের মনে স্থানীয় দেব দেবী ও পবিত্র উপকরণাদি যেমন, পাহাড়-পর্বত, নদী, ঝর্ণা, শিলা ইত্যাদির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

সূর্যের পরে ইনকাদের প্রধান উপাস্যের স্থান নেয় তাঁর ভগ্নী তথা স্ত্রী চন্দ্র এবং জীবন ও বৃষ্টির দেবতা বজ্র। কুজকোর মন্দিরে এই তিন দেবতা পাশাপাশি পূজিত হতেন।[১৩]

রাষ্ট্রীয় ধর্ম সর্বব্যাপী পুরোহিত তন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হত। সম্রাটের উপস্থিতিতেই কুজকোতে সূর্যের পূজা জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হত। কমপক্ষে চারহাজার পুরোহিত ও দেড়হাজার "Sun virgin" এই সমারোহে অংশগ্রহণ করতেন। মেক্সিকোর মতন নরবলি প্রথা এখানে প্রচুর সংখ্যায় না থাকলেও কোন বিপর্যয় বা কোন সম্প্রদায়ের বিপদের সময় কখনও কখনও শিশু কিংবা Sun virgin দের মধ্য থেকে বলি দেওয়া হত।[১৪]

প্রাচীন পেরুভিয়ানরা তারার গতি প্রকৃতি ও সময় নির্ধারণের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। এরা Luner year বা চান্দ্রবর্ষ এবং Solar year বা সৌরবর্ষের মধ্যে প্রায় সামঞ্জস্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ইনকা সভ্যতায় শিক্ষা কেবল উচ্চবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ইনকা সভ্যতার যে দিকটি স্পেনীয়দের আকৃষ্ট করে, তা হল, এদের সুবিন্যস্ত রাস্তা ঘাট। এত উন্নতমানের রাস্তাঘাট শুধু স্পেন কেন সমগ্র ইউরোপেই অজানা ছিল। এই রাস্তা এতটাই চওড়া ছিল যে, আটজন ঘোড়সওয়ার তাতে পাশাপাশি চলতে পারত। উপকূলবর্তী রাস্তাগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি দিয়ে চিলি ও আটাকামা মরুভূমি হয়ে কুজকো পর্যন্ত বিস্তৃত। পর্বত সংলগ্ন রাস্তাগুলিও কুজকো পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তাগুলো মূলতঃ সৈন্য চলাচলের জন্যই নির্মিত ছিল বলে মনে করা হয়। সুবিন্যস্ত রাস্তা ঘাট একদিকে যেমন যেকোন বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহজে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করত, তেমনি অন্যদিকে রাজধানী কুজকো থেকে দক্ষিণ কেন্দ্র কুইটো পর্যন্ত সংবাদের সহজ আদান প্রদানকেও সহজসাধ্য করে তুলেছিল।

. প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক "Arnold Toynbee" যিনি "Challange and Response" তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যে কোন সভ্যতাই প্রকৃতি বা মানবজাতি কর্তৃক প্রণীত কোন "Challange" এর প্রত্যুত্তব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। Challange যত বেশি হয়, সভ্যতাও ততটাই উন্নত হয়ে ওঠে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সভ্যতা বাঁধার সামনে ভেঙে পড়ে। পেরুভিয়ানদেরও অগ্রগতি ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না এবং এই অগ্রগতির পথেই তাঁরা এক উল্লেখযোগ্য সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, অত্যন্ত অল্পসময়ের শাসনকালে ইনকারা তাদের বিজিত অঞ্চলে তাদের স্থায়ী নির্দশন রেখে যায়। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, অসাধারণ নিসর্গ দৃশ্য আরোপিত নিদর্শনাবলী সমৃদ্ধ একদা ইনকা সভ্যতা মহাদেশীয় চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে এক স্থায়ী ভূমিকা রেখে যায়।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) G. A. Collier and others edited · The Inca and The Aztec Sistes

(1400-1800), New york(etc.) Academic Press, 1982, Introduction.

২) B. C. Brundage : Empire of the Inca, Norman University of Oklahama Press, 1974 (Civilzation of the American Indian series), PP. 7-8.

৩) Ibid, P. 10.

৪) Hiram, Bingham . Lost City of the Incas · The story of MachuPicchu and its Builders, New York, Duell, Sloan and Pearce, 1948, PP. 3-5.

৫) Hans, Silvester, Illus : The Land of the Incas, Landon, Tames and Hudson, 1977.

৬) E. Hyams and G. Ordish · The Last of the Incas, London (etc) Longman, Green and Company Limited, 1963, P. 15.

৭) Hans, Silvester, illus . The Land of the Incas, London, Tames and Hudson, 1977.

৮) Ibid.

৯) Ibid.

১০) Ibid.

১১) Ibid.

১২) Ibid.

১৩) Ibid.

১৪) Ibid.

বহির্ভারতে ভারতীয় সেনা প্রেমিকদের সেতুবন্ধন ঃ মহাদেশীয় ইওরোপ

পারমিতা দাস

ভারতবর্ষের স্বদেশপ্রেমীরা উনবিংশ শতকের শেষ দিকে থেকে বহির্ভারিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের মধ্যে 'বিপ্লব' সাধনের জন্য। ইওরোপীয় সেনা রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন দেশই বাদ যায় নি এই সেতুবন্ধনের প্রয়াসে। এই সেতুবন্ধনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক লন্ডনে স্থাপিত "Lotus & Daggers" (১৮৯১-৯২)।[১]

এরপর শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, সর্দার সিংজী রাওজী রাণা, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ইত্যাদি বহুজনের প্রচেষ্টায় এদের শাখা প্রশাখা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তবে আমার এই প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র মহাদেশীয় ইউরোপের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী।

আমার এই প্রবন্ধটির চারটি অংশ আছে। প্রথম অংশ ভারতীয়দের বিদেশে অভিবাসনের ইতিহাস, দ্বিতীয় অংশ বিভিন্ন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের, তথা তৃতীয় অংশ এর ফলে বিদেশে সেনা প্রেমিক ও নেতাদের মধ্যে যোগসূত্রের পর্যালোচনা আলোচনার, চতুর্থ অংশ ভারতীয় সেনা প্রেমিকদের উপর এই যোগসূত্র রচনার প্রভাব আলোচনা করে।

বিদেশে যে সকল প্রবাসী ভারতীয়রা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কাজ করেছিলেন তাদের অভিবাসনের দুটি প্রকারভেদ আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য পূরণের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা তাঁর নিজের জবানীতে বিদেশযাত্রার উদ্দেশে বলেছেন, "১৮৯৭ সালের নাটু ভাইয়ের গ্রেপ্তার ও তিলকের মামলার সময় আমার প্রত্যয় হল যে, ব্রিটিশ ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন দাম নেই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বাধীনতা বলে কোন জিনিষই নেই আর ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতার কথা একটা ভাঁওতা মাত্র। সুতরাং স্বদেশত্যাগ করে আমি ইংল্যান্ডবাসী হলাম।"[২]

আবার সর্দার সিংজী রাওজী রাণা, বিনায়ক দামোদর সাভারকার এরা ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। সর্দার সিংজী ব্যারিস্টার হবার জন্য কৃষ্ণবর্মার এক বছর পরে ১৮৯৮ সালে ইংল্যান্ডে যান। ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি অবশ্য ব্যারিস্টারি করেন নি, হীরে জহরতের ব্যবসা করেছিলেন। আর এই ব্যবসার পাশাপাশি ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবন–– যেখানে Indian Home Rule Society-র সহ সভাপতি

এবং দাদাভাই নৌরজী প্রতিষ্ঠিত London India Society-র সদস্য হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কৃষ্ণবর্মার মতো রাজনৈতিক কারণে আরো ভারতীয় স্বদেশপ্রেমী বিদেশে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ম্যাডাম ভিকাজী রোস্তম কামা। সেখানে কিছুদিন দাদাভাই নৌরজীর সাথে কাজ করলেও শীঘ্রই নরমপন্থী আদর্শের গন্ডী পেড়িয়ে আরো বৃহত্তর কাজের মধ্যে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটে কৃষ্ণবর্মা ও সর্দার সিংজী রাওজী রাণার সংস্পর্শে এসে।

আন্তর্জাতিক যোগসূত্র রচনার ও প্রবাসী ভারতীযদেরকে উদ্দীপিত করার দুটি মাধ্যম ছিল ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পত্রপত্রিকার প্রকাশনা। ১৯০৫ সালে কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠা করলেন Indian Home Rule Society, India House নামে ভারতীয় ছাত্রদের এক বোর্ডিং হাউস এবং প্রকাশনা করলেন The Indian Socilogist নামে বিখ্যাত পত্রিকা। কৃষ্ণবর্মা এক অভিনব পদ্ধতিতে ভারতীয়দের বিদেশে আসায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ফেলোশিপের ব্যবস্থা করেন। হার্বার্ট স্পেনসরের নামে দুটি ও দয়ানন্দ সরস্বতীর নামে একটি ফেলোশিপের ব্যবস্থা করেন।[৩] কিন্তু তাঁর একটা শর্ত ছিল যে, যেসব ভারতীয় ছাত্ররা এই বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করবে তারা দেশে ফিরে গিয়ে সরকারি চাকুরি নিতে পারবে না। এই ভাবেই ইংল্যান্ডে India House এর ছাত্র হিসাবে এলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার।[৪] বিনায়ক দামোদর সাভারকার বৃত্তি নিয়ে গেলেও তিনি কিন্তু রাজনৈতিক কাজে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ১৯০৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অর্ধশতবর্ষ পূর্তি বিজয় পর্বে ভারত সরকার পালন করবে শুনে কৃষ্ণবর্মা ও বিনায়ক সাভারকার সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে উদ্যোগী হলেন। এই সময়ই বিনায়ক দামোদর সাভারকার লিখলেন *Indian War of Independence.*[৬] কৃষ্ণবর্মা তাঁর পত্রিকায় বিদেশী দেশপ্রেমিকদের বীরত্বের কাহিনীও প্রকাশ করতেন। যেমন তিনি তাঁর পত্রিকায় মার্কিন সাংবাদিক লেরয় স্কটের লেখা "Terrorist" প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।[৭] এই প্রবন্ধে ভেরা সেজোনোভা নামে তরুণ রুশ Social Revolutionary আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছিল যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন "নিষ্ঠা উদ্রেকের উপযোগী।" এর পর কৃষ্ণবর্মা প্রকাশ করেছিলেন "Ethics of Dynamite and the British Despotism in India".

কৃষ্ণবর্মার মতো রাণাজীও তিনটি ফেলোশিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। ২০০০ টাকার রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী ও তৃতীয়টি কোন মুসলমান ঐতিহাসিক পুরুষের নামে।[৮] স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ প্রচারের আরো দুটি মাধ্যম ছিল ইংরাজি মাসিকপত্র 'বন্দেমাতরম' ও তলোয়ার ও 'Indian Freedom' নামক পত্রিকাকে যে পত্রিকা প্রকাশনায় প্রেরণা ছিল রাণাজীর।[৯] এছাড়া সাভারকারের উৎসাহে গড়ে উঠেছিল 'অভিনব ভারত সংঘের' শাখা এবং এই গুপ্তসমিতির প্রকাশ্য রূপ 'Free India Society'.

এই সকল ভারতীয়দের কাজের আপাতঃ সাফল্য ছিল যে তারা এই কাজে আন্তর্জাতিক

সমর্থন পেয়েছিলেন।[১০] তাদের যোগসূত্র রচিত হয়েছিল আইরিশ ফিনিযাম আন্দোলনের নেতা মাইকেল ডেভিট, ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলন ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনের নেতা হাইডম্যান্ড, নৈরাজ্যবাদী কানিংহাম ও বিপ্লবী শ্রমিক নেতা টম মানের সঙ্গে।[১১] সর্বপ্রথমে অবশ্য তাদের আইরিশ জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ব্রিটেন থেকে তাদের সাথে সহজেই যোগাযোগ করার সুবিধা ছিল আর ভাষাগত সুবিধাও ছিল।[১২] ভারতবাসীরা চিরকালই যে আইরিশদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলেতে গিয়ে পার্লামেন্টের অধিবেশনের বর্ণনা এভাবে দিয়েছিলেন, "হৌসে Irish memberদের ভারি যন্ত্রণা, সে বেচারিরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠে তখন হাউসে যে অরাজকতা উপস্থিত হয় সে আর কি বলব। চারিদিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, অভদ্র member রা তাসের মতো 'ইয়া' 'ইয়া' করে চেঁচাতে থাকে। বিদ্রপাত্মক 'hear''hear' শব্দে বক্তৃতার স্বর ডুবে যায়। ...আমার স্বভাবতই আইরিশ মেম্বরদের প্রতি টান।"[১৩]

পরাধীন দেশের মানুষের এই যে পরস্পরের প্রতি এই যে স্বাভাবিক টান তার ফলেই পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্যরাও ভারতীয় প্রশ্নে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধতা করতেন। বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাজয় আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক ও বিদেশী বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে মেলবন্ধনের পথ প্রশস্ত করেছিল। ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন ফুটে উঠেছিল বিভিন্ন বিদেশী পত্র পত্রিকাতে। ফরাসি সমাজতন্ত্রী দলের মুখপত্র লুমানিতে (L' Humanite) লেখা হয়েছিল ঃ "ইংরেজ শাসনে অতিষ্ঠ এই ভারতবাসী ফ্রান্সের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা শুধু যে গর্হিত অপরাধ তাই নয়, তার দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে ফ্রান্সের চিরাচরিত মৌলিক অধিকারই।"[১৪] তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র "International Press Correspondence" পত্রিকাতেও ভারতীয়দের উপর পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হয়েছিল।[১৫]

১৯২২ সালের ২০শে অক্টোবর কৃষ্ণবর্মাকে ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর Review পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেন যা 'রাশিয়ার গণ মানসকে কিছুটা ধারণা দেবে মুক্তি ও ন্যায়ধর্মের জন্য ভারতীয় আন্দোলনের।"[১৬]

বিদেশের ভারতীয়রা নানাভাবে লাভবান হয়েছিল যা তাঁদের কাজে আরো উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। মেদিনীপুরের এক তরুণ হেমচন্দ্র কানুনগো বোমা তৈরির পদ্ধতি জানার জন্য গিয়েছিলেন প্যারিসে। এই সময় রাওজী রাণা তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রের জন্য একটি ল্যাবরেটরি খুলে দেন এবং রুশ ও পোলিসদের বোমা তৈরির বই ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করে দেন।[১৭] এই বইয়ের একটি কপি মানিকতলার বাগানে পাওয়া গিয়েছিল। "ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভিক্টোরিয়াতে বোমা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অনুসন্ধানের সময় দেখা যায় ঐ বইয়েরই একটি কপি প্যারিস থেকে ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে পাঠানো হয়েছিল হরনাম সিংএর

কাছে।[১৮] নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনকে ১৯০৯ সালে ও টিনাভেলির ম্যাজিস্ট্রেট এসো কে ১৯১১ সালে সে পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছিল সেগুলি ছিল রাণাজী ১৯০৯ বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে যে ২০টি অটোমেটিক ব্রাউনি পিস্তলগুলি সমেত পাঠিয়েছিলেন তাঁরই দুটি। India House এর রাঁধুনি ছত্রভুজ মারফৎ সেগুলি পৌছেছিল ভারতবর্ষে।[১৯]

প্যারিসে ভারতীয় দেশপ্রেমিকরা একজন সমাজতন্ত্রী নেতার সংস্পর্শে এসেছিলেন যার নাম অজানা থাকায় ভারতীয়রা তাঁকে Ph.D বলে চিহ্নিত করত।[২০] তার কাছে থেকে অনেক নতুন জ্ঞান ভারতীয় দেশপ্রেমিকরা অর্জন করেছিল। "... জগতের তুলনামূলক ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি তত্ত্ব থেকে শুরু করে সোস্যালিজম্, কমিউনিজম আদি হরেক রকম চিজ একসঙ্গে খিচুড়ি পাকিয়ে গিলে ফেলতে লাগলাম।... কিন্তু আমাদের এই বোমা শেখানোর ব্যাপারে উক্ত সোশালিস্ট গুরুমশায়েরা প্রথমে রাজি ছিলেন না। কারণ তারা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, ভারতীয়রা তখন বিপ্লবী তান্ডবকান্ডের জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছে।"[২১] জেমস ক্যাম্পবেল কার "Political Trouble in India, 1907-17" গ্রন্থে লিখেছেন যে হেমচন্দ্র নাকি প্যারিসে বোমা তৈরি শিখেছিলেন নিকোলাস সাফ্রান্সকি নামে রুশ নৈরাজ্যবাদীদের কাছ থেকে। হেমচন্দ্রের মতো আরো অনেক স্বদেশপ্রেমীরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মতাদর্শগত বিরোধকে পিছনে ফেলে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। কারণ তখন তাদের সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল আন্দোলন চালোনোর জন্য অস্ত্রশস্ত্র বা যুদ্ধবিদ্যা অর্জন বা টাকাপয়সার ব্যবস্থা করা।

১৯১৪ সালে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ফ্রান্স ছেড়ে জার্মানীতে চলে যান। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ও ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য উদ্যোগী হয়ে জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের ব্যারেন ওপেন হাইমের সঙ্গে একটা ১৫ দফা চুক্তি করেন জার্মানির সাহায্যে ভারতে বিদ্রোহ ঘটানোর উদ্দেশে।[২১] তাই ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি গঠন করা হয়। পরে India Independence Committee বা বার্লিন কমিটি গঠিত হয়। এই সময় থেকে লন্ডন ও প্যারিসের জয়গান প্রবাসী ভারতীয় সংগ্রামীদের কেন্দ্র হয়ে ওঠে বার্লিন।[২২] এই বার্লিন কমিটির মাধ্যমেই বাংলার দেশপ্রেমিকরা জার্মানির থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল। যদিও 'ম্যার্ভিরিক', 'লারসেন' ও 'হেনরী এস' জাহাজের মাধ্যমে অস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু দেশে ও বিদেশে ভারতীয় দেশপ্রেমিকদেব ঐ মিলিত প্রচেষ্টা যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় অবধি বেশ ভালোভাবেই চলছিল।[২৩]

সুতরাং এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে প্রবাসী ভারতীয় দেশপ্রেমিকরা অন্য দেশের সাহায্য নেবার বিষয়ে আদর্শগত সাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব দেয় নি। তারা জার্মানীর সাহায্য গ্রহণ করছে, সমাজতন্ত্রীদের সাহায্যও গ্রহণ করেছে এমনকি সাহায্যের জন্য তারা লেনিনের সাথেও দেখা করেছিলেন। আদর্শগত দূরত্বকে অগ্রাহ্য করা ছাড়া সেই সকল ভারতীয়দের কাছে নতুন কোন বিকল্প ছিল না।

কারণ সেই সময় অর্থাভাব ও অস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা ভারতীয়দের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল।

এই আলোচনার লক্ষণীয় বিষয় যে আমি বারবার দেশপ্রেমিক কথাটি ব্যবহার করেছি, ইতিহাসকাররা কেউ কেউ বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমার কাছে এরা সকলেই স্বদেশপ্রেমী কারণ তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন ছিল, তা হল যেকোন উপায়ে ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার। যদিও তাঁদের কর্মপন্থা বা স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন ভিন্ন ধরণের ছিল কিন্তু স্বাধীনতা লাভের ৫৪ বছর পরে আজ তাঁদেরকে 'বিপ্লবী' বা 'জাতীয় বিপ্লবী' না বলে শুধুমাত্র স্বদেশপ্রেমী বা দেশপ্রেমিক নামে চিহ্নিত করা অন্যায্য হবে না।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১) চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী. কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ২৩ ২৪
২) "Indian Sociologist" (১৯০৭ সালে প্রকাশিত)
৩) চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৩০
৪) ঐ
৫) ঐ
৬) ঐ
৭) "Indian Sociologist" (১৯০৮ সালে প্রকাশিত)
৮) চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৩৮
৯) Arun Coomer Bose পাটনা, ১৯৭১, Indian Revolutionaries Abroad
১০) চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ২৪-২৫
১১) ঐ
১২) ঐ
১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "যুরোপবাসীর পত্র", কলিকাতা, ১২৮৮
১৪) চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৪২-৪৩
১৫) খন্ড ৪, সংখ্যা ৩, ২১, ২, ১৯২৪
১৬) চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৩৩
১৭) ঐ
১৮) James Campbell Carr, Political Trouble in India, 1907-17, Calcutta, 1973. পৃঃ ৬১-৬২
১৯) চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৪০
২০) হেমচন্দ্র কানুনগো ঃ বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, কলিকাতা, ১৯২৮ পৃঃ ২০২-২০৪,
২১) চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৫৪
২২) ঐ
২৩) ঐ

বহু বিবাহ ও নারী সমাজ— শ্যামদেশের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মণীষা বসু

বিশ্বের পুরুষশাসিত সমাজের ইতিহাসে নারী বৈষম্য অতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে এর জন্ম লগ্ন থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে, শ্যামদেশ তথা থাইল্যান্ডও এর ব্যতিক্রম নয়, যে কোন দেশের সামাজিক কাঠামো — সেই দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিজস্বতানুযায়ী গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে শ্যামদেশের প্রেক্ষাপটে বিবাহ প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক পরিকাঠামোতে — নারী বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরতে হলে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শ্যামদেশের ইতিহাসে বিবাহ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য - পুরুষের বহুবিবাহ। যদিও বিশ্বের পুরুষশাসিত সমাজে 'বহুবিবাহ' কোন নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু থাই পটভূমিতে এর উল্লেখযোগ্যতা হল— এই বহুবিবাহ বহু প্রাচীন কাল থেকেই আইনানুগ স্বীকৃতি ও ধর্মীয় অনুমোদন পেয়ে এসেছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে থাইসমাজে পুরুষের বহুবিবাহ অথবা mia-noi (গৌণ বা অপ্রধান স্ত্রী কিন্তু যথার্থ উপপত্নী নয়) থাকার ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই আলোচনাতে সেজন্যই নারীর অবদমিত স্থান বা নারী বৈষম্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পুরুষের বহুবিবাহ বা 'Polygamy' কেই মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক ভাবেই এর সাথে থাই পারিবারিক কাঠামোর স্ত্রী পুরুষের ভূমিকার পার্থক্য। পুত্র ও কন্যা সন্তানের অবস্থানগত পার্থক্য ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে। সমগ্র আলোচনাটিকে বহুবিবাহের ধর্মীয় সমর্থন, আইনানুগ স্বীকৃতি ও সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা— এই সুনির্দিষ্ট তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে এগিয়ে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা কবার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনাটি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের একটি পূর্ববর্তী থাই সমাজের চিত্রটিই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

থাই পটভূমিতে পুরুষের অগ্রাধিকার ও বহুবিবাহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসা যাক ধর্মীয় সমর্থনের কথায়। শ্যামদেশের মতো একটি থেরোবাদী বৌদ্ধ দেশে, নারী বৈষম্যের প্রকৃত চিত্রটি বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে কিন্তু অবধারিত ভাবেই হিন্দুধর্মের প্রভাবের কথা দিয়ে শুরু করতে হয় শ্যাম দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অষ্টম/নবম শতাব্দীতে দেশে হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে, এমন কি রাজসভার বহু ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মেও হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা উল্লেখ্যযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ

করত এবং ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম ও সমাজের কঠোর নারী বৈষম্য বৌদ্ধ প্রধান শ্যামদেশীয় সমাজ ও ধর্মকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং এই ধর্মীয় অনুমোদন স্বাভাবিকভাবেই ধর্মপ্রাণ শ্যামদেশে নারী বৈষম্যকে জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে।[১] পুরুষের বহুবিবাহ ব্যতীত। স্বামীর স্ত্রীকে শাস্তিবিধানের একক ক্ষমতা, অত্যাচারে পলাতক স্ত্রীকে আইনী সাহায্যের মাধ্যমে ধরে আনবার ক্ষমতা, স্ত্রীকে স্বামীব ইচ্ছানুযায়ী দান বা বিক্রয় করার ক্ষমতা, বিবাহ উত্তর যৌথ সম্পত্তিতে স্বামীর অগ্রাধিকার — এসকল বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাতেই ধর্মীয় সমর্থনের এক প্রচ্ছন্ন ঈঙ্গিত রয়ে গেছে এবং যা জীবনের প্রায় সর্বস্তরেই পুরষের অধীনস্থ নারীর অবদমিত অবস্থানকেই নির্দিষ্ট করে। এছাড়াও ধর্মীয় অধিকার বা শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষের প্রধানাধিকার — একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিল চিরাচরিত থাই সমাজে।[২] প্রাক্‌বিবাহ জীবনেও বুপখুন বা পিতা মাতার ঋণশোধের ক্ষেত্রেও কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন সামাজিক ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বর্তমান ছিল। থাই সমাজে হিন্দুধর্মের প্রভাবে একটি দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মৃত্যুর পর মুক্তির জন্য অথবা স্বর্গের রাস্তায় পৌঁছাবার গুরুদায়িত্ব একমাত্র পুত্রসন্তানই বহন করতে পারে। সেজন্য পুত্র সন্তান তার প্রাকবিবাহ জীরনে তিন-চার মাসের জন্য ভিক্ষু হিসাবে অর্থাৎ সন্ন্যাস নিয়ে, তাদের পিতৃ মাতৃ ঋণ পরিশোধ করে। কিন্তু যেহেতু নারীদের ভিক্ষু হওয়ার কোন ধর্মীয় স্বীকৃতি নেই — সেজন্য কন্যা সন্তান এই ঋণ পরিশোধের জন্য সাংসারিক ঘরোয়া কাজ ও পিতামাতাকে অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমেই এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়।[৩] অর্থাৎ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত অগ্রাধিকারের ধর্মীয় অনুমোদন— পারিবারিক ও সামাজিক পরিকাঠামোতেও নারীর অবদমিত স্থানকেই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

বৌদ্ধধর্মও পক্ষান্তরে এই ব্যবস্থার পরিপূরক। বিবাহের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু পুরুষের এক বিবাহকেই সমর্থন করেছেন এবং বহুবিবাহকে নির্দলীয় হিসাবেই দেখেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মীয় অনুশাসকেরা পুরুষপ্রধান সমাজের প্রতিভু হিসাবে বহুবিবাহের ধর্মীয় স্বীকৃতি দান করেন। এই ধর্মীয় স্বীকৃতি, পুরুষের বহু বিবাহ আইনী অনুমোদন ও সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতার পথ সহজ ও উন্মুক্ত করে দেয়। শ্যামদেশ এর ব্যতিক্রম ছিল না। সেদেশে ১৩৬১ সালে 'স্বামী-স্ত্রী আইন' (Law of Husband and Wife) র মাধ্যমে পুরষের বহু বিবাহ আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। অর্থাৎ ধর্মীয় অনুমোদন ও আইনী স্বীকৃতি— পুরুষের এই বহুবিবাহকে একটি স্বাভাবিক সামাজিক প্রথা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে যার ফলে আজ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে সেদেশে কোন রকম নারী আন্দোলন লক্ষ্য করা যায় নি।[৪]

এবার আসা যাক, শ্যামদেশে বিবাহ ও পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষের অগ্রাধিকারের আইনী স্বীকৃতির কথায়। ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পর্বে দেখা যায় যে, অন্ততঃ দ্বাদশ

শতাব্দী থেকেই দেশে পুরুষের বহুবিবাহের প্রচলন ছিল এবং ১৩৬১ খ্রিঃ আইনী স্বীকৃতির মাধ্যমে এটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। এই আইনানুগ স্বীকৃতি পরবর্তীকালে ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে অপর একটি আইনের (Three seals Code of 1805) মাধ্যমে পুননবীকরণ করা হয়। ১৩৬১-র স্বামী-স্ত্রী আইনের মাধ্যমে থাই স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হতো। স্বামী তার ইচ্ছানুসারে স্ত্রীর মতামত ব্যতিরেকেই তাকে দ্রব্যের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করতে পারত। যদিও প্রাক্ বিবাহ জীবনে কন্যার উপর এই অধিকার পিতারও ছিল। একজন স্বামী একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রীর উপর তার সকল রকম অধিকার প্রতিষ্টা করতে পারত। অথচ স্ত্রীকে সবসময়ই একজন স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে হতো অন্যথায় তার প্রাপ্য ছিল কঠোর শারীরিক শাস্তি।[৫] সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রেও পুরুষেরই অগ্রাধিকার ছিল। বিবাহ উত্তর যৌথ সম্পত্তিতে স্বামীই ছিল প্রধান অধিকারী, বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সেই সম্পত্তিতে স্বামীর অধিকারই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একমাত্র স্ত্রী যদি বিবাহের সময়, বিবাহ পূর্ব জীবনের সম্পত্তি নিয়ে আসত, তাহলেই সে তার প্রাক বিবাহ জীবনের সেই সম্পত্তি ভোগের অধিকারী হতো। পরবর্তীকালে ১৮০৫ সালের আইনে স্ত্রীদের অধিকার ও মর্যাদানুযায়ী তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমা স্ত্রী (সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী), মধ্যমা স্ত্রী (মর্যাদায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী) এবং দাস স্ত্রী, স্বামী একে ক্রয় করে আনত এবং কোন অবস্থাতেই স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না।[৬] এভাবে আইনের মাধ্যমে প্রথম থেকেই স্বামীর তুলনায় স্ত্রীকে মানুষ হিসাবে মর্যাদার হীন স্থান দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট পুরুষের অগ্রাধিকারের ধর্মীয় অনুমোদন ও আইনানুগ স্বীকৃতি সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোতে সুদৃঢ়রূপে গেঁথে গিয়েছে। ফলতঃ আজও দেখা যায় যে, প্রথমা স্ত্রী তথা আইনানুগ স্বীকৃত স্ত্রী কিন্তু স্বামীর 'mia-noi' রাখার ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক প্রথা হিসাবেই স্বীকার করে নেয়, যদি স্বামী তার সংসার ও সন্তানের প্রতি সমস্তরকম আর্থিক দায়িত্ব প্রতিপালন করে। অর্থাৎ পুরুষের একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা — এমন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে গড়ে উঠেছে যে— ১৯৩৫ খ্রিঃ আইনের মাধ্যমে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হলেও 'mia-noi'র উপস্থিতি সমাজে পুরোমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের সন্তানেরা পিতার আইনতঃ স্বীকৃতি পায়।[৭]

সামাজিক সম্পর্ক হিসাবে পুরুষের বহুবিবাহ থাই সমাজে এমনভাবে গেঁথে ছিল যে, বিভিন্ন রাজার ৩৫/৪০ জন বিবাহিত স্ত্রী ও তাদের ততোধিক সন্তানেরা একত্রে নির্বিবাদে রাজপ্রাসাদে বসবাস করত, এদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন প্রধানা মহিষী। অথচ এই জীবনে, রাজপ্রাসাদের মহিষী অথবা রাজপ্রাসাদের বাইরে অন্যান্য পরিবারভুক্ত বহুবিবাহের অধীনস্থ স্ত্রীদের ক্ষোভের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৮] প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় অনমোদন ও আইনী স্বীকৃতি পুরুষের বহুবিবাহ ও তাদের অগ্রাধিকারকে সামাজিক স্তরে এমনভাবে

প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে, এটি যে নারীদের পক্ষে প্রতিবাদের একটি অতি বিশেষ স্থান, সেই বোধ বা আত্মসচেতনতাই তাদের মধ্যে গড়ে ওঠবার সুযোগ পায় নি। কারণ জন্মের পর থেকেই একমাত্র সুগৃহিনী হওয়ার প্রশিক্ষণই তারা এতকাল পেয়ে এসেছে। থাই সমাজের একজন নারী তখনই পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী হন যখন তিনি প্রথমে স্ত্রী এবং তারপর পুত্রসন্তানের জননী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন এবং যেহেতু নারী সমাজে এর বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় প্রতিবাদ নেই, তাই সামাজিক স্তরে এ নিয়ে কোন উদ্বেলতা বা বিক্ষোভও সৃষ্টি হয় নি— এটিই স্বাভাবিক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে চলে এসেছে ১৩৬১ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. Chitra Ghosh : *The world of Thai Women*, Calcutta, 1990, P. 27.

২. Craig J. Reynolds : *A Nineteenth Century Thai Buddhist Defense of Polygamy and Some Remarks on the Social History of women in Thailand.*

৩. Aphichat Chamaratrithirong : *Perspectives on Thai Marriage Pattern*, Proceeding of the conference, on marrige Determinants & consequence pattaya City May 30 to june 3, 1983, P. 2.

৪. Bhassorn Limonanda : *Mate selection & Post nuptial Residence in Thailand* Chulalongkorn University, Bangkok, 1983, P 34

৫. Lipi Ghosh : *Gender, Marriage & Legal Rights in Thailand* (Occassional paper) Dept. of south & southeast Asian Studies, University of Calcutta, 1995, P. 1.

৬. Kobkun Rayanakorn : *Women's Legal Position in Thailand*, Chiangamai 1974, P. 23.

৭. Bhassorn Limonanda : Op. Cit. P. 41.

৮. Malcom Smith : *A Physician in the court of Siam*, London 1946, P. 141.

ইন্দোনেশিয়ার গণমুক্তির সংগ্রামে সাহসী ইংরেজ মহিলা কারমেল বুদিয়ারজো

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

কারমেল বুদিয়ারজো, যাঁর জন্ম ১৯২৫ এ ইংল্যান্ডে কারমেল ব্রিকম্যান নাম নিয়ে একটি ইহুদি পরিবারে। একটি অনন্য সাধারণ মহিলা ইংল্যান্ডেই উচ্চশিক্ষা লাভ করেন তিনি। ২০বছর বয়সে ১৯৪৫এ যোগ দেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টিতে। ১৯৪৬এ চেকোস্লোভিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে আহুত হয় প্রথম বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেস, ব্রিটেন থেকে তার আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি কমিটিতে আরও অনেকের সঙ্গে ছিলেন কারমেল ব্রিকম্যানও। ১৯৪৬এর আগষ্ট মাসে সরাসরি ভারত থেকে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি হয়ে ঐ বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেসে যোগ দিয়ে যান এই প্রবন্ধের লেখক। তখনই তাঁর পরিচয় হয় কারমেল ব্রিকম্যানের সঙ্গে। সেই বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেসের বিশদ বর্ণনা দেওয়া এই প্রবন্ধের কাজ নয়। এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে বিপুল ভোটাধিক্যে নবজাত আন্তর্জাতিক ছাত্র সংগঠন International Union of Students এর (IUS) সভাপতি নির্বাচিত হ'ন চেকোস্লোভাক ছাত্রনেতা যোশেফ গ্রোহ্মান ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হ'ন বামপন্থী ইংরেজ ছাত্র নেতা টম ম্যাডেন। কার্যকরী সমিতিব নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলেন যুগোস্লাভ ছাত্রনেতা রাইকো টমোভিচ ও মিশরীয় ছাত্রীনেত্রী ইঞ্জি ইখালাতুনা। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক পঞ্চম স্থান অধিকার করে কার্যকরী সমিতিতে নিবাচিত হ'ন।

বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেস চলাকালীনই যুগোস্লাভ ছাত্রনেতা রাইকো টমোভিচ ও হাঙ্গেরিয় সমাজতন্ত্রী ছাত্রনেতা আন্তর্জাতিক ছাত্র প্রতিনিধিদের ২৫জনকে তাঁদের দেশে গিয়ে হিটলার শাহির ফৌজের বর্বরতা ও তার বিরুদ্ধে সমগ্র ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তিদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অবশ্য পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়ার ছাত্র প্রতিনিধিরাও একই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যেহেতু সমগ্র পূর্ব ইউরোপে প্রায় একা হাতে লড়ে নিজেদের দেশের শতকরা ৯০ ভাগ অংশ নাৎসীফৌজের হাত থেকে মুক্ত করছিল যুগোস্লাভ গণমুক্তিফৌজ, তাদের প্রসিদ্ধ নেতা মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে, তাই ছাত্র প্রতিনিধিরা অগ্রাধিকার দিলেন যুগোস্লাভ আমন্ত্রণকে। আর হাঙ্গেরি পরে, যাবার পথে, সেখানে দু'দিন থামা কঠিন নয়। তাছাড়া হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেষ্টে ট্রেন বদলাতে হয়। তাই হাঙ্গেরির ছাত্রবন্ধুদের আমন্ত্রণও গ্রহণ করা হ'ল। ভারতীয় ছাত্র প্রতিনিধি দলে ছিলেন তিনজন, ইংল্যান্ডের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের

কমিউনিস্ট ছাত্র নেতা রামস্বামী, বোম্বাই এর ছাত্রনেতা অরবিন্দ মেহ্‌তাব (তিনি তখন অক্‌সফোর্ডে গবেষণা করছেন) স্ত্রী কুমুদ মেহ্‌তা এরং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। রামস্বামী এবং কুমুদের সারা ইউরোপ ঘোরার পাসপোর্ট ও ভিসা ছিল। কিন্তু ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আমাকে যে পাসপোর্ট গিয়েছিল, তাতে পূর্ব ইউরোপের চেকোস্লোভাকিয়া ছাড়া অন্য কোনও দেশে যাবার অনুমতি দেওয়া ছিলনা। আর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শেখা ছিল যে আমি যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন যাবার চেষ্টা করি, তাহলে পাসপোর্টটি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তাহলে আমি কি করে যাব যুগোস্লাভিয়াতে ? সহায় হলেন কারমেল ব্রিকম্যান। তিনি রাইকো টমোভিচের বান্ধবী, অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়া যাবেন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন প্রাগ শহরে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসে। সেখানকার উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। তাঁর সাহায্যে আমার যুগোস্লাভিয়া ও হাঙ্গেরির ভিসা মঞ্জুর হয়ে গেল। ১৯৪৬ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ট্রেনে করে আমরা ২৫টি ছাত্রছাত্রী রওনা হলাম বুদাপেষ্ট হয়ে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের পথে। সঙ্গে ভারতীয় দলের রামস্বামী, কুমুদ ও আমি, কারমেল ব্রিকম্যান, মার্কিন ছাত্রনেতা বিল রাষ্ট, ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রনেতা সোয়েরিপ্‌নো আরও অনেকে।

সে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। স্বতন্ত্রভাবে তা লেখার বাসনা রইল ভবিষ্যতে কোনও দিন। শুধু ২/১টা কথা বলব। বুদাপেষ্ট শহর লালফৌজ মুক্ত করছিল ৮০দিন প্রবল যুদ্ধের পর। দানিয়ুব নদীর এক পারে বুদা, অপর পারে পেষ্ট। মাঝের সেতুটি যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে, তখনও মেরামত হয়নি। একটি সমাজতন্ত্রী ও একটি কমিউনিষ্ট হাঙ্গেরিয় ছাত্র আমাদের সব দেখাচ্ছিল, বোঝাচ্ছিল। কারমেল সমাজতন্ত্রী ছাত্রকর্মীটিকে প্রশ্ন করলেন, জার্মানি আক্রমণের সময় তোমাদের উভয়দেশের মধ্যে তো প্রবল বিরোধ ছিল। এখন কি অবস্থা? সমাজতন্ত্রী ছাত্রটি কমিউনিষ্ট ছাত্রটিকে আলিঙ্গন করে বল্ল ঃ বুদাপেষ্টের ধ্বংসস্তুপের সঙ্গে চূর্ণ হয়েগেছে আমাদের বিরোধ। এখন নতুন জনগণতান্ত্রিক হাঙ্গেরি আমরা এক সঙ্গেই গড়ব।

বুদাপেষ্ট থেকে ট্রেন আমাদের নিয়ে চল্ল বেলগ্রেডের পথে। ট্রেনে শোবার জায়গা ছিল না। ঠেস দিয়ে বসে সবাই চল্লেন। ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রনেতা সোয়েরিপ্‌নোর কাছে শুনলাম ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা। ভারত স্বাধীন হবার পর সোয়েরিপ্‌নো যুবপ্রতিনিধিদল নিয়ে ভারত এসেছিলেন, কলকাতাতে তাঁরা বিরাট সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন ছাত্রদের কাছে। ১৯৪৮ এ মাদিউম শহরে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় তিনি নিহত হ'ন ওলন্দাজদের গুলিতে। কারমেলের সঙ্গে সোয়েরিপ্‌নোর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। কারমেলের ইন্দোনেশিয়া প্রীতির সম্ভবতঃ সেটাই সূচনা।

যুগোস্লাভ অভিজ্ঞতার কথা এখন বন্ধ করে, চলে আসি কারমেলের কথায়। ১৯৪৮ এ কলকাতায় বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও আন্তর্জাতিক ছাত্রসংস্থার যুক্ত উদ্যোগে ও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সমর্থনে ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ছাত্র যুবসম্মেলন।

সেই উপলক্ষ্যে কারমেল ব্রিকম্যান ও বিদ্যা কানুগা (এখন মুন্‌সী) W. F. D. Y. ও I. U S. এর প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে যোগ দিতে আসেন। সম্মেলনের প্রায় দেড়মাস আগে ১৯৪৮ এর জানুয়ারিতে। ঘটনাচক্রে তাঁরা ও প্রস্তুতি কমিটির অন্যান্য সদস্যরা (তার মধ্যে ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় নেতা সৎপাল ডাংও ছিলেন) থাকতেন ১নম্বর পাম প্লেসে সুরেন ঠাকুরের খালি বাড়িতে। তার বিপরীতে ২ নম্বর পাম প্লেসে এই প্রবন্ধ লেখক থাকতেন। এখনও থাকেন।

খুব কষ্ট করে থাকতেন কারমেল ও সব প্রতিনিধিরাই। খাট ছিলনা। সতরঞ্চি পেতে সবাই শুতেন, রাত মশা ধূপ জ্বালিয়ে। খুব মশার উপদ্রব ছিল বাড়িটিতে। ভাতডাল তরকারি রান্না হত সবার জন্য। কারমেল, বিদ্যা, ইন্দোনেশিয়ার যুবনেত্রী ফ্যান্সেস্কা, শিল্পী চিত্তপ্রসাদ, ছাত্রনেতা সৎপাল ডাং— সবাই তা খেতেন। পরবর্তীকালে যখন সমাজতন্ত্রী দেশের প্রতিনিধিরা এসে পঞ্চতারকা যুক্ত হোটেল ছাড়া থাকতেন না ও আমাদের খ্যাতিমান নেতারাও তখন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন, তার সঙ্গে ১৯৪৮ এর অভিজ্ঞতার কি বিরাট আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

১৯৪৮ এর ২৬মার্চ পশ্চিমবঙ্গে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল। বাজেয়াপ্ত হল পার্টির দৈনিক পত্রিকা ''স্বাধীনতা'', গ্রেপ্তার হলেন শত শত নেতা ও কর্মী। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হ'ল অনেকের নামে, তার মধ্যে আমিও ছিলাম। চারবছর আত্মগোপন করে কাটাবার পর ১৯৫২র মে মাসের গোড়ায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হলে, ফিরে এলাম স্বাভাবিক মুক্ত জীবনে। তখনই খবর পেলাম বন্ধু সোয়েরিপ্‌নোর মৃত্যুর। খবর পেলাম কারমেল বিবাহ করেছেন প্রাগে অবস্থিত ইন্দোনেশীয় যুবনেতা বুদিয়ারজোকে। ভাসা ভাসা খবর পেলাম ১৯৫৭তে যে কারমেল বুদিয়ারজো চলে গেছেন জাকার্তায়, ইন্দোনেশীয় কমিউনিষ্ট পার্টির (PKI) দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে। আর তাঁর স্বামী তখন শুধু যুবনেতাই নন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৪লক্ষ সদস্যের বিশাল ইন্দোনেশীয় কমিউনিষ্ট পার্টি, পার্লামেন্টের ১/৩ সদস্য কমিউনিষ্ট। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি আহমেদ সুকার্ণের সঙ্গে প্রগাঢ় মৈত্রীতে আবদ্ধ কমিউনিষ্ট পার্টি। সেই পার্টির সাধারণ সম্পাদক আইদিৎ একাধিকবার ভারতে এসেছেন। সিপিআই এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিয়েছেন সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধি হিসাবে। কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের।

তারপর এল ১৯৬৫র সেই ঘোর দুঃসময়। সামাজিক ক্যুর মারফৎ ক্ষমতা দখল

করল সেনাপতি সুহার্তো। সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করল ৫/৬ লক্ষ কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থককে। হত্যা করল আইদিৎকে, আরো অনেক নেতাকে। সেই হত্যা কান্ডের সময় কোনও খবর পেতাম না কারমেলের বা তাঁর স্বামী বুদিয়ারজোর। ১৯৭০এর দশকের গোড়ায় হঠাৎ খবর পেলাম যে কারমেল বেঁচে আছেন, তাঁকে মুক্তি দিয়ে সামরিক পাহারায় তাঁকে সুহার্তোর সৈন্যরা তুলে দিয়েছে ব্রিটিশ বিমানে করে লন্ডনের পথে। তাঁর মেয়ে তরী ও ছেলে অস্তকে আগেই তারা যেতে দিয়েছে ইংল্যান্ডে, কারমেলের মা-বাবার কাছে। বুদিয়ারজো তখনও জেলে, ছাড়া পান নি। এখবর আমি পাই পশ্চিম-বঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রর কাছে। একটা আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে জাকার্তায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বিমান থেকে নেমে তিনি দেখেন বিপরীত দিকে বন্দুকের পাহারায় চলেছেন কারমেল ব্রিটিশ বিমানের দিকে। দৌড়ে গিয়ে অশোক মিত্র চেঁচিয়ে বলেন আমি কলকাতার অশোক মিত্র। কাউকে কিছু বলবেন? কারমেল বলেন 'গৌতমকে বলবেন আমায় ইংল্যান্ডে পাচার করে দিচ্ছে, ফিরতে দেবেনা।' আর কিছু বলার আগেই সৈন্যরা বন্দুকের খোঁচা দিয়ে তাঁকে বিমানে তুলেদিল।

তারপর বহু চেষ্টা করেছি কারমেলের খোঁজ পাবার। সফল হইনি। তারপর ১৯৮৯তে ফরাসী বিপ্লবের ২০০ বছর উপলক্ষে আমি প্যারিসে আমন্ত্রিত হলাম আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে প্রবন্ধ পেশ করার জন্য। তার আগে গেলাম লন্ডনে, সঙ্গে আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ও ছোট পুত্র ধীমান। সেখানে যাঁর গৃহে ছিলাম - ইংরেজ কমিউনিষ্ট শ্রীমতী ব্রেন্তা কার্শ, তিনি আমাকে বল্লেন ঃ কারমেল বুদিয়ারজোর সন্ধান পেয়েছি। ৭আগষ্ট ১৯৮৯ সন্ধ্যায় ব্রেন্তার আস্তানায় কারমেল আমাকে খোঁজ করলেন, পরদিন সন্ধ্যায় সস্ত্রীক আমাকে ও ব্রেন্তাকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়িতে। ৪১ বছর পরে কারমেলের সঙ্গে দেখা হ'ল, কোনও অসুবিধা হ'লনা চিনতে। পরস্পরকে উচ্চ আলিঙ্গন করলাম আমরা তারপর মধ্যরাত অবধি শুনলাম তাঁর বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা। বল্লেন ঃ আমি মনে প্রাণে এখনও কমিউনিষ্ট। কিন্তু পার্টিতে যোগ দিই নি। বাকি জীবনটা কাটাতে ইন্দোনেশিয়ার লক্ষাধিক বন্দীর মুক্তি ও ইন্দোনেশিয়াতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে। একটা দ্বিমাসিক ইংরাজি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করছেন, তার নাম TAPOL – ইন্দোনেশীয় ভাষায় যার মানে রাজনৈতিক বন্দী।

১৯৮৯ থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মিত TAPOL পাঠাচ্ছেন কারমেল আমার নামে, দৈনিক "কালান্তর" এর ঠিকানায়। অবিশ্রান্ত অভিযান চালিয়ে গেছেন তিনি সুহার্তো ও তার জল্লাদ সরকারের বিরুদ্ধে, পূর্ব টিমোরের স্বাধীনতার সপক্ষে। তাঁর এই কাজের জন্য দু'বছর আগে তাঁকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষা কমিটি সম্মানিত করেছে এক বিশেষ পুরস্কার দিয়ে, যাকে তাঁরা বলেন বিকল্প নোবেল পুরস্কার। নাতি ও নাতনীদের

অনুরোধে কারমেল ১৯৯৮তে লিখেছেন ইন্দোনেশিয়ার বন্দীশালায় তাঁর অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণা। বইটির নাম "A western woman in Indonesia's Gulag."

২০০০ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুর রহমান ওয়াহিদের সরকার কারমেল বুদিয়ারজোকে ইন্দোনেশিয়াতে ফিরে আসবার অনুমতি দেয়। কারমেল এক মাসের জন্য ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব টিমোরে সফরে যান। জাকার্তায়, ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র, পূর্ব টিমোরে গণতান্ত্রিক মানুষ বিশেষতঃ তরুণতরুণীরা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। প্রায় চার দশক বন্দী থাকার পর যে অল্প কয়েকজন পুরানো কমিউনিষ্ট নেতা ও সামরিক বাহিনীর বামপন্থী সংগঠক এখনও জীবিত আছেন, তাঁরাও মিলিত হ'ন কারমেলের সঙ্গে। লন্ডন ফিরে সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কারমেল লেখেন যে তিনি একেবারে অভিভূত হয়েছেন। তাঁর স্বামী বুদিয়ারজো আর এখন বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁকেও মনে রেখেছেন পুরানো কমিউনিষ্টরা। তাঁরা বলেছেন যে ইন্দোনেশিয়া দুঃস্বপ্নের রাতের অবসান ঘটিয়ে, নতুন সূর্যোদয় আনতে যারা সাহায্য করেছেন। তাদের মধ্যে কারমেল বুদিয়ারজো অবশ্যই একজন। কারমেল এখনও লিখে যাচ্ছেন ইন্দোনেশিয়াতে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে। লক্ষ লক্ষ কমিউনিষ্টকে হত্যা করার জন্য তদন্ত করে সুহার্তো ও তার সঙ্গীদের কঠোরতম শাস্তি দেবার দাবি করে।

এত কাজের মধ্যেও কারমেল কিন্তু কলকাতাকে ভোলেননি। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ আরোপিত ভিয়েৎনাম, বর্মা ও ইন্দোনেশিয়া নিয়ে এক আলোচনা চক্রে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি আসতে পারেন নি কিন্তু একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছিলেন। অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ইতিহাস সংসদকে। আমাকে তিনি নিয়মিত TAPOL পাঠিয়ে চলেছেন, মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন খবর দিয়ে ও আমরা কি করছি জানতে চেয়ে। এরকম অসামান্য মহিলা খুব কমই আছেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে আমি গর্বিত। ইতিহাস সংসদের এবারের বার্ষিক সম্মেলনে সমস্ত প্রতিনিধিদের কাছে তাঁর পরিচয় দিতে পেয়ে আমি গভীর আনন্দবোধ করছি।

সারাংশ

ধর্ম বনাম সত্তা ঃ তাই/আহোম থেকে অসমীয়ার্থ বিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

লিপি ঘোষ

উত্তরপূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যে বসবাসকারী অধিবাসীদের অসমীয়া নামে পরিচিতি। অসমীয়া কে বা কারা ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় কি ছিল এদের পরিচয়— এই প্রশ্নটিই বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

আহোমরা ছিলেন 'তাই' জনজাতির একটি অংশ বিশেষ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে এরা চীনদেশ থেকে অভিবাসন শুরু করে বর্তমান ব্রহ্মদেশের শান অধুষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে উত্তর আসামের লখিমপুর শিবসাগর অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং ঘটনাক্রমে দীর্ঘ ৬০০ বছর এরা ঐ অঞ্চল শাসনও করেন।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃক আসামরাজ্য জয় করা হলে স্বাভাবিক ভাবেই শাসক আহোমদের সঙ্গে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ সংঘাত উপস্থিত হয়। শুরু থেকেই ব্রিটিশ সরকারি শাসকদের লক্ষ্য ছিল 'আহোম'দের সত্তা বিলুপ্তিকরণ। শাসন পর্বের কয়েক বছরের মধ্যেই সরকারি ভাবে 'আহোম'দের অসমীয়া নামে ঘোষণা করা হয়। যুক্তি প্রদর্শিত হয় — আহোমরা তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেন।

সত্যই কি সংখ্যাধিক্য ভারতীয় সভ্যতার মূলধারা বা সংস্কৃত আধারিত হিন্দু সভ্যতার মূলধারায় আহোমরা তাঁদের আদি তাই সংস্কৃতিকে ভুলে যান? এই প্রবন্ধটিতে তাই সাংস্কৃতির দুই ধারা — প্রকৃতি পূজা এবং পূর্বপুরুষদের উপাসনা (Spirit Cult এবং Ancester Waship) আলোচনাপূর্বক দেখানো হয় যে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাব সত্বেও আসাম উপত্যকা অঞ্চলে আহোমরা অনেকেই তাঁদের মূল/আদি ধর্মীয় নিজস্বতা বজায় রেখেছেন।

পরিশেষে তাইমুখী (Pro-Tai) এবং তাই বিরোধী (Anti-Tai) দুই ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর গবেষাণার প্রেক্ষাপটে এই প্রবন্ধটি বিশদে ব্যাখ্যা করে আজকে আহোম জনজাতির ধর্মাচরণের কয়েকটি দিক। আহোম জাগতিক দেব-দেবী (Cosmogonicol God) আত্মার বিশ্বাস (Soul Concept) এবং ক্রিয়াভিত্তিক বিধিনিয়ম (Divination Practices)র বৈশিষ্ট্য গুলি বিশদে আলোচিত হয়।

সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে উপসংহারে বলা হয়-ধর্মক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব ভারতের ইতিহাসে আহোম সংস্কৃতি বহুলাংশেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। সুতরাং ব্রিটিশ শাসককুলের নীতির ফলস্বরূপ যাঁরা আজকের সমাজে অসমীয়া নামে পরিচিত তাদের এক বৃহৎ অংশই তাই। আহোম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

জাপানী সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ও আধুনিকতা

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

প্রাচ্য সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ জাপান। বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বণের মত জাপানীদেরও বারো মাসে তেত্রিশ পার্বণ। দেশের প্রধান পার্বণ Strogation (New years day) ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারি এই দুদিন অনুষ্ঠানের মূল দিন হলেও প্রায় সপ্তাহখানেক এর জের থাকে। পারিবারিক মহামিলনের স্মারক এই উৎসব।

দ্বিতীয় বৃহত্তম সামাজিক উৎসব Obon। আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে স্মরণ করা হয় পূর্বপুরুষদের। ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় Setsubun শীত চলে যাচ্ছে বসন্ত আসছে এই সময়ে এই উৎসবের মাধ্যমে বসন্তকে বরণ করা হয়। মার্চের এক অনুষ্ঠান Hinamatsuri বা মেয়েদের পুতুল উৎসব। এপ্রিলের উৎসব Hanamatsuri বা বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব। জাপানের জাতীয় ফুল সাকুরা বা চেরী এপ্রিল মাসে পূর্ব প্রস্ফুটিত হয়। চেরী ফুলকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য নান্দনিক চেতনা সম্পন্ন জাপানীরা একটি উৎসবের প্রচলন করেছেন যাকে বলা হয় hanami জুলাই মাসের উৎসব Tanabata বা Stav jeihvil আগষ্টে অনুষ্ঠিত হয় hanabi - dakai বা আতসবাজির উৎসব। জাপানের বিভিন্ন স্থানে বড় আকারে অনুষ্ঠিত হয় এটি। সেপ্টেম্বরে মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত হয় চন্দ্রদর্শন উৎসব। অক্টোবরে জাপানে হয় Tai-ku-no-hi বা Health Sports day। নভেম্বরে জাপানে হয় Dunka-no-hi বা সংস্কৃতি দিবস এবং Shichi go san শিশুসন্তানদের স্বাস্থ্য কামনার স্মারক এই উৎসব। নভেম্বরে অপর অনুষ্ঠান Kinro-no-hi বা শ্রম-ধন্যবাদ দিবস। ডিসেম্বরে সম্রাটের জন্মদিন এবং খ্রিষ্টোৎসব। উভয় অনুষ্ঠানে সাড়ম্বরে পালিত হয়। এই বার্ষিক উৎসবে বাইরে আছে চা উৎসব। সৌন্দার্য ও সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠার প্রকাশ পায় এই চা-উৎসব।

জাপানীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় পোষাক 'চিমানা' ব্যবহার করে এবং 'ইকেবানা' বা পুষ্পসজ্জা এদের সংস্কৃতির পরিচয়। জাপানী সংস্কৃতির অপর দুই পরিচয় — 'হাইকু' (ক্ষুদ্রতম কবিতা) এবং 'বেসবল' ক্রিড়া ও 'ক্যারাটে'।

জাপানী সংস্কৃতির এই স্বাদেশিকতার বিপরীতে বর্তমান প্রজন্মের ছবিটি কিন্তু বিপরীতমুখী। ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি রক্ষার বর্তমান প্রজন্ম আদৌ সচেষ্ট নয় বরং জাপানী তরুণ তরুণী আমেরিকার প্রতিই বেশি আসক্ত। এর কুফলও হাতে নাতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সবমিলিয়ে প্রবীণ জাপানীরা যথেষ্ট চিন্তাগ্রস্ত। তাঁদের আশংকা সমৃদ্ধ জাপানী সংস্কৃতি আর বেশিদিন বেঁচে থাকবে না।

ব্রহ্মদেশের রাজনীতি ও বাঙ্গালি সমাজ
১৯৪২ খ্রিঃ হতে ১৯৬৪ খ্রিঃ পর্যন্ত

হিমাংশু চক্রবর্তী

এই প্রবন্ধে ব্রহ্মদেশের রাজনীতি ও বাঙালি সমাজ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের উপাদ্য -১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা থেকে চলে আসা ভারতীয় বংশোদ্ভুত বিশেষতঃ সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় 'ইভ্যাকুইজ' নামে পরিচিত।

বার্মায় বাঙালি সমাজের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে নেতাজীর নাম উল্লেখ্য। Indian Indipendence League-র সদস্য হিসাবে নেতাজীর প্রথম উপস্থিতি ঘটে ব্রহ্মে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মত বার্মার ভারতীয়দের কাছ থেকেও অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করেন।

১৯৪২ খ্রিঃ জাপান বার্মা দখল করে এবং ব্রিটিশ সরকার পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে ব্রিটিশ প্রজাদের দায়িত্ব অস্বীকার করেন। সহায় সম্বলহীন অসহায় ভারতীয়রা বিপদে পড়ে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেন। এই সময়ে অবশ্য কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে বাছাই করা কমিনিষ্টদের নিয়ে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই সময়ে গেরিলাযুদ্ধে নিহত বাঙালিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হরিনারায়ণ ঘোষাল, ড অমর নাগ, অমর দে প্রমুখ।

জাপানী বোমার আঘাতে যে সকল শহর বিদীর্ণ হয় তাদের অন্যতম ছিল মৌলমিন, রেঙ্গুন ও প্রোম। এই তিন শহরেই জাপানী বোমাবর্ষণের নিদারুণ বিধংসীলীলার ফলে শতসহস্র ভারতীয়রা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ শরণার্থী নানা পথে ভারতবর্ষে এসেছিল এই সময়ে।

১৯৪৪র শেষদিকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যখন ব্রিটিশ সেনাদল পুনরায় বার্মায় প্রবেশ করেন। এই সময়েই বর্মী নেতা আউংসান Anti Fascist People's Freedom League গঠন করেন ও ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্য দেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ এ বার্মা প্রতিশ্রুতি পেল পূর্ণ স্বাধীনতার ও আউংসান প্রধানমন্ত্রী হলেন।

১৯৬২ বার্মার ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। ঐ বছর গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো ধ্বংস করে বার্মায় ক্ষমতায় আসেন সামরিক জুন্টা সরকার। ক্ষমতা দখলের অনতিবিলম্বে এই জুন্টা সরকার ফতোয়া জারি করেন — "মায়ানমারে যাদের জন্ম হয়নি তারা বিদেশী।" এই ঘোষণা পর ১৯৪২র পর যে সামন্য সংখ্যক ভারতীয় তথা বাঙালি ঐদেশে ছিলেন জুন্টার নির্দেশে এবং তদানীন্তন ভাবতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আশ্বাসে এরা দ্বিতীয়বার রওনা দেন ভারতবর্ষের উদ্দেশে। মাদ্রাজ, কলকাতা হয়ে এরা ক্যাম্প করেন

হাসনাবাদ, বনগা, কামারহাটি, বসিরহাট, লিলুয়া ও বারাসাতে। পরবর্তীতে বারাসাতে গড়ে ওঠে বার্মা কলোনি।

উল্লেখ্য কিছু ভারতীয় তথা বাঙালিরা অবশ্য শেষপর্যন্ত বার্মাতেই থেকে যান। ফলে ফরিদপুরের ললিতা হয় মা-সান বা নোয়াখালির শ্রীবাস হন নামুটং উংখে।

সঙ্ঘ-শক্তি পত্রিকায় রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ

মোহাম্মদ মাহবুবুল হক

দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশ বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যে খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ থেকে যোগাযোগ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বার্মায় ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় এবং বাংলার সঙ্গে বার্মার আধুনিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। ক্রমে সেখানে ইংরেজ অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজন ছাড়াও কৃষি, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে বাঙালিরা ব্যাপকহারে বার্মা যাওয়া শুরু করে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারি অনুসারে বার্মায় ভারতীয় অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালির সংখ্যা ছিল সর্বাধিক, আবার বাঙালিদের মধ্যে চট্টগ্রামের লোক ছিল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙালি বৌদ্ধ বলতে সাধারণত চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধদের বোঝানো হয়। বাঙালি বৌদ্ধরা বাংলাদেশের প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তারা রেঙ্গুনে বৌদ্ধ মিশনসহ বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। *সঙ্ঘ-শক্তি* পত্রিকা ছিল বৌদ্ধ মিশনের মুখপত্র। ইহা ১৯২৯ সালে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, ১৯৩৮ সালে দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয় এবং ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইহার প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

প্রত্যক্ষত এবং প্রধানত স্বধর্ম চেতনা সৃষ্টি এবং স্বজাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশে ব্রহ্মদেশের প্রবাস জীবনেও তাঁরা মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে বিভিন্ন সংগঠন। *সঙ্ঘ-শক্তি* পত্রিকা সমকালীন অন্যান্য পত্রিকা অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এ থেকেই পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা অনুধাবন করা যায়। তদানীন্তন কালের অনেক বৌদ্ধ পন্ডিত ও সাহিত্যিক এই পত্রিকাতে তাঁদের রচনা প্রকাশ করেন। *সঙ্ঘ-শক্তি* পত্রিকা বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে অনেক লেখক ও সাহিত্যিক সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে সময়কার বৌদ্ধ সমাজ সম্পর্কে আলোচনার জন্য *সঙ্ঘ-শক্তি* পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নাই। বার্মা ও বাংলাদেশের বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি, সমাজের উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ, সমাজ হিতৈষণা এবং সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে *সঙ্ঘ-শক্তি* পত্রিকা এবং প্রবাসী বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনগুলোর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।